





যে অল্পম রসমার্জনা-পূর্ণ, সুপ্রাচীন ও সভ্য জগতের সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, আবালবৃদ্ধ-বনিতার উপভোগ্য সুবিপুল কথাগুহ্র আবুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের আদিযুগে অনুবাদিত হইয়া, 'আরব্য-উপাখ্যান' নামে বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারে সুরক্ষিত হইয়াছিল; তাহা বহুকাল হইতে বাঙ্গালী পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইলেও, তাহার বহু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া, আমরা প্রায় দশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের সুসম্পাদিত ও সুবিস্তীর্ণ ইংরেজী সংস্করণের অনুবাদে 'আরব্য-উপাখ্যান' নামের পরিবর্তে কি কারণে তাহাকে 'আরব্য-রজনীর প্রেমোদ-সংগীত' নামে অভিহিত করি, ইংরেজী-ভাষাবিৎ পাঠকগণের নিকট তাহার উল্লেখের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থের আত্মোপাস্ত যে সকল সুখপাঠ্য ও বিশ্বব্যবহ বিচিত্র কাহিনীতে পূর্ণ, তাহা বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ, বাঙ্গালী সমাজে এতই সুপরিচিত যে, 'আরব্য-উপাখ্যান' বলিলেই পাঠকেরা অনায়াসে বুঝিতে পারেন—কোন গ্রন্থের এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের অমুদিত গ্রন্থ যে, কতকগুলি অসম্পূর্ণ, বিক্ষিপ্ত ও বিশৃঙ্খলভাবে বিত্ত ও আধ্যাতিকার সমষ্টি—অসংখ্য ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ, বাজার-প্রচলিত মামুলী 'আরব্য-উপাখ্যান' নহে, তাহার সহিত এই গ্রন্থবাদের যে যথেষ্ট পার্থক্য বর্তমান—পাঠক সমাজকে তাহা বুঝাইবার জন্য ইহার নাম পরিবর্তনের সার্থকতা থাকিলেও, এই পরিবর্তনের আরও একটি অপরিহার্য কারণ ছিল।

নাম

অতীতের কোন স্বরণাভীত স্বর্ণযুগে নারীজাতির গৌরব-স্বরূপিনী, অপকল্প রূপলাবণ্যবতী, লীলিত-কলাকোশল-পারদর্শিনী, রসিকা-শিরোমণি উজ্জীরনন্দিনী শাহরজাদী সুবিশাল পারস্ত-সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ মুন্সেফী যুবতীগণকে তাহাদের তরুণ জীবনের অভিশাপস্বরূপ এক মহাপাপ হইতে নিষ্কৃতি দানের জন্য,—নারীজাতির সতীত্বের গুচিভায় সন্দিহান, প্রতিনিশার অরসানে অব-পরিণীতা পত্নীর প্রাণ-সংহারে কৃতসঙ্কর বাসনাহকে এই মহাপাপ হইতে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে,—স্বীয় মন্তকের উর্দ্ধে সুশাগিত খড়্গ

আরব্য-রজনী

শাহাবজাদীর
আত্ম-নিবেদিত
প্রেমের মন্দির



হৃদয় হৃদয়ে দোহলামান দেখিয়াও, বিন্দুমাত্র ভীত বা বিচলিত না হইয়া, রাজির পর রাজি—
হৃদীর একাদিকসহস্র রজনী প্রমোদনিশার অবসানে অসীম বৈধী সহকারে যে চিত্তরঞ্জিনী, সরস
রসধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, এবং পারস্তের মহাপরাক্রান্ত শ্রেষ্ঠাশ্রয়তর সুলতান শাহান-সা
শাহরয়ার বাহার উদ্দাম কল্পনা-প্রবাহে লঘু তৃণবস্তুর জায়, নিশাশেষে কোন্ কল্পলোকে
ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, একাদিকসহস্র রজনীর শোক-ছাঃখ-বিধান-বেদনাহারী, মৃত্যুঞ্জয়ী স্বধামোতে
অভিমুগ্ধিত সেই প্রমোদ-লহরীর ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিও কি ‘আরব্য-উপন্যাস’ নামটিতে পরিবাক্ত হইয়া
সাহিত্য-রসলিপু নর-নারীর অপরিতৃপ্ত কামনা-বাসনা-বিহ্বল চঞ্চল চিত্ত স্পর্শ করিতে পারে?—
তাহার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বুঝিয়াই শ্রেষ্ঠতর আদর্শে বিরচিত এই বিপুল কথা-গুরুকে যথোপা
নামে অভিহিত করাই সম্ভব মনে হইয়াছিল; হুতরাং অত্মবাদকের পক্ষে ইহা দৃষ্টান্ত নিদর্শন মনে
করিয়া কেহ অসম্ভব হইবেন না, এক্সণ আশা করা যাইতে পারে।

এই বিখ্যাত কথা-গুরু কোন্ গুণে অরণ্যভীত যুগ হইতে রস-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাগণের
চিত্তবিনোদন করিতেছে, এবং এ দেশের সকল শ্রেণীর পাঠক—উচ্চ হইতে নিম্নতম স্তরের
নরনারীগণ স্বাশান্তিপূর্ণ বাল্য—কল্লবিকুল, সংগ্রাম-কাল কন্ধ্যায় যৌবনে, এবং হৃদীর জীবনবাণী
স্ব-ছাঃখের স্তুতি-বিজড়িত, অবসাদ-শিথিল, বৈচিত্র্য-বিরহিত, কল্লজীর্ণ বার্কোর নিঃসঙ্গ অবসরে
পুনঃ পুনঃ পাঠেও পাঠের আগ্রহ তাগে কেন অসমর্থ; গল্পের পর ইহার গল্পের লহরী, একটি আখ্যায়িকার
বর্ণনাস্তরে কালীর কোটার মত অজ্ঞাত কাহিনীর কৌশলময় অবতারণা, বিকাশ ও পরিণতি,
কোন্ মাদকতা-শক্তিতে সকলকে মুগ্ধ করে, এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহাও নিকট কেন যে তাহা
পূরাতন হয় না—নতন করিয়া তাহার পরিচয় দিতে যাওয়া, ক্ষুদ্র মূগ্ধ-প্রদীপের স্নান আলোকের
সাহায্যে স্বধাবন-কৌমুদী-সমুদ্রাসিত শরদ-নিশায় পূর্ণচন্দ্রের বিকশিত শোভা প্রদর্শন-চেষ্টার জায়
হাস্যোদ্ভূতক; আমাদের হাত্যাপদ হইবার ইচ্ছা নাই।

এই উপন্যাস-বর্ণিত একাদিকসহস্র রজনীর কাহিনীগুলি কত কাল পূর্বে কোন্ যুগে ভারত
আসিয়া, ভারতের বিভিন্ন ভাষার মহামূল্য স্থায়ী সম্পদে পরিণত হইয়াছিল, তাহার কোনও
নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নাই। ইহার মূল গুরু কোন্ শতাব্দীতে বিরচিত হইয়া প্রাচ্য জগতে কথা-সাহিত্যের
ইতিহাসে নব যুগের প্রবর্তন করিয়াছিল, তাহা নির্ধারণের স্পষ্টায় কোন কোন ভাষ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত
গভীর গবেষণাক্রমে এক একটা স্থাঃখের নাম নির্দেশ করিলেও, তাহারা তাহাদের উক্তির অল্পকুলে
কোনও প্রামাণ্য যুক্তি বা নির্ভরযোগ্য নিদর্শন প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মূল গ্রন্থের
ভাষ্য-বৈচিত্র্য, ও গুরুবর্ণিত আখ্যায়িকা-সমূহের নায়ক-নায়িকাগণের প্রাদেশিক ও সামাজিক
আচার-ব্যবহারের বৈশিষ্ট্য, রুচি ও প্রবৃত্তিগত বিশেষত্ব ভিন্ন, তাহারা গল্প-রচনার সময় নির্ধারণের
অকাটা কোনও প্রমাণ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যে চেষ্টার ফল কেবল অধ্যয়নের উপর
নির্ভর করে, তাহা হইতে কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না; তবে সেই স্বযোগে
অনেকে পাণ্ডিত্য প্রকাশের খ্যাতি অর্জন করেন বটে। বস্তুতঃ, বিভিন্ন উপাখ্যান কল্পনা-কুশল
সাহিত্যরসজ্ঞ অভিন্ন লেখক দ্বারা একই সময়ে রচিত কি না, এবং এই বিরাট সংগ্রহ একই ব্যক্তির
জীবনবাণী পরিশ্রমের ফল কি না, এ বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হয়। কেহ কেহ অধ্যয়ন

বচনার যুগ



আজ্ঞা দিবেন না, এইরূপে দেশের একটা মহা ভয় আমি নিবারণ করিব।" দিনারজাদী সম্বন্ধে ভগিনীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

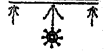
সন্ধ্যাকালে উজীর শাহারজাদীকে স্থলতানের প্রাসাদে লইয়া চলিলেন; স্থলতানের প্রাসাদ-কক্ষ-দ্বারে উপস্থিত হইয়া কজাকে স্থলতানের হস্তে সমর্পণপূর্বক তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্থলতান শাহারজাদীকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহাকে অবগুণ্ঠন মোচন করিতে বলিলেন। তাঁহার অতুল্য স্বন্দর মুখ, কমনীয় কাস্তি, বিকাশোন্মুখ যৌবনের লাবণ্যদীপ্তি দেখিয়া স্থলতান বিমুগ্ধ হইলেন। কিন্তু শাহারজাদীর ইন্দ্রীবরতুলা নয়নে অশ্রু দর্শন করিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, সম্মেহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উজীরকতা, তুমি কাদিতেছ কেন? তোমার ছুখে কি বল, সাধা হইলে আমি তাহা দূর করিব।"

শাহারজাদী বীণাবিনিমিত্ত্বেরে বলিলেন, "জীহাপনা, আমার একটু কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, তাহাকে আমি পাণের সহিত ভালবাসি, সেও আমাকে প্রাণতুলা ভালবাসে। আমার বড় ইচ্ছা, আপনি তাহাকে

আজিকার রাত্রিটা আমার সহিত এক কক্ষে বাস করিবার অনুমতি দান করেন। তাহা হইলে আমরা পুনর্বার প্রণয়ের সহিত কথাবাস্তা করিতে পারিব, তাহার নিকট শেষ বিদায়ও লইতে পারিব। আমি তাহাকে যে কত ভালবাসি, তাহার নিদর্শন দেখাইবার জুই জীহাপনার এই অনুগ্রহ কামনা করিতেছি।" স্থলতান শাহারজাদীর এই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন, তখনই দিনারজাদীকে আনিবার জন্ত লোক প্রেরিত হইল; দিনারজাদীও অবিলম্বে সুবেশে সজাজ্জতা হইয়া প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। স্থলতান মহাসুখা পালকে শাহারজাদীর সহিত পরম আনন্ডপূর্বক-রাত্রি অতিবাহিত করিলেন, দিনারজাদী সেই পালকের পাদদেশে



শাহারজাদী
মিলনের
মধ্যমিনী



লোমুতা
খোন্সা



সংক্ষিপ্ত একখানি গালিচার উপর শয়ন করিলেন। দ্বিবার্ষিক অতিবাহিত হইলে দিনারজাদী শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং শাহারজাদীর শিক্ষা অমুল্যারে বলিলেন, “দিদি, যদি তুমি না ঘুমাইয়া থাক, তবে যতক্ষণ প্রভাত না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমার পরম আশ্চর্যা গল্পের একটি বল, আর কখনও ত তোমার মুখে এ সকল মধুর গল্প শুনিতে পাইব না।”



শাহারজাদী দিনারজাদীকে কোন উত্তর না দিয়া, সুলতানকে সাহায্যপূরক বলিলেন, “জাঁতাপনা, আমার ভগিনী যে অল্পরোধ করিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিতে কি আপনি অমুমতি দিবেন?” জাঁতাপনা বলিলেন, “এ অতি উত্তম কথা, যতক্ষণ প্রভাত না হয়, ততক্ষণ তুমি নিশ্চিন্তভাবে গল্প বলিতে পার।” শাহারজাদী তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন, “ভগিনি, তবে শোন।”—অনন্তর তিনি সুলতানকে লক্ষ্য করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।





অতি প্রাচীনকালে পারস্যদেশে বহু-দিগেশজয়ী এক স্বলতান ছিলেন, ভারতবর্ষে হইতে চীনদেশ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তীর্ণ ছিল। তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে যেমন ভয় করিত, তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার অশেষ সদুত্তমের জন্ত তাঁহাকে সেইরূপ ভক্তি করিত—ভালবাসিত। তাঁহার মহাপরাক্রান্ত বহুসংখ্যক সূক্ষ্মকিত সৈন্য ছিল, সেই জন্ত কোন রাজাই তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেন না।

এই স্বলতানের দুই পুত্র; প্রথম পুত্রের নাম শাহরিয়ার, দ্বিতীয় পুত্র শাহজাহান। রূপে, জ্ঞানে, বলে, সাহসে উভয়েই পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন।

বাদশাহ অনেক দিন মহাগৌরবে রাজত্ব করিয়া নিয়তির অলঙ্ঘ্য-বিধানে পরলোকগমন করিলে, শাহরিয়ার প্রথম-যৌবনে পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। প্রজাগণ নব স্বলতানের মনোরঞ্জনের জন্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। স্বলতান শাহরিয়ার তাঁহার কিশোরবয়স্ক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বহু রাজ্য ও রাজ-সম্মান প্রদান করিয়া, তাঁহাকে তাতারদেশের অধিপতিপদে নিযুক্ত করিলেন। শাহজাহান এই নবরাজ্যে উপস্থিত হইয়া, রাজধানী সমরকন্দে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিলেন।

এই ঘটনার পর দশ বৎসরকাল আর উভয় ভ্রাতার সাফাৎ হইল না। দশ বৎসর পরে স্বলতান শাহরিয়ার ভ্রাতাকে দেখিবার জন্ত উৎসুক হইলেন; তদনুসারে তিনি ভ্রাতাকে তাঁহার রাজধানীতে আস্বানপূর্বক এক দূত প্রেরণ করিলেন। প্রধান উজীরই এই দূত নিযুক্ত হইলেন। মহাসমারোহে উজীর সমরকন্দ রাজধানী যাত্রা করিলেন। শাহজাহান তাঁহার আগমন-সংবাদে পরম পুলকিতচিত্তে উজীর ও ওমরাহবর্গে বেষ্টিত হইয়া, নগরপ্রান্তে উজীরশ্রেষ্ঠের অভ্যর্থনা করিলেন। অজ্ঞাত কথার পর দূত তাতাররাজ শাহজাহানের নিকট স্বলতানের ভক্তিপ্রাণ জ্ঞাপন করিলেন। শাহজাহান তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের এই সদয় বাবহারে পুলকিত হইয়া, উজীরকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, “হে উজীরশ্রেষ্ঠ! আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর স্বলতান আমার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা আর কি অধিক অহুঃখের আশা করিতে পারি? আমিও তাঁহার চরণ-দর্শনের জন্ত একান্ত অধীর হইয়াছি, তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির বিদ্যুদ্ভাও হ্রাস হয় নাই। আমার রাজ্যে অচলা শান্তি বিরাজিত, যাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইতে আমার দশ দিনের সময় আবশ্যক। এই অল্প সময়ের জন্ত আর আপনাকে কষ্ট করিয়া রাজধানীতে প্রবেশ করিতে হইবে না, শিবির-সংস্থাপন পূর্বক নগরপ্রান্তেই এক কয় দিন বাস করুন। আপনার ও আপনার সঙ্গিগণের আতিথ্যের বাহাতে কোন কষ্ট না হয়, আমি তাহার বন্দোবস্ত করিতেছি। শাহজাহানের আদেশে উজীর ও তাঁহার সহচরগণের আতিথ্য-সংকল্পের আয়োজন হইলে, রাজ্য প্রাসাদে প্রস্থান করিলেন। প্রচুর বাগ্‌সভা ও বহুমূল্য উপহারে উজীরের শিবির পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।



উজীর-সম্বন্ধে।



অন্তঃ-
ধর্মসং-
হইল। দশ দিনের মধ্যে সকল বন্দোবস্ত শেষ হইলে, শাহজাহান তাঁহার মহিষী ও অমাত্যগণের
বিদায়গ্রহণ করিয়া, একদিন সাংকালে বহুসংখ্যক অস্ত্রের সহিত রাজধানী সমরকন্দে
যাত্রা করিলেন। সুলতান-প্রেরিত দূতের শিবিরে উপস্থিত হইয়া, মধ্যরাত্রি পর্যন্ত তিনি নানা প্রসঙ্গে
অতিবাহিত করিলেন, তাহার পর সহসা তাঁহার মনে পড়িল যে, একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাসাদে ফেলিয়া
আসিয়াছেন, উহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। শাহজাহান উহা আনয়ন করিবার জন্য তিনি স্বয়ং একাকী গমন
করিলেন। মনে মনে ইচ্ছা ও ছিল, রাজ্যত্যাগের পূর্বে আর একবার তাঁহার প্রিয়তমা মহিষীর সহিত সাক্ষাৎ
করিয়া, তাঁহাকে প্রেমালিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করেন। শাহজাহান মহিষীকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং
তিনি গোপনে রাজধানীতে প্রবেশপূর্বক রাজ্যের মহলে উপস্থিত হইলেন। এদিকে রাণী হির করিয়াছিলেন,
রাজা আর শীঘ্র রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিবেন না, সুতরাং তিনি রাজার একটি সামান্য ভৃত্যকে
বিলাসকক্ষে আনিয়া, তাহার সহিত আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইয়াছিলেন। রাণী যে অসতীর্থ শিরোমণি ছিলেন,
শাহজাহান কোনদিন ঘূণাক্ষরেও তাহা জানিতে পারেন নাই।

রাজা ভাবিতেন, তিনি হঠাৎ রাণীর নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে একেবারে আনন্দ ও বিস্ময়ে মগ্ন
করিয়া ফেলিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি গোপনে অতি দীর্ঘে মহিষীর মহলে প্রবেশ করিলেন। সহসা দূর
হইতে বাতায়নপথে তিনি মহিষীর কক্ষের অগায়ে দেখিলেন, সেই কক্ষে রাণীর শয্যার একটি
পুরুষ-মূর্তি! তাঁহার মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল। রাণীর মহলে পরপুরুষ! চক্ষুকে তিনি বিশ্বাস
করিতে পারিলেন না, অনেকক্ষণ নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজা যখন বুঝিলেন, তাঁহার দৃষ্টির
ভ্রম জন্মে নাই, সতাই মহিষী একজন নগণ্য ভৃত্যের সহিত তাঁহার শয্যা নিদ্রিত আছে,
তখন শাহজাহান ভাবিলেন, 'আমি প্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে না করিতেই চুস্তারিণী এই ভাবে আমার
পবিত্র কুলে কালি দিল! পাণিষ্ঠাকে আমি ইহার প্রতিফল প্রদান করিব। আমি রাজা, রাজ্যে কেহ
কেন কুকার্য্য করিলে, কুকার্য্যকারীকে দণ্ডিত করা রাজধর্ম। আমি মহিষীর স্বামী, আমার প্রতি যখন
মহিষী বিশ্বাসঘাতিনী হইয়াছে, তখন তাহার আর নিন্তার নাই!' শাহজাহান ক্রোধে উদ্ভ্রান্তপ্রায় হইয়া
এক লম্বে গৃহকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং তীক্ষ্ণধার তরবারী কোষ হইতে উন্মুক্ত করিয়া মহিষী ও তাহার
উপপতিকে এক আঘাতেই নিহত করিলেন। তাহাদের নিস্রা চিরনিদ্রায় পরিণত হইল। তখন মর্মান্বিত
রাজা সেই বিধিগত-দেহদ্বয় প্রাসাদ-প্রাস্তর উঠানে নিক্ষেপ করিয়া, স্বয়ং পূর্ববৎ গোপনে রাজধানী পরিত্যাগ
করিলেন। কাহারও নিকট কোনও কথা প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর শাহজাহান মহসমারোহে সমরকন্দে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সহচরগণের আনন্দ ও উৎসাহের
সীমা রহিল না; কিন্তু রাজা স্বয়ং ঘোরতর বিষম, মনুষ্যভীর নিপীড়িত, রাজ্যের অসতীর্থের কথা পুনঃ পুনঃ
তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল; শোকে, গ্লুখে মৌনভাবে তিনি সমস্ত পথ অতিবাহিত করিলেন। কেহই
তাঁহাকে কোনরূপে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না।

শাহজাহান তাঁহার জ্যেষ্ঠ মহোদয়ের রাজধানীতে উপস্থিত হইলে, সুলতান শাহরিয়ার প্রাসাদত্যাগ
করিয়া, অমাত্যগণের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। বহুদিন পরে উভয় ভ্রাতা পরস্পরের
স্নেহালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া, উত্তম হৃদয় নীতল করিলেন; কিন্তু শাহজাহানের মনের বেদনা দূর হইল না।

করেন, ভারতীয় উপকণার বৈচিত্র্যপূর্ণ গ্রন্থ পঞ্চতন্ত্র, এবং কথা-সংস্রমাগরের কোন কোন কাহিনীর ছায়া এই উপন্যাস-মালায় প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজিত আছে। কিন্তু কোনও গ্রন্থে রচিত, তাহা নির্ণয় না হইলে, কে কাহার প্রভাবে ভাস্কর, তাহা নিরূপণ করিবার উপায় নাই। সুতরাং এক্ষেপে ভগবানু জীৱামক্ষুদেবের উপদেশই গ্রহণযোগ্য। বুদ্ধিমান রসজ্ঞেরা প্রাচ্য-বাসীগণে প্রবেশ করিয়া স্বপক্ষ স্রমিষ্টে আমের রসাস্বাদনেই পরম তৃপ্তি লাভ করেন; আর পরব্রাহ্মা হিসাব-বিশেষ দল আমবাগানে কত গাছ আছে, প্রত্যেক বৃক্ষের শাখার সংখ্যা কত, এবং কোন শাখায় কত পত্র, তাহাই নির্ণয়ের জ্ঞান ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। সেই সকল মৃত্তকায় আমের রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকে। সাহিত্যরস-লিপ্সু পাঠক-পাঠিকাগণ আরবা-রজনীর মাধুর্য্য উপভোগের জন্মই আগ্রহ প্রকাশ করেন; তাহাদের এই আগ্রহ পূর্ণ করাই এই সকল মনোহর আশ্রয় রচনার উদ্দেশ্য, এবং ইহাতেই তাহার চরম সার্থকতা। তবে এ কথা সত্য যে, প্রাচ্য-গণের প্রাচ্য মুদলমান সমাজের রীতিনীতি, প্রথা, নরনারীর মনোভাব ও তাহাদের চরিত্রগত বৈশেষ্য প্রভৃতি এই উপন্যাসে যে ভাবে পরিষ্কৃত হইয়াছে, প্রতীচ্য সমাজে তাহার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহারা এই প্রাচ্য দেশীয় ভাবের ভারবাহী ব্যাপারী মাত্র।

একাধিকসহস্র আরবা-রজনীর ধারাবাহিক উপাখ্যানগুলি বহুদিন পূর্বে যুরোপের বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইলেও, প্রাচ্য জাতিসমূহ, বিভিন্ন আখ্যায়িকার বিশেষত্বগুলি স্বল্প নিঃস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছেন, কোনও পাশ্চাত্য জাতি তাহা সে ভাবে আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। উভয় মহাদেশের ধর্ম, সামাজিক আচার-ব্যবহার, রুচি, চরিত্রের আদর্শ, রুচি এবং শিক্ষা-নীতির প্রণালীভেদে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতিসমূহের মধ্যে যে বিশাল ব্যবধান বর্তমান, যুরোপের বিভিন্ন ভাষায় ইহা দক্ষতার সহিত অনুবাদিত হওয়ায়, অনুবাদে সেই স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ আছে, এবং প্রাচ্য জগতের ভাববাহার বিশিষ্টতা, স্বদেশ অনুবাদক-এবং শক্তিশালী লেখনীর ঐক্যজালিক প্রভাবে এক্ষণে সম্পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে যে, প্রত্যেক দৃষ্টপটের রহস্যকুলকা-সমাজের প্রাচীন আরবের বিশাল ধনভাণ্ডারের অতুল অর্থ-সম্পদ, বিপুল ঐশ্বর্য্য, ও অসাম বিলাসোড়র সহ, উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়া, সেই স্বপ্নময় যুগের অগণ্য প্রলোভন এবং স্তম্ভ-স্তম্ভ, আশা, ভয়, মোহ ও মাস্তি-বিজড়িত, লালদালক, মদির-বিহ্বল নরনারীবর্গকে রসজ্ঞ পাঠকের কৃতকাবীর্ণ কল্পনালোকে সজীব মনুবা-মুগ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কিন্তু একাধিকসহস্র আরবা-রজনীর মূল আখ্যায়িকাগুলি প্রাচ্য জগতের নিজস্ব সম্পদ বলিয়া ভারতীয় সমাজের সম্প্রদায়ের পাঠকের নিকট তাহা যে সমাদর লাভ করিয়াছে, প্রতীচ্যের জড়বাদী মানবমণ্ডলী স্বল্প সমাদর সহকারে সেগুলিকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যুরোপে ইহা পরম যত্নে, বিপুল পরিশ্রমে, ও অগণ্য অর্থব্যয়ে প্রাচ্যভাষা-বিং ও প্রাচ্য সমাজজীবনের সহিত পরিচিত সাহিত্যিকমণ্ডলী কর্তৃক অনূদিত, ও সেকালের বৈশিষ্ট্যবাজক চিত্রসম্পদে ভূষিত হইয়া প্রকাশিত হইলেও, তাহারা ইহা কৌতুকাগারে স্তব্ধ অতীত যুগের লুপ্তাবশিষ্ট জীবজন্তুর আদর্শের ছায়া সাদরে ও সখ্যে সংরক্ষিত হইবার যোগ্য বলিয়াই বিবেচনা করেন। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সমাজে ইহা সজীব সকাম নরনারীতে পরিণত হইয়া, যে আনন্দ দান করিতেছে, এ দেশের সাহিত্যরসপিপাসু

রস-উপভোগেই

তৃপ্তি



নিঃসাহিতে
অনুবাদ-গো



পাঠক-সমাজ তাহাদের জীবনে সুখ-দুঃখের প্রভাব, পাপ-পুণ্যের ফলগতি, ধর্ম্মাধর্ম্মের পরিণতি, এবং ভাগ্যচক্রের বিচিত্র আবর্তন নিয়ন্ত্রিত হইতে দেখিয়া, যে সুখ, সন্তোষ ও তৃপ্তি উপভোগ করেন, তাহাই এই গ্রন্থরত্নকে সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদে পরিণত করিয়াছে; এবং সেই আনন্দধারায় অন্তবাদের অসম্পূর্ণতা, ভাষা ও তাবের দৈন্ত, বৈশিষ্ট্যের সকল ক্রটি ভাসিয়া গিয়াছে। যুরোপের বহু ভাষাতেই প্রাচ্য সাহিত্যের এই অমূল্য প্রাচীন সম্পদ, একাধিক-সহস্র আরব্য-রজনীর অন্তবাদের প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরেজী ভাষায় ইহার যে সকল অন্তবাদের সহিত এ দেশের পাঠক-সমাজ পরিচয় আছে, তাহাদের অধিকাংশ দুই এক খণ্ডেই সম্পূর্ণ; কিন্তু প্রাচ্যভাষাবিদ সুপ্রসিদ্ধ রিচার্ড

এক, বার্টনের অন্তবাদ কেবল সুবিস্তৃত ও সুসম্পাদিত নহে, তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই আমাদের দারিদ্র্যে অন্তবাদের সকল ক্রটি সংশোধনের জন্ত মিঃ বার্টন প্রকৃত সাধকের ন্যায় প্রাচ্য ভূখণ্ডের বিহীন দেশে পরিভ্রমণ করিয়া, বহু অজ্ঞাতপূর্ব্ব তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন; এবং কঠোর শ্রমলব্ধ বিপুল অভিজ্ঞতা দ্বারা এই বহুবিচিত্রতাব্যাপ্ত বিশাল গ্রন্থের ত্রিসম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রাচ্যদেশীয় কোন কোন সুশণ্ডিত মৌলবীর গভীর গবেষণাপূর্ণ টীকার সহায়তায় তাঁহার সম্পাদিত গ্রন্থের 'ইজ্ঞা' বদ্ধিত হইয়াছিল। এই গ্রন্থ অত্যন্ত দুস্তাপ্য। 'বার্টন ক্লাব' ইহার সহস্র খণ্ড মাত্র সদস্ত গ্রাহকগণের নিকট বিক্রয়ের জন্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই জন্ত এই বিরাট গ্রন্থ একপ্রহ দুর্দ্বালা যে, সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয়ে এই সুতর্জিত গ্রন্থের সম্পূর্ণ সেট ক্রয় করা সাহিত্যানুরাগী ও বিজ্ঞানসাহী ধনাঢ্য ব্যক্তি ভিন্ন অপরের অসাধ্য। সুতরাং এ দেশের অনেক বৃহৎ গ্রন্থাগারেও তাহার অভাব লক্ষিত হয়। বঙ্গভাষায় কেহ তাহা অন্তবাদেরও চেষ্টা করেন না।

মনস্তত্ত্বের দিক হইতে একাধিক-সহস্র রজনীর অত্যদ্বৃত ও অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ আখ্যানিকাগুলির প্রসঙ্গে অনেক কথাই বলা যাইতে পারে। ব্যক্তিগত ক্রটি অন্তদ্বারে কোন কোন তথ্যের আলোচনা অসম্ভব না হইতেও পারে; কিন্তু ইহা আমার কত ভাল লাগিত, এবং প্রথম বয়সে আমার মন ইহার প্রতি কি ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিল, ইত্যাদি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ দ্বারা গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব সপ্রমাণের চেষ্টা অত্যন্ত হাত্তান্দীপক; অহমিকার বাহ্যভঙ্গের নিস্প্রয়োজন, এবং ঐক্লপ আলোচনাও অপ্রাসঙ্গিক। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ হইলেও, এ কথার উল্লেখ বোধ হয় শিষ্টাচারবিরুদ্ধ, অশোভন উক্তির নহে যে, আমরা প্রথম যৌবনের নবীন উৎসাহে এই বিশাল গ্রন্থের যথাসাধ্য স্থললিত অন্তবাদ সম্পূর্ণ করিলে, বহুমানবীর প্রতিষ্ঠাতা এবং স্থলত সং-সাহিত্য-প্রচারযন্ত্রের হোতা, অকাতক্যে কণ্ঠস্বীর স্বর্গীয় উপেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তিন খণ্ডে তাহা প্রকাশ করেন।—সে কি একালের কথা? তাহার পর স্তম্ভিধি ত্রিশ বৎসর অতীতপ্রায়! এই ত্রিশ বৎসরে বঙ্গসাহিত্যে ভাবার পরিবর্তন, রুচির পরিবর্তন, এমন কি, শিল্পের গভীরতায় না হউক, সমাজের সকল স্তরে ইহার ব্যাপকতায়, ও তরুণ-তরুণীর অবাধে বিশাশিতার ফলে বর্তমান যুগের চিন্তাধারার কিরূপ বিপুল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তাহা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ, কথা-সাহিত্যের আলোচনা হইতেই সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা যে সময় পুঞ্জীয় স্বর্গীয় উপেক্ষনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্তপ্রেরণায় ও আগ্রহে ইংরেজী ভাষা হইতে আরব্য-রজনীর অন্তবাদ করি, সেই সময় বটলসার 'আরব্য-উপন্যাস' এ দেশের জনসমাজে সমাদৃত হইলেও, আরব্য-রজনীর আরও দুই একখানি অন্তবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল;

তাহা আরবা-রজনী-বিত্ত আখ্যায়িকা-সমূহের সাদাসিধা মূল অনুবাদ মাত্র। তাহা পাঠে পাঠকসমাজ আখ্যায়িকার সাধারণ পরিচয় পাইতেন, কিন্তু যে রস-সৃষ্টিই আরবা-রজনীর বিশেষত্ব এবং যাহার উপর ইহার বিশিষ্টতা নির্ভর করে, সাধারণ-প্রচলিত আরবা-উপন্যাসে কেহ তাহার পরিচয় পাইতেন, এরূপ ধারণা করা আমাদের অসাধ্যই হইত।

কাহারও কাহারও বিশ্বাস, ভাষাকে বানপ্রস্থ্যশ্রমে পাঠাইয়া, কথোপকথনের প্রাদেশিক ভাষার ব্যবহারেই আখ্যায়িকাগুলির সরসতা বর্জিত হইবে, এবং তাহা পাঠক-পাঠিকার কল্পনার উপর অধিকতর প্রভাব বিস্তার করিবে! কিন্তু সকলে এই ধারণার সমর্থন করেন, এরূপ আশা করা যায় না। রস-সৃষ্টির পক্ষে সাধু ভাষার উপযোগিতা কত প্রকট, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প 'মেঘ ও রৌদ্র' বা 'ক্ষুধিত পাখাণ' তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বঙ্গ-সাহিত্যের চূড়ান্ত যে, অত-বড় শক্তিশালী লেখক রবীন্দ্রনাথ, ভাষার উপর যাহার ঐকজ্জালিক প্রভাব বর্তমান, তিনি এ কালে তাহার অতুলনীয় ভাষাকে অধিকতর মর্শ্বস্পর্শী এবং সর্বসাধারণের বোধগম্য করিবার অভিপ্রায়ে যে আদর্শ অবলম্বন করিয়াছেন, এ কালের তরুণ লেখকেরা তাহার অনুকরণ ও অনুসরণের বাধ্য চেষ্টায় যে সমজায়ত, শ্রুতিকঠোর, ছুঁসে ছা কাকানীপরিপুষ্ট সঙ্কর ভাষার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে চিরপ্রচলিত এবং আমাদের চিরজীবনের কঠোর সাধনালব্ধ ভাষার মুণ্ডপাত করিয়া ছাড়িয়া দিতেছেন! আরও ভাষার বিষয় অনেক বুদ্ধতপস্বী শিশু ভাস্কিয়া বাছুরের দলে মিশিয়া বাহ্যদ্রবী প্রকাশ করিতে লক্ষ্য বোধ করিতেছেন না! দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, তাহার জননী বীণাপাণির কর্তৃত্ব বীণা কাড়িয়া লইয়া, তাহার 'বাণাপুত্র-রঞ্জিত হস্তে' গেঁটে বাশের এরূপ সুগুরু 'কোংক' গুঞ্জিয়া দিয়াছেন, বাহা গুণ্ডার চন্দ্রমণীয় দাগার মত জননীর অঁচরপাশ্রিত ভক্ত সন্তানগণের মাথা দাটাইবার পক্ষে অভ্যস্ত নিরেট। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বর্তমান ভাষায় যদি তাহার 'ক্ষুধিত পাখাণ' রচিত হইত, তাহা হইলে তাহার ভাবাভিবাতির অশেষ মুসীরান। সত্যও, সেই নীরস কঠিন পাখাণের প্রত্যেক স্তর বিশ্লেষণ করিয়া, কেহ মধুর রস আবিষ্কার করিতে পারিতেন কিনা, তাহা তাহার অন্ধ-অনুকরণপ্রায়ী নব্য লেখকের দল ভিন্ন অস্তুর—বিশেষতঃ আমাদের মত জননীর প্রাচীন সেবকদের অনুধাবন করা অসাধ্য। আরবা-রজনীর মূল গ্রন্থ হইতে ইংরেজী ভাষায় যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা যদি সাধু ভাষার পরিবর্তে সাধারণ ইংরেজ নরনারীর 'ককনী' ভাষায় অনুবাদিত হইত, তাহা হইলে অনুবাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইত, বর্ণনামূলি অস্পষ্ট হইত, এবং যে সকল স্থানে বিধগের উৎকর্ষ বা পদ্যার ঘাত-প্রতিঘাতে—বৈচিত্র্যে রসবারা প্রবৃত্ত ও উপভোগ্য হইয়াছে, সেই সকল স্থানে দণ্ডবীর্য বাবদ্ধত স্তম্ভীকৃত 'কাতান' ভয়কাতর নিরীহ পাঠকগণের সমুখে ঝক-ঝক করিয়া উঠিত; তাহাতে যে রসের সৃষ্টি হইত, তাহা কি বীভৎস রস নহে? বঙ্গভাষার অনুবাদকগণও ষ ষ জ্ঞেয়ায় বাবদ্ধত ক্রিয়া পদের বিশেষত্ব পরিহার করিতে না পারিয়া, ঐ শ্রেণীর অনুবাদে কেহ লিখিবেন, 'গেলুম', কেহ লিখিবেন, 'গেলাম', কেহ লিখিবেন, 'গেলেম',—আরও পূর্বাঞ্চলের লেখক লিখিবেন, 'গেলু'।—কলিকাতার 'গেলুম' যদি দক্ষিণাঞ্চলের অধিবাসীরা সুপ্রযুক্ত বলিয়া শিরোধার্য করেন, তাহা হইলে যে অঞ্চলে 'গেলু' ব্যবহৃত হয়, সেই অঞ্চলের পাঠকেরা 'গেলুম'কে অলে ও অপপ্রয়োগ মনে করিলে, দক্ষিণাঞ্চলের আভিজাত্য রুচির লেখকেরা কোন্ যুক্তিতে

ভাববিবাক্ষে
ভাষামাধুর্য্য-

প্রেন-বৈচিত্র্যের
ইঙ্গদ্বয়

- 'গেহল'কে তাঁহাদের রচনা হইতে নির্দাসিত করিবেন? সাধু ভাষায় এই প্রকার মন্তব্যের ও বিরোধের অবকাশ নাই।

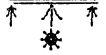
বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে আমার অনূদিত আরব্য-রজনীর প্রথম সংস্করণ তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। অল্পদিনেই তাহার তিনটি সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায়, তাহা যে বঙ্গীয় পাঠক-সমাজে সমাদৃত হইয়াছিল, ইহা সহজেই প্রতিপন্ন হয়; অথচ তখন আরব্য-উপন্যাসের অজ্ঞাত সংস্করণের অভাব ছিল না। তাহার পরও কেহ কেহ ইহার অল্প অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে প্রকাশিত আরব্যরজনীর তৃতীয় সংস্করণ নিঃশেষিত হইবার পর বহু দিন ইহা পুনঃপ্রকাশিত না হওয়ায় বঙ্গীয় পাঠক-সমাজ ইহার অভাব অনুভব করিতেছিলেন। অনেকে অজ্ঞাত অনুবাদকের গ্রন্থ দ্বারা সেই অভাব আংশিকভাবে পূর্ণও করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয়, ইহা দীর্ঘকাল অপ্রকাশিতভাবে কেলিয়া না রাখিলে এত দিন বঙ্গের বহু সাহিত্যরসজ্ঞ শিক্ষিত পরিবারে ইহার সহস্র সহস্র খণ্ড সমাদরে গৃহীত ও পঠিত হইত, এবং আজ ইহা নূতন করিয়া পরিচিত করিবার জন্য ভূমিকায় এত কপা লিখিতে হইত না।

বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দিরের স্নযোগ স্বত্বাধিকারী দীর্ঘকাল পরে একাদিকসহস্র আরব্য রজনীর আখ্যায়িকা-গুলির চিত্রময় অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত করিলেন। এই নূতন সংস্করণে পুস্তকের ভাষা প্রয়োজনানুযায়ী পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং যে রস মূল উপজ্ঞাস অভিধিক্ত, সেই রস পরিপুষ্ট ও ভাবের স্বচ্ছতা দ্বারা যোগ্যতর লেখনীর সাহায্যে এবার সংশোধিত হইয়াছে; এই সংস্করণের উপজ্ঞাস পূর্ণপ্রকাশিত গ্রন্থ অপেক্ষা পাঠক-সমাজে অধিকতর সমাদৃত হইবে, ইহা ছাড়া বঙ্গিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ, একালে পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা অতীত যুগের সাহিত্যরসপিপাসু নর-নারী অপেক্ষা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং আশা করি, ইহা পাঠকপাঠিকাগণের মনোরঞ্জে অধিকতর সমর্থ হইবে। অজ্ঞাত অনুবাদের সত্তি তুলনায় ভাবাতিবাক্তিতে এবং আখ্যানবস্তুর পরিপূর্ণতার ইহা পাঠকসমাজকে নিরাশ করিবে না, এ ধারণা না থাকিলে স্নযোগ প্রকাশক মহাশয় বড়বায়ে ইহার চিত্রাদির আমূল সংস্কারসাধন, বহুসংখ্যক সুরঞ্জিত চিত্রে ইহার শোভাবর্দ্ধন করিতেন কি না জানি না। তিনি এবার ইহার ছাপা কাগজ স্বল্পদ্রব্যে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। এতদ্বিম, ইহার চিত্রসম্পদও অতুলনীয় করিবার চেষ্টায় অর্থব্যয়ে কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। এই সংস্করণের আরও একটি বিশেষত্ব এই যে, প্রকাশক মহাশয় প্রত্যেক আখ্যায়িকার আভ্যোপাত্ত যথাগত্ব সতর্কতার সত্তি বিশ্লেষণ করিয়া, তাহার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শাখার সংক্ষেপ পরিচয় পাশ্চব্দ্য টীকায় সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে সমগ্র আখ্যায়িকাটি, একবার চক্ষু বুলাইলেই, যেন নখদর্পণে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে প্রত্যেক আখ্যায়িকার পাঠক-পাঠিকাগণের চিত্ত অধিকতর আকৃষ্ট হইবে, এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

একাদিকসহস্র আরব্য-রজনীর আখ্যায়িকাগুলির অতিরিক্ত যে বহু মনোরম আখ্যায়িকা বঙ্গ সাহিত্যে একাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত আছে, তাহা বোঝ হয়, এদেশের অধিকাংশ পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত। বঙ্গসাহিত্যে আরব্য-রজনীর যে সকল অনুবাদ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইয়াছে, সেই সকল গ্রন্থে এই অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলির প্রথমমাত্রেরও উল্লেখ নাই; অথচ সেগুলি একাদিকসহস্র রজনীর মূল আখ্যায়িকাগুলির তুলনায় কোনও অংশে হীন নহে। সুতরাং তাহা বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইলে, তাহা পাঠক পাঠকসমাজ প্রচুর আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবেন, এক কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। আমরা মূল

এছের আখ্যায়িকা-সমূহের ধারাবাহিকতা সঞ্চদে সতর্কতাবল্বনের ক্রটি করি নাই। ইহার পরবর্তী অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলিরও বঙ্গানুবাদ করিয়া ইহার সম্পূর্ণভাসাধন করিব, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা; এবং যদি বর্তমান গ্রন্থ দ্ব্যেষ্ঠ সমাদর লাভ করে, তাহা হইলে বিজ্ঞোৎসাহী প্রকাশক মহাশয় সেই অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলি প্রকাশের ভার গ্রহণ করিবেন, এক্রপ অভিপ্ৰায়ও প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই বহু শ্রম ও ব্যয়সাধ্য স্রুগুরু কার্যের ভার কেবল যে প্রকাশক মহাশয়েরই উৎসাহ ও আগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে, এক্রপ আশা করিতে পারিতেছি না। সাহিত্যামোদী ও রসগ্রাহী বঙ্গীয় পাঠকসমাজ যদি বর্তমান গ্রন্থ পাঠে আনন্দলাভ করিয়া, ইহার পরবর্তী অতিরিক্ত আখ্যায়িকাগুলি পাঠের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলেই তাহা ভবিষ্যতে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত করা সম্ভবপর, এবং প্রকাশক মহাশয়ের পক্ষে সসাধ্য হইতে পারে। বস্তুতঃ তাহা বঙ্গীয় পাঠকসমাজের অভিক্রটি ও পাঠস্পৃহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। তাহাদের অল্পকূল অভিমতই যে আমাদের ভবিষ্যৎ কার্যাপদ্ধতির পথনির্দেশ করিবে, এবং আমাদের চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রমের প্রবান অবলম্বন হইবে, এ কথাই উল্লেখ বাতলামাত্র। সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিয়া প্রথম জীবনে যে গুরুভার গ্রহণ করিয়াছিলাম—নিষ্ঠাভরে যে ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলাম, জীবনোপাঞ্চে উপস্থিত হইয়া, এই আলোক-প্রভাসীপ নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়, একক জীবনের ত্রুততার মধো যদি সেই চক্রে ব্রতের উদযাপন করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের আরক্ত কার্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়া সম্পূর্ণতা লাভ করিবে—এই কামনার সচিত্ত আমাদের নিবেদন শ্রেন করিলাম।

সম্পূর্ণ গ্রন্থ
প্রকাশের আশা



বঙ্গমতী-সাহিত্য-মন্দির ;
কলিকাতা ১লা আষাঢ়, ১৩৩০ সাল।



শ্রীমতী প্রমীলা দেবী





গল্প	কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক	গল্প	কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক
দূতম্য	* * * *	...	১	প্রেমরসিক মোরগের জীবনীতি	...	১৫	
উজীর-সম্বন্ধন	...	১		বেতের আলায় মানিনীর মান প্রশমিত	...	১৫	
স্বলতান-অন্তঃপুরে প্রেমরস	...	২		বিবাহের প্রস্তাব	...	১৬	
বাক্ত-সংঘলনে	...	২		শাহারজাদীর বিদায় গ্রন্থ	...	১৬	
বাক্ত চিত্তবিনোদনের প্রয়াস	...	৩		শাহারজাদীর মিলনের মধুসামিনী	...	১৭	
স্বলতানার প্রণয় অভিধান	...	৩		প্রেমোদলহরীর প্রবাহ-সুচনা	...	১৮	
স্বলতানার উপবন-বিহার	...	৪		দূতম্য ও দৈত্য	* * *	১৯	
চিত্তপ্রসাদনের ভূত সন্ধ্যোগ	...	৪		বুদ্ধ দৈত্য আবির্ভাব	...	১৯	
প্রাণের হাসি মুখে ফুটিল কেন ?	...	৫		জরায়ার ছলের অভাব নাই	...	২০	
স্বলতানের নিকট গুপ্তরহস্য প্রকাশ	...	৫		স্বলতানের কৌতুক ও খালনা উদ্দীপ্ত	...	২১	
কি, স্বলতানা ব্যক্তিচারিণী ? অসম্ভব	...	৬		দ্বিতীয় প্রেমোদ-রজনী	...	২১	
স্বলতানের প্রেমোদলীলা দর্শন	...	৬		সদাগরের পুনরাগমনের প্রতিক্রা	...	২২	
আত্মবিক্ষোভে দেশ ত্যাগ	...	৭		প্রিয়জনের আত্মনন্দন	...	২২	
বন্দিনী প্রেমোদিনী যন্ত্রকে দৈত্যের আবির্ভাব	...	৭		প্রথম বুদ্ধের হরিণীসহ আগমন	...	২৩	
অবাচিতভাবে দৈত্যপতীর প্রেমসুখ-দান	...	৮		দ্বিতীয় বুদ্ধের কুকুরসহ আগমন	...	২৩	
প্রণয় নিবেদনের অন্তরায়	...	৯		তৃতীয় বুদ্ধের খড়গসহ প্রতীক্ষা	...	২৩	
সন্তোষ-নিদর্শন অঙ্গুরীর মাল্য	...	৯		গোপন রহস্য-প্রকাশ প্রস্তাব	...	২৪	
জকঠোর সাবধানতা	...	১০		তৃতীয় প্রেমোদ-রজনী	...	২৪	
সতীত্বরক্ষার বিধান নহে	...	১০		প্রথম বুদ্ধ ও হরিণী	...	২৪	
নারীহত্যার অভিধান	...	১০		নারীর প্রতিহিংসা	...	২৫	
শাহারজাদীর করুণা	...	১১		নারী না শয়তানী	...	২৫	
শাহারজাদীর আত্মদান প্রস্তাব	...	১১		জীবনভিকার ভাবাহীন অভিযুক্তি	...	২৬	
সদাগর ও গর্দভ	...	১২		গোপন রহস্য-বিস্তৃতি	...	২৭	
বুদ্ধিমান গর্দভের উপদেশ	...	১২		বাহুস্বয়ের অবসান	...	২৭	
গর্দভের চাতুর্যের পরিণতি	...	১৩		দ্বিতীয় বুদ্ধ ও কুকুর	...	২৮	
শাহারজাদীর জেদ	...	১৩		সহোদরের প্রতি করুণা	...	২৮	
স্বন্দরীর অভিমান	...	১৪		শ্রদ্ধার প্রতিদান	...	২৯	
সদাগর-পতীর দুর্জয় মান	...	১৪		স্বন্দরীর হা লাভ	...	২৯	

কাহিনী	রসভাস	পত্রাক	গল্প	কাহিনী	রসভাস	পত্রাক
ভাতার হীন যড়যন্ত্র	...	৩০	রাজপুত্রের প্রত্নের পরিণতি	...	৪৭	
পরীর প্রতিশোধ	...	৩১	রহস্য উদ্ঘাটন প্রয়াস	...	৪৮	
হুতীয় বুদ্ধের বিচিত্র কাহিনী	...	৩১	কৃষ্ণদ্বীপের দাঁড়পুত্র * * *	...	৪৮	
সুন্দরী পত্নীর ক্রীতদাস-বিহার	...	৩২	গুপ্তলীলা প্রকাশ	...	৪৮	
মায়ামোহটকীর রহস্য প্রকাশ	...	৩২	অভিসারিকার অভিযান	...	৪৯	
চতুর্থ প্রমোদ-রজনী	...	৩২	নিভৃত-মিলন	...	৪৯	
ন্যজীহী ও দৈত্য * * *	...	৩৩	প্রমোদিনী-শাসন	...	৫০	
সমুদ্র-নিমজ্জিত কলসী	...	৩৩	প্রমোদ-সংহার	...	৫০	
দৈত্যের পরম অহুকাঙ্গ	...	৩৪	উপপত্তির স্বত্বপূজা	...	৫১	
কি রকম মৃত্যু বাঞ্ছিত	...	৩৫	দয়িত-পূজার স্তব	...	৫১	
সলোমনের অভিলাপ	...	৩৫	যাহুকরীর স্বামী-নির্ঘাতন	...	৫২	
দৈত্যের প্রত্যাগকার	...	৩৫	যাহুবিকার অলৌকিক প্রভাব	...	৫২	
বুদ্ধিচাতুর্য্যে বিরাট দৈত্য বন্দী	...	৩৬	স্বলতানের স্ত্রীকোশল	...	৫৩	
করুণ ও দুঃখের ইতিহাস	...	৩৬	কাহির প্রণয়সুখার আশায়	...	৫৩	
অভিনব চিকিৎসা-স্বকোশল	...	৩৭	স্বামীর জীবনদান	...	৫৩	
উজীরের ভীষণ যড়যন্ত্র	...	৩৭	মায়াবিনীর ভোজবাজী অপসারিত	...	৫৩	
গৃহস্থ ও শুকপক্ষী	...	৩৮	নবজীবনলাভের সঙ্গে মায়াজা লাভ	...	৫৩	
তরুণীর প্রণয়সুখা বিতরণ	...	৩৮	তিম দাঁড়পুত্র ও পঞ্চ রমণী	...	৫৪	
প্রেমরঙ্গিনীর চাতুর্য্য	...	৩৯	মধু হাসির অন্তরঙ্গ ইঙ্গিত	...	৫৫	
উজীরের দণ্ড	...	৩৯	রূপের প্রভাব আশ্রয়স্থিতি	...	৫৬	
মায়াবিনীর মোহন ফাঁদ	...	৪০	রূপবিভ্যাসের তরঙ্গ	...	৫৬	
উজীরের প্ররোচনা	...	৪০	প্রমোদ উৎসব	...	৫৭	
যড়যন্ত্র সফল	...	৪১	সুন্দরীর পদচারণ	...	৫৭	
উপকারের প্রতিশোধ	...	৪১	নয়সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যের সঙ্গে	...	৫৮	
অদ্বুত গ্রন্থ উপহার	...	৪২	চপেটাঘাতের জ্বালা	...	৫৮	
গ্রন্থরহস্যে প্রাণনাশ	...	৪৩	সুরসিকের চূড়ন প্রতিশোধ	...	৫৮	
দৈত্যের প্রতিশোধ	...	৪৩	নৈশ-প্রমোদের আয়োজন	...	৫৯	
সৌভাগ্যের পথে	...	৪৩	সুন্দরীর প্রমোদকক্ষে ফকিরত্বের সম্বন্ধনা	...	৬০	
বিচিত্র মন্ত্রের আশ্চর্য্য রহস্য	...	৪৪	খালিফের ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ	...	৬০	
মন্ত্রের হস্তের বিফলতা	...	৪৫	সদাগরবেশী খালিফের আতিথ্য	...	৬১	
কুহক না প্রহেলিকা	...	৪৫	পরচর্চার কৌতুহলে বিপদ	...	৬১	
রহস্য উদ্ঘাটনে স্বলতানের অভিযান	...	৪৬	প্রমোদ-মজলিসে কুকুর-নির্ঘাতন	...	৬২	
রহস্যপূর্ণী সম্মর্শন	...	৪৬	প্রেমিকার বক্ষে নিদারুণ ক্ষত	...	৬২	
নির্জন প্রাসাদে করুণ আহ্বান	...	৪৭	প্রতিজ্ঞাভঙ্গে-রূপসীর রোষ	...	৬৩	

প্লট	কাহিনী	রসভাস	পত্রাঙ্ক	প্লট	কাহিনী	রসভাস	পত্রাঙ্ক
	রহস্য-রঙ্গিণীর করুণা	...	৬৩		স্বপ্নাদেশের অহুসরণ	...	৮১
	রহস্য-প্রকাশে নিষ্কৃতির উপায়	...	৬৪		সমুদ্রবক্ষে নিরুদ্দেশযাত্রা	...	৮১
	প্রথম কাণা ফকির	...	৬৪		নির্জন দ্বীপে জীবন্ত-সমাধি	...	৮২
	গুপ্তমন্দিরে প্রমোদিনী চালান	...	৬৫		অজ্ঞাতবাস-প্রহেলিকা	...	৮২
	সমাধিমন্দির বিলাসপ্রাসাদ	...	৬৬		ভাগ্যলিপি-খণ্ডন-প্রয়াস	...	৮৩
	উজীর বিদ্রোহ	...	৬৬		নিয়তির অঘোষ বিধান	...	৮৩
	সমাধিমন্দির রহস্য উদ্ঘাটন	...	৬৭		পিতৃবক্ষে শোকের বজ্রাঘাত	...	৮৪
	প্রেমিক-প্রেমিকার অন্তিম আলিঙ্গন	...	৬৭		সন্তপ্ত যুবক-বৃদ্ধ-সম্মেলন	...	৮৫
	ভগিনীর গুপ্তপ্রেমে আত্মদান	...	৬৮		স্বকঠোর অহুতাপ	...	৮৫
	বিদ্রোহী উজীরের রাজ্য অধিকার	...	৬৮		কৌতূহলের বিপদ	...	৮৬
	দ্বিতীয় কাণা ফকির	...	৬৯		আকাশপথে প্রেমিক চালান	...	৮৬
	হিন্দুস্থান বাদশাহের বিছার সমাদর	...	৬৯		প্রমোদসায়রে রূপসী রঙ্গিণীদলে		
	দস্তাভ্রষ্টে নির্যাতন	...	৬৯		একক প্রেমিক	...	৮৭
	দরদী দক্ষিণ করুণা	...	৭০		নৈশবিহারের প্রেমিকা নির্বাচন	...	৮৭
	দৈত্যপ্রাসাদে অনিন্দাসুন্দরী	...	৭০		প্রেমের সঙ্গে রূপমদিরার মোহন মিলন	...	৮৮
	দৈত্যাবিন্দী রাজনন্দিনী	...	৭১		প্রেমের স্বপ্নে বিরহের বজ্রপাত	...	৮৮
	স্বপ্নসুন্দরীর স্নানবিলাস	...	৭১		বিদায়-চুশ্বন	...	৮৯
	স্বপ্নের মন্দনে বজ্রাঘাত	...	৭২		কৌতূহলের পরিণাম	...	৮৯
	প্রেমময়ী নির্যাতন	...	৭২		প্রেমিকের আকাশ অভিযান	...	৯০
	দৈত্য-কবলে	...	৭৩		উজীরের ফাঁকিবাজী	...	৯১
	প্রমোদিনী সংহার	...	৭৪		স্বলতানসভায় রহস্য-বিবৃতি	...	৯১
	অপরাধীর পুরস্কার	...	৭৫		জোবেদী	...	৯২
	পরীর আশ্রয়	...	৭৫		সুন্দরীর বাণিজ্য অভিযান...	...	৯২
	দৈত্য-বিলাসিনী স্বলতান-নন্দিনী	...	৭৫		পাষণ্ডময়ী নগরী-রহস্য	...	৯৩
	বানররূপ প্রদান	...	৭৬		হীরকদণ্ডে নির্জনপ্রাসাদে একাকিনী সুন্দরী	...	৯৩
	বানরের গৃহি চাতুর্য	...	৭৬		কুসংস্কারের পরিণাম	...	৯৪
	বানর-সংগর্ভন	...	৭৭		সমগ্র নগরবাসী প্রস্তরমূর্তিতে রূপান্তরিত	...	৯৪
	যাজকরী স্বলতান-নন্দিনী	...	৭৭		সুন্দরীর বাণিজ্য-অভিযানে দ্রুত লাভ	...	৯৫
	সিংহরূপে দৈত্য আবির্ভাব	...	৭৮		পরীর প্রতিশোধ	...	৯৫
	যাজবিছার ভীষণসংঘর্ষ	...	৭৮		আমিনা	...	৯৬
	অগ্নিস্নেহে যাজকরীর সম্ভরণ	...	৭৯		সুন্দরীর পরিচ্ছদ-বিলাস	...	৯৬
	সুন্দরীর ভগ্নস্বপ্নে পরিণতি	...	৭৯		নিমজ্জিতার বিবাহ	...	৯৭
	তৃতীয় কাণা ফকির	...	৮০		মিলন-নিশি যেন প্রভাত না হয় !	...	৯৭
	চুবক পাহাড়ের ভীষণ আকর্ষণ	...	৮০		বুজার দুতিয়ালী	...	৯৮
	জাহাঙ্গ-বিপর্যয়	...	৮১		চুধনে রক্তিমকপোলে রক্তধারা	...	৯৯

কাহিনী	রসভাস	পত্রাঙ্ক	গল্প
প্রেমিকার কৈফিয়ৎ	...	৯৯	
স্বামীর স্তব্ধতার শাসন	...	১০০	
দাশহস্তে প্রণবিনীর লাক্ষণ	...	১০০	
স্তলতান-সভায় সৌন্দর্যময়ী পুরী	...	১০১	
পক্ষ রঞ্জিতের রূপের মোহন কান	...	১০১	
রসায়ন মাদিক * * *	...	১০২	
সদ্বাস্ত নাবিক ও শ্রমজীবী	...	১০২	
সৌভাগ্য কোন পথে	...	১০৩	
সিদ্ধবাদের প্রথম সমুদ্রযাত্রা	...	১০৩	
দীপান্বিত—প্রাকাত তিমি	...	১০৪	
অজ্ঞাত দীপে আল্পলাভ	...	১০৫	
রাহসদর্শ	...	১০৫	
মৃতের পুনরাগমন সম্ভব কি ?	...	১০৬	
ভাগ্যলক্ষীর প্রসাদ লাভ	...	১০৬	
সিদ্ধবাদের দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রা	...	১০৭	
বিরট রুক্মিণীর এরোপ্লেন	...	১০৭	
স্বর্ণ উপনিবেশে হীরকস্ত প	...	১০৮	
হীরক-সংগ্রহের উপায়	...	১০৮	
ভাগ্যের জয়	...	১০৯	
সিদ্ধবাদের তৃতীয় সমুদ্রযাত্রা	...	১০৯	
নরনাগসদলের জাহাজ অপকার	...	১১০	
রাক্ষসের মনুষ্য ভঙ্গ	...	১১১	
রাক্ষসদলের আক্রমণ	...	১১১	
অজগর সর্পের মনুষ্য গ্রাস	...	১১২	
সৌভাগ্য-স্বপ্নপ্রভায় জীতির তমসা দূর	...	১১২	
সমৃদ্ধির শিখরে প্রতিষ্ঠা	...	১১৩	
সিদ্ধবাদের চতুর্থ সমুদ্রযাত্রা	...	১১৩	
নরভুক্ত রাক্ষসদল-কবলে	...	১১৪	
অজ্ঞাত রাজ্যে সমাদর	...	১১৪	
প্রেমময়ী পত্নীলাভ	...	১১৫	
স্বামীর সহমরণ	...	১১৬	
বন্ধুর প্রণয় জীবন্ত-সমাধি	...	১১৬	
সমাধিগন্ধবের মুতাই কি ভাগ্যলিপি ?	...	১১৭	
আশার ক্ষীণ আলোক	...	১১৭	

কাহিনী	রসভাস	পত্রাঙ্ক
মৃত্যুর পথেও রক্তক্ষয়	...	১১৮
নরভুক্ত রাজ্যে বাণিজ্য	...	১১৮
সিদ্ধবাদের পঞ্চম সমুদ্রযাত্রা	...	১১৯
রুক্মিণীর প্রতিহিংসা	...	১১৯
করুণায় বিষম বিপদ	...	১২০
বৃদ্ধের জন্মে জীবন-সংসার	...	১২১
বানরের সহায়তায় বাণিজ্য	...	১২১
সিদ্ধবাদের ষষ্ঠবার সমুদ্রযাত্রা	...	১২২
পক্ষিতে রক্তপ	...	১২২
ক্ষুদ্র ভেলায় অজ্ঞাত রাজ্যে যাত্রা	...	১২৩
পার্বত্য নদীপথে নিরুদ্দেশ অভিযান	...	১২৩
স্বর্ণদীপ ভারতবর্ষ	...	১২৪
ভারত-সম্রাটের সৌজ	...	১২৫
সিদ্ধবাদের শেষবার সমুদ্রযাত্রা	...	১২৫
খালিসের আদেশ অলঙ্ঘনীয়	...	১২৬
জলদস্যুর জাহাজ লুণ্ঠন	...	১২৬
সদ্বাস্ত বণিক ক্রীতদাস	...	১২৬
হস্তি-শীকার অভিযান	...	১২৭
হস্তীর করুণা	...	১২৭
হস্তি-সমাধিভূমিতে সম্পদরাশি	...	১২৮
বিরট সমুদ্রমংগের জাহাজ গ্রাস	...	১২৮
অদৃষ্ট-প্রোভের অন্তর্বর্তন	...	১২৯
পক্ষিপটে স্বর্ণরাজ্যে অভিযান	...	১২৯
শয়তানের অস্ত্রচর	...	১৩০
সৌভাগ্য স্তলভ নহে !	...	১৩০
তিনটি আপেল * * *	...	১৩১
আশাজীত পুরস্কারের আশা	...	১৩১
জল-নিমজ্জিত দিন্দুকে হৃদয়ীর মৃতদেহ	...	১৩২
উজীরের ফাঁদীর আদেশ	...	১৩৩
গুবক ও বৃদ্ধের কাসী যাইবার আগ্রহ	...	১৩৩
হৃদয়ী-হস্তার আত্মপ্রকাশ	...	১৩৪
গুবক ও ভাতার প্রিয়তমা	...	১৩৪
আপেলের আগ্রহ	...	১৩৪
সংশয়ের বিধবারা	...	১৩৫

গল্প	কাহিনী	রসভাস	পত্রাঙ্ক	গল্প	কাহিনী	রসভাস	পত্রাঙ্ক
	গল্পের প্রবন্ধন।	...	১৩৬		বিবাহ-অভিজ্ঞান সংরক্ষণ	...	১৫৩
	উজীরের নৃতন বিপদ	...	১৩৬		পিতৃ-পরিচয়-সমস্ত	...	১৫৩
	উজীরের অন্তিম বিদায়	...	১৩৭		অজ্ঞাত পিতৃ-সংশেলন	...	১৫৪
মোহেদীম ও মদেদেদীম					বক্তদারায় স্নেহের প্রতিদান	...	১৫৪
	উজীর-দাত্তবয়ের বিরোধ-রহস্ত	...	১৩৮		নিরুদ্ভি জামাতার সম্মানে	...	১৫৫
	নিজ বিবাহের পূর্বেই পুত্র-কন্টার				স্নেহের সম্মোহন আকর্ষণ	...	১৫৫
	বিবাহ-সমস্ত	...	১৩৯		দেলাখোস সরবৎ	...	১৫৬
	কলিত মনোমালিখে দেশান্তরিত	...	১৩৯		পিষ্টক-রহস্ত সমস্ত	...	১৫৬
	সন্দরী পত্নীর প্রেম উপভোগের স্তম্ভাগ	১৪০			জামাতাহরণ অভিযান	...	১৫৭
	বিবাহ উৎসবে সমস্ত লাভ	...	১৪০		বিবাহ-স্বপ্নের সভাসজ্জা	...	১৫৭
	নিরন্তর বিধানে একই দিনে				স্বপ্ন কি এতই মধুর	...	১৫৮
	দাত্তবয়ের বিবাহ	...	১৪১		প্রমোদকক্ষে সাদর-আছান	...	১৫৯
	একই দিনে উভয় দাত্তার সন্তানলাভ	...	১৪১		প্রমোদ-নিশার বিচিত্রস্বপ্ন	...	১৬০
	স্বপ্ন কি চিরস্থায়ী ?	...	১৪২		অবিরাম চক্ষুনে বিরহ-সম্ভাপ প্রাণমিত	১৬০	
	লোকসার ভিতর জীবনরহস্ত	...	১৪২	কুজ ও মজু			
	প্রাণ ধাত্তা বর্জ্জনীয়	...	১৪২			...	১৬১
	নারী উপদেশ বরণ	...	১৪৩		পুনের দায়ে চিকিৎসক	...	১৬২
	জগৎবেশে সমাধিমন্দিরে	...	১৪৩		শব-সংগোপন-নৈপুণ্য	...	১৬২
	ইতদী সদাগরের অযাচিত করুণা	...	১৪৪		পৃষ্ঠানের নেশা চুটিল	...	১৬৩
	সুন্দর মুখের সঙ্কট জয়	...	১৪৪		কাজীর বিচার-প্রাচলিক	...	১৬৩
	প্রত্যাগান-প্রতিশোধ	...	১৪৫		লোভনীয় কাগী রহস্ত	...	১৬৩
	আকাশপথে বর চালান	...	১৪৬		গুঠান সদাগরের উপহাস	...	১৬৪
	বিবাহ-সভায়-সুগল বর	...	১৪৬		অদ্বুত সদাগরের বেসাতি	...	১৬৪
	সুন্দরীকুলগরবিধীর বর বিকলাঙ্ক জীতদাস	১৪৭			প্রেমলীলার পূর্বস্বার-রহস্ত	...	১৬৫
	বর অপসারণ-স্বকৌশল	...	১৪৭		মিশরের বাণিজ্য-প্রমোদ	...	১৬৫
	দৈত্যের স্তম্ভকী	...	১৪৮		সুন্দর চক্ষে প্রেমের ভাষা	...	১৬৬
	মনোমত্ত দয়িত-মিলন	...	১৪৯		প্রত্যনোচ্ছতা অভিমানিনী	...	১৬৬
	চক্ষুনে প্রেম নিবেদন	...	১৪৯		রূপের তরঙ্গ না বিভ্রান্তের শিতরণ ?	১৬৬	
	প্রমোদ নিশি অবশানে কোথায় ?	...	১৫০		প্রেম উপহারে প্রাণ-বিনিময়	...	১৬৭
	প্রমোদাদ্য না প্রণয়-স্বপ্ন	...	১৫০		মোহন রূপের প্রেমিক ধরা ফাঁদ	...	১৬৭
	কেজা খুব বক্তব্য আছে !	...	১৫১		প্রমোদ-মন্দিরে মিলন উচ্ছিত	...	১৬৮
	নৈরাশের পাশে প্রেমের কমল	...	১৫১		প্রমোদ-নিশার মিলন-মাবুদী	...	১৬৮
	জীতদাসের চম্পট	...	১৫২		প্রেমের দায়ে সর্বস্বান্ত	...	১৬৯
	প্রেমনিদর্শন পাগড়ী-রহস্ত	...	১৫২		প্রেমদাসের যোগ্য পুরস্কার	...	১৬৯

কাহিনী	রসভাস	পত্রাঙ্ক	গল্প	কাহিনী	রসভাস	পত্রাঙ্ক
প্রেম-মন্দিরায় যখন উপশম	...	১৭০		তৃতীয় সন্দরীলাভের সৌভাগ্য	...	১৮৬
প্রেমোন্দিরায় আত্মদান	...	১৭১		দরজীর কাহিনী	...	১৮৭
বন্ধুত্বের পুরস্কার	...	১৭১		হাসি নয় প্রাণের কঁাদ	...	১৮৭
স্বপ্নতান-ভাঙারীর উপস্থাপন	...	১৭২		প্রেম-জ্বর কি ঐশে মারে	...	১৮৮
চাটুর্নীতে প্রথম অভিলাষ	...	১৭২		প্রথম-কলাকুশলী বৃদ্ধার		
রূপসী রাণীর প্রেমিক-সন্ধান বেসাতি	১৭২		সাবাস দৃষ্টিশালী	...	১৮৮	
রূপের বিচ্ছিন্ন মিলাইল	...	১৭৩		বিরক্ত-বাসি উপশমে বৃদ্ধার নৈপুণ্য	...	১৮৯
প্রেমোন্মাদনায় সর্বস্ব পণ	...	১৭৩		দয়িতা-মিলনের অধীর প্রতীক্ষা	...	১৮৯
খোজার দৃষ্টিশালী	...	১৭৪		নাছোড়বান্দা নাপিত	...	১৯০
জীবন বিয়ম না করিলে কি			প্রথম মিলনের বিষম কণ্টক	...	১৯০	
পীরিত জমে ?	...	১৭৫		পীরিতের দায়ে লাঠিপেটার চটপোতা	...	১৯১
রূপসী রাণীর প্রেমিক-হরণ	...	১৭৫		গোপন পীরিতের বিষম বিদা	...	১৯১
স্বপ্নতান হারেসে পুরুষ চালান	...	১৭৬		শতমুখে কলঙ্ক রটনা	...	১৯২
সন্দরী বানীর সাবাস বাহাদুরী	...	১৭৬		পীরিতের আশা বিসর্জনে অন্ততাপ	...	১৯৩
বাহিত মিলনের বিবাহ-উৎসব	...	১৭৭		মুখ না ক্ষুর ?	...	১৯৩
তৃতীয় অবরুদ্ধনে ভাঙা-বিড়ম্বনা	...	১৭৭		নাপিতের আত্মকাহিনী	...	১৯৪
প্রেমোন্মাদনে সহসা বজপাত	...	১৭৮		বাকসংঘম-রহস্য	...	১৯৪
বোঝ বিহববার স্বকটিন দণ্ড	...	১৭৮		প্রথম দাতার কাহিনী	...	১৯৫
সৌরন উচ্ছলিত প্রেমোন্মাদনায়			পর্যাক-পথে কতাক্ষের চৌকিগ্রাম	...	১৯৫	
যখন নিবৃত্তি	...	১৭৯		সুরসিকের রাত কাটে কিরণে ?	...	১৯৫
চিকিৎসক কাহিনী	...	১৭৯		বিদ্যুৎয়ের মরুর হাসির উদ্দামনা	...	১৯৬
স্নানাগারে রক্তোৎসাদন	...	১৮০		পীরিতের দায়ে বানী টানা	...	১৯৭
মিসর সন্দরীর বর্ণনায় লালসা উদ্বেক	১৮০		প্রথমবাসি-প্রশমন চালক	...	১৯৭	
অভিসারিকার ভ্রান্তমগ্ন	...	১৮১	দ্বিতীয় দাতার কাহিনী	...	১৯৮	
উপযাচিত সৌরনদান	...	১৮১	প্রেমোন্মাদ-প্রাসাদে রত্নমগ্ন	...	১৯৮	
প্রাণয়িনীর সন্দরী উপহার প্রস্তাব	...	১৮২	সন্দরীর সোহাগের দাপট	...	১৯৮	
সৌজন্য থাক প্রেমলীলা চক্ৰ	...	১৮২	প্রেমোন্দিরী রক্তবীর শপ্রেম চপেটাত	...	১৯৯	
পুরুষের পীরিতের আবার মূল্য কি ?	...	১৮২	প্রেমের দায়ে দাড়ী গোচ বিসর্জনে	...	১৯৯	
সখীর প্রাণয়লীলা দর্শনে প্রাণয়িনীর আগ্রহ	১৮৩		নগদেহে নৃত্য উল্লাস	...	২০০	
প্রেমোন্মাদনায়-বিভীবিবাস			তৃতীয় দাতার কাহিনী	...	২০১	
দেশান্তরে পলায়ন	...	১৮৪	শঙ্ক ভিখারীর সহিত পরিহাস	...	২০১	
প্রেমনির্দশন মুক্তামালা চূষন	...	১৮৪	ভিক্ষা ব্যবসয়ে অর্পসংকল্প	...	২০২	
জুব্বীর চালবাজী	...	১৮৫	স্বচকুর চোরের কারসাজি	...	২০২	
শাসনকর্তার রূপসী কহাণ্ডয়ের প্রেমলীলা	১৮৫		গল্পের কৌশলে অন্ধরয়ের সন্ধান	...	২০৩	
প্রেমোন্মাদনীর প্রতিহিংসার অন্ততাপ	১৮৬		অন্ধের ভাণে অন্ধ্রপূর বিহার !	...	২০৩	

পদ্য	কাহিনী	রচনাভাস	পত্রাঙ্ক	পদ্য	কাহিনী	রচনাভাস	পত্রাঙ্ক
	কাজীর বিচার !	...	২০৪		প্রেমস্থতি কবরের দার্শন্য	...	২২৩
	চতুর্থ দাতার কাহিনী	...	২০৫		আত্মগোপনে বিরহ-আবার অবসান-প্রয়াস	...	২২৪
	বুদ্ধ যাহকের বুদ্ধরূপিক	...	২০৬		সমাবিধি এ অল্পরাগের সমাপ্তি	...	২২৫
	মেঘদেহ যাজবলে মনুষ্যদেহে পরিণত !	...	২০৭		ঔষধে কি প্রেমব্যাদি সারে ?	...	২২৬
	গাথা প্রহরীর ধাঁধা	...	২০৮		পিরীতে প্রমাদ !	...	২২৭
	ডাকাত সন্দেহে নির্ঘাতন	...	২০৯		খালিকের প্রেমোদ্দিনী তোয়াজ	...	২২৮
	পঞ্চম দাতার কাহিনী	...	২১০		বিদায়ের সোহাগ-চুপন	...	২২৯
	স্বপ্নের প্রাসাদ পদাঘাতে চূর্ণ	...	২১১		প্রেমোদ্দিনীর মুখ	...	২৩০
	পদাঘাত-বিড়ম্বনা	...	২১২		প্রেম-নৈরাশের মনবেদনা	...	২৩১
	পিপাচিনির কৌশলজাল বিস্তার	...	২১৩		প্রেমপথে সহস্র চুপন	...	২৩২
	কাফী তত্ত্বে প্রেমিক-লাঞ্ছনা	...	২১৪		জয়কুলে প্রেমের রাগিণী	...	২৩৩
	প্রতিভিন্সা চরিতার্থ	...	২১৫		প্রিয়তমের চিত্তাই জীবনমঞ্চল	...	২৩৪
	প্রেম-প্রবোভন সন্ধিত সম্পদ-তৃপ	...	২১৬		জীবনে এ প্রেমোদয়ের নিষাধ নাট !	...	২৩৫
	কাজীর উল্লাস !	...	২১৭		খালিক-প্রেমোদ্দিনী মিলনের চরকাঙ্ক্ষা	...	২৩৬
	ষষ্ঠ দাতার কাহিনী	...	২১৮		পিরীতের শুভকথা ব্যক্তি	...	২৩৭
	অভিনয় নিপুণ রাজপুত্র	...	২১৯		মিলনদূতের স্তম্ভদান	...	২৩৮
	মনোরঞ্জনর অভিনব দারা	...	২২০		প্রিয়তমার স্বামীর অলসরণ	...	২৩৯
	দস্তা-শিবিরে ভীষণ নিগাহ	...	২২১		প্রণয়-মিলনে আত্মনিয়োগ	...	২৪০
	প্রেমব্যাদি আরোগ্যের পুরস্কার	...	২২২		পথপ্রাপ্তে আকাঙ্ক্ষিত প্রেমপথ	...	২৪১
	নিদাক মনুষ্যের কোতুহল	...	২২৩		প্রণয় মিলনের সাদনা	...	২৪২
	কুন্দের পুনর্জীবন	...	২২৪		খালিক-প্রাসাদে প্রবেশ বিদাতি	...	২৪৩
					অভিসারিকার অভিযান	...	২৪৪
					প্রেমোদ-বাসর সচ্ছা	...	২৪৫
					মিলন-মাধুর্য্য	...	২৪৬
					দস্তাকবলে প্রেমিক-প্রেমিকা	...	২৪৭
					অভিসারিকার পরিচয়	...	২৪৮
					প্রণয় অভিযানের বিড়ম্বনা	...	২৪৯
					স্বন্দরীকুলবাহীর পদপ্রাপ্তে	...	২৫০
					অভিসারিকার প্রত্যাভর্তন	...	২৫১
					সংগোপনের পুরস্কার	...	২৫২
					প্রণয়-বক্ষিতার বিরহ-উজ্জ্বল	...	২৫৩
					পুনরায় প্রেমোদগ্ধ সচ্ছা	...	২৫৪
					এ প্রেম সমাধিভূমি অধিকার করিবে	...	২৫৫
					খোজার মুখে শুভপ্রেমলীলা প্রকাশ	...	২৫৬
					জ্ঞতগামী অথি প্রেমিকের পলায়ন	...	২৫৭

আত্মজ্ঞান হায়েন দ্যামদেল নীহাদ ২১৮

	চোখে মুখে প্রেমের ভাষা	...	২১৮
	প্রেমিকার সাদর নিমন্ত্রণ	...	২১৯
	আনন্দ-নিকেতনে প্রেমোদ-তরঙ্গ	...	২২০
	স্বরতরঙ্গে প্রেম-নিবেদন	...	২২১
	নিরাশায় প্রেমের অবসান	...	২২২
	ক্ষণিক মিলনে তৃপ্তি কোথায় ?	...	২২৩
	প্রেমসঙ্গীতে প্রাণ-বিনিময়	...	২২৪
	রঙ্গক্ষে চমকের বজ্রাঘাত	...	২২৫
	প্রেমনৈরাশের দাবদাহ	...	২২৬
	প্রেমোদ-বাসরের শোভাযাত্রা	...	২২৭
	আত্মনিবেদনের বন্ধন	...	২২৮
	প্রেমোদ-স্বপ্নভঙ্গে মুখ	...	২২৯

কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক	পগ
সৌন্দর্য-নির্ভর তীরে নিরাশা	...	২৪২	
প্রেম-পরিণাম	...	২৪২	
ছুটি ফুল একসঙ্গে ফরিল	...	২৪৩	
নয়ন-কমল অশ্রুজলে ছলছল	...	২৪৪	
প্রেমিক-প্রেমিকার একত্র সমাধি	...	২৪৪	
সাঁহা	...	২৪৫	
পূজলাভের প্রার্থনা	...	২৪৫	
প্রেমোদ্রাস্ত রাজার অবসাদ	...	২৪৬	
বিবাহিত জীবন দুঃখময়	...	২৪৬	
সুন্দরী সঙ্গিনী অনিষ্টের মূল	...	২৪৭	
বিবাহে সম্ভতির আশায় সময় দান	...	২৪৭	
সুন্দরী-হৃদয়ের পরিচয় অজ্ঞাত	...	২৪৮	
রাজপুত্রের নির্বাসন	...	২৪৯	
পরীর সোহাগ-চুষন	...	২৪৯	
বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী-সন্দেশ	...	২৫০	
বিবাহবন্ধনে সুন্দরী অসীকৃত	...	২৫০	
দৈত্যের রূপ-স্বতি	...	২৫১	
রূপতুলনার বিরোধ	...	২৫১	
সৌন্দর্য-তর্কের সমস্তা	...	২৫২	
সৌন্দর্য-তুলনার সঙ্গত প্রস্তাব	...	২৫৩	
যৌবনপুপিতা দেহলতার আকর্ষণ	...	২৫৩	
প্রেমিকের অঙ্গুরীয় বিনিময়	...	২৫৪	
অজ্ঞ প্রচুনে প্রেমিকার আত্মদান	...	২৫৪	
সুন্দরী সন্ধানের নির্যাতন	...	২৫৫	
প্রেমিকের প্রচণ্ড চপেটাঘাত	...	২৫৫	
শয়নমন্দিরে সুন্দরী আবির্ভাবের রহস্ত কি ?	...	২৫৬	
উজীরের দাড়ী-দায় !	...	২৫৬	
স্বপ্নের প্রেমনিবেদন	...	২৫৭	
স্বপ্ন-সুন্দরীর প্রেমে সত্য কোথায় ?	...	২৫৭	
প্রেমময়ীর বিরহ-বিকার	...	২৫৮	
বাহিত মিলন না হইলে আত্মহত্যার পণ	...	২৫৯	
প্রেমের নাগপাশের উপর শাসন-শৃঙ্খল	...	২৫৯	
প্রেমব্যাধি আরোগ্য-প্রয়াসে শিরচ্ছেদ	...	২৬০	
ধর্মজ্ঞাতার নিকট প্রেমরহস্ত প্রকাশ	...	২৬০	

কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক
প্রেমিক সন্ধান অভিধান	...	২৬১
চিন্তাচোরের সন্ধান মিলিল	...	২৬১
কবিতার মধ্যে বিরহ-শাস্তি	...	২৬২
প্রেমব্যাধি উপশমে আনন্দ উৎসব	...	২৬২
প্রেমিকের আত্মসংগোপন-নৈপুণ্য	...	২৬৩
দৈবজ্ঞের ছদ্মবেশে সুন্দর !	...	২৬৩
হয় সুন্দরী লাভ, নয় জীবনদান	...	২৬৪
প্রেমপঞ্চে প্রণয়-নিদর্শন	...	২৬৪
দয়িত-মিলন	...	২৬৫
প্রেমোদ-খেলা	...	২৬৫
সোহাগ মিলনে দুঃস্বপ্ন	...	২৬৬
নিদ্রালসা সুন্দরীর পীবর বক্ষোচ্ছ্বাস	...	২৬৬
প্রেমিকের পথভ্রান্তি	...	২৬৭
বিরহশয়নের অশ্রুধারা	...	২৬৮
রাজপুত্রের ছদ্মবেশে প্রেমময়ী	...	২৬৮
সুন্দরীর তরুণী বিবাহ	...	২৬৯
ছদ্মবেশিনী রঙ্গময়ীর বিবাহ উৎসব	...	২৬৯
উচ্ছ্বসিত সৌবনে স্বামিপ্রেমের বন্ধন	...	২৭০
বক্ষোবর অপসারণে রহস্ত প্রকাশ	...	২৭০
পক্ষিহৃদে সৌভাগ্যোদয়	...	২৭১
গুহামধ্যে সম্পদরাশি	...	২৭১
অতর্কিত বিপদে মিলন-বাধা	...	২৭২
বিরহিণীর বাহিত সন্ধান	...	২৭২
আশার চমকে বিরহিণীর মুখ	...	২৭৩
প্রেমিক সন্ধানে সমুদ্রযাত্রা	...	২৭৩
প্রণয়স্পন্দ বন্দী	...	২৭৪
রঙ্গময়ীর চরণতলে প্রণয়ী	...	২৭৪
রঙ্গবিলাসিনীর প্রেমোদ-কৌতুক	...	২৭৫
আকাঙ্ক্ষিত মিলনের চুষন-উচ্ছ্বাস	...	২৭৬
সুন্দরীর আত্মগোপন-চাতুরী	...	২৭৬
রাজপুত্র আমজাদ ও আসাদ	...	২৭৭
প্রণয়ের নেশা	...	২৭৭
বিমাতার প্রেমনিবেদন	...	২৭৮
সুন্দরীর ভীষণ প্রতিহিংসা	...	২৭৯
পুত্রহত্যার নিষ্মম আদেশ	...	২৭৯

পত্র	কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক	পত্র	কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক
	সিংহের অতর্কিত আক্রমণ	...	২৮০		শশ-মদিরার আশ্বিনবুতি	...	২৯৯
	প্রাণহত্যার প্রকল্পপকার	...	২৮০		চুবনের অমরজন	...	৩০০
	রাজরাণী বন্ধিনী	...	২৮১		সুন্দরী দাসীর আশ্বিনবেশন	...	৩০০
	রাজপুত্রের নিরুদ্দেশ যাত্রা	...	২৮১		প্রতিহিংসার অস্ত্রাশ্রয়	...	৩০১
	সকটে রাজহুমায়	...	২৮২		প্রেমিক পুত্রের শান্তি-ব্যবস্থা	...	৩০১
	অগ্নি-উপাসকের ভীষণ চক্রান্ত	...	২৮২		সুন্দরী বিলাস-মহিনী হইবে না	...	৩০২
	অগ্নি-উপাসকের রাগো	...	২৮৩		আমোদের উজান বহিণ	...	৩০৩
	দানাপারে সুন্দরী-মিলন	...	২৮৪		মধু অভাবে মধুচক্র শুকাইল	...	৩০৩
	উপহাটিকার আগ্রহ	...	২৮৪		সুন্দরী-রাণী দাসী বিক্রম-প্রচেষ্টা	...	৩০৪
	প্রেমের প্রস্তাবনা	...	২৮৫		দাসী করে প্রতিহিংসা	...	৩০৪
	সুন্দরীর ভোজন-বিলাস	...	২৮৫		উজীর-সাহসনা	...	৩০৫
	বাহাদুরের উদারতা	...	২৮৬		উজীরের প্রতিহিংসা	...	৩০৫
	ভূতাবেশের বিভ্রম	...	২৮৭		রূপসী সঙ্গে চম্পট	...	৩০৬
	সুন্দরীর বেড়াঘাতের দাপট	...	২৮৭		প্রমোদ-উজানে	...	৩০৬
	প্রাণহরী সুন্দরী	...	২৮৮		সৌন্দর্যে সহায়বুতি	...	৩০৭
	শব-সংগোপন-প্রয়াস	...	২৮৮		প্রাসাদে প্রমোদবাসন	...	৩০৮
	আত্মসমর্পণে সৌভাগ্যোদয়	...	২৮৯		আনন্দ-মদিরা কোথায় ?	...	৩০৮
	নরবলির অভিযান	...	২৮৯		প্রেমসঙ্গীতের অমির উজান	...	৩০৯
	সুন্দর দাস উপঢৌকন প্রস্তাব	...	২৯০		প্রমোদ মজলিসে বুড়া প্রেমিক	...	৩০৯
	সুন্দরী রাণীর দাস-সমাদর	...	২৯১		রূপসী-রাণীর বৃদ্ধ তোরণ	...	৩১০
	আবার অত্যাচারীর কবলে	...	২৯১		সুন্দরী-সোহাগে বৃদ্ধের মস্তপান-রস	...	৩১০
	প্রেমিক উদ্ধারে বীরাসনার অভিযান	...	২৯২		হৃদয়েশে খালিক	...	৩১১
	সমুদ্র-সৈকতে প্রণয়ী	...	২৯২		মজলিসের রসরস	...	৩১১
	রাজপুত্র আবার বন্দী	...	২৯৩		স্বরের সম্মোহন প্রভাব	...	৩১২
	কারাগারে প্রেমের মদিরা	...	২৯৩		জেলের বেশে খালিক	...	৩১৩
	দুঃখনিশির অবসান	...	২৯৪		সুন্দরীর রক্তন অমরোথ	...	৩১৩
	প্রেমিক উদ্ধারে রাজ্য আক্রমণ	...	২৯৫		সুন্দরী দান	...	৩১৪
	অস্ত্র সৈন্যদলের অভিযান	...	২৯৫		সঙ্গীতে সুরঙ্গ মর্মবেদনা	...	৩১৪
	পুত্র-উদ্ধারে রাজ্য আক্রমণ	...	২৯৬		আসন্ন বিরহের আবেগ	...	৩১৫
	মিলন-উৎসব	...	২৯৬		সুন্দরী দাসীর আক্রমণ	...	৩১৬
	মোহরেন্দ্রীয় ও পারদম্য রূপদী	...	২৯৭		খালিকের পুরস্কার	...	৩১৬
	সুন্দরী বিদ্রোহী দাসী চাই	...	২৯৭		কারাগৃহে প্রেমিক বন্দী	...	৩১৭
	পারস্ত রূপসীর রূপের চমক	...	২৯৮		শক্রসংহারের সমারোহ	...	৩১৭
	সবতনে রূপবিকাশ	...	২৯৮		কানীর পর বিচার	...	৩১৮
	সুন্দরীর কোঁকুল চরিতার্থ	...	২৯৯		করণ মুর্ছনার সৌভাগ্যোদয়	...	৩১৮

কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক	পর্ল	কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক
রুক্মিণী দেব ও রাজকন্যা ৩১৯				কামের শপথ	...	৩৩৮
নির্দীপক প্রেমিক	...	৩২০		প্রেমিক লুণ্ঠনের গর্ভ	...	৩৩৮
যৌবনের জয়চাঁক	...	৩২০		মদিরার সঙ্গে রূপমদিরার চমক	...	৩৩৯
প্রেমিকার মৌন ভঙ্গ	...	৩২১		কাম-প্রশান্তির শান্তি	...	৩৩৯
নীরব প্রণয়ের রহস্য বিস্মৃতি	...	৩২১		রূপসী শিশাচিনী	...	৩৪০
হৃন্দরী দাসীর জীবননাট্য	...	৩২২		যাহ্নব্রের প্রভাব	...	৩৪১
রাজনন্দিনী বাদী	...	৩২২		সোহাগের প্রণয় কাকলি	...	৩৪১
সমুদ্র-রাজকন্যাপদের গুভাগমন	...	৩২৩		যাহ্নব্রের অভিসম্পাত	...	৩৪২
আনন্দ-মিলনে বিরহ-সন্তাপ	...	৩২৩		অশ্বিনীকুণ্ডে প্রেমোদিনি	...	৩৪২
রাণীর প্রেমনিদর্শন	...	৩২৪		যাহ্নব্রের প্রভাব চূর্ণ	...	৩৪৩
প্রেমময়ীর পুত্র উপহার	...	৩২৪		শিশাচিনীর প্রতিহিংসা	...	৩৪৩
সমুদ্ররাজের যৌতুক	...	৩২৫		দৈত্য অভিযান	...	৩৪৪
পুত্রশিরে রাজমুকুট	...	৩২৫		যাহ্নব্রের বিজয়লাভ	...	৩৪৪
রাজপুত্রের বিবাহ প্রস্তাব	...	৩২৬		নির্দীপকনের প্রণয়-সোহাগ	...	৩৪৫
রূপভূষায় প্রণয়-সংকার	...	৩২৬		প্রণয়ের দাম্পত্য প্রেম		
প্রেমিকের প্রণয় উজ্জ্বল	...	৩২৭		প্রণয়দাসের বাণিজ্য-যাত্রা	...	৩৪৬
মামার নিপুণ প্রণয়-দৌত্য	...	৩২৮		শব-সম্বন্ধনা	...	৩৪৭
মন্ত্রসিদ্ধ অমৃতরীর প্রভাব	...	৩২৮		রহস্যময় সিন্দুক	...	৩৪৭
পরিণয়-প্রার্থনায় হীরকহার উপহার	...	৩২৯		খোজা বখাইডের আশ্চর্যকাহিনী	...	৩৪৮
প্রত্যাখ্যানের লাঞ্ছনা	...	৩২৯		খোজা কাসুরের জীবনরহস্য	...	৩৪৮
উপসংহারে রণরঙ্গ	...	৩৩০		মিথাকথার বাহাদুরী	...	৩৪৯
বাঙালির অপ্রত্যাশিত সাফল্য	...	৩৩০		অর্দেক মিথ্যায় সর্কনাশ	...	৩৪৯
রাজপুত্রের প্রেমভিক্ষা	...	৩৩১		সমাধিগর্ভে প্রেমময়ী	...	৩৫০
চমকে অভিসম্পাত	...	৩৩১		সমাধিশিখা হইতে প্রেমিকা উদ্ধার	...	৩৫১
মরুভূমিতে প্রেমিক নির্দাসন	...	৩৩২		প্রেমনিবেদনের ঘট	...	৩৫১
যাহ্নব্রের রূপান্তর	...	৩৩২		উল্লস যৌবনে প্রেমমিলনে বাধা	...	৩৫২
রাজ্যের যাজ্ঞচতুর্থা	...	৩৩৩		অনুপমা হৃন্দরীর জীবনরহস্য	...	৩৫২
যাহ্নব্রের প্রভাব	...	৩৩৪		জীবনদানে প্রাণ-বিনিময়	...	৩৫৩
প্রেমিক জানোয়ারের দেশে	...	৩৩৪		প্রণয়-গুঞ্জে মানস-রঞ্জন	...	৩৫৩
যাহ্নব্রের প্রেমলীলা	...	৩৩৫		প্রেমস্বরণে প্রণয় সমাপ্তি	...	৩৫৪
বৃক ওস্তাদের মধুর আশাস	...	৩৩৫		আগগোছে প্রেমলীলা	...	৩৫৫
প্রেমবিলাসিনী যাহ্নব্রের শোভাযাত্রা	...	৩৩৬		সপত্নী-সংহারের সাবধানতা	...	৩৫৫
প্রেমময়ীর প্রতিশ্রুতি	...	৩৩৬		প্রেমোদিনি বিয়োগের নিদারুণ ব্যথা	...	৩৫৬
হৃন্দরী-রাণীর অশ্রুধ্বংস হরণ	...	৩৩৭		কৃত্রিম শোকের আকরণ	...	৩৫৬
প্রণয়ের বেসাতি	...	৩৩৭				

গল্প	কাহিনী	রসাতান	পৃষ্ঠা	গল্প	কাহিনী	রসাতান	পৃষ্ঠা
	প্রণয়িনীহার খালিকের আক্রোশ	...	৩৫৭		সুন্দরী বাচারের বিভ্রম	...	৩৭৭
	প্রমোদিনী বকীর অভিমান	...	৩৫৭		সুখবন্ধের ঔষধ প্রয়োগ	...	৩৭৭
	ভৃত্যবেশে প্রেমিক লম্পট	...	৩৫৮		সুন্দরীর চরিত্র বাচাই	...	৩৭৭
	প্রেম-প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর ক্রান্ত-ক্রোধ	...	৩৫৯		ধন্যলোকের মাধুর্য	...	৩৭৮
	প্রেমিক প্রেমচারে ক্রোধেত দূত	...	৩৫৯		সুন্দরী উপহারের স্বর্ণবেদনা	...	৩৭৯
	খালিক-প্রেমচারে অট্টালিকা চূর্ণ	...	৩৬০		গুপ্তকক্ষে প্রেম-প্রতিমা	...	৩৭৯
	প্রেমিকের মাতা ভবী নির্দাসিন	...	৩৬০		সংঘের পুরস্কার	...	৩৮০
	নির্দাসিতা সুন্দরীর আশ্রয়	...	৩৬১	খোন্দোন্দো ও নকিহা-দাসের হাজির			
	খালিক-প্রেমোদিনীর বিলাপ	...	৩৬১				
	সুন্দরীর কৈকির	...	৩৬২		বেগম নির্দাসিন	...	৩৮১
	প্রণয়িনীর মনোরঞ্জন-প্রয়াস	...	৩৬২		বীরপুত্রের শত্রুঘ্ন প্রস্তাব	...	৩৮১
	প্রমোদিনী পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি	...	৩৬৩		ব্রাহ্মবধের চক্রান্ত	...	৩৮২
	প্রণয়-সন্ধানে মুক্তহস্তে দান	...	৩৬৩		মুগয়া বাজার নিরুদ্ধ	...	৩৮২
	সুন্দরী দাসীর জন্ত সর্বনাশ	...	৩৬৪		সুন্দরীর আর্জনাম	...	৩৮৩
	মিলন আশার উল্লাস	...	৩৬৪		নরখাদক রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ	...	৩৮৪
	প্রেমিকের প্রাণসংশয়	...	৩৬৫		বলি-যুদ্ধ উদ্ধার	...	৩৮৪
	বিরহ-বেদনায় মৃত্যুশয্যা	...	৩৬৫		রাক্ষস-বলিনী রাজকন্যা	...	৩৮৫
	প্রেমিক-প্রবোধ	...	৩৬৬		মিশেহারা রাজার অহুসরণ	...	৩৮৫
	মিলনের উল্লাস	...	৩৬৭		রাক্ষস-সংহার	...	৩৮৬
	প্রেমদাসের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বী সর্বনাশ	...	৩৬৭		সুন্দরী উদ্ধারের ধন্যবাদ	...	৩৮৭
	ভবীদানে প্রণয়িনীলাভের সৌভাগ্য	...	৩৬৮		বাস্ত প্রেমিকের উদ্ধৃত	...	৩৮৭
জীম অক্ষয়ময় ও মৈত্রেয়াজ					পিতৃহত্যার বিবাহ-প্রস্তাব	...	৩৮৮
	পিতৃবিরোধে প্রমোদ-প্রবাহ	...	৩৬৯		রূপবান বীরের আশ্বাস	...	৩৮৮
	স্বপ্নের অহুসরণ	...	৩৭০		সুন্দরী-পরিণয়ের সৌভাগ্য	...	৩৮৯
	আশা মরীচিকা	...	৩৭০		জলদহ্যকবলে সুন্দরী	...	৩৮৯
	গুপ্তধনাগারে স্বর্ণমুদ্রারালি	...	৩৭১		সুন্দরী লাভে জলদহ্যগণের বন্দু	...	৩৯০
	হীরক পুতুলের দ্বিবা জ্যোতি	...	৩৭১		রাজনন্দিনী, রাক্ষসবলিনী	...	৩৯১
	অমূল্য সংগ্রহের অতুল্য বিষয়	...	৩৭২		বীরপুত্র প্রেমের বিজয়মালা	...	৩৯১
	আত্মপরিচয়ের নির্দশন	...	৩৭৩		রুতজ্ঞতার প্রতিশোধ	...	৩৯১
	আদর্শ প্রভুভক্তি	...	৩৭৩		প্রতিহিংসার পরামর্শ	...	৩৯২
	সৈতাপতির রম্য প্রাসাদ	...	৩৭৪		রাজ্য বিশুদ্ধ	...	৩৯৩
	সৈতাপতির আবির্ভাব	...	৩৭৫		বেগম-সর্বনাশ	...	৩৯৩
	সুন্দরী উপঢৌকনে অহুসরণ আশ্বাস	...	৩৭৫		চিকিৎসক-যুগে বড়বড় প্রকাশ	...	৩৯৪
	সত্য-পরীক্ষার অলৌকিক আয়না	...	৩৭৬		ধরবার-সন্ন্যাস আদেশ	...	৩৯৪

কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক	গল্প	কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক
অশ্রু-সন্মিলন	...	৩৯৫		আমি খালিক, তাতে সন্দেহ !	...	৪১৩
রাজ্য-আক্রান্ত	...	৩৯৫		পাগলা গারদে	...	৪১৪
সংগ্রামে বীরেন্দ্র আবির্ভাব	...	৩৯৬		বাদসাহী নেশা ছুটল !	...	৪১৪
মিলন উৎসবের আনন্দ-প্রবাহ	...	৩৯৬		সেই মোসামফের বাহুর	...	৪১৫
পরিচয়-বিহীন রাজপুত্রের বিজয়মুক্তি	...	৩৯৭		বাদসাহী স্বপ্ন অবসানে	...	৪১৫
যুদ্ধ-হোদেন্দ্র	...	৩৯৮		আবার হৃদয়ে খালিক	...	৪১৬
				বহুব্রহ্মের মধুর আশাস	...	৪১৬
ফুটির কোয়ারায় অর্থরাশি নিশ্চেষ্ট	...	৩৯৮		সবিনয়ে মনোরঞ্জন	...	৪১৭
ইয়ার জমায়েৎ—বাক্স খালি	...	৩৯৯		অকুরোখে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ	...	৪১৭
বহুর মুখোশ খুলিল	...	৪০০		পিরীত চাই না, মদেই আমোদ	...	৪১৮
একদিনের বন্ধু-সংঘর্ষ	...	৪০০		স্বরা ও স্বন্দরী ব্যতীত যৌবন অক্লান্ত	...	৪১৮
পান-প্রসূর হৃদয়োকাস	...	৪০১		বাদসাহী স্বপ্ন-প্রহেলিকা	...	৪১৯
ইয়ার বেইমানীর পরিচয়	...	৪০১		রঙ্গিনীগণের জাগরণ উল্লাস	...	৪২০
আতিথ্যের পুরস্কার	...	৪০২		দেখখোশ সোহাগ পরিহাস	...	৪২০
একদিনের বাদসাহীর আশা	...	৪০২		মৃণাল ভূজবন্ধনে স্বপ্ন-জাগরণ	...	৪২১
এ পেয়ালা বড় মজাদার !	...	৪০৩		রঙ্গিনীসোহাগে স্বপ্নভ্রান্তি	...	৪২১
সংগোপনে খালিক-প্রাসাদে	...	৪০৩		প্রেমিক-কণ্ঠে নিদারুণ কামড়	...	৪২২
বাদসাহী প্রদানের আদেশ	...	৪০৪		যাহুর না খালিক ?	...	৪২৩
স্বপ্ন না সত্য ?	...	৪০৪		নির্লোভ প্রেমিক পুরস্কার	...	৪২৩
স্বপ্ন যদি মধুর এমন,	...			আড় নয়নে মুচকি হাসিতে প্রাণ-বিনিময়	...	৪২৪
হোক সে কেবল কল্পনা	...	৪০৫		প্রমোদ তুফানের অবিরাম রঙ্গ	...	৪২৪
এ কি ইন্দ্রজাল ?	...	৪০৫		মরিয়া আমোদ	...	৪২৫
জাগরণের ভ্রান্তি	...	৪০৬		মরণের অভিনয়	...	৪২৫
নকল খালিক সিংহাসনে	...	৪০৭		প্রিয়তমার শোকের অশ্রুধারা	...	৪২৬
হঠাৎ বাদসাহীর চাল	...	৪০৭		দয়িতা-বিরোগে আদায়	...	৪২৭
ইমাম-শান্তির আদেশ	...	৪০৮		মৃত্যু-অভিনয়ের প্রহেলিকা	...	৪২৭
নকল খালিকের বিচার-বৈচিত্র্য	...	৪০৮		মৃত্যু-সন্দেহের ধাঁধা	...	৪২৮
বাদসাহী আহ্বানের ঘটা	...	৪০৯		হার-জিতের বাজি	...	৪২৮
স্বন্দরী-মিলনে সরবৎ পানের ছটা	...	৪০৯		মরণ-নির্ণয়ের সন্ধান	...	৪২৯
স্বরা মজলিসের প্রমোদ-স্রোত	...	৪১০		স্বলতান হারিলেন	...	৪২৯
গানের সঙ্গে স্বধার পেয়ালা	...	৪১০		বাজিহারের হুজ্জয় অভিমান	...	৪৩০
স্বপ্ন-বিভ্রমের মোহ	...	৪১১		প্রেমিকার সাবাস শোকাভিনয়	...	৪৩০
এ কি সত্যতানের ভেতিকা ?	...	৪১২		‘ও বড় দানাবাজ’	...	৪৩১
মায়াবিনী দূর হ’	...	৪১২		‘চোপ, চোপ, দানাওয়ারী	...	
লাঠির চোটে স্বীকার-প্রয়াস	...	৪১৩		নেহি তোমারা লাজ’	...	৪৩২

গল্প	কাহিনী	রসভাস	পত্রাঙ্ক	গল্প	কাহিনী	রসভাস	পত্র
	মরণের কারসাজী	...	৪৩২		তরবারি ব্যবসানে প্রথম মিলন	...	৪
	কে হারে জিনে	...	৪৩৩		রাজনন্দিনী-হরণ-রহস্য	...	৪
	মরণ অভিনয়ে সৌভাগ্যভাষ	...	৪৩৩		পুনরায় প্রেমিক-প্রেমিকা হরণ	...	৪
আফ্রান্দীম ও আশ্চর্য্য প্রদীপ			৪৩৪		সত্য না ইলুজাল ?	...	৪
	পথে কাকা মিলিল !	...	৪৩৪		উৎসব আনন্দে বিবাহ-যবনিকা	...	৪
	কাকার মোহর সেলামী	...	৪৩৫		স্বলভানের অপকৃত্ত অবদার	...	৪
	ব্রাতৃবধূকে সাধ্বনা	...	৪৩৫		হীরকরত্ন ও স্নানরীরত্ন উপহার	...	৪
	বাছুরের মধুর আশ্বাস	...	৪৩৬		উপহার-বাহিনীর শোভাযাত্রা	...	৪
	প্রলোভন-জাল বিস্তার	...	৪৩৬		রাজকীয় প্রদান	...	৪
	নূতন ধাঁধার অলুসরণে	...	৪৩৭		কল্পনাভীত সৌভাগ্যের সর্বা	...	৪
	রহস্ত-কাননে	...	৪৩৭		স্বলভানের সর্ধনা	...	৪
	ধুমরাশির অন্তরালে গুহাপথ	...	৪৩৮		স্বপ্নপুরী নির্মাণ	...	৪
	রহস্তময় ভূগর্ভের দ্বার উন্মুক্ত	...	৪৩৮		প্রিয়তমার শুভাগমনের জন্ম মঞ্চমল আভূত	...	৪
	আশ্চর্য্য প্রদীপ আবিষ্কার	...	৪৩৯		ঐলুজালিক প্রদান-রহস্ত	...	৪
	গুহামধ্যে জীবন্ত সমাধি	...	৪৩৯		প্রিয়তমার অভিনন্দন	...	৪
	অদুরীদাস দৈত্যের আবির্ভাব	...	৪৪০		প্রথম মিলনের সোহাগ অহরজন	...	৪
	অপ্রত্যাশিত উদ্ধার	...	৪৪০		অলৌকিক প্রদান সম্পর্কনে বিশ্বাস	...	৪
	প্রদীপ-ভূত দৈত্যের শুভাগমন	...	৪৪১		বাতারন-সজ্জায় রত্নভাণ্ডার নিঃশেষিত	...	৪
	দৈত্য না হুঁত্মান সৌভাগ্য	...	৪৪২		স্বলভানী মর্প চূর্ণ	...	৪
	দৈত্যদানার কারবার ত্যাগ কর	...	৪৪২		বিবাহ-নিরাশার ধাপ্তাবাজী	...	৪
	ইছদীর প্রবন্ধনা	...	৪৪৩		বাছুর তত্ত্বিত	...	৪
	বাহাতর মোহরের রোপ্যাপাত্র	...	৪৪৩		আক্রোশের প্রতিহিংসা	...	৪
	সানাগারে রাজকন্তা সম্পর্কন	...	৪৪৪		আশ্চর্য্য প্রদীপ অপহরণ-প্রদান	...	৪
	প্রণয়ের নেশা	...	৪৪৪		প্রদীপ-কোরী স্নানকৌশল	...	৪
	রাজনন্দিনী বিবাহ-বাসনা	...	৪৪৫		রাজপ্রাসাদে সাড়া	...	৪
	চাঁদ ধরিবার সাধ !	...	৪৪৫		দ্রুতগতির চলনা	...	৪
	হীরক-রত্নের মহামূল্য কল উপঢৌকন	...	৪৪৬		শূন্তপথে প্রাসাদ চালান	...	৪
	প্রদীপের আশ্চর্য্য শক্তিতে অসম্ভব সম্ভব	...	৪৪৬		প্রাসাদ অন্তর্ধানে বিশ্বাস ধাঁধা	...	৪
	স্বলভান-মরবারে	...	৪৪৭		ভাগ্যদেবীর নিহুর পরিহাস	...	৪
	বিবাহ-প্রস্তাবনা	...	৪৪৭		শূন্যে বন্দী	...	৪
	রত্নপ্রভায় আশ্চর্য্যবিস্মতি	...	৪৪৮		নির্মম আদেশের বিরোধ	...	৪
	তিন দাস পরে বিবাহ আশ্বাস	...	৪৪৮		জীবন-সীমা চল্লিশ দিন	...	৪
	মত-পরিবর্তনের বিভ্রাট	...	৪৪৯		আশ্চর্য্যতার প্রেরাস	...	৪
	শূন্তপথে সবদশাতি চালান	...	৪৪৯		অদুরীদাস দৈত্যের অভিযান	...	৪
					সৌভাগ্য-প্রদান	...	৪

কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক	গল্প	কাহিনী	রসাতাস	পত্রাঙ্ক
প্রিয়তমা সন্মেলনে প্রাসাদ-রহস্য	...	৪৬৮		বাল্লের ভিতর বিশ্বের সংস্কৃত ধনভাণ্ডার	...	৪৮৭
জয়চিহ্ন বক্ষে ধারণ	...	৪৬৯		বিশ্বের অনন্ত রত্নরাশি সন্মর্শন	...	৪৮৭
হয়বেশের সঙ্কট	...	৪৬৯		আশার উল্লাসে অন্ধ	...	৪৮৮
উদ্ধারলাভের যড়যন্ত্র	...	৪৭০		নৈরাশ্রের ভীষণ অন্ধকার	...	৪৮৮
রূপের বোহন কীস	...	৪৭০		শান্তিতে শান্তি	...	৪৮৯
প্রেম-চাতুর্যের অভিনয়	...	৪৭১		মৃৎসতার গোপন রহস্য	...	৪৮৯
মদের সঙ্গে গল্পের বুকুনী	...	৪৭১		সিদ্ধিমানের আত্মকাহিনী	...	৪৯০
আশ্চর্য্য প্রদীপ উদ্ধার	...	৪৭২		সুন্দরীর পক্ষীর মত আহার	...	৪৯০
শূন্যপথে স্রসজিত প্রাসাদ	...	৪৭৩		সমাধি-ভূমিতে শব আহার	...	৪৯১
মিলন অশ্রুর উছল প্রবাহ	...	৪৭৩		সুন্দরীর অসহ বজ্রাভী	...	৪৯১
আবার সোভাগ্য-শিখরে	...	৪৭৪		গলিত মৃতদেহ কি স্রবজ ?	...	৪৯২
ব্রাহ্মতার প্রতিহিংসা	...	৪৭৪		যাহুবিজ্ঞাপ্রভাবে স্বামী কুকুর	...	৪৯২
মহিমময়ী নারীর ছন্নবেশে	...	৪৭৫		বুদ্ধি নৈপুণ্যের ঘাটাই	...	৪৯৩
নিষ্ঠুর-হস্তে ধার্মিকা হত্যা	...	৪৭৫		পয়সা-বাঁধা কুকুর	...	৪৯৩
প্রাসাদে প্রতিহিংসা-প্রয়ালী যাহুকর	...	৪৭৬		রূপান্তরের রক্তজতা	...	৪৯৪
রাজকল্পার চিত্তহরণ-চাতুরী	...	৪৭৬		বোতলে গুপ্তময়	...	৪৯৫
নির্জন বক্ষে যড়যন্ত্র চিন্তা	...	৪৭৭		যাহুকরীর যোগ্য শান্তি	...	৪৯৫
কুহকীর ধর্মোপদেশ	...	৪৭৭		খোজা হাসেন আলহাবল	...	৪৯৬
সৌন্দর্য্য-সম্বরের ক্রটি আবিষ্কার	...	৪৭৮		ভাগ্য-পরিবর্তনে মনোবৃত্তি	...	৪৯৬
রকপক্ষীর ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ-সজ্জা অসম্পূর্ণ	...	৪৭৮		আশা-আকাজ্জাহীন জীবন	...	৪৯৭
সৈত্যগর্জনে ভূমিকম্প	...	৪৭৯		দরিত্রের ভাগ্যপরীক্ষা	...	৪৯৭
শিরঃশীড়ার অভিনয়ে ছুরিকাঘাত	...	৪৭৯		স্বর্ণমুদ্রা বাধা পাগড়ীতে চিলের ছোঁ!	...	৪৯৮
আততায়ীর যোগ্য শান্তি	...	৪৮০		নিরাশার বিভ্রম	...	৪৯৮
জিফের মৈশ্বর্য্য	...	৪৮১		উপকারীর কৈফিয়ৎ	...	৪৯৯
স্বর্ণমুদ্রার সহিত চপেট চাই	...	৪৮১		পুনরায় আশার উদ্দীপনা	...	৪৯৯
নিদ্রাভাবে ষোটকী প্রহার	...	৪৮২		সাজিমাটী-বিনিময়ে মোহরের গলি	...	৫০০
হঠাৎ ধনীর রহস্য কি ?	...	৪৮৩		টাকায় অদৃষ্ট ফেরে না	...	৫০০
দরবারে রহস্য-প্রকাশ আব্হান	...	৪৮৩		মোহর গেল, তর্কের মীমাংসা হইল না	...	৫০১
বাধা আবদারের কাহিনী	...	৪৮৪		বিনাসম্বলে ভাগ্য-পরিবর্তন	...	৫০১
গুপ্তরহস্যভাণ্ডারের সন্ধান	...	৪৮৪		সীসার টুকরার মহিমা	...	৫০২
উপভোগ্য রত্নস্তুপ	...	৪৮৫		প্রথম জালের মাছ	...	৫০২
আশীট উত্তরে পিঠে ধনরাশি চালান	...	৪৮৫		মাছের পেটে সমুজ্জল হীরক	...	৫০৩
আকাজ্জা উদ্দীপনার চাকলা	...	৪৮৬		হীরকজ্যোতিতে গৃহ আলোকিত	...	৫০৪
ধন আকাজ্জার নিয়তি নাই	...	৪৮৬		হীরকপ্রাপ্তিতে আনন্দ-উল্লাস	...	৫০৪
				সোভাগ্য-হীরক গ্রহণের আগ্রহ	...	৫০৫

কল্যাণ

পত্র	কাহিনি	পত্র	কাহিনি
১	বিশ মোহর হইতে লক্ষ মোহর	১০৫	তৈলের কুণার দস্যুচালান
২	লক্ষ স্বর্ণদ্বারীর হীরক বিক্রয়	১০৬	দস্যুদলপতির আভিষেক গ্রহণ
৩	সৌভাগ্য-নিধনে	১০৭	হৃদয়ে অহুগ্রহ লাভ
৪	ধান্যবাহী কেন ?	১০৮	সঙ্কেত জ্ঞাপন
৫	আভিষেক সম্মাননা	১০৯	তৈলের কুণার মাহুকের কথা
৬	পল্লীভবনে বিশ্রাম-প্রদোষ	১১০	বুদ্ধিকৌশলে দস্যুদল সাবাড়
৭	দ্বিতীয় প্রমাণ কোথায়	১১১	দস্যুতির নিষ্ফল আক্রোশ
৮	ঘোড়ার দানা সংগ্রহে মোহর আবিষ্কার	১১২	তৈলের পরিবর্তে দস্যু দেখিয়া বিস্ময়
৯	টাকার ভাগ্য-পরিবর্তন সম্ভব নয়	১১৩	দস্যুদলের সমাধি
১০	খালিকের চমক	১১৪	বীরবাহিনী মৃত্যু হইল না কেন ?
আলিহাট ও চম্পাচি দস্যু		১১৫	প্রতিশোধ বাসনায় বহুতর প্রসার
১১	চিহ্ন কীক	১১৬	সাদরে দস্যুপতি নিমন্ত্রণ
১২	সিসেম বন্ধ	১১৭	আভিষেক প্রস্তাবনা
১৩	স্বপ্ন-সুপ্তি ধনরত্ন তু পীকৃত	১১৮	লবণ-বন্ধিত খাতে অল্পরূপ
১৪	চোরের উপর বাটপাড়ী	১১৯	হৃদয়ে অহুগ্রহ লাভ
১৫	কুম্ভকেতে মোহর মাণ	১২০	ছোরা হস্তে সুন্দরীর ললিত বুজ
১৬	সৌভাগ্য-নির্দর্শনে হিংসানল	১২১	সুন্দরী দাসীর চাকুরী ও শোঁধ্য
১৭	ভগ্ন ধনাগারের সন্ধান	১২২	ঐর্ষ্যা ও সৌন্দর্যের সমন্বয়
১৮	অতুল ঐর্ষ্যে আত্মবিশ্বাস	১২৩	হোঁচড়াইয়ের দস্যুগণ
১৯	প্রলোভনে হৃতিভ্রংশ	১২৪	জলপাই চাপা মোহর
২০	অর্থহরণে প্রাণসংহার	১২৫	মিশর হইয়া হিন্দুস্থান
২১	হুরাশার উৎস	১২৬	বিশ্বাসঘাতকতার জীর নিবেশ
২২	সুতদেহ ও স্বর্ণদ্বারীর খলি চালান	১২৭	অর্থলোভে ধর্মজ্ঞান বর্জন
২৩	নিকার আশায়ে সাক্ষ্য	১২৮	জীর ভবিষ্যৎবাণী অগ্রাহ্য
২৪	শোকের আওরাজ	১২৯	প্রতারক বহুর লাক্ষাই
২৫	রূপের ধাঁধায় মোহরের চাল	১৩০	মোহরের বদলে জলপাই
২৬	গোপন পীরিতের ফল সামান্য	১৩১	অবীকারের ধাক্কা
২৭	প্রৌঢ় বয়সে প্রেমের বন্ধন	১৩২	আদার দাম্য সম্ভব নয়
২৮	প্রতিশোধ-প্রয়াস	১৩৩	কাণীর বিচার !
২৯	সন্ধানের শির বাধী	১৩৪	বালকের বিচার খেলা
৩০	বাবামোহাকার অঙ্গসংলগ্ন	১৩৫	বালক কাণীর বিচার অভিনয়
৩১	সকল বাড়ীই চিহ্নিত	১৩৬	জলপাই-পল্লীকার রক্ত প্রকাশ
৩২	চিকুলোপে প্রাণদণ্ড	১৩৭	বালকের বিচার-নৈশুপ্যের প্রশংসা
৩৩	দ্বিতীয় দস্যুর অভিযান	১৩৮	খালিক সভার বিচারদানে বালক
৩৪	গোহিত রেখাঙ্কিত বাড়ী	১৩৯	আদার ও মরদল বিচারে প্রকট হয়

কাহিনী	রসাতান	পত্রাঙ্ক	গল্প	কাহিনী	রসাতান	পত্রাঙ্ক
হা' অশ্বের কাহিনী	...	৫৪৪		প্রণয়িনী উজ্জার	...	৫৬৩
বিশ্বভ্রমণে শক্তিমান কৃত্রিম অশ্ব	...	৫৪৪		মিলনের প্রমোদ-উৎসব	...	৫৬৪
শুভপথে মারী অশ্ব	...	৫৪৫		রাজপুত্র আমেদ ও পরীমামু	...	৫৬৪
অশ্ববিনিময়ে রাজকুমারী প্রার্থনা	...	৫৪৫		প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বী	...	৫৬৫
বংশগৌরব বিসর্জনে আগতি	...	৫৪৬		সুন্দরীলাভের যোগ্য আশ্চর্য নিদর্শন চাই	...	৫৬৫
রাজপুত্র অদৃষ্ট	...	৫৪৬		বালীমাতের আশা	...	৫৬৬
আকাশে বিচরণের উদ্যোগ	...	৫৪৭		ভারতের অতীত ঐশ্বর্য	...	৫৬৭
রাজপ্রাসাদের হাদে অবতরণ	...	৫৪৭		অত্যাশ্চর্য দূরবীণ	...	৫৬৭
নিদ্রাশান্ত মুখের সৌন্দর্যদীপ্তি	...	৫৪৮		মুহুর্তে আকাশজিতের দর্শন সম্ভব	...	৫৬৮
নৈশবাসের অন্তরালে সূতন্ত জ্যোৎস্না	...	৫৪৯		ফল নয়—অমৃত	...	৫৬৮
দরশনে আত্মসমর্পণ	...	৫৪৯		মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি সংগুপ্ত	...	৫৬৯
মনোমোহিনী সজ্জার ঘট।	...	৫৫০		অত্যাশ্চর্য দ্রব্যসংগ্রহের প্রতিযোগিতা	...	৫৬৯
রূপবিজলীর ছটা	...	৫৫০		সাক্ষীর পরীক্ষা	...	৫৭০
প্রেম-নিবেদনের হুচনা	...	৫৫১		প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রিয়তমার জীবনসঙ্কট	...	৫৭০
রূপের মোহন কাদে	...	৫৫১		পরীক্ষা-সমগ্র	...	৫৭১
ছুট মনোচোরে প্রাণবিনিময়	...	৫৫২		প্রেমপ্রতিযোগিতায় শৌর্য পরীক্ষা	...	৫৭২
রূপের নাগপাশে বন্দী	...	৫৫২		ভাগ্যপরীকার শর অদৃষ্ট	...	৫৭২
পূর্বরাগ অবগানে পিতৃ-সম্মতি প্রার্থনা	...	৫৫৩		নিষ্কিপ্ত শরের অম্লসরণ	...	৫৭৩
মিলনহুচনায় বিরহ আশঙ্কা	...	৫৫৪		জ্যোতির্দীপ্ত গুহাপথে	...	৫৭৩
প্রেমদেবতার চরণে অর্ঘ্য	...	৫৫৪		পরীমুখে প্রেম-পরিচয়	...	৫৭৪
প্রণয়ীর মধুর আশ্বাস	...	৫৫৫		পরী-প্রণয়ের সৌভাগ্য	...	৫৭৪
বিমানে সুন্দর সুন্দরী চম্পট	...	৫৫৫		কথার বিবাহ অধিক স্নদূত	...	৫৭৫
পুত্র আগমনে আনন্দ-উৎসব	...	৫৫৬		প্রাসাদ, না ইন্দ্রপুরী	...	৫৭৬
অশ্বিনীর প্রতিশোধ	...	৫৫৬		উচ্চ যৌবন-স্রোতে নিমজ্জন	...	৫৭৬
রাজকুমারী হরণ	...	৫৫৭		উচ্ছ্বসিত প্রণয়ীলায় বিরহ যন্ত্রণা	...	৫৭৭
প্রণয়িনী উজ্জারে নিরুদ্ধেশ যাত্রা	...	৫৫৭		পুত্র অদর্শনের উৎকণ্ঠা	...	৫৭৭
অপহৃত রাজকুমারী কান্দারে	...	৫৫৮		বিদায়ের কাতর অন্তর	...	৫৭৮
ছর্ষিত সংহারে রূপসী উজ্জার	...	৫৫৯		চুষনে মিলন-প্রতিশ্রুতি	...	৫৭৮
রক্ষাকর্তার রূপলাগণ	...	৫৫৯		‘বিরহ বেদন শরে তহু ডেল জর জরে’	...	৫৭৯
প্রেমিকা উন্মাদিনী	...	৫৬০		প্রণয়ের নীতিশাস্ত্র	...	৫৭৯
উন্মাদনা প্রশমনে নিরুপায়	...	৫৬০		গুপ্তকথা প্রকাশ অনাবশ্যক	...	৫৮০
হারানিধি লাভের আশা	...	৫৬১		পুনর্মিলনের প্রমোদ বরণ	...	৫৮০
প্রমোদিনী বিধামিনী	...	৫৬১		বিষেব উল্লেসের কুমন্ত্রণা	...	৫৮১
প্রেমিকের আত্মপ্রকাশ	...	৫৬২		ঐশ্বর্যগর্ভের ক্রারণ কি ?	...	৫৮১
রূপমুগ্ধ সুলতানের মুক্তিভ্রমণ	...	৫৬৩		রাজমুহুর্ত কণ্টকাধীন	...	৫৮২

গল্প-সূচী

গল্প	কাহিনী	রসাতাল	পত্রাঙ্ক	পৃষ্ঠা	কাহিনী	রসাতাল	পত্রাঙ্ক	পৃষ্ঠা
	ষাটকরী গোয়েন্দা	...	৫৮২		প্রিয়-ভগিনীর মনোরঞ্জন	...	৬০১	
	চাতুর্য-কাল বিস্তারের অহুত	...	৫৮৩		বাকশিক্ষণী পাখী	...	৬০২	
	পীড়িতের ভাণে করুণা উদ্বেক	...	৫৮৩		সঙ্গীতকারী গাহ, স্রবণের জল	...	৬০২	
	মারাবিনীর ছলনা	...	৫৮৪		অসাধ্য-সাধনের অভিযান	...	৬০২	
	অহুতের বিষম ফল	...	৫৮৫		ভগিনী-প্রবোধের অভিজ্ঞান	...	৬০৩	
	অমরার ঐশ্বর্য-সমর্থন	...	৫৮৫		মুখের জল সাক	...	৬০৪	
	অপ্রতীত ঐশ্বর্যদর্শনে ঐর্ষার জ্বালা	...	৫৮৬		সন্ধান দিলে অপকার আশঙ্কা প্রবল	...	৬০৪	
	পুত্রের বিরুদ্ধে পিতাকে উত্তেজনা	...	৫৮৬		শতবিস্তৃত পথের অন্তরায়	...	৬০৫	
	পুত্রদমনের যত্ন	...	৫৮৭		অশরীরী আশ্রয় চাঁৎকার	...	৬০৫	
	অহুত আবদার	...	৫৮৭		রাজপুত্র প্রভুরে পরিণত	...	৬০৬	
	এ প্রেম অপার্থিব, স্বার্থগন্ধে দূষিত নহে	...	৫৮৮		মুক্তামালায় জীবন-সমতা	...	৬০৬	
	চুখন-আলিঙ্গনে চিত্তবিনোদন	...	৫৮৮		সকলসাধনে জীবন পণ	...	৬০৭	
	সুবিশাল তাম্র ছাতায় পরিণত হইবে	...	৫৮৯		পিছনে চাহিলে কৃষ্ণপ্রভুরে পরিণত	...	৬০৭	
	হাতের মুঠায় প্রকাণ্ড শিবির	...	৫৮৯		প্রভুর-সমাধিতে কোধ উপশম	...	৬০৮	
	শক্তিমান পুত্রসংহারে পিতার চক্রান্ত	...	৫৯০		বীরস্রনার অভিযান	...	৬০৮	
	অসাধ্য আদেশের উদ্দেশ্য কি ?	...	৫৯০		সাহস অপেক্ষা চাতুর্য শ্রেষ্ঠ	...	৬০৯	
	সিংহ-রক্ষিত ঝরণার উদ্দেশ্যে	...	৫৯১		কৌশলে বাধা প্রতিহত	...	৬০৯	
	এক হাত মাছবের কুড়ি হাত দাড়ি	...	৫৯১		সামল্য অদ্রবর্তী	...	৬১০	
	ধূমরাশির অন্তরালে বিরাট দাড়ি	...	৫৯২		সঙ্গীতকারী বৃক্ষসমীপে	...	৬১১	
	বিকট-দৈত্যের ভয়ীপতি-সম্ভারণ	...	৫৯৩		স্বর্ণজলের মৃতসঞ্জীবনী শক্তি	...	৬১১	
	গদাঘাতে স্থলতান চূর্ণ	...	৫৯৩		জীবনদানের কৃতজ্ঞতা উজ্জ্বল	...	৬১২	
	মহিব্রহ্ম সাবাড়	...	৫৯৬		সুন্দরী পথ-প্রদর্শিকা	...	৬১২	
	সুন্দরী-হুল-গৌরবিনী পরীবাহু স্থলতান	...	৫৯৮		অভ্যাসার্ঘ্য দর্শনীরে সমাবেশ	...	৬১৩	
ঐর্ষান্বিতা ভগিনীমুগ্ধ				৫৯৯	মুগ্ধ-প্রমোদ	...	৬১৩	
	সুন্দরীর মনের কথা	...	৫৯৯		স্থলতানের প্রসাদ-লাভ	...	৬১৪	
	অনুষ্ঠের নির্ভুর পরিহাস	...	৬০০		পাখীর সুপারমর্শ	...	৬১৪	
	হিংসার দাবদাহ	...	৬০০		স্নেহের আকর্ষণ	...	৬১৫	
	অসময়ে প্রতিহিংসার সুযোগ	...	৬০১		প্রাসাদে সঞ্চর্চনা	...	৬১৬	
	স্থলতানার কুকুর-শাবক প্রসব !	...	৬০১		স্থলতান নিমন্ত্রণ	...	৬১৬	
	সুন্দর রাজপুত্র-শাভের সৌভাগ্য	...	৬০২		সম্মানিত অভিধির সঞ্চর্চনা	...	৬১৭	
	সুন্দরী রাজকন্যার পরিবর্তে ইহরহানা	...	৬০২		কাঁহুড় মিয়া মুক্তার ব্যঞ্জন	...	৬১৭	
	স্থলতানার কঠোর দণ্ড	...	৬০২		আকাশে সঙ্গীত-প্রবাহ	...	৬১৮	
	অপুত্রকের গৃহে আনন্দ-জ্যোৎস্না	...	৬০৩		পাখীর গানের অমিয় মাধুরী	...	৬১৮	
	অভিধি-সঞ্চর্চনার আগ্রহ	...	৬০৩		বিদ্যের অন্ধকার কোথায় ?	...	৬১৯	
					রহস্য-বনিকা অপসারিত	...	৬১৯	



স্বরঞ্জিত চিত্র

চিত্র	গল্প	পৃষ্ঠা	চিত্র	গল্প	পৃষ্ঠা
১। প্রবেশ	...	আবরণী	২৩। সম্মোহন কাদ	খুঁটান সঙ্গার	১৬৭
২। উপহার	...	প্রারম্ভে	২৪। চুশন-বিভূষণ	ভাণ্ডারী উপভাস	১৭৭
৩। উপহার	...	উপক্রমে	২৫। প্রণয়ের রিখ	চিকিৎসক	১৮৩
৪। প্রণয়-অভিধান	হৃচনা	৩	২৬। দৃষ্টিবালী	দরজীর কাহিনী	১৮৯
৫। অভিসারে	ঐ	৪	২৭। পিরীতের দায়	প্রথম লাতার কাহিনী	১৯৫
৬। রূপবিভ্রান্তে অশ্রুধারা	ঐ	১৭	২৮। সোহাগের হলনা	দ্বিতীয় লাতার কাহিনী	১৯৮
৭। গল্পের কুহক	ঐ	১৯	২৯। বাছুর ভেড়ী	চতুর্থ লাতার কাহিনী	২০৪
৮। প্রতিশোধ	সঙ্গার ও দৈত্য	২৩	৩০। লাক্ষনার প্রতিশোধ	পঞ্চম লাতার কাহিনী	২১০
৯। রহস্যপ্রকাশে নিরুত্তি	ঐ	২৪	৩১। প্রমোদ-ভোজ	সামসেল নীহার	২১২
১০। প্রেমের বর্ষা	দ্বিতীয় বৃক ও কুসুর	৩০	৩২। সৌন্দর্য-কুলনা	বেঙ্গেরা	২৫১
১১। মুক্তির মূল্য	মৎস্যজীবী ও দৈত্য	৩৪	৩৩। মিলন-মাধুরী	ঐ	২৬৫
১২। শান্তি	রুক্মিণীর রাজপুত্র	৫৪	৩৪। প্রাণহন্তার জীবনদান	আমজাদ আসাদ	২৮০
১৩। চরণ চুশন	তিন রাজপুত্র ও পঞ্চ রমণী	৫৭	৩৫। প্রেমিক প্রণয়	নৌরোদীন ও পারস্য রূপণী	৩০৬
১৪। দান-কৌতুক	ঐ	৫৮	৩৬। প্রণয়-নিবেদন	বানের ও রাজকন্তা	৩৩১
১৫। দাবা খেলা	অপরাধীর পুরস্কার	৭৭	৩৭। সমাধি-রক্ত	প্রণয়ের দাস গানেম	৩৫১
১৬। হাছ-বুদ্ধ	ঐ	৭৮	৩৮। প্রেম-প্রতিমা	জীন আলাস্‌নাম	৩৭৯
১৭। অসাধ্যসাধন	তৃতীয় কাণা ফকির	৮১	৩৯। প্রেম-অভিধান	দরিদ্রাবাদের রাজকন্তা	৩৮৯
১৮। প্রতিহিংসার পুরস্কার	জোবেলী	৯৫	৪০। প্রমোদ পেয়লা	আবুহোসেন	৪১০
১৯। সহস্র চুশন	আমিনা	৯৭	৪১। মিলন-উৎসব	আলাদীন	৪৫৮
২০। সর্প উপনিবেশে	সিল্‌বাম	১০৮	৪২। রূপণী ও রসিক	আলিবাবা	৫১৯
২১। প্রেমোৎপল	নৌরোদীন ও বদরোদীন	১৫৩	৪৩। বিমানে চম্পট	মায়-অব	৫৬৩
২২। অতিক্রান্ত বিপদ	রক্ত ও দর্জী	১৬২	৪৪। বিদায়-চুশন	আমেদ ও পরীবাহ	৫৭৭
			৪৫। রহস্য প্রকাশ	ঈর্ষাখিতা ভদ্রিনী-বৃগল	৬১৯



— রেখা-চিত্র-সূচী —

চিত্র	পৃষ্ঠা	চিত্র	পৃষ্ঠা	
১। বন্ধিনী রঙ্গিনী	...	৮	৩৪। সিন্দুকে প্রণয়ী সংগোপন	... ১২২
২। ঘোমটা খোলা	...	১৭	৩৫। পিরীতের ঝাতির	... ১২৬
৩। সহোদন-কাঙ্ক্ষিনী	...	১৮	৩৬। প্রেমরসিকের নারীসজ্জা	... ২০০
৪। জ্ঞান-রূপী দৈত্য	...	২০	৩৭। করুণাময়ীর দান	... ২০৮
৫। করুণা-উদ্বেক প্রয়াস	...	২৬	৩৮। দম্ভ-প্রমোদিনীর প্রেমরস	... ২১৩
৬। পরীর স্বামী উদ্ধার	...	৩০	৩৯। প্রথম মিলনে প্রেমের কাঁদ	... ২১৬
৭। কলসীর ভিতর দৈত্য	...	৩৪	৪০। বিদায় অশ্রুধারা	... ২২১
৮। কাটামুণ্ডের উত্তর	...	৪২	৪১। প্রেমিকের চম্পট	... ২২৩
৯। গৃহপ্রাচীরে হৃদয়-আবির্ভাব	...	৪৪	৪২। পত্রে প্রেমনিবেদন	... ২২৯
১০। রূপসীর ব্যাসাতী	...	৫৫	৪৩। প্রেম-প্রতিদানে জীবনদান	... ২৪৩
১১। হৃদয়-গৃহঘরে ছদ্মবেশী	...	৫৯	৪৪। মাতৃ-অনুরোধ	... ২৪৮
১২। সহোদর প্রণয়িনী	...	৬৫	৪৫। সৌন্দর্য-পরীক্ষা	... ২৫২
১৩। নয়নারী-নির্যাতন	...	৭৩	৪৬। প্রেম-প্রহেলিকা	... ২৫৮
১৪। অদৃষ্টের পরিহাস	...	৮৪	৪৭। মালীর আশ্রয়ে রাজপুত্র	... ২৬৭
১৫। রঙ্গিনী-কাকের বিদায় অশ্রুধারা	...	৮৮	৪৮। ছদ্মবেশিনীর প্রণয়ী পরীক্ষা	... ২৭৫
১৬। পক্ষিরাজ বোড়া	...	৯০	৪৯। প্রত্যাখ্যানের তিরস্কার	... ২৭৮
১৭। নিদারুণ চূষন	...	৯৮	৫০। রাজপুত্র-নির্যাতন	... ২৮৩
১৮। অশীম সমুদ্রে সাঁতার	...	১০৪	৫১। মদিরা-চূষনে বিপত্তি	... ২৮৬
১৯। রাহুঘের শিক-কাবাব	...	১১০	৫২। দাসবেশে রাজপুত্র	... ২৯০
২০। সমাধি-বিলাপ	...	১১৫	৫৩। মুক্তির আলোক	... ২৯৪
২১। নাছোড়বান্দা বুদ্ধ	...	১২০	৫৪। নিগৃহে অগ্রগৃহ	... ৩০২
২২। ভারত-সম্রাট-সকাশে	...	১২৪	৫৫। নিরাশ্রয়া হৃদয়	... ৩০৭
২৩। ক্রীতদাস-আলিঙ্গন	...	১২৮	৫৬। ব্যাঘ্র-কবলে	... ৩১২
২৪। জালে সিন্দুক	...	১৩২	৫৭। হৃদয়-ভাগের দাবী	... ৩১৫
২৫। সন্দেহক্রমে প্রিয়তমা-হত্যা	...	১৩৫	৫৮। আনমনা হৃদয়	... ৩১৯
২৬। সাধবীহতা দাসের সন্ধান	...	১৩৭	৫৯। দিবা-স্বপ্নের মোহ	... ৩২৭
২৭। বাসক-সজ্জা	...	১৪৫	৬০। ঘোমটা টানা	... ৩৩৩
২৮। হৃদয়-সোহাগ	...	১৪৮	৬১। বাহুরীর ইন্দ্রজাল	... ৩৪০
২৯। চিত্তার প্রশান্তি	...	১৫৮	৬২। মিলন-বশ সফল	... ৩৪৫
৩০। স্বভদ্রে চালান	...	১৬১	৬৩। শব্দধারে খালি-সোহাগিনী	... ৩৫০
৩১। অশ্রুজলে স্নানকমল	...	১৭০	৬৪। বীণার বন্ধারে প্রণয়-উদ্ধাস	... ৩৫৪
৩২। অবাচিত প্রণয়-প্রস্তাব	...	১৭৪	৬৫। উজীরের হৃদয়-সোহাগ	... ৩৫৮
৩৩। আত্মহারা প্রেমালিঙ্গন	...	১৮৩	৬৬। স্বভাবগত পেরিক্রিয়ন	...

চিত্র	পৃষ্ঠা	চিত্র	পৃষ্ঠা
৬৭। নিশাশেষে আশার স্বপ্ন	৩৬৯	৯০। লীলা বিনিময়ে বাছ	৫০৩
৬৮। স্বপ্নবেশীতে হীরক-প্রতিমা	৩৭২	৯১। পাখীর বাসার পাগড়ী	৫০৮
৬৯। মায়ারতরঙ্গীর অদ্বুত কাণ্ডারী	৩৭৪	৯২। মোহরের স্তূপ	৫১৩
৭০। সৌন্দর্যের উল্লীপনা	৩৭৮	৯৩। রূপের সঙ্গে রুমালের বন্ধন	৫১৯
৭১। মরু-প্রান্তরে মরুর প্রাসাদ	৩৮৩	৯৪। সুন্দরীর চাতুরী	৫২৬
৭২। সুন্দরী-সংহারোক্ত রাক্ষস	৩৮৬	৯৫। নৃত্য-লীলার দম্ভ্য-সংহার	৫৩৩
৭৩। আহত স্বামি-কোড়ে সাধ্বী	৩৯২	৯৬। গোলমালে অপমান	৫৩৯
৭৪। মরণাহত রাজপুত্রের জীবনদান	৩৯৭	৯৭। বালক বিচারক আহ্বান	৫৪২
৭৫। গোলাম-খানায় বাদশাহ	৪০০	৯৮। সুন্দরীর শয্যা-প্রান্তে	৫৪৮
৭৬। সুন্দরীর অজুলি-দংশন	৪০৬	৯৯। চোখে চোখে প্রেমের ভাষা	৫৫৩
৭৭। চোপরাও !	৪১১	১০০। সুন্দরী-ধ্বংস	৫৫৮
৭৮। ভূতাক্ষকে নিদ্রিত চালান	৪১৯	১০১। আশার আলোক-দীপ্তি	৫৬২
৭৯। রত্ননিগণ সঙ্গে নৃত্য-উজ্জাস	৪২২	১০২। আসনের মহিমা	৫৬৬
৮০। মরণে আদায়	৪২৬	১০৩। প্রেমিকার নবজীবন	৫৭১
৮১। প্রেমিকের মৃত্যু-নির্ণয়	৪৩১	১০৪। পরীর কর-চূষন	৫৭৫
৮২। মায়াবীর বাছ	৪৩৮	১০৫। করুণার আহ্বান	৫৮৪
৮৩। দৈত্য-সম্মুখে	৪৪১	১০৬। লৌহ-গদাধারীর শুভাগমন	৫৯২
৮৪। প্রেমিক-প্রবোধ	৪৫০	১০৭। অবাচিত দান	৫৯৮
৮৫। আশ্চর্য-প্রদীপ বদল	৪৬৩	১০৮। ছুরিতে জীবন পরীক্ষা	৬০৩
৮৬। স্বরাপানে ঘুম-তরঙ্গ	৪৭২	১০৯। বাস্তব পাখী-শাত	৬১০
৮৭। কুহকীর লীলাসমাপ্তি	৪৮০	১১০। পাখীর ভবিষ্যৎ বাণী	৬১৫
৮৮। চপেট-উপহারে ধস্তবাদ	৪৮২	১১১। মিলনের আনন্দ-উৎসব	৬২০
৮৯। সুন্দরীর বস্ত্রপ্রান্ত চূষন	৪৯৪		





প্রণয় অভিযান

হুলতান কনিষ্ঠের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে একটি প্রাণদান নির্ধারণ করেছিলেন, সেই প্রাণদানটি হুলতানের প্রাণদানের সন্নিবেশে, এই উত্তর প্রাণদানের মধ্যে উল্লেখ্য ভিতর দিয়ে একটি গুপ্ত-পথ ছিল। শাহজাহানের প্রাণদান হুলতানের আদেশে হুলতানের সন্নিবেশেই ছিল।

হুলতানের নিকট হইতে মিথ্যে বলাই, শাহজাহানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আসিলেন—যদিও বঙ্গ-পরিবর্তনের পর আবার হুলতানের নিকট গমন করিলেন। যেদিন হুলতান আসিলেন তখন হুলতান কত দীর্ঘকাল পরে উত্তর দিক দিক হুলতানের পর করিতে পারিলেন। তখন একই দিনে হুলতান করিলেন, তাহার পর আবার গমন আরম্ভ হইল। রাত্রি অধিক হইলে, শাহজাহান বিরাম-কামনার হুলতানের প্রাণদান ত্যাগ করিলেন।

কিন্তু শাহজাহানের অশ্রু বিপ্রানব্ব হল না। দীর্ঘকাল পরে সহানুভূতির সহিত জানিলেন শাহজাহান তাঁহার দ্রুতগতির কথা বিবৃত হইয়াছিলেন, সে সকল কথা পুনর্বার তাঁহার মনে উদয় হইল। একাকী শয়ন করিয়া, তিনি ঘোরতর চিন্তার নিমগ্ন হইলেন। তাঁর ব্যাভিচারের কথা মনে মনে যতই আশ্রয়ণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার চিত্তকোষ বাড়িয়া উঠিল।

রাত্রি গভীর হইল, কিন্তু চিন্তার বিরাম নাই, নিদ্রাও নাই। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তিনি শয্যা পড়িয়া ছটুট করিলেন। পরদিন তাঁহাকে দেখিয়া হুলতান ভাবিলেন, শাহজাহানের মনে এমন কি কষ্ট যে, তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, মনে অসুস্থতা নাই, আমি তাঁহার প্রতি স্নেহ-স্বপ্ন সন্ধান প্রকাশ্যে ক্রটি করি নাই; হুলতান আমার ব্যবহারে তিনি যে অসন্তুষ্ট হইয়া বিমর্ষ হইয়াছেন, তাহা বোধ হয় না। দেশ হইতে বহু দূরে আসিয়াই কি তাঁহার মনে দুঃখ হইয়াছে, প্রিয়তমা তাঁর বিরোধে কি এত কাতর হইয়াছেন? তাহাই যদি হয়, তবে শীঘ্র তাঁহাকে তাঁহার রাজধানী সমরকন্দে পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। এই স্থির করিয়া, হুলতান তাঁহার রাজভাণ্ডার হইতে উৎকৃষ্ট ব্রহ্ম ও মূল্যবান হীরকস্বর্ণাদি শাহজাহানকে উপহার প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও শাহজাহানের মনে স্নেহের উদয় হওয়া দূরের কথা, তিনি প্রতিদিন অধিকতর বিমর্ষ হইতে লাগিলেন।

একদিন প্রত্যহ শাহজাহান মুগ্ধা করিতে বাইলেন, এই আদেশ-বোধনা করিলেন। হুলতান শাহজাহান মনে করিয়াছিলেন, সহোদরকে মুগ্ধার লইয়া গেলে হয় ত তাঁহার মনের বিষন্নতা বিদ্রুত হইতে পারে। নগর হইতে ছই দিনের পথ দূরে মুগ্ধার বাগা ছিন্ন হইল। কিন্তু শাহজাহানকে হুলতানের সহিত মুগ্ধার গাইবার জন্য অনুরোধ করার, তিনি তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া প্রাণে থাকিবার অমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি একাকী উপবন-প্রান্তবর্তী প্রাঙ্গণে শয়ন করিয়া রহিলেন। চতুর্দিকে হুলতান হুলতান-বিশেষণ গুপ্ত, গাধীর শিষ্ট গান, বাঘের মধুর বিলোপ; কিন্তু এ সকল তাঁহার ভাল লাগিল না, তিনি কেবল তাঁহার দ্রুতগতি : মহাবীর বিশ্বাসব্যক্ততার কথাই ভাবিতে লাগিলেন।

শাহজাহান একমনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বাতায়ন-দুখে এক অসুস্থ দৃষ্ট দেখিয়া একবারে স্তম্ভিত হইলেন;—দেখিলেন, হুলতানের প্রাণদানের একটি গুপ্তদ্বার আশ্রয় হইতে বুঝিয়া গেল, আর লতানের মনোমোহিনী, অপরাধ হুলতান মহাবীর, কুড়িল্লন কিছরীর সহিত মূল্যবান কোমলতার সন্নিবেশ হইয়া, সেই প্রাণদান-প্রান্তবর্তী উপবনে প্রবেশ করিল। হুলতান-মহাবীর জাবিরহীন, শাহজাহানও লতানের সঙ্গে মুগ্ধার পিঠাছেন, হুলতান মহাবীর শাহজাহানের শয়নকক্ষের নিকটে আসিতেও সক্ষম হইল না। শাহজাহান হুলতান-মহাবীর কাণ্ড দেখিবার জন্য সন্নিবেশের নিকটে আসিয়া বাহিরের দিকে

হুলতান
প্রাণ-
দান

চাহিয়া রাখিলেন। তাঁহাকে কেহই দেখিতে পাইল না। মহিষীর সঙ্গিনী তাহাদের বস্ত্রাদি খুলিয়া ফেলিল। তখন শাহজাহান সন্নিহনে দেখিলেন, সেই বিশজনের সকলেই নারী নহে, তাহাদের মধ্যে দশ জন কন্যা ও দশজন সুলতানের উপপত্নী। দশ জন উপপত্নী বা সহচরীর সহিত দশ জন খেতকার দাস সন্নিহিত হইল; মহিষীকেও বেজোড় অবস্থায় থাকিতে হইল না, মহিষী করতালি ধ্বনি করিয়া আনন্দ করিল, “জীবনমুখা, স্বয়ংবরভক্ত, মাহুদ!” তৎক্ষণাৎ একটা গাছ হইতে বিগুলকার, কুংসিতদর্শন যৌবনকর্ণ কাঞ্চী তাহার ভাঁটার দ্বারা রক্তবর্ণ গোলাকার চক্ষুগুণ বিক্ষারিত করিয়া নামিয়া আসিয়া, সুলতানার সহিত আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইল।

সুলতানার
বন-বিহার



এই সকল পুরুষ ও রমণী তখন যে বীভৎসকার্যে প্রবৃত্ত হইল, যে ভাবে তাহারা কাম-ক্রিয়ার উন্নত হইয়া উঠিল, তাহার বর্ণনা দ্বারা লেখনীকে কল্পিত করা আমাদের পক্ষে অসাধ্য। সুলতান-মহিষী এই কুংসিতদর্শন দৃঢ়কার কাঞ্চী দাসের সহিত বৈরূপ নিম্নজ্ঞভাবে বিহার করিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া শাহজাহানের অন্তর যুগার শিহরিয়া উঠিল। এমন অপূর্ণ সুন্দরী, লোকমোহিনী তরুণী, শাহরিয়ারের দ্বারা প্রিয়দর্শন দেবকান্ত রূপ, ঐশ্বর্য্য, শক্তি ও খ্যাতির আধার স্বামীর অঙ্গলক্ষী হইয়াও কি করিয়া এই বীভৎসদর্শন পুরুষের আঁকে আপনাকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিতে পারে, ইহা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য! অস্বাভাব্য নারীরা খেতকার দাসগণের সহিত ইঞ্জিয়বৃত্তি চরিতার্থ করিতেছিল। তাহা বরং তাহাদের কঠিন সমর্থক; কিন্তু অপরূপ সুলতার পক্ষে বীভৎস, কদাকার কাঞ্চী পুরুষ!—শাহজাহান বাতায়নের অন্তরালে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

শাহজাহান সুলতান-মহিষীর ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া বুকিলেন, তাঁহার অগ্রজ সুলতানের জীবন তাঁহার অপেক্ষা আদৌ সুখের নহে। মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত এই সকল স্ত্রী-পুরুষ নানাবিধ উৎকট ও কুংসিত আমোদ-প্রমোদে মত্ত রহিল। তাহার পর তাহারা নিকটস্থ পুকুরিগিতে অবগাহন করিল, এবং স্ব স্ব পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া যে গুপ্তপথে তাহারা উদ্ভানে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথেই প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিল। মহিষীর উপপতি মাহুদও প্রাচীরের উপর দিয়া বৃক্ষান্তরালপথে অদৃষ্ট হইল।

সমস্ত ঘটনা স্বপ্নের মত চক্ষুর উপর ঘাটরা গেল। শাহজাহান মনে মনে বলিলেন, ‘আমার দুর্ভাগ্যই যে সকল অপেক্ষা শোচনীয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব? বোধ করি, ইহা সকল স্বামীরই অদৃষ্টে সমানভায়ে বস্ত্রি থাকে; কারণ, আমার বিশ্ববিজয়ী ভ্রাতা রাজরাজেশ্বর সুলতানও তাঁহার অসতী স্ত্রীর ব্যভিচার নিবারণ করিতে পারেন নাই, দেখিতেছি। তাহা হইলে আমি অনর্থক দুঃখ করিয়া মরি কেন? বাহা সকল স্বামীর অদৃষ্টে ঘটে, তাহা আমার অদৃষ্টেও ঘটনাছে। আমি আর দুঃখ করিব না, আক্ষেপকে আর মনে স্থান দিব না, মনের শান্তি নষ্ট করিব না।’ এই সকল কথা চিন্তা করিয়া শাহজাহান দ্রুতিত্বা পরিভ্রাণ করিলেন, মন প্রকল্প করিলেন; সুলতান-মহিষী ও তাঁহার সঙ্গি-সঙ্গিনীগণের আমোদ-প্রমোদ দেখিতে রাষ্ট্র গভীর হইয়াছিল, গভীর রাষ্ট্রকেই আহ্বার করিতে হইল। কিন্তু আজ আর আহ্বারে পূর্ব্ববৎ অঙ্গুচি রহিল না, তিনি কঠিন সহিত পাণ্ডিত্য আহ্বার করিলেন, এমন কি সমরকন্দ ত্যাগ করিবার পর আর একদিনও তিনি উদার পূর্ণ করিয়া এ ভাবে আহ্বার করেন নাই। তাঁহার আহ্বারকালে যে গীতাবৃত্ত হইতেছিল, তাহাও তিনি সঙ্কটমনে উপভোগ করিলেন।

দশ-
তত-
পং

এই ঘটনার পর যথাকালে সুলতান যুগ্ম হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে শাহজাহান তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। এবার তাঁহার মনে বিধ্বস্ততা ছিল না। দুঃখ-শোক অপগত, মুখ সমাধি হাসিতেছিল, প্রাসাদে

আমার মুখে হঠাৎ উঠেছিল; হুলস্থলন শাহরিয়ার প্রাণে তাঁহার সহোদরের এই পরিবর্তন কখনও
নাই, কিন্তু তাহা পরে লক্ষ্য করিয়া জাভাকে বলিলেন, “ভাই, পরমেশ্বরকে বশবাস্য যে, আমি সূর্য্যাস
বাওয়ার পর তোমার হৃৎকণ্ড বিবাহ দূর হইয়া মুখে হাসি বাহির হইয়াছে। আমি ইচ্ছা করি তুমি
হইয়াছি, এখন তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, রাখিবে?”

“অবশ্য”—শাহজামান বলিলেন, “অবশ্যই রাখিব, আপনার কোন অনুরোধ? আমি অগ্রাহ্য করিতে
পারি? আপনার বাহা ইচ্ছা বলিতে পারেন। আপনি কি আশা করিবেন, জানিবার জন্য আমি
ব্যাভুল হইয়াছি।”

হুলস্থলন তাঁহার জাভার বিষমভাব ও হঠাৎ প্রকলিত-শান্তির কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, “তোমার
হৃৎকণ্ড-বিবাদের যে সকল কারণ স্থির করিয়াছিলাম, তাহার একটাও যেহেতু তাহা নষ্ট হইয়াছে, তাহা আমার বিশেষ
অনুরোধ, তুমি প্রকাশ করিয়া বল, প্রথমে তুমি বিবাহ ছিলে কেন, পরে তাহা হইতে হুজি বা কোথা
হইতে আসিয়া জুটিল?”

শাহজামান হুলস্থলনের প্রশ্নে কিয়ৎকাল চুপ করিয়া রহিলেন, অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে তিনি
বলিলেন, “আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আমার পুজনীয় ব্যক্তি; আপনি আমার মুখে আপনার প্রশ্নের
উত্তর শুনিবার জন্য কোতূহল প্রকাশ করিবেন না, আপনার কোতূহল নিবারণ করি, আমার সে সামর্থ্য নাই।”

হুলস্থলন এই কথা শুনিয়া আরও অধিক কোতূহল প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “হী, তোমাকে বলিতেই
হইবে, আমার অনুরোধ তুমি অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না।” তখন শাহজামান বলিলেন, “আমি আপনার
আদেশের প্রথমার্শ পালন করিব, অর্থাৎ কেন আমি বিবাহচিহ্নে কালামাপন করিতেছিলাম; তাহার কারণ
বিস্তৃত করিব; কিন্তু কেন আমার স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিল, মনের প্রকলিত ফিরিয়া পাইলাম, তাহার
কারণ জানিবার জন্য অনুরোধপূর্ব্বক আমার পীড়াপীড়ি করিবেন না।” শাহরিয়ার বলিলেন, “ভাল তোমার
বিবাহের কারণই আমাকে খুলিয়া বল, শুনি।” “তবে শুধুন”, বলিয়া সমরকন্দ হইতে বাজাকালে
শাহজামান তাঁহার মহিষীর যে আচরণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন, হুলস্থলনের নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন এবং
বলিলেন, “ইহাই আমার জ্যেষ্ঠ ও বিবাদের কারণ; ইহা কি যথেষ্ট হৃৎকণ্ডের কথা নহে? অসীম
কমতাপন্ন রাজার জীব ও যদি বিবাস্যভিত্তি হয়, তবে আর কে যত্ন পত্রকে বিশ্বাস করিবে?”

হুলস্থলন বলিলেন, “ভাই, তোমার কথা শুনিয়া আমি একেবারে হতবুদ্ধি হইয়াছি। বাহা হউক, তুমি সেই
পাপিষ্ঠা ও তাহার উপপতির প্রাণদণ্ড করিয়াছ, তাহা অতি উত্তম কার্য্যই হইয়াছে। একজন আমি তোমার
প্রশংসা করি, আমি কিন্তু এ অবস্থার পক্ষে এত সহজে ক্ষান্ত হইতাম না; আমি একটি রক্ষণীয় প্রশংসা
করিয়াই স্থির হইতাম না, আমি আমার ক্রোধশক্তি করিতে সহস্র রমণীর প্রাণদণ্ড করিতাম। তোমার হৃৎকণ্ডের
কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস দূর হইয়াছে, তোমার আক্ষেপের যথেষ্ট কারণ আছে। বোধ হয়, এমন আর কাহারও
অনুরোধ ঘটে না, তোমার বড় দুঃখ। বাহা হউক, আজ তোমার মনে শান্তি দান করিয়াছেন, একজন আমি
পরম সুখী হইয়াছি। কিন্তু তোমার জ্যেষ্ঠ ও হৃৎকণ্ড হইল, সহসা কি জন্ম আবার প্রকল হইলে,
এখন সেই কথা খুলিয়া বল, শুনিতে আমি বড়ই উৎসুক হইয়াছি।”

শাহজামান দেখিলেন, এবার হুলস্থলনের কথার উত্তর দেওয়া আরও কঠিন, কিন্তু হুলস্থলনের পুনঃ পুনঃ
অনুরোধে তিনি আর সে কথা আর পোষণ করিতে পারিলেন না। বলিলেন,—“আপনি বাহা বলিতে আদেশ
করিতেছেন, তাহা আমাকে বলিতেই হইবে; কিন্তু হুলস্থলন। আমি বেশ বুঝিতেছি যে, আমার কথা

প্রাণের হারি
মুখে হুলস্থলন
কেন?

হুলস্থলনের
নিকট হৃৎকণ্ড-
বহত প্রকাশ

শুনিয়া আপনি অন্তরে বড় বেদনা পাইবেন, আমার অপেক্ষাও আপনাকে অধিক দুঃখ ও বিষম হইতে হইবে। এ সকল কথা আমার অন্তরে লুকান থাকাই উচিত ছিল।”—সুলতান শাহরিয়ার বলিলেন, “ভাই, আর কখনো আরও বিলম্ব করিও না, তোমার কথার আমার কোতুলক সহস্রগুণে বাড়িয়া গেল। তুমি সকল কথা এই দণ্ডে খুলিয়া বল।” তখন শাহজামান সুলতান-মহিবীর নৈশ-আমোদ-প্রমোদের কাহিনী আত্ম-বর্ণনা করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—“এই পৈশাচিক ব্যাপার দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে, সকল জীবলোকই এই প্রকৃতির; কেহই কামপ্রবৃত্তি দমন করিতে পারে না। সংসারের গতিই যখন এইরূপ, তখন অসতী জীবর ব্যবহারে কোন স্বামীরই অস্বপ্নী হওয়া উচিত নহে, আমি এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আর এই জন্তই আমি মনের কষ্ট ও অস্থখ তাগ করিতে পারিয়াছি। যদিও মন সংবৃত্ত করিবার জন্ত আমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছে, কিন্তু সুলতান দেখিতেছেন, আমার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে। এ বিষয়ে যদি আপনি আমার সহিত একমত হন, তাহা হইলে আপনিও আমার ভায় সকল ক্ষোভ পরিত্যাগ করুন।”

কিন্তু সুলতান সহোদরের এ পরামর্শে মন স্থির করিতে পারিলেন না। তিনি কোথেকে গর্জন করিয়া ভ্রাতাকে বলিলেন, “কি বলিলে? পারস্ত-সুলতানের মহিষী বাত্চিরণী, পরপুরুষে আসক্ত! না, আমি কখন ইহা বিশ্বাস করিব না। হী, তবে যদি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারি, তাহা হইলে বিশ্বাস করা বাইতে পারে। আমি এ কথা বলি না যে, তুমি আমার সঙ্গে প্রতারণা করিতেছ, কিন্তু আমি তোমার কাছে এ বিষয়ের প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই।”

শাহজামান বলিলেন, “যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চান, তবে তাহা প্রমাণ করা বড় কঠিন কার্য হইবে না। আপনি পুনরায় সুগয়াযাত্রার কথা ঘোষণা করুন, আমরা দলবলে নগরতাণ করিব, কিন্তু পরে আবার গোপনে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিব, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, রাত্রি আমি আপনাকে সে নৈশ-বিহার প্রত্যক্ষ দেখাইতে পারিব।”

সুলতান ভ্রাতার প্রস্তাব সন্তোষে জ্ঞান করিয়া, সুগয়া যাত্রার আদেশ প্রচার করিলেন। নগরের সর্বত্র তাঁহাদের সুগয়া যাত্রার কথা বিবোষিত হইল। সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা মহাসমারোহে যথাকালে সুগয়ার যাত্রা করিলেন, শিবিরসংস্থাপন করিয়া তাঁহারা সেখানে রাত্রি পর্যন্ত অপেক্ষা করিলেন, তাহার পর সুলতান প্রধান উজীরকে ডাকিয়া বলিলেন, “আমি এখনই স্থানান্তরে যাইব, তুমি শিবিরে আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে, কাতাকেও আমার অস্থগস্থিতির কথা জানাইবে না।”

অনন্তর সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা অশ্বে আরোহণ করিয়া, অন্তরে অগস্ত থাকিয়া গোপনে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন এবং শাহজামানের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। শাহজামান যেখানে পাড়াইয়া সুলতান-মহিবীর বীড়স আচরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অন্ধকারে আশ্রয়গোপন করিয়া সেই বাতায়নের সম্মুখে আসিয়া পাড়াইলেন।

তাহার পর পূর্বে যেমন হইয়াছিল, সেইমanner ও তাহাই হইল। দশ জন কিসরী ও দশ জন ক্রীতদাস নগরদেহে কামক্রীড়ার মত্ত হইল, মহিবীর উপপতি সেই কক্ষবর্ণ কাফ্রীটাও গুপ্তহান হইতে মহিবীর আশ্রানে বাহির হইয়া আসিয়া, নগরদেহে মহানন্দে মহিবীর সহিত বীড়স ক্রীড়ার যোগদান করিল। সুলতান যে পক্ষীয় বিধানের জন্ত তিনি সকল সময়েই উৎকণ্ঠিত থাকিতেন, তাঁহার সেই প্রিয়তমা, লোক-সঙ্গ-বৃত্তি স্থানরীকুল-পৌরবিনী মহিষী, তাহারই এক জন ক্রীতদাস—অসভা, বর্কল, কক্ষকার, কুংসিতদর্শন লবঙ্গ-কায়িক

সুলতান!
চচারিখী?
সম্ভব!



নৈর
নি-
পন
—

সহিত কামোদ্ভূতা হইয়া ইন্দিরলালসা চরিতার্থ করিতেছে ! শাহরিয়ার বিষম-বিমুক্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সেখানে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিলেন।

মহিষী ও তাঁহার সচ্চরিত্রগণের আবেদন-প্রমোদ শেষ হইলে সকলে স্ব স্ব স্থানে, স্থানাতে বেশত্বা পরিধান করিয়া চলিয়া গেল। সুলতান রাগে, হুশার, অশ্রুধারা আভ্যন্তরিত মত হইয়া বলিতে লাগিলেন, “কি লজ্জা ! —কি হুশা ! আমি অর্ধপৃথিবীর অধীশ্বর, আমার প্রীত এই ব্যবহার ! একটা কাক্সার শিরিতে সে এভাবে হাবুডু খাইতেছে !! আমার পত্নী যখন একরূপ কার্যা করিতে পারিল, তখন আর কোন্ পুরুষ আপনাকে হুখী মনে করিবে ?” অনন্তর সুলতান তাঁহার ভ্রাতাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন,—“ভাই ! চল আমরা এ সংসার ত্যাগ করি, সতীত্ব পৃথিবীতে নাই, আমরা এ রাজ্য হইতে অস্ত্র কোন রাজার রাজ্যে চলিয়া যাই, সেখানে অজ্ঞাতবাস করিব ; এ অপমান ও লজ্জা গোপন করিবার চেষ্টা করিব।” শাহজাদান সুলতানের এই প্রস্তাব সন্তোষ জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু তাঁহার ভ্রাতার মনের গোচরী অবস্থার কথা চিন্তা করিয়া প্রতিবাদও করিতে পারিলেন না ; হুতরাং বলিলেন, “সুলতান ! আপনি বাহা বলিলেন, আমাকে তাহাই পালন করিতে হইবে, আমার ইচ্ছার কোন কাজ হইবে না। আপনার ইচ্ছাক্রমেই আমি চলি, কিন্তু একটি বিষয়ে আপনাকে অস্বীকার করিতে হইবে, কোথাও যদি আমার আশ্রয়স্থানের অভাব থাকে, তাহা হইলে তাহা দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমার আশ্রয় রক্ষা প্রত্যাপন করিব।”

সুলতান বলিলেন, “ভ্রাতা, আমি তাহাই অস্বীকার করিলাম, কিন্তু আমার অশেষ আশ্রয় হইতে তাহার সহিত যে কোথাও আশ্রয়ের সন্ধান হইবে, এক্ষণে আমার অস্থান হইবে না।” —বাহারারি বলিলেন,—“এ বিষয়ে আপনার সহিত আমার মতভেদ আছে। আমার বিবাহ, আমাদের অধিক দূর হইতে হইবে না।” এইরূপ আলোচনার পর উভয় ভ্রাতা গোপনে রাজধানী ত্যাগ করিলেন এবং বহুজন নিবাসস্থান না হইল, ততক্ষণ চলিতে লাগিলেন। হুখ্যস্তের পর চতুর্দিক অন্ধকার হইলে উভয় ভ্রাতা একটি বৃক্ষের রাশিবাগান করিলেন ; প্রভাত হইলে আবার যাত্রা আরম্ভ করিলেন। এইভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে তাঁহারা সমুদ্রতীরে একটি প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। হৃদয়ীর্ণ হৃদয় প্রান্তর, কিছুদূর অতি সুস্থ মনোহর। এই অরণ্যের একটি বৃক্ষতলে উপবেশনপূর্বক উভয়ে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহাদের স্ব স্ব প্রীত সতীত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ রহিল না।

উভয়ে বসিয়া আলাপ করিতেছেন, এমন সময় সমুদ্রের দিকে তাঁহারা অতি ভয়ানক ঝড় আসিয়া পাইলেন, তাহার পরই অতি করুণ-রোদনজনিত তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। সেই শব্দে তাঁহারা পর্বত প্রতিক্রমিত হইতে লাগিল। অবশেষে সমুদ্রবক বিদীর্ণ করিয়া একটি ভক্ত ভৌমিল, সেই ভক্তের অশ্রুধারা নেন আকাশ স্পর্শ করিল ! এই অশ্রুত মুক্ত দেখিয়া সুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা মহাভীত হইলেন, উভারা যে বৃক্ষমূলে বসিয়াছিলেন, তাহার পাখার আশ্রয়ে পূর্বক ব্যাপার কি, তাহাই দেখিতে পারিলেন না। তাঁহারা শব্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, সেই বৃক্ষবর্ণ তক্তা সতীত্ব পক্ষার্থের দ্বার দ্বীপে দ্বীপে তাঁহাদের অস্তিত্বই অগ্রসর হইতেছে। ব্যাপার কি, প্রথমে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু কিছুই তাঁহাদের বিষম দূর হইল।

তাঁহারা দেখিলেন, এই বৃক্ষবর্ণ বিরাট ভীষণ আর কিছুই নহে, একটি ভীষণাকৃতি দেবদেবতা। তাঁহার বর্ণ মেঘের রক্ত, আকারও সেইরূপ ভীষণ। তাঁহার মস্তকে একটি কাক্সার শির, তাহা নাড়িত বৃক্ষ শিতলের তালি দিয়া বদ্ধ করা। সেই ভীষণ দেবদেবতা আসিল, এবং তাঁহারা যে প্রান্তর পাশের

আশ্রয়
দেখতারা

যদিও এক
দ্বীপ-মস্তক
পৈতৃক
আদিভাব

বসিয়াছিলেন, সেই গাছের নীচে আসিয়াই সিদ্ধুক নামাইল। শাহরিয়ার ও শাহজাহান বুঝিলেন, দৈত্যের হাতে পড়িয়া অবিলম্বেই প্রাণ হারাইতে হইবে, আর রক্ষা নাই।

দৈত্যটা সেই বৃক্ষতলে বসিয়া তাহার কোমর হইতে চাবী বাহির করিয়া সিদ্ধুক খুলিলে একটি পরম-সুন্দরী লাবণ্যবতী যুবতী স্তম্ভিতভাবে সেই সিদ্ধুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। এই তরলীর দেহে যৌবন-লাবণ্য তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার কটিদেশ ক্ষীণ, মুখ মণ্ডল অপূর্ণ মাথুণো মণ্ডিত। দেহের বর্ণ পরিপূর্ণ শশাঙ্কে ও লজ্জা দেয়। এই তরী যুবতীর দেহকান্তি সমুদ্রতটকে যেন উজ্জ্বলিত করিয়া তুলিল। দৈত্য সেই সুন্দরীকে তাহার পাশে বসাইয়া তাহার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, “সুন্দরী! তুমি বড় রূপসী, আমি তোমাকে তোমার বিবাহসভা হইতে হরণ করিয়া আনিয়াছি, তাহার পর সর্বদাই তোমাকে কাছে রাখিয়াছি। তোমার প্রেম-রসের কেন্দ্রপুষ্পিত যৌবন-তরঙ্গে আমি ছাড়া কেহ বিহার করিতে পারে নাই। প্রিয়তমে, আমি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, এখন কিছুকাল ঘুমাইব, ঘুমে আমার চোখ ডাকিয়া আসিতেছে, তুমি আমার কাছে কিছুকাল বসিয়া থাক।” দৈত্য, সুন্দরীর কোলে মাথা রাখিয়া



শুইয়া পড়িল, তাহার দীর্ঘ পদদ্বয় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হইল। অল্প-কালের মধ্যেই দৈত্যের নাসাগর্জন আরম্ভ হইল, সেই শব্দে সমুদ্রতীর প্রকম্পিত হইতে লাগিল।

এদিকে সুন্দরী সহসা গাছের দিকে চাহিতেই শাহরিয়ার ও শাহজাহানকে দেখিতে পাইল। সে তাঁহাদিগকে নামিয়া আসিবার জন্ত ইঙ্গিত করিল। স্থলতান ও তাঁহার ভ্রাতা দেখিলেন, আর রক্ষা নাই, দৈত্যের হাতে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে, সুতরাং তাঁহাদের ভয় শতগুণ বাড়িয়া উঠিল। তাঁহারা সাহসে ইচ্ছিতে জানাইলেন—বে, তাঁহারা বেখানে আসেন, সেখানেই থাকিবেন, বৃক্ষ হইতে

নামিবার ইচ্ছা নাই, এবং সে জন্ত বেন আর অক্লেশ করা না হয়। যুবতী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দৈত্যের নিক্ত ধীরে ধীরে তাহার উৎসর্গ হইতে মাটির উপর নামাইয়া রাখিয়া উঠিয়া পাঁজাইল এবং ফুৎ, ফুৎপুর করে বলিল, “নামো, আমি বলিতেছি নামো; যদি না নামো, আমি এই দৈত্যকে এখনই জাগাইব, সে উঠিয়াই তোমাদের প্রাণবধ করিবে।”



সুন্দরী পুনঃ পুনঃ তাঁহাদিগকে নামিবার জন্ত ইঙ্গিত করিতে লাগিল। জলতান ও তাঁহার ভ্রাতা আর আপত্তি করিতে সাহস করিলেন না। অতি সাবধানে তাঁহারা নীচে নামিলেন। সুন্দরী তাঁহাদের নিকটে আসিয়া হাত ধরিল এবং অবিলম্বে তাহার ইন্দিয়লাপসা-পরিতৃষ্টির আগ্রহ জানাইল। তাঁহারা প্রথমে এই গর্হিত প্রস্তাবে অসম্মত হইলেন, কিন্তু সুন্দরী বলিল, “আমার কামপিপাসা নিবারণ না করিলে আমি তোমাদিগকে ছাড়িব না, এখনই দৈত্যকে জাগাইয়া তোমরা আমাকে কুৎসিত ইঙ্গিত করিয়াছ বলিয়া তোমাদিগকে ইহার হস্তে সমর্পণ করিব।” ভ্রাতৃদ্বয় কাতর ভাবে অহুসার সহকারে বলিলেন, “ভয়ে! ভগবানের দোহাই, আনাদিগকে এই পাণকাথো প্রলুব্ধ করিও না। আমরা এইরূপ প্রলোভনের পথ ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। বিশেষতঃ তোমার এই স্বামীটিকে দেখিয়া আমরা আতঙ্কে অভিভূত হইয়াছি।”

বাসনাভাঙিতা নারী তাঁহাদের অহুসার-বিনয়ে বিম্বাহার বিচলিতা হইল না। সে নানাপ্রকার ভাবভঙ্গী সহকারে তাঁহাদের প্রথম রিপুকে উদ্বেজিত করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “বাক্য বকিও না। আমার বধন প্রয়োজন, তখন তোমাদিগকে আমার বাসনা মিটাইতেই হইবে। নহিলে আমার স্বামীকে দিয়া এখনই তোমাদিগকে প্রাণে মারিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দিবার ব্যবস্থা করিব।” শাহরিয়ার তখন উপায়াস্তর না দেখিয়া সহদানরকে বলিলেন, “ভাই, তুমি তবে উহার আদেশ পাগল কর।” শাহজামান বলিলেন, “অগ্রে আপনি পথ প্রদর্শন করুন।” মনোগত অভিপ্রায়, এইভাবে যদি নারীকে জুলিয়া সমর পাওয়া যায়। কিন্তু চতুরা মোহিনী বলিয়া উঠিল, “তোমরা বৃথা তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করিতেছ। তোমরা উত্তরেই যদি আমার কামনানলে আহুতি না দেও, তবে কাহারই নিস্তার নাই।” শাহরিয়ার ও শাহজামান অগত্যা তখন যুবতীর পাশ-প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে যুবতীকে পরিতুষ্ট করিলে সে অত্যন্ত সুখী হইয়া তাঁহাদের প্রশংসাবাদ করিল। তারপর সে অলবরণ হইতে একটি মুজাধার বাহির করিয়া একটি মালা দেখাইল। ভ্রাতৃদ্বয় দেখিলেন, সেই মালাটি মূল্যবান অকুরীর দ্বারা এখিত। হস্ত-ফুরিতাথরে সুন্দরী বলিল,—“এগুলি কি জান?” জলতান বলিলেন, “কিরূপে জানিব? তুমি যদি বল, তাহা হইলেই জানিতে পারি।”

হাসিমুখে সুন্দরী উত্তর করিল, “আমি বাহাদের প্রশংসাবাদে তৃপ্ত করিয়াছি, তাহাদের প্রত্যেকের অঙ্গুলী হইতে এক একটি আঙটা লইয়া রাখিয়াছি। ইহাতে ৫ শত ৭০টি অকুরীর আছে। তোমাদের দুই ভ্রাতার দুইটি অকুরীর আমাকে দাও। দেখ এই হৃৎকৃত দৈত্য আমাকে কত সাবধানে রাখিয়াছে, তথাপি আমি তাহার চোখে ধূলা দিয়া এতগুলি উপশতি করিয়াছি। সে তাহিরাছিল যে, আমার এই জ্বলন্ত জ্বলন্ত সন্মত বল সে একাই জোণ করিবে। অতঃপর তাহাতে ভাগ বসাইতে পারিবে না। কিন্তু সে আমাকে শিষ্টক পুষ্টি লাভের নীচে ফেলিয়া রাখিলে আমি তাহার উদ্বেগ ব্যর্থ করিয়াছি। ইহা হইতেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, বধন কোন রকমের কর্তব্য করিবার সময় করে, তখন পতি বা উপশতি, সেই সময় দ্বারা বহন করিতে পারে না। যুবতী বেন প্রীতলাপসক অধিক বক্তব্য মনো না রাখে, জায়া হইলেই অকুরীর কলিক কলিক করিয়া



বৃত্তী অতঃপর উত্তর ভ্রাতার নিকট হইতে দুইটি অল্পরায় লইয়া মাগার প্রথিত করিয়া চুলনদানে বিদায় লইল। তারপর দৈত্যের মস্তক মাটি হইতে কোলে তুলিয়া লইয়া পূর্ববৎ বসিল। —হুলতান ও তাঁহার ভ্রাতাকে অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিবার জন্ত ইঙ্গিত করিল।

হুলতান-ভ্রাতৃদ্বয় যে পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রস্থান করিলেন। দৈত্যের দৃষ্টিপথ ছাড়িয়া অনেক দূর আসিলে, শাহরিয়ার শাহজাহানকে বলিলেন, “ভাই, আজ আমরা যাহা দেখিলাম, এ সম্বন্ধে তোমার কি বলিবার আছে? এই দৈত্যের সাবধানতার পরিণতি দেখিলে ত? তাহার অবস্থা কি? আমাদের অপেক্ষাও শোচনীয় নহে? স্ত্রীলোকের দুরভিসন্ধি যে কত ভয়ানক, তাহার কিছু সন্দান পাইলে কি?” শাহজাহান বলিলেন, “আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। এই দৈত্য আমাদের অপেক্ষাও অধিক হতভাগ্য। অথচ সে আমাদের অপেক্ষা কত অধিক শক্তিশালী। কিন্তু হুম্মরী রমণীকে কঠোর নির্যাতনের ভিতর রাখিয়াও তাহার সত্যি রক্ষা করিতে পারে নাই। আমরা যাহা খুঁজিতে বাহির হইরাছিলাম, তাহা ত দেখিলাম, এখন চলুন, রাজ্যে ফিরিয়া যাই। অতঃপর পুনর্বীর বিবাহ করাই আমাদের সম্ভব হইবে। আমার কথা যদি বলেন, তবে আমি এই বলিতে পারি যে, আমার স্ত্রীর সত্যি স্বরূপের উপায় অবলম্বন করিব। সে উপায় কি, তাহা এখন আপনার নিকট প্রকাশ করিব না। আমার বিশ্বাস আছে, একদিন সে কথা আপনি জানিতে পারিবেন ও আমার দৃষ্টান্তের অমূল্যত্ব করিবেন।” হুলতান ও তাঁহার ভ্রাতা তৃতীয়দিন রাত্রিতে তাঁহাদের শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন।

আর মুগ্ধতা করা হইল না। শাহরিয়ার রাজধানীতে ফিরিয়া একবারে তাঁহার মাইবীর সহিত সাক্ষাতের জন্ত অন্তরে প্রবেশ করিলেন। মাইবীকে অবিলম্বে স্নদুতরূপে রজ্জ্ববদ্ধ করিয়া, তিনি তাহাকে উজীরের হস্তে সমর্পণ পূর্বক বলিলেন, “এখনই পাশ্চাত্য মুওচ্ছদ কর।” হুলতানের আদেশ অবিলম্বে প্রতীপালিত হইল। হুলতান এই আদেশ প্রদান করিয়াই-স্বপ্ন হইলেন না, তিনি স্বহস্তে মাইবীর সহচরীকুল ও তাহাদের উপশব্দসমূহের শিরশ্ছেদ করিলেন। তাহার পর, পৃথিবীতে মাঝী নারী নাই, এই বিবেচনা করিয়া তিনি স্থির করিলেন, অতঃপর বর্ধমানীকৃত পত্নীর সত্যি যাহাতে নষ্ট না হইতে পারে, এজন্ত প্রতি রাত্রিতে তিনি এক একটি নারীকে বিবাহ করিবেন, সে রাত্রে তাহার সহিত মিলনানন্দ উপভোগ করিয়া, পরদিন তাহার প্রাণদণ্ড করিবেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা শাহজাহানকেও বরাজ্যে ফিরিয়া তাঁহার অমূল্য কার্য করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইলেন।

শাহজাহান নিজের রাজ্যে প্রস্থান করিলে, হুলতান প্রধান উজীরকে তাঁহার যে কোন এক জন সেনাপতির বিবাহযোগ্য কন্তাকে আনিবার আদেশ করিলেন। উজীর রাজ-আজ্ঞা পালন করিলে, হুলতান সেই কন্তাকে বিবাহ করিয়া, তাহার সম্বন্ধে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে তাহাকে বাতকহস্তে সমর্পণ করা হইল, নিরপরাধে অভ্যাসিনীর প্রাণদণ্ড হইল। সেই দিন রাত্রিতে আবার নূতন কন্তা আনিবার জন্ত উজীরের প্রতি আদেশ হইল। অতি কঠোর আদেশ হইলেও উজীরকে তাহা পালন করিতে হইল, আর এক জন কর্মচারীর একটি কন্তা আনীত হইল, একরাত্রি মাত্র তাহার সহিত বাস করিয়া, হুলতান পরদিন প্রভাতে তাহারও প্রাণবধের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। এইরূপে প্রতিদিন এক একটি হুম্মরী বৃত্তী নিরপরাধে প্রাণ হারাতিতে লাগিল। নগরমধ্যে মহাকালাহল উপস্থিত হইল। যাহাদের অবিবাহিতা কন্তা আছে, তাহাদের আর হুচিস্তার সীমা রহিল না; সকলেই ভয়ে কাতর হইল, সকলেই তাহাতিতে লাগিল, এইবার মুক্তি আমার সর্বনাশ হইবে। এতদিন পর্যন্ত যে রাজাকে তাহার পিতার জায় ভক্তি করিয়া আসিয়াছে, সেই রাজাকে তাহার এত ঘরের জায় ভয় করিতে লাগিল।

প্রধান উজীরের এই কার্যে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক ছিল না, তাহারই বা এমন পারমিত্ব কেন? অত্যাচার থাকে? কিন্তু রাজ-আজ্ঞা, তিনি সুলতানের হুকুমাত, তাহাকে তাহা শাসন করিতেই হইবে, এই অস্ত তিনি সুলতানের আদেশ লম্বন করিতে পারেন নাই। এই উজীর মহাশয়ের জুইটি স্তন্যবতী কন্যা ছিল, রূপে-গুণে, বিজ্ঞানবিনয়ে যেন সাক্ষ্য দেবী। এই কন্যাদের জ্যেষ্ঠার নাম শাহারজাদী, কনিষ্ঠার নাম দিনারজাদী। শাহারজাদী কেবল রূপে-গুণেই বৈরমণীকুল-শিরোমণি ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার সাহসও অসীম, অরূপশক্তি অসাধারণ। বাহা তিনি একবার শুনিতে ন বা পড়িতে; তাহাই অবিকল মনে রাখিতে পারিতেন। এতদ্বিধ চিকিৎসাশাস্ত্র, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য—সকল বিষয়েই তাঁহার অত্যুত পারদর্শিতা ছিল। তিনি অতি সুন্দর কবিতাও রচনা করিতে পারিতেন।

উজীর এমন স্থলীণ, স্তন্যবতী, সর্বগুণে গুণবতী কন্যাকে যে নয়নপুঞ্জিলি মনে করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? একদিন তিনি শাহারজাদীর সহিত আলোচনা করিতেছেন, অত্যন্ত কথার পর শাহারজাদী পিতাকে সম্বোধনপূর্বক বলিলেন, “বাবা, আপনার কাছে আমার এক ভিক্ষা আছে, তাহা পূর্ণ করিতে হইবে। আপনি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না ত?”—উজীর বলিলেন, “না, যদি তোমার প্রার্থনা অভয়া ও অদ্বন্দ্ব না হয়, তবে আমি কেন তাহা অগ্রাহ্য করিব?”—শাহারজাদী বলিলেন, “না বাবা, ইহা অপেক্ষা সমস্ত প্রার্থনা আর কিছুই নাই। আমার অভিপ্রায় কি শুধু। আমি ইচ্ছা করিয়াছি, নগরবাসিগণের উপর সুলতানের এই পণ্ডিত অত্যাচারের আমি প্রতিবিধান করিব। চারিদিকের এই আতঙ্কনা ও ক্রন্দন আমি আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। আমি পারস্তবাসিগণের বিপদ দূর করিব।” উজীর বলিলেন, “না, তোমার ইচ্ছা খুব মহৎ সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি বাহা নিবারণ করিবে মনে ভাবিয়াছ, তাহাতে সমর্থ হইবে না। তুমি কি উপায় স্থির করিয়াছ, বল।”

শাহারজাদী বলিলেন, “সুলতান প্রত্যহই এক একটি বিবাহ করেন, কন্যাপুঞ্জির ভিন্ন আশ্রয় উপায় আপনি অল্পগ্রন্থপূর্বক আমাকে একরাত্রির জন্য সুলতানের অধ্যাপকদিবী করিয়া দিন। আমার প্রার্থনা আপনার পক্ষমত, তাহারই অনুরোধে আপনার নিকট আমি এই প্রার্থনা করিতেছি।” কন্যার কথা শ্রবণ করিয়া, উজীর ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, “হা আলা! এ কি কথা!—তুমি কি একবারে জান-বুদ্ধি লক্ষ্যই হারাইয়াছ? আমাকে এমন অনুরোধ করিতে জোরার মনে কেন? সুলতান হইল না? তুমি কি জান না যে, সুলতান বাহা বিবাহ করিবেন, একরাত্রির অধিক আর তাহারক জীবিত থাকিতে হইবে না, পরদিন প্রত্যহেই তাহার প্রাণত্যাগ হইবে? এ অবস্থায় তুমি অসাধারণ বুদ্ধিমতী হইয়াও তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছ? এক্ষণ সুলতানের পরিধানে কলমের যে জোরার শ্রীবনের অবসান হইবে, তাহা কি ভাবিয়া দেখ নাই?”

শাহারজাদী সবিনয়ে বলিলেন, “বাবা, আপনি বাহা বাহা বলিলেন, তাহা সত্যই সত্য, আমাকে যে মহাবিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা আমি জানি; কিন্তু বাবা, সে সত্য সত্যি আমার সমস্ত ভাষণ করিতে পারিতেছি না। যদি আমি এই রহৎ উদ্দেশ্যে প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে সে সত্য আমার পক্ষে পৌরষের বিষয় হইবে; কিন্তু যদি আমি কৃতকার্য্য হইতে পড়ি, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ দেখুন, আমার দ্বারা দেশের কি মহাপ্রকার হইবে। পারস্তের প্রবাসিতা দুবতীপক্ষকে রক্ষা করিতে পারিব।”

উজীর ঋণা নাড়িয়া বলিলেন, “সে, মা, তুমি মনে করিও না, তোমার কন্যার কলমের শ্রীবাসিতার বচন এই বিপদের মুখে নিক্ষেপ করিব। সুলতানের আদেশে আমি কি আমার প্রাণের প্রিয়বাসিতার বচন

শাহারজাদীর
কথনা



পাণিত ছুরী বিধাইতে পারি? পিতার পক্ষে তাহা অপেক্ষা কঠিন কাজ আর কি হইতে পারে? যদি তুমি ব্রহ্মভয়ে কাতর না হও, তথাপি তোমার পিতাকে এই নিষ্ঠুর কার্য্য হইতে রক্ষা কর। আমার এ হস্তে বেন তোমার বুকের রক্তপাত করিতে না হয়।”—শাহারজাদী উভয় হস্ত বোড় করিয়া বলিলেন, “বাবা, আমার অস্থুরোধে কর্ণপাত করুন, স্থলতানের সহিত আমার বিবাহ দিন, আমার এ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিবেন না, আপনার কোন ভয় নাই।” উজ্জীর উত্তর করিলেন, “তোমার কথাই আমার রাগ হইতেছে, এজন্য আর তুমি আমাকে অস্থুরোধ করিও না। কেন তুমি এ ভাবে নিজের প্রাণবিনাশ করিবে? যাহারা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ না করে, তাহাদিগকে বিপদে পড়িতে হয়, আমি দেখিতেছি, তোমার অবস্থা ঠিক সেই গাধার মত হইবে। গাধার অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু সে শেষ রক্ষা করিতে পারিল না।” শাহারজাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, “গাধার কি ইহা ছিল, খুলিয়া বলুন।”— উজ্জীর বলিলেন, “সে বড় অকুত কথা, মন দিয়া শোন, গল্পটি তোমাকে বলিতেছি;—

গর্দ-
নী
ক
এক জন সদাগরের বহুসংখ্যক গো-মেথাদি পশু ছিল। কেবল এক স্থানে নয়—বহু স্থানেই তাহার অনেক খোঁয়াড় ছিল। একদিন সদাগর জী-পুজাদি লইয়া একটি খোঁয়াড় তদারক করিতে গেল। সদাগর পশু-পক্ষীর কথা বুঝিতে পারিত, কিন্তু সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবার তাহার অধিকার ছিল না, প্রকাশ করিলেই মরিতে হইবে, এইরূপ বিধান ছিল। সেইজন্য সে পশু-পক্ষীর কথা তনিয়াও তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিত না।

একদিন ঘটনাক্রমে সদাগরের একটা বলদ ও একটা গর্দভ একই খোঁয়াড়ে আবদ্ধ ছিল। সদাগর তাহাদের নিকটে বসিয়া আছে, এমন সময় শুনিতে পাইল, দুখ গর্দভকে বলিতেছে,—“তুমি ভাই বসিগা বসিগা বেশ আরাম ভোগ করিতেছ; কোন চিন্তা নাই, অতি অল্পই খাটিতে হয়, একটা চাকরে দিবারাত্রি তোমার সেবা করে। আমাদের মনিব যখন কোথাও যান, তখন তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাইতে হয়, এই ত তোমার কাজ। এ ছাড়া তোমার আর কোন কাজই নাই, বড় সুখে আছ। কিন্তু আমার প্রতি আমাদের মনিব যে ব্যবহার করেন, তাহা সম্পূর্ণ পুতল। তোমার যত সুখ, আমার তত দুঃখ। দিবারাত্রি আমাকে লাঙ্গল টানিতে হয়, খাটিতে খাটিতে আমার শরীর শুকাইয়া গেল, কিন্তু সমস্ত দিন খাটিয়াও চাট বিচালি ভিন্ন আর কিছু খাইতে পাই না। রাত্রে অতি অপরিষ্কার স্থানে আমাকে বাঁধিয়া রাখে। তোমার অদৃষ্ট আমার চেয়ে কত ভাল। তোমার অবস্থা দেখিয়া আমার ভাই সত্যই হিসো হয়।”

গর্দ-
পদেশ
গাধা বলদের দুঃখকাহিনী শেষ পর্যন্ত শুনিয়া বলিল,—“ভাই, তুমি যে একটি মহানুর্ভ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, তুমি কেন তাহাদের প্রত্যেক আদেশ নতশিরে পালন কর? এত ইীনতা স্বীকার করিয়া তোমার লাভ কি? যদি তুমি সাহস দেখাইতে পারিত, তাহা হইলে তোমাকে প্রতিদিন এ ভাবে বধে পাইতে হইত না, কিন্তু কেহ কোন দিন তোমার কিছুমাত্র সাহসের পরিচয় পাইল না। একটি দিনও তুমি তোমার শিং নাড়িয়া কাহাকেও ভয় দেখাইলে না, কি মাটিতে খুর বসিয়া কখনও রাগ প্রকাশ করিলে না, গভীরগর্জনে কখনও তোমার বলের পরিচয় দিলে না। তুমি আশ্চর্য্যকার যে সকল উপকরণ লাভ করিয়াছ, কোন দিন তাহা তোমাকে ব্যবহার করিতে দেখিলাম না। কতকগুলি অখাদ্য বস্তু—তাহাই প্রাণপণে চর্ষণ করিবে। আমার উপদেশ শোন। এখন হইতে এক কাজ করিবে, খাবার জিনিষ কিছু পাইলেই তাহা শুকিয়া পরিত্যাগ করিবে, খাইবে না; ইহাতেই

তুমি তোমার প্রতি ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিতে পাইবে, তখন আমাকে ধন্যবাদ দিবে।" বলল গর্দভের পরামর্শ শুনে কান্না কবিত্তে গন্ত হইয়া বলিল, "বন্ধু, আমি তোমার উপদেশ অনুসারেই চলি, তাহার এক চুল অঙ্গণা করিব না।" উত্তর প্রাঙ্গণ প্রত্যেক কথা সদাগর তুলিল ও স্মৃতিতে পালিল।

পরদিন প্রভাতে কুবক বলদটিকে লাঞ্জে ছুড়িল। বথানিয়মে চাব আরম্ভ হইল, কিন্তু বলদ সে দিন গর্দভের কথা মনে রাখিয়াছিল, সমস্ত দিন ধরিয়া সে অব্যাহতচলন করিল। রাত্রিতে পরিচারক বথন তাহাকে বোঁরাড়ে বান্ধিতে গেল, তখন সে শিং নাড়িয়া, খুর দিয়া মাটা বুড়িয়া, মহা আকাশান করিয়া কুবককে মারিতে গেল। এইরূপে গর্দভের উপদেশ সে দিন পালন করিল। পরদিন সকালে কুবক বলদটাকে লাঞ্জে ছুড়িতে গিয়া দেখে, সে রাতে এক আঁটি বড়ও খার নাই, বলদটা মাটিতে পড়িয়া আছে, চারি পা উজ্জ্বলিক প্রসারিত, মধ্যে মধ্যে গা গা করিয়া শব্দ করিতেছে। কুবক মনে করিল, বলদের কোন কঠিন পীড়া হইয়াছে, তাই সে তাড়াতাড়ি তাহার প্রেত সেই সদাগরের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সকল কথা বলিল।

সদাগর সুখিল, পাখার বক্তৃতা শুনিয়াই বলদ মহাপ্রসন্ন হইয়া বিগড়াইয়া গিয়াছে। হৃদয়গর্দভকে উপস্থিত দণ্ডবাসের জন্য সদাগর কুবককে আবেশ করিল, "আজ এই গাধাটিকে বিয়া করী চাব করিয়া লও।" তাহাই হইল, পাখাকে সবস্ত মিন ধরিয়া লাঞ্জন টানিতে হইল। কখন লাঞ্জনটার অঙ্গান না থাকায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গর্দভ হীপাইয়া পড়িল, তাহার উপর কার্যে একই ক্রটি হইল। কুবকের লাঠি পিঠে পড়িল—সদাগর সময় অতি অবসরভাবে গর্দভ বোঁরাড়ে প্রবেশ করিল, তাহার পর উঠিয়া পড়িল, আর উঠিতে পারিল না।

বলদ কিন্তু তারি ধূলী; যত পেটে ধরিল খাইল, তাহার পরমত্বেরে বিশ্রাম করিতে পারিল। সে মনে মনে পাখার বড় প্রশংসা করিতে লাগিল, পাখাকে রাই হইতে কিরিতে দেখিয়াই তাহার অঙ্গান উপদেশের জন্য তাহাকে অঙ্গণা ধন্যবাদ প্রদান করিল। পাখা কোন কথা না বলিয়া অত্যন্ত গভীর হইয়া থাকিল, রাগে গম্ গম্ করিতে লাগিল, পেবে মনে মনে বলিল, "নিজের বুদ্ধির দোষেই আমি এ বিপদে পড়িয়াছি। যথেষ্ট ছিলাম, কোন কষ্ট ছিল না, সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হইতেছিল; মধ্য হইতে পেলাম বলদের ভাল করিতে, এখন প্রাণবীচান কঠিন দেখিতেছি। এ ক্ষীণ হইতে উদ্ধার হইতে না পারিলে আর গতি নাই।" বোঁরাড়ে হৃতবৎ পড়িয়া গর্দভ উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

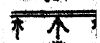
উজীর তাঁহার কস্তা শাহারজাদীকে বলিলেন, "তুমিও বাছা এই গাধার মত, পরে তোমার অবস্থাও এই গাধার মত হইবে। তখন কিন্তু উদ্ধারের আর কোন পথ থাকিবে না।"—শাহারজাদী বলিলেন, "আপনার এই চুটতে আমার সম্বন্ধ নষ্ট হইবে না, ফলতানের সহিত আমার বিবাহ না দিলে আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়িব না, ক্রমাগত বিরক্ত করিব।"—উজীর বলিলেন, "তাহা হইলে আমাকেও অস্ত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। সদাগর তাহার জীবন প্রতি বেল্লপ ব্যবহার করিয়াছিল, তোমার প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার না করিলে তোমার চৈতন্যের হইবে না। সে ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলি শোন;—

পাখার সহিত বলদের আর কোন কথা হয় কি না তাহা জানিবার জন্য সদাগর আহাঙ্গারির পর বোঁরাড়ের পাশে গিয়া বলিল, তাহার জীব তাহার নিকটে আসিয়া ছুটিল। তখন রাত্রি অনেক, আকাশে চন্দ্র উজ্জ্বল চক্ৰবর্তীকি কিরণপালা ছায়া দিতেছেন। সদাগর বোঁরাড়ের কাছে আসিতেই পাখার যথেষ্ট

গর্দভের চাব-
বোঁরাড়ের



শাহারজাদী
কে



তনিত পাইল, সে বলদটাকে বলিতেছে, “কাল কুবক তোমাকে খাবার দিতে আসিবে তুমি কি করিয়া
মজল করিয়াছ?” কাল বলিল, “তুমিই ত ভাই মজল লিখাইয়া দিয়াছ। এখন আমি করিয়া করিয়া
বাইবে, তাহার পর যি নীচ করিয়া নসিতে হইবে, সেবে চারি পা হুড়াইয়া মকর কল হইয়া দিখি, তখন
কুবক রসদান করিয়াছে।” গাথা বলিল, “ধবরদার, ও রকম করিও না। সন্ধ্যার সময় কোন্ হইতে
আসিয়া সদাগরের ঘরে যে যে কথা শুনিয়াছি, তাহাতে তোমার জন্ত ভাই আমার বড় ভাবনা হইয়াছে।”
কাল বলিল, “কল ভাই বল, তুমি যে আমার প্রাণে ভারি ভয় জন্মাইয়া দিলে। কোন কথা লুকাইও না।
মজল খুলিয়া বল।”

গাথা বলিল, “আমাদের মনিব কুবককে বলিতেছিল, বলদটা এখন কাজ করিতে পারে না,
খাবারও খাদ না, তখন ওটা দেখিতেছি নিতান্তই অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমি কাল উহার
প্রাণবধ করিব, তাহার মাংস পরীক্ষা করান করা যাইবে, চামড়াখানা চামারকে দেওয়া যাইবে, তাহাতে
অনেক কাজ হইবে। তুমি কসাইকে ডাকিতে তুলিও না।” এই কথা শুনিয়া আমার মনে ভাই বড়ই ভয়
হইয়াছে, তোমার সঙ্গে আমার কত কালের বন্ধুতা! তোমার উপকার করাই আমার কর্তব্য, সুতরাং
তোমাকে সত্বনেশে দিতেছি শোন। তোমাকে ঘাস ও বিচালী আনিয়া দিবামাত্র তুমি খুব ব্যস্তভাবে
সমস্ত খাইয়া ফেলিবে। তাহা হইলেই সদাগর বুঝিবে, তোমার রোগ সারিয়া গিয়াছে, তখন আর তোমার
প্রাণবধ করা দরকার মনে করিবে না। যদি তুমি আমার এ উপদেশে না চল, তবে কিন্তু তোমার
প্রাণরক্ষার কোনই আশা নাই।” বলদ তদ পাইয়া হাধা হাধা করিয়া ডাকিতে লাগিল।

সদাগর পশুঘরের এই আলাপ শুনিয়া এতই আশ্চর্য হইল যে, সে হো হো করিয়া হাসিয়া
উঠিল। সদাগরের স্ত্রী তাহার নিকটেই বসিয়াছিল, সে তাহার স্বামীকে হঠাৎ এই ভাবে হাসিতে
দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিল। সে বলিল, “হঠাৎ তুমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলে কেন,
তাহা বল, আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছে।”—সদাগর বলিল, “সে কথা আর তোমার শুনিয়া
কাজ নাই।” সদাগরপত্নী বলিল, “না, আমি নিশ্চয়ই শুনিব।” সদাগর বলিল, “সে কথা তোমাকে
বলা আমার পক্ষে অসম্ভব; এইমাত্র জানিয়া রাখ যে, ঐ গাথা ও বলদটাকে যে কথা হইতেছিল,
তাহা শুনিয়াই আমি না হাসিয়া থাকিতে পারি নাই, ইহার অধিক আর তোমাকে বলিতে পারিব না।”
সদাগরের স্ত্রী বলিল, “এ আর বলা শব্দ কথা কি? এ কথা বলিলে কি হইবে?” সদাগর বলিল,
“বৌ কিছু নয়, তাহা হইলে আমার প্রাণ যাইবে।”—সদাগরের পত্নী অভিমানভরে বলিল, “তুমি কথা
কথার আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কর, আমি এত অত্যাচার সহ করিতে পারি না। তুমি কেন হাসিয়াছ,
এ কথা যদি অবিলম্বে আমাকে না বল, তাহা হইলে আমার দিয়া করিয়া বলিতেছি, আমি আর তোমার
ঘরে থাকিব না। আমি কোনও দিন তোমাকে আমার প্রেম-বিতরণ করিব না।”

সদাগর-পত্নী এই কথা বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া মানমর্য্য মানিনীর দ্বার
সমস্ত রাত্রি ধরিয়া অশ্রুতাগ করিল। সদাগর সমস্ত রাত্রি বড় চিন্তিত্যয় কাটাইল। পরদিন স্ত্রীর
মনজ্ঞ হইল না দেখিয়া, সদাগর বলিল, “এ ভাবে অনর্থক কষ্ট পাওয়া তোমার উচিত নয়। কথাটা
জানিয়া তোমার বিশেষ কোন লাভই নাই, কিন্তু ইহা বলিলে আমার প্রাণবিয়োগ হইবে; এ অবস্থার এই
মাত্র কথা শুনিবার জন্ত তোমার পীড়ান্বিত করা অন্ত্যায়।” স্ত্রী বলিল, “যদি তুমি না বল, তবে
মি উত্তিব না, ভাতও খাইব না, তোমার ঘরকরাও দেখিব না, কেবল বসিয়া বসিয়া কাঁদিব। আমার

শ্রেম-সঙ্গিক
মোষণের
জীবন-নীতি

বেতের আলা
মানিীর মা
প্রশস্তি

[10]

শাহারজাদী উত্তর করিলেন, “বাবা, আমি আমার সমস্ত ত্যাগ করিতেছি না বলিয়া, আমার উপর অসন্তুষ্ট হইবেন না। এই সদাগর-পত্নীর গল্প শুনিয়া আমার সমস্ত ত্যাগ করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আমিও এমন অনেক গল্প জানি, বাহা শুনিলে আপনিও আমার মতের সমর্থন করাই কর্তব্য মনে করিবেন। আপনি আমাকে ক্রমা করুন, আমি আপনার কথা বিচলিত হইব না। কারণ, আপনার দেহবশত আমার জীবনের আশঙ্কার যদি স্থলতানের সহিত আমার বিবাহ না দেন, তাহা হইলে আমি স্বয়ং স্থলতানের কণ্ঠে বরনগা প্রদান করিয়া তাঁহার পত্নী হইব।” এই কথা শুনিয়া উজীর কস্তার কথা আর প্রতিবাদ করিলেন না। ব্যাকুলচিত্তে তিনি স্থলতান শাহরিয়ারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—“আমার জ্যেষ্ঠকস্তা শাহারজাদী আগামী কলা আপনাকে পত্ররূপে বরণ করিবার জন্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছে।”

উজীরের কথা শুনিয়া স্থলতানের বিষয়ের পরিদীক্ষা রহিল না। তিনি উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি তোমার নিজের সন্তানকে এ ভাবে নষ্ট করিবে, ইহা কি সম্ভব?” উজীর বলিলেন, “জীহাদিনা, সে নিজেই, এই প্রস্তাব করিয়াছে, পরিণাম-চিন্তায় সে কিছুমাত্র ব্যাকুল নহে, একরাত্রির জন্তও আপনার মহিষী হওয়া সে পরম স্নান্য, যদিও মনে করে।” স্থলতান গভীরভাবে বলিলেন, “উজীর, বৃথা আশা মনে স্থান দিও না। মনে রাখিও; প্রতিভা যখন শাহারজাদীকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিব, তখন তাহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাও তোমাকে প্রদত্ত হইবে। যদি সে আদেশ পালন না কর, তোমার মস্তক দেহচ্যুত করা হইবে।” উজীর বলিলেন, “খোদার, যদিও প্রভুর সেই আদেশপালনে আমার জন্ম বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা, তথাপি মনুষ্যের ক্রন্দন যে নিকল; তাহা আমি জানি। যদিও আমি আমার কস্তার পিতা, তথাপি আমার দ্বারা স্থলতানের আদেশ কখনই লঙ্ঘিত হইবে না।” এই কথা শুনিয়া স্থলতান শাহরিয়ার আর প্রতিবাদ করিলেন না, উজীরের কস্তাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইয়া আদেশ করিলেন, “যে দিন ইচ্ছা তুমি তোমার কস্তাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিতে পার।”

শাহারজাদী
এই

উজীর কস্তার নিকট এই সংবাদ প্রাপ্ত করিলে, শাহারজাদী অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শাহারজাদী বলিলেন, “বাবা, আপনি এখন বড় দুঃখিত ও ব্যাকুল হইতেছেন, কিন্তু পরে আপনি আমার কার্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইবেন। এই বিবাহের জন্ত আপনাকে কিছুমাত্র অসুস্থতাপ করিতে হইবে না।”

উজীর-কস্তা শাহারজাদী অতঃপর স্থলতানের নিকটে উপস্থিত হইবার জন্ত নানা সাজে সজ্জিত হইতে লাগিলেন। স্থলতানের সন্নিধানে বাইবার পূর্বে তিনি তাঁহার ভগিনী দিনারজাদীকে সোধোদনপূর্বক গোপনে বলিলেন, “প্রাণের ভগিনী, কোন একটি গুরুত্ব কাজে তোমার সাহায্য গ্রহণ করা আমার আবশ্যক, আমি আশা করি, তুমি এই সাহায্য হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবে না; তোমাকে বাহা করিতে হইবে, তুমি তাহার সম্পূর্ণ যোগ্য। স্থলতানের সহিত আমার বিবাহ দিবার জন্ত বাবা আমাকে প্রাণদণ্ডে লইয়া বাইবেন, এ সংবাদে তুমি ভয় পাইও না। আমি বাহা বলি, শোন। আমি স্থলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া তোমাকে ডাকিয়া পাঠাইব। তিনি বাহাতে আপত্তি তাহাতে না করেন, সে ব্যবস্থাও আমি করিব। স্থলতান যখন আমার সহিত বিহার করিয়া কুণ্ড হইবেন, তাহার পর তুমি আমার সহিত দেখা করিতে চাহিবে। তিনি তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। অন্ততঃ আমার শেষবাসনা পূর্ণ করিতে তিনি বাধা দিবেন না। সেই সময় তুমি বলিবে ‘দিদি, যদি তুমি না ঘুমাইয়া থাক, তবে সকালবেলা পর্যন্ত তুমি তোমার পরম আশঙ্কা গল্পের একটা বল, শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।’ তুমি এই কথা বলিলেই আমি স্থলতানের অস্থগতি লইয়া গল্প আরম্ভ করিব। স্থলতান গল্প শুনিয়া মোহিত হইবেন এবং শেষ পর্যন্ত আমার গল্প শুনিবেন, সুতরাং আমাকে হঠাৎ যত্ন করিবার





কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

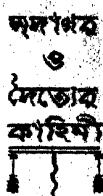


স্বদেশসেবা

দিন-দিনের মালিক জাহাঙ্গীর! পূর্বকালে একদেশে একজন সদাগর ছিল, তাহার সম্পত্তি প্রচুর; জমিদারী ছিল, বাগিচা ছিল, এতদ্বিধা নগদ টাকাও যথেষ্ট ছিল। তাহার কর্মচারী দাস-দাসী প্রভৃতির সংখ্যাও অনেক ছিল। বাগিচার উন্নতির জন্য তাহাকে অনেক সময়ই দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিতে হইত। একদিন সে কার্য্যভরোপে অপরোহিতপূর্বক কোন দূরবর্তী স্থানে গমন করিতেছিল, আহার্য্য-দ্রব্যের মধ্যে একটি থলির ভিতর কতকগুলি বিড়ু ও অনেকগুলি ধর্ম্ম লইয়াছিল। দক্ষিণে পার হইতে হইবে, সেখানে খাড়ালাদ্রী পর্বত, তাই এগুলি তাহাকে সঙ্গে লইতে হইয়াছিল। নিবিড় বনে গিয়া-হানে উপস্থিত হইল, এবং কার্য্য শেষ করিয়া পুনর্বার স্বদেশযাত্রা করিল।

চলিতে চলিতে চতুর্থদিনে সর্ব্বোচ্চাশে অভ্যস্ত লাজ হইল, পথপ্রমদ করিবার জন্য সন্ধ্যার পথের অধরে একটি বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। একটি প্রকাণ্ড তালগাছের পাদদেশে একটি বৃক্ষশাখা দিবারী দেখিয়া সে সেই স্থানে তাহার থলিয়া খুলিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিতে লাগিল। অর্থাৎ একটি বৃক্ষশাখা রাখিয়া রাখিল। ধর্ম্মগুলি আহার করিয়া সন্ধ্যার ধর্ম্মবীজ সন্ধ্যারে কিঞ্চিৎদূরে নিক্ষেপ করিতেছিল। আহার শেষ হইলে সদাগর হস্ত-মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নরসিং বহিল।

নামাক শেষ হইয়াছে, সদাগর আদমভাঙ্গ করিয়া উঠিলে, এমন সময় সে দেখিল,—একটি ভীষণ-বিকট-বুদ্ধ দৈত্য একখানি তীক্ষ্ণ-তরবারি হস্তে বৃক্ষশাখাটিকে তাহার নিকট আসিয়া লইয়াছে। দৈত্যটা সদাগরের নিকটে আসিয়া গর্জন করিয়া বলিল, "এই ধর্ম্ম-বীজ, আমি তোমার আশ্রয় করিব।"



কারণ, তুই আমার পুত্রের প্রাণসংহার করিয়াছিল।” সদাগর দৈত্যের সেই ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া ভয়ে কম্পিতস্বরে বলিল, “হে দৈত্যরাজ, আমি কিরূপে আপনার পুত্রের প্রাণ নষ্ট করিলাম, তাহা বৃত্তিতে পারিতেছি না। আমার ছায় স্কৃদের প্রতি আপনার ছায় মহতের এরূপ জোখ অনুচিত।” দৈত্যরাজ গম্ভীরস্বরে বলিল,—“হাঁ, আমি তোকে বধ করিব প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না, তুই আমার পুত্রকে বধ করিয়াছিল কেন?”—সদাগর কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—“হা আন্না! আমি কিরূপে আপনার পুত্রের প্রাণবধ করিলাম? আমি তাহাকে চিনিও না, কখন দেখিও নাই।” দৈত্য বলিল,—“তুই এখানে আসিয়া কি কতকগুলি খজুর খাইতে খাইতে তাহার বীজ চারিদিকে নিক্ষেপ করিস্ নাই?” সদাগর বলিল, “তাহা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে কি হইল?” “কি হইল?—আমার ছেলের প্রাণ নষ্ট হইল, আবার কি হইবে? আমার ছেলে এই পথ দিয়া যাইতেছিল, একটা খজুরবীজ হঠাৎ তাহার চোখে লাগিয়া তাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।” দৈত্য এই কথা বলিলে, সদাগর সবিনয়ে বলিল, “মহাশয়, দুর্ঘটনাটা দৈবাৎ হইয়া গিয়াছে, আমি তাঁহাকে দেখি নাই, তাঁহার সহিত আমার কোনরূপ



শত্রুতাও ছিল না, ইচ্ছা করিয়াও মারি নাই, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।” দৈত্য বলিল, “আমার দয়া নাই, ক্ষমাও কাহাকে করি নাই। যে কাহাকেও হত্যা করিয়াছে, তাহার দণ্ডভোগ করাই উচিত, তা সে অপরাধ ইচ্ছা করিয়াই করুক আর দৈবাৎই হোক।” সদাগর দৈত্যের নিকট অনেক অহুস-বিনয় করিল, কিন্তু তাহার মনে কিছুমাত্র করুণার উদ্বেগ হইল না। সে তাহার সংকল্প ত্যাগ করিল না। সে পুনঃ পুনঃ সরোষে বলিতে লাগিল, “তুই আমার ছেলে মারিয়াছিল, আমি তোকে বধ করিব।” তাহার পর সে সদাগরকে ধরিয়া মাটিতে ফেলিল এবং তাহার মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিবার জন্য তরবারি উত্তত করিল।

দৈত্য কিন্তু তরবারির আঘাত করিল না, তাহার মনে যে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল, তাহা নহে, দ্রী-পুত্রাদির কথা স্মরণ করিয়া সদাগর কাতরস্বরে আর্তনাদ ও প্রবলবেগে অশ্রুবর্ষণ করিতেছিল। দৈত্য ভাবিল, “ইহার রোদন শেষ হইবামাত্র ইহার মস্তক দেহচ্যুত করিব, প্রাণ উন্নিয়া আগে ও কাঁদিয়া লউক।” দৈত্য বলিল, “এখন আর বিলাপ করিয়া কোন ফল নাই, ও চক্ষু দিয়া অশ্রুর পরিবর্তে যদি রক্ত ফাটিয়া বাহির হয়, তথাপি আমি দয়া করিব না, বলিয়াছি,—আমার দয়া নাই। আমার পুত্রের প্রাণবধ করিয়াছি, আমি প্রতিহিংসা লইব-ই লইব।”

সদাগর কাতরস্বরে বলিল, “আপনার কঠিন হৃদয় কি কোন কারণেই কোমল হইতে পারে না? আপনি কি একটি নিরীহ প্রাণীর প্রাণবধ করিবেনই?”

দৈত্য বলিল “হাঁ, আমি এজন্ত প্রস্তুত আছি।”

এই পর্যা্য গল্প বলা হইয়াছে, এমন সময় শাহারজাদী দেখিলেন, পূর্বদিক পরিষ্কার হইয়াছে, অবিলম্বেই সূর্যোদয় হইবে। স্থলতান অতি প্রত্নবেই নামাজের জন্ত শয্যাভাগ করেন বুঝিয়া শাহারজাদী মধ্যপথে গল্প বন্ধ করিলেন। দিনারজাদী বলিলেন, “দিদি, এ বড় আশ্চর্য্য গল্প!” শাহারজাদী বলিলেন,—“ভগিনি, তুমি ত ইহার শেষভাগ শোন নাই, সে আরও আশ্চর্য্য! কি বলিব, স্থলতান যদি আমাকে আর একদিন বাঁচাইয়া রাখেন, তাহা হইলে গল্পটি তোমাকে শেষ পর্য্যন্ত শুনাইতে পারি।”

স্থলতান শাহরিয়ার গল্পটির সুখবন্ধ মাত্র শুনিয়া বড় আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, শেষ কি, তাহা জানিবার জন্ত তিনিও বিশেষ কোতূহলী হইলেন; হৃৎকণ্ঠে তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, এই গল্পটি শেষ হইলে পরদিন প্রভাতে শাহারজাদীর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিবেন। হুম্মারী-কুল-গরবিলী এই বিধবী হুম্মারীকে আর একদিন জীবিত রাখিলে কোনই ক্ষতির আশঙ্কা নাই, তাহা বরং পর্য্যাপ্ত আনন্দ-উপভোগের কারণ হইবে। স্থলতান মনে মনে ইহা ভাবিয়া সে দিন শাহারজাদীর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন না, যথাবিধি নামাজ শেষ করিয়া রাজকাৰ্য্য দেখিবার জন্ত দরবার-গৃহে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে শাহারজাদীর পিতা উজীর মহাশয় কস্তার জন্ত মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হয় নাই, প্রভাতে প্রতিসূর্য্যোদয়ে তাঁহার মনে হইতেছিল, এখনই তাঁহার প্রিয়তমা হৃহিতার প্রাণদণ্ডের পরোয়ানা তাঁহার হস্তে প্রদত্ত হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি স্থলতানের সমীপস্থ হইয়া দেখিলেন, স্থলতান তাঁহার হস্তে প্রাণদণ্ডের জন্ত তাঁহার কস্তাকে সমর্পণ করিলেন না, সে সম্বন্ধে কোন কথাও বলিলেন না।

সমস্ত দিন রাজকাৰ্য্যাবসানে রাত্রিকালে স্থলতান শাহারজাদীর সহিত শয়ন-প্রকারে উপস্থিত হইলেন। প্রমোদ-নিশার অবসানে দিনারজাদী শাহারজাদীকে পূর্বদিনের মত গল্প বলিবার জন্ত স্নানোৎসাহ করিলেন। স্থলতান শাহারজাদীকে তাঁহার নিকট অসুস্থমতি প্রার্থনার অবসর না দিয়া বলিলেন,—“প্রিয়তমে, তুমি তোমার সদাগর ও দৈত্যের কাহিনী শেষ কর, আমি শুনিবার জন্ত বড় উৎসুক হইরাছি।”

শাহারজাদী আবার গল্প আরম্ভ করিলেন—

ঈশাপনা, সদাগর যখন দেখিল, দৈত্য কিছুতেই ক্ষান্ত হইবে না, তাহার প্রাণবধ করিবে-ই, তখন সে বলিল, “আমার একটি ক্ষুদ্র প্রার্থনা আছে, আপনি অল্পগ্রহ করিয়া কিছু দিন সময় দিন, ইতিমধ্যে আমি আমার দ্রী-পুত্রকর্তৃপক্ষকে বিষয় ভাগ করিয়া দিয়া আসি। এখনও আমি-লালপুত্র প্রস্তুত করি নাই, এখন আমি-নিজে বিষয়-সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারা না করিলে, তাহার দাবী-মতকাৰ্য্য করিয়া গরম বিষয় নষ্ট



করিয়া ফেলিবে। আমি অঙ্গীকার করিতেছি, আমার এই কাজ শেষ হইলেই আমি আপনার কাছে ফিরিয়া আসিব, তখন আমাকে লইয়া আপনি যা খুশী করিবেন।”

দৈত্য বলিল, “হঁ, তুই বড় চালাক, আমি ছাড়িয়া দিই আর কি, একবার মুক্তি পাইলে কি আর তুই এ দিকে আসিবি?”

সদাগর বলিল, “আমি আমার দিবা করিয়া বলিতেছি, নিশ্চয়ই আসিব, আমার দিব্যে আপনার বিশ্বাস হয় ত?”

দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল, “তোমার কত দিন বিলম্ব হইবে?” “একবৎসরের আগে আর এ সকল কাজ কিরূপে শেষ হয়? ঠিক একটি বৎসরই লাগিবে, আজ হইতে বার মাস পরে ঠিক এই দিনে এই গাছতলায় আবার আমার সঙ্গে আপনার দেখা হইবে। আমি আসিয়া আপনার হস্তে আত্মসমর্পণ করিব প্রতিজ্ঞা করিতেছি।” সদাগর এই উত্তর মিল।

দৈত্য বলিল, “তোমার আমার দিবা দিয়া যে কথা বলিলি, তাহা যেন ঠিক থাকে; এক বৎসর পরে আমি কিন্তু তোকে চাই, কোন ওজর শুনিব না।” সদাগর ভরসা পাইয়া বলিল, “পূর্বের দুর্য্যাপশ্চিমে যাইবে ত আমার কথার ব্যতিক্রম হইবে না, ঠিক আসিবি।”—এই কথা শুনিয়া দৈত্য ধীরে ধীরে অদৃশ হইল।

সদাগর অস্বাভাবিক পূর্বক বিষমরূপে গৃহে ফিরিল। দৈত্য-হস্তে মুক্তিলাভ করিয়া যদিও তাহার মন একটু স্নেহ হইল, কিন্তু এক বৎসর পরেই পুনরায় সেই বিপদে পড়িতে হইবে ভাবিয়া দৃষ্টিভঙ্গি তাহার হৃদয় কম্পিত হইতেছিল। গৃহে ফিরিলে বহুদিন পরে তাহাকে দেখিয়া তাহার জী-পুত্রকজাগণ মহা-আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, কিন্তু সদাগর ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল। এই ব্যাপারে সকলে অত্যন্ত বিস্মিত হইল, সদাগর তাহার ক্রন্দনের কারণ আভ্যুপাশ্ব্য বর্ণনা করিল।

এই বিবরণ শুনিয়া, সদাগরের পরিবারের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল; সকলেই ব্যথিত, সদাগরের আত্ম শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর এক বৎসর মাত্র তাহার জীবন। সদাগরের জী-পুত্র চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া করুণস্বরে কঁাদিতে লাগিল, পুত্রকজাগণের রোদনে পাষাণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। সদাগরের পরিবারে শোকের ঝড় উঠিল।

যাহা হউক, আর বিলম্ব করা চলে না, এক বৎসরের মধ্যেই সকল কাজ শেষ করিয়া যাইতে হইবে; সদাগর তাহার সমস্ত ধন পরিশোধ করিল, বহুবাক্যের মধ্যে উপহারাদি বিতরণ করিল, দরিদ্রকে অনেক অর্থ দান করিল এবং বহুলখ্যাত জীতদাস-দাসীকে চিরজীবনের জন্ত মুক্তিদান করিল। তাহার পর বিষয়-সম্পত্তির ভাগ-বাটোরা করা করিতেই একটি বৎসর অতি ক্রতবেগে দেখিতে দেখিতে চলিয়া গেল।

সদাগর তখন পরিবারবর্গের নিকট বিদায় লইতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহার জী-পুত্র সহজে বিদায়দান করিল না, তাহারাও তাহার সহিত দৈত্য-হস্তে দণ্ডভোগ করিবার জন্ত তাহার অনুমতি প্রার্থনা করিল। সদাগর তাহাদিগকে অনেক সঙ্কপদেশ প্রদান করিয়া কিঞ্চিৎ সাহস দিয়া, তাহাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। যে দিবসে দৈত্যের সহিত দেখা করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়া গিয়াছিল, ঠিক সেই দিনেই সে যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। সদাগর অর্থ হইতে অর্থতরুণ করিয়া সেই নিকরিশীলুলে উপবেশন করিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই দৈত্যের প্রতীক্ষা করিতে কাগিল, কিন্তু দৈত্য আর আসে না, সময় অত্যন্ত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল।



সদাগর বৃক্ষতলে বসিয়া আছে, এমন সময় একজন বৃদ্ধ একটি হরিণী সঙ্গে হইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল। পরস্পরের অভিধানাদি শেষ হইলে, আগন্তুক বৃদ্ধ বলিল, “তাই, এ তরবার মর-
তুমিতে তুমি কি জন্ত আসিয়াছ, তাহা জানিবার জন্ত আমার বড় আগ্রহ হইতেছে, তুমি কি জান
না যে, এই মরুভূমি অতি তরবার দৈত্যগণে পূর্ণ? হানটি নিশ্চিন বটে, কিন্তু বড় বিপজ্জনক, এখানে
অধিক কাল থাকিলে নিশ্চয়ই কোন ভয়ানক বিপদে পড়িবে।”

সদাগর বৃদ্ধের কথা শুনিয়া তাহার বিচিত্র কাহিনী কর্ণা করিল। বৃদ্ধ মনোযোগের সহিত সকল
কথা শুনিয়া বলিল, “তাই ত, বড় ক্ষত ব্যাপার দেখিতেছি, পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য ঘটনার কথা
আমি কখন শুনি নাই। তুমি এমন ভয়ানক প্রতিজ্ঞাও পালন করিতেছ; তাহা বইক, দৈত্য তোমার
প্রতি বিশেষ ব্যবহার করে, তাহা দেখিবার জন্ত আমার বড় কৌতুহল হইয়াছে, আমি তোমার সা-
দেখিয়া স্থান হইতে উঠিতেছি না।” এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ সদাগরের নিকট ধরিয়া বিদায়
করিয়া গেল। ইতিমধ্যে সেখানে আর একজন বৃদ্ধ আসিয়া উপস্থিত; সে দুইটি বৃক্ষকণ্ড ফুটুর
সহ আসিয়াছিল। এই লোকটি আসিয়া পূর্বকথিত বৃদ্ধ ও সদাগরকে অভিধান করিল,
সেই বিপদমুহুর স্থানে তাহাদিগের বসিয়া থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। প্রথম বৃদ্ধ সদাগর-
সংক্রান্ত সকল কথা বলিল। বৃদ্ধ শেষে বলিল, “আজ দৈত্যের আসিবার দিন; বোধ হয়, শীঘ্রই সে
এখানে উপস্থিত হইবে। সে আসিয়া কি করে, তাহা দেখিবার জন্তই সদাগরের নিকট আমি
প্রতীক্ষা করিতেছি।”

দ্বিতীয় বৃদ্ধটি এই গল্প শুনিয়া এতই আশ্চর্য হইল যে, সেও এই ঘটনা দেখিবার জন্ত সেখানে
বসিয়া পড়িল। সকলে বসিয়া গল্প করিতেছে, এমন সময়ে সেখানে আর একজন লোক একটি
মাষ্ট্রী অস্ত্রের সহ আসিয়া উপস্থিত হইল। সেও বৃদ্ধদের কাছে সদাগরের শোচনীয় কাহিনী শুনিয়া, দৈত্য
আসিয়া কি করে দেখিবার জন্ত তাহাদের পাশে উপবেশন করিল।

অল্পক্ষণ পরে তাহার মাঠের মধ্যে অনেকদূরে গাঢ় ধূস্রং এক ভক্ত দেখিতে পাইল, যেন ভয়ানক
ধূস্রবাহুতে ধূস্রাশি আকাশপথে উড়িয়া আসিতেছে। সেই ধূস্রভক্ত ক্রমে তাহাদের নিকটবর্তী হইতে
লাগিল। অবশেষে হঠাৎ সমস্ত ধূম কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহার পরিবর্তে সেই বৃদ্ধ দৈত্য তাহা-
দিগের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দৈত্যটি অস্ত্র তিনজন পথিকের দিকে একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া,
তরবার হস্তে সদাগরের নিকট হইল এবং তাহার হাত ধরিয়া বলিল,—“ওঠ, এইবার আমি তোকে বধ
করি, তুই আমার পুত্রহত্যা।” সদাগর প্রাণবিসর্জনের জন্ত প্রস্তুত হইয়া আসিলেও ত্তরে কাণিতে
লাগিল, প্রাণের মার্য সহজে ত্যাগ করিতে পারা যায় না। পথিকত্রয় দৈত্যের বিকটমুখ ও তাহার
ভয়ানক বক্তব্য দেখিয়া প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া উন্মত্তভাবে রোদন করিতে আরম্ভ করিল, তাহা-
দের সেই বিলাপধ্বনিতে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

যে লোকটা হরিণী লইয়া সেখানে আসিয়াছিল, সে দেখিল, দৈত্য সদাগরকে ধরিয়াছে, এখনই তাহার
প্রাণবধ করিবে। দয়া প্রার্থন করিলে, সে আশা নাই; তখন সে দৈত্যের পদতলে পড়িয়া তাহার
পদময় চূষন করিয়া বলিল, “হে দৈত্যরাজ! আমি সবিনয়ে তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি
তোমার এই নিষ্ঠুর লোকের পরিত্যাগ কর। তোমার কোথ ত্যাগ করিয়া আমার সোপানরহিত কথা প্রকাশ কর।
আমি আমার স্বীকৃতির কাহিনী তোমাকে বলিতেছি, সেই সঙ্গে আমার এই হরিণীর উপাখ্যানও



যহন তোমাকে বলিব। যদি তুমি মনে কর, আমার সেই বিচিত্র কাহিনী—এই সদাগরের উপাখ্যান হইতেও অধিক বিষয়কর, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা যে, তুমি সদাগরের উপর যে দণ্ডবিধান করিবে স্থির করিয়াছ, তাহার এক-তৃতীয়াংশ হইতে তাহাকে মুক্তিদান করিতে হইবে।” দৈত্য কিছুকাল ভ্রান্তভাবে চিন্তা করিয়া বলিল, “আজ্ঞা, তোমার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম, এখন তুমি তোমার গল্প বলিতে পার।” সদাগরকে ছাড়িয়া দিয়া দৈত্য বৃদ্ধ পথিকের কাহিনী শুনিতে বলিল।

এদিকে শাহারজাদী এই পর্যন্ত বলিতেই রাত্রিশেষ হইল, সুতরাং গল্প এখানেই বন্ধ রাখিতে হইল, কিন্তু এই গল্প শ্রুতানের নিকট এতই আশ্চর্য্য ও কৌতূহলোদ্দীপক বোধ হইতেছিল যে, তিনি গল্পের শেষ পর্যন্ত শুনিবার বাসনার শাহারজাদীর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা সে দিনও স্থগিত রাখিলেন এবং প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া যথারীতি রাজকাৰ্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তখন কস্তার জীবন-সম্বন্ধে উজীরের কথকিং আশা হইল। শ্রুতান কিছু কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

তৃতীয় দিন প্রমোদ-রাত্রিশেষে দিনাজাদীর অমুরোধে শাহারজাদী আবার গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। যে বৃদ্ধ হরিণী আনিয়াছিল, দৈত্যকে সে নিজের কাহিনী সম্বন্ধে কি বলিল, তাহা শুনিবার জন্ত শ্রুতান উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন, শাহারজাদী স্মিটস্বরে ধীরে ধীরে বৃদ্ধের আশ্বকাহিনী বলিতে লাগিলেন।

—জ ত ত মম জ ত ত ত—

প্রথম
দুহু ও
দ্বিতীয়
কাহিনী

বৃদ্ধ বলিল, “মহাশয়, মনোযোগ দিয়া শুহুন। এই যে হরিণীটি দেখিতেছেন—আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, এটি আমার পিতৃব্যকস্তা—ভগিনী, ভগিনীই বা বলি কেন, আমি ইহাকে বিবাহ করিয়াছিলাম—এ আমার স্ত্রী। যখন ইহার বয়স বারো বৎসর, সেই সময়ে আমি ইহাকে বিবাহ করি, সুতরাং আপনাদি বৃত্তিতেছেন, আমাকে স্বামী ও রক্ষাকর্ত্তমাত্র বলিয়াই মনে করা ইহার উচিত ছিল না, আমি ইহার অন্তরের নিভৃত স্থান পর্যন্ত অধিকার করিয়াছিলাম। দ্বিশ বৎসর আমার একত্র বাস করি, কিন্তু সম্বন্ধের মুখ দেখিতে পাইলাম না, তথাপি সে জন্ত আমি আমার স্ত্রীর প্রতি কোন দিন রুঢ় ব্যবহার করি নাই, সর্বদাই তাহাকে আদর-বন্দ করিতাম। কিন্তু একটি ঘটনা-ঘাতের ইচ্ছা আমার এমন বলবতী হইয়া উঠিল যে, সেই জন্তই আমি একটি সুন্দরী দাসী ক্রয় করিলাম। দাসীগর্ভে অল্পদিনের মধ্যেই আমার একটি অতি রূপবান্ গুণবান্ সম্বন্ধের জন্ম হইল। ইহাতে আমার স্ত্রীর স্খীয় আর সীমা রহিল না; সে আমার দাসী ও সম্বন্ধটিকে দুই চক্ষুর বিষ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কিন্তু সেই তাহার মনের ভাব এমন গোপনে রাখিয়াছিল যে, তাহা আমি কোনদিন বুঝিতে পারি নাই; অবশেষে যখন বুঝিয়াছিলাম, তখন আর প্রতীকারের কোন পথ ছিল না।

আমার পুত্রটি ক্রমে বড় হইতে লাগিল; তাহার যখন দশ বৎসর বয়স, সেই সময় আমাকে জিহ্মদেশে বান্ধা করিতে হইল। আমি আমার দাসী ও পুত্রকে আমার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বসিলাম, —স্ত্রীর প্রতি আমার কোন মনোহ ছিল না, সুতরাং আমি তাহাকে অমুরোধ করিলাম,—“আমার পক্ষপাতিকালে যেন তাহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়।” বিদেশে আমার এক বৎসর বিলম্ব হইল। এই সময়ের মধ্যে আমার স্ত্রী আমার পুত্র ও দাসীর প্রতি তাহার হিংসা-বৃত্তি





নারী
প্রতিবেশ



নারী না
সহানী



নারী না
সহানী



নারী না
সহানী



নারী না
সহানী



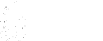
নারী না
সহানী



নারী না
সহানী



নারী না
সহানী



নারী না
সহানী



নারী না
সহানী



নারী না
সহানী

চরিত্র করিবার উৎকৃষ্ট জীবন গ্রহণ হইল। আমার স্ত্রী বারিষ্ঠা শিখিতেছিল, এই বিভার বিস্তার পারদর্শিতা লাভ করিল সে আমার পুত্রের বিরুদ্ধে এক অতি ভয়ঙ্কর বক্তৃতা করিল। তৎকালে সে আমার পুত্রকে বিশেষে লইয়া গেল এবং বিজ্ঞানে তাহাকে একটি গো-বৎসে রূপান্তরিত করিয়া তাহাকে আমার গৃহে ফিরাইয়া আনিল, তাহার পর সেই বৎসটি আমার খানসামাকে দিয়া বলিল, 'ইহাকে পালন করিতে হইবে।' পাশিষ্ঠা কেবল এই কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আমার সেই ক্ষমারী দাসীটিকেও একটি পাভীতে পরিণত করিল। গাভীটিকেও সে আমার খানসামার হস্তে প্রদান করিল।

বিশেষ হইতে গৃহে ফিরাই আমি আমার স্ত্রীকে সন্তান ও দাসীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, পাশিষ্ঠা অবলীলাক্রমে বলিল, "তোমার দাসী পটল তুলিয়াছে, আর আজ দুই মাস হইতে তোমার ছেলের কোন খবর পাইতেছি না, তাহার কি হইয়াছে তাহা জ্ঞানাই করুন।" দাসীর বৃত্তান্তবোধে আমি বড় কাতর হইলাম। পুত্রটি নিরুদ্দেশ হইয়াছে শুনিয়া ভাবিলাম, শীঘ্রই হয় ত সে ফিরাই আসিবে। এই ভাবে আটমাস চলিয়া গেল, কিন্তু সে ফিরিল না, তাহার কোন সংবাদও পাইলাম না। বাইরম উৎসবের সময় আমি আমার খানসামাকে বলিলাম, "সকল অপেক্ষা ছুটপুট গাভীটি লইয়া আইস, কোরবানি করিতে হইবে।" আমার খানসামা আমার আদেশানুসারে গাভীরূপিণী আমার সেই দাসীকেই লইয়া আসিল। আমি তাহাকে বাঁধিয়া জব্বাই করিব, এমন সময়ে সে অঙ্গবর্ষণ পূর্বক এমন নীল নয়নে আমার দিকে চাহিয়া কাতর ভাবে আর্তনাদ করিতে লাগিল যে, তাহাতে আমি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। তাহার মুখে আমার জন্ম বরাবর হইল, আমি আর তাহাকে মারিতে পারিলাম না, হাতের ছুরি হাতেই রহিয়া গেল। খানসামাকে বলিলাম, "ইহাকে রাখিয়া আর একটা গরু লইয়া আর।"

আমার স্ত্রী দেখানে দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতেছিল, গাভীর উপর সন্ম-প্রকাশ করিতে দেখিয়া, পাণ্ডাণীর তাহা সহ হইল না। হিংসার জলিয়া উঠিয়া সে আমাকে বলিল, "জিহ্বতম স্বামী, তুমি এ কি করিতেছ? তুমি এই গাভীটিকে কোরবানি কর, তোমার খানসামা গোয়ালের সর্বোৎকৃষ্ট গাভীই তোমাকে আনিয়া দিয়াছে, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গাভী আমাদের আর নাই; এ কাজের জন্যই এইটিই সর্বোৎকৃষ্ট অধিক উপযুক্ত।" আমার স্ত্রীর অজুরোধে তুলিয়া, আমি আমার মন্তব্য ব্যাখ্যা করিলাম, আবার ছুরি জ্বাইয়া সেই গাভীর কাছে উপস্থিত হইলাম। এবার ঘৃণচিত্তে গাভীর গলায় সেই তীক্ষ্ণ ছুরিকা কাটাইবার উদ্দেশ্য করিলাম দেখিয়া গাভী আবার অতি করুণভাবে আর্তনাদ করিয়া উঠিল, তাহার অক্ষয়বীর্য্য বর্ণিত হইল। তখন আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া আমার সেই খানসামার হস্তে ছুরিখানি প্রদান করিয়া বলিলাম, "তুমি নিজে সিঁদা কোরবানি কর, ইহার আর্তনাদ ও অঙ্গ দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইতেছে, আমি বহুতে ইহার প্রাণনাশ করিতে পারিব না।"

আমার খানসামা আমা অপেক্ষা নিষ্ঠুর। বহুসময়ে সে গাভীর গলায় ছুরি দিয়া তাহার প্রাণসংহার করিল। তাহার চামড়া ছাড়াইয়া দেখা গেল, দেহে হাড় ভিন্ন অধিক মৎসে নাই, এদিকে কিন্তু তাহাকে খুব কটপুট দেখাইরাছিল। বাহা হউক, আমি ইহাতে দুঃখিত হইয়া একটি ছুটপুট গো-বৎস আনিবার আদেশ করিলাম। অল্পকাল পরে সে একটি অতি ক্ষমার গো-বৎস লইয়া উপস্থিত হইল। আমি একবার কল্পনাও করিতে পারি নাই যে, এই গো-বৎসই আমার পুত্র, কিন্তু বৎসটি দেখিয়াই আমার প্রাণের মধ্যে কেমন সমতার সঞ্চার হইল। সে আমাকে দেখিয়া আমার কাছে আনিবার জন্য বিস্তর জেঁট করিতে

ভঙ্কার লাগিল, অনেকবার তাহার গলার দড়ী ছিঁড়িবারও চেষ্টা করিল। তাহার পর দড়ী ছিঁড়িয়া আমার পদপ্রান্তে নিগতিত হইল, এবং নানাভাবে দীনতা প্রকাশ করিয়া আমার করুণা উদ্বেক করিতে লাগিল; সে যে আমারই পুত্র, তাহা বুঝাইবার জন্ত কত চেষ্টা করিল, কিন্তু অবলম্ব্য সে, কোন কথা প্রকাশ করিতে পারিল না।



গো-বৎসের এই আচরণে আমার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। আমার হৃদয়ে করুণার উদ্বেক হইল, আমি থান-সামাকে বলিলাম, “ইহাকে এখান হইতে লইয়া যা, ইহার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবি, ইহার পরিবর্তে আর একটা বাছুর লইয়া আয়।”

আমার স্ত্রী এই কথা শুনিয়া বলিল, “প্রিয়তম স্বামী, তুমি এ কি করিতেছ? এই বাছুর ছাড়া আর কোনটা কোরবানি করা হইবে না।” আমি বলিলাম, “প্রাণেশ্বরী, আমি ইহার প্রাণবধ করিতে পারিব না, আমি ইহাকে সব্বয়ে প্রতিপালন করিব। তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিও না।” পাণ্ডিত্য আমার প্রজ্ঞাযে সন্দত হইল না, সে স্থল:

পুনঃ ঐ বাছুরই জবাই করিবার জন্ত আমাকে অহরোধ করিতে লাগিল; অবশেষে অহরোধে বাধা হইয়া আমি সেই বৎসটিকেই বধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম। ছুরি তুলিয়া তাহার গলার কবাইতে বাইব, এমন সময় বাছুরটি অঙ্গপূর্ণ-লোচনে এমন কাতরভাবে আমার দিকে চাহিল যে, আমার হাত হইতে ছুরিখানি খসিয়া পড়িল। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলিলাম, “আমি এ বাছুরটিকে জবাই করিতে পারিব না।” কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই আমাকে ছাড়িবে না, শেষে আমি তাহাকে ধূলী করিবার জন্ত বলিলাম, “আগামী বৎসর বাইরাম উৎসবের সময় এটিকে কোরবানি করা বাইবে, এ বৎসর প্রাণেশ্বরী—থানসামা সেই বাছুরটি লইয়া চলিয়া যেল।

পরদিন আমার খানদামা গোপনে আমার কাছে কোন কথা বলিতে চাহিল। সে বলিল, “আমি আপনাকে এমন কোন সংবাদ দিব, বাহা আপনার প্রীতিকর হইতে পারে। আমার একটি মেয়ে আছে, সে কিছু কিছু বাহুবিত্তা জানে। কাল আমি বধন ঐ বাছুরটি আপনার কাছ হইতে লইয়া বাইতেছিলাম, তখন আমার মেয়ে তাহাকে দেখিয়া প্রথমে হাসিল, পরক্ষণেই কাঁদিয়া উঠিল। তাহার এই অপূর্ণ ব্যবহারের তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া, আমি সবিস্ময়ে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার কন্ডা বলিল, ‘বাবা, আপনি যে বাছুরটি আনিয়াছেন, সেটা ত আসল বাছুর নয়, আপনার মনিবের ছেলে। সে যে এখনও জীবিত আছে, এই কথা ভাবিয়া মনের আনন্দে একটু হাসিলাম, কিন্তু তখনই তাহার হতভাগিনী মায়ের কথা মনে পড়ায় আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম, তাহার মাকে কাল আপনারা বধ করিয়াছেন। আপনার মনিবের স্ত্রীর বাহুবিত্তাতেই ইহাদের এরূপ পরিবর্তন ঘটরাছে, সে এই ছেলে ও ছেলের মাকে দুই চক্ষু দেখিতে পারিত না।’—আমি আমার মেয়ের মুখে এই সংবাদ পাইয়া তাহা আপনাকে বলিতে আসিয়াছি।”—



দৈত্য মহাশয়! আমার খানদামার মুখে এই কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহার কন্ডার সঙ্গে দেখা করিতে চলিলাম। প্রথমে আমি গোয়ালে গিয়া গো-বৎসরূপী আমার ছেলের সঙ্গে দেখা করিলাম—নানা প্রকারে তাহার প্রতি আসন্ন প্রকাশ করিলাম। সে এমন ভাব দেখাইল যে, সে আমার পুত্র, এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

পরে আমি আমার খানদামার কন্ডাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সে আমার ছেলেকে পুনরীর মাছবের দেহ করিয়া দিতে পারে কি না? সে বলিল, “হাঁ, পারি।”—তিনি আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলাম,—“যদি তাহা পার, তবে আমি তোমাকে ধ্যানসরূপের মালিক করিব।” সুবতী হাসিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকারপূর্বক আমার প্রস্তাবে সন্মত হইল, কিন্তু সে আমাকে ছইটি অঙ্গীকার করিতে বলিল। প্রথমতঃ—আমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিতে হইবে; দ্বিতীয়তঃ—আমার স্ত্রীর প্রতি শাস্তিবিধানে সন্মতি দান করিতে হইবে। আমি প্রথম প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সন্মতি জানাইলাম। দ্বিতীয় প্রস্তাব সম্বন্ধে বলিলাম, “যে স্ত্রী এমন দুষ্ট করিতে পারে, সে দণ্ডভাজ্যের যোগ্য, আমি তোমার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিলাম, তুমি তাহার উপর যে দণ্ড ইচ্ছা, তাহাই প্রয়োগ করিতে পার। তবে আমার অনুরোধ, তাহাকে বধ করিও না।” সুবতী বলিল, “সে আপনার পুত্রের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে, তাহার প্রতিও আমি তদ্রূপ ব্যবহার করিব।” আমি ইহাতে আর কোন আপত্তি করিলাম না।

সুবতী তখন এক বটী জল আনিয়া তাহা মন্ত্রপূত করিল ও গো-বৎসকে বলিল, “সৌভাগ্য, আজ তোমাকে যে দেহ দান করিয়াছেন, ইহা যদি সেই দেহই হয়, তাহা হইলে তুমি এই দেহই ধারণ করি। থাক; কিন্তু যদি কোন দ্বন্দ্ববিলীর বাহুমে তোমার এ অবস্থা হইয়া থাকে, তবে তুমি তোমার প্রকৃত রূপ ধারণ কর।”—এই কথা বলিয়া আমার সমস্ত জল, সে সেই গোবৎসের উপর ঢালিয়া দিল। গো-বৎস-বৃত্তি দূরে গিয়া আমি তৎক্ষণাৎ আমার পুত্রকে সমুখে দেখিলাম।

আমি তাহাকে কোলে লইয়া আনন্দভরে পুনঃ পুনঃ তাহার মুখচুম্বন করিতে লাগিলাম। তাহার পর সেই সুবতী আমার কি মহা উপকার করিয়াছে, তাহা জানাইয়া আমার পুত্রকে তাহার পানিগ্রহণে অনুরোধ করিলাম। খানদামার চুহিতার পানিগ্রহণে আমার পুত্রেরও আর কোন আপত্তি হইল না। তাহার সন্মতি আছে জানিয়া আমি সেই সুবতীর সহিত বহানবারোহে আমার পুত্রের বিবাহের আয়োজন করিলাম; বিবাহের পূর্বেই সে সুবতী আমার স্ত্রীকে হরণ করিয়া ফেলিয়াছিল; সেই হরণী এই আমার স্ত্রী। অতঃপর কোন আনন্দের অপেক্ষা হইল না মনে করিয়া আমি এই পরিবর্তনে সন্মতি দিয়াছি।



এই ঘটনার কিছু কাল পরে আমার পুত্রবৃন্টির মৃত্যু হওয়ার আমার পুত্র বিবাহী হইয়া সেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনেকদিন তাহার কোন সংবাদ পাই নাই বলিয়া তাহার সন্ধানে বাহির হইয়াছি। হরিণীক্লম্পি আমার স্ত্রীকে আর কাহার কাছে রাখিয়া যাইব? এই ভাবিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়াই ঘুরিতেছি। ইহাই আমার ও এই হরিণীর ইতিহাস। ইহা অপেক্ষা অপূর্ব ঘটনা আপনি আর কখন শুনিরাছেন কি?

দৈত্যরাজ এই গল্প শুনিয়া বলিল, “তুমি যাঁহা বলিতেছ, তাহা সত্য, বড় অদ্ভুত গল্প, আমি এই সদাগরের এক-তৃতীয়াংশ দণ্ড মাপ করিলাম।”

— অ অ অ অ অ অ অ অ —

দৈত্য

ও

হর-

হর

ইন্দ্র

ক

দ্বিতীয় বৃদ্ধটি, যে দুইটি ক্লম্পবর্ণ কুকুর সঙ্গে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, বলিল, “আমার ও এই ছই কালো কুকুরের ইতিহাস এখন আমি আপনাকে বলিতেছি। আমার এই কুকুর আরও আশ্চর্য্য, কিন্তু আপনি অঙ্গীকার করুন, যদি ইহা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়, তাহা হইলে আপনি এই সদাগরের এক-তৃতীয়াংশ অপরাধ ক্ষমা করিবেন?”—দৈত্য বলিল, “হাঁ, তাহা পারি, কিন্তু তোমার গল্পটি ইহা অপেক্ষাও অধিক অদ্ভুত হইলে তবেই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব, নতুবা নহে।”

দ্বিতীয় বৃদ্ধ এই কথার সম্মত হইয়া বলিল, “দৈত্যকুলভূষণ! আমি ও আমার এই ছই কুকুর—আমরা তিনজনে সহোদর ভাই।

আমাদের পিতা মৃত্যুকালে আমাদের প্রত্যেককে হাজার টাকা করিয়া দিয়া বান। এই টাকা লইয়া আমরা তিন ভাই-ই সদাগরী আরম্ভ করিলাম। কিছুদিন পরে আমরা একটা দোকান খুলিলাম, আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদেশে গিয়া ব্যবসা করিবেন, এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাহার পর দোকানের তাঁহার নিজের অংশ বিক্রয় করিয়া সেই টাকার বাণিজ্যোপযোগী অনেক দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া বিদেশে যাত্রা করিলেন।

আমার বড় ভাই বিদেশযাত্রা করিলে এক বৎসর আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না। এক বৎসর পরে আমার দোকানে এক জন দরিদ্র লোক আসিয়া উপস্থিত হইল। দোকানে আসিয়াই সে বলিল, “আজ্ঞা, তোমার মঙ্গল করুন।” আমিও অভিযাচন করিয়া বলিলাম,—“আজ্ঞা, তোমার মঙ্গল করুন।” “তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না?” বলিয়া লোকটি আমার মুখের দিকে চাহিল। আমি মনোযোগের সহিত তাঁহার মুখ দেখিয়া চিনিলাম, আমাদের দাদাই কটে। তখন আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম “দাদা, আপনার যে এরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা শুনেও আমি ভীত না। আপনার এ দুর্দশার কারণ কি?” দাদা বলিলেন, “আমাকে আর ও সকল কথা জিজ্ঞাসা করিও না, আমার অবস্থা দেখিয়া ত সকল কথা বৃষ্টিতে পারিতেছ, এই এক বৎসর বয়সে যে সকল দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছি, তাহার কথা আর নুতন করিয়া বলিতে পারিব না, তাহা শ্রবণ করিলে আমার মন বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।”

আমি তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া দাদার পরিচর্য্যার প্রবৃত্ত হইলাম। তাহার পর আমার দোকানের হিসাব করিয়া দেখিলাম, ব্যবসায় আরম্ভ করিবার পর আমার মূলধন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে। আমি তখন ছই সহস্র মুদ্রার অধিকারী, আমি তাহা হইতে হাজার টাকা লইয়া আমার দাদাকে দান করিলাম। তিনি আনন্দের সহিত সেই দান গ্রহণ করিয়া আমার নুতন করিয়া ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দ্বিতীয় ভ্রাতা ব্যবসার উঠাইয়া বিদেশে যাইবার সঙ্কল্প করিল, আমি ও আমার বড় দাদা তাহাকে সে সঙ্কল্প পরিভাগ করিতে বহুতর অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহাকে তাহার সঙ্কল্প হইতে স্থলিত করিতে পারিলাম না। সে তাহার জিনিস পত্র বিক্রয় করিয়া বাণিজ্যের ব্যবসায় সফর করিয়া বিদেশ যাত্রা করিল। এক বৎসর পর সেও আমার বড় দাদার মত অসহ্য অবস্থার বিরিয়া আসিল। ঐ সময়ে মধ্যে আমার হাজার টাকা লাভ হইয়াছিল, আমি তাহাই তাহাকে প্রদান করিলাম। সে সেই টাকাতে একখানি দোকান খুলিয়া ব্যবসার আরম্ভ করিল।

একদিন আমার ছই ভাই আমাকে বলিলেন,—“জাহাজে চড়িয়া বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করার অনেক লাভ, অতএব তাহাই আমাদের কর্তব্য।” আমি বলিলাম, “একবার ত আপনারা বিদেশে গিয়া বাণিজ্য করিয়া আসিলেন; কিন্তু লাভবান হইরাছিলেন, তাহার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে; আমি যে আপনারদের মত লাভবান না পড়িব, তাহা কেমন করিয়া বলিব?”—কিন্তু তাঁহাদিগকে আমি নিরন্তর করিতে পারিলাম না, আমিও তাঁহাদিগের কথাই তখন স্মৃত হইলাম না; অবশেষে পাঁচ-বৎসর পরে আমি কোনক্রমে তাঁহাদিগের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, বাণিজ্য-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

তখন বাণিজ্যের জন্ত কি কি সামগ্রী লওয়া উচিত, তাহা লইয়া আমার দাদাদের সঙ্গে আলোচনা করিতে করিতে জানিতে পারিলাম, আমি তাঁহাদের প্রত্যেককে আমার লগাংশ হইতে যে হাজার টাকা দান করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহারা ছইজনেই নিশ্চেষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের হস্তে আর কপর্দক মাত্র নাই। কিন্তু এজন্য আমি তাঁহাদিগকে একবারও তৎস্মা করিলাম না; ততদিন ব্যবসারে আমার ছয় হাজার টাকা মূলধন পাড়াইয়া ছিল; আমি সেই টাকা ছই ভাগে বিভক্ত করিয়া তিন হাজার টাকা যাত্রা লইয়া বিদেশযাত্রা করা কর্তব্য মনে করিলাম। অবশিষ্ট টাকা মাস্তির নীচে লুকাইয়া রাখিয়া যাইবার ব্যবস্থা করিলাম এবং আমার দাদাদের বলিলাম,—“তিন হাজার টাকা রাখিয়া বাইতেছি, যদি বিদেশে দৈবচক্রিপাক আমাদের মূলধন নষ্ট হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে একেবারে পথে পাড়াইতে হইবে না, আমার এখানে আসিয়া দোকান খুলিব।” আমি আমার পৃথকভাবে তিন হাজার টাকা প্রেরণ করিয়া রাখিলাম, অবশিষ্ট তিন হাজার আমরা তিনজনেই ভাগ করিয়া লইলাম।

অনন্তর জিনিস-পত্র কিনিয়া একখানি জাহাজ ভাড়া করিয়া অসহ্য প্রদেশে প্রেরণ করিলাম। অসহ্য বাহুতরে সমুদ্রবক্ষে জাহাজ নাচিতে নাচিতে গিয়া এক মাস পরে তখন যাত্রা করিয়া, আমরা একটি বন্দরে নিরাপদে প্রবেশ করিলাম। সেখানে আমরা আমাদের পণ্যসম্পত্তি বিক্রয় করিলাম। যাত্রা-ব্যয়ই অধিক হইল। আমি এক টাকার প্রায় পয়সা মাত্র বিক্রয় করিলাম। আমার বড় ভাই নৈশের জিনিস-পত্র কিনিয়া তাহা দেশে আসিয়া বিক্রয়ের জন্য লইয়া গেল। আমার বড় ভাইয়ের পণ্যসম্পত্তি বিক্রয় করিয়া

যখন আমাদের জাহাজ হাড়িবে, তখন সেই বন্দর সমুদ্রবক্ষে আনিয়া একটি প্রদেশে প্রেরণ করিতে পাইলাম। রমণীট পরমাত্মশ্রী, কিন্তু পারিবারিক দোষে মৃত্যু পাইয়াছিল। সে আমার করতল চুম্বন করিয়া আমার প্রতি তাহার ভালবাসা প্রকাশিত করিয়া এবং তাহাকে বিক্রয় করিয়া দেশে লইয়া যাইবার জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। কাকট বড় ভাল হইলে না হইয়াই প্রায় আমার বিবাহ হয়, তাই আমি তাহার প্রস্তাবে প্রথমতঃ কর্ণপাত করিলাম না, কিন্তু অন্ততঃ যখন কোনক্রমে তাহার হাত হইতে এড়াইতে পারিলাম না, তখন তাহাকে গদ্য লগাইয়া পলাতন মনে হইল। অনন্তর মূল্যস্ফূর্ত পরিদ্রবে তাহাকে হুজিা করিয়া এখািবি বিবাহ করিলাম, তাহার পর সমুদ্র-যাত্রা করিলাম।

অসহ্য
প্রদেশে



সুখী-বহু
লাভ



জাহান্নামে উত্তীর্ণ হইলাম। দেখিলাম, আমার নব বিবাহিতা পরী আমার গুণে গুণবতী, কেবল রূপ তেমনই ছিল। জাহান্নাম রূপে শুধু হইয়া আমি প্রতিদিন তাহার প্রতি অমিতব্যয় অতুল্য হইয়া উঠিলাম। আমার দুই দালা বাগিকে আমার ভায় লাভবান হইতে পারেন নাই, আমার উত্তীর্ণিতে তাঁহাদের মনে ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, এমন কি তাঁহারা আমার প্রাণনাশ করিবার জন্য বহুতর পরীচেষ্টা করিলেন। অবশেষে একদিন রাত্রিতে তাঁহারা আমাকে ও আমার স্ত্রীকে জাহান্নামের উপর হইতে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন, তখন আমরা উভয়েই ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন।

নমুনে পড়িয়াও কিন্তু আমরা ছুবিলাম না। আমার স্ত্রী একটি পরী, সুতরাং তাহার অমৃত কন্যতা ছিল, সেই কন্যতাবশেই আমি রক্ষা পাইলাম। আমি জলে পড়িবামাত্র আমার স্ত্রী আমাকে কোঁড়ে তুলিয়া একটি



বীণে লইয়া গেল। বীণে উপস্থিত হইয়া আমার স্ত্রী সহান্তে বলিল, “দেখ প্রিয়তম, তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া প্রীতি-প্রণয় দান করিয়াছ। সেই ভালবাসার প্রতিদানে আমি তোমার প্রাণ বাঁচাইলাম। আমি সত্যই ত আর মাহুষ নহি—আমি পরী; তোমাকে দেখিয়াই আমি তোমার রূপে মোহিত হইয়াছিলাম, নতুবা নরলোকের সাধ্য কি আমার অঙ্গস্পর্শ করে। তুমি যেরূপ সদাশয় ব্যক্তি, তাহাতে তোমার উপকার করাই আমার কর্তব্য, ইহাতে কৃতজ্ঞতামাত্র প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমি তোমার দুই দালা উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছি, তাহাদের প্রাণবধ না করিয়া আমি কাত হইব না।”

আমি আমার স্ত্রীকে আমার জীবন দান করার বহু ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। অবশেষে বলিলাম, “তুমি আমার ভ্রাতাদের কথা না করিলে আমি ছাড়িলাম না। যদিও তাহারা আমার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিয়াছে, কিন্তু আমি তাহাদিগের বিনাশ বাসনা করি না।” আমি দাদাদের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছি, আমার স্ত্রীকে সে কথাও বলিলাম। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া তাঁহরি ক্ষোভের বৃদ্ধি হইল। তিনি

করিয়া কহিলেন, “একপন্নসিঁহাট কখন কখন বোণা করে, আমি এই বড় ভাইদের প্রতি উপস্থিত
কৃতবিদ্যন করিব। আমি তাহাদের সাহায্য সমুদ্রে ডুবাইরা দিব। সমুদ্রপথে তাহাদের পৌঁছন সম্ভব হইবে।”
সুপ্রতিভা হার হাত ধরিয়া বলিলাম, “না ভ্রমস্বী, তুমি কখনই এমন নির্দয় ব্যবহার করিতে পার না, তাহারা যে
আমার ভাই; মন্য করিয়াছে বলিয়া আমার তাহাদের ভাল না করিব কেন?”

আমার এই কথা শুনিয়া পরী বড়ই রাগ করিল, তাহার পর আমাকে মুহূর্ত মধ্যে সেই বীণ হইতে তুলিয়া
জামার গৃহের ছাদে আনিয়া কেলিয়া কোথায় অন্তর্ধান করিল। আমি ছাদ হইতে নামিয়া দ্বার খুলিলাম,
তাহার পর গৃহকোণ হইতে আমার সেই শুশ্রূষন বাহির করিয়া কেলিলাম। আবার রীতিমত সোঁকান করিতে
লাগিলাম। আমার বুক-বাঁহব ও সদাগরেরা দীর্ঘকাল পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল।
বাকী আসিয়া এই দুইট কুকুরকে দেখিতে পাইলাম, তাহারা অত্যন্ত কাতরভাবে আমার পদতলে লুটাইয়া
পড়িল। প্রথমে আমি ইহার কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না। শেষে আমার পরী—সেই পরী মহা আমার
বিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, “প্রিয়ভম, এই কুকুর দুইটকে দেখিয়া অবাক হইও না; ইহারা তোমার দুই শুশ্রূ
ধর দাদা।” কথা শুনিয়াই আমার চক্ষুরি। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “মাছব হঠাৎ কুকুর হইয়া গেল
কিহুগে?” পরী বলিল, “আমি করিয়াছি। আমার একজন ভগিনী ইহাদের জাহাজখানিও ডুবাইয়া কিহুগে।
তোমার অনেক পণ্যদ্রব্য ডুবিয়া গিয়াছে এবং সে সমস্ত তোমার বিশেষ কৃতি হইয়াছে বটে, কিন্তু তুমি চিন্তা
করিও না, অস্ত্র উপায়ে আমি তোমার কৃতিপুণ্য করিব। তোমার অস্ত্রধর দশ বৎসর কাল এই ভাবে কুকুর-
দেহ বহন করিবে, তাহাদের বিবাসবাতকতার ইহাই দণ্ড।” এই কথা বলিয়া পরী সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

দশ বৎসর শেষ হইয়া আসিল, এখন কোথায় আমার সেই স্ত্রী বা তাহার ভগিনী সেই পরীর সন্ধান পাইব,
সেই চেষ্টার ব্যয়িা বেড়াইতেছি, পথিমধ্যে সহসা এই সন্ধানের মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ। দৈত্য মহাশয়, আপনি
প্রথম বৃক্ষের গল্ল শুনিয়াছেন, আমার গল্লও শুনিলেন; এখন বলুন দেখি, আমার এই কাহিনী অতি অদ্ভুত কি না?

দৈত্য বলিল, “হী, ইহা অতি আশ্চর্য্য কাহিনী বটে; আচ্ছা, আমি আমার অঙ্গীকার পালন করিলাম,
তোমার এই গল্পের সম্বন্ধ এই সদাগরের এক-তৃতীয়াংশ অপরাধ ক্ষমা করিলাম।”

তৃতীয় বৃক্ষ এতক্ষণ নীরবে গল্প শুনিতেছিল, সে দৈত্যকে বলিল, “দৈত্যরাজ—এখন আমার গরুট শুনিতে
হইবে, কিন্তু যদি আমার গল্প সন্ধ্যাপেক্ষা অধিক অদ্ভুত হয়, তবে এই সদাগরের অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ
অপরাধও আপনি ক্ষমা করিবেন, অঙ্গীকার করুন।” দৈত্য সেই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া তৃতীয় বৃক্ষের গল্প
শুনিতে বলিল। সে গল্প অতি বিচিত্র ও বিস্ময়কর।

শাহারজাদী বলিলেন, জাহাপনা অন্তঃপর তৃতীয় বৃক্ষ তাহার বিস্ময়কর কাহিনী বলিতে লাগিলেন,—

— ৩৩৩ —

“রাজাধিরাজ দৈত্যকুলপতি! এই ঘোটকী আমার বিবাহিতা পরী। কার্য্যগতিকে আমি এক-
বৎসর বিদেশে ছিলাম। পর্যটন-শেষে এক গভীর রজনীতে আমি গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। পরীর পদ-
ক্ষেপে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, আমার দুবতী পরী এক কক্ষকার ক্রীড়াঙ্গের সহিত আশ্রিত-বদ্যবহার
রহিয়াছে। তাহারা প্রেমচর্চা করিতে করিতে এমনই বিভোর হইয়াছিল যে, প্রবেশকৃত আমার আগমন
লক্ষ্য করে নাই। আমি আমার ক্রীড় ব্যক্তির দর্শনে বিষমই ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলাম। ক্রুদ্ধাঙ্গের

তৃতীয়
বৃক্ষের
মিহির
কাহিনী

ক্রীতদাসটা যখন আমার দ্বীপ ফুলারবিন তুলা ওঠপুটে চুখন-রেখা সৃষ্টিত করিতেছিল, তখন আমার দ্বী ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়িতেছিল।

ক্ৰোধে কল্মিত-কলবের হইয়া আমি কক্ষমাধ্য প্রবেশ করিলামাত্র, আমার দ্বী আমাকে দেখিতে পাইল। সে তখনই তাহার প্রেমিকনাগরের আলিঙ্গন-পাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইয়া একটা বারি লইয়া মস্তোচ্চারণ করিতে করিতে আমার নিকে ছুটিয়া আসিল। তারপর বারি হইতে মস্তপূত বারি আমার অঙ্গে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—“তুই এখনই কুকুরখোনি প্রাপ্ত হ’।”

মূহুর্ত মধ্যে আমি কুকুরের দেহ প্রাপ্ত হইলাম। তখনই প্রাণভরে দৌড়িতে দৌড়িতে রাজপথে উপনীত হইলাম। সারারাত্রি দৌড়িয়া দিবাভাগে আমি এক মাংস বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইলাম। তথায় ইতস্ততঃ যে অস্থি মাংস পড়িয়াছিল, জুখার জালায় তাহা চৰ্শন করিতে লাগিলাম। মাংসবিক্রেতা আমাকে দেখিতে পাইয়া দয়াপরবশ হইয়া আমাকে তাহার গৃহে লইয়া গেল।

তাহার বৃত্তী কস্তা আমাকে দেখিয়াই অবগুষ্ঠনে তাহার মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া বলিল,—“বাবা, আপনি পরপুরুষকে বাড়ীর ভিতর আনিলেন কেন?” তাহার পিতা বলিল, “পুরুষ আবার এখানে কে আছে?” কস্তা বলিল, “এই কুকুরটাই ত পরপুরুষ; উঁহার দ্বী উঁহাকে মায়াবলে কুকুর করিয়া দিয়াছে। আমি উঁহাকে মায়াযুক্ত করিতে পারি।” তাহার পিতা এই কথা শুনিয়া বলিল, “বৎসে, জালায় দোহাই, তুমি উঁহাকে মায়ায় জাল হইতে মুক্ত কর।”

বৃত্তী স্তম্ভরী তখন একপাত্র জল লইয়া তাহা মস্তপূত করিয়া আমার দরজা হে ছড়াইয়া দিয়া বলিল, “আপনি এই দেহ ত্যাগ করিয়া নিজ স্বাভাবিক দেহ প্রাপ্ত হউন।”

আমি পূর্ণদেহ প্রাপ্ত হইয়া, তাহার সুকোমল করণব শ্রদ্ধাভরে চুখন করিয়া, আমার হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলাম। তারপর বলিলাম, “ভদ্র, তুমি আমাকে পুনর্জীবন দিলে, এজন্ত আমি তোমার কাছে চিরঋণী রহিলাম।

এখন দয়া করিয়া তুমি আমার ছুটা দ্বীকে অল্প পশুসৃষ্টিতে রূপান্তরিত করিয়া দিলে আমি আরও বাঞ্ছিত হইব।”

বৃত্তী আমার হাতে একপাত্র মস্তপূত জল দিয়া বলিল,—“ভদ্র, আপনার দ্বী যখন নিদ্রিত থাকিবে, সেই সময় তাহার দেহে এই জল ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে যে দেহ ধারণ করিতে বলিবেন, সে তখনই সেই দেহ ধারণ করিবে।” আমি তাহার নির্দেশমত নিদ্রিতা দ্বী দেখে, মস্তপূত বারি নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে ষোটকীরূপে পরিবর্তিত করিরাছি। এই সেই ষোটকী।

দৈত্যরাজ সন্নিহরে ষোটকীকে বলিল, “এ কথা সত্য?” ষোটকী ইঙ্গিতে তাহা স্বীকার করিল। তখন দৈত্যরাজ তাহা শুনিয়া সন্নিহরকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

গম সমাপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে উভয় আলোক প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিল। তখন দিনারজাদী বলিলেন, “বিনি, তোমার গল্পগুলি অতি চমৎকার। এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্প আমি শুনি নাই।” শাহারজাদী বলিলেন, “এ গল্প ত কিছুই নয়। আমি অস্ত্র যে সকল গল্প জানি, তাহা শুনিতে সক্ষম হইবে। মূলতান যদি অল্পমতি করেন, তবে অস্ত্র রাজনীতে সে পরমাচর্য্য কাহিনী বলিতে পারি।” বাদশাহ ভাবিলেন, শাহারজাদীর স্বপ্নের মুখে এই গল্পগুলি অতি চমৎকার। গল্পের আনন্দপ্রসন্ন মদিরার সহিত এই স্তম্ভরীর রূপের সুখা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ না করিয়া ইহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইবে না। এইরূপ চিন্তার পর তরুণী শাহারজাদীর কুহুম-পেলব দেহ কক্ষ চাপিয়া ধরিয়া মূলতান অবশিষ্ট সময় সুখাবেশে বাগন করিলেন; তারপর নির্দিষ্ট সময়ে রাজদরবারে গিয়া কর্তব্যসম্পাদন করিলেন। সন্ধ্যাসমাপ্তে প্রাসাদে আসিয়া, পান-ভোজনান্তে শাহারজাদীর সহিত বিহার করিলেন।

দিনারজাদী মধ্যাহ্ন-শেষে বলিলেন, “মিদি, এইবার তোমার গল্প আরম্ভ কর। স্থলভান বোধ হয় ইহাতে আগ্রহী করিবেন না। স্থলভান এই কাহিনী শুনিবার জন্য এমন উৎসুক হইয়াছিলেন যে, তিনি সহজেই সন্মতি দিলেন। তখন শাহরজাদী কাহিনী আরম্ভ করিলেন।



অনেক কাল পূর্বে কোন দেশে একজন বৃদ্ধ জেলে বাস করিত। স্ত্রী ও তিন পুত্র সহীয়া অতি কষ্টে সে সংসার চালাইত। সে বড় পরীষ ছিল, সমুদ্রে জাল ফেলিয়া যে মৎস্ত পাইত, তাহাই তাহার পরিবারবর্গের একমাত্র উপজীবিকা ছিল। সকালবেলা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে চারিবার জাল ফেলিত।

একদিন অতি প্রত্যুষে সে সমুদ্রতীরে গিয়া সমুদ্রজালে জাল ফেলিল। জাল টানিয়া তুলিতে গিয়া বিদ্রম ভারী বোধ হইল। তাহার বোধ হইল,—জালে কোন বড় মাছ পড়িয়াছে। জেলে মনে মনে মহা খুসী হইল। বহুকষ্টে জাল তীরে তুলিয়া জেলে দ্বাধা দেখিল, তাহাতে তাহার সকল আশা নিঃসরগত হইয়া গেল। জেলে দেখিল, জালে যে পদার্থ উঠিয়াছে—তাহা মাছ নহে, একটা গাধার মূত্রেবহ। সকাল বেলা জালে গাধার একটা মূত্রেবহ উঠিল দেখিয়া তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। সে ভাবিল, আজ দিনটি বড় মন্দ, আজ আর কিছুই হইবে না। কিন্তু সহজে কেহ আশা ত্যাগ করে না, সুতরাং জেলে আবার জেলে জাল ফেলিল। আবারও জাল ভারী বোধ হইল, সুতরাং মাছ আছে মনে করিয়া খুসী হইয়া সাবধানে জালখানি টানিয়া তীরে তুলিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য,—সেবার একটা বোড়া উঠিল, কাদা আর বাগিতে বোড়া পরিপূর্ণ। জেলে সখেদে বলিল, “হা ভাগ্য! আজ অল্পে বড় দুঃখ আছে দেখিতেছি। আল্লা, এ বড়ার উপর একই মেহেরবাণী কর। আমার সংসার-পালনের আর কোন উপায় নাই। জালে যদি কিছু না উঠে ত ছেলেপিলেগুলি সমস্ত দিন অনাহারে থাকিবে। অংশ, তোমার কোন কাজ আমার বুঝি উঠিতে পারি না, তোমার রাজ্যে ধার্মিক লোক অনাহারে থাকে, বাহারা মহৎ লোক, কেহ তাহাদের নামও জানিতে পারে না, আর বাহারা পাশিষ্ট, পৃথিবীর ভারবরণ—তাহাদিগকেই তুমি সুখী কর, তাহাদিগকে অর্থ, সম্পদ, ধনদৌলত সকলই দান কর।”

এইরূপ আক্ষেপ করিয়া জেলে সেই বোড়াটা ক্রোধভরে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আবার জেলে জাল ফেলিল। এবার কতকগুলি প্রস্তরখণ্ড, শামুক, গুলি ও বালি উঠিল। এবার জেলের মনস্তাপের আর সীমা রহিল না। সে নামাজ করিবার সময় বলিল, “আল্লা, তুমি জান, আমি চারিবারের অধিক জাল ফেলি না। তিনবার জাল ফেলা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এ তিনবারে কিছুই পাইলাম না। শেষবার যদি কিছু না পাই, তাহা হইলে আমার আজ অনাহারে দিন কাটিবে। হে আল্লা, দয়া কর! এবার আমার জালে কিছু দাও, দোহাই তোমার।”

নামাজ শেষ করিয়া জেলে আবার জাল ফেলিল। এবারও জাল বড় ভারী। হয় ত কিছু পাওয়া গিয়াছে, সমুদ্র-নিমজ্জ কলসী। আল্লা যুধ তুলিয়া চাহিয়াছেন তাহা, জেলে সাবধানে জাল টানিয়া তুলিল; কিন্তু দেখিল, জালে একটা চাঁদা মাছও উঠে নাই, তৎপরিবর্তে একটা তামার কলসী উঠিয়াছে। কলসী অত্যন্ত ভারী দেখিয়া জেলে ভাবিল, “আল্লা আমার প্রার্থনার কর্পণত করিয়াছেন, ইহাতে নিতরই অনেক টাকা পোহের আছে।” সাবধানে উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কলসীর মুখ ঢাকা, ঢাকনির উপর একটা মোহর।

জেলে কলসীটির লবণ কিছু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, নাড়িয়া চাড়িয়া ভিতরে কিছু আছে কি না, তাহা বুঝিতে পারিল না। কলসীর উপর অনেকক্ষণ কাপ পাতিয়া বসিয়া রহিল, কিন্তু কোন লব্ধি পাইল না। তখন তাহার বিবাল হইল, ইহাতে নিশ্চয়ই কোন মূল্যবান সম্পত্তি আছে। কি আছে, তাহা দেখিবার জন্য জেলে বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিল এবং ছুরি বাহির করিয়া ঢাকনীটা খুলিয়া ফেলিল। ঢাকনী খুলিয়া অধোমুখ করিয়া ঝাঁকাইতে লাগিল, কিন্তু ভিতর হইতে কিছুই পড়িল না। তখন সে কলসীটা কেলিয়া একদূরে সে দিকে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল, অন্নকণের মধ্যেই কলসীর ভিতর হইতে ধূম বাহির হইতেছে, ধূমের পরিমাণ ক্রমে বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া জেলে একটু সরিয়া দাঁড়াইল।

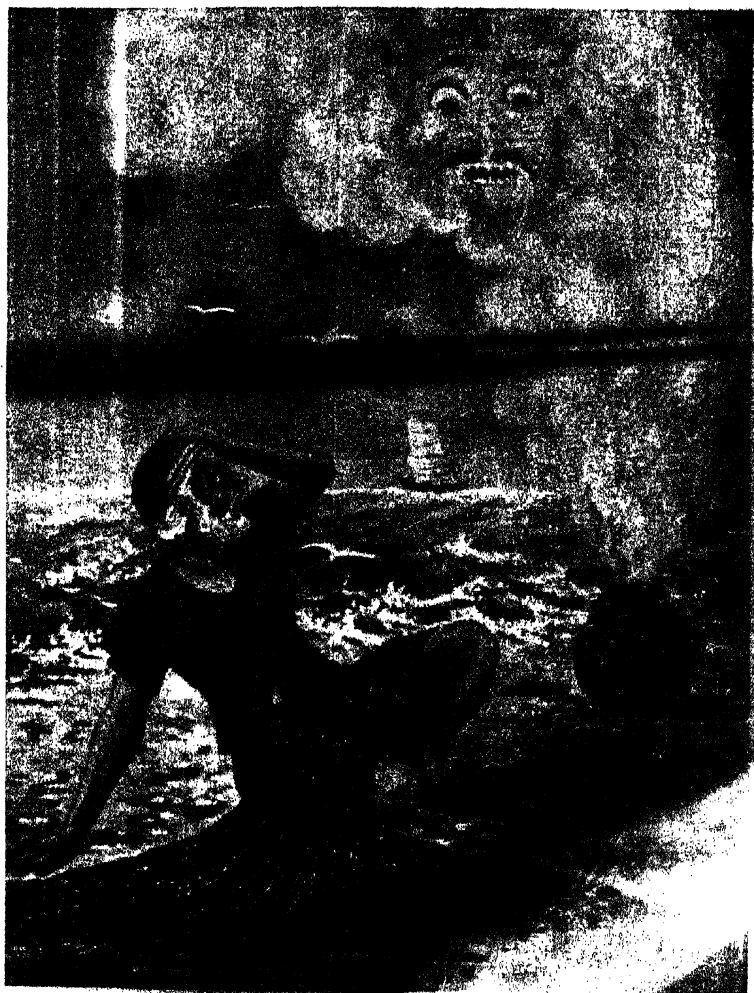


নীল
হর
শঙ্ক
ত্যা
১০

ক্রমে সেই ধূম আকাশ স্পর্শ করিল, জল ও স্থল তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল, যেন নীতের প্রভাতের কুয়াশা। এই দৃশ্য দেখিয়া জেলের বিষয়ের সীমা রহিল না। সমস্ত ধূম বাহির হইয়া জমিয়া গেল এবং এক ভীষণাকার দৈত্যে পরিণত হইল।

আকাশ-জোড়া দেহ লইয়া দৈত্য জেলের নিকট দাঁড়াইয়া উচ্চগুণে করজোড়ে বলিল, “সৈয়দান, সলোমান, আমাকে এবার ক্ষমা কর, আমি আর কখন তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিব না।”

জেলে দৈত্যের মুখে এই কথা শুনিয়া সাহস করিয়া বলিল, “হে গর্ভিত দৈত্য! তুমি এ কি কথা বলিতেছ! সলোমান ও আজ প্রায় দুই হাজার বছর পৃথিবী-ত্যাগ করিয়াছেন।” দৈত্য ঘণাভরে জেলের দিকে চাহিয়া ক্রকুট করিয়া কলিল, “রে ক্ষুদ্র মানুষ, আমার সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বল।” জেলে বলিল, “কবে আমি তোমাকে সর্বশেষে বলিয়া ডাকিব।” দৈত্য আরও রাগ করিল। বলিল, “কেন যদি ছোট-মুণ্ডার কথা বলিবি, তোর প্রাণবধ করিব।” জেলে বলিল, “তাহা ত করিবেই, লোকের ভাল করিতে নাই, আমি তোমাকে সমুদ্রগর্ভ হইতে উদ্ধার করিলাম, আর এইরূপে তুমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে।” দৈত্য বলিল, “তুমি আমাকে সমুদ্রগর্ভ হইতে তুলিয়াছিলি বটে; তবুও তোমার প্রাণবধ করিতেই হইবে। তবে আমার প্রতি একটা অনুরোধ দেখাইতে পারি।” জেলে বলিল, “অনুরোধটা কিরূপ প্রকাশ করিয়া বলিলে যুক্তিযুক্ত পারি।”



দৈত্য বলিল, "এইটুকু অস্ত্র গ্রহণ করিতে পারি যে, তুমি যে ভাবে মরিতে চাহিবে, সেই ভাবেই তোমার মৃত্যু লাভ হইবে, তা ভুলে ভুবিয়াই মরিতে চাও, আর অস্ত্রিতেই পুঙ্খিল বর কিংবা আমার একটি চপেটাঘাতেই পঞ্চ-প্রাণির ইচ্ছা কর, দ্বারা তোমার ইচ্ছা বল।" লোক-বলিল, "তোমার খুব নাম শরীর দেখিতেছি, কিন্তু আমি ও তোমার কোন কতি করি নাই, প্রত্যেক আমারকে মরিতে কেন।" দৈত্য বলিল, "আমার উপহার করিয়াই ও তোমার নিজের পাশে মৃত্যু ব্যতীত, তোমাকে হত্যা করিয়া আমার লাভ নাই, তুমি আমার বধা, কেন তাহা মনেই করিতে পারিবে।" এই বাক্য শ্রবণে দৈত্যের মস্তিষ্কে একটা চিন্তা উপস্থিত হইল।

‘‘ভৈরবের পূজা সেলামের আদ্যক তাঁহার জীবনী।’’ ইত্যাদি কবিতা-কলমে, ‘‘আমি ভৈরব জীবনীকার করিলাম।’’ সেলামের আদ্যের অস্বাভাব্য বিবিক্ত-হইয়া আসনকে বাস্তবায়ন করিবার জন্য এই ভাষার কলমে আদ্যক আবহ করিয়া রাখিলেন। আমি বাহাতে সেই কলমের ঢাকনী ঠেগিয়া খোঁজ করিলাম বাহির হইতে না পারি, সেই জন্ত ঢাকনীর উপর সেলামের চকরের নামাঙ্কিত এক মোহর মরিয়া গিলেন। সেলামের বীজত এক দৈত্য তখন কল্যাণী সমুদ্রভাগে নিক্ষেপ করিয়া দেল। আমি সমুদ্রে পড়িয়া মরিলাম।

“আমাকে কেহই তুলিল না, কলসে আঁকব হইয়া আমার বড় কষ্ট হইতে লাগিল। তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, এক শত বৎসরের মধ্যে যে আমাকে তুলিবে, আমি তাহাকে মহা ধনবান করিয়া দিব। সময় কাটিতে লাগিল, একশত বৎসরের মধ্যে কেহই আমাকে তুলিল না। দ্বিতীয় শত বৎসর আরম্ভ হইল, আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, এই একশত বৎসরের মধ্যে যে আমাকে তুলিবে, আমি তাহাকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের সমান বলিয়া দিব। কিন্তু তথাপি আমার সোভাগ্যবান হইল না, কেহ আমাকে তুলিল না। এক তাহেই আমি সবদ্রপ্তে পড়িয়া রহিলাম।

“তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভ কালে আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, যে আমার উদ্ধার করিবে, পৃথিবীতে তাহাকে আমি অতি শক্তিশালী সম্রাট করিব, সর্বমুখ তাহার নিকট বাস করিব। প্রত্যহ তাহার তিনটি অঙ্গুরোধ রক্ষা করিব। কিন্তু কেহ আমাকে তুলিল না, সমুদ্রতটে পড়িয়াই সে শব্দ বৎসর কাটিয়া গেল।। বাগ করিয়া তখন আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্তঃপুরে যে কেহ আমাকে সমুদ্র হইতে তুলিবে, আমি তাহারই প্রাণবিনাশ করিব, তবে এইটুকু অঙ্গুরোধ করিব যে, সে যে প্রশাণীতে মরিতে চাহিবে, সেইরণেই তাহাকে মরিতে দেওয়া হইবে। এক কাল পরে তুমি আমাকে উদ্ধার করিরাছ—বল কি ভাবে মরিতে চাই। আমি শীঘ্রই প্রতিজ্ঞা পালন করিব।”

জেনে দৈত্যের কথা শুনিয়া বিধ্বংসভাবে চিন্তা করিতে লাগিল। দেখে বলিল, “আমার হৃদ্যাপাণ্ডা যে আমি এমন একটা অকৃতজ্ঞ কানোয়ারের হাতে পড়িলাম। তুমি এই অভ্যর্থনা প্রতিজ্ঞা পালন না করিলে কোন কতি হইবে না, যে দৈত্যের, আমাকে ধাপ কর, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাই, আল্লা তোমার অঙ্গল করিবে।”

“দৈত্য মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, না, ও সকল কথা থাকিবে না, শ্রীমৎ বল কিরণে মরিতে চাহ।” জেলে অনেক হুজি দেখাইল, অনেক অহরোধ করিল, দৈত্যের দহা উদ্বেকের লজ বিতর চোঁট করিল, কিন্তু সকলই নিৰ্বাণ হইল।” দৈত্যের সেই এক কথা—এক সৌ।

বিশেষে পড়িগেই হাফিজে বুকি বাড়ে। জেনের মাথার বী করিয়া একটা বকলর আসিল। জেনের বলিল,—
 “কখন হুসি কিছুতেই হাফিজে না; তখন আমাকে হাফিজেই হইবে; কিন্তু শুলোবনের বেলারের বিবা, আমার
 বিবা, সত্য করিয়া আমার একটা কথার অবাব লাগে।” লেভা হেখিল, এবং কটকট শিখাতে শিখা-বণা চলিল
 না; সে-পূর্ব্বক করিয়া বলিল, “বী-বল; আমি-বী-বিল করিতে পারি না।”
 জেনের বলিল, “হুসি যে আমাকে হাফিজে হাফিজে, আমার কখন কি। আমি আমাকে সত্যক

हि नृकर्म भू
वाहित ।

সংবাদে
অভিলাষ

নৈভ্যের
অভ্যুপকার

হইতে তুলিয়াছি, এই জন্ত ত ? কিন্তু তুমি আমাকে বধ করিবার আগে আমার জানিবার দরকার যে, সত্যই তুমি এই কলসে ছিলে, তুমি আল্লার দিবা করিয়া এ কথা বলিতে পার ?”

দৈত্য বলিল, “আমি আল্লার দিবা করিয়া বলিতেছি, আমি এই কলসেই ছিলাম।”

কচাছুধো
রাট দৈত্য
বলী !



জ্যেলে বলিল, “আমি ও কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না, তোমার প্রমাণ কি ?—প্রমাণ দাও।”
জন্মাইরা তুমি আমাকে মারিতে পারিবে না। এই কলসে তোমার একখানা পা ঢুকিতে পারে না, যদি তুমি বিকটাকার দৈত্য হইয়া উহার মধ্যে ছিলে, ইহা না দেখিলে কে বিশ্বাস করিবে ?”

জ্যেলে এই কথা শুনিয়া দৈত্যদেহে ক্রমে ধূমপুঞ্জ পরিণত হইল। ক্রমে সে ধূমে জল স্থল জ্বল জ্বল হইয়া গেল, তাহাতে আকাশ ও পৃথিবী পরিপূর্ণ হইল ; অবশেষে সেই ধূম ধনীভূত হইয়া কলসের মধ্যে প্রবেশ করিল, আর কিছুই বাহিরে থাকিল না। দৈত্য এইরূপে কলসে প্রবেশ পূরুক বলিল, “রে অবিখ্যাসী নর ! দেখে দেখে আমার দেহ এই কলসে আঁটিতে পারে কি না ?” জ্যেলে এ কথা উত্তর না দিয়া, কলসের মুখের ঢাকখানি তুলিয়া ভাঙাভাঙি কলস ঢাকিয়া ফেলিল। তাহার পর বলিল, “রে দুর্ভক্ত দৈত্য ! আমি তোমার উপকার করিয়াছিলাম, সমুদ্রগর্ভ হইতে তোকে উদ্ধার করিয়াছিলাম, প্রত্যাশকারস্বরূপ তুমি আমার প্রাণবধের জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলি। আমি তোকে এবার সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিব, কেবল সমুদ্রেই ফেলিয়া দ্বান্ত হইব না ; এখানে এক ঘর প্রস্তুত করিয়া বাস করিব, আর যে সকল জ্যেলে এখানে মাছ ধরিতে আসিবে, তাহাদের সাবধান করিয়া দিব, যেন তোমার মত ভ্রাতার পামরকে জ্বলে টানিয়া না তোলে, যে তোমার উপকার করিবে, তাহারই প্রাণদণ্ড করিবি !”

দৈত্য জ্যেলের কথা শুনিয়া অভ্যস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, কলসীর বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ঈশ্বরের নামাঙ্কিত সলামনের মোহর কলসের মুখে ধাক্কা দে স ঢাকনী ঠেলিয়া উঠিতে পারিল না। তখন সে কোথ গৌপন করিয়া বলিল, “জ্যেলে ভাই, আমি ঠাট্টা করিতেছিলাম, ভাই, তুমি সত্য ভাবিলে, তুমি কি ধোকা ! এখন কলসীর মুখ খোল, আমি বাহিরে যাই।” জ্যেলে বলিল, “এখন আমার কাছদার মধ্যে আসিয়াছ বলিয়াই নয়ন হইয়া গিয়াছ ! এই একটু আগে কি মূর বাহির করিয়াছিলে, তাহা আমার মনে আছে। মাছ হইলেও আমি এতই নির্কোষ নই যে, তোমার মতলব বুঝিতে পারি না। আমার চৈতন্ত হইয়াছে, তোমাকে এখন সমুদ্রের নীচে ফেলিয়া আমি নিশ্চস্ত হই।”

অবশেষে দৈত্য বলিল, “আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, এবার যদি তুমি আমাকে মুক্তিদান কর, তবে আর তোমার প্রতি অভয়া ব্যবহার করিব না, তুমি এই উপকারের জন্ত যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে।”

জ্যেলে বলিল, “তোমার মত নিমকহারামকে বিশ্বাস করাও নিরাপদ নহে। তোমাকে মুক্তিদান করিলেই গ্রীকদের রাজা, ডুবান হকিমের প্রতি বৈরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহাই করিবে। কি হইয়াছিল পোন,—

—৩৩৩—

হীক-
জিও
হুয়াম
কিম



পারস্তের অন্তর্গত রুম দেশে, হুয়ান্ নামে এক রাজা ছিলেন। এককালে তাহার অনেক গ্রীক প্রেমা ছিল। রাজা কুঠরোগগ্রস্ত হইয়া অনেক দিন হইতে বড় কষ্ট পাইতেছিলেন। চিকিৎসকরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে পারিলেন না ; অবশেষে একজন হুদক, বিচকণ, বহুদর্শী ও বহু ভাবাবিজ্ঞান হকিম রাজসভায় আগমন করিলেন। হকিমের নাম ডুবান।

হকিম রাজার রোগ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, “মহারাজা কুঠ, আরোগ্য করিব, একজন আপনাকে খোদা ওষধ সেবন করিতে কিংবা মালিস করিতে হইবে না।” রাজা বলিলেন, “তাহা যদি তুমি পার, তবে আমি

তোমাকে প্রচুর অর্থ দান করিব। তোমাকে আমার সর্বপ্রধান প্রিয়পাত্ররূপে গণ্য করিব, কিন্তু তুমি কোন ঐশ্বর্য সেবন করাইতে বা মানিষ্য করিতে পারিবে না—কেমন এই ত তোমার কথা?" ডুবান বলিলেন, "হাঁ মহারাজ। কাল আমি চিকিৎসা আরম্ভ করিব।"

ডুবান গৃহে আসিয়া একখানা কাঁপা হাতলবিশিষ্ট একটি ব্যাট ও একটি বল প্রস্তুত করিলেন, এবং যথাকালে রাজার সনীপস্থ হইয়া তাহা রাজচরণে স্থাপন পূর্বক তুমির্পর্ণ করিয়া রাজাকে সেলাম করিলেন। তাহার পর রাজাকে বলিলেন, "তিনি যেখানে বল খেলিতেন, সেখানে তাঁহাকে অঝোরোহণে বাইতে হইবে।" রাজা চিকিৎসকের কথার অঝোরোহণে জীভাষলে উপস্থিত হইলে, ডুবান রাজার হস্তে ব্যাটবল সিঁদা বলিলেন,—“বতঞ্চ না বখেট্ট বাম হর, ভতঞ্চ এই ব্যাটবল লইয়া ব্যায়াম করুন। এই ব্যাটের হাতলের মধ্যে ঐশ্বর্য আছে। আপনার হাতের সংঘর্ষে ব্যাটের হাতল গরম হইয়া সেই ঐশ্বর্য আপনার চরণের ভিতর সিঁদা দেহে প্রবেশ করিবে। তাহার পর আপনি ব্যায়াম বন্ধ রাখিতে পারেন। প্রাণাদে কিরিতা আপনারকে দান করিতে হইবে, সর্বশরীর উত্তমরূপে মার্জনা করিতে হইবে, তাহার পর আপনি শয়ন করিবেন, দেখিবেন শীঘ্র আরোগ্য হইয়া গিয়াছে।”

রাজা চিকিৎসকের পরামর্শানুসারে ব্যায়াম করিয়া, তাঁহার উপদেশ বর্ণানির্ধিক্রমে পালন করিয়া, এক দিনেই রোগমুক্ত হইলেন। তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহার রোগমুক্তির সংবাদে তাঁহার আত্মিক ও অমাত্যগণ সকলেই মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

চিকিৎসক ডুবান পরদিন রাজার চরণ বন্দনা করিয়া সপ্তাহমান হইলে রাজা পরম সন্মানেরে তাঁহার নিজের পাশে উপবেশন করাইলেন। প্রকৃত ভাবে তাঁহার শুশ্রূষা করিলেন। বিবিধ প্রকারে তাঁহার প্রতি সন্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; তাহার পর রাজপ্রাসাদে একদিন ভোজের আরোজন হইল, সে দিন রাজা ডুবানকে সঙ্গে লইয়া একত্র আহাৰ করিলেন। তাঁহাকে বহুশ্রুতা পুরস্কারে ভূষিত করিলেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতা দেখিয়া ডুবান বৎপরোন্মত্তি জুই হইলেন, তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না।

রাজার উজীর লোকটি প্রত্যেক, প্রেক্ষক, চিত্রহীন এবং সর্বপ্রকার নিচকর্ষাসক্ত। রাজা চিকিৎসককে যে ভাবে সম্মানিত করিলেন, তাহা দেখিয়া উজীরের হৃদয়ে ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল, তিনি রাজার ন্যস্ত চিকিৎসকের প্রতি বিদ্বেষ ও অশ্রদ্ধা জন্মাইবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে দেখিলেন একদিন রাজাকে বলিলেন, “গর্ভাবতার, এরূপ অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে এতখানি বিধান করা রাজার ন্যস্ত অসমত কার্য। ডুবান আপনার রোগ দূর করিয়া আপনার বিশ্বাসভাজন হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার শুণ্ড অভিশপ্তি মহারাজের স্থানিত নহে, আপনাকে বধ করিবার জন্যই লোকটা আপনাকে রোগ হইতে মুক্ত করিয়াছে।” রাজা বলিলেন, “আমাকে তুমি এমন কথা বলিতে নাহন করিতে? নহে রাণি, কাহাকে তুমি এ সকল কথা বলিতেছ, এমন অজ্ঞাত কথা আমি কিরূপে বিশ্বাস করি; আমাকে যদি বধ করাই তাঁহার অভিশপ্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি আমাকে কঠিন রোগ হইতে মুক্ত করিলেন কেন?” উজীর বলিলেন, “জীহাশনা, আমি যে লংঘন পাইয়াছি, কর্তব্যবোধে তাহাই আপনার নিরুত প্রকাশ করিলাম, আমার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।” লোকটাকে আপনি এত অধিক বিশ্বাস করিলেন না, আপনার বোধসিদ্ধি এখনও ভুল হওয়া উচিত। ডুবান হকিম গ্রীস দেশ হইতে আপনাকে বধ করিবার অভিশপ্তি এত দূর আনিয়াছে।”

রাজা বলিলেন, “না উজীর, তুমি রাজাকে বিশ্বাসভাজক ও প্রেক্ষক বলিয়া বনে করিতেছ, আমি তাঁহাকে বিশেষরূপে গণ্য করিয়া দেখিয়াছি, লোকটি প্রকৃত ব্যক্তিক, বিশ্বাসী ও বরদাশী ব্যক্তি।

অভিনব
চিকিৎসা
হকোশদ।

উজীরের
জীবন বড়

দেখিলেন, গহনঘনে তাঁহার পথ হারাইয়া গিয়াছে, অনেক চেষ্টা করিয়াও পথ দেখিতে পাইলেন না। সন্ধ্যা দেখিলেন, বনমধ্যে একটি স্নানার্থী যুবতী অবনত মস্তকে রোদন করিতেছে। রাজপুত্র অশ্রুগতি সংগত করিয়া সেই রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহাও বলিলেন। ক্রীলোকটি বলিল, “আমি কোন ভারতীয় রাজার কন্যা। আমি অশ্রুস্রোহে চলিতে চলিতে নিম্নোক্তা হইয়া পড়ি, সেই অবস্থায় আমার ঘোড়ার পিঠ হইতে পড়িয়া বাই, ঘোড়া আমাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছে। ঘোড়া যে এখন কোথায়, তাহা আমি জানি না।” রাজপুত্র তাহাকে নিজের ঘোড়ার উপর তাঁহার গৃষ্ঠভাগে চড়াইয়া লইয়া চলিলেন।

মারাবিনী
গহন-কাঠ



একটা প্রাচীন ভদ্র অট্টালিকার নিকটে আসিয়া রমণী নামিতে চাহিল। তাহাকে অর্থ হইতে নামাইয়া রাজপুত্র স্বয়ং অবতরণ করিলেন এবং অর্থের বস্তা ধরিয়া অট্টালিকার দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দূর গিয়াই তিনি সন্নিহিত গুনিলেন, কে একজন কোথা হইতে বলিতেছে, “বাছা সকল, আনন্দ প্রকাশ কর, আমি তোমাদের জন্য একটি স্তম্ভপুষ্ঠ যুবককে আনিয়াছি।” এই কথা শুনিয়া একসঙ্গে অনেকে বলিল, “কোথায় মা, কোথায়? আমরা তাহাকে খাইয়া বাঁচি, ক্ষুধার ব্যতন আর সহ্য হয় না।”

রাজপুত্র বুলিলেন, তিনি মহাবিপদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন। এই ক্রীলোকটি রাজকন্যা বলিয়া পরিচয় দিল বটে, কিন্তু সে নরমাংসলোভুপা রাক্ষসী ভিন্ন আর কিছুই নহে, যাহুবিন্যাসে সে রাজকন্যার মূর্তি ধরিয়া জঙ্গলে বসিয়া শিকারের চেষ্টাতেই ছিল। মারাবিনীরা এই ভাবেই অসহায় পবিকগণের প্রাণবধ করে। এই সকল কথা ভাবিয়া রাজপুত্র ভয়ে ধ্বংস করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাজপুত্র আর অগ্রসর না হইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্রু আরোহণ করিলেন।

সেই মারাবিনী রাক্ষসী তখন রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া মধুরবচনে বলিল, “তুমি কে, আমার কাছে পরিচয় দাও, তোমার কোন ভয় নাই, বল, তুমি কি জন্ত এ মহাবনে প্রবেশ করিয়াছ?”

রাজপুত্র বলিলেন, “স্বপ্না করিতে আসিয়া পথ হারাইয়া আমি পথের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি।” রাক্ষসী বলিল, “যদি পথ হারাইয়া থাক ভগবানকে ডাক, তিনিই তোমাকে পথ দেখাইয়া দিবেন; এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন।”

রাজপুত্র ভাবিলেন, ইহা রাক্ষসীর ছলনামাত্র, কিন্তু তিনি তাহার উপদেশ অগ্রাহ্য করিলেন না। উত্তর হস্ত উর্দ্ধে তুলিয়া করযোড়ে সেই সর্বাঙ্গস্থায়ী আজ্ঞাকে ডাকিয়া বলিলেন, “হে সর্বাঙ্গস্থায়ী প্রভু, আমাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার কর।” এই প্রার্থনা শুনিবামাত্র রাক্ষসী তাহার অট্টালিকায় প্রবেশ করিল, রাজপুত্রও ঘোড়া ছুটাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং শীঘ্রই পথ পাইয়া বন্যাসমরে প্রাণাদে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর—তাঁহার পিতার নিকট প্রকাশ করিলেন, উজীরের দোষেই তাঁহাকে এত কষ্ট পাইতে হইয়াছে। রাজা উজীরের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রাণদণ্ডা প্রদান করিলেন।

কুম-রাজকে
বোচনা



কুম-রাজকে তাঁহার উজীর বলিলেন, “ধর্ম্মবতার, ডুবানের উপর আপনার অসীম বিশ্বাস, যদি আপনার এই বিশ্বাস দূর না হয়, তাহা হইলে আপনার মঙ্গল নাই, সে এক জন গোয়েন্দামাত্র, শত্রু কর্তৃক আপনার প্রাণনাশের জন্য প্রেরিত হইয়াছে। সে আপনার পীড়া আরোগ্য করিয়াছে বলিতেছেন, কিন্তু তাহার প্রমাণ কোথায়? হয় ত ইহা বাহা উপশম মাত্র, কিন্তু রোগ প্রবল আছে। আর এই রাজা উপশমই যে কালে অতি শোচনীয় কল প্রদান করিবে না, তাহাই বা কে বলিয়া?”

গ্রীকরাজা লোকটি বভাবতাই কিছুদূরল প্রকৃতি। উজীরের প্রমতিসকি বৃষ্টিগাও বৃষ্টিলেন না, ক্রমাপত উজীরের কুপসার্মশ্চ তনিয়া তাঁহার সেকর বিচলিত হইল। তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “উজীর, তুমি বাহা বলিতেছ, তাহা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে বটে। আমার জীবন নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ভুবানের এখানে আগমন করা অসম্ভব নহে, হয় ত কোন দিন কোন গুণবের আশ্রয় ধারাই আমার প্রাণ নষ্ট করিবে। কি করা এখন কর্তব্য, তাহা স্থির করিতে হইবে।”

উজীর রাজার মতপরিবর্তনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিল, “এ বিপদ হইতে উদ্ধারের একমাত্র উপায় আছে, অবিলম্বে ভুবানের যুগলেশ্বরের আদেশ প্রদান করুন।”—রাজার আদেশে কর্তব্যনির্ণয় ভুবানকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিল। ভুবান রাজার নিকট উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, “হকিম, তোমার এ রাজ্যে আসিবার উদ্দেশ্য বৃষ্টিগাছ, তোমার বড়বয়ের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্ত আমি আদেশ করিতেছি, বাতক এই দণ্ডে তোমার শিরশ্ছেদন করিবে।”

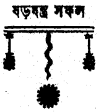
ভুবান একবারে আকাশ হইতে পড়িলেন, তাঁহার বিষয়ের সীমা রহিল না, কিন্তু তিনি বৃষ্টিলেন, অব্যবস্থিত ব্যক্তির অল্পগ্রহ অতি ভয়ঙ্কর পদার্থ! রাজা তাঁহাকে পৌরবের সপ্তমর্গে তুলিয়াছিলেন, আবার তিনিই আজ সহসা বিনা কারণে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। তথাপি তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, আমার অপরাধ কি?”—রাজা বলিলেন, “আমি জানিতে পারিয়াছি, তুমি শত্রুসৈন্যের গুপ্তচর, আমার প্রাণবিনাশের জন্ত প্রেরিত হইয়াছ, প্রথমে তুমি আমার পীড়া আরোগ্য করিয়া আমার বিবাসভাজন হইয়াছ, এখন একদিন আমার প্রাণনষ্ট করিবে। বাহাতে তাহা না করিতে পার, সে জন্ত তোমার প্রাণবধের আদেশ প্রদান করিয়াছি। বাতকগণ অবিলম্বে আমার আদেশ পালন করিবে।”

হকিম রাজার কথায় বৃষ্টিতে পারিলেন, দীর্ঘাকুল ব্যক্তির চক্কাভেই তাঁহার প্রতি এ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। দূরলচিত্ত রাজা তাহাদিগের বশীভূত, সহজেই তাহাদিগের মুহুরিসন্ধিতে মুগ্ধ হইয়াছেন। রাজার রোগ আরোগ্য করিয়া হকিম মনে মনে অতুতাপ করিতে লাগিলেন; অবশেষে রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ, এই কি বিচার? আমি আপনাকে উৎকট ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত করিলাম, আর আপনি প্রত্যাশার স্বরূপ অনায়াসে আমাকে বাতকের হস্তে সমর্পণ করিতেছেন। মহারাজ, প্রেরণ হউন, আপনি আমাকে জীবনদান করিলে পরমেশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবী করিবেন।”

জেলে দৈত্যকে বলিল,—“গ্রীকরাজ হকিম ভুবানের প্রতি বৈরপ ব্যবহার করিলেন, তুমিও আমার প্রতি সৌন্দর্য ব্যবহার করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলে। বাহা হউক, শেষে কি হইল, তাহা তোমাকে বলি।

রাজা হকিমের কথায় কর্ণপাত মাত্র করিলেন না, বলিলেন, ‘তোমাকে দণ্ডভোগ করিতেই হইবে, তোমার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, সে আদেশ আমি পরিবর্তন করিব না। আমি জানি, তুমি যেমন অতুত উপায়ে আমার ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছ, তাহা অশেষাও অতুত উপায়ে আমার প্রাণনষ্ট করিবে।’

বাতক ভুবানের চক্কা বস্ত্রবৃত্ত করিয়া তাহার মস্তকে অগ্নি প্রেরণ করিবে, এমন সময় ভুবান রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আমার প্রতি যখন কোন মতেই অল্পগ্রহ প্রদর্শন করিলেন না, তখন আমাকে কিছুদিনের জন্ত বিচারদান করুন। আমি আমার পরিবারবর্গের বিচারে প্রস্তুত হইয়া আছি, আমার আত্মসম্মতিস্বরূপ প্রত্যাশা করিতে হইবে। আমার মস্তকস্থিত অতি উৎকট ব্যাধির কারণে, রোগা হকিম যেমনি তাহা বলি করিয়া আসিয়াছে। উজীর আমার একবারে অতুত উপায়ে আমার প্রাণনষ্ট করিয়াছে।”



তাহা আরি মহারাজকে উপহার প্রদান করিব বলিয়া নব্বয়ে রাধিরাহি—সেখানিও আমাকে জালিতে হইবে।” রাজা বিজ্ঞপ্তি করিলেন, “সেখানি কি পুস্তক যে এত মূল্যবান বলিতেছ?”—ডুবান বলিলেন, “মহারাজ, সে পুস্তকে অনেক আশোকিক ঘটনার উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে একটি ব্যাপারের কথা বলি। যখন আমার শিরশ্ছেদন হইবে, সেই সময়ে মহারাজ যদি ঐ পুস্তকের বহু পৃষ্ঠা খুলিয়া তৃতীয় ছত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে মহারাজ যে কোন প্রেরণ করিবেন, আমার হিন্ন-মুণ্ড তাহার উত্তর প্রদান করিবে।”—রাজা এই পুস্তকখানি লাভের জন্ত এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, তিনি ডুবানের প্রাণবধের আজ্ঞা সে দিনের জন্ত রহিত করিয়া গৃহ হইতে সেই বিচিত্র পুস্তকখানি আনিবার জন্ত তাঁতাকে আদেশ করিলেন।

ত গ্রন্থ
পহার

ডুবান বখানসময়ে পুস্তক লইয়া রাজসভার প্রেতাগমন করিলেন। রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ, এই পুস্তক প্রেরণ করুন, কিন্তু এখনও বলিতেছি, আমি নিরপরাধ, আমাকে মুক্তিদান করুন।” রাজা বলিলেন, “তাও কি হয়? যদি তোমার কোন অপরাধ না-ও থাকে, তথাপি তোমার কথা কতদূর সত্য, তোমার

পুস্তক সভাই অসাধারণ গুণ-সম্পন্ন কি না, তাহা পরীক্ষার জন্তও তোমার শিরশ্ছেদন আবশ্যক।”—রাজার আদেশে ডুবানের শিরশ্ছেদন করা হইল। রক্তাক্ত হিন্নমুণ্ড কথা কহিল,—বলিল, “মহারাজ, ইচ্ছা করিলে এখন পুস্তক খুলিতে পারেন।” রাজা এই কথা শুনিয়া মহা আগ্রহভরে পুস্তক খুলিলেন, কিন্তু দেখিলেন, প্রথম পৃষ্ঠা দ্বিতীয়ের সহিত ঘোড়া লাগিয়া রহিয়াছে। রাজা অঙ্গুলীতে জিহ্বা সন্যোগ করিয়া সেই পৃষ্ঠা খুলিলেন, কিন্তু কোনই লেখা দেখিতে পাইলেন না। রাজা আবার অঙ্গুলীতে লালা সন্যোগ করিয়া পরপৃষ্ঠা খুলিলেন, কিন্তু কোনই লেখা দেখিতে



কতি-
মুণ্ডের
উত্তর

পাইলেন না, মুক্তকথারি একখানি সাধা বাতা। রাজা অসহিষ্ণুতবে বলিলেন, “কই যে হকিম, মুক্তকথা কোন্ সেখা দেখিতেছি না কেন?” কাটাছুত বলিল, “বড় পূজা হলু, আপনার কোঁচুহুগ চরিতার্থ হইবে।” — রাজা পুনরায় অকুলীতে লাগা মনোমোহন করিতে করিতে বড় পূজা বুঝিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই তাহার নৃত্যক ব্রূরিতে লাগিল, তিনি চতুর্দিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন, তাহার পর মনোমোহন হইতে তুণ্ডিত হইলেন। রাজা জানিতেন না যে, দুখানি তাঁহার কতরতার প্রতীয়মানের ভক্ত অতি উৎকট বিব প্রত্যেক পূজার সন্ধিত রাখিয়াছিলেন, অকুলীগাহায্যে সেই বিব লাগা “শব্দ” হওয়ার তাহা অচিরকালের মধ্যে তাঁহার গর্ভীক জর্জরিত করিয়া ফেলিল। তখন কাটাছুত পক্ষন করিয়া বলিল,— “রে পাষণ্ড, নরশিখাট, নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণনষ্ট করিবার কল বহু ভোগ কর। পরমেশ্বর জাহেন, তিনি অত্যাচারীকে এই ভাবে দণ্ডন করিয়া থাকেন।” কাটাছুত নীরব হইল, রাজার প্রশ্নও তাঁহার দেহশিখর পরিত্যাগ করিল। চতুর্দিকে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল।

গম শেষ করিয়া জেলে বলিল, “হে কৈতা, তুমি মুক্তিভেদ, তোমাকে পুনরায় নিষ্কৃত্যন করিলে আর আমার জীবনের আশা নাই, অন্তএব আমি আর তোমাকে ঐ কলস হইতে বাহির করিব না, এখনই পদাঘাত সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পৃথিবীর লোককে তোমার মত ছুরাচারের হস্ত হইতে রক্ষা করিব।”

দৈত্য সবিনয়ে বলিল, “জ্যেলে ভাই, তুমি অতি সজ্ঞান, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি আমাকে মুক্তিদান কর, তাহা হইলে তোমাকে আমি শীঘ্রই বড়লোক করিয়া দিব, তোমাকে আর জল টানিয়া কষ্টে সংসারপালন করিতে হইবে না।”

জেলে এই কথা শুনিয়া অনেকক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর বলিল,— “আমার শপথ করিয়া বল, তুমি কলসী হইতে বাহির হইয়া আমার কোন ক্ষতি করিবে না, আমি বাহাতে ধনবান হইতে পারি, তাহা করিবে।” দৈত্য সেই প্রতিজ্ঞা করিলে জেলে সেই কলসীর ঢাকনী উঠাইয়া ফেলিল। মুক্তকথ কলস হইতে পূজীভূত ধুম নির্গত হইতে লাগিল, তাহার পর কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যে দৈত্যের ভীষণ আকার জেলের সমুখে সুপ্রকাশিত হইল, দৈত্য প্রথমেই কলসটা পদাঘাত করিয়া সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল দেখিয়া, জেলের মনে তরসর আতঙ্ক জন্মিল। তাহার মনে হইল, দৈত্যটা এখনই হয় ত তাহার প্রাণসংহার করিবে, তাই সে সতরে লিজলা করিল, “হে দৈত্যরাজ, তোমার এ কিরূপ বিবেচনা! তুমি এখনই যে প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা এই মুহূর্ত্তেই ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায় করিয়াছ?”

জেলের উত্তর দেখিয়া দৈত্য হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, “না হে তোমার কোন ভয় নাই, আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা পালন করিব। তোমার ভাল লইয়া আমার সন্তোষ।” — জেলে ভাল বাড়ে লইয়া দৈত্যের অহুসরণ করিল। অনেক দূর ব্রূরিতে ব্রূরিতে অবশেষে তাহারই একটি হস্তের মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। দৈত্য জেলেটক বলিল, “তুমি এই হস্তে ভাল ফেল।” হস্তক হস্ত দেখিয়া জেলের মনে কণ্ড আনন্দের সঞ্চার হইল; কারণ, সে বুঝিল, এই হস্ত হস্তে নিজেরই অপরাধ্য পরিমাণে মাহ আছে। জেলে ভাল ফেলিয়া অতি অল্পকাল পরে তাক টানিয়া তীরে তুলিল, দেখিল, ভালে লতাই মাহ উঠিয়াছে, কিন্তু সংজ্ঞের সংখ্যা মাত্র চারিটি; চারিটিই সম্পূর্ণ বিভিন্ন বর্ণের মংত—একটি লাল, একটি লাল, একটি লাল, আর একটি শীতল। জেলে দীর্ঘকাল হইতে এই ব্যবসার করিতেছে, সে অনেক জাতীর মংত খরিদাছে, কিন্তু এমন অকৃত মাহ আর কখন তাহার দৃষ্টিপথে পড়ে নাই। দৈত্য জেলেটক বলিল, “এই মাহ লইয়া তুমি রাবড়াড়ী

বহু
প্রাণ

↑
↓

দৈত্যের
প্রতিজ্ঞা

↑
↓

সোভানে
পথে

↑
↓

যাও, সেখানে স্থলভানকে এই সকল মাছ প্রদান করিলে তিনি খুশী হইয়া ভোমাকে এত টাকা দিবেন যে, জীবনে কখন এত টাকা তুমি একত্র দেখ নাই। তুমি প্রতিদিন এই ব্রহ্মের ধারে আসিরা মাছ ধরিতে পার, কিন্তু সারথান, শোভে পড়িয়া কোন দিন এক বারের অধিক জাল ফেলিও না; যদি কেন্দ্র, তোমার তরফর বিশেষ খটিবে। যদি ভাল চাও আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিও না।" তেলে মৈত্রেয়র উপদেশে গালাশে স্তম্ভীকৃত করিয়া, মৎস্তচতুর্দশ লইয়া বহানন্দে রাজপ্রাসাদভিত্তিতে অগ্রসর হইল।

ব্রহ্মের
অপেক্ষা

অপেক্ষা

কেন্দ্র হইয়া স্থলভানের সন্মুখে উপস্থিত হইলে, স্থলভান সেই মৎস্তচতুর্দশের আকার ও বর্ণবীরব
বিশীল করিয়া প্রেরিত হইলেন। মৎস্তের অনেক প্রেক্ষণ করিয়া ঐকট প্যাচিকা দ্বারা তাহার মস্ত
তরফর দৃষ্ট উপস্থিত হইতে সক্ষম করিলেন। অনন্তর স্থলভান ভেদকে পুরস্কারধনের আদেশ
করিলেন। স্থলভানের আদেশে প্রত্যেক মৎস্তের মস্ত এক শত করিয়া স্বর্ণমুদ্রা হিমায়ে চাঁদ্রিষক
স্বর্ণমুদ্রা লাভ করিয়া ভেদে বহানন্দে গৃহে প্রদান করিল। আজ যে জীবন সক্ষম মনে করিল।

মৎস্তচতুর্দশ রন্ধনের মস্ত স্থলভানের অন্তঃপুরে প্রেরিত হইল। সুনিপুণা পাচিকা তাহার রন্ধনে প্রবৃত্ত

হইল। পাচিকা উদানে
তৈল চড়াইয়া তাহার
উপর মাছ ছাড়িয়া দিল।
এক দিক্ ভাজা হইলে,
যেমন সে মাছ কয়টি
উটাইয়া দিবে, অমনি সে
এক অতি অল্পত ব্যাপার
দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত
হইল। সে দেখিল, সহসা
পাকশালার প্রাচীর বিনীর্ণ
হইয়া গেল, আর সেই
পথে বিচিত্র পরিচ্ছদ ও
অলঙ্কারে সুসজ্জিত একটি
রূপবতী যুবতী গৃহমধ্যে
প্রবেশ করিল, তাহার
হস্তে একটি কুহকদণ্ড।
এই দৃষ্ট দেখিয়া পাচিকা
ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত
হইয়া পড়িল। নরাসক্ত
স্বকরী তাহার দিকে দৃষ্-
পাত মাত্র না করিয়া,
একটি মৎস্তে তাহার
দণ্ড স্পর্শ করিয়া বলিল,



গ্রহ-
প্রাচীরে
সুন্দরী
অনিভা

“মাছ, তুমি কি তোমার কর্তব্য পালন করিতেছ?”—দুবতী প্রথমে কোন উত্তর পাইল না দেখিয়া, পুনর্বার সে সেই প্রশ্ন করিল। এবার সেই অর্ধজড়িত মস্তচতুর্ভুজ কড়া হইতে মাথা তুলিয়া বলিল, “হাঁ, হাঁ, যদি তুমি মান ত মানি, যদি তুমি বেনা শোষ কর ত আমরাতও করি, যদি তুমি পালান কর, তাহা হইলে আমরা বল করিয়া লুপী হই।” এই কথা শ্রবণ হইতে না হইতে দুবতী পদাঘাতে কড়াখানি উল্টাইয়া ফেলিয়া যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে প্রস্থান করিল। দুবতীর আবার পূর্ববৎ অবিকল হইয়া গেল।

পাচিকা অনেককাল পরিত্যক্তভাবে গিড়ায়িরা বসিল, তাহার পর যখনকি তুমিল দেখিল, তাহা উপন্যাসের ভঙ্গি পড়িয়া গেল—পাচিকা একবারের কলসার মত নিশ্বাস হইয়া উঠিল। “কথা শুনাগেল যে কি কথার বিষয়? পাচিকা আত্মনিয়ন্ত্রণে আসিতে পারিল। সে বুজিল, যে পলায়ন করি কথার কথা মূলতানকে তাহা বলিলে, তিনি কদাচ সে কথা বিশ্বাস করিবেন না। বিধা কখন মনে করিল সুশিষ্ট হইয়া তাহার প্রতি স্বতন্ত্র বিধান করিবেন।

পাচিকা পাকস্থলে একাকী বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে, এমন সময় উজীর সেই কথক উপস্থিত হইলেন। পাচিকা উজীরের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিল। উজীর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু ভৎসনায় মূলতানের নিকট এ কথা প্রকাশ না করিয়া, মাছগুলি নষ্ট হইবার অস্ত্র কার্য বলিলেন। তাহার পর তিনি সেই জেলেকে ডাকাইয়া পুনর্বার সেইরূপ মাছ আনিবার আদেশ প্রদান করিলেন। নৈত্য জেলেকে এক দিনে দুই বার জাল ফেলিতে নিষেধ করিয়াছিল, কিন্তু সে কথা উজীরের নিকট প্রকাশ না করিয়া বলিল, “অনেক দূরে গিয়া মাছ ধরিতে হইবে, আর আর সময় নাই, কাল নিশ্চয়ই আনিয়া দিব।”

পর দিন জেলে আবার সেইরূপ চারি বর্ণের চারিটি মাছ আনিয়া দিল। উজীর তাহাকে পূর্ববৎ পুরস্কার দিয়া বিহার করিলেন এবং মস্তচতুর্ভুজ পাচিকার হস্তে রক্ষণার্থ প্রদান করিয়া, তিনি পাকশালার প্রবেশ করিলেন। পাচিকা মস্ত রন্ধনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে পাচিকা পূর্বদিন যে লুপ দেখিয়াছিল, সে দিনও অবিকল সেই লুপ দেখিল। উজীর সাহেব এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ভয়ে ও বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া রহিলেন। তাহার মুখে কথা সরিল না। অনেককাল পরে তিনি বলিলেন, “এমন অদ্ভুত ব্যাপার আর কখন দেখি নাই, এমন গুরুতর ঘটনা মূলতানের নিকট গোপনে রাখা উচিত নহে, অবিলম্বে তাহাকে এ কথা জানাইতে হইবে।”

মূলতার উজীরের মুখে এই অদ্ভুত বার্তা শ্রবণ করিয়া, বিষম-মাগরে নিমগ্ন হইলেন, কিন্তু স্বপ্ন ইহা না দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন না। পরদিন জেলেকে ডাকান হইল, মূলতান তাহাকে পুরস্কারের প্রস্তোভন দেখাইয়া আবার মস্ত আনিত বজিলেন। জেলে তিন দিনের সময় লুপা মস্তর সন্ধান চগিয়া গেল।

তৃতীয়বার মস্ত ধরিয়া লইয়া আসিলে মূলতান জেলেকে চারিগুণ স্বর্ণদ্রব্য প্রদান করিলেন। মূলতান পাচিকাকে মস্ত রন্ধন করিতে দিয়া স্বর্ণ পাকস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিয়ৎকাল পরে তিনি দেখিলেন, উজীর তাহাকে বৈরাগ্য হটনার কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই অবিকল সত্য হইল। মূলতান প্রকল বিষয়ে অবাক হইয়া সমস্ত দর্শন করিলেন, তাহার মুখেও কোন কথা সরিল না।

অনেককাল পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া মূলতান উজীরকে বলিলেন, “উজীর, মাছ দেখিলাম, এমন কাত কখন দেখি নাই, কখন কলনাও করি নাই, কিন্তু এই ব্যাপারের অর্থ কি, তাহা আদিকার না করিয়া আমি হির থাকিতে পারিতেছি না, জেলেকে বল দাও, সে কোথায় এ সন্ধা মাছ ধরে, তাহা আমাকে দেখিতে হইবে।” জেলে মূলতানের আদেশে তাহার নিকটে নীত হইলো, সে কোথায় এই সকল মাছ



পাইয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করার জেলে বলিল, “এই নগরের কিছু দূরে চারিটি পর্বত-বেড়িত একটি হ্রদে আমি এই সকল মন্ত ধরিয়াছি। সে পর্বত ঐ দেখা যাইতেছে।” এই কথা শুনিয়া সুলতান উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সতী, তুমি কি সে হ্রদ দেখিয়াছ?” উজীর বলিলেন, “জাহাপনা, এ অতি অদূত কথা; আমি ষাট বৎসর কাল এ অঞ্চলের সর্বত্র ঘুরিয়াছি, ঐ পর্বতের সর্বস্থানে বিচরণ করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন হ্রদ আমার দৃষ্টিপথে নিপতিত হয় নাই।”

হস্ত উন্মোচনে
সুলতানের
অভিধান



সুলতান জেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে হ্রদ এখান হইতে কত দূর?” জেলে বলিল, “এখান হইতে তিন ঘণ্টার পথ হইবে।” সুলতানের আদেশে জেলে সুলতান ও তাঁহার সহচরবর্গকে পথ দেখাইয়া সেই হ্রদের কাছে লইয়া চলিল।

তাঁহার পর্বত অতিক্রম করিয়া একটি সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর দেখিতে পাইলেন; দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কারণ, তাঁহার অনেকবার এই পর্বতের উপর ভ্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু এই প্রান্তর কখনও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানে যে কোন প্রান্তর পূর্বে ছিল, তাহা কেহই বলিতে পারিল না। তাহার পরেই তাঁহার সেই হ্রদ দেখিতে পাইলেন, হঠাৎ কোথা হইতে হ্রদ আসিল, তাহাও তাঁহার ঘৃষিতে পারিলেন না। দেখিলেন, হ্রদের জলে চারিঘণ্টার মাছ মহানন্দে সাঁতার দিতেছে। সুলতানের আদেশে হ্রদের তটে শিবির স্থাপিত হইল। সন্ধ্যাগমে সুলতান সহচরবৃন্দের সহিত সেই শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সুলতান উজীরকে বলিলেন, “উজীর, অবিলম্বে এ রহস্য ভেদ না করিলে আমার মন স্থির হইবে না, আমি রহস্যভেদের জন্য গোপনে একাকী শিবির ত্যাগ করিব, তুমি এ সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।”

পাছে সুলতান একাকী কোথাও বিপদে পড়েন, এই আশঙ্কায় উজীর তাহাকে একাকী শিবিরত্যাগ করিতে নিষেধ করিলেন; কিন্তু সুলতান সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া একখানী তীক্ষ্ণধার তরবার লইয়া শিবির হইতে বহির্গত হইলেন।

পার্বত্যপথে সমস্ত রাত্রি একাকী ঘুরিয়া পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের সময় সুলতান একটি প্রশস্ত প্রান্তরে পদার্পণ করিলেন। এখানে আসিয়া অদূরে তিনি একটি সুবৃহৎ কক্ষবর্ণ অট্টালিকা দেখিতে পাইলেন, এতক্ষণে সকল ভ্রম সফল হইল ভাবিয়া তিনি বড় আনন্দিত হইলেন; কারণ, তাঁহার বিশ্বাস হইল, সেই অট্টালিকায় উপস্থিত হইতে পারিলেই তিনি সকল রহস্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু উৎসাহে সুলতান সেই অট্টালিকাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

রহস্যপূরী
সম্মুখ



সুলতান প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, কক্ষবর্ণ দ্বার-প্রস্তরের এক সুবিশাল প্রাসাদ। প্রাসাদের দ্বার উন্মুক্ত, কোন দিকে জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই। সুলতান ইচ্ছা করিলেই প্রাসাদভিত্তরে প্রবেশ করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা ক্ষণকাল না করিয়া দ্বারে করাঘাত করিলেন। তিনি প্রথমে ধীরে ধীরে আঘাত করিলেন, কিন্তু কেহই সে আঘাতে তাঁহার সন্মুখে আসিল না দেখিয়া সজোরে আঘাত করিলেন। তথাপি তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তবে কি প্রাসাদটি জনশূন্য? সুলতান ভাবিতে লাগিলেন, এমন অদূত, অসঙ্গত, অসম্ভব প্রাসাদে মানুষ নাই, ইহা ত’ বড়ই আশ্চর্য্য ব্যাপার। সুলতান একাকীই প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন।

প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ শোভা দেখিয়া তিনি একেবারে বিমোহিত হইলেন। বহুমুখ্য বিবিধ আনন্দাবে প্রাসাদের প্রত্যেক কক্ষ সুসজ্জিত। স্থানে স্থানে কৃত্রিম নিকরে জলরাশি উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে প্রভাত-স্বর্ণরশ্মি নিপতিত হইয়া সুকলিঙ্গুর দ্য প্রতীকমান হইতেছে। যুদ্ধনেত্র সুলতান এই সকল দৃশ্য

দেখিতে লাগিলেন। প্রাসাদের তিন দিকে রমণীয় উপবন, সুগন্ধ ফুলে-ফুলে বৃক্ষলতা পরিপূর্ণ, শত শত বিহবল ফুলের গান করিয়া স্থলতানের কর্ণে সুধা ঢালিয়া দিতে লাগিল। স্থলতান এক কক্ষ হইতে অন্য কক্ষে প্রবেশপূর্বক গৃহস্থাসীর অঙ্গসজ্জান করিতে লাগিলেন।

বহুক্ষণ বিচরণের পর তিনি ক্রান্তভাবে একটি কক্ষে একখানি মূল্যবান আসনে উপবেশন করিলেন। তিনি সেখানে বসিয়া বাগানের দিকে চাহিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ অতি কাতর আত্মনাদ তাঁহার কর্ণমূলে প্রবেশ করিল। স্থলতান শুনিলেন, কেহ যেন জীবনের অসহ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া অদৃষ্টকে বিচার দিয়া হুঃখ প্রকাশ করিতেছে এবং সকল যাতনার অন্তকারী দরামর মৃত্যুকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছে।



এই রোমন্থন শ্রবণ করিয়া স্থলতানের কল্পন-ছন্দর বিগলিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ আসনত্যাগ করিয়া উঠিলেন, শব্দ লক্ষ্য করিয়া দ্রুত চলিলেন, অবশেষে একটি বৃহৎ হলের সমুখে উপস্থিত হইলেন। গৃহস্থার পরদা প্রসারিত ছিল, পরদা সরাইয়া সেই হলে প্রবেশ করিতেই স্থলতান দেখিলেন, একটি অতি সুন্দরকান্তি, উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ-ভূষিত যুগপূর্ব একখানি প্রস্তর-সিংহাসনে উপবিষ্ট; কিন্তু তাঁহার মুখে নিরাশা ও বিবাদ মাখান রহিয়াছে, যেন সেই যুবক এই নিভৃত প্রাসাদে জীবনের সকল সুখ বিসর্জন দিয়া, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছে। স্থলতান ধীরপদে সেই যুবকের সমীপস্থ হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, যুবক নতমস্তকে প্রত্যভিবাদন করিল; কিন্তু আসন ত্যাগ করিল না, তাহার পর বিনয়-সম্মানে ধীরে ধীরে বসিতে লাগিল, “মহাশয়, আমি বৃষিতছি, উঠিয়া আপনার প্রতি যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করা আমার কর্তব্য। কিন্তু আমার সে সামর্থ্য নাই, অতএব আমার শিষ্টাচারের এই ক্রটি আপনার ওদারদৃশ্যে মার্জনা করিবেন।” স্থলতান যুবকের ভদ্রতায় বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, “শিষ্টাচার-প্রদর্শনে কোন ক্রটি হয় নাই, আপনি অনর্থক ক্ষুব্ধ হইবেন না, আপনি আমার প্রতি যথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। আপনি যে কারণেই আসনত্যাগে অসমর্থ হউন, তাহাতে আমার বিদ্বেষ কোড নাই। আপনার রোমন্থন শুনিয়া আমি অত্যন্ত মর্জিত হইয়াছি, যদি কোন উপকার করিতে পারি, এই আশায় আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। যদি বিশেষ কোন বাধা না থাকে, তাহা হইলে আপনি আপনার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আমার নিকট প্রকাশ করুন। কিন্তু সে কথা জানিবার পূর্বে আমার আর কয়েকটি বিশেষ গুরুতর কথা জানা আবশ্যিক। এই প্রাসাদের অদূরে যে হ্রদ দেখিলাম, সে হ্রদটি সহস্রা এখানে কোথা হইতে আসিল, হ্রদে চারিবর্গের মংগল থাকিবারই বা কারণ কি, এই প্রশ্নসহই বা কিরূপে এখানে অকস্মৎ আবিস্কৃত হইল, আর আপনি এখানে এ অবস্থায় একাকী কি অল্প আত্মনা করিতেছেন?”

এ সকল কথাই কোন উত্তর না দিয়া, যুবক অতি কক্ষ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিল, “আজিও আমি বলি, ‘মহাশয়! অদৃষ্টের গতি বিচিত্র।’ হৃদয়বিশেষকণ্ড একদিনের মধ্যে পঞ্চম ভিত্তি হইতেছে। অদৃষ্ট কাহাকে চিরস্থায়ী চিরশান্তি দান করিয়াছে, এমন লোক কি বিব্রতকণ্ডে একজনকে আনয়িত?”

স্থলতান যুবকের কথার পরিতুষ্ট হইয়া, সহস্রাহুভিত্তের তাঁহার হৃদয়বিশেষকণ্ডের কারণ বিবৃত করিবার জন্য পুনর্বার তাঁহাকে সন্তোষিত করিলেন। যুবক তখন বলিল, “মহাশয়, আমার হৃদয়বিশেষকণ্ডের সীরা কাই, আমি কি আমার চক্ষু হইতে নিরন্তর অধিরসদ্বারের প্রবরণ হয়?” যুবক তাঁহার সোহাগে নিরন্তর পরিচ্ছদ অপসারণ করিলে, স্থলতান বসিমে দেখিলেন, যুবকটির দেহের উজ্জ্বল আভির্ভূত সন্ধ্যাবেগের ভাষ হইলেও কটিনেশের নিরন্তর হইতে পলকপলক পঙ্খ সমস্ত অংশ যেরূপ কল্পন প্রভাবের পণ্ডিত হইয়াছে।



স্বপ্ন উন্মাদিন
প্রকাশ



স্বপ্ন উন্মাদিন স্বপ্নের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া বলিলেন, “স্বপ্ন, আপনার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে দুঃখের ভর ও বিষয়ের সন্ধার হইয়াছে, আপনার কাহিনী শ্রবণের জন্য আমার বড় আগ্রহ জন্মিয়াছে, এ কাহিনী অতি অদ্ভুত হইবে সন্দেহ নাই। আমার বিবাস, আপনার সেই কাহিনীর সহিত এই দুঃখের বহির্দর্শন হইতে চারিঘণ্টার মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। সেই জন্য আমার অহরোধ, সন্ধ্যা কথা অবিলম্বে শুনিয়া বলুন। ইহাতে আপনি মনে কিঞ্চিৎ সাধনা লাভ করিতে পারিবেন এবং আমিও সম্ভবতঃ কিছু না কিছু প্রতীকারের চেষ্টা করিতে পারিব।”

স্বপ্ন উত্তর করিল, “আমি আপনাকে আমার জীবনের বিচিত্র কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন।”—
অতঃপর স্বপ্ন তাহার অপরূপ কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল :—



স্বপ্ন-
জীবনের
রাজ-
পুত্রের
কাহিনী



আমার পিতা এই ধীরের অধিপতি ছিলেন, তাহার নাম মামুদ। ঐ পর্বত-চতুর্দহ হইতে এই দেশের নামকরণ হইয়াছিল। পূর্বে এখানে ধীর ছিল, আর আপনি যে হ্রদ দেখিয়া আসিয়াছেন, ঐ হ্রদের স্থানেই আমার পিতার রাজধানী ছিল, সেই রাজধানীই এখন হ্রদে পরিণত হইয়াছে। কিরূপে এই বিচিত্র কাণ্ড ঘটিল, তাহা আমার কাহিনীর আভ্যোপাত্ত মনোযোগ দিয়া শুনিলাই আপনি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবেন।

এই রাজ্যের রাজা—আমার পিতা পটাত্তর বংশের বরসে পরলোক গমন করেন। আমি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই একটী সর্বাঙ্গস্বন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলাম। এই রমণী আমার জ্ঞাতি পিতৃব্যের কন্যা, সম্বন্ধে ভগিনী। আমার প্রতি আমার পত্নীর গভীর ভালবাসা আছে, সে পরিচয় আমি অনেকবারই পাইয়াছিলাম, এবং আমিও আমার পত্নীর প্রতি স্নেহ-প্রদর্শনে কোন দিন ক্রটি করি নাই। প্রথম যৌবনের দিনগুলি রাজ-কার্যের অবকাশে প্রেমচর্চার তাহার সহিত ব্যাপন করিতাম। তাহার অনবস্ত্র দেহের উজ্জ্বল যৌবনের সমস্ত রস উপভোগ করিয়া আমি পরিতৃপ্ত হইতাম। আমাদের এই স্নেহের মিলন পাঁচ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময়ের পর আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, আমার প্রতি আমার স্ত্রীর আর পূর্ববৎ আশঙ্কি নাই।

একদিন সন্ধ্যার পর আমার স্ত্রী দানাপারে গা ধুইতে গেলেন, আমি পরিশ্রান্ত ছিলাম, শয্যা শয়ন করিলাম। আমার পত্নীর দুই জন পরিচারিকাকে সেই কক্ষে ডাকিয়া পরিচর্যা করিতে বলিলাম, তাহাদের একজন আমার পদতলে, অস্ত্রজল আমার মস্তক-প্রান্তে বসিয়া আমার পরিচর্যা করিতে লাগিল। কিছু কাল পরে আমি নিদ্রিত হইয়াছি ভাবিয়া, তাহার ধীরে ধীরে আগাশে প্রবৃত্ত হইল। আমি তখন নরন মুদিত করিয়াছিলাম, নিদ্রিত হই নাই, সুতরাং তাহাদের কথোপকথন আমার কর্ণে প্রবেশ করিত, কোতুলকাকান্ড হইয়া আমি তাহাদের কথাবার্তা আভ্যোপাত্ত শ্রবণ করিলাম।

দাসীদের মধ্যে একজন বলিল, “দেখছিল তাই, এমন সুন্দর রাজা, এত রূপ, আমাদের রাণীর এমন স্বামী মনে ধরে না।” দ্বিতীয় উত্তর করিল, “বা বলোছিস তাই, রাজা যুমায়া পড়িলে রাণী প্রত্যহ রায়ে তাহাকে ছাড়িয়া যে কোথায় বাহির হইয়া যান, তা’ত আমি কিছুই ঠিক করিতে পারি না। আচ্ছা, রাজা কি এ ছাড়া বুঝতে পারেন না?” প্রথমা পূর্ববৎ বৃহৎ বলিল, “বুঝবে কি ক’রে গো! বুঝতে দিলে ত বুঝবে? রাণী রাজাকে প্রত্যহ রায়ে সরবতের সঙ্গে কি একটা গাছের রস খেতে যেন, আর রাজা সমস্ত

গুপ্তাঙ্গ
প্রকাশ



রাত্রি আরো অটুট হয়ে পড়ল। তখন সন্ধ্যা হয়েছিল। বেলায় ইচ্ছা বিহারে যান, কিন্তু কবি করে এসে রাণী রাজার নাকের কাছে এসেটা কি জিহ্বা ধরেন, আর তারই পথে রাজার মিন্দিতে বসে। এমন ডাকাতে মেয়েদেহ ত-ই কখন দেখি নি।

এই কথোপকথন শুনিয়া আমার মনে কি ভাবের উদয় হইল, তাহা আপনি বুঝিতে পারেন, কথার আমি তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ। বাহ্য হউক, আমি অসহিষ্ণুচিত্তে তখনই একটা বিদ্রাট বটাইলাম না। অতি কষ্টে মনের ভাব দমন করিয়া শব্দার পড়িয়া রহিলাম, পরে যখন উঠিলাম, তখন কিছুই যেন জানিতে পারি নাই, এই ভাব দেখাইলাম।

রাজী দানাপার হইতে কিরিয়া আসিল। রাত্রিকালে আমরা একত্রে আহার করিলাম, আহাঃসন্তে আমি প্রত্যহ যেন নির্দিষ্ট পানীয় পান করি, সে দিনও সেইরূপ সর্বৎ চাহিলাম, রাজী এক পেরালা সর্বৎ গ্রহণ করিল, কিন্তু সে দিন আর তাহা পান করিলাম না। রাণীর অলক্ষ্যে আমার বসনবধো উঠা চালিয়া দিয়া পেরালাটা রাণীর হাতে প্রত্যর্পণ করিলাম; রাণীকে বুঝিতে দিলাম, আমি সেই সর্বৎ অস্ত্র দিনের মতই পান করিয়া ফেলিয়াছি। তাহার পর আমরা উভয়ে শয্যা শয়ন করিলাম। কিছুকাল পরে আমি ঘুমাইয়াছি তাবিয়া রাণী অফুট-স্বরে বলিল, “বৃষাও, আর যেন কখন তোমার নিদ্রা না ভাঙ্গে। ভগবানের শপথ, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, তোমার স্পর্শ আমার সর্বদেহে বিধের মত তীব্র ও অসহ্য মনে হয়। কবে যে জালা তোমাকে এ জগৎ হইতে টানিয়া লইবেন!”—রাণী বেশকুহার ভূদজিতা হইয়া অবিলম্বে প্রকোষ্ঠ ত্যাগ করিল।

রাণী কক্ষ পরিত্যাগ করিবামাত্র আমি একখানি ঝুঞ্জা হস্তে লইয়া, অতি সাবধানে রাণীর অঙ্গগমন করিলাম। সে তাহার বাহুরস্থত দণ্ড স্পর্শে করেকটি দ্বার মুক্ত করিয়া, সেই পথে অতি ব্যস্তগতিতে ধাবিতা হইল, আমিও অন্ধকারের মধ্যে বতস্বর সম্ভব তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। ক্রমে সে নগরের বাহিরে উপনীত হইল। আমিও অলক্ষ্যে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলাম। অবশেষে সে একটা স্থলের সন্নিহিত হইল। তথায় বৃক্ষশাখা, লতাপাতার দ্বারা পরিবেষ্টিত একট মটীর ঘরের দ্বারপথে প্রবেশ করিল।

আমি তখন তৃণের উপর উঠিয়া ঘরের ভিতরের দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সেই অপূর্ণ রূপাবল্যবতী রাজমহিষী—আমার স্ত্রী এক কদাকার কাক্সির সহিত মিলিত হইল। এই ক্রীতদাসের বীভৎস রূপ বর্ণনার অতীত। তাহার মূণ গঠবৃণ দেখিলেই ঘৃণার স্রোতঃ শিহরিয়া উঠে। লোকটা মুষ্টিকার উপর তৃণরতিত শয্যা শায়িত ছিল। তাহার পরিধের বসন যেনন ছিন্ন, তেমনই মলিন ও ভুগ্নবস্ত্র। একখানি পুরাতন কঞ্চলে ক্রীতদাসটা সঙ্কীর্ণ আচ্ছাদিত করিয়া গুইয়াছিল।

অভিচারিকা নারী তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ভূমিচুখন করিয়া ঝাঁড়াইল। কাক্সিটা তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “তুই এতক্ষণ কি করিতেছিলি—এত দেরী করিয়া আসিলি কেন? আমার কালো ভাইরা পিশা পিশা মদ খাইয়া যে বাহার হুস্বরী উপহারী লইয়া, আমোদ-প্রমোদ করিয়া চলিয়া গেল, আর আমি একা গুইয়া আছি, তোর জন্য এক কোটা মনও পেটে গেল না।”

রাণী সৌহার্দভরে তাহার প্রশ্নরূপে বলিল, “আমার বিলাস হইয়াছে বলিয়া তোমার রাগ করা উচিত নহে, দেখ, আমি দ্বায়ীনা নই, ইচ্ছানুসারে মনে আসিয়া তোমার সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করিতে পারি না, কিন্তু তোমার উপর আমার ভালবাসা কত, তাহার ত পরিচয় পাইরাছ। তাহাতেও যদি আমার প্রণয় অকৃত্রিম বলিয়া মনে না কর, তবে আমি ইচ্ছা অথেকাও গুরুতর প্রমাণ দিব। কি প্রমাণ চাও বল, আমার কন্যাতা



কত, তাহা তুমি অবগত আছ! তোমার ইচ্ছা হইলে আমি কাল হৃদ্যাদেশের পূর্বেই এই বৃহৎ নগর ও বিস্তীর্ণ রাজপ্রাসাদ ভ্রমণ করিয়া কেহিতে পারি। সেই প্রশানে মাহুৰ থাকিবে না, কেবল বাথ, ভাস্কর্য, চিত্র, শকুনি বাঁধ করিবে। যদি বল, এখনই আমি এই প্রাসাদের সমস্ত পাথর ককেশস পর্বতের পরপারে নিষ্কাশিত করিতে পারি। শ্রিত্তম! বল, কি চাও, দাসী তোমার আজ্ঞাধীন, বাহা বলিবে, তাহাই করিব।”

প্রমোদিনী
শাসন

কাক্সিতা এই কৈফিয়তে সন্তুষ্ট হইল না। সে বলিল, “তুই মিথ্যাবাদিনী। তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না। দেখ, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, কাল যদি ঠিক সময়ে না আসিস, তাহা হইলে তোর সঙ্গে কথা ত বলিব না, আর তুই যে গ্রন্থের জন্ত পাগল, তাহাও আমার কাছে পাইবি না। তোর দেহ আমি স্পর্শই করিব না। কয় বৎসর ধরিয়া তোর সমস্ত যৌবনরস ত আমি উপভোগ করিয়াছি। ঐ দেহে আর এখন কি আছে? আমার কথামত কাজ না করিলে আমি কখনই তোর অতিরিক্ত কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করিব না।”

এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, এই নরকের প্রমোদ-বৃন্দ দেখিয়া, সমগ্র পৃথিবী যেন আমার দৃষ্টি হইতে মুছিয়া গেল। তারপর শুনিলাম, পাণ্ডিত্য বলিতেছে, “প্রাণবন্ত, জদররঞ্জন, তুমি ছাড়া আমার প্রাণে আনন্দ মিবার আর কেহ নাই। তুমি যদি আমার ত্যাগ কর, তবে এ জগতে আমার আর কে রহিল, বৎ প্রাণসখা?” আমার বিশ্বাসভাঙ্গিনী জী কঁাদিতে লাগিল; ইহাতে ঐ পণ্ডিতা যেন কিছু শান্ত হইল।

কামবিস্ময় নারী তখন অশ্রুজলিত্তে বলিল, “প্রহু, তোমার দাসীর জন্ত কি খাবার রাখিয়াছ বল?” লোকটা বলিল, “ঐ পাত্রের ঢাকনীটা খুলিয়া ফেল; ইহাদের কয়খানা হাড় পড়িয়া আছে, তাহাই চিবাও। আর ওখানে ঐ জামার পকেটে খানিকটা বীয়ার মদ আছে, তাহাই পান কর।”

পাণ্ডিত্য হঠাৎ যেন সেই কদম্ব খাত আহার করিল। তারপর হাত মুখ ধুইয়া নয়দেহে ক্রীতদাসের পার্শ্বে ক্রমশঃ শয়ন করিল। ইহার পর আমার দেখিবার শক্তি যেন বিলুপ্ত হইল। সতর্পণে তৃপ্তিশির হইতে নিচে নামিয়া আসিলাম। স্বপ্নপথে নিঃশব্দে ফুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তাহার নিষিদ্ধ আলিঙ্গনে নিদ্রিত। সে লজ্জা-বর্ণনে শব্দহীনতার সীমা হারাইল। উভয়কে বক্ষাধায়ে বিনষ্ট করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলাম। প্রথম আঘাত ক্রীতদাসটার উপরেই পড়িল। আমার মনে হইল, এক আঘাতেই তাহার মস্তক স্বকৃত্য হইয়াছে; কিন্তু তাহা হয় নাই, তাহার শব্দ ও মাংস বিদীর্ণ হইয়াছিল মাত্র। সে অস্পষ্টভাবে গৌরাহিয়া উঠিল। ইহাতে আমার ব্যক্তিচাষিনী জী নিম্না ভাঙ্গিয়া গেল। রাগী আমাকে দেখিতে পাইবার পূর্বেই সে স্থান হইতে চম্পট দিয়া আমি আমার শয়নকক্ষে প্রত্যাগমন করিলাম।

রাগী তাহার উপপত্তির এই অবস্থা দেখিয়া বাহুদ্বয়ে তাহার দেহে জীবন আবদ্ধ করিয়া রাখিল, বস্ত্রতঃ সে তখন মৃতও নহে, জীবিতও নহে, এই অবস্থার পড়িয়া রহিল। আমি প্রাসাদে ফিরিবার পর শুনিলাম, পাণ্ডিত্য টাংকার-শব্দে রোল করিতেছে। বুঝিলাম, উপপত্তির মৃত্যুতে তাহার শোকের সীমা নাই, আমি ইহাতে ভুট্টই হইলাম। পরদিন প্রভাতে নিজ্রাত্তে দেখিলাম, জীমতী আমার পার্শ্বেই শয়ন করিয়া নিদ্রাস্থ ভোগ করিতেছে, আমি আর তখন তাহাকে বিরক্ত করিলাম না; নরবার হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, রাগী বড়ই কাতরা, চুল ছিড়িয়া, শোকের শোষাক পরিয়া, বিমর্ষভাবে বলিয়া আছে। সে আমাকে বলিল, ‘আমি তোমাকে তিনটি ছুটনার কথা বলিব, এই সংবাদ আমি অল্পকাল পূর্বে পাইয়া এমন অধীর হইয়াছি যে, তাহার সে কথা প্রকাশ করিতে পারি না।’—আমি অবচলিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, ‘কি ছুটনার সংবাদ বলিতে চাও?’—রাগী বলিল, ‘আমার ম’র মৃত্যু হইয়াছে, বাবা যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, আমার ভ্রাতা পাহাড় হইতে পড়িয়া মরিয়াছেন।’—সকলগুলিই মিথ্যা, তাহা বুঝিলাম। আমিই যে তাহার উপপত্তির মর,

সম

ক

না

রে

য়ে

তাহা সে জানিতে পারে নাই, এ কথাও বুঝিলাম। আমি বলিলাম, 'রাণী, তোমার শোকের কোন অপরোধ নাই, কি জন্য তোমার এত শোক, তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে। এই গুরুতর শোকে তোমাকে কতদূর না দেখিগেই আমি আতঙ্কিত হইতাম। অতএব ক্রন্দন কর, ক্রন্দন কর, তোমার ঐ নলিন-নয়নের অঙ্গ তোমার স্বপ্নেরই মঞ্চ-প্রকাশক। বাহা হউক, আমি ভরসা করি, সময়ে তোমার এই শোক দূর হইবে, আবার বদনকমলে হাসিরাশি বিকশিত হইবে।'

রাণী তাহার কক্ষ প্রবেশ করিয়া, এক বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত শোক করিল; পাণিষ্ঠার পতি বিভ্রমসেও উপপতি-শোক প্রশমিত হইল না। এক বৎসর পরে সে উজানের মধ্যে একটি সমাধিমন্দির নির্মাণ করাইয়া মৃত উপপতির চিত্তার জীবনের অবশিষ্টকাল বাগনের সংস্কার করিল। এই সমাধিমন্দিরের নাম রাখিল "অশ্রু-প্রাসাদ।" এই অশ্রু-প্রাসাদে রাণী তাহার উপপতির জীবদ্ভূত দেহ আনিয়া রাখিয়াছিল, প্রতিদিন রাত্রিতে ঔষধ-প্রদানে সেই পাণিষ্ঠার দেহে প্রাণরক্ষা করিত। রাণী প্রত্যহ দুইবার সেখানে বাইত।

রাণীর মৃতকল্প উপপতি কেবল চাহিতে পারিত, শৃঙ্খলিতে চাহিত, এতদূর তাহার উদ্ভিষ্ট, নড়িবার বা কথা কহিবার শক্তি ছিল না। রাণী তাহার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া, সঙ্কল্প বিলাশে মন্দির প্রতিষ্ঠান করিত;—বলিত, 'প্রিয়তম প্রাণেশ্বর! তোমার এ দশা দেখিয়া আমার বুক বে বীর্ণ হইয়া বাইতেছে, তুমি যে বাতনা সহ করিতেছ, তাহা যে আর সহ করিতে পারি না। প্রাণনাথ, আমি তোমাকে এতবার ডাকিতেছি, এত আদর করিতেছি, কিন্তু তুমি নিরুত্তর, কতকাল এ ভাবে কাটাইবে? একবার কথা কও, আমার হৃদয় শীতল হোক। তোমার সঙ্গে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণই স্বর্গস্থ ভোগ করি, তোমাকে ছাড়িয়া আমি সমস্ত পৃথিবীর উপরও রাজ্য করিতে চাহি না।'

ক্রমে বড় বিরক্ত হইয়া উঠিলাম, এত আবদার ত' আর সহ হয় না। একদিন সে যখন তাহার উপপতিক আক্কেলপূর্বক বিলাপ করিতেছে, সেই সময় সহসা সেই সমাধিমন্দিরের কোন গুপ্তস্থান হইতে রাণি-হইয়া বলিলাম, "হুম্মরি, এ পর্য্যন্ত অনেক অশ্রুই ত' বর্ষণ করিলে, এখন কিছু শান্ত হইলেই ভাল হয়।"

হুম্মরি বলিয়া উঠিল, "দেখ, আমাকে বাধা দিও না। আমি বাধা করিব, তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিও না। যদি কর, তাহা হইলে আমি আত্মহত্যা করিব।" এই কথাই পর আমি আর কোন উত্তর না করিলাম না। সে তাহার ইচ্ছামত চলিতে লাগিল। তাহার শোক কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না। সকল সময়েই সে হৃদয়ভেদী ক্রন্দন করিত। এইভাবে আরও এক বৎসর চলিয়া গেল।

তৃতীয় বৎসরের শেষভাগে আমিও অত্যন্ত অস্থির হইয়া উঠিলাম। তাহার এই প্রকার অস্বাভাবিক শোকভিষ্ট আমার কাছে অসহ্য হইয়া উঠিল। কোনও কারণে উত্তেজিত হইয়া একদিন আমি তাহার নিদিষ্ট সমাধিমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভনিতো গাইলাম, সে বলিতেছে, "প্রাণবন্ত, আমার সর্ব্ব, তুমি এ পঙ্কজ অভঙ্গীকে একটি কথাও বলিলে না।' হে দরিদ্র! কেন তুমি আমার সহিত কথা বলিতেছ না?"

তারপর সে গগনকর্কশ পানের স্বরে বলিয়া চলিল, "হে সন্মাহি। তুমি আমার প্রাণকলকে কেন এমন ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছ? তাহার চক্রানন দেখাছের হইয়া রাখিয়াছ। এ নানী শোভার আহার এই বিচিত্রা ধরণী, তাহার অঙ্গল ভোগকিনাসের উপকরণ আমাকে আকর্ষণ করিতেছে না। স্বর্গও আজ আমার প্রার্থনার নহে। আমার হৃদয়ের স্বা ও চক্রবর্ত্ত দরিত্রকে আমার কাছে কিরাইয়া নাও!"

কাহারও পরীক্ষিতা পূর্ণা যদি তাহার উপপতির সন্মুখে এইরূপ কথা অবিশ্রান্ত ভাবে বিলাপ উক্তি উভারণ করিয়া যায়; আর সেই নারীর স্বামী যদি স্বকণে তাহা শ্রবণ করে, তাহা হইলে সে কি ক্রোধ, বিচলিত, বিজাতীয়

উপপতির
চিহ্ন-পুঙ্খ



দরিত্র পুঙ্খ
স্ব



সিখাসের উদ্ভব হইয়া উঠে না? আমার জন্যে প্রচণ্ড ক্রোধের সঞ্চার হইল। আমি আশ্চর্যবশত কহিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম, “কি বাঃ! আর কতকাল এই শোকের খেলা চলিবে?” তারপর কথিত হইল আমিও বলিলাম, “হে সমাধি! বাহাকে ছুঁই গর্তে ধারণ করিয়াছ?—তাহার কাম-কলুষিত কন্যা আত্মাকে—তাহার পঞ্চাশক সহস্রক লীল গ্রাস কর; তাহার কুৎসিত আননে মৃত্যুর ঘনিষ্ঠ টানিয়া দাও! ইহার কাছে মলমূর্ত্তপূর্ণ নরককুণ্ডও অপ্রার্থনীয় নহে।”

বাহু-কলী
বি-সিখা-উঠিল

আমার কথা শুনিবামাত্র হুস্তরিভা নারী সলফে উঠিয়া দাঁড়াইল। তারপর চাঁৎকার করিয়া বলিল,—“ওরে কুস্তুর, তাকে দিক! এ কার্য্য তবে তুমি করিয়াছিস! তুমি আমার প্রাণবল্লভকে আঘাত করিয়া অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছিস। তোর লজ্জাই আমার শ্রিয়ন্তম পূর্ণঘোষনে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে—এই বিবরণ শয্যাপাশী হইয়া আমাকে প্রণয়দানে তুষ্ট করিতে পারিতেছে না।” আমি সক্রোধে বলিয়া উঠিলাম,—“ওরে পানীয়সি, লজ্জা নারী! তুমি বায়বনিতারও অধম! তোর ইশ্বরলালসা চরিতার্থ করিবার জন্য তুমি এই কদাকার কাম্রিতে উপলব্ধ হইতে দৃণবোধ করিস্ না। হী, আমিই তোর উপপত্তিকে অস্বাভ্যাস করিয়াছি। এখন তোকেও বসুধে পাইয়াইতেছি।” এই বলিয়া তরবারী কোষদ্রুত করিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইবামাত্র, সে উল্লেখ্যে হুস্তিয়া উঠিয়া বলিল,—“ওরে ইতর কুস্তুর! আর তোর দক্ষা নারীজাতকে কিয়দূর পক্ষি আশ্রয় নাই; কিন্তু তোকে উপদ্রুত শাস্তি দিব। সারা জীবন তোকে করিয়া দাখিব।” ইহা বলিয়াই সে দ্রুতগতি ভাব্য কি ময় আত্মিক করিল। তারপর বলিল,—“আমি ইন্দ্রজাল বিভার আমি তোকে অর্ধেক মাহু ও অর্ধেক পাথর করিয়া দিব। তাহা হইলে তুমি প্রতিদিন আমার প্রণয়-নিবেদন দেখিতে পাইবি, কিন্তু প্রতিবিধান করিতে পারিবি না; তোকে জীবন্ত অবস্থায় রাখিব।” এই বলিয়া সে মস্তপূত জল আমার অঙ্গে নিক্ষেপ করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার শরীরের নিরতাগ প্রকৃতি পরিণত হইয়া গেল।

বাহুবিভার
অলৌকিক
প্রভাব

হুস্তরিভা নারী তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া ইন্দ্রজাল বিভার বলে রাজপথ, উত্তানসমমিত সমগ্র নগরকে রূপান্তরিত করিয়া কেলিল, চারিটি দীপকে চারিটি পুরুতে পরিণত করিয়া দিল। নগরে চারিশ্রেণীর লোক ছিল—মুসলমান, নাস্তারেন, ইহুদী ও ম্যাসিয়ান—পাণ্ডা তাহাদিগকে হ্রদের জলে খেত, রক্ত, নীল ও পীত এই চারি শ্রেণীর মন্ত করিয়া রাখিয়াছে। নিষ্ঠুরা রাক্ষসী প্রতিদিন আমার পৃষ্ঠদেশে একশত কশাঘাত করে। প্রতিদিন কতপথে রক্ত ঝরিয়া পড়ে, অসংখ্য যন্ত্রণার শ্রাণ বাহির হইতে চাহে। তারপর পানীয়সী কেশরচিত আবরণ দ্বারা আমার দেহ আবৃত করিয়া তাহার উপর এই শোণক চাপাইয়া দিয়া যায়।”

বসিষ্ট বলিতে যুবক বেদনার অঙ্গপাত করিতে লাগিল। স্থলতান কুম্বলীশের নবীন রাজার হৃদ্যগায় সঙ্কল্প ইতিহাস শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—“আপনার হৃৎকের সীমা নাই দেখিতেছি। বাহা হউক বন্ধু, সেই নারী এখন কোথায়? আর সেই সোপাটাই বা কোন্ দিকে অবস্থিত, তাহা আমাকে বলিয়া দিন।” সুবা বলিলেন, “অদূরে ঐ যে পথক দেখা বাইতেছে, উহারই নিম্নে সেই ক্রীতদাস জীকন্তু অবস্থায় রহিয়াছে। আর সেই পাণ্ডা সমুদ্রের ঐ ঘরের দরজার বসিয়া আছে। প্রতিদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে এই ঘরে আসিয়া আমাকে কশাঘাত করে। আমি যন্ত্রণার আত্মনাদ করিতে থাকিলে, সে আনন্দ লাভ করে। তারপর সে কিছু খাদ্য আমার আনিয়া দেয়। আপাদী কল্য প্রভাতেরই সে আসিবে।” স্থলতান বলিলেন, “বন্ধু, আমি আপনার উপকার করিব। আপনি মুক্তিলাভ করিবেন; মাহু চিরদিন উদ্ধকটে সে কাহিলী বোঝা করিবে।”

হুলতান সারাদিনী কক্ষবীথের ভাণ্ডারবিক্রিত প্রাকপুত্রের পাঁচের বাপন করিলেন। প্রভাত হইবামাত্র তিনি সে কক্ষ তাগ করিয়া স্মৃতি-সৌধের বহিরাংশে চলিলেন। অঙ্গ অঙ্গলহানের কলে তিনি উহা দেখিতে পাইলেন। মুক্ত তরবারী হাতে তিনি দ্বারপথে বিচিত্র স্বর্গ্যদণ্ডে প্রবেশ করিলেন। প্রহরিত বসিকা ও তত্ত্বগত প্রভৃতির স্বপানে তিনি মুতকর ক্রীতদাসের অবস্থান-স্থান আকির্ষ করিলেন। লোকটা শরিত অঙ্গহারা বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি তরবারীর আঘাতে তাহার প্রাণসংহার করিলেন। তার পর তিনি মৃতদেহ পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন। অনুরে একটা গভীর কূপ দেখিয়া তদাধো মৃতদেহ নিক্ষেপ করিলেন।

তার পর ক্রতগতিতে সন্ধানিককে প্রত্যাবর্তন করিয়া, হুলতান ক্রীতদাসের পাত্যাক পরিচ্ছদ দেখে ধারণ করিয়া, তাহার অঙ্গাবরণে লক্ষ্য আচ্ছাদিত করিয়া, নিশ্চলভাবে শব্দার উপর পড়িয়া রহিলেন। পাঁচের মুক্ত তরবারী লুকাইয়া রাখিলেন।

প্রায় তিন দণ্ড পরে শাশীরনী নারী সেই কক্ষে কিরিয়া আসিল। এই সময়ে সে-তাহার স্বামীকে নির্ঘাতিত করিয়া আকেশ মিটাইয়া লইয়াছিল। প্রাণরত্নহানের কক্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়া সে বিলাপ সহকারে বলিতে লাগিল, “প্রাণেশ্বর, স্বামিবরভ ! একবার আমার দহিত একটা কথা শুন।”

নারী আঁতরবে পুনঃ পুনঃ এইভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। হুলতান ক্রতঃ অশ্রুধারা, কীপকটে বিকৃতভাবে কাক্রিয়াদের ভাষায় বলিলেন, “আল্লা—আল্লা—উম্মার মস্ত লজ্জমান কেহ নাই।” দহিতকে এককাল পরে এই ভাবে কথা বলিতে শুনিয়া নারী উল্লাসে লাকাইয়া উঠিল। তার পর অধীরভাবে বলিল, “প্রাণনাথ ! এক কথা ? সত্যই এককাল পরে তোমার কথা শুনিলাম ?” হুলতান পূর্ববৎ বিকৃতকটে বলিলেন, “ওরে, হতভাগী ! তোর সঙ্গে কথা বলিব কেন ? তুই কি তার যোগ্য ?” প্রেমোচ্ছাসিনী নারী ব্যাকুলকটে বলিল, “বল, বল, প্রভু, আমার কি অপরাধ ?” ঐচ্ছরকটে—কীপশব্দে হুলতান বলিলেন, “না, তোর অপরাধ, নয় ত কি আমার অপরাধ ? তুই প্রভাহার স্বামীকে কেন এত কষ্ট দিতেছিস ? তুই যদি এমন কাজ না করিতিস, তাহা হইলে এতদিন আমি আরো ৷ লাভ করিতাম, কিন্তু তাহা না করিয়া তুই প্রতিনিয় তাহাকে প্রহার ও নির্ঘাতন করিতেছিস। এই জন্তই ত আমি কথা কহি না, তুই যত কামিস, আমি নির্লক্ষ্য হইয়া পড়িয়া থাকি।” রাগী বলিল, “তবে আমি কি তাহাকে তাহার নিজস্ব প্রদান করিব ? তাহা হইলে তুমি কি সন্তুষ্ট হও ?”—হুলতান বলিলেন, “হাঁ, তাহাকে শীঘ্র মুক্ত করিয়া দে, আমি আর তাহার রোদন শুনিতে পারিতেছি না।”

রাগী ‘অজ্ঞপ্রাসাদ’ পরিভাগ করিয়া গেল, এবং এক পাত্র জল লইয়া তাহার উপর কয়েকটি ময় উত্তারণ করিল ; সেই ময় উচ্চারিত হইবামাত্র জল উগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার পর সেই জল তাহার অঙ্গ-পাণ শাশীর মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল,—“যদি আমার বাহুবিকার তোমার এ দশা হইয়া থাকে, তবে আমি আদেশ করিতেছি, এখনই তোমার পূর্বাধরা হোক।” যুবক পূর্ব দেহ প্রাপ্ত হইলেন, তখন মায়ামিনী রাজ্যে তাহাকে বলিল, “এই মণ্ডে এখন হইতে প্রাণ লইয়া শল্যন কর, নতুবা তোমার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইবে।”—যুবক তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন এবং কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিয়া হুলতানের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর রাগী ‘অজ্ঞপ্রাসাদে’ কিরিয়া কাক্রি উপহারক-দ্রবে হুলতানকে বলিল, “হে প্রিয়তম প্রাণেশ্বর ! তুমি যে আদেশ করিয়াছ, আমি তাহাই পালন করিয়াছি, এখন উঠ। আমি তোমার বিরহে নিদারুণ যাতনা

কাক্রি-প্রাণ-
হরণ-আপাধ
স্বাধীর
ক্রীত-দাস





ভোজ করিতেছি, কোন স্থানে আমার আর প্রবৃত্তি নাই।”—হুলতান কাক্সির ভাবার কিছু কক্ষনভাবেই বলিলেন,—“জোয়ার কর্তব্য কণ্ঠ এখনও শেষ হয় নাই, তুমি কেবল একাংশ করিয়াছ, এখনও অনেক বাকি।”
রানী বলিল,—“বীথিতথর! আমি কি বাকি রাখিয়াছি বল। এখনই তাহা শেষ করিব।”—হুলতান বলিলেন,
“নগর যেমন ছিল, তেমনই কর, লোকজন যেমন ছিল, তেমনই হোক, যা যেখানে যেমন ছিল তেমনই হইবে,
তবে তুমি আমার মনে শান্তি হইবে। ঐ হৃদের মাছগুলি প্রতিদিন রাতে মাখা তুলিয়া আমাদের হৃদয়কে অভি-
সম্পাত করে। এই জন্তই ত’ আমি এতদিন সারিয়া উঠিতে পারিলাম না। শীঘ্র যাও, এই কাজগুলি শেষ
করিয়া এস, তাহার পর আমার হাত ধরিয়া আমাকে উঠাও।”

“আমি এখনই এই কার্য শেষ করিয়া আসিতেছি”—বলিয়া বাহুকরী চলিয়া গেল। তাহার পর নগর হৃদয় ও
নগরবাসিনগণকে তাহাদের স্ব স্ব রূপে পরিবর্তিত করিয়া হুলতানের নিকট সেই ‘অজ্ঞপ্রাসাদে’ কিরিয়া আসিল।
কাক্সি-ক্রমে সে হুলতানকে বলিল, “প্রিয়তম উঠ, এখন আমরা ছুজনে দেশান্তরে গিয়া পরম স্থখে আমোদ-
প্রমোদ করিব, আমার পাখও স্বামী প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছে।”—হুলতান বলিলেন, “আমাকে ধর—ধরিয়া
তোল।” বাহুকরী হুলতানের দেহের নিকটে আসিয়া তাঁহার বামহস্ত ধারণ করিলে, হুলতান দক্ষিণ হস্তের
থকেসর দ্বারা চক্ষুর নিমিষে ছুচাঙ্গিরীর শিরশ্ছেদন করিলেন। তাহার পর তাহার মৃতদেহ পুরোঁকত রূপে
নিক্ষেপ করিয়া, কুক্করীপের রাজার নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহাকে আদ্বান করিয়া বলিলেন, “আপনার
আর কোন ভয় নাই, পাপিষ্ঠা তাহার পাপের উপযুক্ত প্রতিকূল পাইয়াছে।”

রাজা হুলতানকে বখাযোগ্য ধন্বাদ দিয়া, নতজাহু হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাহার পর বলিলেন,
“হুলতান, আপনি কি মনে করেন আপনার রাজ্য আমার রাজ্যের নিকটে?”—হুলতান বলিলেন, “হাঁ, অধিক
দূরে নহে। আমার রাজ্য এখান হইতে চারি পাঁচ ঘণ্টার পথ হইবে।”—রাজা বলিলেন, “না। আপনার
রাজ্য এখান হইতে এক বৎসরের পথ; আপনি যখন এখানে আসিয়াছিলেন,—তখন এই স্থান আপনার
রাজ্যের অতি নিকটে ছিল বটে, কেবল বাহুকরীর বাহুবিক্রা-প্রভাবেই এক্ষণ স্থানদৈকট্য ঘটিয়াছিল, এখন
আর সে অবস্থান নাই। বাহা হউক, আমি আপনার সঙ্গে গিয়া, আপনাকে আপনার রাজ্যে পৌছাইয়া
দিব, যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যাইতে হইত, তথাপি আমি নিশ্চয় যাইতাম। আপনি আমার প্রার্থনায়
করিয়াছেন।”



হুলতান তাঁহার রাজ্য হইতে এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছেন শুনিয়া প্রথমে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, কিন্তু
বাহুকরীর প্রভাবে সকলই সম্ভব ভাবিয়া সে কথা অবিশ্বাস করিলেন না। রাজাকে সম্বোধনপূর্বক তিনি
বলিলেন,—“তোমার, যখন একটু উপকার করিতে পারিয়াছি, তখন আমার দীর্ঘ পথকে আর কষ্টকর বলিয়া
মনে করিব না। তুমি আমার সঙ্গে যাইবে শুনিয়া আমার বড় আনন্দ হইল। আমার পুত্রসন্তান নাই,
তোমাকে আমি আমার পুত্রস্বামী মনে করিতেছি, আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমাকেই দান করিয়া যাইব।”

শত শত উষ্ট্র বহন রত্ব লইয়া তিন সপ্তাহ পরে উভয়ে হুলতানের রাজ্যে বাত্ৰা করিলেন; হুলতানের
প্রজাগণ তাঁহার অদর্শনে ব্যাহুল হইয়াছিল। তাঁহাকে নিরাপদে কিরিয়া আসিতে দেখিয়া, সকলে উল্লাস
প্রকাশ করিতে লাগিল। হুলতান সকল স্থানের মূল সেই জেলেকে বহু ধনরত্ন প্রদান করিলেন।







শাহারজাদী গল্প শেষ করিয়াই বলিলেন, “শাহানশাহা, এই গল্প চমৎকার হইলেও, করিব বেশী রাজপুত্র ও পক্ষ রমণীর কাহিনীর ভাৱ মনোজ্ঞ নহে।” হুলভান তখন গল্প শুনিবার জন্য এত আগ্রহান্বিত হইরাছিলেন যে, শাহারজাদীকে উহা বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিলেন। শাহারজাদী গল্প আরম্ভ করিলেন।

কালিক হারুন-অল-রাসিদের রাজত্বকালে ষোণদাদ নগরে এক ভারবাহী বাস করিত। যদিও তাহার উচ্চ পদমোরব ছিল না, তথাপি লোকটি বড় সুরসিক ও বুদ্ধিমান। একদিন প্রভাতে সে একটি প্রকাণ্ড ঝাঁকা লইয়া কাজের চেষ্টায় পাড়াইয়া আছে, এমন সময় উৎকৃষ্ট বেশধারিণী একটি সম্ভ্রান্ত রমণী তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, “মুটে, তুমি তোমার ঝাঁকা লইয়া আমার সঙ্গে এস।”—মুটে কিছু উপার্জনের আশায় খুলী হইয়া ‘আজ দিন ভাল,’ বলিয়া রমণীর পশ্চাতে ধাবিত হইল, ঝাঁকাতা সে বাড়ে করিয়া লইল।

একটি বুদ্ধবাদের সম্মুখে আসিয়া সেই যুবতী দ্বারে করাঘাত করিলেন। একজন বৃদ্ধ পুষ্টান সাধা দাড়ির নিশান উড়াইয়া দ্বার-দল্লিকটে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। যুবতী পুষ্টানের হস্তে কয়েকটি মুদ্রা প্রদান করিতেই তিনি বিনা বাক্যে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন এবং কয়েক মুহূর্ত্ত পরে এক কলস উৎকৃষ্ট মণ্ড আনিয়া তাহা যুবতীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন; যুবতী মুটেকে কলসী তাহার ঝাঁকার পাখিতে বলিলেন। অনন্তর যুবতী সে স্থান পরিত্যাগ করিবার সময় মুটেকে তাঁহার সঙ্গে বাইবার আদেশ করিলেন, মুটে মনের আনন্দে বলিতে লাগিল, “আজ দিন ভাল, বড় সুখের দিন।”

ফুল ও ফলের দোকানে আসিয়া যুবতী আশেল, এপ্রিকট, পিচ, লেবু, কমলা, নারঙ্গী প্রভৃতি বহুবিশেষ মিষ্ট ফল ক্রয় করিলেন। সেখান হইতে যুবতী এক কসাইখানায় আসিয়া সাড়ে চার সের মাংস ক্রয় করিলেন, তার পর নানাপ্রকার মশলা ক্রয় করিয়া মুটের ঝাঁকার তুলিয়া দিলেন। মুটে ত্র্যবাসামণ্ডীর আধিক্যে বিম্বিত হইয়া বলিল, “আপনি এত জিনিস কিনিবেন জানিলে আমি ঝাঁকা না আনিয়া একটা ঘোড়া লইয়া আসিতাম। আপনি যে নীকল ত্র্যব ক্রয় করিয়াছেন, ইহার উপর আর কিছু চাপাইলে আমার লইয়া বাওয়া কঠিন হইবে।”—স্বন্দরী একটু হাসিয়া মুটেকে তাঁহার অনুরোধ করিতে বলিলেন।



ফকির-
হেজী
তিন
রাজপুত্র
ও পক্ষ
রমণী

কপালী
ব্যানাজী

মধু হালি
অহমরণ ইকিত

এবার সুন্দরী এক ভয়-বিহীনতার দোকানে উপস্থিত হইলেন। এখানে নানাবিধ গন্ধদ্রব্য জর করা হইল, তাহাও ঝাঁকায় উঠিল। মুটে অতি কষ্টে ঝাঁকা লইয়া তাহার অনুসরণ করিতে লাগিল। সুন্দরী তখন একটি অস্বস্তিজনক গন্ধদ্রব্যনির্গত দ্বার-সরিকটে আসিয়া দ্বারে মুহু কৰাঘাত করিলেন। মুটে তাহার পশ্চাতে গাড়াটয়া সুবতী ও তাহার দ্রব্যরাজি সম্বন্ধে নানা কথাই আলোচনা করিতে লাগিল। সুবতী কে, তিনি কি করেন, ইত্যাদি কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য মুটের বড় কোঁড়ুল হইল। সুবতীকে তাহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে বাইবে, এমন সময় সেই দ্বারপথে আর একটি সুন্দরী তাহারদের সম্মুখে আসিলেন ;

রূপের প্রভাষ
আত্মবিশুদ্ধি



এই সুন্দরী এমন রূপসী যে, তাহার রূপ দেখিয়া মুটের বাহুজ্ঞান লুপ্ত হইল, সে সম্পূর্ণ আত্মবিশুদ্ধ হইয়া পড়িল, আর একটু হইলেই তাহার মাথার ঝাঁকা মাটিতে পড়িয়াছিল আর কি !

মুটে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, “আহা, কি রূপ, এমন রূপ ত কখন দেখি নাই, আর সুখি কখন এমন দেখিব না, এ কি মানুষ না পরী ?” প্রথম সুবতী মুটের যথেষ্ট দিকে চাহিয়া তাহার রসের ভাব সুখিতে পারিলেন। তিনি মুটের ভাব দেখিয়া এতই আশ্চর্য বোধ করিলেন যে, দ্বারের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গেলেন। নবাগতা সুবতী মুহুরেরে বলিল, “ওখানে গাড়াটয়া কি ভাবিতেছ ? ভিতরে এসো না !”

সুবতী মুটেকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে দ্বার রুদ্ধ হইল। বিভিন্ন গৃহের বিচিত্র শোভা দেখিয়া মুটের কোঁড়ুল ও আনন্দের সীমা রহিল না। সুন্দরী সুন্দর স্তম্ভ, সুচিত্রিত প্রাচীর, বহুশূলা সিংহাসন, নীতল আলের ভূমি প্রভৃতি, মুটে কত বিচিত্র সৃষ্টি জিনিস দেখিল, তাহার সংখ্যা নাই ; তাহার নিম্ন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুটে ভাবিল, একে কোন আশীষ-ওমরারের বাড়ী, এমন ভাগ্যবানের বাড়ী মোটো বহিরা আনিয়াও সুখ আছে। মুগ্ধজিত, প্রশস্ত কক্ষমধ্যে মুটে আর একটি অপূর্ণ সুন্দরীকে উপস্থিত দেখিল।

রূপবিশুদ্ধতার
তরঙ্গ ক্রমেই
বাড়িতেছে !



এবার আমরা সুবতীরূপের পরিচয় প্রদান করিব। যে সুবতী বাজার করিয়া আনিলেন, তাহার নাম আমিনা, আর যিনি দ্বার খুলিয়া দিলেন, তাহার নাম সফি। দ্বারের জন্য এই সকল সামগ্রী আনীত হইল, তাহার নাম জোবেদী।

জোবেদী বলিলেন, “জগিনি, মুটেটা মোলো যে ! দেখ দেখ, ও একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে, শীঘ্র উঠিয়া মোটো নামাইয়া লুণ্ড !” এই কথাই আমিনা ও সফি মুটের ঝাঁকা নামাইয়া লইলেন। জিনিবপত্র ঝাঁকা হইতে নামাইয়া লইয়া, আমিনা মুটেকে তাহার পারিশ্রমিক প্রদান করিলেন, তাহার বাহা প্রাপ্য, তাহা অপেক্ষা অধিকই দান করিলেন। মুটে পরসে লইয়া বিদায় হইয়া বাইবে, কিন্তু তাহার মন সরিতেছিল না। কাজ শেষ হইয়াছে, গাড়াটয়াও পারে না, আবার চলিতেও ইচ্ছা হয় না। এমন অপরূপ রূপ দেখিয়া কি সহজে সে স্থান ত্যাগ করা যায় ? তাহার উপর মুটে আবার পরম রসিক পুরুষ ; তাহার প্রাণে রসের লহরী উথলিয়া উঠিল। আমিনার রূপ দেখিয়া সে আরও মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর বাড়ীতে কোন পুরুষ মানুষ নাই দেখিয়া সে কিছুতেই ভাবিয়া পাইতেছিল না যে, এ কাহার। চিত্তা করিতে লাগিল। ভোজের আয়োজন বলিয়া বোধ হইতেছে, ইহার অর্থ কি ? মুটে গাড়াটয়া গাড়াটয়া চিত্তা করিতে লাগিল।

জোবেদী প্রথমে ভাবিলেন, ভারি মোটো আনিয়া মুটের খাড়ে রাখা গায়াগাছে, তাই ব্রহ্ম সে গাড়াটয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিতেছে ; কিন্তু তাহাকে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেখানে গাড়াটয়া থাকিতে দেখিয়া জোবেদী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, তোমার ভাড়া ভূমি পাইয়াছে ?”—তাহার পর আমিনার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “জগিনি, মুটেকে আরও কিছু দাও, ঝাঁকা বড় ভারি হইয়াছিল, গরীব মানুষ—কিছু ধরিয়া দেওয়া কর্তব্য।”



মুটে বলিল, “আমি ভাড়া পাইয়াছি, ভাড়ার লব্ধ আমি এখানে পাড়াইয়া নাই, আমি একটা কথা বুঝিতে না পারিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেছি।—কথাটা বলি, বেয়াহরি মাগ করিবেন। আপনারা তিন জন পরমাশ্রমণী বৃত্তী এখানে আছেন, অথচ এত বড় বাড়ীটীতে একটিও পুরুষমানুষ দেখিতেছি না, ইহার অর্থ কি? পুরুষের দলে জীলোক না থাকিলে যেমন সে দলের শোভা হয় না, তেমনি পুরুষ ছাড়া জীলোকের দলেও কোন শোভা নাই। বিশেষ কোন স্থানে তিনজন লোকমাত্র থাকিলে তাহার অঙ্গহানি হয়, সেখানে চারিজন লোক থাকাই দরকার, আর বোম্বাই নগরের ইহাই রীতি, আপনারা দলের একজন অঙ্গহানি করিতেছেন কেন?”

স্বতীত্রয় মুটের কথা শুনিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া হাসিলেন, তাঁহাদের হৃদয়ের মুখে হৃদয়ের হাসির শোভা দেখিয়া, মুটের প্রাণে স্মৃতির তরঙ্গ বলিল। মুটে ভাবিল, সে সশরীরে স্বর্ণে আসিয়াছে, জিরি দল তাহার চারিদিকে প্রমোদোৎসবে মত্ত!



সেই ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া, পরে একটু গম্ভীর হইয়া, জোবেদী বলিলেন, “একজন ঝাঁক মুটেকে এক কক্ষিত দেওয়ার কোন আবশ্যক না থাকিলেও আমি তোমাকে আমাদের পরিচয় দিতেছি। আমরা তিন ভগিনী, আমরা নিজেরাই নিজেরদের সকল কাজ করি, নিজেরদের ঘরের কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করি না; কারণ, যাঁহারা ঘরের কথা প্রকাশ করে, তাহাদের ঘর বাহির সকলই সমান।”

যা হউক, দুই চারিট কথা জোবেদী বুঝিলেন, মুটেরি করিলেও লোকটা অপদার্থ নহে, পড়াশুনাও কিছু কিছু আছে, বোধ হয়, সে তাঁহাদের সহিত আহার্যমোদে যোগ দিতে চায়। স্মৃত্যঃ তিনি রহস্যভরে বলিলেন, “মুটে সাহেব, আমরা কিছু ধান্যপিনার আয়োজন করিতেছি। তুমি নিজেই দেখিলে তাহাতে ধরচ কত! বিনা বায়ে যে তুমি এই সকল জিনিসের ভাগ পাইবে, তাহা কি সম্ভব?”

মুটে এবার অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া যায় দেখিয়া, আমিলা তাহার পক্ষাবলম্বন করিলেন, “জোবেদী, সখী, শোন, লোকটাকে এখানে থাকিয়া কিছু খাওয়া, দাওয়া করিতে দাও। এ ব্যক্তি কথাবার্তার আমাদিগকে বেশ আমোদে রাখিবে; দেখিতেছি, উহার সে ক্ষমতা আছে। ইহার মত শত্রু মুটে না পাইলে আমি এত শীঘ্র এত জিনিস এমন গুছাইয়া আনিতে পারিতাম না। সে অনেক অদ্ভুত গল্প জানে, আমাদিগকে তাহা শুনাইবে।”

আমিনার এই কথা শুনিয়া মুটে আনন্দে বিগলিত হইয়া আমিনার পদতলে দুটাইরা পড়িল; তাঁহার হৃদয়ের পায়ের ধূলা চাটিতে লাগিল; শেষে বলিল, “ঠাকুরাণী, আপনাদের কথার আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইয়া গেল, আমি একবারে নরলোক হইতে স্বর্ণে পৌছিয়াছি, আপনাদের দয়া আমি কখন ভুলিব না। মনে করিবেন না যে, আমি তোমাকে আপনাদের সমকক্ষ লোক জ্ঞান করিতেছি, আমি আপনাদের দাসাশ্রয়ান।”—মুটে এই কথা বলিয়া মহা খুসী হইয়া তাহার পরমা জোবেদীর হাতে প্রদান করিতে গেল। জোবেদী গম্ভীর ভাবে তাহাকে বলিলেন, “আমরা যাঁহা একবার দান করি, তাহা আর ফেরত লই না। আমরা তোমাকে আমাদের ভোজে যোগদান করিতে দিব, কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, এখানে বাহা হইবে বা বাহা তুমি প্রত্যক্ষ করিবে, সে সবকে কোন কোঁতুল প্রকাশ করিতে পারিবে না; তব্ধি তুমি ভ্রমলোকের মত বসিয়া থাকিবে ও কথাবার্তা বলিবে, কোন রকম বয়োদর্শি প্রকাশ করিতে পারিবে না। কোনও বিষয়ে প্রশ্ন করিলেই তাহার মগ্ন ভোগ করিতে হইবে।”

তিন ভগিনীতে আহারের টেবিল বিবিধ ভোজ্যদ্রব্যে সুসজ্জিত করিলেন, যদের বোতল ও স্বর্ণপাত্র আনীত হইল। অনন্তর রমণী তিনজন টেবিলে আহারে বসিলেন, তাঁহারা সেই ঝাঁক-মুটেকেও তাহাদের



এক পাশে বসিতে দিলেন। মুটে এইরূপে তিনজন সন্ন্যাস মহিলার পাশে সেই স্নগজ্জিত ভোজনগারে আহ্বারে বসিয়া স্বর্ণমুখ অমুভব করিতে লাগিল।

আহার করিতে করিতে আমিলা মদের বোতল ও পেয়ালা বাহির করিয়া, স্বয়ং কিছু মত্তপান করিলেন, তাহার পর আরবীর কাদদার তাঁহার ভগিনীদিগকেও এক এক পাত্র ঢালিয়া থাইতে দিলেন। তাঁহাদের মত্ত-পান হইলে সেই মুটেকেও এক পাত্র পান করিতে দেওয়া হইল। এই অমুগ্রহ দর্শন করিয়া, মুটে স্তম্ভীর করচুষন করিয়া মনের সুখে গান আরম্ভ করিল; মত্তপান করিয়া তাহার মনে রীতিমত ক্ষুধির উদ্রেক হইল। তাহার গান শুনিয়া যুবতী তিনজনও সুধাবরীকণ্ঠে গান গাহিলেন, সকলেই আনন্দগারে ভাসিতে লাগিলেন।

নয়-সৌন্দর্যের
মাধুর্যের সঙ্গে
চপেটাঘাতের
আলা!



প্রশস্ত কক্ষের একদিকে একটা স্নানকুণ্ড ছিল। তাহাতে স্নিগ্ধ সুগন্ধি জল টল-টল করিতেছিল। যুবতীদিগের যখন মত্তাবস্থা সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্য হইতে আমিলা যৌবনলীলায়িত দেহ হইতে বস্মাদি উন্মোচন করিয়া নয়মুর্ধিতে জলক্ৰীড়া করিতে লাগিলেন। স্নান সমাপ্ত হইলে, যুবতী অঙ্গকোচে গাত্রাদি মার্জনা করিয়া উছলিত যৌবনের রূপ-ভরণে মুটেকে বিব্রত ও বিভ্রান্ত করিয়া তুলিলেন। তারপর নয়দেহে স্তম্ভীর মুটের উৎসঙ্গে উপবেশন করিয়া, নানারূপ প্রলম্বাণে তাহাকে জর্জর করিয়া তুলিলেন। বেচারী ভারবাহী এ জন্ত প্রস্তুত ছিল না। স্তম্ভীর তরুণীর যৌবন-পুশিত দেহভার তাহার সর্বদেহে বিচিত্র অলুভূতির সঞ্চার করিলেও সে শ্রীলতাবিন্দু কোন প্রকার আচরণ করিতে সাহস পাইল না। প্রলম্বগুলির সত্তর দিতে না পারায় স্তম্ভীর তাহার গণ্ডদেশে চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। স্তম্ভীর নারীর করণরবের স্পর্শ স্নমধুর হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু পুনঃ পুনঃ প্রহারে মুটের গণ্ডদেশ ক্ষীত ও আরক্ত হইয়া উঠিল।

যথাক্রমে দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া যুবতীও অমুরূপ জলক্ৰীড়ার পর নয়সৌন্দর্যের স্তম্ভাভালি প্রকাশ করিয়া মুটের ক্রোড়ে উপবেশন করিলেন এবং নানাবিধ প্রলম্ব উপাধান করিতে লাগিলেন। মুটে বেচারী রসিক ও দাহনীর হইলেও উপযুক্ত উত্তর দিতে পারিল না। তাহার কলে নয় স্তম্ভীর হস্তপরিবেষিত মৃষ্টাশাত ও চপেটাঘাতের মাধুর্যে তাহার আহত গণ্ডস্থল বাথার-টাটাইয়া উঠিল।

স্বপ্নবকের চুষন
প্রতিশোধ!



তবে মুটে রসিকপুরুষ। প্রতিশোধ দিবার বাসনার সেও নয়দেহে জলের মধ্যে কাঁপাইয়া পড়িল এবং যুবতীরা যেভাবে অবগাহন করিয়াছিলেন, সেও ঠিক সেইভাবে স্নানকার্য্য সমাপ্ত করিল। তারপর নয়দেহে আমিনার ক্রোড়ে বসিয়া সেও তাঁহাদের মত কতিপয় প্রলম্ব করিল। যুবতীরা সে প্রলম্বের দখলমত উত্তর দিতে না পারায় সে প্রত্যেকের ফুল্লারবিন্দুতলা নোদারম গণ্ডদেশে পুনঃপুনঃ চুষন-রোপা সূত্রিত করিয়া দিল। যুবতীরাও তাহাতে প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না।

বেগা শেষ হইয়া আসিল। সন্ধ্যা মুটেকে সন্ধ্যোধনপূর্বক বলিলেন, “বেলা শেষ হইয়াছে, তুমি এখন বিদায় হইতে পার।” মুটের তখন সে স্থান ত্যাগ করিবার ইচ্ছা ছিল না; সে বলিল, “ঠাকুরাণিগণ! আমার এ অবস্থায় আমাকে ত্যাগ করিবার অমুমতি করিতেছেন কেন? আপনাদিগের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমি আশ্বহারা হইয়া গিয়াছি। আপনারা আমার মনে যে আনন্দ দান করিয়াছেন, এ অবস্থায় আমি কোন মতে বাড়ী ফুঁকিয়া পাইব না। আমি রাত্রি আর বাড়ী ঘাইতে পারিব না; যেখানে বসিবেন, সেইখানেই আমি পড়িয়া থাকিব। আর যখনই ফিরিয়া যাই, যেমন মাছুষটি আসিয়াছিলাম, তেমনটি আর ফিরিব না।”

আমিলা পুনর্বার মুটের প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্ত তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে অমুরোধ করিলেন। তখন তাঁহারা মুটেকে রাতিতে সেখানে বাস করিবার অমুমতি দিয়া বসিলেন, “দেখ মুটে, আমরা তোমার প্রার্থনার সম্মত হইলাম, কিন্তু তোমাকে আবার নৃতন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইবে। তুমি আমাদিগকে

যে কিছু কাজ করিতে দেখিলে, তাহা চক্ষু মেলিয়া দেখিয়াই যাইবে, সে সৰ্ব্বদে কিম্বা তারার উদ্দেশ্যে সৰ্ব্বদে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না ; আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহা কেবল শুনিয়াই যাইবে, কাঁড়কাঁড় হইয়া সে সৰ্ব্বদে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবে না ; কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহা তোমার পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না ।”

মুটে বলিল, “আপনাদের কথা বুঝলাম, আপনারা যে অজ্ঞমতি করিলেন, প্রায়পথে তাহাই পালন করিব । আমার জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ নীরব রহিবে । আর আমার চক্ষুকে আরসীর মত করিয়া রাখিব, আমি এমন একটা কথাও বলিব না, যাহার সহিত আমার কোন সন্দেহ নাই ।” অনন্তর জোবেদী তাহাকে ঘরের দেয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিতে বলিলেন । মুটে দেখিল, প্রাচীরে লেখা আছে—“যে ব্যক্তি পরচর্চা করে, তাহাকে অশ্রীতিকর কথা শুনিতে হয় ।”

আমিনা নৈশাহারের আয়োজন করিলেন । বহুসংখ্যক বাতিতে কশট দিবালোকের তায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অগ্নিকুণ্ড হইতে সুবাসিত ধূম উঠিয়া চতুর্দিক পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল । বমণীগণ সেই মুটেকে লইয়া মধ্যাহ্নকালের জায় আহার করিতে বসিলেন ; নান্দা ছিল সে বেচারীকে অতিরিক্ত মত্তপান করাইয়া একেবারে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন । মুটের মুখ খুলিয়া গেল ; খুব প্রবলবেগে হসিকতা চলিতে লাগিল ।

নৈশ-প্রায়োনের
আয়োজন



আমোদ পূর্ণমাত্রার চলিতেছে, এমন সময় তাঁহার দ্বারে করাঘাতশব্দ শুনিতে পাইলেন । শব্দ বাহির হইতে আসিতেছিল ; তিনজনই একত্রে দ্বার খুলিতে উঠিলেন ; দক্ষী মধ্যাগ্রে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিতে গেলেন । এত রাত্রে কে, কি কাজের জন্ত আসি-
য়াছে জানিবার জন্ত তাঁহার অত্যন্ত ব্যগ্র হইলেন । দক্ষী আসিয়া বলিলেন, “আজ মহানন্দে রাত্রি কাটাইবার পতি উৎকৃষ্ট সুযোগ উপস্থিত ! আমাদের গৃহদ্বারে তিনজন কবির ; তাঁহার কবিতা না, ঠিক বলিতে পারি না, তবে কবিরের পরিচয়-
দারী বটে ; কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, তাঁহার তিনজনই একচক্ষু ; তন্নিম্ন তাঁহাদের মস্তক ও পাণ্ডিত্যিক এমন কি, ও পর্য্যাপ্ত জানি না । তাঁহারা বলিল, তাঁহারা এইমাত্র বৌদ্ধবাদ নগরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে । এখানে তাঁহারা পূর্বে আর কখনও



সংস্কৃত
গৃহদ্বারে
তিনজন
কবির



আসে নাই। কোথায় বাসা পাওয়া ঘাইতে পারে, তাহা না জানায় বাসার সন্ধানে দৈববাণী তাহার। আমাদের ধারে যা দিয়াছে। আমাদের দয়া প্রার্থনা করিতেছে। ফকির কয়টি অল্পবয়স্ক স্ত্রীক; কথাবাহীরা বোধ হইল, নিতান্ত অপদার্থ নহে; কিন্তু তাহাদের আকৃতি ও পরিচ্ছদগত মিল দেখিয়া আমি হস্ত সংবরণ করিতে পারি নাই।—এই কথা বলিয়া সতী আবার হাসিতে লাগিলেন, সে ভয়ানক হাসি আর থামে না। অজ্ঞ ভগিনীরাও সেই হাতে বেগদান করিলেন।

হৃদয়ী
প্রমোদক
ফকিরত্বের
সম্বন্ধন।



অবশেষে সতী জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাদিগকে ভিতরে আনিব কি?”—এ বিষয়ে জোবেদী ও আমিনার বিশেষ মত না থাকিলেও সতীর আগ্রহ তাঁহারা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। জোবেদী বলিলেন, “তাহাদের আনিতে পার, কিন্তু তাহারা এখানে অজ্ঞের কথা, কি আচরণ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিবে না, একপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া আনিবে। গৃহপ্রাচীরে যে লেখা আছে, তাহা তাহাদিগকে পাঠ করিতে বলিবে।” সতী এই কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত মনে ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং ফকির তিনজনকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ফকিরের গৃহপ্রবেশ করিয়াই নতমস্তকে স্তবতীক্ষণক নমস্কার করিল। স্তবতীক্ষণ প্রত্যাহ্বান জানাইয়া বলিলেন, তাঁহারা বোধ হয় বিশেষ পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, সেই বাড়ীতে অনায়াসে বিশ্রাম করিতে পারেন। ফকিরের অমরুদ হইয়া হৃদয়ীপথের পাশে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা একবার বক্রদৃষ্টিতে মুঠের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, লোকটির আকারপ্রকার তাঁহাদেরই মত, প্রভেদের মধ্যে দাড়িগৌল ও জ্ঞান কানন নহে; চক্ষু দুইটিই বর্তমান আছে, কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে অনেক বিষয়েরই সাম্য দৃষ্ট হইল। একজন ফকির বলিলেন, “এ লোকটি আমাদের বিদোহী আবীরের ভ্রাতার মত দেখিতে।”

অধিক পরিমাণে মত্তপান করিয়া মুঠে ঝিমাইতেছিল, ফকিরের কথা শুনিয়া সে তাহার দিকে একবার মকোলে চাহিল; তাহার পর বলিল, “মহাশয়, আপনারা বহন, পরের কথা লইয়া চর্চা করিবেন না। ঘরের উপর কি লেখা আছে, দেখেন নাই কি? এখানে পরের মতে চলিতে হইবে; নিজের ইচ্ছায় কোন কাজ করিতে পারিবেন না।” পূর্বোক্ত ফকির সবিনয়ে বলিলেন, “ভাই সাহেব, আমার কথায় রাগ করিব না। এখানে আমরা তোমাদের কোন আদেশ করিতে আসি নাই, বরং আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি।” গোপমগ জনে বাড়িয়া উঠে দেখিয়া হৃদয়ীপথ মধ্যে পড়িয়া তাহা মিটাইয়া দিলেন।

ফকিরগণ আসনগ্রহণ করিলে তিন ভগিনীতে মিলিয়া তাঁহাদের আহ্বানটির আয়োজন করিয়া দিলেন। তাঁহাদের পানের জন্ত সতী উৎকৃষ্ট মদ্য আনিয়া দিল। উৎকৃষ্ট খাদ্য ও মদ্য উদর পূর্ণ করিয়া তাহারা গীতবাত্য আরম্ভ করিলেন; সতীতেও স্বাধর, বাজের ঐক্যাতনিকের ধ্বনি, সমবেত কণ্ঠের উচ্চ হাস—সকল মিলিয়া সেই গৃহটিকে উৎসবভবনে পরিণত করিল। এই ভাবে যখন উৎসব চলিতেছে, এমন সময় সেই গভীর রাত্রিতে হৃদয়ীপথের দ্বারে আবার কে করাবাত করিল; সতী গান বন্ধ রাখিয়া, আগমুক কে, তাহা দেখিতে গেলেন।

খালিকের ছা-
বেশে পরিভ্রমণ



এইখানে শাহরজাবী হুলতানকে বলিলেন, এত রাত্রিতে লোকের বহির্দ্বারে কে আঘাত করিতে পারে, সে সম্বন্ধে হুলতানকে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বলিয়া মনে করি। বোগদাদের অধীশ্বর খালিক হাকিম-অল-রসিদ তাঁহার রাজধানীতে অনেক সময়েই ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিতেন। রাত্রিকালে তিনি নগরীর পথে পথে ঘুরিয়া দেখিতেন, কোথাও কোন গোপযোগ আছে কি না। সে দিন সন্ধ্যাকালে খালিক তাঁহার প্রধান উকীর জাকরের সহিত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া, প্রধান বেলায় সন্ধ্যা সন্ধ্যা

নগরভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। সে দিন তাঁহারা সদাগরের ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পথ দিয়া বাইতে বাইতে যে বাড়ীতে ঐ যুবতীগণ বাস করিতেন, সেই বাড়ীর নিকটে আসিয়া, খালিক গীতবাত্ত ও হাত্তামোদ শুনিত পাইলেন। তিনি সবিস্ময়ে ইহার কারণ জানিবার জন্ত উজীরকে কহিলেন, “উজীর, আমি ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গান-বাজনা ও আমোদের কারণ জানিতে ইচ্ছা করি, তুমি ঘরে গিয়া ধাক্কা দাও।” উজীর খালিককে কোতুহল ভাগ করিতে অহরোধ করিয়া বলিলেন, “এখানে হয় ত জীলোকোন্না মদ খাইয়া আমোদ-প্রমোদ করিতেছে, এখন সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহাদের আমোদে বাধানান করা সম্রাটের উচিত হইবে না, তত্ত্বি অপমানিত হইবারও আশঙ্কা আছে।” খালিক বলিলেন, “তোমার সে চিন্তার আবশ্যক নাই, যাহা বলিলাম, কর।”

খালিকের আদেশ অনুসারে উজীর দরজার ধাক্কা দিলেন। সন্ধ্যা উঠিয়া আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিতেই গৃহমধ্যবর্তী উজ্জ্বল দীপালোকে উজীর দেখিলেন, সন্ধ্যা পরমাত্মার যুবতী। তিনি সন্ধ্যাকে অভিবাদন করিয়া বিনীতভাবে বলিলেন, “ঠাকুরাণি! আমরা তিনজন সদাগর মোশন হইতে আজ দশ দিন হইল আসিয়াছি, আমাদের সঙ্গে অনেক মূল্যবান পদার্থ আছে, এক খাঁর বাড়ীতে আমরা বাসা লইয়াছি। এই নগরের একজন সদাগর আজ আমাদের নিকট নিয়ন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেখানে আমাদের আহার-আমোদের যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল, নৃত্যগীত কোলাহলেরও বিরাম ছিল না; সেই কোলাহল শুনিয়া নগরের একজন প্রহরী গৃহদ্বারকে প্রেষণ করিল, কেবল আবরাহী তিনজন প্রাচীর লক্ষিয়া পলাইয়া আসিয়াছি; কিন্তু আমরা এখানে অপরিচিত, তাহার উপর প্রচুর মদ খাইয়া মাতাল হইয়াছি; আমাদের বাসাও অনেক দূর, পথে পাহারাভরানার হাতে পড়িয়া যাইতে পারি এবং এত রাত্রে বাসকে পথে হইয়া থাকিতে পারি। এখানে আপনার নৃত্যগীত শুনিয়া মুগ্ধালাম, আপনারা এখনও জাগিয়া আছেন, তাই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু জন্ত আশ্রয়লাভের আশার আপনাদিগকে বরক্তি করিয়াছি।”

সন্ধ্যা জ্ঞানের কথা শুনিয়া তাঁহাদের তিন জনেরই মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিলেন; দেখিলেন, আগন্তকের কথায় অবিখাঁস করিবার কারণ নাই; কারণ, তাঁহাদের আকার দেখিয়াই বুঝিলেন, তাঁহারা সাধারণ লোক নহেন, সুতরাং তিনি সবিনয়ে জানাইলেন, তিনি গৃহকর্ত্তা নহেন, তাঁহারা দ্বারপ্রান্তে মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিলে তিনি গৃহকর্ত্তার অভিপ্রায় তাহাদিগকে জানাইতে পারিবেন। আগন্তুকগণ এ প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইলে সন্ধ্যা তাঁহার ভগিনীগণের নিকট গিয়া সকল কথা প্রকাশ করিলেন; সেই রাত্রির জন্ত আগন্তুকগণকে গৃহে স্থানদান করিতে কাহারও আপত্তি হইল না। খালিক, উজীর ও অহরোধের সহিত সন্ধ্যার অনুসরণ করিয়া যেখানে নৃত্যগীত হইতেছিল, সেইখানে উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকগণকে সম্মানে গ্রহণ করিয়া জোরবন্দী বলিলেন, “আপনারা এখানে আজ রাত্রে থাকিতে পারেন, কিন্তু আপনাদিগকে একটি প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইতে হইবে। আপনারা কেবল নির্দোষভাবে এখানকার সকল কাণ্ড দেখিয়া যাইবেন, কোন কথা বলিবেন না কিংবা কোন কারণ জানিতে কোতুহল প্রকাশ করিবেন না; অন্তথা করিলে আপনাদিগকে অপ্রিয় কথা শুনিত হইবে।” উজীর বলিলেন, “স্বন্দরি, আপনার আদেশ শিরোধার্য, আমরা এরূপ বয়োদয লোক নই যে, পরের গৃহে আসিয়া পরচর্চার সময় কাটাইব।”

সকলে উপবেশন করিলে পূর্ব্বে গান-বাজনা চলিতে লাগিল, ফকিরগণ মহানন্দে গীত আরম্ভ করিয়া দিলেন। এইভাবে অনেক রাত্রি পর্ধ্যন্ত নৃত্যগীতাদির পর সেই গৃহের দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল। ডিস, টেল, বোল, গেলস ও বাত্মহাদ্রাদি স্থানান্তরিত করা হইল। তাহার পর একটি প্রশস্ত সোকার একদিকে তিনজন



ফকির, অজ্ঞানকে খালি, উজীর ও খোজা উপবেশন করিলেন। আমি সেই মুঠেকে বলিলেন, “তুমি এখানে পাড়াইয়া থাক, তোমার মত জোয়ান মর্দের বসিয়া থাকা শোভা পায় না। আমরা যাহা করিতে বলিব, এখানে পাড়াইয়া তাহাই করিতে হইবে।” মুঠে অনেকক্ষণ ঘুমাইয়া লইয়াছিল, ইতিমধ্যে মদের নেশাও অনেকটা কাটিয়া গিয়াছিল, স্বতঃস্ফূর্ত স্বন্দরীর আদেশ পালনে তাহার আপত্তি হইল না।

প্রাথমিক
মজলিসে
কুর নির্যাতন



সকলে উপবেশন করিলে আমি আনন্দ কক্ষ হইতে দুইটি প্রকাণ্ড কুম্ভবর্ণ কুকুরী সেই কক্ষে লইয়া যাইবার জন্ত মুঠেকে আদেশ করিলেন, মুঠে আদেশ পালন করিল। কুকুরী দুটিকে দেখিলেই বৃষিতে পারা যায়, তাহার কিলুমাত্র আদর পায় না। উদরে আহার অপেক্ষা পুষ্ট বেত্রই অধিক পরিমাণে পায়। জোবেদীর আদেশে মুঠে একটি কুকুর আমিনার হস্তে প্রদান করিল, অজ্ঞাত জোবেদীর নিকট রহিল। জোবেদীর কাছে যে কুকুরীটি ছিল, সে ভয়ানক চীৎকার করিতে লাগিল ও পুনঃ পুনঃ মাথা তুলিয়া অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু জোবেদী কিছুমাত্র দয়া না করিয়া প্রবলবেগে তাহাকে বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন; কুকুরীটি আঘাতে মৃতপ্রায় হইলে জোবেদীও বেত্রচালনে পরিশ্রান্ত হইলেন। তখন তিনি বেত ফেলিয়া দিয়া কুকুরীটিকে বক্ষ্যদেশে তুলিয়া লইয়া প্রবলবেগে অঙ্গবর্ণন করিতে লাগিলেন এবং ক্রমাৎ দিয়া কুকুরীর চোখের জল মুছাইয়া দিয়া তাহার মুখচুষন করিলেন। অতঃপর কুকুরীটিকে কক্ষান্তরে রাখিয়া আসা হইল। প্রথমটির প্রতি এই প্রকার বিচিত্র ব্যবহার করিয়া জোবেদী দ্বিতীয় কুকুরীটির প্রতিও ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিলেন। ভিনজন ফকির, খালিফ ও তাঁহার সহচররা এই প্রকার ব্যাপার দেখিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না। খালিফের বিষয়টী সাক্ষর অপেক্ষা অধিক হইল, এই অপূর্ণ ব্যবহারের মর্ম কি, তাহা স্থির করিবার জন্ত তাঁহার পরস্পর কিছুকাল আলোচনা করার পর খালিফ উজীরকে উহার কারণ বিজ্ঞানীর জন্ত আদেশ করিলেন। উজীর খালিফকে ইহিতে জানাইলেন, তাঁহার কোতুল চরিতার্থ করিবার এখনও সময় হয় নাই।

সকলে কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন, তাহার পর সফী আপন পরিচয় করিয়া আমিনাকে বলিলেন, “ভয়, উঠ, আমার উদ্দেশ্য বোধ হয় বুঝিয়াছ।” এই ইঙ্গিতমাত্র আমিনা আপন হইতে উঠিয়া ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং সাতদিনমণ্ডিত স্বর্ণবর্ণে চিত্রিত একটি বাস্ক লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বাস্ক খুলিলে দেখা গেল, তাহার মধ্যে একটি অতি সুন্দর বীণা রহিয়াছে। সফী বীণা বাজাইয়া গান করিতে লাগিলেন; সেই সুন্দর গীতে সকলেই মুগ্ধ হইলেন। কিয়ৎকাল গানের পর তিনি পরিশ্রান্ত হইলে আমিনার হস্তে সেই বীণা প্রদান করিলেন;—বলিলেন, “ভয়, আমার গলা শুকাইয়া গিয়াছে, তুমি এখন কিছুকাল বীণা বাজাইয়া গান করিয়া অতিথিগণের হৃদয়ে আনন্দ দান কর।”

আমিনাও গান করিলেন। গান শুনিয়া জোবেদী মুক্ত-হৃদয়ে বলিলেন, “ভয়! তোমার অসুখ ক্ষমতা, শোক যেন তোমার গানে মুগ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন করুণ-সঙ্গীত কখনও শুনি নাই। এই কথা বলিতে না বলিতে আমিনা তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিয়া বক্ষঃস্থল অনাবৃত করিলে, দর্শকগণ সন্নিহনে ও সমুদ্রে দেখিলেন, আমিনার বক্ষে নিরাকৃণ ক্ষতচিহ্ন; আমিনা বক্ষ অনাবৃত করিয়াই মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন। জোবেদীও সফী দ্রুতবেগে তাঁহার সাহায্যার্থ ধাবিত হইলেন। একজন ফকির বলিলেন, “এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপার সন্দর্শন করা অপেক্ষা গাছতলায় পড়িয়া নিশা ঘাওয়া অনেক ভাল ছিল।”

খালিফ সমস্ত ব্যাপার জানিবার জন্ত বিশেষ গুংহুকা প্রকাশ করিলে উজীর তাহাকে সংগোপনে বলিলেন, “জাহাঙ্গীর, রাতি শেষ হইয়া আসিয়াছে, আপনি যৈর্ঘাধারণ পূর্বক আর কিছুকাল অপেক্ষা করুন, প্রজাত হইলেই আমি এই যুবতীগণকে আপনার রাজসভায় উপস্থিত করিব। তখন আপনি ইহাদের মুখে সকল

ফিকার বক্ষ
নিরাকৃণ ক্ষত





কথাই জানিতে পারিবেন।” খালিফ বলিলেন যে, তিনি প্রস্তাব পৰ্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অসমর্থ, অবিলম্বেই তিনি সকল কথা জানিতে চাহেন; কিন্তু কে সৰ্ব্বপ্রথমে যুবতীগণকে প্রণয় করিবে, তাহার কিছুই স্থির হইল না, অবশেষে তাঁহার নানা কোশলে মুটেকে প্রণয় করিবার জন্ত সম্মত করাইলেন। অনেকক্ষণ সেবা-শুশ্রূষার পর আমিনার মুচ্ছাভঙ্গ হইলে মুটে জোবেদীকে বলিল, “ঠাকুরাণি, এই ভ্রমলোকগুলি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, আপনারা কুকুরের সহিত এরূপ অদ্ভুত ব্যবহার কি জন্ত করিলেন এবং আপনাদের ভগিনী মুনসীর আমিনার বক্ষঃস্থলে এরূপ দ্রুত হস্তারহি বা কারণ কি? ইহাদের ইচ্ছা অমুগারেই আমি আপনাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি।”

জোবেদী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বিরক্তভাবে বলিলেন, “আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, আপনারা এখানে কেহই আমাদের কোন ব্যবহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবেন না, আপনারাও সেই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু আপনারা আপনাদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন না, এ জন্ত আপনাদিগকে ফলভোগ করিতে হইবে।”

অনন্তর জোবেদী মুক্তিকার পদাব্যাপ্তপূর্বক তিনবার করতালি দিয়া বলিলেন, “শীজ এস।” মুহূর্তমধ্যে একটা গুপ্ত দ্বার খুলিয়া গেল এবং সেই পথে সাতজন বলবান্ কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি তরবারি হস্তে দ্রুতবেগে প্রবেশ করিল। তাহারা গৃহমধ্যস্থ সাত জন পুরুষকেই ধরাশায়ী করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করিবার জন্ত তরবারি উত্তত করিল।

প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে
রূপসীর বোধ

এই অদ্ভুত ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া, খালিফ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন, উজীরের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়াই এই বিপদে পড়িতে হইল তাহারা, তিনি মনে মনে অমুগতাপ করিতে লাগিলেন। এ দিকে কাফ্রি দাসরা তাহাদের অসি উত্তত করিয়াই জোবেদী ও তাঁহার ভনীধরকে জিজ্ঞাসা করিল, “ঠাকুরাণি! আপনাদের অমুমতি হইলে এই দ্রুত ভদ্রিগের শিরশ্ছেদন করি।”—জোবেদী বলিলেন, “একটু থাম, আগে ইহাদের সকল কথা শুনা যাউক।”—তখন মুটে অত্যন্ত কাতরভাবে বলিল, “ঠাকুরাণি, আল্লার দিবা, অস্তের অপরাধে আমার প্রাণনষ্ট করিবেন না, আমি নিরদোষ, এই লোকগুলাই অপরাধী, কত স্তম্বে আমাদের সময় কাটতে-ছিল, কিন্তু এই একচক্ষু ফকিরগুলা আসিয়া সব গোল করিয়া দিল; কাণার সুখদর্শন করিলে বিপদে পড়িতে হয়, দয়া করিয়া এবার আমার প্রাণরক্ষা করুন।”

জোবেদী মুটের কাতরতা দেখিয়া ও তাহার কথা শুনিয়া মুগ্ধহস্ত করিলেন। মুটের উপর তাহার ক্রোধ অনেক পরিমাণে হ্রাস হইল, তিনি অল্প অল্প অতিথিগণকে সন্মোদন করিয়া বলিলেন, “তোমরা কে, এখনি পরিচয় দাও; নতুবা তোমাদের জীবনের আশা নাই। তোমরা যে ভ্রমলোক কিংবা কোন ভ্রমসমাজে মিশিয়াছ, এ কথা আমার বিশ্বাস হয় না, তোমাদের ভ্রমস্তাবোধ থাকিলে প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া এ ভাবে আমাদের অপমান করিতে না।”

রহস্ত-রক্ষিত
কল্পনা

খালিফ সকল অপেক্ষা অতিশয় ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রদানের জন্ত ইঙ্গিতে উজীরকে অমুগতাপ করিলেন; কিন্তু বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ উজীর খালিফের পরিচয় প্রদান করিতে সম্মত হইলেন না;—বলিলেন, “আমরা যেমন কাজ করিয়াছি, তাহার উপযুক্ত ফলভোগ করিব।”

জোবেদী একে একে সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, একচক্ষু ফকির তিনজনকে বলিলেন, “দেখিতেছি, তোমাদের প্রত্যেকেরই এক একটা চক্ষু নাই, তোমরা কি তিনজনে সহোদর ভ্রাতা?—তখন একজন ফকির উত্তর করিলেন, “আমাদের পরাম্পরের সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই, একটা ভয়ানক বিপদে

পড়িয়া আমার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেই বিশদে কোন ক্রমে প্রাপ্যরক্ষা হইয়াছে বটে, কিন্তু চক্ষুটি নষ্ট হইয়াছে! সে বড় অদ্ভুত কাহিনী! সেই বিশদের পর আমি মাথার চুল, দাড়ী, পোপ, জুগমস্ত কামাইয়া ফকিরী গ্রহণ করিয়াছি।”



জোবেদী অল্প ফকিরদ্বয়কেও সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারও প্রথম ফকিরের জায় উত্তর দান করিলেন; কেবল তৃতীয় ফকির বলিলেন, “ঠাকুরাণি, আমরা সাধারণ লোক নহি, তিনজনই আমরা রাজপুত্র, দৈবঘটনার আজ সন্ধ্যাকালে আমাদের পরস্পরের আগাগ হইয়াছে, তাহার পূর্বে আমরা কেহ কাহাকেও চিনিতাম না।”

ফকিরদিগের মুখে এই কথা শুনিয়া জোবেদীর ক্রোধ অনেক পরিমাণে শান্ত হইল, তিনি সেই কাক্সি দাসদিগকে আদেশ করিলেন, “ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, কিন্তু চলিয়া যাইও না, নিকটে পাড়াইয়া থাক। যে তাহার ইতিহাসের কোন অংশ গোপন না করিয়া, সরলভাবে সত্য কথা বলিবে, এবং কি উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছে, তাহা গোপনে না রাখিবে তাহার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই, কিন্তু ইহার অন্তথা করিলে আমি মার্জনা করিব না।”

মুক্তিলাভের আশায় সকলেই সত্যকথা বলিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মুটে সর্বপ্রথমে কথা কহিল; সে বলিল, “ঠাকুরাণি, আমার ইতিহাস আপনি সকলই অবগত আছেন, কি জন্ম আমি আপনাদের বাড়ী আসিয়াছি, তাহাও আপনার অজ্ঞাত নাই; আপনাদের দ্রব্যশাস্ত্রী লইয়া বাজার হইতে এখানে আসিয়াছি, তাহার পর আপনাদের অহুগ্রহেই আজ এখানে প্রচুর পরিমাণে আহা! ও আমোদ লাভ করিয়াছি, এ অহুগ্রহ কখনও আমি ভুলিব না, ইহাই আমার ইতিহাস।”

মুটের কথা শেষ হইলে জোবেদী তাহার প্রতি সম্বন্ধ হইয়া বলিলেন, “তোমাকে কমা করা গেল, তুমি অবিথাকে এখান হইতে দূর হইয়া যাও।”—তখন মুটে ক্রোধে বলিল, “ঠাকুরাণি, আপনি অম্মমতি করিলে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া এই কাণা ফকির তিনজন ও ভদ্রলোক কয়েকটির ইতিহাস শুনিয়া যাই;—ইহারা যখন আমার কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন, তখন ইহাদের কাহিনী শ্রবণেও আমার অধিকার আছে।” জোবেদী তাহার প্রার্থনার সম্মত হইলে সে একপাশে আসনের উপর বলিল। তাহার মনে এখন বড় আনন্দ; কারণ, তাহার ভর দূর হইয়াছিল। জোবেদীর আদেশে একজন ফকির প্রথমে তাঁহার নিজের বিচিত্র কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।



প্রথম ফকির কাহিনী



প্রথম ফকির বলিলেন, “ঠাকুরাণি! কিরূপে আমি এক চক্ষু হারাইলাম এবং কি জন্মই বা ফকিরী গ্রহণ করলাম, তাহা বলিবার পূর্বে আপনাকে বলিতে হইতেছে যে, আমি একজন রাজপুত্র। আমার পিতা ও তাঁহার সহোদর উভয়েই সন্নিকটবর্তী দুইটি রাজ্যের রাজা ছিলেন। আমার পিতার সহোদরের দুই সন্তান;—একটি পুত্র ও একটি কন্যা। পুত্রটি আমার সমবয়স্ক।

আমার বয়স হইলেও লেখাপড়া শিখিলে, আমার পিতা আমাদের ইচ্ছামত সকল কাক করিতে দিতেন। আমি প্রতিবৎসর যথানিয়মে আমার কাকার রাজ্যে গমন করিতাম এবং কিছুদিন তাঁহার প্রাসাদে বাস করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতাম। পিতৃব্যগৃহে পুনঃপুনঃ এই ভাবে যাতায়াত করার আমার পিতৃব্য পুত্রের সহিত অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইল। শেখবার আমি যখন কাকার বাড়ীতে যাই, তখন আমার পিতৃব্যপুত্র আমার

স্বর্জন্যর জন্ত মহা ধুমধামে ভোজের আয়োজন করিলেন। আহারাদির পর আমরা বসিয়া গল্প করিতেছি, এমন সময় আমরা সেই ভ্রাতা আমাকে বলিলেন, “ভাই, গতবার তোমার এখান হইতে বাণ্ডার পর আমার মনে যে অদ্ভুত খেয়ালের উদয় হইয়াছে, তাহার কথা তুমি কিছুই জান না। আমি একটি বাড়ী নির্মাণ করাইতেছি। আমেক লোক বাটতেছে, সম্ভ্রুতি তাহা শেষ হইয়াছে, শীঘ্রই আমরা উত্তরে সেই বাড়ীতেই বাস করিব। আমি তোমাকে সেই বাড়ী দেখাইতে লইয়া যাইব, কিন্তু তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি বাহা জানিতে পারিবে, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।”

আমার ভ্রাতার সহিত আমার স্নেহপ্রণয় ও ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল, তাহাতে এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে আমি কলকালের জন্তও বিধা বোধ করিলাম না। আমার প্রতিজ্ঞা শুনিয়া তিনি উঠিলেন—বলিলেন, “তুমি এখানে কলকাল অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি।”—অল্পকালের মধ্যেই আমার ভ্রাতা একটি পরমা সুন্দরী যুবতীর হাত ধরিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। যুবতী যেমন সুন্দরী, তেমনই সুসজ্জিত।

আমার ভ্রাতা, যুবতীর কোন

পরিচয় দিলেন না, আমিও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। আমরা একত্র বসিয়া পরস্পর আলাপ করিতে লাগিলাম, যতপানও চলিতে লাগিল। রাজপুত্র আমাকে বলিলেন, “আর সময় নাই, তুমি এই যুবতীকে লইয়া এখান হইতে বাহির হইয়া যাও, সোজা চলিয়া গিয়া কিছু দূরে একটি সমাধিক্ষেত্র দেখিতে পাইবে, সেখানে একটি নূতন মন্দিরও দেখিবে। মন্দিরের দ্বার খোলা আছে, তোমরা দু'জনে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।”

বস্তুর প্রতি আমার যথেষ্ট বিবাস ছিল, আর কিছু জানিবার আবশ্যক হইল না। তখন রাত্রি হইয়াছিল, চন্দ্রালোকে চতুর্দিক হাল্ধমর, আমি যুবতীকে লইয়া যথানিদিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। অল্পকাল পরেই রাজপুত্র আমাদের সমীপস্থ হইলেন; তাহার হস্তে একটি জলপূর্ণ পাত্র, একখানি কোদালি এবং একটি থলিয়া পূর্ণ চূর্ণ-সুরকী। রাজপুত্র সেই কোদালির সাহায্যে সমাধির মধ্যস্থল খনন করিয়া, প্রস্তরগুলি এক পাশে সরাইয়া



গুপ্ত-যন্ত্রিণে
প্রমোদিনী
চালান

সংস্কৃত-সাহিত্য

প্রকাশিত



রাখিলেন। খনন করিতে করিতে একটি গুহার দ্বার প্রকাশ হইয়া পড়িল। সেই দ্বারটি টানিয়া তুলিতেই কতকগুলি মিড়ি দৃষ্টপথে পড়িল। রাজপুত্র যুবতীকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, “হুম্বরি, আমি তোমাকে যে স্থানের কথা বলিযাছি, এই পথ দিয়া দেখানে বাইতে হইবে।”—যুবতী তখন বিনা বাক্য-বাহে সেই মিড়ি দিয়া নামিতে লাগিলেন। রাজপুত্র আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ভাই, আজ তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ, তোমাকে যে কষ্ট পাইতে হইয়াছে, সেজ্ঞ আমি তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি, এখন বিদায়।” এই বলিয়া রাজপুত্র সেই যুবতীর অহুসরণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “ভাই, তোমার এক্ষণ ব্যবহারের অর্থ কি?” রাজপুত্র উত্তর দিলেন, “কিছুই নহে, তুমি যে পথে আসিয়াছ, সেই পথে ফিরিয়া যাও।”

সমাধি-মন্দিরে
নিলাম-প্রাসাদ



আমি তাঁহার মুখে আর কোন কথা শুনিতে পাইলাম না। আমার কাঁপার প্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া কিছু অহুস বোধ করিলাম; কারণ, মদটা অধিক খাওয়া হইয়াছিল। বাহা হউক, আমি আমার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া শয্যার শুইয়া পড়িলাম। পরদিন সকালবেলা নিদ্রাভঙ্গে আমার বোধ হইল, রাত্রির ঘটনা সমস্তই স্বপ্ন! আমি রাজপুত্রের সন্ধান লোক পাঠাইয়া জানিলাম, তিনি রাত্রিকালে ফিরিয়া আসেন নাই, তাঁহার কি হইল, তাহার সন্ধান না পাইয়া সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিল। তখন বুকিলাম, রাত্রির ঘটনা সমস্তই সত্য, আমার উদ্বেগের সীমা রহিল না; আমি গোপনে সমাধি-ভূমিতে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, স্থানটি বহুসংখ্যক সমাধি-মন্দিরে সমাচ্ছন্ন। গোপনে বিস্তর অহুসন্ধান করিলাম, কিন্তু বন্ধ কোন মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলাম না। এই ভাবে চারি দিন নানারূপে যথাসাধক অহুসন্ধান করিলাম।

এ স্থানে বলা আবশ্যক। আমার পিতৃবা সে দেশের রাজা, “এ সময় তিনি রাজধানীতে ছিলেন না, কিছুদিন পূর্বে যুগ্মদ্বার গিয়াছিলেন। আমি তাঁহার প্রভাণ্ডগমন পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষা করিতে না পারিয়া, পিতার রাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু আসিবার সময়ও পিতৃবাবুর অমাত্যগণকে রাজপুত্র দ্বন্দ্বের আমি যেটুকু কথা জানিতাম, তাহা বলিতে পারিলাম না; কারণ, এক কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না, বলিয়া বন্ধুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম।

রাজ্যে ফিরিয়া দেখিলাম, আমার পিতার শৈলগণ ও অমাত্যবর্গ উজীরকে আমার পিতৃ সিংহাসনে বসাইয়াছে। শুনিলাম, আমার পিতার মৃত্যু হওয়ারভেই তাহার এক্ষণ করিয়াছে। উজীরের বলীকৃত শৈলগণ সহস্র আমাকে ধৃত করিয়া, তাহাদের নৃতন রাজার নিকট লইয়া চলিল, আমার ক্ষোভ ও বিশ্বাসের সীমা রহিল না।

উজীর-বিরোধ



বিদ্রোহী উজীর বহুদিন হইতে আমাকে ঘৃণা করিত, কারণ, বাণ্যকালে একদিন আমি প্রাসাদের ছাদে উঠিয়া ধনুর্কাণ লইয়া পক্ষী শিকার করিতেছিলাম, হঠাৎ একটা তীর তাহার চক্ষুতে বিদ্ধ হয়, সে তখন তাহাব গৃহছাদে উঠিয়া বায়ুসেবন করিতেছিল। আমি এই দৃষ্টান্তের কথা শুনিবামাত্র তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু সে দৃষ্ট হইল না, প্রয়োগ পাইলেই আমার এই অসাবধানতার প্রতিফল প্রদান করিবে বলিয়া আমাকে ভয় প্রদর্শন করিল।—এতদিনে তাহার সেই হুম্যোগ উপস্থিত, আমাকে দেখিবামাত্র উজীর সক্রোধে আমার নিকট ছুটিয়া আসিল এবং আমার দক্ষিণ চক্ষুতে অশ্রুণী প্রবিষ্ট করিয়া আমার চক্ষুটি উৎপাটন করিয়া লইল। সেই দিন হইতে আমি একচক্ষুহীন হইলাম।

সেই দ্রব্যাক্ষা উজীরের কোষে কিছু ইহাতেও প্রশমিত হইল না, সে আদেশ করিল, আমাকে লোহ-পিজরে

আবদ্ধ করিয়া অরণ্যের মধ্যে লইয়া গিয়া বধ করিতে হইবে। তদনুযায়ী বাতক আমাকে পিঙ্গরাবদ্ধ করিয়া নগরবাহিরে লইয়া গেল এবং তাহার নৃত্যন নাকার আদেশ অনুযায়ী আমাকে বধ করিতে উদ্যত হইল। আমি বিস্তর অশ্রু-বিনয় করিয়া বাতকের অঙ্গগ্রহ প্রার্থনা করার তাহার ক্ষমতা দয়ার সঞ্চার হইল, সে আমাকে মুক্তিদান করিয়া বলিল, “এই মুহূর্তেই এ দেশ পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যান, আমি আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছি, এ কথা জানিতে পারিলে রাজা আমারও প্রাণবধের আদেশ প্রদান করিবেন।” আমি তদুত্তরে পিত্তরাজ্য পরিত্যাগ করিলাম এবং ধরা পড়িবার ভয়ে দিবসে গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিরা, রাত্রিতে বতদূর পারি চলিয়া, অবশেষে আমার কাকার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

পিত্তবীর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি আমার দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু দেখিলাম, এতদিন পর্যন্ত পুস্ত্রের কোন সন্ধান না পাইয়া, তাঁহার মানসিক অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হইয়াছে, পুস্ত্রের আশার জলাঞ্জলি দিয়া, তিনি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কাতরতার ব্যথিত হইয়া, তাঁহার পুস্ত্র সম্বন্ধে আমি যে গোপনীয় কথা জানিতাম, তাহা প্রকাশ করিলাম—এইরূপে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিলাম।

আমার পিতৃত্ব আমার মুখে সকল কথা অবগত হইয়া বসিলেন, “বৎস, তোমার কথায় আমার নিরাশ হৃদয়ে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। আমার পুস্ত্র যে একজন একান্ত সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিয়াছে, তাহা জানিতাম, এমন কি, তাহা কোথায় নির্মিত হইয়াছে, তাহাও জানি, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য জানিতাম না। বাহা ইউক, সে যখন এ কথা তোমাকে গোপনে রাখিতে বলিয়াছে, তখন ইহা অল্প ব্যক্তির নিকট প্রকাশ না করিয়া, তুমি বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্যই করিয়াছ, এমো আমরা উভয়ে সঙ্গোপনে এই রহস্যভেদের চেষ্টা করি।”

আমরা ছয়বেশে প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইলাম এবং বহু অঙ্গসন্ধানের পর সোভাগ্যক্রমে সেই সমাধিমন্দির চিনিয়া বাহির করিলাম। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ভূতলগর্ভস্থ সিঁড়ির ধারের দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—চূণ, স্তবকী ধারা উত্তমরূপে আবদ্ধ করা হইয়াছে। বহু কষ্টে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া আমরা ভূগর্ভে প্রবেশ করিলাম। প্রথমে আমার পিতৃত্ব চণ্ডিতে লাগিলেন, আমি তাঁহার অঙ্গগমন করিলাম। প্রায় পঞ্চাশটি সোপান অতিক্রম করিয়া, আমরা ভূগর্ভস্থ একটি কুঠরীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, অন্ধকারময় কক্ষটি গাঢ় ধূমে পরিপূর্ণ। সেই ধূম আমাদের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিবামাত্র আমরা দের বোর ঘষণা উপস্থিত হইল। এই ধূম একজন গাঢ় যে, তাহা অলোকের গতি সম্পূর্ণরূপে রোধ করিয়াছিল।

এই কক্ষ হইতে আমরা আর একটি বৃহৎ কক্ষে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, চতুর্দিকে প্রকাণ্ড স্তম্ভ-শ্রেণী শোভা পাইতেছে, গৃহটি সুসজ্জিত, উজ্জ্বল আলোকমালায় পরিপূর্ণ। সে গৃহের মধ্যস্থলে বহুবিধ খাত্তরবা সুসজ্জিত, কিন্তু কোথাও কেহ নাই। কিছু দূরে দেখিলাম, একটি মূল্যবান পর্দাকে অতি সুন্দর শয্যা, তাহার উপর অতি সুন্দর কাককার্যাবিশিষ্ট সশ্যরি বিলম্বিত। আমার পিতৃত্ব সেই শয্যা দেখিয়া ক্রতবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং মশারি টানিয়া তুলিলেন। তখন দেখা গেল, তাঁহার পুস্ত্র ও সেই যুবতী পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া সেই শয্যায় শায়িত আছেন; কিন্তু তাঁহাদের দেহ অম্লিতে দগ্ধ হইয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে, যেন তাঁহারা অম্লিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভস্মীভূত হইবার পূর্বেই তাঁহা-দিগকে কেহ টানিয়া বাহির করিয়াছে। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, এই ভয়ানক দৃশ্য দেখিয়াও আমার পিতৃত্ব কিছুমাত্র বিষম বা বিষাদ প্রকাশ করিলেন না, একবারও তাঁহার মুখে হাহাকার শব্দ শুনিলাম না,

সমাধি-মন্দির
রহস্ত উন্মোচন



প্রেমিক-প্রেমি-
কার অস্তিত্ব
আলিঙ্গন



তিনি মহাজ্ঞেয়ে তাঁহার মৃতপুত্রের মুখে নিম্নবন ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “পৃথিবীর শান্তিই এইরূপ, পর-
লোকেও অনন্তকাল শান্তি পাইতে হইবে।”—তাঁহার পর তিনি পায়ের জুতা খুলিয়া তদ্বারা তাঁহার মৃতপুত্রের
পাশ্রে সবেগে আবৃত করিলেন।



ভগিনীর
গুপ্তপ্রবেশে
আত্মদান

আমার পিতৃবাকে তাঁহার মৃতপুত্রের প্রতি এইরূপ ব্যবহার করিতে দেখিয়া, আমার মনে ক্রোধ ও
কোভের সঞ্চার হইল; কিন্তু আমি মনোভাব দমন করিয়া, তাঁহাকে এই অভূতপূৰ্ণ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা
করিলাম। রাজা বলিলেন, “বৎস! আমার পুত্র আমার নাম কলঙ্কিত করিয়াছে, সে তাঁহার সহোদরা
ভগিনীর গুপ্তপ্রণয়ের মুখ হইয়াছিল, এজন্য আমি তাহাকে যথোপযুক্ত তিরস্কার করিতে ক্রটি করি নাই, তাহাকে
অনেক গড়পদেশও দান করিয়াছি এবং অবশেষে তাঁহার ভগিনীকে সকল কথা বুঝাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
করিতেও নিবেদন করিয়াছিলাম, কিন্তু পাপিষ্ঠা সুধাক্রমে যে বিধপানে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে নিবৃত্ত
হইল না। তাঁহার উদ্ভয়েই আমার হিতোপদেশ অগ্রাহ করিল। অবশেষে তাঁহার আমার সতর্কদৃষ্টিকে
প্রত্যাহত করিয়া, তাঁহাদের পাপলাদসা চরিতার্থ করিবার জন্ত এই গুপ্ত পাতালগৃহ নির্মাণ করিল এবং
আমার রাজধানী অশ্রুপস্থিতির সুযোগে তাঁহার সহোদরকে এখানে লইয়া আসিল। এখানে তাঁহার তাঁহাদের
বিলাসলাদসা চরিতার্থ করিবার সকল উপকরণই সংগ্রহ করিয়াছিল; কিন্তু বিধাতা এত পাপ সহ্য করিলেন না,
তাঁহাদিগকে যে ভীষণ দণ্ড দান করিলেন, তাহা দেখিতেই পাইতেছি।”—এতক্ষণে রাজা কাতরভাবে রোদন
করিতে লাগিলেন, আমিও অশ্রুরোধ করিতে পারিলাম না।

অনন্তর রাজা কিঞ্চিৎ শান্ত হইলে আমাকে সোধেন পূৰ্বক বলিলেন, “বৎস! আমার অযোগ্য পুত্র
নিজ কর্মফলে নিহত হইয়াছে, তুমি আমার উপযুক্ত ভাতৃপুত্র, আজ হইতে তুমি আমার পুত্রস্বামীর
হইলে।”—তিনি সম্মুখে পরম আদর সহকারে আমাকে আলিঙ্গন করিলেন।

অনন্তর আমরা সেই ভূগত গৃহ হইতে উঠিয়া তাঁহার সিঁড়ির পথ উদ্ভবরূপে রুদ্ধ করিয়া
দিলাম এবং অন্তরে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে পিতৃবাতু প্রাণাদে প্রত্যাগমন করিলাম।

প্রাসাদে আসিয়া আমরা বহুসৈন্যের কোলাহল ও গণবাস্তবধনি শুনিতে পাইলাম; বুঝিলাম, শত্রুদল আমার
পিতৃব্যের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছে। এ আর কেহই নহে, আমার পিতার সেই বিধাসম্বাতক
উজ্জীর। আমার পিতৃরাজ্য অধিকার করিয়া, অবশেষে সন্মুখে আমার পিতৃব্যের রাজ্য গ্রাস করিতে আসি-
য়াছে। আমার পিতৃব্য যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না, তাঁহার সৈন্যগণও অসতর্কতাবস্থায় ছিল, সুতরাং
শত্রুসৈন্য সহজেই রাজ্য হস্তগত করিল! আমার পিতৃব্য আশ্চর্যকর জন্ত চেষ্টা করিয়া, অবশেষে শত্রুসৈন্যে
নিহত হইলেন, আমি বহুক্ষেপে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলাম। শত্রুহস্ত হইতে আশ্চর্যকর করিবার অভি-
প্রায়ে এই ফকিরের বেশে আমি রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছি; অনেক দিন পথান্ত আমার ভর দূর হয়
নাই। অনেক দেশ ঘুরিয়া অবশেষে আমি মহাপ্রতাপশালী রাজরাজ্যের খালিক হারুণ-অল-রসিদের রাজ্যে
উপস্থিত হইয়াছি এবং এত দিনে আমার প্রাণের ভর দূর হইয়াছে। আমি স্থির করিয়াছি, এখন আমি
খালিকের চরণে শরণ লইব। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার এই জীবনের বিচিত্র ইতিহাস শ্রবণ
করিলে তাঁহার দলয়ে দয়ার সঞ্চার হইবে, এবং তাঁহার সাহায্য হইতে আমি বক্ষিত হইব না।

আজ সন্ধ্যাকালে আমি এই নগরে পদার্পণ করিয়াছি। পথশ্রমে অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলাম, এক স্থানে
বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় দ্বিতীয় ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন,
“ভাই, বোধ হয়, তুমিও আমার মত বিদেশী, আমার অহমান সত্য কি না বল?”—আমি বলিলাম, “আপনি



বিজোতা
উজ্জীরের
রাজ্য অধিকার

বখাৰ্থই অহুমান কৰিগাছেন।" ঠিক সেই মুহূৰ্ত্তে তৃতীয় ককিৰাট আমাদেৱে নিকটস্থ হইলেন, তাঁহাৰ পৰিচয় জানিলাম, তিনিও আমাদেৱে জ্ঞান বৰাগত পথিক, সেই সন্ধ্যাকালেই বোগদাদে উপস্থিত হইগাছেন। আমাৰা ডিনজনে পৰস্পৰে বন্ধুতা-হুৱে আবদ্ধ হইলাম, প্ৰতিজ্ঞা কৰিলাম, বিপদে বা সম্পদে কেহ কাহাৰও সঙ্গ পৰিত্যাগ কৰিব না।

বোগদাদেৰ ৰাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে আপনাদেৱে গৃহঘাৰে উপস্থিত হইয়া আনন্দ-কোলাহল শুনিতে পাইলাম। ধীৰে ধীৰে দৰজাৰ আঘাত কৰিলাম, তাহাৰ পৰ ঘাঘা খটিয়াছে, তাহা আমাদেৱে জ্ঞাত আছেন, ইহাই আমাৰ ইতিহাস।

প্ৰথম ককিৰেৰ কথা শুনিয়া, জোবেদী বলিলেন, "তোমাৰ ইতিহাস শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, তুমি এখন বেথানে ইজ্ঞা প্ৰস্থান কৰিতে পাৰ।"—প্ৰথম ককিৰ বলিলেন, "অবশিষ্ট ককিৰদেৱেৰ ও অস্ত ভদ্ৰলোক কৰেকটি ইতিহাস শুনিবাৰ জন্ত তিনি সেখানে আৰও কিছু কাল অপেক্ষা কৰিবাৰ অহুমতি চাহেন, বিশেষতঃ তিনি তাঁহাৰ বন্ধুদেৱেৰ ত্যাগ কৰিতে অসমৰ্থ।" জোবেদী এই প্ৰস্তাবে সন্মত হইয়া, দ্বিতীয় ককিৰকে তাঁহাৰ জীবনেৰে কাহিনী বলিবাৰ আদেশ দিলেন।



দ্বিতীয় কাণা ককিৰ বলিতে আৰম্ভ কৰিলেন;—“ঠাকুৰাণি, আমি বিৰূপে এক চকু হাৱাইলাম এৰ এতদিন কি ভাবে আমাৰ জীবন অতিবাহিত হইগাছে, তাহা জানিবাৰ জন্ত আপনাৰা উৎসুক হইগাছেন, আমি তাক বলিতেছি, শ্ৰবণ কৰুন।”

আমাৰ প্ৰিতাও ৰাজা ছিলেন। বালাকাল হইতেই আমি কিছু অধিক নিৰ্কোষ। আমাৰ বুদ্ধিবৃত্তিৰ উন্নতিৰ জন্ত আমাৰ পিতা সাধ্যাহুসাৰে চেষ্টা কৰিগাছিলেন, আমাৰ শিক্ষাদানেৰ জন্ত চতুৰ্দ্দিক হইতে বড় বড় মৌলবী সংগ্ৰহ কৰা হইগাছিল। অল্প দিনেৰ মধ্যে সমস্ত কোৱাণখানি আমি কৰ্ত্তব্য কৰিয়া কেলিলাম; কোৱাণ সমাপ্ত কৰিয়া আমি ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য পাঠে মনোনিবেশ কৰিলাম, তাহাৰ পৰ ভূবিজ্ঞানি বিভিন্ন বিজ্ঞা আৰম্ভ কৰিলাম। চতুৰ্দ্দিকে আমাৰ শিক্ষাৰ খ্যাতি বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

আমাৰ বিজ্ঞাৰ খ্যাতি বহুদূৰবন্তী ভাৱতবৰ্ষেৰ বাদশাহেৰে কৰ্ণগোচৰ হইল। তিনি আমাৰ সহিত সাক্ষাতে সমুংস্ক হইয়া বহু ধনতত্ত্ব ও বহুমূল্য উপহাৰাদি সহ আমাৰ পিতাৰ ৰাজধানীতে দূত প্ৰেৰণ কৰিলেন। হিন্দুস্থানেৰ বাদশাহেৰে সন্মদয়তাৰ পৰিচয় জানিবা আমাৰ পিতা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন, এৰে মহাসমাবেৰে আমাকে হিন্দুস্থানে প্ৰেৰণ কৰিলেন। আমি হিন্দুস্থানেৰে দুতৰ সহিত ভাৱতবৰ্ষে শুভযাত্ৰা কৰিলাম।

সুদীৰ্ঘ পথ,—এক মান ধৰিয়া চলিলাম। পথেৰ শেষ হইল না। সহসা একদিন আমাৰা পক্ষাণ জন অনুধাৱী অখাৰোহী দহা কৰ্ত্তব্য কৰ্ত্তব্য আক্ৰান্ত হইলাম। আমাদেৱে অহুচৰেৰে সংখ্যা অধিক ছিল না, তাৰাপি দহাগণেৰে সহিত প্ৰাণপণে যুদ্ধ কৰিলাম, কিন্তু তাহাদিগকে পৰাস্ত কৰিতে পাৰিলাম না, আমাৰাই পৰাস্ত হইলাম এৰে পৰিত্ৰাণেৰে কোন উপায় না দেখিয়া, একট অৰ্থে আৱোহপ কৰিয়া, আহতদেহ লইয়া পলায়ন কৰিলাম। অৰ্থট আমাৰ জ্ঞান আহত হইগাছিল, কিয়ংদূৰ গিয়াই সে প্ৰাণত্যাগ কৰিল। আমি আহত ও পৰিত্ৰাস্ত দেহ লইয়া সম্পূৰ্ণ অপৰিচিত স্থানে অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইলাম, দহাদেৱেৰে হস্তে পড়িবাৰ ভয়ে প্ৰশস্তপথ ছাড়িয়া আমি গুপ্তপথে চলিতে আৰম্ভ কৰিলাম। বহু কষ্টে সমস্ত দিন চলিয়া

দ্বিতীয়
কাণা
ককিৰ
কাহিনী



হিন্দুস্থান-
বাদশাহেৰে
বিজ্ঞাৰ সমাধাৰ



দহাহুস্তে
নিৰ্ধ্যাতন



সন্ধ্যার সময় আমি এক পর্বতের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম এবং একটি গুহার অন্বেষণ করিয়া, সামান্য ফলমূল খাইয়া সেই গিরিগুহার শয়ন করিলাম। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া আবার চলিতে লাগিলাম, ধীরে ধীরে অতি কষ্টে এক মাস পথভ্রমণ করিয়া অবশেষে একটি সুন্দর নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম; কিন্তু তখন দেহের ও পরিচ্ছদের যে অবস্থা ইয়াছিল, তাহাতে কোন ভদ্রলোকের সম্বন্ধ হওয়া আমার পক্ষে লজ্জার বিষয় হইয়াছিল।

যাহা হউক, অবশেষে আমি এক দরজীর দোকানে উপস্থিত হইয়া তাহার শরণগ্রহণ করিলাম। দরজী দরপারবণ হইয়া আমাকে তাহার দোকানে স্থান দান করিল, আমি অকপটভাবে আমার সকল কথা তাহার নিকটে প্রকাশ করিলাম। দরজী বিশেষ মনোযোগের সহিত আমার সকল কথা শ্রবণ করিল, কিন্তু আমাকে সন্তুষ্ট করা দূরে থাকুক, সে আমাকে বলিল, “সাবধান, তুমি এখানে আর কাহারও নিকট এ ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিও না, তাহা হইলে ভয়ানক বিপদে পড়িবে। এই দেশের রাজা তোমার পিতার ভয়ানক শত্রু। এখানে তোমার আগমনের কথা প্রকাশ হইলে, তোমার প্রাণরক্ষা কঠিন হইবে।”—দরজীর কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস হইল, দোকানটী প্রকৃতই সজ্জন। আমি তাহার সুপারামর্শের জন্ত তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম এবং আমার বিপদকালে তাহাকেই একমাত্র বন্ধু বলিয়া মনে করিলাম। আমাকে ক্ষুধাতুর দেখিয়া দরজী আমাকে খাণ্ডস্বা ও পরিশ্রান্ত দেখিয়া শয্যা প্রদান করিল; আহা! তাহাতে আমি শয্যায় শয়ন করিলাম। দরজীর গৃহে কিছুকাল বাস করিয়া আমি সবল ও সুস্থ হইলাম। একদিন দরজী কথাপ্রসঙ্গে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “জীবিকা-নির্বাহের জন্ত কোন স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বনের উপযুক্ত শিক্ষা আমি লাভ করিয়াছি কি না?” আমি বলিলাম, “আমি আইন জানি, ব্যাকরণ জানি, কবিতাও অল্প-বিস্তর জানা আছে এবং হাতের লেখাটিও মন্দ নহে।”—এই কথা শুনিয়া দরজী হাসিয়া বলিল, “তোমার এ বিভ্রান্তি এ দেশে এক টুকরা রুটিও উপার্জন করিতে পারিবে না। তোমার যে বিদ্যা, এ রাজ্যে উহা নিভাতই অনর্থক। আমার উপদেশ শুন, তোমার শরীরে বল আছে, একটা কুঠার লইয়া জঙ্গলে যাও, কাঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় কর, যাহা কিছু উপার্জন হইবে, তাহাতেই স্বাধীনভাবে তোমার দিন চলিয়া যাইবে। যতদিন তোমার চন্দ্রিন না কাটে, তত দিন ঐ ভাবে চালাও। আমি তোমাকে একখানি কুঠার ও কাঠ বাধিবার একগাছি দড়ি দিব।”—আমি অগত্যা এই নীচকর্ম করিতেই স্বীকৃত হইলাম এবং এই উপায়ে কিছুদিনের মধ্যে যে অর্থসঞ্চয় করিলাম, তদ্বারা দরজীর ঋণ পরিশোধে সমর্থ হইলাম।

এই ভাবে আমার জীবনের এক বৎসর অতিবাহিত হইল। একদিন আমি কাঠ কাটিতে গিয়া একটা গাণের মূলদেশ কাটিতে কাটিতে মটীর নীচে একটা লৌহদ্বার দেখিতে পাইলাম; সেই দ্বার খুলিলে ভূগর্ভে কতকগুলি সিঁড়ি আমার দৃষ্টিপথে পড়িল। আমি কুঠার হস্তে লইয়া সেই সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেলাম—দেখিলাম, একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভিতর আসিয়া সেই সোপানপ্রণী প্রবেশ করিয়াছে, দেখিয়া বোধ হইল, তাহা একটা প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদটি উজ্জল আলোকমালার শোভিত। সেই প্রাসাদে একটা সুবর্ণ-নির্মিত সুসজ্জিত পর্দাকে একটী অসাধারণ-রূপবতী যুবতী বসিয়া আছেন। যুবতীর অপূর্ণ মাধুর্য্য, পীবন-বক্ষঃস্থল এবং বিকশিত যৌবনের রূপের শোভা আমাকে মুগ্ধ করিল। তাঁহাকে দেখিবামাত্র আমি আর অজ্ঞানিকে চক্ষু কিরাইতে পারিলাম না। সম্মানে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতেই যুবতী আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে?—কোন



মানব না দৈত্য ?—আমি বলিলাম, “সুন্দরী, আমি মানুষ, দৈত্যের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।”—সুন্দরী আমার জিজ্ঞাসা করিলেন, “মানুষ হইয়া তুমি কিরূপে এখানে আসিলে ? আমি পাঁচ বৎসর এখানে বাস করিতেছি, কিন্তু এতকালের মধ্যে তোমাকে ভিন্ন আর কোন মানুষকে এখানে আসিতেও দেখি নাই।”

বলিলাম, আমার হঠাৎ আবির্ভাবে সুন্দরীর মনে ভয়ের সন্ধার হইয়াছে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে আমি যুগ্ম হইয়াছিলাম, তাঁহার বীণানিনিত কণ্ঠস্বর আমার কর্ণে সুধাবর্ণন করিতেছিল, তাঁহাকে একাকী সেই নির্জন প্রাসাদে কিঞ্চিৎ ভীত ও বিচলিত দেখিয়া, আমার জীবনের আত্মশূন্য ইতিহাস তাঁহাকে বলিলাম। আমার কথা শুনিয়া যুবতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, “রাজপুত্র, আমি এই ঐশ্বর্য্যপূর্ণ সুসজ্জিত কারাগারে বন্দিনী। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি আমাদেরিকে কেহ স্বর্ণেও লইয়া যায়, তাহাও আমাদের প্রীতিকর হইবে না। আমি ইবনি বীণের রাজকন্যা। আমার পিতা আমার একটি জ্ঞাতি ভ্রাতার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, বিবাহ রাত্রে আমার পিতার সজ্জিত রাজপ্রাসাদে যখন উৎসব চলিতেছিল, সেই সময়,—বিবাহের ঠিক পূর্ব্বমুহূর্ত্তে একটি ভয়ঙ্কর দৈত্য আমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। দৈত্যের করতলগত হইয়া আমি মুচ্ছিত হইয়া পড়ি; মুচ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমি এই স্থানে আনীত হইয়াছি। অনেক দিন পর্য্যন্ত আমি অত্যন্ত অশান্ত ও কাতর ছিলাম, সেই দৈত্য অনেক সময়ই আমার নিকটে আসে বলিয়া তাহার ভয়ঙ্কর আকার দেখিতে আমি অত্যন্ত হইয়াছি। এখানে আমার কোন অভাব নাই, কেবল একটি অভাব আছে, তাহা মনের স্থখ।

“সেই দৈত্য দশদিন অন্তর এক এক রাত্রি এখানে আসিয়া প্রমোদনশি যাপন করিয়া যায়,—এই দশ দিনের মধ্যে আর তাহার সাক্ষাৎলাভ হয় না, কিন্তু যদি তাহার সহিত সাক্ষাতের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে আমার শরনকঙ্কর প্রবেশদ্বারে যে মন্মথ প্রস্তরখণ্ড আছে, তাহা স্পর্শ করিলেই সে এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। দৈত্য এখান হইতে চারিদিন হইল গিয়াছে, সুতরাং আর ছয়দিন পরে সে আমার ফিরিয়া আসিবে; সুতরাং তোমার ইচ্ছা হইলে এখন পাঁচ দিন এখানে বাস করিতে পার, যথাসম্ভব তোমার আতিথ্যসংস্কারে আমি কৃষ্টিত হইব না।”

তুবনমোহিনী সুন্দরী রাজকন্যার মুখে এই কথা শুনিয়া, আমি মনে মনে যৎপরোনাস্তি উল্লসিত হইলাম, এবং এই প্রলোভন পরিচাণ করিতে পারিলাম না। কিছুকাল প্রেমালোচনের পর আমি রূপসী-রাণীর সঙ্গে একটি সুন্দর সজ্জিত রানগৃহে প্রবেশ করিলাম। পরস্পরের সাহচর্য্যে অতি তৃপ্তির সহিত রান-বীলা সমাধা করা গেল, যুবতীর কুসুম-স্নানকোমল স্পর্শে—নিরন্তর শীতল জলে আমার পরিশ্রান্ত দেহ-মনের সকল ক্লান্তি দূর হইল। রানান্তে রানগৃহের বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, আমার কাঠুরিয়ার বস্ত্রের পরিবর্ত্তে একটি উৎকৃষ্ট রাজপরিচ্ছদ সংরক্ষিত আছে। আমি সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিলাম, আমার দেহের শোভা শতগুণে বর্দ্ধিত হইল।

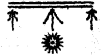
অনন্তর ভোজনকক্ষে উপস্থিত হইয়া আমি একখান অতি সুকোমল গালিচায় উপবেশন করিলে সুন্দরী স্বর্ণপাত্রের বহুবর্ণ মুমিট খাদ্য ও উৎকৃষ্ট সুরা প্রদান করিলেন। আমার যথেষ্ট ক্ষুধা হইয়াছিল, উত্তরে একত্রে বসিয়া মহানন্দে পান-ভোজন করিলাম। সমগ্র রজনী উভয়ে এক শয্যা বিনিময়-রজনী যেন সুখ-স্বপ্নে অভিযাহিত করিলাম। যুবতী সমস্ত দেহ-মন দিয়া আমার কৃতিবোধন করিতে লাগিলেন। অনাবদিতপূর্ব্ব সুখভোগে আমার দেহ-মন পরিতৃপ্ত হইল।

পরদিনও এই ভাবে কাটিল, সে দিন সুন্দরী আরও অধিক উৎকৃষ্ট সুরা আনিয়া দিল, তেমন মুমিট সুরা মদ জীবনে আর কখনও পান করি নাই। সে দিন আমি অধিক মদ পান করিয়া ফেলিলাম,

দৈত্য-বন্দিনী
রাজনন্দিনী



বঙ্গ-সুন্দরীর
রান-বীলা



স্বপ্নের নন্দনে
বজ্রাঘাত



আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল, আমি উদ্ভ্রান্তপ্রায় হইয়া সেই স্বপ্ন-স্বন্দরীকে বলিলাম, “শ্রিতমে, অনেক বৎসর ধরিয়া তুমি এই ভূ-গর্ভস্থ গৃহে আবদ্ধ আছ, আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে মানবের শ্রিয়নিবাস আলোকপূর্ণ অবিভীর্ণ পৃথিবীর উপর লইয়া যাই—পরম্পরের মিলন-মাধুর্য্যে সুখস্বপ্ন সফল—জীবন ধন্য করি।”—স্ববতী সহাস্তে বলিলেন, “রাজপুত্র, এক্ষণ কথা আর মুখে আনিও না। যদি তুমি এখানে আমার সহিত নয় দিন নিভা নব প্রেমরসে অভিবাহিত কর ও দৈত্য আসিবার দিন লুকাইয়া থাক, তাহা হইলে এখানেই পরমসুখে আমাদের দিনগুলি কাটিয়া যাইবে, আমি পৃথিবীর অস্ত্র মুখ ও ঐশ্বর্য্যের কামনা করি না।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “রাজকন্যা, দৈত্যের ভয়েই যে তুমি এ কথা বলিতেছ, তাহা আমি বুঝিতে পারিরাছি, তুমি দৈত্যকে ভয় করিতে পার, কিন্তু আমি তাহাকে গ্রাহ্যও করি না, এমন কি, তাহার ঐ মূঢ়পূত প্রস্তরখণ্ডখানি এক দণ্ডে আমি শতখণ্ডে চূর্ণ করিতে পারি। ইহাতে যদি সেই দৈত্য এখানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আমার এই সবল হস্তের এক মুষ্টিাঘাতে তাহার প্রাণবধ করিব। পৃথিবী হইতে দৈত্যকুল ধ্বংস করিবার জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই দৈত্যটাকে দিরাই সেই ধ্বংস-কার্য্যের আরম্ভ করিব।”—রাজকন্যা জানিতেন, সেই প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ করিলে তাহার কি কল হইবে, সুতরাং তিনি আমাকে তাহা স্পর্শ করিতে নিষেধ করিলেন;—বলিলেন, “যদি তুমি এক্ষণ কর, তাহা হইলে আমাদের উভয়েরই প্রাণ যাইবে, দৈত্যের পরিচয় আমি তোমা অপেক্ষা ভাল জানি।” মন্তের প্রভাবে আমার বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছিল, স্ববতীর কথা কণকণাতা করিয়া, সেই প্রস্তরখণ্ডে সজোরে আঘাত করিলাম, দেখিতে দেখিতে তাহা খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

সেই প্রস্তরখানি চূর্ণ হইবামাত্র সমস্ত প্রাসাদ ভূমিকম্পের ছায় কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর মেঘ-গর্জনের ছায় শব্দ উদ্ভিত হইল, প্রাসাদের কৃত্রিম আলোক-রাশি নির্দোষিত হইয়া গেল এবং সেই অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে দিগন্তব্যাপী বিদ্যুৎ-ফুলিঙ্গ মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হইতে লাগিল, আমার মনের নেশা একেবারে ছুটিয়া গেল, আমি সভয়ে রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “রাজকন্যা, এ কি বাপার?” রাজকন্যা নিজের বিপদের কথা ভুলিয়া, আমার কি হইবে সেই চিন্তার কাতর হইলেন; সভয়ে বলিলেন, “রাজপুত্র, তোমার জীবনের আর কোন আশা নাই; এখনও যদি বাঁচিবার সাধ থাকে, প্রাণ লইয়া পলায়ন কর।”

আর সময় নাই। আমি আমার কুঠার ও দড়ি ফেলিয়াই পলায়ন করিলাম, কিন্তু সোপানে উঠিতে হইল না। দেখিলাম, এক অতি ভীষণাকার দৈত্য সেই সোপানপথে অবতরণ করিতেছে। সে আসিয়া রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, “অসময়ে কেন তুমি আমাকে শরণ করিয়াছ?”—রাজকন্যা বলিলেন, “হঠাৎ আমার অতুহ হওয়ার আমি ঐশ্বর্য্য খাইতে গিয়া পা পিছলাইয়া ঐ পাথরের উপর পড়িয়া গিয়াছিলাম; তাহাতেই উহা ভঙ্গিয়া গিয়াছে।”—দৈত্য সে কথা বিশ্বাস না করিয়া মহাক্রোধে বলিল, “পাপীয়াসি, তোর এই মিথ্যা হলনার আমি ভুলিব না; এই কুঠার ও দড়ি কোথা হইতে আসিল?”—রাজকন্যা সবিস্ময়ে বলিলেন, “তাহা আমি কি করিয়া বলিব? কড়ের বেগে আসিয়াছে। সেই সময় হয় ত তোমারই আগমনের ঝড়ে উহা উড়িয়া আসিয়াছে।”

প্রেমঘরী
নির্দোষন



বলা বাহুল্য, দৈত্যকে দেখিয়া আমি একটি গুপ্তস্থানে লুকাইয়াছিলাম; দৈত্য স্ববতীর কথা বিশ্বাস না করিয়া, নির্দয়ভাবে তাহারে কিল ও চড় মারিতে লাগিল; আমি গুপ্তস্থান হইতে প্রহারের শব্দ শুনিতে লাগিলাম; কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না, মনোমোহিনী স্বন্দরী এই বিপদে অত্যন্ত চণ্ডিত ও পরিতপ্ত হইয়া, আমি গুপ্তস্থানপথে সেই দৈত্যপূরী হইতে বাহির হইয়া আসিলাম।

আমাকে সুহৃদে গৃহে ফিরিতে দেখিয়া, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী দরজী বড় আনন্দিত হইল। সে তাবিয়াছিল, গুপ্তচরের মুখে আমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সে দেশের রাজা আমার প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। আমি দরজীকে ধন্যবাদ দিয়া, নিজের কক্ষে প্রবেশ করিলাম, তাহার কাছে কোন কথা ভাঙ্গিলাম না; কিন্তু আমার আক্ষেপের আর সীমা রহিল না, একটু বুদ্ধিমানের মত কাজ করিলেই রাজকন্ডার সহিত পরমুখে সেই প্রাসাদে বাস করিতে পারিতাম।

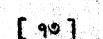
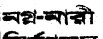
আমি আমার শয়নকক্ষে শুইয়া এসকল কথা ভাবিতেছি, এমন সময় দরজী আসিয়া বলিল, “একজন বৃদ্ধ তোমার কুঠার ও দড়ি লইয়া আসিয়াছে, সে ইহা পথে কুড়াইয়া পাইয়াছে, তোমার সঙ্গী কাঠুরিয়ার মুখে শুনিয়াছে যে, ইহা তোমার জিনিস। এস, তোমার জিনিস সে তোমার হাতে দিয়া যাইবে বলিতেছে।” দরজী কথা শুনিয়া আমার পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, আমার মুখ শুকাইল। দরজী তাহা লক্ষ্য করিয়া, আমার এই ভাবপরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছে, এমন সময় সেই বৃদ্ধ আমার বিলম্বে অসহিষ্ণু হইয়া, আমার কক্ষে প্রবেশ করিল এবং আমার কুঠার ও দড়ি আমাকে দিয়া বলিল, “আমি মৈতরাজ ইরলিসের দৌহিত্র, এই কুঠার ও দড়ি কি তোমার নয়?”—তাহার পর সে আমাকে কথা বলিবার অবসর না

দিয়াই ভয়ঙ্কর মুষ্টি ধারণ করিয়া, আমার কটিদেশ ধরিয়া আকাশমার্গে উঠিতে লাগিল, মহাবেগে কতদূর উঠিল, বলিতে পারি না; তাহার পর আবার সবেগে নামিতে আরম্ভ করিল। আমি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলাম, মুচ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমি দৈত্যের সেই প্রাসাদে ইবনিরীপের সেই স্বন্দরী রাজকন্ডার সমুখে নীত হইয়াছি। কিন্তু কি ভয়ানক দৃশ্য দেখিলাম, রাজকন্ডা উলঙ্গিনী, তাহার হস্তদ্বয় তন্তুর সহিত দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ—সরীসেপ রক্ত বহিতেছে—চক্ষু অশ্রুশ্রিতে ভাসিতেছে, সেহে প্রাণ আছে কি না সন্দেহ!

ঐশ্য সন্নিবেশে সেই বৃহত্তীক্ষ্ম জিজ্ঞাসা করিল, “ওরে পাপীয়সি, এই লোকটা তোরা উপপত্তি কি না, সত্য করিয়া বল!”—স্বন্দরী কাঁপন্বরে বলিলেন, “আমি উহাকে চিনি না, এই প্রথম দেখিতেছি।”



দৈত্য-কবলে





দৈত্য আবার গর্জন করিয়া বলিল, “দুশ্চারিণি ! এত শাস্তি পাইয়াছিস্, তথাপি মিথ্যা কথা ! আচ্ছা, যদি উহাকে না চিনিস্, তাহা হইলে আমার এই তরবারি লইয়া উহার মস্তকচ্ছেদন কর ।”—স্বপ্নী কাতরভাবে বলিলেন, “আমার হাত তুলিবার পর্য্যন্ত শক্তি নাই, আর যদি সে শক্তি থাকিত, তাহা হইলেও আমি এই অপরিত্রিত নির্দোষ লোকের প্রাণবধ করিতাম না ।” দৈত্য বলিল, “তোমার ঠোঁটমী বুঝিয়াছি, এই ব্যক্তিই তোমর উপপতি ।” তাহার পর অগ্নিনেত্রে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, “বল্, তুই ইহাকে চিনিস্ কি না ?” আমি চিনি না বলায়, সে আমার হস্তে তাহার খড়্গ দিয়া বলিল, “তবে এখনই তুই ইহার প্রাণবধ কর ।”—আমি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার অস্ত্র গ্রহণ করিলাম । তখন সে রাজকন্ডার প্রাণবধের জন্ত আমাকে ইঙ্গিত করিল ; কিন্তু আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, খড়্গ ফেলিয়া দিয়া দূতস্বরে বলিলাম, “আমি কখনই এই দোষহীন অপরিত্রিত অবলার প্রাণবধ করিব না । তোমার এই নিষ্ঠুর আদেশপালন করিবার শক্তি আমার নাই, আমি তোমার হাতে পড়িয়াছি, তোমার বাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে পার ।” দৈত্য তখন সেই খড়্গ দ্বারা হৃদয়ের একটী হস্ত ছিন্ন করিল, ছিন্নহস্ত দিয়া অজস্র রক্তধারা ঝরিতে লাগিল, স্বপ্নী কাতরদৃষ্টিতে আমার নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করিল ; দেখিতে দেখিতে তাহার প্রাণবিয়োগ হইল ।

আমি সেই হৃদয়-বিদায়ক দৃশ্য দেখিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলাম । মুহূর্ত্তভঙ্গে দেখিলাম, দৈত্য তখনও সেই একই ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে । আমি হতাশভাবে বলিলাম, “তোমার এই তরবারির এক আঘাতে আমার প্রাণহারা কর ।” দৈত্য বলিল, “আমি প্রধান অপরাধীর প্রাণদণ্ড করিয়াছি, তোমর প্রাণবধ করিলে তোমর সকল কষ্টের অবসান হইবে, সেই জন্ত তোমর প্রাণবধ করিব না ; তোকে কুকুর, গাধা, নিহং, কিবা কোন পক্ষীতে পরিণত করিয়া রাখিব, তুই কোন্ রূপ পাইতে চাস্ ?” আমি দৈত্যের ক্রোধ দূর করিবার জন্ত বলিলাম, “যদি তুমি আমার প্রাণবধ না কর, তাহাঁ হইলে আমার অপরাধ মার্জনা করিয়া যাও, তাহা হইলে এ উপকার আমি চিরকাল মনে রাখিব । অপকার করিলেও ভাললোক সেই অপকারীর উপকার করে, তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী গরু বলিতেছি, শুন ।”



কোন বৃহৎ নগরে দুইজন লোক বাস করিত, তাহারা পরস্পরের প্রতিবাসী ছিল । ইহাদের একজন অল্প প্রতিবেশীর বড় হিসসা করিত । হিস্মিত ব্যক্তি তাহার প্রতিবাসীর হিসসার ভয়ে সর্ব্বথ বিক্রয় করিয়া ঐ নগর ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন । এই লোকটি বড় ধার্মিক ছিল । রাজধানীতে আসিয়া তিনি দরবেশের ভাষা জীবন-বাগন আরম্ভ করিলেন । তাঁহার ধর্ম্মপরায়ণতার খ্যাতি অল্পদিনের মধ্যেই চতুর্দিকে প্রচারিত হইল, তাঁহার ধর্ম্মজীবনেরও অনেক উল্লেখ হইল ।

তাঁহার এই খ্যাতি ও উন্নতির কথা কিছুদিন পরে তাঁহার সেই পূর্ব্বপ্রতিবাসীর কর্ণগোচর হইল, তখন সে এই ধার্মিক ব্যক্তির সর্ব্বনাশ করিবার জন্ত গৃহত্যাগ করিয়া রাজধানীতে আসিল, এবং তাহার পূর্ব্বপ্রতিবাসীর নিকট আসিয়া তাঁহাকে বলিল, “তোমার সহিত গোপনে কোন কথা আছে, অল্প লোক না শুনিতে পায়, এরূপ স্থলে চল ।”—ধার্মিক ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া, সেই দুরাখ্যাকে সঙ্গে লইয়া একটী গোপনীয় স্থানে চলিলেন, চলিতে চলিতে নিকটে একটি কূপ পাইয়া দুরাচার, দরবেশকে এক ধাক্কা সহই কূপের মধ্যে ফেলিয়া অন্তরে অলক্ষ্যে পলায়ন করিল ।

সৌভাগ্যক্রমে সেই কুপের মধ্যে কতকগুলি পরী ও অপদেবতা বাস করিত। ধার্মিক ব্যক্তি পড়িতে পড়িতে তাহারা মধ্যপথে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল; তাঁহার দেহে বিশেষ আঘাত লাগিল না। ধার্মিক ব্যক্তি এত উচ্চ হইতে পড়িয়াও দেহে বিশেষ আঘাত না পাওয়ার বড় বিস্মিত হইলেন, কিন্তু তিনি পরক্ষণেই স্তমিলেন, একজন পরী আর একজনকে বলিতেছে—“যে লোকটিকে আমরা এইমাত্র বাঁচাইলাম, তাঁহাকে কেন কি?” দ্বিতীয় পরী বলিল, “না।”—তখন প্রথম পরী সেই লোকটির সকল জ্ঞপের কথা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার হিংস্র প্রতিবাদী কর্তৃক তিনি কিরূপে উৎপীড়িত হইতেছেন, তাহার পরিচয় দিল। তাহার পর বলিল, সুলতান ঐ ধার্মিক ব্যক্তির প্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া, কাল ইহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন। এই ধার্মিক ব্যক্তি সুলতানের কন্ডার জন্ত পরমেশ্বরের নিকট উপাসনা করেন, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। আর একটি পরী জিজ্ঞাসা করিল, “সুলতান-কন্ডার এমন কি রোগ হইয়াছে যে, এই ধার্মিক দরবেশকে দিয়া, তাঁহার জন্ত প্রার্থনা করাইতে হইবে?” ইহার উত্তরে প্রথম পরী বলিল, “ডিমডিন দৈত্যের সন্তান মৈমুন দৈত্য সুলতান-কুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার উপর ভর করিয়াছে, তাহা কি জান না? কিন্তু এই ধার্মিক দরবেশ কিরূপে তাঁহাকে আরোগ্য করিবেন, সে কথা আমার জানা আছে। ঐ দরবেশের মঠে একটা কালো বিড়াল আছে, তাহার লেজের অগ্রভাগ সাদা। সেই সাদা অংশ হইতে সাতগাছি লোম তুলিয়া, সুলতান-কুমারীর নানারক্কে, তাহার ঝুঁ প্রবেশ করাইলেই মৈমুন দৈত্য বাপ বাপ করিয়া ডাক ছাড়িতে ছাড়িতে পলায়ন করিবে, আর সুলতান-দুহিতার কাছেও আসিতে সাহস করিবেন না।”

পরদিন প্রভাতে দরবেশ সেই কূপ হইতে উঠিয়া তাঁহার মঠে উপস্থিত হইলেন; সেখানে অজ্ঞাত দরবেশের সহিত এই আকস্মিক বিপদ সম্মুখি কথাবার্তা বলিতে বলিতে, সেই কালো বিড়ালটা সেখানে উপস্থিত হইল। দরবেশ তাহাকে দেখিবারাত্র ধরিয়া, তাহার লাঙ্গলাগ্রভাগের সাতগাছি সাদা লোম উৎপাটন করিয়া রাখিলেন।

সেই দিন মধ্যাহ্নের পূর্বেই সুলতান তাঁহার প্রধান কন্ডারিগণের সহিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার কন্ডার পীড়ার কথা প্রকাশ করিয়া, কিরূপে তাঁহার রোগ আরোগ্য হইতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দরবেশ রাজকন্ডাকে সেই মঠে আনিবার উপদেশ দিলেন এবং তিনি যে রাজকুমারীকে অবিলম্বেই আরোগ্য করিতে পারিবেন, সে কথাও জানাইবেন। দরবেশের এই আশ্বাস-বাক্যে সুলতান বিশেষ আনন্দিত হইয়া, বহুসংখ্যক খোজা ও পরিচারিকাগণের সহিত রাজকন্ডাকে সেই মঠে প্রেরণ করিলেন। দরবেশ সেই সাতগাছি লোম দগ্ধ করিয়া, তাহার ধূম রাজকন্ডার নাসারক্কে প্রবেশ করাইলেন; দেখিতে দেখিতে মৈমুন দৈত্য ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া রাজকন্ডাকে পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিল।

এতদিন রাজকন্ডার কিছুমাত্র জ্ঞান ছিল না, এখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি বলিলেন, “আমি কোথায়, আমাকে এখানে কে আনিয়া?” কন্ডার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে বুঝিয়া, সুলতান দরবেশের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং দরবেশের হস্তে তাঁহার সেই কন্ডা সম্ভ্রাদান করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। ইহার কিছু দিন পরে প্রধান উজীরের মৃত্যু হইলে সুলতান দরবেশকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন। দরবেশ বহু দিবস সেই পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহার শব্দের মৃত্যুর পর শব্দের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সুলতানের পুত্রসন্তান ছিল না।

দরবেশ সুলতানী লাভ করিয়া, এক দিন তাঁহার উজীরকে আদেশ করিলেন, “তাঁহার সেই পুত্রসন্তান

পরী

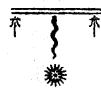
আস্তানায়



দৈত্য-বিলা-

সানী সুলতান-

নন্দিনী



প্রতিবাদীকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। যথাসময়ে তাঁহার সেই হিংস্র প্রতিবাদী তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, স্থলতান বলিলেন, “বন্ধু, তোমাকে দেখিয়া আমি বড় খুশী হইলাম।” কোথাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ হইল, ইহাকে হাজার খান মোহর এবং কুড়িবত্তা অতি উৎকৃষ্ট বাণিজ্যদ্রব্য উপহার প্রদান কর। সেই হিংস্রবাক্তি ঐ সকল দ্রব্য লইয়া মহানন্দে গৃহে প্রতিগমন করিল।

বারম্বক্ষণ
প্রদান



দ্বিতীয় কাণা ফকির বলিল, আমি দেই দৈত্যকে এই দৃষ্টান্ত দ্বারা মুগ্ধ করিবার চেষ্টা করিলাম বটে, কিন্তু কৃতকার্য হইলাম না, তাহার সংকল্প হইতে সে বিচলিত হইল না। আমাকে সজোরে ধরিয়া বায়বেগে উজ্জ্বলিত উঠিল। এত উজ্জ্বলিত যে, পৃথিবী একখানি ক্ষুদ্র স্বেতবর্ণ মেঘের স্তার দেখাইতে লাগিল। সেই উচ্চস্থান হইতে সে এক পর্বতের উপর অবতরণ করিল এবং এক মুঠি ধূলি লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক তাহা আমার মস্তকে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “মাত্রবের আকার পরিত্যাগ করিয়া এখন হইতে বানরের দেহ ধারণ কর।” দেখিতে দেখিতে আমি বানর হইয়া পড়িলাম।

অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে আমি পর্বত হইতে নীচে নামিয়া আসিলাম এবং একটি নৃতন রাজ্যে উপস্থিত হইলাম। ক্রমাগত চলিতে লাগিলাম; এক মাস জনপের পর সমুদ্রতীরে আসিলাম, দেখিলাম, প্রায় এক ক্রোশ দূরে একখানি জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। আমি একটি বৃক্ষশাখা ভাঙ্গিয়া তাহা নৌকায় পরিণত করিলাম; সমুদ্রজলে তাহা নিক্ষেপ করিয়া, তাহার উপর উপবেশন করিলাম, আর ছুটি শাখা ধাঁড়ের কাজ করিতে লাগিল। জাহাজের সন্নিকটবর্তী হইলে জাহাজের লোকরা আমাকে দেখিতে পাইয়া দড়ি ফেলিয়া, আমাকে জাহাজের উপর তুলিল; কিন্তু ছুড়ীগাক্রমে আমি বাস্তবিক হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলাম, তথাপি আমার বুদ্ধিগুণে পুণ্য দেখিয়া জাহাজের লোকরা যার-পর-নাই চমৎকৃত হইল।

বানরের
বুদ্ধি-চাতুর্য্য



এই জাহাজে যে সকল সদাগর ছিল, তাহারা অজ্ঞ ও কুসংস্কারক লোক। আমাকে জাহাজের উপর দেখিয়া, তাহারা নানাপ্রকার বিপদের আশঙ্কা করিতে লাগিল; কেহ আমাকে বধ করিবার ভয় দেখাইল, কেহ সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিবে বলিল। আমি আশ্বাসকার কোন উপায় নাই দেখিয়া, অবশেষে জাহাজের কাপ্তেনের পদতলে নিপতিত হইলাম এবং অল্পভঙ্গীর দ্বারা তাঁহার অঙ্গকম্পা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। অবশেষে কাপ্তেনের মনে দরার সঞ্চার হইল, তিনি সকলকে জানাইলেন, কেহ আমার প্রতি কোন অত্যাচার করিলে, তাহাকে কঠিন দণ্ডভোগ করিতে হইবে। কাপ্তেন আমার প্রতি বিশেষ অমুগ্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কথা কহিতে না পারিলেও আমি আকার ইঙ্গিতে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম।

পঞ্চাশদিন পরে জাহাজখানি একটি মহাসমুদ্র নগরের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল। জাহাজের চতুর্দিকে বহুসংখ্যক নৌকায় নগরবাসিগণ সমবেত হইতে লাগিল। কয়েকজন রাজকর্মচারী জাহাজে উঠিয়া প্রকাশ করিলেন যে, সেই রাজ্যের স্থলতান জাহাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইবার জন্ত আদেশ করিয়াছেন। ইহার কারণ, স্থলতানের প্রধান আমাত্যের হত্যাকার অতি সন্মত ছিল, সমস্ত তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন; রাজকার্য্য-পরিচালনের জন্ত একটি উৎকৃষ্ট হত্যাকার-বিশিষ্ট কর্মচারীর আবশ্যক; কিন্তু অল্পসন্ধানও সেরূপ লোক পাওয়া যায় নাই। জাহাজে সেরূপ কোন লোক থাকিলে এবং হত্যাকার দেখিয়া তাহার লেখা পছন্দ হইলে স্থলতান তাহাকে সেই পদ প্রদান করিবেন।



জাহাজের সকল লোক সেই কাগজে ছই চারি ছত্র করিয়া লিখিল; আমিও সেই কাগজখানি টানিয়া লইলাম। বানরে কাগজ ছিঁড়িয়া ফেলিবে বলিয়া, সকলে প্রথমে ভীত হইয়াছিল; কিন্তু যখন আমি সেই কাগজে নানা ভাষার কবিতা-রচনা করিলাম, তখন তাহাদের ভয় বিষয়ে পরিণত হইল। জাহাজের কাপ্তেন মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, এমন সুন্দর হস্তাক্ষর কোন মানুষেরই তিনি দেখেন নাই।

স্বলতান আমার হস্তাক্ষর দেখিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার আশ্বাবল হইতে একটি সুসজ্জিত উৎকৃষ্ট অশ্ব আমার জন্ত জাহাজের নিকট পাঠাইতে আদেশ দিলেন। স্বলতানের আদেশ শুনিয়া তাঁহার কর্মচারিগণ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহাতে স্বলতান অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে কঠিন দণ্ডদানের ভয় প্রদর্শন করিলেন। তাহারা হাসি বন্ধ করিয়া বলিল “স্বলতান, আপনি বাহাকে আনিবার জন্ত অশ্ব পাঠাইতেছেন, সে মানুষ নহে, একটি বানর।” ইহা শুনিয়া স্বলতান অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং বলিলেন, “তোমরা অবিলম্বে আমার নিকট সেই বানরকে উপস্থিত কর।” আমি মহা সমারোহে স্বলতানের প্রাসাদে উপনীত হইলাম। সভার সকল লোক আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ করিল, রাজধানীর লোক দলে দলে আমাকে দেখিতে আসিল।

যথাকালে সভাসভ করিয়া স্বলতান দরবারগৃহ হইতে বিশ্রামক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া ভোজন করিতে বসিলেন। আমিও তাঁহার প্রতি যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বিন্মত হইলাম না। টেনিলের উপর দোয়াত কলম দেখিয়া, আমি একটি পীচফলের উপর স্বলতানের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ করেক ছত্র প্রবন্ধ রচনা করিলাম এবং তাহা স্বলতানের হস্তে প্রদান করিলাম। ইহাতে স্বলতান আমার প্রতি অধিক সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এক গেলান অতি উৎকৃষ্ট মত্ত পান করিতে দিলেন; তাহা পান করিয়া আমি প্রফুল্লচিত্তে করেক ছত্র কবিতা লিখিলাম, তাহাতে আমার দুর্ভাগ্যের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম। স্বলতান সেই কবিতা পাঠ করিয়া শতমুখে আমার প্রশংসা করিলেন। তাহার পর তাঁহার ইচ্ছাক্রমে তাঁহার সহিত সতরঞ্চ খেলিতে লাগিলাম, প্রথমবার স্বলতানের জয় হইল, কিন্তু তাহার পর উপর্যুপরি দুইবার আমিই জয়লাভ করিলাম।

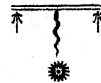
স্বলতানের একটি পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। অত্যন্ত সুন্দরী বলিয়া তাঁহার নাম ছিল তিলোত্তমা। স্বলতান তাঁহার কন্যাকে আমোদিত করিবার অভিপ্রায়ে—তাঁহাকে আনিবার জন্ত করেকজন খোজা পাঠাইয়া দিলেন। রাজকন্যা আবৃতমস্তকে পিতৃনিগদানে উপস্থিত হইলেন। স্বলতান ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া তাঁহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এখানে এমন কেহই নাই, বাহাকে দেখিয়া তুমি এভাবে অবগুণ্ঠন দিতে পার।” রাজকন্যা বলিলেন, “বাবা! আপনার সম্মুখে এই যে বানর উপবিষ্ট আছেন, ইনি সতাই বানর নহেন, ইনি এক দেশের রাজপুত্র। এক দৈত্য ঈর্ষাবশতঃ যাজ্ঞবিষ্ঠাবলে ইহাকে বানরে পরিণত করিয়াছে।”

এই কথা শুনিয়া স্বলতান বিষয়ে স্তম্ভিত হইলেন এবং আমার দিকে কিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমার কন্যা বাহা বলিতেছেন, তাহা কি সত্য?” আমি কথা কহিতে পারিতাম না; ললাটে হাত দিয়া দেখাইলাম, বাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহাই হইয়াছে। স্বলতান তাঁহার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দৈত্য যে যাজ্ঞবিষ্ঠাবলে রাজপুত্রকে বানরে পরিণত করিয়াছে, তাহা তুমি কিরূপে জানিলে?” তিলোত্তমা উত্তর করিলেন, “আমার বৃদ্ধা ধাত্রী যাজ্ঞবিষ্ঠার পারদর্শিনী ছিল, এবং সে আমাকে এ বিজ্ঞা শিক্ষা দিয়াছিল, ইহাতে আমি এরূপ পারদর্শিনী হইয়াছি যে, ইচ্ছামাত্র আমি আপনার রাজধানী সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত

বানর-সম্বন্ধনা

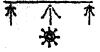


বাহুকরী স্বল-
তান-মণিনি



কিংবা ককেশাস পর্বতের অপর পারে স্থানান্তরিত করিতে পারি। যদি কোন লোক কোন বাহুরকের কবলে পড়িয়া কোন জন্তুতে রূপান্তরিত হয়, তাহা হইলে এই বিভাবলে আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারি। সেই জন্তই আমি এই রাজপুত্রকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছি। আপনার অমুমতি হইলে ইহাকে আমি পুনরায় মানুষ করিয়া দিতে পারি।” হুলতান বলিলেন, “আমার অমুরোধে অবিলম্বে তুমি ইহাকে ইহার নিজমুষ্টি প্রদান কর।”

সিংহরূপে দৈত্য
আবির্ভাব



রাজকন্যা তিলোত্তমা তাঁহার কক্ষে গমন করিয়া, একখানি ছুরি লইয়া আসিলেন; ছুরির ফলকের উপর কতকগুলি হিন্দু অক্ষর লেখা। সেই ছুরিকা হস্তে লইয়া তিলোত্তমা অক্ষুটবরে কতক-গুলি মন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ অন্ধকার হইয়া গেল, বোধ হইল যেন রাত্রি-কাল সমাগত। আমাদের মনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল; সহসা দেখিলাম, সেই অন্ধকারের মধ্যে ইরলি-সের দোহিত্র সেই দৈত্য একটি ভয়ঙ্কর সিংহের মূর্তি ধারণ করিয়া সেই কক্ষে উপস্থিত হইল।

রাজকন্যা তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধবরে বলিলেন, “বে কুকুর, আমার অনানতা স্বীকার না করিয়া, আমাকে ভয় দেখাইবার জন্ত এই ভয়ানক মূর্তি ধারণ করিয়াছিস? এখনি তোকে উপযুক্ত প্রতিফল পাইতে হইবে।” সিংহ গর্জন করিয়া বলিল, “আমরা পরস্পর কেহ কাহারও অপকার করিব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইয়াছিলাম; তুমি আজ সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে সাহসী হইয়াছ। আজ তোমাকে ইহার প্রতিফল পাইতে হইবে,” এই বর্ণিমা সে তাহার তীক্ষ্ণ দন্ত বাহির করিয়া রাজকন্যাকে গ্রাস করিতে অগ্রসর হইল। তিলোত্তমা ইহাতে কিছুমাত্র ভীতা না হইয়া, এক লম্ফে সিংহের পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন এবং তাঁহার নিজের একগাছি কেশ ছিঁড়িয়া দুই একটি মন্ত্র উচ্চারণ করি-মাত্র সেই কেশ একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারিতে পরিণত হইল। রাজকন্যা সেই তরবারির আঘাতে সিংহের মূণ্ডচ্ছেদন করিলেন। তাহার পর তাহার দেহ তিন খণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

বাহুবিভার
ভীষণ সংঘর্ষ



মুণ্ডটা পড়িয়া রহিল, দেহের অপর দুই খণ্ড চক্ষুর নিম্নে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু অধিক আশ্চর্যের কথা এই যে, সিংহের মুণ্ডটা অতি অল্পসময় মধ্যেই একটি প্রকাণ্ড বৃশ্চিকে পরিণত হইল, তাহা দেখিয়া রাজকন্যাও সর্পমূর্তি ধারণ করিলেন, বৃশ্চিক ও সর্পে মহা যুদ্ধ উপস্থিত হইল। বৃশ্চিক শব্দন দেখিল, সে আর কোন মতেই সর্পকে পারিয়া উঠিতেছে না, তখন সে যুদ্ধ ছাড়িয়া ঈগল পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া আকাশে উড়িয়া গেল। তখন সেই সর্পও ক্রুদ্ধবর্ণ ভীষণদর্শন মহাপরাক্রান্ত ঈগলের মূর্তি ধরিয়া তাহার অঙ্গসংগ্রহ করিল; কিছুকালের জন্ত উভয়েই অদৃশ্য হইয়া গেল।

অল্পকাল পর আমাদের সম্মুখের মৃত্তিকা বিদীর্ণ করিয়া একটি বিড়াল বহির্গত হইল, তাহার দেহ খেত ও কৃষ্ণবর্ণ লোনে পরিপূর্ণ। বিড়ালটা মিউ মিউ করিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া সকলের কাণে তালা লাগাইয়া দিল; কিন্তু পরক্ষণেই ভূগর্ভ হইতে একটি নেকড়ে বাঘ উঠিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। নিকটে একটি দাড়িম্ব পড়িয়াছিল, বিপদ দেখিয়া বিড়াল ক্ষুদ্র কীট হইয়া সেই দাড়িম্বে প্রবেশ করিল। দাড়িম্বটা তৎক্ষণাৎ ফুলিতে আরম্ভ করিল, পরে লালহাতে লালহাতে কাটিয়া বহুখণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল।

নেকড়ে বাঘও তৎক্ষণাৎ মোরগদেহ দেহ ধারণ করিয়া দাড়িম্বের বীজগুলি চকুপুটে তুলিয়া গ্রাস করিতে লাগিল। সে সকল বীজ গ্রাস করিল বটে, কিন্তু একটি বীজ অদূরবর্তী খালের ধারে পড়িয়াছিল, তাহা সে গ্রাস করিবার পূর্বেই জলের মধ্যে গড়াইয়া পুড়িল এবং একটি ক্ষুদ্র মৎস্য পরিণত হইল। তাহা দেখিয়া মোরগটি জলে পড়িয়া, একটি বোয়ালমাছের আকার ধারণ করিয়া, সেই ক্ষুদ্র মৎস্যের অঙ্গসংগ্রহ করিল। দুই



ককরাশির পুরস্কার

যাত্রা-যুদ্ধ



ঘণ্টা আর তাহাদিগকে দেখা গেল না, তাহার পর এক মহা ভয়ঙ্কর শব্দে আমাদের জংকম্প উপস্থিত হইল। আমরা চাহিয়া দেখিলাম, দৈত্য ও রাজকন্যা উভয়েই অগ্নিশ্রোতে ভাসিতেছে। তাহাদের উভয়ের নিশ্বাসে অগ্নিবর্ণ হইতে আরম্ভ হইল; ধূম ও লেলিহান অগ্নিশিখায় চতুর্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। আমাদের আশঙ্কা হইল, হয় ত সে অগ্নিতে স্থলতান-প্রাণাদ ভস্মীভূত হইবে। আমরা ক্রতবেগে সেখান হইতে পলায়ন করিলাম, কিন্তু সে অগ্নির হস্ত হইতে নিরাপদে পরিত্রাণ পাইলাম না; স্থলতানের মুখ ও মাথা বলসাহায়া গেল, প্রধান খোজা সেই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল এবং অগ্নির একটি শিখা লাগিয়া আমার এই দক্ষিণ চক্ষুটি নষ্ট হইয়া গেল। আমরা প্রতিমূহুর্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি, এমন সময় রাজকন্যা ‘আমি জয়লাভ করিয়াছি’ বলিয়া আমাদের নিকট আসিলেন, দৈত্যের মৃতদেহ ভগ্নে পরিণত হইল।

রাজকন্যা আমার নিকটে আসিয়া মস্তপূত জল আমার মস্তকে নিক্ষেপপূর্বক বলিলেন, “যদি তুমি প্রকৃতই মানুষ হও ও যত্নবিজ্ঞাবলে বানর হইয়া থাক, তাহা হইলে অবিলম্বে নিজমুষ্টি ধারণ কর।”— আমি তৎক্ষণাৎ নিজমুষ্টি লাভ করিলাম, কিন্তু দক্ষিণ চক্ষুটি আর পাইলাম না।

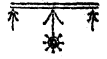
আমাকে মনুষ্যদেহ দান করিয়া, তিলোত্তমা স্থলতানকে বলিলেন, “বাবা, আমি জয়লাভ করিয়াছি বটে, কিন্তু আমার জীবনের পরিবর্তে এই জয়লাভ করিতে হইয়াছে, আমার পরমায়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে, আমার শরীরের মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়া আমাকে দগ্ধ করিতেছে।” এই কথা শুনিয়া স্থলতান ক্রীলোকের ছাঈ বোদন করিতে লাগিলেন। কন্যাটিকে তিনি প্রাণের অপেক্ষা ভালবাসিতেন।

করক মুহূর্তমধ্যে রাজকন্যা “পুড়িয়া মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার দেহ ভয়ঙ্করপে পরিণত হইল। এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিয়া রাজপ্রাসাদে মহা হাহাকার রব উঠিল। আমি মনে মনে ভাবিলাম, আমার চিরজীবন কুকুর কিংবা বানর হইয়া থাকাও ভাল ছিল, আমার জীবনদাত্রীকে এ ভাবে নষ্ট করিয়া, নিজমুষ্টি লাভও আমার নিকট বিড়ম্বনামাত্র মনে হইতে লাগিল। স্থলতান আমাকে সঘোষন করিয়া বলিলেন, “এতদিন তুমি এখানে না আসিয়াছিলে, ততদিন আমি পরমসুখে ছিলাম, তুমি আসিবার পরই আমার সুখশান্তি সমস্ত নষ্ট হইল, তোমার জন্তেই আমার প্রাণসম্মা কন্যা হইতে আমি বঞ্চিত হইলাম, আমার কন্যার অকালে মৃত্যুতে আমার হৃদয়ে যে শোকের আগুন জ্বলিয়াছে, তাহাতেই হয় ত আমার ইহজীবনের অবসান হইবে। তুমি আমার রাজ্যে অমঙ্গল লইয়া আসিয়াছে; তুমি এখনই আমার রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরে গমন কর, কাল স্বর্গদাতার পূর্বে যদি তোমাকে আমার রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।”

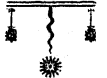
আমি স্থলতানের আদেশ অস্বীকার প্রাণভয়ে সেই দিনই তাঁহার রাজ্য পরিত্যাগ করিলাম এবং দাড়ি, গৌঁড়, জু কামাইয়া ফকিরের বেশে দেশান্তরে যাত্রা করিলাম। বোগদাদাদিধপতি মহাপ্রাকৃত্য হাঙ্গম-অল-রসিদের রাজ্য ভিন্ন অল্প কোথাও গমন করিয়া আমার নিরাপদ হইবার আশা নাই বুঝিয়া, নানা রাজ্য ঘুরিতে ঘুরিতে আজ সায়ংকালে এই নগরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি, এবং এই নগরেই প্রথম ফকিরের সহিত আমার আলাপ হইয়াছে; তাহার পর যাহা ঘটিয়াছে, তাহা আপনার অবগত আছেন।

দ্বিতীয় ফকিরের কাহিনী শেষ হইলে, জোবেদী তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি যাঁহা বলিলে, তাহাতে সন্দেহ হইলাম; এখন তুমি স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পার।” কিন্তু এই ফকিরও প্রথম ফকিরের মত অবশিষ্ট ব্যক্তিগণের কাহিনী শ্রবণের জন্য সেখানে কিছুকাল থাকিবার অস্বমতি প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর তৃতীয় ফকির তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

অগ্নিশ্রোতে
বাহুকীর
সম্ভরণ



স্থলবীর
ভয়ঙ্কর
পরিণতি



তৃতীয়
কাণ্ড
ফকির
কাহিনী



মাকুরাশি, আমার ছই বন্ধু তাঁহাদের এক-চক্ষু-নাশের যে উপাখ্যান বলিলেন, তাহাতে বৃথিতে পারা গেল, দৈবক্রমেই তাঁহারা এ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন; কিন্তু আমি নিজের নির্বুদ্ধিতা-দোষে এক চক্ষু হইতে বঞ্চিত হইয়াছি; আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী আত্মপূর্ব্বিক শ্রবণ করুন।

আমিও এক দেশের রাজপুত্র, আমার পিতার নাম কাসিম, আমার নাম আজিব। পিতার মৃত্যুর পর আমি পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলাম। সমুদ্রতটে আমার রাজ্যের রাজধানী ছিল, বিস্তীর্ণ রাজ্য, অগাধ ধনসম্পত্তি, অসংখ্য জাহাজ ও বহুসংখ্যক সৈন্য—আমার কোন হুখেরই অভাব ছিল না।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, আমি জাহাজে চড়িয়া, আমার শাসিত দ্বীপসমূহ সন্দর্শনে যাত্রা করিলাম। তাহার পর দশখানি জাহাজ লইয়া, নূতন নূতন দ্বীপ আবিষ্কারের সংকল্প করিলাম।

সৈন্যসামন্ত ও মন্ত্রিবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া আমি জাহাজে উঠিলাম। সমুদ্রজলে জাহাজ ভাসিল। চলিশ দিন ধরিয়া নিরাপদে জাহাজ চলিল, পথে কোনই বিপদ ঘটিল না। চলিশ দিনের দিন রাত্রিতে ভয়ানক ঝড় উঠিল, প্রতি মুহূর্ত্তেই আমাদের আশঙ্কা হইতে লাগিল, জাহাজ অবিলম্বেই জলমগ্ন হইবে, কিন্তু তাহা হইল না, কোন রকমে রাত্রিটা কাটিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে ঝড়ের বেগ কমিল, মেঘ কাটিয়া গেল, প্রভাততৃণ্য-কিরণ চারিদিক আলোকিত হইয়া উঠিল। আমরা একটী দ্বীপে নামিলাম, সেখানে দুই দিন থাকিয়া খাদ্যদ্রব্যাদি সংগ্রহ করিলাম, তাহার পর আবার জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল। দশ দিন পরে আমরা সেই সমুদ্রমধ্যে স্থলভাগ দেখিবার আশা করিতেছিলাম, কিন্তু আমরা কোথায় যে উপস্থিত হইয়াছি, জাহাজপরিচালক তাহা স্থির করিতে পারিল না। আমাদের চতুর্দিকে অনন্ত মহাসমুদ্রের নীলজল যতদূর দৃষ্ট যায়—ততদূর পর্যন্ত বাপিয়া রহিয়াছে দেখা গেল। তাহার পর দেখিলাম, সমুদ্রমধ্যে কি একটা কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আমাদের সম্মুখে অবস্থান করিতেছে।

চুষক পাহাড়ের
ভাষণ আকর্ষণ



এই দৃশ্য দেখিবামাত্র জাহাজপরিচালকের মুখ শুকাইয়া গেল, সে অধীরভাবে তাহার পাগড়ী ভেঙে দেকের উপর ছুড়িয়া ফেলিয়া চীৎকারশব্দে বলিল, “মহাশয়, আমাদের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এ পি... হইতে উদ্ধারের আর আশা নাই! এই জাহাজের একটি প্রাণীও আর রক্ষা পাইবে না।” আমি তাহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, “আমরা ঝড়ের বেগে আমাদের গণ হইতে বিপথে নীত হইয়াছি। ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ দেখিতেছেন, কাল বেলা ছই গ্রহের মধ্যে আমাদের জাহাজ উহার নিকটস্থ হইবে। ঐ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটি একটি চুষকের পাহাড়, আমাদের জাহাজ ঐ পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র জাহাজের সমস্ত লোহা চুষকপ্রস্তর আকৃষ্ট হইয়া খুলিয়া বাইবে, এবং জাহাজখানি খণ্ড খণ্ড হইয়া সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইবে; জাহাজ আর কিরূপের অগ্রগণ্য হইলেই আমরা চুষকের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে পারিব।”

জাহাজের পরিচালক আরও বলিল, “এই পর্ব্বতটি অত্যন্ত উচ্চ ও দুর্য্যবাহ, ইহার শিখরদেশে একটি ধাতুময়ী অশ্বমুক্তি আছে, অশ্বের উপর ধাতুময় আরোহী। এই আরোহীর বন্ধোদেখে একখানি সীসার ফলক আছে, ঐ ফলকে কতকগুলি যাদুমন্ত্র লিখিত আছে। শুনিতে পাওয়া যায়, ঐ ধাতুমুক্তিই জাহাজমগ্নদের প্রধান কারণ, যতদিন কেহ এই মূর্ত্তি ধ্বংস না করিবে, ততদিন কোন জাহাজের পরিত্রাণ নাই; সমুদ্রের এই অংশে আসিলেই তাহা নষ্ট হইবে।”—জাহাজপরিচালকের কথা শেষ হইলে জাহাজের সকল লোক ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া, কাতরস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল, কিন্তু আশ্রয়কার কোন উপায় স্থির হইল না।

পরদিন প্রভাতে আমরা সেই পর্ব্বতটিকে আরও পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাইলাম। মধ্যাহ্নকালে আমরা তাহার এত নিকটবর্ত্তী হইলাম যে, তাহার আকর্ষণ স্পষ্টরূপে বৃদ্ধিতে পারা গেল; দেখিতে দেখিতে

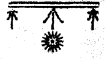


ଉତ୍କଳ କାହାଣୀ

ଅନାଥା ନାଥ

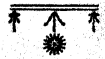
জাহাজের রূপ ও পেরেকসকল খুলিয়া খুলিয়া সেই পাহাড়ের দিকে ছুটিতে লাগিল। তাহার পরই জাহাজের তক্তাসমূহ শতখণ্ডে বিভক্ত হইয়া সেই অনন্ত সমুদ্রে নিমগ্ন হইল। জাহাজে যে সকল লোক ছিল, তাহারা কেহই রক্ষা পাইল না। সকলেই অল্পকালমধ্যে জলমগ্ন হইল, কেবল সৌভাগ্যক্রমে আল্লা আমাকে এক খণ্ড তক্তা ছুটাইয়া দিলেন, আমি সেই তক্তার উপর সোহেবের সমস্ত ভার নিক্ষেপ করিলাম, তক্তা সমুদ্র-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে সেই পাহাড়ের পাদদেশে উপস্থিত হইল। যে স্থানে আসিয়া তক্তা পাহাড় স্পর্শ করিল, পরর্তের সেই স্থানটি ছুরারোহ নহে, আমি আল্লার নাম লইয়া পাহাড়ের উপর উঠিয়া পড়িলাম। অত্যন্ত সংকীর্ণ পথ, তাহার উপর ভয়ানক পিচ্ছিল, ঝটিকার বেগ এমন প্রবল, প্রতি মুহূর্তেই ভয় হইতে লাগিল, হয় ত' উড়িয়া আবার সমুদ্রগর্ভে পড়িতে হইবে; কিন্তু আল্লার অগ্ৰগাহে আর কোন বিপদে পড়িতে হইল-না, পাহাড়ের শিখরদেশে একটি গম্বুজ, সেই গম্বুজের উপর পুরোঁকত অবস্থায় রহিমুদ্দীন। আমি বহু কষ্টে অতি ধীরে ধীরে সেই গম্বুজের মধ্যে উপস্থিত হইয়া নামাজ শেষ করিলাম।

জাহাজ
বিপর্যয়



সেই গম্বুজের মধ্যেই আমার রাত্রি কাটিয়া গেল। নিদ্রাঘোরে আমি দেখিলাম, একটা সম্রাট বৃদ্ধ, আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, “আজিবে, শোন, নিদ্রাভঙ্গে তুমি তোমার পদতলের মুক্তিকা খুঁড়িবে, কিছুক্ষণ খুঁড়িলেই দেখিতে পাইবে, একটা পিস্তল-নির্শিত ধনুজ ও তিনটা বাঁসকনির্শিত বাণ রহিয়াছে। সেই ধনুজকে ঐ বাণ তিনটা যোজন করিয়া, ঐ অঝোরোহীকে বিদ্ধ করিবে, তাহা হইলেই অঝোরোহী অশ্বপৃষ্ঠ হইতে সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হইবে। তাহার পর সেখানে তুমি ঐ ধনু ও তীর পাইবে, সেই স্থানে ঐ অশ্বটিকে প্রোথিত করিবে। তুমি এইরূপ করিলে পর সমুদ্রের জল ক্ষীত হইয়া পর্বতশিখরস্থ গম্বুজ স্পর্শ করিবে। সেই সময় তুমি একখানি ক্ষুদ্র নৌকার আরোহী দেখিতে পাইবে। সে একটা ঠাড় বাহিয়া নৌকা লইয়া, তোমার নিকটে উপস্থিত হইবে, তুমি তখন আল্লার নাম না লইয়া সেই নৌকার উঠিয়া পড়িবে। নৌকার সেই আরোহীটীও ধাতুনির্শিত, কিন্তু তাহা হইতে তোমার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই। সেই নৌকা দশ দিনের মধ্যে তোমাকে আর একটা বীপে লইয়া যাইবে, তাহার পর সেখান হইতে তুমি নিরাপদে স্বদেশে ফিরিতে পারিবে; কিন্তু তোমাকে আবার বিশেষ করিয়া বলিতেছি, যত দিন নিরাপদে ফিরিতে না পার, ভূগিয়াও আল্লার নাম লইবে না।”

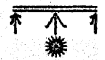
বন্দোবস্তের
অনুসরণ



আমার নিদ্রাবস্থার সেই বৃদ্ধ যে যে উপদেশ প্রদান করিলেন, আমি তদনুসারেই সকল কাজ করিলাম,—শরাবাত্তে সেই ধাতুময় অঝোরোহীকে সমুদ্রগর্ভে নিপাতিত করিলাম, অশ্বটিকে বধাস্থানে প্রোথিত করিলাম, তাহার পর সমুদ্রজল গম্বুজের সমান ক্ষীত হইয়া উঠিলে একটি ধাতুময় মুক্তিকে নৌকা লইয়া, সেই স্থানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া নির্ভীকভাবে আমি তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। সমুদ্রে নরদিন ধরিয়া নিরাপদে নৌকা চলিল, দশম দিবসে অদূরে একটি বীপ দেখিয়া মনে বড় আনন্দের সঞ্চার হইল, হতালপ্রাণে আশার অঙ্কুর দেখা দিল, মনের আনন্দে বলিয়া ফেলিলাম, “আল্লা, তোমার অলীম দয়্য, ধন্ত তোমার নাম।”

সমুদ্রবন্দে

নিক্ষেপে বাতাস



যেমন এই কথা বলা, তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা ও তত্পরিত্ব ধাতুনির্শিত পরিচালক উভয়েই সমুদ্রগর্ভে ভুবিয়া গেল। আমি আবার জলের উপর ভাসিতে লাগিলাম, এবং প্রাণপণে সঁতার দিয়া সর্বশেষে নৌকাটী বীপের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বেলা শেষ হইল, রাত্রি আসিয়া চরাচর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিল, তখনও আমি প্রাণপণে সঁতার দিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার অঙ্গ অবশ হইয়া আসিল, প্রাণের আশা হুঃ-ইয়া গেল, এমন সময় বিধাতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! সহসা প্রবল বড় আশিষ আমাকে কলভায়ে লইয়া গিয়া ফেলিল। আমি ব্যস্তভাবে তীরে উঠিয়া পরিত্রাণে বরাণসি নিষ্কড়াইয়া তাহা বাণির উপর শুকাইতে দিলাম।

জ্ঞান বীণে
বস্ত্র সূচিয়া
বহত

পরদিন সকালে সোয়ে আমার বস্ত্র শুদ্ধ হইলে তাহা পরিধান করিয়া, কোথায় আসিয়াছি, তাহা পরীক্ষার জন্ত চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ ঘুরিয়া বুকিলাম, আমি একটি ক্ষুদ্র বীণে উপস্থিত হইয়াছি। বীণাট জনশূন্য, কিন্তু বেশ সুন্দর, বহুসংখ্য ফলের গাছে ঘূষোভিত। আমি এখানে আবদ্ধ হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম, কারণ, বহুদূর নিরীক্ষণ করিয়াও মনুষ্যানিবাসের কোন চিহ্ন দেখিতে পাইলাম না। কি করিব বলিয়া ভাবিতেছি, এমন সময়ে দেখিলাম, একখানি জাহাজ পাল তুলিয়া বীণের দিকে অগ্রসর হইতেছে। কিছুকাল পরে জাহাজখানি আমার অদূরে আসিয়া নঙ্গর করিল। জাহাজের লোকগুলি ক্রিপণ প্রকৃতি-বিশিষ্ট, তাহা না জানিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সঙ্গত মনে করিলাম না। একটি পত্রবহুল বৃক্ষের উপর বসিয়া তাহাদের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিলাম, তাহারা আমাকে দেখিতে পাইল না। কিরংকাল পরে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম,—সেই জাহাজখানি বীণসংলগ্ন হইবামাত্র দশজন ক্রীতদাস জাহাজ হইতে নামিয়া কোদালী হস্তে বীণের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল, এবং একটি স্থান খুঁড়িয়া মৃত্তিকার নিয়ে একটি গুপ্তদ্বার বাহির করিল। তাহার পর বহুসংখ্যক গৃহশোভার সামগ্রী ও খাদ্যস্রাবাদি জাহাজ হইতে বহন করিয়া, তাহারা সেই গুপ্তদ্বারপথে ভূগর্ভস্থ গৃহে সঞ্চিত করিতে লাগিল। সন্ধ্যাবেলায় একটি বৃদ্ধ একটি চৌদ্দ পোনের বৎসর-বয়স্ক বালককে সঙ্গে লইয়া, সেই ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন। কিছুকাল পরে সেই বালক ভিন্ন আর সকলেই বাহির হইয়া আসিল এবং গুপ্তদ্বারের উপর মাটি চাপা দিয়া, তাহারা জাহাজে প্রত্যাগমন করিল। অনতি-বিলম্বেই জাহাজ বীণ ত্যাগ করিল। আমি স্তম্ভিতহৃদয়ে নিশ্চেষ্ট এই ব্যাপার দেখিতে লাগিলাম।

বখন দেখিলাম, জাহাজ সেই বীণ হইতে অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে, তখন আমি ধীরে ধীরে গাছ হইতে নামিলাম এবং ক্রীতদাসেরা কোদালীর দ্বারা যে স্থান খনন করিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া মাটি সরাইতে লাগিলাম। মাটির কিছু নিয়ে এক খণ্ড অনতিদীর্ঘ প্রস্তর দেখিতে পাইলাম, প্রস্তরখানি উঠাইতেই একটি ক্ষুদ্র দ্বার দৃষ্টিগোচর হইল;—দেখিলাম, দ্বারপ্রান্ত হইতে বহুসংখ্যক সোপান ভূগর্ভে প্রসারিত রহিয়াছে। আমি সেই সোপানশ্রেণী দিয়া ভূগর্ভস্থ একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিলাম। কক্ষটা অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। পূর্বে যে বালকটির কথা বলিয়াছি, তাহাকে একটি সোফার উপস্থিতি দেখিলাম। ছইটি নশাবের উজ্জ্বল আলোকে আরও দেখিলাম, তাহার নিকটে ফল, ফুল ও খাদ্যস্রাবাদি সজ্জিত রহিয়াছে। যুবকট আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। তদর্শনে আমি তাহাকে সাহসদানের জন্ত বলিলাম, “যুবক, তুমি যেই হও, আমার জ্ঞান একজন রাজপুত্র ও রাজার হস্তে তোমার কোন বিপদের আশঙ্কা নাই। তোমাকে এখানে কি জন্ত জীবন্ত সমাহিত হইতে হইয়াছে, তাহা আমি অবগত নহি, কিন্তু তোমাকে আমি নিরাপদে উদ্ধার করিব, এ কথা স্থির জানিও। তবে একটি কথা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, দেখিলাম, কতক-গুলি লোক তোমাকে এই ভূগর্ভস্থ কারাগারে বদ্ধ করিয়া গেল, কিন্তু সে জন্ত তোমার কিছুনাথ আক্ষেপ নাই, তুমি বিদ্রোহও কাতর হও নাই, ইহার কারণ কি?”

অজ্ঞাতবাস
প্রাণেলিকা

↑ ↑
✱

যুবক আমার কথায় আশ্বস্ত হইয়া আমাকে বলিল, “রাজপুত্র, আপনি আসন গ্রহণ করুন, আমার জীবনের স্রষ্টা ইতিহাস আপনাকে বলিতেছি :—

আমার পিতা একজন জহরী। এই ব্যবসারে তিনি প্রচুর অর্থকর্য করিয়াছেন। তাঁহার দাসদাসী অশ্বখান, জাহাজ ইত্যাদিও অনেক আছে। তিনি বহুদিন পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু পুত্রসুখ-দর্শন-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই। একদিন রাত্রিকালে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, নীলজি তাঁহার পুত্র জন্মিবে বটে, কিন্তু অকালে তাহার প্রাণ নষ্ট হইবে। ইহার অল্প দিন পরেই আমার জন্ম হইল।

আমার পিতা জ্যোতিষীগণের দ্বারা গণনা করাইয়া জানিলেন, “পনের বৎসর বয়সের পূর্বে আমার জীবনের কোন আশঙ্কা নাই। তাহার পর প্রাণনাশের বিশেষ সম্ভাবনা; যদি কোন উপায়ে এই সময়ে প্রাণরক্ষা হয়, তাহা হইলে দীর্ঘজীবনের আশা আছে।” জ্যোতিষিগণ আরও বলিলেন, “কাসিমরাজার পুত্র আজিব চুখক-পাহাড়ের উপর সংস্থাপিত অধারোহীমূর্তি নিপাতিত করিবার পর চল্লিশ দিন অতিবাহিত হইলে ঐ রাজপুত্র আজিবের হস্তেই আমার প্রাণবিয়োগ হইবে।”

“জ্যোতিষীদের যথেষ্ট এই কথা শুনিয়া আমার পিতা বড় চিন্তিত হইলেন, এবং আমার জীবনরক্ষার জন্ত কি উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, মনে মনে তাহাই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। অবশেষে এই ভূগর্ভস্থ গৃহে চল্লিশ দিন আমার অজ্ঞাতবাস করাই স্থির হইল। আজ দশ দিন চুখকপর্বতের অধারোহীমূর্তি নিপাতিত, সুতরাং জ্যোতিষীদিগের মতে আমার পরমায়ু ত্রিশ দিনের অধিক নাই। আমাকে এখানে লুকাইয়া রাখিবার অভিপ্রায়েই আমার পিতা এই গুপ্তগৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই ত্রিশ দিন অতীত হইলেই পিতা স্বয়ং আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন। বাহা হউক, আমার বিশ্বাস, আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাইব, কারণ, রাজপুত্র আজিব যে এই জনহীন বীণে আসিয়া, আমার প্রাণবধের জন্ত এই ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করিবেন, এরূপ আমার অসম্ভব হয় না।”

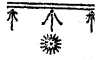
জহরীর পুত্রের এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া, আমি মনে মনে খুব হাসিলাম, কারণ, জ্যোতিষীদিগের এই গণনার মধ্যে আমি কোন যুক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি যুবকের নিকট আমার পরিচয় প্রদান করিয়া তাহাকে ভীত করা সম্ভব মনে করিলাম না, তাহাকে সাহস দান করিলাম, তাহার সহিত একত্রে হাস্যমোদে কালযাপন করিতে লাগিলাম। এইরূপে অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সংস্থাপিত হইল। দিবারাত্রি আমরা একত্র বাস করিতে লাগিলাম, আহারাদির দ্রব্য এত প্রচুর ছিল যে, তাহাতে দুইজন লোকের বহুদিন অনায়াসে চলিতে পারিত। উনত্রিশ দিন নিরাপদে অতিবাহিত হইল।

ত্রিশ দিনের দিন যুবকের আর আনন্দের নীনা রহিল না, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে ভাবিয়া, তাহার সমস্ত চিন্তা দূর হইল। যুবককে নিশ্চিন্ত দেখিয়া আমিও অত্যন্ত সুখী হইলাম। যুবক বলিলেন, “আজ আমার অজ্ঞাতবাসের শেষ দিন, একটু জল গরম করিয়া দিন, ভাল করিয়া স্নান করি।” যুবকের অহরোধে জল গরম করিতে দিলাম, গরম হইলে সেই জলে যুবক স্নান করিলেন, প্রীতিভরে আমি তাহার গাত্রমার্জনা করিয়া দিলাম। স্নানান্তে যুবক কিছুকাল শয্যার বিশ্রাম করিলেন, তাহার পর আহারার্থ আমার নিকট একটু তরমুজ ও কিছু চিনি চাহিলেন।

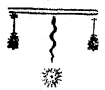
আমি তাঁহাকে তরমুজ আনিয়া দিলাম, কিন্তু ছুরি খুঁজিয়া পাইলাম না, ছুরি কোথায়, তাঁহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহার মস্তকের উপরস্থ কার্ণিশ দেখাইয়া দিলেন। আমি ছুরিখানি পাড়িবার জন্ত হাত বাড়াইয়া দিলাম, কিন্তু কার্ণিশ অধিক উচ্চ বলিয়া আমাকে দুই পদের বুড়াবুড়ের উপর ভর দিয়া ছুরিখানি স্পর্শ করিতে হইল। যেমন তাহা পাড়িতে যাইব, দৈবাৎ পদস্থলিত হইয়া আমি যুবকের বুকের উপর পড়িয়া গেলাম। আমার হস্তস্থিত শাণিত ছুরিকা তাঁহার বক্ষস্থলে বিদ্ধ হওয়ায় যুবক তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন।

এই আকস্মিক দুর্ঘটনার আমি কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলাম, বৃক ও মাধ্যম করাবাত করিয়া, পরিচ্ছদ ছিঁড়িয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বহুক্ষণ রোদন করিলাম। দীর্ঘকাল রোদন করার পর আমি বুঝিলাম, বিলাপ ও পরিভাষে আমি আর সেই যুবককে বাঁচাইতে পারিব না; তাহার পিতা শ্রীশ্রী পুত্রের

ভাগ্যলিপি
খণ্ডন প্রয়াস



নিয়তির অমোঘ
বিধান



সন্ধান আসিবেন স্থির করিয়া, আমি সেই ভূগর্ভস্থ গৃহ পরিত্যাগ করিলাম এবং বহির্ভাৱে সেই প্রস্তরখানি রাখিয়া মুক্তিকাঘরা তাহা আবৃত করিলাম। এই কার্য শেষ করিয়া আমি সমুদ্রের দিকে চাহিতেই, দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম;—বুঝিলাম, যুবকের পিতা তাঁহাকে গুপ্তস্থান হইতে লইতে আসিতেছেন। আমি বুঝিলাম, ধীপে আসিয়া এই বৃদ্ধ আমাকে দেখিতে পাইলে ও পরে আমি তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর কারণ ইহা জানিলে, ক্রোধে ও ক্রোড়ে তিনি আমার প্রাণবিনাশ করিবেন, সুতরাং তিনি ধীপে আসিয়া কি করেন, তাহা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া দেখিবার জন্ত আমি অদূরবর্তী ঘনপত্রবিশিষ্ট বৃকশাখায় আরোহণ করিয়া জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।



অদৃষ্টের
পরিচয়

কিছুকাল পরে সেই বৃদ্ধ জহরী ও তাঁহার দাসগণ সমুদ্রতীরে জাহাজ নম্র করিয়া, অভ্যস্ত ব্যস্তভাবে সেই গুহাঘারে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন, কেহ গুহার দ্বারের মুক্তিকা অপসারিত করিয়াছিল, সুতরাং বৃদ্ধের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তিনি গুহায় প্রবেশ করিয়া পুত্রের অস্থলদান করিতে লাগিলেন, কিন্তু হার, তাঁহাকে আর জীবিত দেখিতে পাইলেন না! বৃদ্ধের যে অবস্থা হইল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। তাঁহার দাসগণ বহু কষ্টে তাঁহাকে উপরে টানিয়া আনিল, শোকে ভ্রূণে তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার ভ্রাতৃগণ তাঁহার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিল।

অনেককাল পরে তাঁহার চৈতন্যদান হইলে, বৃদ্ধ পুত্রের মৃতদেহ ভূগর্ভস্থ গৃহ হইতে উদ্ধোলন করিয়া অন্ত স্থানে তাহা সমাহিত করিলেন, এবং গুপ্তগৃহস্থ জীবাদি জাহাজে লইয়া যাইবার আদেশ দিয়া বিলাপ করিতে করিতে সেই ধীপ পরিত্যাগ করিলেন।

পিতৃবকে
শোকের
বজ্রাঘাত

আমি একাকী সেই জনশূন্য ঘোঁষা বাস করিতে লাগিলাম। রোজ, রাত্টি ও হিংস্রক জন্তর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত আমাকে সেই গুহামধ্যস্থ গৃহে বাস করিতে হইল, কিন্তু একাকী সেই ভয়ানক স্থতিবিজড়িত স্থানে বাস করিতে আমার অগ্ৰহ যত্নশীল হইত। একমাস পরে একদিন শেখিলাম, সমুদ্রের জল কিছু হ্রাস হইয়াছে,—বীণ ও স্থলভাগের মধ্যবর্তী জলরাশি অগভীর বোধ হইল। আমি সাহসে ভর করিয়া চলিতে আরম্ভ করিলাম, জল এক হাতের অধিক বোধ হইল না। ক্রমে জল হইতে উঠিয়া কঠিন মৃত্তিকার পদার্পণ করিলাম; সমুদ্র হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িলাম। সমুদ্রে চাহিয়া বহু দূরে উজ্জল আলোকরাশি দেখিয়া, আমার মনে আশা ও আনন্দের সঞ্চার হইল; কারণ, আমি জানিতাম, আমি কখনও আপনি জলিতে পারি না, নিশ্চয়ই সেখানে মানুষ আছে। ক্ষতবেগে সেই অগ্নিশিখা লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম, অবিলম্বেই আমার ভ্রম দূর হইল; বুঝিলাম, বাহা অগ্নিশিখা বলিয়া বোধ করিয়াছিলাম, তাহা গোহি তবণ-ভার-নির্মিত ছুঁয়াপ্রভাগ, উজ্জল সূর্য্যাকিরণে তাহা অগ্নিশিখার স্যায় প্রজ্বলিত বোধ হইতেছিল।

আমি সেই চূর্ণের নিকটে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে চূর্ণশোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম; অবিলম্বেই দেখিলাম, দশটি রূপবান যুবক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের যুবের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার বিশ্বাসের সীমা রহিল না;—দেখিলাম, তাঁহাদের দশ জনেরই দক্ষিণ চক্ষু নাই। তাঁহারা একটি বৃদ্ধের অঙ্গগমন করিতেছিলেন।

সমস্ত যুবক-
বৃদ্ধ সম্মেলন
↑
*

তাঁহাদের সকলেরই দক্ষিণ চক্ষু কিরূপে নষ্ট হইল, তাহা জানিবার জন্ত আমি অত্যন্ত উৎসুক হইলাম। আমি তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহারা অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট আমার অদ্ভুত ইতিহাস আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলাম। সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন ও আমাকে সেই চূর্ণে প্রবেশের জন্ত অনুরোধ করিলেন। আমি তাঁহাদের সহিত চূর্ণে প্রবেশ করিলাম। চূর্ণের কক্ষগুলি অতি স্নন্দর ও সুসজ্জিত। আমরা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবেশন করিলাম। অনন্তর আমি তাঁহাদের এক চক্ষু নষ্ট হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, এ কোতুহল দমন করাই আমার পক্ষে মঙ্গলের বিষয়। আমাদের সঙ্গে যে বৃদ্ধটি ছিলেন, তিনি উঠিয়া গিয়া গৃহান্তর হইতে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিলেন; ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে তাহা আমাদের সকলকেই প্রদত্ত হইল। আমরা পরমভূষণ সহিত তাহা ভোজন করিলাম। আহা! শেষ হইলে বৃদ্ধ আমাদের প্রত্যেককে এক এক পাত্র মদ্যপান করিতে দিলেন।

আমাদের কথাবার্ত্তায় অনেক রাত্রি হইয়া গেল। রাত্রি গভীর হইয়াছে দেখিরা একজন যুবক বৃদ্ধকে বলিলেন, “রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন আমাদের গকে শয়ন করিতে হইবে, আগ্রহ, তৎপূর্বে আমরা আমাদের কর্তব্যকর্ম শেষ করি।” এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধ নীলবস্ত্রে আচ্ছাদিত দশটি পাত্র লইয়া আসিলেন। পাত্রগুলি উন্মোচিত হইলে দেখা গেল, প্রত্যেক পাত্রের ভিতর কিঞ্চিৎ পরিমাণ ছাই, কয়লার গুঁড়া ও ভূঙ্গা কাণী রহিয়াছে। যুবকগণ ঐ সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া তাহা স্ব স্ব মুখে মাখিলেন, তাহার পর মাথা ও বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—“আমাদের লালসা ও ইঞ্জিরপারগতার কল প্রত্যক্ষ করুন।”

স্বকঠোর
অহুতাশ
↑
*

প্রায় সমস্ত রাত্রি ধরিয়া এই অদ্ভুত কাণ্ড চলিল। অবশেষে তাঁহারা অত্যন্ত পরিশ্রান্ত ও নিষ্কর্ষবোধে হইয়া পড়িলে বৃদ্ধ জল আনিয়া দিলেন, সেই জলে যুবকগণ হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া পরিচ্ছন্ন পরিবর্তন

করিলেন। তাঁহাদের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জানিবার জন্ত আমার বিশেষ কৌতূহল জন্মিলেও আমি সে কৌতূহল প্রকাশ করিতে পারিলাম না, কিন্তু উৎকর্ষায় সমস্ত রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া, আর কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া, আমি যুবকগণকে বলিলাম, “আমার অদৃষ্টে বাহাই থাকুক, আপনারা আপনাদের এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ খুলিয়া বলুন, আমি আর কৌতূহল দমন করিতে পারিতেছি না।” কিন্তু তাঁহারা কোন কথাই প্রকাশ করিলেন না। করেক রাত্রি ধরিয়া আমি তাঁহাদিগের সেই একই প্রকার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলাম।

কৌতূহলের
বিপদ



প্রভাত্য এই অদৃত ও বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া, আমি বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম এবং সেই যুবকগণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “কোন পথে আমি স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিতে পারি, বলিতে পারেন কি, আমি আর এখানে থাকিতে ইচ্ছুক নহি, কারণ, ক্রমাগত একই প্রকার বিরক্তিকর বাপার দেখিয়া আমার ধৈর্য নষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ এই অপূর্ণ ব্যবহারের কারণ কি, তাহা জানিতে পারিতেছি না।” আমাকে এইরূপ আক্ষেপ করিতে শুনিয়া একজন যুবক বলিলেন,—“বন্ধু, আমরা যে কথা আপনার নিকট প্রকাশ করি নাই, তাহা গোপনে রাখিবার অর্থ এই যে, ইহাতে ভবিষ্যতে আপনিও আমাদের স্থায় দ্রবস্থায় না পড়েন, তাহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আপনি যখন ইহা জানিবার জন্ত প্রতিনিয়ত যৎপরোনাস্তি কৌতূহল প্রকাশ করিতেছেন, তখন আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতেছি।”

আমি অধীরভাবে বলিলাম, “বলুন, আমার এই কৌতূহলের জন্ত যদি আমাকে কোন প্রকার শাস্তিভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে সেজন্ত আমি আপনাদিগকে অপরাধী মনে করিব না।” যুবক বলিলেন, “আপনি যখন আমাদের স্থায় অবস্থায় পতিত হইবেন, তখন আর আমাদের সহিত মিশিতে পারিবেন না, কারণ, আমাদের সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে, আমাদের দলে দশজনের অধিক ব্যক্তির স্থান নাই।” এই কথা শুনিয়াও আমি বিচলিত হইলাম না ;—বলিলাম, “দ্রষ্টব্যাক্রমে যদি আমাকে আপনাদের স্থায় এক চক্ষুহীন হইতে হয়, তাহা হইলে আমি আপনাদের দলরন্ধি না করিয়া নিজের পথ নিজেই দেখিয়া লইব।”

আকাশ-পথে
প্রেমিক
চালান।



যুবকগণ আমাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখিয়া, একটি বৃহৎ মেঘ বধ করিলেন এবং তাহার চক্ষু ছাড়াইয়া গাইয়া, আমার হস্তে একখানি ছুরি দিয়া বলিলেন, “এই ছুরি লউন, ভবিষ্যতে ইহা দরকারে লাগিবে। আপনাকে আমরা এই মেঘচর্মের মধ্যে পুরিয়া ইহা সেলাই করিব এবং তাহা অদূরে কোন অনারত স্থানে রাখিবার প্রস্থান করিব। আপনি এই চর্মের মধ্যে গোপনে অবস্থান করিবেন ; কিছু কাল পরে একটি অতি সুবৃহৎ বকপক্ষী আসিয়া মেঘ ভ্রমে আপনাকে নখে ধরিয়া আকাশে উড়িয়া যাইবে, কিন্তু আপনি ইহাতে ভীত হইবেন না। কিছুকাল আকাশে উড়িয়া সেই পক্ষী আবার পৃথিবীতে ফিরিয়া আদিবে এবং একটি পরর্তের শব্দে আপনাকে নামাইয়া ধাইবার উপক্রম করিবে। আপনি যে মুহূর্ত্তে বৃক্ষিবেন, আপনাকে পাহাড়ের উপর নামাইয়াছে, তৎক্ষণাৎ এই ছুরি দ্বারা মেঘচর্ম বিদাণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িবেন, বিলম্ব করিলেই আপনাকে পক্ষীর উদরস্থ হইতে হইবে। যাহা হউক, চর্মের ভিতর হইতে আপনাকে বহির্গত হইতে দেখিয়া, বকপক্ষী ভয়ে উড়িয়া যাইবে। অনন্তর আপনি সেই পর্ত্তশূল হইতে নামিয়া দূরে যে একটি রাজপ্রাসাদ তুল্য অট্টালিকা দেখিতে পাইবেন, সেই স্থানে গমন করিবেন। আমরা সকলেই সেই অট্টালিকায় অবস্থান করিয়াছিলাম, কিন্তু সেখানে উপস্থিত হইয়া আমরা যাহা দেখিয়াছি বা যাহা যাহা ঘটয়াছে, তাহা আপনার নিকটে প্রকাশ করিব না, সে অভিজ্ঞতা আপনি স্বয়ং সঞ্চয় করিবেন।”

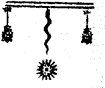
যুবক এই কথা বলিয়া আমাকে সেই মেঘচর্মে পুরিয়া, চর্ম সেলাই করিলেন এবং আমাকে একটি অনাবৃত হানে রাখিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটি বকপক্ষী আসিয়া আমাকে নথরে ধরিয়া গগনমার্গে উড়িয়া গেল। বহুক্ষণ উড়িয়া সে এক পর্বতশৃঙ্গে উপবেশন করিল। আমি সেই মুহূর্তে হস্তে ছুরিকা ধরা সেই মেঘচর্ম বিদীর্ণ করিয়া, তাহা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম; বকপক্ষী আমাকে দেখিয়া ভয়ে উড়িয়া পলাইল। দেখিলাম, পক্ষীটির বর্ণ সাদা, আকার অতি সুবৃহৎ; দেহ দেখিয়া বোধ হইল, সে দশ বিশটা হস্তী তাহার নথরে তুলিয়া আকাশে উড়িয়া যাইতে পারে।

আমি সেই পর্বতশৃঙ্গ হইতে নামিয়া পূর্ববর্ণিত অট্টালিকার উপস্থিত হইলাম। অতি সুন্দর অট্টালিকা, তাহার একশতটি দ্বার, একটি কক্ষের দ্বার সুবর্ণনির্মিত, অবশিষ্টগুলি চন্দনকাঠিনির্মিত। এমন সুন্দর সুসজ্জিত অট্টালিকা জীবনে কোথাও দেখি নাই।

আমি ভিন্ন দ্বারপথে একটি প্রশস্ত সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, চল্লিশ জন অল্পম্ন রূপবতী যুবতী সেই কক্ষে আমোদ-প্রমোদে মত্ত আছেন, তাহারা সকলেই পরীর ভায় সুন্দরী, বসনভূষণ দেখিয়া সকলকেই এক একটি রাজকন্যা বলিয়া মনে হইল। আমাকে দেখিলামাত্র তাহারা মহানন্দে একবাক্যে বলিলেন, “সাহসী যুবক, আপনার শুভাগমনে আমাদের গৃহ পবিত্র হইল, দয়া করিয়া ভিতরে আসুন।” আমি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতেই একটি সুন্দরী বলিলেন, “আমরা অনেক দিন হইতে আপনার ভায় একটি প্রেমিকের প্রতীক্ষা করিতেছি, আপনি পরম সুন্দর, সুবাসিক; আপনাকে দেখিয়া বোধ হইতেছে আমাদের সাহচর্য আপনার অপ্রীতিকর হইবে না।” তাহারা মহাসমাদরে আমাকে একটি উচ্চাসনে বসাইলেন, আমি সেই আসনগ্রহণে কিছু সন্ধ্যাচ প্রকাশ করিলে, যুবতীগণ বলিলেন, “সে কি মহাশয়, এখানে আপনার সন্ধ্যাচ কি? ইহা আপনার গৃহ বলিয়া মনে করিবেন। আপনি আমাদের প্রভু, আমরা দাসী, আপনি বাহা বলিবেন, কার-মনোবাক্যে আমরা তাহাই পালন করিব।” পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত পদার্থ দেখিরাছি, জীবনে অনেক আশ্চর্য কাণ্ড ও ঘটনা আছে, কিন্তু এমন অপূর্ণ ব্যাপার আর কখনও দেখি নাই। একজন অপরিচিত, দুহাঙ্গনস্পর্হীন, অসহায় আগন্তকের প্রতি সুন্দরী-কুলগরবিনী যুবতীগণের সোহাগ নিবেদনের আগ্রহ ও পরিচর্যা দেখিয়া ঐন্দ্র-জালিক ব্যাপার বলিয়া আমার বোধ হইতে লাগিল। আমি সুন্দরীগণকে আমার জীবনের কাহিনী সবিস্তারে বলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইলে, যুবতীগণের কেহ কেহ উঠিয়া আলোকের বন্দোবস্ত করিতে গেলেন, কেহ কেহ আমার কাছে বসিয়া নানা সোহাগে ও গল্পে আমার মনে আনন্দসঞ্চার করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে উজ্জ্বল আলোকমালার সেই সুবৃহৎ প্রাসাদ আলোকিত হইয়া উঠিল; এমন উজ্জ্বল আলোক যে, স্বর্য়ালোক ও তাহার নিকটে লজ্জা পায়। বিলাস-লাগন্য শব্দিক হইতে শতধারার উচ্ছৃঙ্খিত হইতে লাগিল।

রাত্রিকালে মহাসমারোহে পানভোজন চলিতে লাগিল। সুপেয় মদ্যের স্রোত অশ্রান্তধারায় প্রবাহিত হইতে লাগিল; সুন্দর গীত ও সুশ্রাব্য বায়ো চতুর্দিক উৎসবময় হইয়া উঠিল; নদ্যারাত্রি পর্যন্ত এই প্রকার আনন্দোৎসব চলিল। অনন্তর রজনীগণ আমাকে স্বাধোদনপূর্বক আদরভরে বলিলেন, “দীর্ঘপথ-পৰ্যটনে আপনি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এখন বিশ্রাম করাই কর্তব্য, আপনি আমাদের মধ্য হইতে বাহ্যকে ইচ্ছা বাছিয়া লউন। আমরা চল্লিশজন আছি। প্রতি রাত্রেই আপনি বাহ্যকে ইচ্ছা এক একজনকে শয্যাসঙ্গিনী করিতে পারিবেন। তবে আজ বাহ্যকে শয্যাসঙ্গিনী করিবেন, কাল তাহাকে পাইবেন না। আবার ৩০ দিন পরে তাহাকে পাইতে পারিবেন।” আমি সেই তরুণী সুর-সুন্দরীগণের মধ্য হইতে একজন রজনীকে বাছিয়া লইলাম। তিনি আমার সঙ্গে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। অবশিষ্ট উনচল্লিশটা যুবতী সেই রাত্রির মত আমার নিকট

আমোদ-সাহসের
রূপশী বসিনী-
মলে এক
প্রেমিক



ঐন্দ্র-বিহারের
প্রেমিকা



বিদায়চূড়ন গ্রহণ করিয়া, স্ব স্ব কক্ষে বিশ্রামার্থ প্রবেশ করিলেন। সমস্ত রজনী মদনোৎসবে অতিবাহিত হইল। আমি যৌবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া পরমানন্দে বিনীত রাত্রি যাপন করিলাম।

প্রেমের সঙ্গে
কপ-মহিয়ার
যৌবন-মিলন



এই সুবিকীর্ণ সুন্দর প্রাসাদে, অঙ্গুরীর ভায় চলিষ্ঠা পরমা সুন্দরী রমণীর সহবাসে আমার জীবনের একটি বৎসর পরমমুখে একটি নিশাসের ভায় অতিবাহিত হইল, কোন প্রকার লালসা-তৃষ্ণি—প্রেমসুখা পানের বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

এক বৎসর অতিবাহিত হইলে, সেই চলিষ্ঠজন মনোমোহিনী এক দিন প্রভাতে অশুপূর্ণলোচনে আমার নিকটে উপস্থিত হইয়া কাতরভাবে বলিলেন, “রাজপুত্র, বিদায়, আজ আমরা আপনার নিকটে বিদায় লইব।”



রাজমহী-
বাঁকেল
বিদায়
জ্ঞান-
নায়া

প্রেমের সঙ্গে
বিবাহের
বজ্রপাত



সুন্দরীগণের কথা শুনিয়া আমার মস্তকে বেন বজ্রপাত হইল। তাঁহাদের বিবাহ কাতরতা ও অশু দেখিয়া আমার সকল সুখ, সকল আনন্দ, মন হইতে অস্থহিত হইয়া গেল। আমি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহারা মহা আমাকে কি অপরাধে পরিত্যাগ করিতেছেন? তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, “রাজপুত্র, আমাদের কাহিনী প্রবণ করুন, আমরা সকলেই রাজকন্যা। এখানে আমরা সকলে কি ভাবে প্রেমোদ-স্রোতে গা ভাসাইয়া দিনযাপন করি, তাহা দেখিয়াছেন। এক বৎসর আমাদের এখানে স্বাধীনভাবে বাস করিবার অধিকার আছে, কিন্তু বৎসরান্তে চলিষ্ঠদিন আমাদেরকে হানাস্তরে থাকিতে হয়;—আমরা কোথায়, কি ভাবে থাকিব, তাহা আপনার নিকট প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের নাই। এই

চলিষ্ঠদিন পরে আবার আমরা এখানে কিরিয়া আসিব। আগামী কলা বৎসর শেষ হইবে, সুতরাং আজই আমাদেরকে এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতে হইবে; এ জন্তই আন্ত বিরহের আশঙ্কার আমরা একরূপ কাতর হইয়াছি। আপনার ভায় হ্রসিক আমোদপ্রিয় প্রেমিকের বিরহ অসহ্য।”

আমরা এই প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবার পূর্বে ইহার চলিষ্ঠটি বিভিন্ন কক্ষের চাবী আপনার হস্তে প্রদান করিয়া যাইতেছি। আপনি ইচ্ছানুসারে সকল কক্ষই খুলিতে পারেন, কিন্তু আমাদের বিশেষ অঙ্গরোধ, যে কক্ষে সুবর্ণখণ্ড আছে, তাহা কদাচ খুলিবেন না; যদি খোলেন, তাহা হইলে আর জীবনে আমাদের

সহিত আপনাদের সাক্ষাতের আশা থাকিবে না। কোঁতুহলের বশবর্তী হইয়া, আপনি সেই কক্ষ খুলিলেই আপনাদের মহা অমঙ্গল ঘটবে। আপনি যদি চল্লিশ দিন মাত্র এই কোঁতুহল দমন করিয়া থাকিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার আপনাদের সহিত আমাদের সাক্ষ্য হইবে, এক বৎসর আবার আমরা প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া পরমসুখে কালাপন করিব।” স্বন্দরীগণের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, আমি অপরূপলোচনে তাঁহাদের প্রত্যেককে চুম্বন করিয়া, বিদায় প্রদান করিলাম।

বিদায়-চুম্বন

চল্লিশটি বিভিন্ন কক্ষের চারি আমার কাছেই ছিল, আমি এক এক দিন এক একটি কক্ষ উন্মুক্ত করিয়া, তাহার ভিতরের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। এক একটি কক্ষের প্রান্তভাগে এক একটি সুরমা বাগান। কোথাও ফলের বাগান, নয়নানন্দকর সহস্র সহস্র সুগন্ধি কুসুম বিকসিত হইয়া চতুর্দিক সুরভিত করিতেছে; কোথাও ফলের বাগান, শত শত বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষে সুগন্ধি সুমধুর ফল শোভা পাইতেছে। কোথাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নির্যাস; কৃত্রিম প্রস্রবণ, তাহা হইতে হীরকচূর্ণের দ্বারা ফটিকবিল জলধারা অশ্রুভরণে উৎসারিত হইতেছে এক তাহাতে স্বর্ণাকিরণ প্রতিফলিত হইয়া মনোহর ইন্দ্রধনুর সপ্তবর্ণ বিকাশ করিতেছে। বৃক্ষে বৃক্ষে পক্ষীর কুজন, ছায়ার সমীরণের পুলক-হিলোল;—আমি একাকী মহানন্দে সেই সকল কক্ষ ও তাহাদের সমীপবর্তী উপবন ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এতদ্বির কত কক্ষ কত অদ্ভুত ও অদৃষ্টপূর্ণ সামগ্রী নিরীক্ষণ করিলাম, কত হীরক ও রত্নতুণ্ডের ধরে সম্ভিত দেখিলাম, পৃথিবীর কত দুঃখাণা ও মহাখ্যা সামগ্রীর একত্র সমাবেশ দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ঠাকুরানি, এক রাত্রির মধ্যে সে সকল কথা বলিবার সময়ও নাই। তবে সেই সকল সামগ্রী দেখিয়া আমার মনে হইল, ধন্য আমি, আমি এই বিপুল ঐশ্বর্যের একমাত্র অধিকারী। এই ভাবে আমি উনচল্লিশ দিনে উনচল্লিশটি কক্ষ খুলিয়া তাহার মধ্যবর্তী সকল পদার্থ দেখিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিলাম। স্বর্ণধারবিশিষ্ট কক্ষটির ভিতর না জানি কি অপরূপ পদার্থ আছে ভাবিয়া, আমি অত্যন্ত কোঁতুহলাক্রান্ত হইয়া উঠিলাম, চল্লিশ দিনের দিন সে কোঁতুহল সংবরণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল, স্বন্দরীগণের নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা রক্ষা করিতে পারিলাম না,—সেই কক্ষ খুলিয়া ফেলিলাম।

কক্ষবার উন্মুক্ত করিতেই একটি অতি সুন্দর গন্ধ আমার নাসিকার প্রবেশ করিল। কিন্তু তাহা এরূপ তীব্র যে, সেই গন্ধে আমার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। যাহা হউক, আমি লীলাই সুস্থ হইলাম। অনেক-ক্ষণ ধার খুলিয়া রাখিলাম, গন্ধ কিছু কমিলে আমি গৃহনধ্যে প্রবেশ করিলাম;—দেখিলাম, সুবর্ণনির্মিত দীপাধারে শত শত দীপ জলিতেছে, সেই সকল দীপে বহুবিধ সুগন্ধবিশিষ্ট তৈল জলিয়া এক প্রকার অদ্ভুত মিশ্রগন্ধ উৎপাদন করিয়া চতুর্দিক সুরভিত করিতেছে।

সেই গৃহে অনেক আশ্চর্য্য বস্তু ছিল, তন্মধ্যে একটি সুবৃহৎ কক্ষবর্ণ অবহি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমন সুন্দর অবহি আমি আর কখনও দেখি নাই। ইহার লাগাম ও জিন প্রভৃতি সুরঞ্জম সুবর্ণালঙ্কৃত। ইহার পাশ্চাত্যালীর এক দিকে উৎকৃষ্ট বব ও অত্রদিকে গোলাপগন্ধি সুগন্ধ জল রহিয়াছে। অখণ্ট দেখিয়া তাহার উপর আরোহণ করিবার জন্ত আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিল। আমি তাহাকে খুলিয়া তাহার জিন লাগাম ভাল করিয়া পরীক্ষা করিলাম; তাহার পর তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তাহাকে চালাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে অচল রহিল। তখন তাহাকে চাবুক দ্বারা আঘাত করিলাম, আঘাত-মাত্রেরে অখণ্ট চীৎকারপূর্ব্বক দুইখানি পাখা মেলিয়া আমাকে পৃষ্ঠে লইয়াই আকাশে উঠিল। ক্রমে পরিস্ফুটান পৃথিবী অদৃশ্য হইয়া গেল, ভয়ে আমার মাথা ঘুরিতে লাগিল। অনেক উচ্চ উঠিয়া

কোঁতুহলের
পরিণাম

অখট পৃথিবীতে অবতরণ করিতে লাগিল, তাহার পর একটি বৃহৎ অট্টালিকার ছাতের নিকট আসিয়া এমন ভাবে তাহার সর্বাঙ্গ বাড়া দিল যে, আমি তাহার পিঠ হইতে ছাদের উপর পড়িয়া গেলাম; তখন সে তাহার লেজের এক আঘাতে আমার দক্ষিণ চক্ষুটি নষ্ট করিয়া মুকুপক্ষে পণ্যারন করিল এবং মুহূর্ত্তমধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি ছাদ হইতে নামিয়া গৃহকে প্রবেশপূর্বক দেখিলাম, যে অট্টালিকার আমি দশজন একচক্ষু যুবকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলাম, ইহা সেই অট্টালিকা। চক্ষুর বাতনার আমি কাতর হইলাম এবং আমার পূর্বপরিচিত যুবকগণের সহিত সাক্ষাৎ কবিরার জন্ত উৎসুক হইয়া উঠিলাম, কিন্তু তখন তাঁহারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

প্রেমিকের-
আকাশ
অভিমান



পক্ষি-
রাভ
মোড়া



অনেকক্ষণ প্রতীক্ষা করার পর তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইলেন। আমার অবস্থা দেখিয়া তাঁহারা কিছুদূর বিস্মিত হইলেন না। আমি তাঁহাদিগকে জানাইলাম, আমার এই শোচনীয় অবস্থার জন্ত আমিই একবার দায়ী, তাঁহাদের কোন অপরাধ নাই। যুবকগণ বলিলেন, “এক বৎসরকাল মহানন্দে বাস করিয়া আমাদের যে দশা ঘটয়াছিল, আপনাকেও তাহাই ঘটয়াছে। কোভুহলবশে স্বর্ণদ্বারবিশিষ্ট কক্ষের দ্বার খুলিয়া আমরা যে বিভ্রম ভোগ করিয়াছি, আপনাকেও তাহাই ভোগ করিতে হইয়াছে, এক্ষেত্রে আপনি অধিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। যাহা হউক, আমরা আপনাকে আমাদের দলভুক্ত করিতে পারিলে স্বস্তি হইতাম, কিন্তু আমাদের দল পূর্ণ, আমাদের দলে আর আপনার স্থান হইবে না, আপনি সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী বোন্দাদনগরে গমন করুন, সেখানে নূতন শক্তিগণের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইবে।” যুবকগণ আমাকে পথের কথা বলিয়া দিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলাম। তাহার পর দাড়ি, গৌণ ও জু কাঁচিয়া ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া নানা স্থান ঘুরিতে ঘুরিতে আজ সন্ধ্যাকালে এই নগরে

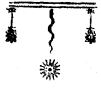
আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এখানে আমার ফকির বন্ধুদের সাক্ষাৎ পাইয়াছি। তাহার পর যাহা ঘটরাছে, আপনারা ভাড়া অবগত আছেন।

তৃতীয় কাণা ফকিরের কাহিনী শেষ হইলে, জোবেদী বলিলেন, “তোমরা তিনজন ফকিরই স্বস্থানে গ্রহণ করিতে পার, তোমাদের মুক্তিদান করিলাম।” ফকিররা বলিলেন, “অবশিষ্ট তিনটি ভঙ্গলোকের কাহিনী শুনিয়া তাঁহারা সেই স্থান ত্যাগ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। ইহাতে আশঙ্কি না হইলেই তাঁহারা সুখী হইবেন।” জোবেদী তখন খালিক হারুন-অল-রসিদ ও তাঁহার উজীর জাফরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

উজীর জাফর অত্যন্ত প্রত্যাশমত ছিলেন, খালিক কোন কথা বলিবার পূর্বেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, “ঠাকুরাণি, আমাদের নূতন কথা কিছুই বলিবার নাই, আমরা তিনজন মোঘলনগরের বশিক, পদাঙ্গবা লইয়া বোম্বাদে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছি। এক খা সাহেবের বাড়ীতে আমরা বাসা লইয়াছিলাম; একজন সদাগরের গৃহে আমাদের নিমন্ত্রণ ছিল, সেখানে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের আরোজন হইয়াছিল। প্রচুর পরিমাণে সুরাপান করিয়া, আমরা সকলেই কিছু কিছু বে-একতার হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের গোলমাল শুনিয়া নগরের শাস্তিরক্ষক প্রহরীগণ আমাদেরিকে আক্রমণ করিল, তখন আমরা আত্মরক্ষার জন্ত সেখানে হইতে পলায়ন করিলাম। যেখানে বাসা লইয়াছিলাম, তত রাত্রে সেখানে ঘর খোলা পাইব না মনে করিয়া, কোথায় গিয়া রাত্রে বাস করি, এই কথা চিন্তা করিতে করিতে এই পথ দিয়া যাইতেছিলাম, আপনাদের গৃহমধ্যে গীত-বাঞ্ছন শুনিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছি। তাহার পর যাহা ঘটরাছে, সকলই আপনি জানেন।” সকল কথা শুনিয়া জোবেদী কিয়ৎকাল নির্বাক রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি উজীর জাফরের কথা বিশ্বাস করিলেন না। ফকির তিনজন তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া এই ছদ্মবেশী সদাগরদ্বয়কে মুক্তিদানের জন্ত অনুরোধ করিলেন। জোবেদী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, তাঁহাদের সকলকেই সে স্থান পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ অবিলম্বে পালিত হইল। আগন্তুকগণের প্রস্থানের পর গৃহদ্বার রুদ্ধ হইল।

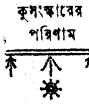
পরে আসিয়া ছদ্মবেশী খালিক ফকিরদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়গণ, এখন আপনারা কি করিবার অভিপ্রায় করিতেছেন?” ফকিররা বলিলেন, “এখনও রাত্রি শেষ হয় নাই, আমরা এ নগরে নূতন আসিয়াছি, এ রাত্রে কোথায় বাইব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।” খালিক বলিলেন, “আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাদিগকে আশ্রয় দিব।” অনন্তর তিনি উজীরের কাণে কাণে বলিলেন, “ফকিরদিগকে আজ তোমার গৃহে লইয়া যাও, কাল প্রভাতে ইহাদিগকে রাজসভায় উপস্থিত করিবে; ইহাদের কাহিনী বড়ই অদ্ভুত, আমার রাজসভার ইতিহাসে ইহা স্থায়ীভাবে যোগ্য; অতএব ইহা বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে।” অতঃপর খালিক তাঁহার প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন। শয্যা শয়ন করিয়াও তাঁহার মিস্রা হইল না, কুতূহ লইয়া জোবেদী ও আমিনার অপূর্ণ ব্যবহার এবং আমিনার বন্ধের আবাতিচক্রে ইতি-বৃত্ত-জানিবার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলেন। পরদিন প্রভাতে খালিকের আদেশে তিনটি কাণা ফকির, জোবেদী, আমিনা ও সফী রাজসভায় নীত হইলেন, এবং খালিক গত রাত্রে প্রসঙ্গ তুলিয়া, তাঁহাদের ইতিহাস জানিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে, জোবেদী তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

উজীরের
কাহিনী!



স্বপ্নতান-সভায়
বহুত-বিস্ময়





আলোকিত, একখানি কুদ আসনে একটি স্তম্ভের যুবক উপবেশন করিয়া মধুর-স্বরে কোরোণ পাঠ করিতেছেন। আমি উচ্চৈশ্বরে আন্নার নাম করিয়া আমার প্রতি যুবকের মনোযোগ আকর্ষণ করিলাম। যুবক পাঠ বন্ধ করিয়া সবিশ্বরে আমার দিকে চাহিলেন এবং আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি সংক্ষেপে আমার পরিচয় দিয়া, তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম এবং একপ স্তম্ভের নগরের এমন চূর্ণা কেন হইল, কোন্ অপরাধে নগরবাসিগণ সকলেই পাষাণে পরিণত হইলেন, তাহাও জানিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলাম।

যুবক কোরোণপাঠ বন্ধ করিয়া বলিলেন, “দেখিতেছি, আপনি বিদেশী, কিন্তু আপনি এখানে উপস্থিত হইয়া মহিমাময় আন্নার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে বসিলেন, আপনি সত্যার্থের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছেন। আমার পিতা এই দেশের রাজা। আমার পিতা, তাঁহার সত্যসদ্বর্ণ ও তাঁহার প্রজামণ্ডলী এবং নগরবাসিগণ সকলেই অগ্নির উপাসক ছিলেন, এতদ্বির তাঁহারা ঈশ্বরের বিদোহী দৈত্যগণের অধিপতি নার্কুনের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাসবান ছিলেন।

আমার পিতা মাতা জড়োপাসক ছিলেন বটে, কিন্তু দৌভাগ্যক্রমে আমার বাত্নী সত্যার্থে দীক্ষিতা ছিলেন, কোরাণে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল এবং সমস্ত কোরাণখানি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি আমাকে যথানিঘনে আরবীভাষা শিখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট আমি কোরাণ পাঠ করিতে শিখিয়াছিলাম। কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু হইল, কিন্তু আমার জন্মে সত্যার্থের উজ্জ্বল মহিমা সুপরিষ্কৃত হইয়াছিল, জড়োপাসনাকে আমি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতে লাগিলাম।

কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর অতীত হইল, একদিন নগরবাসিগণ সকলে স্তম্ভের গুনিতে পাইল, কে কোথা হইতে বলিতেছেন, ‘নগরবাসিগণ! তোমরা তোমাদের কুসংস্কারাজ্ঞের মিথ্যার্থ পরিভাগ করিয়া সত্যস্বরূপ আন্নার ভজনা কর, তিনি তোমাদের প্রতি অবগ্রহ দণা করিবেন।’



এইরূপে তিন বৎসর প্রত্যহ নগরবাসিগণ এই প্রকই আদেশ শ্রবণ করিল, কিন্তু তাহাদের চৈতন্যোদয় হইল না, তাহারা তাহাদের মিথ্যার্থ পরিভাগ করিয়া সত্যস্বরূপ আন্নার উপাসনার মনোযোগি হইল না। ইহার কয়েক মাস পরে, একদিন শেষবাত্রিতে নগরবাসিগণ সকলেই, এমন কি, আমার পিতা-মাতা পর্য্যন্ত প্রস্তর-মুহুর্তে পরিণত হইলেন। আমিই এই রহৎ পুরীতে সত্যস্বরূপ আন্নার ভজনা করিতাম, স্তব্ধ আমিই কেবল জীবিত রহিলাম।”

যুবকের এই উপাখ্যান শুনিয়া, তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা সমরিক বদ্ধিত হইল, আমি তাঁহাকে এই নিরুজন নগর পরিভাগ করিয়া আমাদের পরমধার্মিক মহামতি খালিসের রাজধানী বোন্দাদ নগরে গমন করিবার জন্ত অনুরোধ করিলাম এবং আমার জাহাজে তাঁহাকে লইয়া বাইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলাম। যুবক আন্নের সহিত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন প্রভাতে সেই রাজপ্রাসাদ পরিভাগ করিয়া বহু মণিমাণিক্যসহ সমুদ্রের বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম,—দেখিলাম, আন্নার অদর্শনে ভগিনীস্বয় এবং কর্ম্ম-চারী ও ভূতগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে কালখাপন করিতেছেন। আমি তাঁহাদের নিকট যুবকের পরিচয় দান করিলাম এবং সেই নগরের অধিবাসিগণের অস্তুত নিরতির কথা ব্যক্ত করিলাম।

অনন্তর জাহাজ হইতে বহুসংখ্যক পণ্যদ্রব্য বন্দরে নামাইয়া রাখি। এই নগরের অত্যাংকুট ও মহামূল্য দ্রব্যসমূহ যতগুলি সম্ভব জাহাজে তুলিয়া লইলাম এবং উপযুক্ত পরিমাণে খাজদ্রব্যাদি লইয়া জাহাজ ছাড়িয়া দিলাম। জাহাজ বোন্দাদ অভিমুখে বাত্না করিল।



জাহাজের উপর কয়েক দিন পরমানন্দে অতিবাহিত হইল, কিন্তু মানুষের স্বপ্ন অত্যন্ত অচিরস্থায়ী ; জাহাজে রাজপুত্রের সহিত আমার সম্ভাব্য দর্শনে আমার ভগিনীদ্বয়ের মনে ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। আমি আমার ভগিনীদ্বয়কে অধিকতর ঈর্ষাকুল করিবার জন্ত বলিলাম, “আমি এই প্রিয়দর্শন যুবককে স্বদেশে লইয়া গিয়া বিবাহ করিব।” তাহার পর যুবকের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আমার অভিপ্রায়ের কথা জানাইয়া বলিলাম, আমার ভগিনীদ্বয়কে অধিকতর সম্ভ্রান্ত করিবার জন্তই আমি তাহাদের নিকট একরূপ কথা প্রকাশ করিগাছি। ইহা যে কেবল ছলনা মাত্র, এ কথা যেন তিনি বুঝাঙ্করেও প্রকাশ না করেন। এই কথা শুনিয়া যুবক বলিলেন, তিনি সম্ভ্রান্ত আমার প্রতি আন্তরিক অমুরক্ত হইয়াছেন, ছলনা করা তাহার অভিপ্রেত নহে, বোম্বাদ নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি আমাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিবেন, একরূপ অঙ্গীকার করিলেন। যুবকের এই কথা আমার ভগিনীদ্বয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল ; আমার প্রতি তাহাদের ক্রোধ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, তাহারা আমাকে শত্রু মনে করিতে লাগিলেন।

স্বাভাস পাইয়া জাহাজ বেশ চলিতে লাগিল। ক্রমে আমরা পারস্ত উপসাগর পার হইয়া, বালসোরার সমীপবর্তী হইলাম। এমন সময় একদিন রাত্রিকালে আমাকে ও সঙ্গী যুবককে নিদ্রিত দেখিয়া, আমার ভগিনীদ্বয় আমাদের ছইজনকেই জাহাজ হইতে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল। ভূভাগক্রমে যুবকট সমুদ্রগর্ভেই প্রাণত্যাগ করিলেন ; দৈবক্রমে আমার প্রাণরক্ষা হইল, আমি ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম, এবং বালসোরার কূড়ি মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে আসিয়া লাগিলাম। তীরে উঠিয়া সূর্য্যাকিরণে বস্ত্র-শুকাইয়া আমি বৃক্ষচ্ছায়ায় গমন করিলাম। এই দ্বীপে অনেক স্তম্ভিত ফলের গাছ ও স্তম্ভেয় জলপূর্ণ নিষ্করীণি ছিল।

বৃক্ষমূলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিলাম, পক্ষিবিষ্ঠ একটি বৃহৎ সর্প আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে, এবং পুনঃ পুনঃ জিহ্বা প্রসারিত করিতেছে। আমি বৃষ্ণিলাম, সর্পটি কোনরূপে বিপন্ন হইয়াছে ; আমি উঠিয়া তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম, একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ সর্প তাহাকে গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া আকর্ষণ করিতেছে। আমি এই বিপন্ন সর্পটির অবস্থা দর্শনে তাহার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া একথণ্ড বৃহৎ প্রস্তর উত্তোলন পূর্ব্বক সজোরে তাহার শত্রুর মস্তকে আঘাত করিলাম। সেই আঘাতে বৃহৎ সর্পটির মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপে বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া অত্র সর্পটি পক্ষিবস্তার পূর্ব্বক উড়িয়া গেল। আমি কতক্ষণ সেই বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিদ্রিত লইয়া পড়িলাম।

নিদ্রাভঙ্গে চাহিয়া দেখিলাম, একটি কাক্রী রমণী দুইট কুকুরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া, আমার পাশে বসিয়া আছে। আমি উঠিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলাম। কাক্রী রমণীট মবিনয়ে বলিল, “আপনি দয়া করিয়া যে সর্পটিকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আমিই সেই সর্প। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, তাহার প্রতাপকারস্বরূপ আপনীর দুই বিষমবাস্তিনী ভগিনীকে কুকুরে পরিণত করিয়া আপনীর হস্তে সমর্পণ করিতেছি। আমরা প্রকৃতপক্ষে সর্প নহি,—পরী। আমরা অনেক পরী মিলিয়া আপনীর জাহাজস্থ জবাবদি বোম্বাদ নগরে আপনীর বাড়ীতে রাখিয়া আসিগাছি, এবং আপনীর ভগিনীদ্বয়ের অধিকৃত জাহাজখানি সমুদ্রজলে ডুবাইয়া দিয়াছি। এই পাণ্ডুরসীমার প্রতি আমরা যে দণ্ডবিধান করিগাছি, তাহা যথেষ্ট নহে, ইহাদের প্রতি আরও গুরুতর দণ্ডবিধান করিতেছি। আমার আদেশ এই যে, ইহাদিগকে প্রত্যহ রাত্রে একশত ব্রোভাবত করিবেন, এই নিয়মের অস্তথা হইতে পারিবেন না, করিলে আপনাকে শাস্তি পাইতে হইবে। এই প্রকারেই ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।”

স্বপ্নরীম
বাগিচা
অভিধান
দখিত-লাত



পরী
প্রতিশোধ



হে পরমধর্মপরায়ণ নরপতিশ্রেষ্ঠ ! আপনি পূর্বরাত্রিতে কুন্তলদ্বয়কে যে বেত্রাঘাত করিতে দেখিয়াছেন, ইহাই তাহার কারণ। আমার প্রতি যৎপরোনাস্তি নির্দয় ব্যবহার করিলেও, ইহার আমার ভগিনী ; এই অঙ্গীভিক্তকর নির্ভর কর্তব্য পালন করিতে শোকে চুপে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়, সেই জন্মই আমি গ্রহাণের পর তাহাদের জন্ম জন্মন করিয়া থাকি। আমার ইতিহাস শেষ করিলাম, আপনি অজ্ঞ যে সকল কথা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা আমার ভগিনী আমিনার মুখেই শুনিতে পাইবেন।

খালিক হারুণ-অল-রসিদ জোবেদীর এই অকুত ও পরম বিষমকর উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎকাল তন্ত্বিত হইয়া রহিলেন, তাহার পর আমিনাকে তাঁহার বক্ষঃস্থলের দ্বতচিহ্নের কাহিনী বর্ণনা করিবার জন্ম অনুরোধ করিলে, আমিনা বীরে বীরে তাঁহার বক্তব্য বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

আমি-
নার
কাহিনী



জাহাপনা, আমার ভগিনী আপনার নিকট যে সকল কথা ইতিপূর্বে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার পুনরুল্লেখের কোন আবশ্যক নাই। পিতার মৃত্যুর পর আমার জননী এই নগরের একজন অতি প্রসিদ্ধ ও ধনাঢ্য সম্রাটের সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর সহিত আমার বিবাহ প্রদান করেন।

বিবাহের এক বৎসর পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল। বিধবা অবস্থায় আমি আমার পতির তাক্ত সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইলাম। আমার হস্তে প্রায় নব্বই হাজার টাকা, এই বিপুল অর্থের মূল্য হইতেই আমি অনায়াসে অবশিষ্ট জীবন সুখে অতিবাহিত করিতে পারিতাম, কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর ছয় মাসের মধ্যেই আমি দশটি পরিচ্ছদ নির্মাণ করাইলাম, ইহার প্রত্যেকটিতে হাজার টাকা খরচ পড়িল। শোকের সময় অতীত হইলে, আমি সেই সকল স্রষ্ট্র পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আমার রূপের গর্ল পরিষ্কৃত করিতাম।

একদিন আমি একাকী গৃহকর্মে ব্যস্ত আছি, এমন সময় আমার পরিচারিকা সংবাদ দিল, একটি রমণী কোন কারণে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আমি তাঁহাকে আমার নিকট আসিয়া দেখা করিতে বলিলে, শুনিলাম, সে অত্যন্ত বৃদ্ধা ; শুনিয়া আমি স্বয়ং গিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। রমণী আমাকে সমস্ত্রমে অভিবাদন করিয়া বলিল, “ভদ্রে, আপনার দরবার পরিচয় পাইয়াই আপনাকে বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি, আমার নিবেদন শ্রবণ করুন। আমার একটি পিতৃহীনা কন্যা আছে, আজ তাহার বিবাহ দিব। আমরা উভয়েই এ নগরে অপরিচিত, নগরের কাহারও সহিত আমাদের পরিচয় নাই, বিবাহে কোন সম্ভ্রান্ত সমাজস্থ লোক উপস্থিত থাকিবেন, তাহারও সম্ভ্রাবনা নাই, সেই জন্ম আমি আপনাকে অনুরোধ করিতেছি, দয়া করিয়া আপনি এই বিবাহে উপস্থিত থাকিলে শুভকর্ম্য মোটক-সহকারে স্নদস্পন্ন হইতে পারে। আপনি যদি আমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে আমার অন্তঃবিধা ও মনঃকষ্টের সীমা থাকিবে না।”

বৃদ্ধার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিতে লাগিল। তাহার অন্তঃকরণে বিচলিত হইয়া আমি সহানুভূতিভরে বলিলাম, “আপনি চিন্তিত হইবেন না, আমি আপনার এই অনুরোধ বক্ষা করিব। উপযুক্ত পরিচ্ছদে সজ্জিত হইতে আমার যে বিলম্ব, তাহার অধিক বিলম্ব হইবে না।” আমার কথা শুনিয়া বৃদ্ধার আনন্দের সীমা রহিল না। সে আমার প্রদত্তাশ্রে পড়িয়া মুক্তিকা চুষন করিতে লাগিল, কত কৃতজ্ঞতার কথা বলিল, তাহার সংখ্যা নাই। তাহার পর সে বলিল, সন্ধ্যাকালে সে আমার গৃহে উপস্থিত, হইয়া, আমাকে সঙ্গ করিয়া লইয়া যাইবে।

স্বন্দরীর
পরিচ্ছদ-বিস্তার



বৃদ্ধা চলিয়া গেলে আমি স্মৃদ্ধ পরিচ্ছদ ও বহুদ্রব্য হীরক-রত্নাকারে সুসজ্জিত হইয়া তাহার প্রতীক্য করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধা অত্যন্ত কষ্টে আমার সহিত শাশুৱা করিতে আসিল। সে আমার কর্ণচূষন করিয়া আনন্দভরে বলিল, “আমার জাভাতার আশীৰ্ব্বাদ ও পিতা মাতা সকলেই এ নগরে উপস্থিত হইয়াছেন। যে সকল স্মৃদ্ধী আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সম্ভ্রান্তবরের রমণী। আপনি এখন অল্পগ্রহ করিয়া, আমার সঙ্গে আসিলে ভাল হয়, আমি পথ দেখাইয়া যাইতেছি।” আমি কতিপয় পরিচারিকা সঙ্গে লইয়া, সেই বৃদ্ধার অনুসরণ করিলাম, একটি পরিচার্য্য পরিচ্ছদ বহু রাত্তা দিয়া আসিয়া, একটি প্রকাণ্ড গৃহঘরে উপস্থিত হইলাম; উচ্চ দোপাশোকে পাঠ করিলাম, গৃহঘরে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে,—“অশ্রান্ত আনন্দ-প্রমোদের আগম।”—এই দ্বার-সন্নিহিতে আসিয়া বৃদ্ধা ঘরে যাক্কা দিলে ভিতর হইতে লোক আসিয়া অবিলম্বে দ্বার খুলিয়া দিল।

আমি একটি সুসজ্জিত গৃহকক্ষে প্রবেশ করিতেই একটি পরমা স্মৃদ্ধী মহা সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া, আমাকে কাছে বসাইল;—বলিল, “ভগিনি, আপনাকে বিবাহে সাহায্যার্থ আন্ধান করা হইয়াছে বটে, কিন্তু যে ভাবে আপনি সাহায্য করিবেন ভাবিয়া আসিয়াছেন, আমাদের প্রার্থিত সাহায্য তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমার একটি ভ্রাতা আছেন, তিনি রূপবান্ ও সম্ভ্রান্তসমাজে বিশেষ পরিচিত, আপনার অসামান্য রূপের কথা শুনিয়া তিনি এমন মুগ্ধ হইয়াছেন যে, আপনাকে বিবাহ করিবার জন্য তিনি অধীর; যদি আপনি দয়া করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন, তাহা হইলে তিনি পৃথিবীতে নিজে সৰ্ব্বাপেক্ষা দোভাগ্যবান্ প্রেমিক মনে করিবেন। আপনার মান সম্মত ও খ্যাতি-প্রতিপত্তির কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তিনি আপনার অযোগ্য স্বামী হইবেন না। আমার প্রার্থনা আপনাকে পূর্ণ করিতেই হইবে, নতুবা আমাদের অজ্ঞ উপায় নাই।”

আমার স্বামীর মৃত্যুর পরে পুনর্বার বিবাহসংকল্প কোন দিন আমার মনে উদয় হয় নাই, এখন এই যুবককে বিবাহ করিবার প্রলোভন সম্মুখে দেখিয়া, আমি সেই প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। আমি মোনভাবে আমার সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। অল্পকাল পরে সেই গৃহে একটি পরমসুন্দর যুবা প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিলাম; বুঝিলাম, তিনি আমার পাণিগ্রহণে উৎসুক। আরও দেখিলাম, তাঁহার গুণ সম্বন্ধে সেই যুবতী যাহা বলিয়াছিলেন, তাঁহার গুণ তাহা অপেক্ষাও অনেক অধিক। আমি যুবকের সহিত আলোচনা মুগ্ধ হইলাম, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে আমার যোগ্য পতি জ্ঞান করিয়া মনে মনে তাঁহাকে আশ্রয়মর্পণ করিলাম।

সেই রাত্রিতেই কাকী আসিলেন, তিনি বখাশান্ত্র আমাদের বিবাহ দিলেন, চারিজন ভদ্রলোক আমাদের বিবাহের শাকী হইলেন। আমার নূতন স্বামী একটি বিষয়ে আমাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া গইলেন। আমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইল, আমার স্বামী ভিন্ন আমি অজ্ঞ কোন ব্যক্তির সহিত আলোচনা করিতে পারিব না, এমন কি, অজ্ঞ কোন পুরুষের মুখদর্শনও করিব না। আমার স্বামী প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি যদি আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়া চলি, তাহা হইলে তাঁহার সহিত আমার কোন দিন বিরোধ বা মনোমালিন্য হইবে না। আমাদের বিবাহ শেষ হইয়া গেল, অপরের বিবাহ দিতে আসিয়া নিজেই বিবাহ করিয়া ফেলিলাম।

রাত্রে আমি বাসরঘরে স্বামীর সহিত প্রমোদ-রজনী যাপনের জন্য উৎসুক হইলাম। আমার নূতন স্বামী যেমন প্রিয়দর্শন—তেমনিই মধুরভাষী। তিনি আমাকে বক্ষেদেশে নিপীড়িত করিয়া সহস্র চুম্বনে আলাদা অধীর করিয়া তুলিলেন। আমি এমন প্রেমিক স্বামী পাইয়া আনন্দে উৎকুর হইলাম। সমস্ত রজনী যৌবন-স্বপ্নে বিভোর হইয়া প্রেমভরঙ্গে ভাসিতে লাগিলাম।

নিমন্ত্রিতার
বিবাহ



দিলন-নিশি
যেন প্রভাত
না হয়।



ব্রাহ্ম
দুঃখীরাণী

বিবাহের এক সপ্তাহ পরে আমি কিছু রেশমী বস্ত্র কিনিতে বাজারে যাইবার জন্ত আমার স্বামীর অনুমতি প্রার্থনা করিলাম, আমার স্বামী তৎক্ষণাৎ অনুমতি দান করিলেন। আমি সেই বস্ত্র ও ছইজন পরিচারিকাকে লইয়া বাজারে চলিলাম। বাজারের পথে আসিয়া সেই বস্ত্র আমাকে বলিল, “ঠাকুরানি, আপনি যখন বাজারে আসিয়াছেন, তখন চলুন, আপনাকে আমার পরিচিত কোন সদাগর যুবকের দোকানে লইয়া যাই, সেই ব্যক্তির দোকানে যে সকল রেশমী জিনিষ পাওয়া যায়, তাহা অতি উৎকৃষ্ট। তাহা হইলে আপনাকে আর দোকানে দোকানে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইবে না, আপনি যে সকল দ্রব্য চাহেন, তাহা এক স্থানেই কিনিতে পাইবেন।”

বুদ্ধার পরামর্শ সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, আমি তাহার সহিত একটি যুবক সদাগরের দোকানে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, সদাগরটি পরম শ্রীমান। আমি বুদ্ধাকে যুবকের নিকট হইতে রেশমী বস্ত্রাদি লইয়া দেখাইবার জন্ত অনুরোধ করিলাম। বুদ্ধা আমাকে বলিল, “ঠাকুরানি, এখানে কেহ নাই, আপনি স্বয়ং যুবকে এই অনুরোধ করুন।” আমি তখন বুদ্ধাকে আমার বিবাহকালের সেই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিলাম;—বলিলাম, “আমি বিবাহকালে স্বামীর নিকট যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়াছি, তাহা লঙ্ঘন করিতে পারিব না।”



নিবন্ধ
রূপ
সুন্দর

বাহা হউক, সদাগর যুবক বুদ্ধার নারকতে আমাকে বহু-সংখ্যক রেশমী বস্ত্রাদি দেখাইলেন, তন্মধ্যে একখানি বস্ত্র আমার মনোনিতি হইল। আমি বুদ্ধার হস্ত দিয়া যুবকে তাহার মূল্য প্রদান করিলাম, কিন্তু সে বুদ্ধাকে বলিল, “আমি এই বস্ত্রবিনিময়ে মূল্য গ্রহণ করিব না, আমি এই বস্ত্র স্বন্দরীকে বিনামূল্যে প্রদান করিব, কিন্তু ইহার বিনিময়ে আমি এই যুবতীর নিকট একটি দ্রব্য প্রার্থনা করি,—আমি একবার তাহার মুখচুম্বন করিব।” আমি এই প্রস্তাবে বিরক্ত হইয়া বলিলাম, “যুবকের এই প্রস্তাব অত্যন্ত অপমানজনক ও রূঢ়।” বুদ্ধা আমাকে বুঝাইল, ইহাতে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের আশঙ্কা নাই; কারণ, আমাকে সেই যুবকের

সহিত কথা কহিতে হইবে না, কেবল গওস্থলে একটি চুম্বন গ্রহণ করিলেই কার্য শেষ হইবে। আমি সেই রেশমী বস্ত্রখানি লাভ করিবার জন্ত এতই উৎসুক হইয়াছিলাম যে, বুদ্ধার পরামর্শ অনুসারে যুবকের অনুরোধ রক্ষা

করিতে সন্মত হইলাম। বৃদ্ধা ও আমার পরিচারিকাগণ আড়াল করিয়া দাঁড়াইলে, যুবক আমার মুখচুম্বন করিল। কিন্তু কেবল মুখচুম্বনই নহে, হঠাৎ আমার গণ্ডদেশে দংশন করিয়া, অনেকখানি মাংস ভুলিয়া লইল,—সব্ব বন্ধ করিয়া আমার গণ্ডস্থল হইতে রক্তধারা বহিতে লাগিল।

আমি লজ্জার ও বেদনার মুচ্ছিত হইয়া পড়িলাম। দৌকানদার আমাকে তলবন্ধ দেখিয়া পলায়ন করিল। আমি মুচ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, আমার মুখ রক্তস্রোতে তাসিতেছে, অনেক লোক সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতেই আমার পরিচারিকাগণ আমার মুখ ঢাকিয়া দিয়াছিল, তাহারা সেই সকল লোককে প্রকৃত ঘটনা জানিতে না দিয়া বলিয়াছিল, আমার হঠাৎ মুচ্ছা হইয়াছে,—তিনিরা তাহারা তাহাই বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল।

অন্তঃপুর বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে বৃদ্ধা আমার নিকট ক্রমা প্রার্থনা করিতে লাগিল, এই ব্যাপারে যে তাহার কোন হাত নাই, তাহাই সে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। তাহার পর সে বলিল, সে এমন আশ্চর্য্য ঔষধ জানে যে, তাহা লাগাইলেই তিন দিনের মধ্যে আমার ক্ষত সম্পূর্ণ আরোপা হইতে পারিবে, ক্ষতচিরু পর্য্যন্ত থাকিবে না। আমি বড় চর্তুর্ভল হইয়া পড়িয়াছিলাম, বহু কষ্টে গৃহে ফিরিয়া আবার মুচ্ছিত হইলাম। বৃদ্ধা আমার ক্ষতে ঔষধ প্রয়োগ করিল, আমি মুচ্ছাভঙ্গে শয্যা শয়ন করিলাম।

রাত্রিকালে স্বামী গৃহে আসিলেন। আমার সুরক্ষিত গণ্ডে পটা জড়ান দেখিয়া তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, “আমার মাথা ধরিয়াছে।” ভাবিলাম, ইহা শুনিয়াই তিনি সন্তুষ্ট হইয়া থাকিবেন, আর কোন প্রশ্ন করিবেন না; কিন্তু দেখিলাম, আমার কথায় তাঁহার কোতুল মটিল না, তিনি আমার মুখের কাছে বাতী ধরিয়া গালের ক্ষত দেখিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, “এ হইয়াছে কি?” আমি তখনও সত্য গোপন করিয়া বলিলাম, “ভূমি আমাকে বাজারে বাইবার অহুমতি দিয়াছিলে, আমি বাজারে যাইতেছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে একটা মুটে এক জুটি কাঠ লইয়া বাইতে বাইতে একেবারে আমার ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে, তাহার একখানা কাঠ আমার গালে বিঁধিয়া গিয়া এই অবস্থা ঘটাইয়াছে। আবাত সামান্যই লাগিয়াছে।”

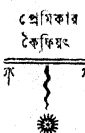
আমার এই কথা শুনিয়া আমার স্বামী বলিলেন, “এ বড় অস্ফাট কথা, কাল আমি রাজদ্বারে এ সম্বন্ধে স্তুতি প্রার্থনা করিব, এই মুটে বেটারা বড়ই অশাবধান, তাহাদের সকলকে দণ্ডিত না করিয়া আমি কখনই ক্ষান্ত হইব না।”

আমি এই কথা শুনিয়া, ভীত হইয়া, আমার স্বামীকে ক্রোধ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলাম;—বলিলাম, “এ অতি তুচ্ছ ঘটনা, ইহা লইয়া এতগুলি প্রাণীর উপর অত্যাচার করা সঙ্গত হইবে না, বিশেষতঃ মুটেরও সম্পূর্ণ দোষ নাই।”

আমার স্বামী বলিলেন, “তবে প্রকৃত ঘটনা কি, খুলিয়া বল, কিরূপে ক্ষত হইল?” আমি আবার নূতন ফন্দী জুটিলাম;—বলিলাম, “একটা লোক গাধার পিঠে ঝাঁটা বোঝাই করিয়া বাইতেছিল, পথের মধ্যে সেই গাধা ঝাঁটা সমেত আমার গায়ের উপর আসিয়া পড়ে, ঝাঁটার গাল কাটিয়া গিয়াছে।”

আমার স্বামী বলিলেন, “রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আমি উজ্জীর জাকরের নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল ঝাঁটা-বিক্রেতার মণ্ডপান্তরে ব্যবস্থা করিব।”

আমি বলিলাম, “প্রাণনাথ, আমার দোহাই, ভূমি ক্রোধ ত্যাগ কর। অনর্থক ঝাঁটা-বিক্রেতৃগণের উপর রাগ করিও না, তাহাদের বিশেষ দোষ নাই, আমি হঠাৎ মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহাতেই আমার এই দশা ঘটয়াছে।”





এই কথা শুনিয়া আমার স্বামী ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন,—সক্রেতে বলিলেন, “পান্সিদি, তোর মুখে অনেক মিথ্যাকথা শুনিয়াছি, আর অধিক মিথ্যা শুনিবার ইচ্ছা নাই।” অনন্তর তিনি ভৃত্যগণকে বলিলেন, “ছুকানিরীকে বিছানার উপর হইতে গৃহের মধ্যস্থলে লইয়া আয়।” তাহারা অবিলম্বে এই আদেশ পালন করিল। আমার স্বামী একজন ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, “একখানা খড়্গ দ্বারা এই ছুকানিরীকে মৃত্যুদণ্ডন কর, তাহার পর ইহার মৃতদেহ টাইগ্রিস নদীতে নিক্ষেপ কর, মাছে ইহার দেহ ভক্ষণ করুক। যাহারা আমার প্রমোদিনী হইয়াও বিশ্বাসঘাতিনী হয়, তাহাদিগের প্রতি আমি এইরূপ দণ্ডন করিয়া থাকি।”

স্বামীর এই কঠোর আদেশ শুনিয়া, আমি অনেক বিলাপ ও পরিতাপ করিলাম, তাঁহার দয়া প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল না। আমাকে বধ করাই তিনি স্থিরস্বকর করিলেন; কঠোরস্বরে তাঁহার ভৃত্যকে আদেশপালন করিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে আমার স্বামীর বৃদ্ধা.ধাত্রী সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন; তিনি আমার স্বামীকে ক্রোধ ত্যাগ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন, অনেক হিতবচনও বলিলেন, অবশেষে অশ্রুপূর্ণলোচনে আমার জীবনভিক্ষা চাহিলেন। স্বামী তাঁহার কাতরতায় বিচলিত হইলেন; অবশেষে বলিলেন, “আমি তোমার অনুরোধে পাণ্ডিত্যকে ক্ষমা করিতে পারি, কিন্তু তাহাকে দুঃস্বপ্নের প্রতিফল গ্রহণ করিতে হইবে।” অনন্তর স্বামীর আদেশে তাঁহার একটি ভৃত্য একগাছি স্বস্ত্র বেত্র ধারী এমন নির্দয়ভাবে আমার বক্ষে প্রহার করিতে লাগিল যে, আমার বক্ষের কোমল চর্ম ছিন্নবিছিন্ন হইয়া গেল, আমি সম্পূর্ণরূপে সংশ্লান্ত হইয়া পড়িলাম।

আমার স্বামী কেবল যে আমার প্রতি এই প্রকার অত্যাচার করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন, তাহা নহে, তিনি ক্রোধবশে ভূতাপগকে আদেশ করিয়া, আমার মূগ্ধজিত বাসগৃহে এবং পার্শ্ববর্তী অনেকগুলি বাড়ীও ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মত হৃদয়বান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট এমন নিদারিত্ব অত্যাচারের কল্পনা কোন দিনই করি নাই। কিন্তু রাজদ্বারে আমি কোনপ্রকার প্রতীকারকামনা করিতে পারিলাম না, কারণ, আমার স্বামীর কোন পরিচয়ই আমি জানিতাম না। তিনি এই নগরে সম্পূর্ণরূপে আত্মগোপন করিয়া বাস করিতেন। তাহার পর তাঁহার ক্ষমতা দেখিয়া, তাঁহাকে সাধারণ ব্যক্তি বলিয়াও আমার মনে হইল না, রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়াই বা কি ফল ভাবিয়া আমি নিরঙ্গম রহিলাম, এবং স্বামিগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়া আমার প্রিয়ভগিনী জেবেদীর নিকট উপস্থিত হইলাম।

আমার হৃৎকান্থিনী ভূনিয়া জোবেদীর ক্ষুদ্রে দরাসফার হইল, তিনি তাঁহার গৃহে আমাকে আশ্রয় দান করিলেন। তাঁহার মুখে তাঁহার জীবনের সকল ইতিহাস শ্রবণ করিলাম, রক্তবর্ণ কুকুর দুইটির ইতিহাসও তিনি আত্মপূরিক বলিলেন। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের কনিষ্ঠা ভগিনীও বিধবা হইয়া আমাদের নিকটে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কষ্টদিনের পরে আমার আমার তিন ভগিনীতে মিলিত হইলাম। আমরা জীবনের অবশিষ্ট কাল একত্র বাস করিতে রুতসংকল্প হইলাম। এখন আমরা কয় ভগিনীতে মিলিয়া পরমস্বখে একত্র বাস করিতেছি, গৃহের সকল ভার এখন আমার হস্তেই বহিয়াছে। আমি স্বয়ং মধ্যে মধ্যে বাজার করিতে যাই, গত কল্যাও গিয়াছিল্যাম, একজন মুটের মাথায় জীনসপত্র দিয়া বাড়ী লইয়া আসিলাম, মুটেটি সুরসিক ও মৃৎসিনী লোক দেখিয়া তাহাকে আর শীঘ্র যাইতে দিই নাই। তাঁহার কথাবাক্যের আমোদ পাওয়া বাইবে তাহা। তাহাকে থাকিতে বসিয়াছিলাম। সম্প্রকালে তিন জন ফকির আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করায় আমরা তাহাদিগকেও আশ্রয় দিই। তাহার পর মৌসমের তিনজন সপাগরের আবির্ভাব হইল। আমাদের দৈনিক কর্তব্য সম্পাদন করিতে দেখিয়া তাঁহারা প্রতিজ্ঞা তদ্রূপ করেন; আমরা

আমাদের অভিগণকে দিরা অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিল যে, তাঁহারা আমাদের কোন কার্যের কারণে সন্তোষ প্রাপ্ত করিবেন না। আমরা অভিগণকে তাঁহাদের অভ্যন্তরীণ কৌতুহলের জন্য দণ্ডপান করিতে পারিতাম, কিন্তু তাঁহাদের বিচিত্র কাহিনী শুনিয়াই আমরা তাঁহাদিগকে মুক্তিদান করিয়াছি।

খালিফ হারুণ-অল-রসিদ এই সকল বিবরণ শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত স্তম্ভী হইলেন এবং আমিনা ও তাঁহার ভগিনীদ্বয়কে পুরস্কারদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অনন্তর সন্ত্রী জাফরকে দিরা জোবেদীকে বলাইলেন, যে পরী সর্পমুক্তিতে তোমার সাহায্যলাভ করিয়াছিল, এবং অবশেষে তোমার ভগিনীদ্বয়ের প্রতি এমন গুরুদণ্ডবিধান করিয়া গিয়াছে, সেই পরী এখন কোথায় আছে? তোমার ভগিনীদ্বয় কখনও কুকুরদেহ পরিত্যাগ করিতে পারিবে কি না?”

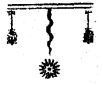
জোবেদী বলিলেন, “জাঁহাপনা, আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, সেই পরী আমার হাতে এক বাণ্ডুল চুল দিয়া বলিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত সাক্ষাতের আবশ্যক হইলে দুইগাছি চুল পুড়াইলেই তাহার সাক্ষাৎ পাইব। সে ককেসস পর্বতের অপরপারে থাকিলেও আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে।” জোবেদীর নিকটে কেশগুলি ছিল, তিনি তাহা বাহির করিয়া খালিফকে দেখাইলে, খালিফ তাঁহাকে বলিলেন, “অবিলম্বে সেই পরীকে এইখানে উপস্থিত করিতে হইবে।”

খালিফের আদেশ অনুসারে দুইগাছি কেশ দগ্ধ করিবামাত্র খালিফের রাজসভা মহাবেগে কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর বহুবিধ বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত হইয়া একটি অপূর্ণহৃদয় সেই সভার আবির্ভূত হইল, এবং জোবেদীর নিকট সে যে উপকার লাভ করিয়াছে, মুক্তকণ্ঠে সকলের নিকট তাহা প্রকাশ করিল।—এই রমণীই সেই পরী।

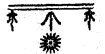
খালিফ তখন সেই পরীকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, “সুন্দরি, আমি তোমার নিকটে অল্পগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, যে দ্বারা আমি আমিনাকে বিবাহ করি। তাহার লঘু পাপে তাহার প্রতি এমন গুরুদণ্ডের বিধান করিয়াছে, সেই নরাধম কে, তাহা আমি জানিতে চাই, আমার রাজ্যে এমন পাপও যে বিনা দণ্ডে পরিত্রাণ পাইবে, ইহা আমি ইচ্ছা করি না। আর জোবেদীর ভগিনীদ্বয়ের যথেষ্ট শাস্তি হইয়াছে, পাপ অপেক্ষা পাপের দণ্ড আমার রাজ্যে অধিক হইলে আমার স্থানকে কলঙ্ক স্পর্শিবে; অতএব আমার অনুরোধ, তুমি কুকুর দুইটিকে তাহাদের যথার্থ আকার দান কর।” পরীর আজ্ঞাক্রমে কুকুর দুইটি তৎক্ষণাৎ জোবেদীর দুই ভগিনীমুণ্ডিতে পরিণত হইল। পরীর ইচ্ছায় আমিনার বক্ষের ক্ষতচিহ্নও বিলুপ্ত হইল। আমিনার অজ্ঞাত-নামা স্বামী সন্তোষ পরী বলিল, “জাঁহাপনা, এই যুবক আপনার সতি নিকট আত্মীয়, ইনি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা আমিন, আমিনার রূপের খ্যাতিতে মুগ্ধ হইয়া তিনি আশিনাকে গোপনে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি আমিনার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার সম্পূর্ণ অযোগ্য নহে; কারণ, আমিনা মিথ্যা বলিয়া তাঁহার মনে গুরুতর সন্দেহ জন্মাইয়া দিয়াছিল।” অতঃপর পরী খালিফকে অভিবাদন করিয়া রাজসভা হইতে অন্তর্হিত হইল।

খালিফ তাঁহার পুত্র আমিনকে আহ্বান করিয়া আমিনাকে পুনঃগ্রহণ করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। সকল কথা শুনিয়া আমিন স্তম্ভিত্তে পরিত্যক্তা পতিগতিপ্রাপ্তা স্ত্রম্বরী পত্নীকে সাদরে পুনঃগ্রহণ করিলেন। জোবেদীর প্রতি খালিফের মনে অনুরাগের সঞ্চার হইয়াছিল, তিনি জোবেদীকে বিবাহ করিলেন, এবং তাঁহার তিন ভগিনীকে পূর্বোক্ত একচক্ষু ফকিরব্রহ্মের হস্তে সমর্পণ করিলেন। ফকিররা রাজপুত্র ছিলেন, খালিফের শ্যালীপতি হইয়া, তাঁহারা পরমসুখে বোন্দাদ নগরে বাস করিতে লাগিলেন এবং ক্রমে তাঁহারা রাজ্যের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

হুসতান-সভায়
দৌলতামহী
পরী



পঞ্চরঙ্গিনী
রূপের
মোহন-দাঁড়



শাহারজাদীর উৎকল যোবনের সৌন্দর্য্য ও তাঁহার গল্পের মাধুর্য্যে হৃদয়ান এই সম্বোধিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিবার কথা বিস্মৃত হইয়া, পরদিন প্রমোদ-নিশা শেষে তাঁহাকে নুতন গল্প বলিবার জন্ত নিজেই অহুরোধ করিলেন। মোহন কটাক্ষের বিদ্রোহাণ বর্ণন করিয়া, সম্মিতমুখে শাহারজাদী আবার নুতন কাহিনীর অবতারণা করিলেন।



সিন্দ-
বাদ
নাই-
কেহ
কাহিনী



বোম্বাদাধিপতি হারুণ-অল-রসিদের রাজত্বকালে বোম্বাদ নগরে সিন্দবাদ নামে একটি দরিদ্র শ্রমজীবী বাস করিত, মোট বহন করিয়া তাহাকে জীবিকা নির্বাহ করিতে হইত। একদিন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড রোদে একটি প্রকাণ্ড মোট মাথায় লইয়া, সে নগরের এক প্রান্তে হইতে অপর প্রান্তে বাইতেছিল। চলিতে চলিতে সে পথের এক স্থানে আসিয়া দেখিল, পথের সেই অংশ গোলাপজলে সিক্ত, বায়ু হিল্লোলে চতুর্দিকে গোলাপগন্ধ বিকীরণ হইতেছে। সিন্দবাদ এই স্থানে আসিয়া তাহার মোট নামাইল এবং একটি গৃহের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিল। প্রকাণ্ড গৃহ, রাজপুরীর দ্বার প্রশস্ত। হৃদয়জিত গৃহ হইতে সুনন্দ সঙ্গীতধ্বনি উথিত হইতেছে, পিঞ্জরে বসিয়া শ্রাব্য ও বৃষ্ণ মনের আনন্দে শীত দিতেছে, গৃহদ্বারে পরিচ্ছদ-ভূমিত সৌবারিকগণ সশস্ত্রে দ্বার রক্ষা করিতেছে। গৃহবাসিগণ যেন কোন উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছেন। কাহার গৃহে এইরূপ আনন্দোৎসব চলিতেছে, তাহা জানিবার জন্ত সিন্দবাদের মনে কোতুহলের সঞ্চার হইল; সে দ্বারবানের নিকট গৃহস্থানীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। দ্বারবান গৌরবে চাড়া দিয়া সবিস্ময়ে বলিল, “কি আশ্চর্য্য, তুমি বিখ্যাত নাবিক সিন্দবাদের নাম শুনি নাই? জাহাজে করিয়া তিনি সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহার ধন-দৌলতের সীমা নাই, ইহা সেই নাবিকশ্রেষ্ঠ সিন্দবাদের প্রাসাদ।” মুটে এই কথা শুনিয়া ললাটে করাঘাত পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “হা আশা, তোমার রাজ্যে বিচার নাই, সিন্দবাদ ও সিন্দবাদ ছদ্মনামেই নাম একরূপ, কিন্তু ছদ্মনামে অবহার মধ্য কি আকাশ-পাতাল প্রভেদ! আমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া, বৃষ্টি ও রোদে মোট বহিয়া, অতি কষ্টে এক মুষ্টি অন্ন সংগ্রহ করি, আর এই সিন্দবাদ পথের ধূলা-নিবারণের জন্ত গোলাপজল ছড়াই, তাহার স্বপ্ন ও সোভাগ্যের সীমা নাই!” সিন্দবাদ এইরূপ বিলাপ করিতেছে, এমন সময় একজন ভূতা আসিয়া তাহাকে বলিল, “আমার প্রভু সিন্দবাদ নাবিক তোমাকে ডাকিতেছেন, আমার সঙ্গে তাঁহার নিকটে চল।”

↑



সিন্দবাদের দ্বার একজন সামান্য মুটেকে ধনকুবের নাবিক সিন্দবাদ ডাকিতেছেন শুনিয়া, তাহার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। সে ভাবিল, তাহাকে কোনরূপ শাস্তি দিবার জন্তই সিন্দবাদ তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন। হুতরাং মুটে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হইল না, তাহার সঙ্গে মোট আছে এবং তাহা শীঘ্র যথাহানে পৌছাইয়া দিতে হইবে বলিয়া, ভূত্যের সহিত বাইতে আপত্তি করিল; কিন্তু ভূতা পীড়াপীড়ি করায়, বিশেষতঃ মোটের রক্ষাবেক্ষণে সম্মত হওয়ায়, অবশেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে সিন্দবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিল।

সিন্দবাদ ভূত্যের সহিত একটি হৃদয়জিত প্রশস্ত কক্ষ উপস্থিত হইয়া দেখিল, উৎকল আসনে অনেকগুলি লোক বসিয়া আছেন, আহা-টেবিলে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য থরে থরে সজ্জিত, প্রধান আসনে একটি বৃদ্ধ উপবিষ্ট, তাঁহার খেতবর্ণ শাশ্রু বক্ষ পর্য্যন্ত বিলম্বিত। সিন্দবাদ বৃথিল, এই লোকটিই সিন্দবাদ নাবিক।

সিন্দবাদ এমন গৃহে জীবনে কখনও পদার্পণ করে নাই, এরূপ একটি হুম্মার গৃহে এতগুলি লোককে একত্র উপস্থিত দেখিয়া সে ভয়ে কঁপিতে লাগিল, কিন্তু সম্ভ্রান্ত সিন্দবাদ মধুরবণের তাহাকে নিকটে আহ্বান করিয়া তাঁহার দক্ষিণপশ্চিম আসন গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। শ্রমজীবী সিন্দবাদ উপবেশন করিলে, সিন্দবাদ তাহাকে টেবিলে গজিত উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি আহ্বার করিতে বলিলেন, হুপের মত আনিয়া দেওয়া হইল। সিন্দবাদের আলৌকিক ব্যবহারের মুঠের ভর দূর হইল, সে তখন মনের আনন্দে পানভোজনে রত হইল।

আহারাদি যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিল, তখন সিন্দবাদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাই, তোমার নাম কি, তুমি কি কর?” সিন্দবাদ বলিল, “আমার নাম সিন্দবাদ, আমি মুটেগিরি করি।” সিন্দবাদ বলিলেন, “তোমার নাম ও আমার নাম একই। তোমার সহিত আলাপ করিয়া আমি তুষ্ট হইলাম। তোমার নিকট আমি একটি কথা জানিতে চাই, আমার ঘরের ছায়ায় বসিয়া, তুমি আমারকে ডাকিয়া কি বলিতেছিলে? তোমার কথা আমার কাণে গিয়াছিল, তাই তোমাকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলাম।” সিন্দবাদ কিয়ৎকাল অবনত-মস্তকে থাকিয়া কাতরভাবে বলিল, “রোদ্রে প্রকাণ্ড মোট বহিয়া অভ্যস্ত ক্লান্ত হওয়াতে আমি অবিবেচকের মত যে ছই একটি কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য অপরাধ হইয়া থাকিলে আমাকে ক্ষমা করুন।” সিন্দবাদ বলিলেন, “তুমি মনে করিও না যে, সে জন্য আমি তোমাকে তিরস্কার করিব। তোমার অবস্থা-সম্বন্ধে আমার উত্তম অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং তোমার প্রতি ক্রোধের পরিবর্তে আমার মনে করুণাসঞ্চার হইয়াছে; কিন্তু তুমি যে ভুল ধারণা করিয়াছ, তাহা দূর করা আমার উচিত। তুমি নিশ্চয়ই মনে করিয়াছ, আজ আমি যে ঐশ্বর্য্য ও সুখভোগ করিতেছি, তাহা আমার অগ্রগ্রহ করিয়া, আমাকে ছাপ্‌ড় ফড়িয়া দান করিয়াছেন। তোমার এরূপ অহুমান ভুল। আমি অবস্থার উন্নতির জন্য যেরূপ শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা কিরূপ কঠোর, সে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নাই বলিয়াই তুমি এরূপ অহুমান করিয়াছ।”

অনন্তর তিনি উপস্থিত ভদ্রনগরীকে সন্ধান পূর্ব্বক বলিলেন, “মহাশয়গণ, আমি বত কষ্ট সহ্য করিয়াছি, পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রূপগণও সেরূপ কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য তাঁহাদের সন্ধিত সমস্ত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমি দাতব্যর বিভিন্ন সময়ে যাত্রা করি, সেই সকল সমুদ্রযাত্রায় আমাকে কিরূপ ভয়ানক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আপনাদের কোঁতুহল জন্মিতে পারে; আমি একে একে তাহা বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ করুন।”



সিন্দবাদ নাবিক বলিতে আরম্ভ করিলেন;—আমি ধনবানের সন্তান। যৌবনকালে কুণ্ডলগর্গে পড়িয়া আমি পৈতৃক অর্থের অধিকাংশই উড়াইয়া দিয়াছিলাম; তাহার পর ক্রমে আমি বৃদ্ধিতে পারিলাম, যে ভাবে আমি অর্থব্যয় করিতেছি, অর্থ সে ভাবে ব্যয় করিবার জন্য নহে, নানাবিধ ক্রিয়াতে আমি জীবনের যে সময় নষ্ট করিয়াছিলাম, তাহা যে অসংখ্য স্বর্ণমুদ্রা অপেক্ষাও মূল্যবান, তাহাও আমি বৃদ্ধিতে পারিলাম। সমস্ত জীবন অপব্যয় করিয়া, বৃদ্ধবয়সে দারিদ্র্য্যভ্রাণা ভোগ অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কিছুই নাই, তাহা বারম্বার আমার মনে পড়িতে লাগিল। আমি শিশুর যুগে কত দিন ওনিয়াছি, তিনি বলিতেন, শলোমন বলিয়াছেন, ‘দারিদ্র্য্যভ্রাণা অপেক্ষা মৃত্যুই বাঞ্ছনীয়।’—এই কথা স্মরণ করিয়া আমি সম্পূর্ণ নিঃশব্দ হইবার পূর্ব্বকই আমার যে কিছু

সৌভাগ্য
কোন পথে?



সিন্দ-
বাদের
প্রথম
সমুদ্র-
যাত্রা



সম্পত্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহা নীলামে বিক্রয় করিয়া, বাণিজ্যযাত্রার জন্ত প্রস্তুত হইলাম; এবং কয়েকজন সদাগরের সহিত যোগদান করিলাম; আমরা কয়েকজন সদাগর একত্র বাগেরা হইতে প্রথম সমুদ্রযাত্রা করিলাম।

প্রথমবার আমরা পারশ্ব উপদাগরপথে পূর্ব ভারতভিমুখে যাত্রা করিলাম; এই উপদাগরের পর ভারত-মহাসাগর। প্রথমে কয়েকদিন আমি সমুদ্রপীড়ায় কাতর ছিলাম, কিন্তু শীঘ্রই আমার সে পীড়ার উপশম হইল, তাহার পর আর কখনও আমি সমুদ্রপীড়ায় আক্রান্ত হই নাই। আমরা চলিতে চলিতে কয়েকটি দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তত্রতা বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিলাম, কিছু পণ্যদ্রব্যও বিক্রয় করিলাম। একদিন আমাদের জাহাজে পা'ল তুলিয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশি ভেদ করিয়া অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় অদূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ দৃষ্টিগোচর হইল; এই দ্বীপ দেখিয়া জাহাজের কাপ্তেন পা'ল নামাইবার আদেশ প্রদান করিলেন, তাহার পর এই দ্বীপে বাহারা গমন করিতে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। কয়েকজন আরোহীর স্তায় আমিও জাহাজ হইতে এই দ্বীপে অবতরণ করিলাম এবং দ্বীপের মধ্যস্থলে অগিয়া আহারাতির আরোজন করিলাম। আমরা পানভোজনে রত আছি, এমন সময় দ্বীপটি সহসা প্রবলবেগে নড়িয়া উঠিল, বোধ হইল যেন মহা ভূমিকম্প আরম্ভ হইয়াছে।

দ্বীপ নহে
প্রকাণ্ড তিমি



অসীম
সমুদ্রের
নীভার

যে সকল আরোহী জাহাজের উপর ছিলেন, তাহারা সেই দ্বীপ-টিকে এই ভাবে অন্দোলিত হইতে দেখিয়া আমাদিগকে তৎক্ষণাৎ জাহাজে উঠিতে অস্বরোধ করিলেন; কারণ, আমরা দ্বীপ ভাবিয়া বাহার উপর নামিয়াছিলাম, তাহা দ্বীপ নহে, একটি বোজনবাপী তিমির পৃষ্ঠ! জীবনরক্ষার জন্ত কেহ নিকট-বর্তী নৌকায় লক্ষ প্রদান করিলেন, কেহ বা তিমিকে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশের চেষ্টা করিতে দেখিয়া জাহাজে উপস্থিত হইবার জন্ত তাহার উচ্চ পৃষ্ঠ হইতে সমুদ্রগর্ভে লক্ষ প্রদান করিলেন; কিন্তু আমার কোন উপায়ই অবলম্বন করা হইল না, আমি তিমিপৃষ্ঠেই রহিয়া গেলাম। তিমি সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইবারাত্র আমি সমুদ্রে

একখানি তক্তা দেখিয়া—যাহা আমরা জাহাজ হইতে আলাদার জন্ত আনিয়াছিলাম—তাহারই উপর ভর দিয়া সমুদ্রবক্ষে ভাসিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে বাহারা জাহাজে গিয়া উঠিল, স্রবাতাস পাইয়া তাহাদিগকে লইয়া কাপ্তেন জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। আমি ক্ষুদ্র তক্তার উপর নির্ভর করিয়া সমুদ্রতরঙ্গে ভাসিতে লাগিলাম। এক দিন এক রাত্রি সেই ভাবে সমুদ্রবক্ষে কাটিল, পরদিন প্রভাতে দেখে বলও

রহিল না, কদমে আশাও রহিল না। কিন্তু আমার ইচ্ছা কি, তাহা কেহ বলিতে পারে না; আমি তরলবেগে একটি দীপের প্রান্তে আসিয়া পড়িলাম, নিকটেই একটি বুক ছিল, তাহা ধরিয়া বহু কষ্টে দীপের উপর উঠিলাম। অধমৃত অবস্থায় অনাবৃত দীপের উপর আমি পড়িয়া রহিলাম, তাহার অরক্ষণ পরেই ধীরে ধীরে স্তব্ধোদয় হইল।

অনেকক্ষণ বিশ্রামের পর শরীর কিছু সুস্থ হইল বটে, কিন্তু ক্ষুধার ঘরগা অনগ্র। কোথাও যদি কোন প্রকার ফলফল পাওয়া যায়, অতি কষ্টে তাহারই সন্ধান করিতে লাগিলাম। অনেক অল্পসন্ধানে নির্মল জলপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র প্রবাহিনী দেখিতে পাইলাম, অল্প খাওয়াবোর অভাবে সেই জল খাইয়াই কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলাম, তাহার পর বীপদ্রমণে যাত্রা করিলাম। বীপটি সুপ্রশস্ত ও সুন্দর;—কিছু দূরে দেখিলাম, একটি ঘোড়া চরিতেছে, আমি তাহার সমীকটবর্তী হইবামাত্র ঘাটীর নীচে হইতে কে একজন লোক আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে আমার কাহিনী বলিলে, সেই লোকটি আমার হাত ধরিয়া একটি গুহার মধ্যে লইয়া গেল,—দেখিলাম, সেই গুহার মধ্যে আরও বহুজন লোক বসিয়া আছে, তাহারা আমাকে দেখিয়া অধিক বিস্মিত হইল কি আমি তাহাদিগকে দেখিরা অধিক বিস্মিত হইলাম, তাহা স্থির করা কঠিন।

আমাকে তাহারা খাওয়াদাবাদি দান করিল, তাহা আহাৰ করিয়া মহাপ্রাণকে পরিতুষ্ট করিয়া, আমি সেই লোকগুলিকে সেই স্থানে অবস্থানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারা বলিল, তাহারা এই বীপের রাজা মিরেজীর সহস্র, এখানে তাহারা প্রতি বৎসর তাহাদের রাজার আত্মাবল হইতে ঘোড়াকী লইয়া আইসে, শিক্কাঘোটক দ্বারা ঐ সকল ঘোড়াকীর সন্ধান উৎপাদনই তাহাদের আগমনের উদ্দেশ্য। ঐ সকল ঘোড়াকীর যে শাবক হয়, তাহারা কেবল রাজারই ব্যবহারে লাগে। সহস্ররা আরও বলিল, পরদিন তাহারা এই বীপ ত্যাগ করিবে; সুতরাং আর একদিন বিলম্বে আসিলেই এখানে একাকী থাকিরা আমাকে প্রাণ হারাইতে হইত।

সহস্ররা আমার সহিত গল্প করিতেছে, এমন সময় একটি প্রকাণ্ড শিক্কাঘোটক সমুদ্র হইতে উঠিয়া একটি ঘোড়াকীর সহিত মিশ্রুকিয়া আরম্ভ করিল। তারপর তাহাকে সমুদ্রমধ্যে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল, তাহা দেখিয়া সহস্ররা উচ্চৈঃস্বরে ঘোর চীংকার করার শিক্কাঘোটকটি পলায়ন করিল। সহস্ররা বলিল, “একদম তাহা চীংকার না করিলে শিক্কাঘোটকের হস্ত হইতে ঘোড়াকীদিগের প্রাণরক্ষা করা নিতান্ত কঠিন হইয়া পড়িত।

পরদিন সহস্ররা রাজধানীতে ফিরিয়া গেল, আমিও তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। রাজা মিরেজীর নিকট উপস্থিত হইলে, তিনি আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং আমার মুখে সমস্ত কথা শুনিরা, আমার দ্বন্দ্ব ও বিপদে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন; বাহাতে আমার কোন অসুবিধা না ঘটে বা কোন বিষয়ে অভাব উপস্থিত না হয়, কৰ্মচারিগণকে তিনি দে আদেশও দান করিলেন। রাজার দয়ালুতার আমার দ্বন্দ্ব ও কষ্ট দূরীভূত হইল।

আমি নুতন রাজ্যে আসিয়া, বিভিন্ন গম্ভীর-ভুল গোকের সহিত মিশিতে লাগিলাম, এবং সেই দেশের আচারব্যবহার রীতিনীতি প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে লাগিলাম। একদিন আমি বন্দরের কাছে পাড়াইয়া আছি, এমন সময় দেখিলাম, একখানি বিদেশী জাহাজ আসিয়া সেই বন্দরে নল্লর করিল; জাহাজ হইতে জিনিষপত্র নামিতে লাগিল। হুই একটি বস্তার উপর আমি দৃষ্টিপাত করিতেই দেখিলাম, বস্তাসমূহের উপর আমার নাম লেখা রহিয়াছে; অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সেই বস্তাগুলি

যজ্ঞাত বীপে

আশ্রয়-পাত



রাজস্বকালে





মনোবাগের সহিত পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, অবশেষে আমার মনে পড়িল, আমি বাগেশ্বর হইতে যে সকল জিনিস জাহাজে বোকাই দিয়াছিলাম, ইহা তাহাই ; সেই জাহাজের কাপ্তেনকেও আমি চিনিতে পারিলাম ; কিন্তু আমি বুঝিলাম, আমি প্রাণভাগ করিয়াছি। ভাবিয়া সে নিশ্চিন্ত আছে, স্তব্ধ আমি কাপ্তেনের নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাহাকে এই সকল দ্রব্যের অধিকারীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল, “এ সকল মাল বোঙ্গাদ নগরের সিন্ধবাদ নামক একজন নাবিকের সম্পত্তি।” অনন্তর সে আমার সম্মুখে বাহা বাহা জানিত, তাহা সকলই বলিল, অবশেষে জানাইল, এ সকল মাল বিক্রয় করিয়া বাহা কিছু অর্থলাভ হইবে, তাহা সে সিন্ধবাদের কোন আত্মীয় থাকিলে তাহাকে প্রদান করিবে। আমি কাপ্তেনকে বলিলাম, “তুমি যাহাকে মৃত বলিয়া মনে করিতেছ, আমিই সেই সিন্ধবাদ নাবিক। আমি মরি নাই, এ সকল মাল আমার।” আমার কথা শুনিয়া জাহাজের কাপ্তেন চাৎকার করিয়া সবিস্ময়ে বলিল, “হা আশা, এ পৃথিবী কি কেবল প্রবঞ্চকেই পরিপূর্ণ ?” এই বলিয়া, আমার দিকে চাহিয়া পুনরায় কহিল, “আমি স্বয়ং সিন্ধবাদকে মরিতে দেখিয়াছি, আমার জাহাজের আরোহিণীগণও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে, আর তুমি আজ নির্লঙ্ঘের মত বলিতেছ, তুমি স্বয়ং সিন্ধবাদ ! তোমার সাহস কত নয় ? প্রথমে তোমাকে দেখিয়া ভাল লোক বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন দেখিতেছি, তুমি একজন বোয় প্রবঞ্চক।” আমি কাপ্তেনকে বলিলাম, “হির হও বাপু, আমার সকল কথা শুনিয়া পরে বক্তৃতা করিও।” কাপ্তেন বলিল, “কতকগুলো মিথ্যা কথা বলিবে ত ? আচ্ছা, বল, শুনি।” আমি ধীরে ধীরে সকল ঘটনার উল্লেখ করিলাম, কিন্তু সে আমি প্রাণরক্ষা করিলাম, তাহাও তাহাকে জ্ঞাত করিলাম।

কাপ্তেন হাঁ করিয়া আমার কথা শুনিতে লাগিল। আমার কাহিনী শেব হইলে সে বুঝিল, সত্যই আমি প্রবঞ্চক নহি ; জাহাজে যে সকল লোকের সহিত পূর্বে আমার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে চিনিতে পারিয়া, আগ্রহভরে আমার সহিত আপোষ করিল। অবশেষে কাপ্তেন তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, আমার দ্রব্য আমার হস্তে সমর্পণ করিল, আমি তাহাকে ঐ সকল দ্রব্যের অংশদান করিতে চহিলেও সে তাহা গ্রহণ করিল না।



জাহাজে আমার যে সকল পণ্যদ্রব্য ছিল, তাহার মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলি রাজা মিরেজীকে উপহার প্রদান করিলাম। আমি কিন্তু সে আমার সম্পত্তি পুনর্লাভ করিলাম, তাহার বিবরণ শুনিয়া রাজা মহাশয় বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, তাহার পর আমি তাঁহাকে যে মূল্যের সামগ্রী উপহার দিয়াছিলাম, তাহা অপেক্ষা বহুমূল্যবান সামগ্রী আমাকে প্রদান করিলেন। অনন্তর সেই দ্বীপ হইতে আমরা নানা প্রকার মসলা ও গন্ধদ্রব্য লইয়া স্বদেশযাত্রা করিলাম, এবং বিভিন্ন বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিয়া অবশেষে বাগেশ্বরের উপস্থিত হইলাম ; সেবার বাণিজ্যে আমার লক্ষ টাকা লাভ হইল। এই অর্থে আমি বাদগুহ, ভূমিসম্পত্তি ও দাস-দাসী ক্রয় করিলাম। প্রচুর অর্থলাভে আমার স্বত্বের সীমা রহিল না।

গল্প শেষ করিতে রাত্রি হইল, সকলেই বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন দেখিয়া, সিন্ধবাদ সে দিনের মত তাঁহাদিগকে বিদায়দান করিলেন। প্রমিত সিন্ধবাদকে তিনি একশত টাকা-পূর্ণ একটি থলি দান করিয়া বলিলেন, “ইহা লইয়া তুমি গৃহে যাও, কাল আসিয়া আমার অল্প অল্প সমুদ্রযাত্রার বিবরণ প্রবণ করিও।” সিন্ধবাদ, নাবিক সিন্ধবাদকে তাঁহার এই অপ্রাথিত দানের জন্য প্রচুর ধন্যবাদ প্রদান করিল, আলাকেও পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিতে বিবৃত হইল না।

পরদিন সকলে সন্ধ্যার সিলবাদের গৃহে উপস্থিত হইলে, পান-ভোজনাদি সমাপনের পর সিলবাস
তাহার দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন,—প্রথমবার সমুদ্র হইতে প্রত্যাপন করিয়া, আমি স্থির করিলাম, যথেষ্ট অর্থ উপার্জন
করিয়াছি, জীবনের অবশিষ্ট কাল আরামের সহিত ইহা ভোগ করিব, এই স্থরের বোন্দাদ ছাড়িয়া আর
কোথাও যাইব না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই অলস জীবন অসহ্য হইয়া উঠিল, আবার সমুদ্রপারবর্তী
দেশসকল দেখিবার জন্ত আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। কিছু কিছু পণ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া, আমার
নাম স্মরণ করিয়া দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রা করা গেল। দীপ হইতে দীপান্তরে জাহাজ বাধিয়া অবশেষে
আমরা একটি দীপে উপস্থিত হইলাম,—দেখিলাম, সেখানে মানুষের বাস নাই, স্থানটি অসংখ্য
কলের গাছে পরিপূর্ণ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীতে সমাচ্ছন্ন। আমার সহচরগণ কুল পাড়িয়া, কল বাইরা
মহানন্দে বিচরণ করিতে লাগিল, আমি একটি ক্ষুদ্র নির্ঝরিলীর তীরে বসিয়া কিঞ্চিৎ খাদ্যদ্রব্য
আহার ও মত্তপান করিতে লাগিলাম। পরিতৃপ্তির সহিত আহার করিয়া উদরটি পূর্ণ হইলে, আমি
একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় শয়ন করিলাম। ক্রমে আমার নয়নে অজ্ঞাতসারে নিদ্রার আবির্ভাব হইল। আজ্ঞা
জানেন, কতক্ষণ আমি ঘুমাইয়াছিলাম, নিদ্রাভঙ্গে জাহাজে উঠিতে গিয়া দেখি, জাহাজ অদৃশ্য! আমি
অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া আমার সহচরগণের অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।

একাকী সেই নির্জন অরণ্যপ্রদেশে বসিয়া আমি ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। সহস্র
চিন্তায় আমার হৃদয় আচ্ছন্ন হইল, স্থখে থাকিতে কেন এমন বিপদে ঝাঁপ দিলাম, ভাবিয়া মনে বড়
অনুতাপের সঞ্চার হইল; কিন্তু অনুতাপ নিফল, তখন আর প্রতীকারের কোন পথ ছিল না। আজ্ঞার
যাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হইবে ভাবিয়া একটি উচ্চরবে আরোহণ করিলাম, কিন্তু পরিত্রাণের কোনই
উপায় দেখিলাম না। সমুদ্রের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, সে দিকে কেবল আকাশ আর বন। অবশেষে
দীপের মধ্যভাগে ষেতবর্ণ কি একটা জিনিষ দেখিতে পাইলাম। আমি বৃক্ষ হইতে নামিলাম এবং
অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া, সেই ষেতবর্ণ পদার্থটির অভিমুখে ধাবিত হইলাম। উহার নিকটে
আসিয়া দেখিলাম, ষেতবর্ণ একটি প্রকাণ্ড তাঁটা; স্পর্শ করিয়া দেখিলাম, তাঁটাটি বিলকণ নরম
ইহার কোন দিকে ছিদ্র আছে কি না, চারিদিক ঘুরিয়া তাহা পরীক্ষা করিলাম, কিন্তু কোন ছিদ্র দেখিতে
পাইলাম না, সেই তাঁটার উপরে উঠিবারও কোন উপায় দেখিলাম না, ইহার পরিধি ৩০ হাতের অধিক।

দিবা অবসান হইল; সন্ধ্যা চতুর্দিক অন্ধকার হইয়া উঠিল, বোধ হইল, বোর ক্রকবর্ণ মেঘে গগনভল
আবৃত হইয়াছে। এহ ব্যাপার দেখিয়া আমি বড়ই বিস্মিত হইলাম, কিন্তু পরে যাহা দেখিলাম, তাহাতে
আর আমার বিস্ময়ের সীমা পরিলীমা রহিল না,—দেখিলাম, একটি বিশালকার রুক্মণ্য গগনবাসী
পক্ষীর বিস্তার করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপ বিরাটকার রুক্মণ্যকার কাহিনী
আমি নাবিকগণের মুখে পূর্বেই শুনিয়াছিলাম। আমি তখন বুলিলাম, সেই ষেতবর্ণ তাঁটাটি ঐ
রুক্মণ্যকার ডিম। পক্ষীটি তাহার ডিমের কাছে আসিয়া বসিল। আমি পূর্বেই ডিমের আড়ালে
আসিয়া বসিয়াছিলাম, আমি আমার পাণ্ডু বুলিয়া কবের একটি নখের সহিত আমার শরীর
দৃঢ়ভাবে বাধিলাম; কারণ, আমি মনে করিলাম, পরদিন প্রভাতে পক্ষী যখন এই স্থান পরিত্যাগ
করিবে, আমিও সেই সঙ্গে এই নির্জন মরুপ্রদেশ তাহার সহায়তার ভাগ করিতে পাবিব,—ইহা ভিন্ন
আমার পরিত্রাণের অন্য উপায় ছিল না।

সিঙ্গ-
বান্দেহ
দ্বিতীয়
সমুদ্র-
যাত্রা

বিরাট
রুক্মণ্য
এরোয়েন

পরদিন প্রভাতে রুক্মণী আমাকে লইয়া আকাশে উড়িল। এত উর্দ্ধে উঠিল যে, পৃথিবী দৃষ্টপথে পড়িল না, তাহার পর সে মহাবেগে নামিতে লাগিল, সেই প্রচণ্ড বেগ আমি সহ্য করিতে পারিলাম না, আমার জ্ঞানলোশের উপক্রম হইল। যাহা হউক, রুক্মিণী একটি পর্বতের উপত্যকার অবতরণ করিবামাত্র আমি আবার দেহের বন্ধন মুক্ত করিলাম, পক্ষীও তৎক্ষণাৎ আবার উড়িয়া একটি অতি ভীষণদর্শন সর্পের উপর ছৌ মারিয়া দর্পটিকে টোটে লইয়া উড়িয়া চলিল। এত বড় সর্প আমি জীবনে আর কখনও কুত্রাপি দেখি নাই।

উপনিবেশ
হীরকমণ্ডপ



পর্বতের উপত্যকার পড়িয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম; কারণ, দেখিলাম, উন্নত শৃঙ্গগুলি আকাশ স্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, সেই সকল শৃঙ্গে আরোহণ মহাবীর পক্ষে অসম্ভব বোধ হইল। আমি বুলিলাম, পূর্ববর্তী নির্জন বীণ অপেক্ষা এখানে আমার অবস্থা কিছুমাত্র অধিক আশাশ্রয় নহে।

আমি সেই গিরি-উপত্যকার ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথের সন্ধান করিতে লাগিলাম। শত শত খণ্ড স্বরূহ অত্যাচ্ছন্ন হীরক আমার পায়ে ফুটিতে লাগিল। এক স্থানে এত হীরক? আমি বিশ্বাসভিত্ত হইলাম, কিন্তু হীরকখণ্ডগুলি সাবধানে পরীক্ষা করিয়া আমার বিশ্বাস ভগ্নে পরিণত হইল,—দেখিলাম, এই সকল হীরক অতি প্রকাণ্ডকার সর্পের শিরোভূষণ। এই সকল সর্প এক্ষণ স্বরূহ যে, তাহারা এক একটি প্রকাণ্ডদেহ হস্তী অনায়াসে গ্রাস করিতে পারে। সর্পগুলি ঈগল ও রুক্মের ভয়ে দিবাভাগে এই গিরি-উপত্যকার লুকাইয়া থাকে, রাত্রিকালে আহার অন্বেষণে বাহির হয়। সমস্ত দিন সেই উপত্যকার বিচরণ করিয়া সাংসকালে আমি একটি গিরিশৃঙ্গার আশ্রয় লইলাম। সেই শৃঙ্গার প্রবেশ করিয়া আমি আমার সঙ্গে আনিত খাদ্যদ্রব্য হইতে কিয়দংশ আহার করিলাম। যদিও আমি সর্পের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্ত গুহামুখ বন্ধ করিয়াছিলাম, তথাপি সমস্ত রাত্রি সর্পের গর্জনে আমার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে শুভা হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম, সর্পগুলি স্থানান্তরে চলিয়া গিয়াছে, তখন আমি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হইলাম। আমার তত্ত্বার আবির্ভাব হইয়াছে, এমন সময় আমার বোধ হইল, আমার নিকটে কেহ কোন দ্রব্য নিক্ষেপ করিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিলাম, বৃহৎ একখণ্ড মাংস আদিয়া পড়িয়াছে, দেখিতে দেখিতে এক্রপ বহু খণ্ড মাংস পর্বতগাত্র হইতে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

আমি পূর্বে শুনিয়াছিলাম, সদাগররা এক অজুত উপায়ে পার্বত্যপ্রদেশে হীরক সংগ্রহ করে। উপায়টি এইরূপ :—তাহারা খণ্ড খণ্ড মাংস কাটিয়া হীরক-সমাচ্ছন্ন উপত্যকার ছুড়িয়া ফেলে, হীরকগুলি সেই মাংসে বাঁধিয়া যায়, ঈগলপক্ষী হীরকসমনেত্র ঐ মাংসখণ্ড চক্ষুপুটে ভুলিয়া, পাছাড়ের উচ্চস্থানে তাহাদের শাবকগণকে আহার দিতে যায়। ঈগল তাহার কুলায়ে উপস্থিত হইলে সদাগররা দলবদ্ধ হইয়া ঈগলের বাসার নিকটে উপস্থিত হয়, তাহার পর ঈগলকে তাড়াইয়া সেই মাংসবদ্ধ হীরকখণ্ডগুলি হস্তগত করে। পূর্বে এই বৃত্তান্ত আমার নিকট অবিশ্বাস্ত গল্প বলিয়াই মনে হইত, কিন্তু এখন এই সকল মাংসখণ্ড দেখিয়া ইহা সত্য বলিয়া বোধ হইতে পারিলাম। আমার পদতলে সহস্র সহস্র হীরকখণ্ড, কিন্তু তাহার প্রতি আমার তখন বিদ্রোহ ও লোভ হয় নাই; কারণ, আমি যেখানে আসিয়াছি, সেখানে হইতে পরিত্রাণলাভের কোনই সম্ভাবনা দেখিলাম না। যাহা হউক, আমি যতগুলি পারিলাম, হীরক সংগ্রহ করিয়া সাবধানে আমার খাদ্যদ্রব্যের থলির ভিতর পুথিলাম, তাহার পর বৃহৎ একখণ্ড মাংস লইয়া তাহা পাগড়ীতে বাঁধিলাম এক তাহা মাথায় লইয়া নিশ্চলভাবে বসিরা থাকিলাম।

বসিয়া আছি, এমন সময় মাংসের লোভে ঈগলরা সবেগে সেই উপত্যকার উপর পড়িয়া মাংস সংগ্রহ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে একটি প্রকাণ্ড ঈগল আমার মাথার উপর রক্তিত মাংসখণ্ড ছেঁা মারিল, মাংস আমার পাগড়ীতে এবং পাগড়ী আমার দেহে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ ছিল, স্বতরাং আমিও সেই মাংসের

ক-সংগ্রহের
উপায়



সহিত ঈগল কর্তৃক পর্ত্তশুণে নীত হইল। ঈগল আমাকে, লইয়া বাসায় গিয়া বসিরাভ্যাস সদাগররা মহা শোরগোল করিয়া তাহাকে ভাড়াইতে গেল। ঈগল ভয় পাইয়া মাসখণ্ড ছাড়িয়া পলায়ন করিল। একজন সদাগর ঈগলের বাসার নিকটে গিয়া আমাকে দেখিল, তাহার ভয়ের নীমা রহিল না; কিন্তু নীত্বই লোকটার ভয় দূর হইল। তাহার শিকার কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি ভাবিয়া লোকটা আমার সহিত বিবাদ আরম্ভ করিল। তাহাকে আমি আমার অস্ত্র ইতিহাস বলিয়া ও আমি যে সকল অত্যাচারিত হীরক সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা তাহাকে দেখাইয়া একটু শান্ত করিলাম; এমন সময় অস্ত্রাভ্যাস সদাগরগণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহাদের কাছেও আবার সকল কথা বলিলাম, তাহারা আমার সাহস দর্শনে বিশ্বাসে স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

তাৎপার্য ভাষ্য



আমি সেই-সকল সদাগরের সহিত তাহাদের বাসস্থানে গমন করিলাম। সংগৃহীত হীরকগুলি দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাসের নীমা রহিল না। এক্ষণে বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট হীরক তাহারা জীবনে কখনও দেখে নাই।

সদাগরগণ সেই স্থানে কয়েক দিন বাস করিয়া যথেষ্ট পরিমাণে হীরক সংগ্রহ করিয়া, সে স্থান ত্যাগ করিল; আমিও তাহাদের সহিত চলিলাম; ভীষণ সর্পসঙ্কলস্থানে আমাদের প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল; বাহা হউক, অবশেষে আমরা নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইয়া তথা হইতে রোহা দ্বীপে যাত্রা করিলাম। এই দ্বীপের সমুদ্রে আপনাদিগকে অনেক কোতুকাবহ বিবরণ বলিতে পারিতাম, কিন্তু আপনাদের দৈর্ঘ্যচ্যুতি হইবে, এ আশঙ্কায় বিরত হইলাম। এখানে আমি কয়েকখানি হীরকের পরিবর্তে বিবিধ মূল্যবান পণ্যস্রব্য সংগ্রহ করিলাম, অবশেষে জাহাজে চড়িয়া বহু বন্দর ঘুরিয়া বাগসোয়ার উপস্থিত হইলাম, সেখান হইতে নিরাপদে বোম্বাদে প্রত্যাগমন করিয়াছি। ইহাই আমার দ্বিতীয়বার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী। শ্রোতৃগণ অধিক রাত্রি হওয়ার স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। নাবিক সিন্ধবাদ শ্রমিক সিন্ধবাদকে সে দিনও একশত মুদ্রা উপহার দিলেন।



পরদিন যথাসময়ে বহুগণ সমাগত হইলে সিন্ধবাদ নাবিক পানাহারে তাহাদের পরিতৃপ্ত করিয়া তাহার তৃতীয়বারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

তিনি বলিলেন, স্রুথে ও শাস্তিতে কিছুকাল গৃহবাস করিয়া, আমার মনে আবার সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল, পূর্ব-পূর্ববার যে সমস্ত ভয়ানক বিপদে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, সে সমস্ত কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইলাম এবং বহুমূল্য পণ্যস্রব্য লইয়া বোম্বাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া বাগসোয়ার জাহাজে চড়িলাম। এখান বড় বড় বন্দরে জাহাজ লাগাইয়া অনেক দ্রব্য বিক্রয় ও নূতন নূতন পণ্যস্রব্য ক্রয় করিলাম, তাহাতে বাণিজ্যের অনেক স্রুবিধা হইল; অস্ত্রাভ্যাসের জ্ঞান এখানও অনেক সদাগর আমার সহিত বাণিজ্যে যোগদান করিয়াছিল।

সিন্ধ-
বাদে
তৃতীয়
সমুদ্র-
যাত্রা



অকূল সমুদ্রে আসিয়া একদিন আমার প্রচণ্ড ঝটকায় হস্তে পড়িলাম। বড় কয়েক দিন ঘুরিয়া চলিল। কয়েক দিন পরে আমার একটি দ্বীপের কাছে আসিয়া জাহাজ নঙ্গর করিলাম; কিন্তু কাণ্ডেন সেই স্থানে জাহাজ রাখিতে বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল। সে বলিল, “এই স্থানের অধিবাসিগণ অত্যন্ত অসভ্য; যদিও তাহারা ক্ষুদ্রমাত্র, তথাপি সংখ্যাগত এত অধিক যে, তাহাদের গতিরোধ করা অসম্ভব। যদি আমরা দৈবাৎ কোন একটিকে হত্যা করি, তাহা হইলে তাহারা পক্ষপালের ঠাধ আমাদের জাহাজ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে।” এই বিবরণ শুনিয়া জাহাজের সকল লোকই ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িল। কাণ্ডেনের কথা কত দূর সত্য, আমরা মনে মনে সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, অতি কুৎসিত আকারের অগাধ



রাকসদের
জাহাজ
অধিকার



অসভ্য মহুয়া আমাদের জাহাজের দিকে আসিতেছে। এক একটি মানুষ দেড় হাত লম্বা, তাহাদের চুল রক্তবর্ণ। দলে দলে তাহারা আমাদের জাহাজে উঠিল এবং জাহাজের চতুর্দিক ঘিরিয়া ও সমুদ্রতীর ঢাকিয়া ফেলিল। তাহারা আমাদের নিকটবর্তী হইয়া অনেক কথা বলিল বটে, কিন্তু তাহাদের ব্রাহ্মণ্য কথা কিছুই আমরা বুঝিতে পারিলাম না। অতি সহজেই তাহারা আমাদের জাহাজ পদ্মপালের জায় ছাইয়া ফেলিল। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তাহারা জাহাজের নদর ও মড়ি দণ্ডা কাটিয়া, জাহাজ তীরের নিকট টানিয়া লইয়া গেল এবং আমাদের জাহাজ হইতে নামিতে বাধ্য করিল।

বীণে উঠিয়া আমরা বহু প্রকার ফলমূল দেখিতে পাইলাম, তাহাই পর্যাণ্ড পরিমাণে ভক্ষণ করিয়া ক্ষুণ্ণিপাশা নিবারণ করা গেল। কিছু দূর অগ্রসর হইয়া আমরা একটি বৃহৎ অট্টালিকা দেখিতে পাইলাম; তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, এই অট্টালিকার দ্বার আবলু-কাঠনির্মিত। দ্বারে দাঁকা দিতেই তাহা খুলিয়া গেল; একটি প্রশস্ত অঙ্গনে উপস্থিত হইয়া আমরা দেখিলাম, এক স্থানে শুপাকার মহুয়ের হাড় পড়িয়া রহিয়াছে, আর এক স্থানে নরমাংসের কাবাব করিবার জন্ত দারি দারি শিক বিরাজিত। এই দৃশ্য দেখিয়া আমরা ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, যথেষ্ট পরিশ্রান্ত ও ইয়াছিলাম, পথক্রান্তিতে ও ভয়ে আমরা সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম; আমাদের উত্থানশক্তি রহিত হইল।



ব্রাহ্মণ্য
শিক
জাহাজ



ক্রমে বেলো শেষ হইয়া আসিল। স্বর্গাস্তকালেও আমরা সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম। মহাশব্দে সহসা সেই গৃহের দ্বার খুলিয়া গেল এবং গৃহমধ্যে একটি কৃষ্ণবর্ণ মহুয়মূর্তি প্রবেশ করিল। তাহার দেহটি ভালগাছের জায় দীর্ঘ, আকার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কপালে প্রজ্জ্বলিত কয়লার জায় দীপ্যমান একটি চকু, তাহার সম্মুখের দাঁত অত্যন্ত দীর্ঘ ও স্তীক্ল, —এত দীর্ঘ যে, তাহা বৃকের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কর্ণ হস্তিকর্ণের জায়, তাহাতে কর্ণদেশ আবৃত, নখগুলি ধাকা ও অত্যন্ত দারাল। এই কদাকার ভীষণ রাকসকে দেখিয়া আমরা ভয়ে মুঞ্জিত হইয়া পড়িলাম এবং বহুক্ষণ যতের জায় শুক হইয়া রহিলাম। মুচ্ছাভঙ্গে দেখিলাম, সেই রাকসটা আমাদের নিকটে বসিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমাদের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছে। অনেকক্ষণ ভাল করিয়া

দেখিয়া, সে তাহার দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া, আমার দাড় চাপিয়া ধরিল, কিন্তু আমার বেহে কেবল হাড় ও চামড়া ভিন্ন অঙ্গ পদার্থ নাই ভাবিয়া আমাকে পরিত্যাগ করিল এবং আমার সঙ্গিপকে একে একে এইভাবে পরীক্ষা করিতে লাগিল। আমাদের জাহাজের ক্যাপ্তেন সর্বাপেক্ষা অধিক দৃষ্টপুষ্টি ছিল, রাক্ষসটা তাহাকে ধরিয়া শিকে বিদ্ধ করিল এবং আঁখি জালিয়া তাহাকে ঝলসাইয়া ভক্ষণ করিল। আহোরের পর সে নাক ডাকাইয়া ঘুমাইতে লাগিল, মেথগর্জনে অপেক্ষাও ঘোরতর নাসিকাগর্জনে হইতে লাগিল। রাক্ষস পরদিন প্রভাত পর্যন্ত ঘুমাইল, আমরা যৎপরোনাস্তি ভয় ও দ্রুতিতায় রাতিযাপন করিলাম। পরদিন প্রভাতে সে উঠিয়া সেই অট্টালিকা পরিত্যাগ করিল।

রাত্রিতে রাক্ষসের ভয়ে আমরা নিশ্চেষ্ট ছিলাম, এখন চীৎকার করিয়া কান্দিতে লাগিলাম। আমরা সংখ্যার নিত্যই অল্প লোক ছিলাম না, কিন্তু তথাপি সেই রাক্ষসের হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন উপায় দেখিলাম না, তাহাকে বধ করিবার যে কোন সম্ভাবনা আছে, সে কথা আমাদের মনেই আসিল না।

রাক্ষসটা প্রস্থান করিলে, আমরা অল্প কোন স্থানে আশ্রয় লইবার ইচ্ছায় সেখানে হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু সে দীপে আর কোথাও মাথা রাবিবার স্থানও দেখিলাম না; অগত্যা দলসল ভক্ষেণে ক্ষুধা-নিবারণের পর আমরা সেই গৃহেই কিরিয়া আসিলাম। সে দিনও অপরাহ্নকালে রাক্ষস সেই প্রাঙ্গণে কিরিয়া আসিয়া, আমাদের আর একটি সঙ্গীকে পূর্ববৎ কাবাব করিয়া খাইল, তাহার পর শয়ন করিয়া নাসিকাগর্জনে আরম্ভ করিল। আমার সঙ্গিপ এখন জীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের কেহ কেহ এরূপ ভাবে নিহত হওয়া অপেক্ষা সমুদ্রে ডুবিয়া মরা অল্প ক্লেশকর মনে করিতেছিল। একজন বলিল, “এরূপ ভাবে প্রতিদিন দণ্ড হইয়া মরা অপেক্ষা এই রাক্ষসটাকে মারিবার চেষ্টায় মরাও অনেক ভাল।” অবশেষে আমরা সকলে পরামর্শ করিয়া সমুদ্রতীরে কয়েকখানি ভেলা নির্মাণ করিয়া তাহা জলে ভাসাইয়া রাখিলাম, প্রত্যেক ভেলার একদিকে তিন জন করিয়া লোক উঠিবার উপযোগী হইল।

সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা সেই প্রাঙ্গণে কিরিয়া আসিলাম। রাক্ষস আমাদের মধ্য হইতে আর একজনকে খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিল, তাহার পর পূর্ব-পূর্ব দিনের তায় শয়ন করিল। তাহার নাসিকাগর্জনে আরম্ভ হইলে বুঝিলাম, সে নিদ্রিত হইয়াছে, তখন আমরা দশজন লোক প্রত্যেক এক একটি শিক লইয়া তাহার অগ্রভাগ আঁত্রে লাগ করিয়া গুড়াইলাম এবং সেগুলির দ্বারা সেই রাক্ষসের ললাটস্থ একটি মাত্র চক্ষু বিদ্ধ করিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া ফেলিলাম।

চক্ষুর যন্ত্রণায় রাক্ষসটা বিকট গর্জনে করিতে লাগিল, তাহার আর্তনাদে চতুর্দিক কম্পিত হইয়া উঠিল, তাহার পর সে শব্দা ত্যাগ করিয়া আমাদের দিকে ধরিবার জ্ঞান ছই বাহ বিস্তার করিল; কিন্তু আমরা দূরে সরিয়া গড়িয়াছিলাম, স্তব্ধতা কাহাকেও সে করকবলিত করিতে পারিল না। তাহার পর তাহাকে আমাদের সন্ধানে ধাবিত হইতে দেখিয়া, আমরা নানা স্থানে লুকাইলাম। রাক্ষস ক্রোধে ও যন্ত্রণায় সে গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক একদিকে ধাবিত হইল।

আমরা সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া ভেলার উপর উঠিয়া বসিলাম;—তাবিলাম, যদি রাক্ষসটা আবার আমাদের আক্রমণ করিতে আইবে, তাহা হইলে অগত্যা আমাদের দিকে ভেলা সমুদ্রে ভাসাইতে হইবে, অতথা আমরা অল্প স্থান না পাওয়া পর্যন্ত সেই দীপেই অপেক্ষা করিব। মধ্যাহ্নকালে দেখিলাম, সেই রাক্ষসটা তাহার তায় ভাঙার আর দুইটা রাক্ষসকে সঙ্গে লইয়া, দ্রুতবেগে আমাদের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। তাহাদের পশ্চাতে আরও বহুসংখ্যক রাক্ষস।



এই অন্ধকার রাত্রে স্নেহবান্ধব আমরা সমুদ্রতীরে ভেলা ভাসাইয়া দিলাম। রাক্ষসজাতি সমুদ্রতীরে হইতে সন্ধ্যাকালে একত্র সম্মেলন হয়, আমাদের ভেলা লক্ষ্য করিয়া ছুড়িতে লাগিল। সেই প্রকৃতভাবে ভেলায় ভাসিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে আরোহিণীগণকেও সমুদ্রগর্ভে মগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইতে হইল। কেবল আমি ও আমার হইজন সঙ্গী যে ভেলায় ছিলাম, তাহাই রক্ষা পাইল।

ইঙ্গিত
এ গ্রাম

সময়ে ভাগিতে ভাগিতে আমরা আর একটি দীপে উপস্থিত হইলাম। সেই দীপে উগ্রিয়া, ফলমূলাদি আহ্বার করিয়া, সন্ধ্যাকালে আমরা সমুদ্রতীরেই শয়ন করিলাম; পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং অল্পকালের মধ্যে নিদ্রা আসিল। হঠাৎ শব্দ শব্দে জাগিয়া দেখি, আমাদের অদূরে একটি বৃহৎ সর্প!—তালগাছের ভায় লম্বা, কুণ্ডল ও সেইরূপ। আমরা বৃক্ষে উঠিতে না উঠিতে সর্পটি মুখ বিস্তার করিয়া আমাদের একজন সঙ্গীকে গ্রাস করিল।

আমার অজ্ঞ সঙ্গী ও আমি উদ্ধ্বাসে পলায়ন করিলাম, কিন্তু বহু দূর হইতে তিনিতে পাইলাম, সর্পটি মহাশব্দে তাহার উদরস্থ অস্থিরাশি বমন করিতেছে। আমরা অপেক্ষাকৃত নিরাপদে রাত্রিবাস করিবার জন্ত একটি উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় আরোহণ করিলাম। কিন্তু অনতিবিলম্বেই সর্পের আগমনসূচক শব্দ শব্দ তিনিতে পাইলাম। আমরা যে বৃক্ষে আশ্রয় লইয়াছিলাম, সর্পটি অবশেষে সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং বৃক্ষের উপর তাহার মুখ প্রদারিত করিল। আমার সঙ্গীটি অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী শাখায় বসিয়া ছিল, সর্প তাহাকে ধরিয়া পক্ষীর স্থায় অবলীলাক্রমে গ্রাস করিয়া ফেলিল।

সমস্ত রাত্রি সেই বৃক্ষশাখায় আমি জীবদ্ভূতের স্থার অবস্থান করিলাম। রাত্রি প্রভাত হইল, কিন্তু আমার সর্পভয় দূর হইল না। সর্পের হস্ত হইতে পরিত্রাণের আশার কতকগুলি শুক কণ্ট সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষমূল পরিবেষ্টিত করিয়া অগ্নি জ্বালিলাম। আমাকে ভক্ষণ করিবার জন্ত সর্পটি সেই রাত্রিতে আবার সেইখানে উপস্থিত হইল, কিন্তু অগ্নির উত্তাপে নিকটে আসিতে পারিল না, অদূরে থাকিয়া ক্রোধে গর্জন করিতে লাগিল; অবশেষে প্রভাতে সে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। আমি তখন বৃক্ষ হইতে নামিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম; জনমগ্ন হইয়া কষ্টকর জীবন বিদর্জন দিব ভাবিতেছি, এমন সময় দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম। জাহাজস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত আমার পাগড়ী খুলিলাম এবং তাহা আলোলন করিয়া উল্কেষের তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করিলাম। অনেকক্ষণ পরে আমার চেষ্টা সফল হইল। জাহাজের কাপ্তেন আমাকে দেখিত্ত পাইয়া আমার জন্ত একখানি নৌকা পাঠাইলেন।

সেই নৌকার আরোহণ করিয়া যথাকালে আমি জাহাজে উপস্থিত হইলে, আরোহিণি আমার ইতিহাস জানিবার জন্ত অভ্যস্ত উৎসাহ হইলেন। আমি তাহাদিগকে আমার বিপদের সকল কথা খুলিয়া বলিলাম,— দেখলাম, তাহারাও সেই নরভুক রাক্ষস ও সর্পের বিবরণ অবগত আছেন।

সীমাবদ্ধ-
এ প্রকার
জীবিত
সময় দূর

সেই জাহাজে আরোহণ করিয়া, আরও অনেক দীপ ঘুরিয়া, আমরা মালাহত দীপে উপস্থিত হইলাম। এই দীপে চন্দনকাঠের আবাদ হয়। এই দীপের বন্দরে জাহাজ নঙ্গর করিয়া আরোহিণি তাহাদের পণ্যদ্রব্য কতক বিক্রয় করিলেন এবং কোন কোন পণ্যদ্রব্যের পরিবর্তে সেই দীপজাত নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া জাহাজে তুলিলেন। এই সময় একদিন জাহাজের কাপ্তেন আমাকে বলিলেন, “তাই, আমরা জাহাজে একজন সদাগরের কতকগুলি জিনিষ আছে, তাহার মূল্য হইয়াছে, সুতরাং সামগ্রীগুলি বিক্রয় করিয়া, যাহা কিছু লাভ হইবে, তাহা মৃত সদাগরের উত্তরাধিকারিণীগণকে প্রদান করিব, যদি তুমি অস্বগ্রহ করিয়া এ সকল দ্রব্যের ভার গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি বিশেষ সুখী হইব।”

ঐ সকল শ্রব্য কোন সঙ্গারের, তাহা বিজ্ঞান করার কাণ্ডে বসিলেন, “উহা সিন্ধবান নামক একজন নাবিকের মাল।” কাণ্ডের কথা শুনিয়া আমি কৌতুহলিত্তে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহাকে চিনিতে আর বিলম্ব হইল না। দ্বিতীয়বার বাহার জাহাজে আমি সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলাম, সেখান, এ ব্যক্তি সেই কাণ্ডের। কাণ্ডের সহিত শীতাই আমার পরিচয় হইয়া গেল, তিনি বলিলেন, পূর্ববার আমরা বোপে নামিলে, আমি জাহাজে উঠিয়াছি কি না, তাহার সন্ধান না লইয়াই তিনি জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্তই আমাকে বহু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। বাহা হউক, কাণ্ডের আমার নিকট রূপা প্রার্থনা করিলেন এবং আমাকে এতদিন পরে জীবিত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। আমার যে সকল শ্রব্য তিনি বিভিন্ন বন্দরে বিক্রয় করিয়াছিলেন, সে সকল শ্রব্যের মূল্য আমাকে প্রদান করিলেন। আমি কাণ্ডের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম।

মালাহত বোপ হইতে আমরা আর একটি বোপে উপস্থিত হইয়া অনেক মঙ্গল ক্রয় করিলাম, এবং নানা স্থান ঘুরিয়া বাগদোয়ার প্রত্যাভর্তন করিলাম। বাগদোয়া হইতে বোম্বাদ আসিবার সময় আমি বাগিজালক এত অধিক অর্থ সঙ্গে লইয়া আসিলাম যে, তাহার সংখ্যা হয় না। গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দীন-দুখীকে অনেক টাকা দান করিলাম, অনেক ভূগুণ্টিও ক্রয় করিলাম।

সিন্ধবাদ নাবিক তাহার তৃতীয়বারের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ শেব করিয়া, পূর্ব পূর্ব দিনের স্তায় শ্রমিক সিন্ধবাদকে শতমুদ্রা প্রদান করিলেন, এক তাহার বহুগুণকে পরদিন তাহার গৃহে আসিয়া তাহার চতুর্থবারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণের নিমন্ত্রণ করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, হুতরাং সে দিন সভ্যত্ব হইল।



সমুদ্র হইতে তৃতীয়বার প্রত্যাভর্তনের পর আমি অনেক দিন সংসার-হুখে মগ্ন ছিলাম, কিন্তু আমার আমার মনে ধীরে ধীরে সমুদ্রযাত্রার বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল; হুতরাং আমি পুনর্বার সমুদ্রযাত্রা করিলাম। এবার পারশ্বাভিমুখে যাত্রা করা গেল। পূর্বগঙ্গারী বোপপুত্র সন্দর্শন করিয়া আমাদের জাহাজ সমুদ্রপথে অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময় একদিন প্রচণ্ড ঝটিকাযোগে জাহাজের সমস্ত পাল সহস্রখণ্ডে ছিন্ন হইয়া গেল; কাণ্ডের বিশেষ চেষ্টা করিয়াও জাহাজ রাখিতে পারিল না, একটি বালুকাময় চরে বাধিয়া জাহাজখানি চূর্ণ হইয়া গেল, পলায়ন্যবাসী সমস্ত নষ্ট হইয়া গেল।

আমি এবং অস্ত্রান্ত কয়েকজন নাবিক ও সঙ্গার তত্ত্বা অবলম্বন করিয়া অদ্রবতী বোপের দিকে ভাসিয়া চলিলাম। তীরে উঠিয়া স্থলীত জল ও স্থপক ফলে ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করিয়া আমরা শয়ন করিলাম; অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম, শীতাই নিশ্চিত হইয়া পড়িলাম।

পূর্ণদিন প্রভাতে গাংগোপান করিয়া লোকালয়ের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছি, এমন সময় সেই দেশের কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসী আসিয়া আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিল। আমি ও আমার পাঁচজন সহচর তাহাদের সহিত তাহাদের গৃহে চলিলাম। আমরা সকলে সেখানে উপবেশন করিলে তাহারা কতকগুলি লতা আনিয়া আমাদিগকে আহার করিবার জন্ত অল্পরোধ করিল। ইহা আহার করিলে হয় ত কোন অপকার হইবে ভাবিয়া আমি তাহা আহার করিলাম না। কিন্তু আমার সহচরগণ অত্যন্ত আগ্রহের সহিত তাহা চর্ষণ করিতে লাগিল। ইহার ফল অবিলম্বেই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইল; কারণ, ক্রিয়াকাল পরে তাহাদের জ্ঞানলোপ হইল, উন্নতির স্তায় প্রাণাণ বলিতে আরম্ভ করিল। বোপবাসিন্দ

সমুদ্রের শিখরে
প্রতিষ্ঠা।

সিন্ধ-
বান্দেহ
চতুর্থ
সমুদ্র-
যাত্রা

নরহত্ব রাক্ষস-
মলের কবলে



তাহার পর কতকগুলি চাউল নারিকেলতৈলে ভাজিয়া আমাদিগকে খাইতে দিল, আমার সঙ্গিগণ উন্নতবৎ হইয়া তাহা প্রচুর পরিমাণে আহার করিল, আমি অল্পপরিমাণ খাইলাম।

এই লোকগুলো নরহত্ব মনুষ্য। ক্রমাগত চাউল খাওয়াইয়া, আমাদিগকে ছুটেপুটে করিয়া, পক্ষে আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে, তাহাদের ইহাই অভিপ্রায় ছিল। আমার সঙ্গিগণ ভবিষ্যৎ জ্ঞান হারা হইয়া, তাহাদের কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম, প্রতিদিন দুশ্চিন্তায় আমি দিন ও দুর্কল হইতে লাগিলাম। ক্রমে আমার সঙ্গিগণকে দুর্কৃতরা নিহত করিয়া ভক্ষণ করিল, চাউল আমি পীড়িত হইয়া পড়িলাম, হস্তরাং সে অবস্থায় আমার মাস বিশেষ স্পৃহণীয় হইবে না ভাবিয়া তাহারা আমাকে রাখিয়া দিল।

অতঃপর তাহারা আমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিল না, আমি তাহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবা না ভাবিয়া তাহারা নিশ্চিত ছিল, আমি যেখানে ইচ্ছা, বাইতে পারিতাম। একদিন দুইদিন ঘুরিয়া আমি এই দুর্কৃত নরখাদকগণের বাসস্থান পরিত্যাগ করিলাম। একটি বৃদ্ধ আমাকে পলায়ন করিতে দেখিয়া আমাকে আহ্বান করিল, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই আমি ক্রতবেগে চলিতে লাগিলাম এবং তাহার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিলাম। পাছে ইহারা দলবদ্ধ হইয়া আমার অনুসরণ করে, ইহা ভাবিয়া আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোড়ার চলিলাম, ক্রমাৎ বোধ হওয়ায় নারিকেলের জলে ও শস্তে উদর পরিপূর্ণ করিলাম। এভাবে দিন কাটিতে লাগিল, শোকালয় হইতে দূরে দূরে থাকিয়া আমি চলিতে লাগিলাম।

অষ্টম দিনে সমুদ্রতীরে আসিয়া দেখিলাম, আমার মত কতকগুলি গৌরবর্ণ লোক সমুদ্রতীরে গোলমরিচ সংগ্রহ করিতেছে। আমি তাহাদিগকে দেখিয়া যথেষ্ট আশস্ত হইলাম; তাহারা আমাকে দেখিয়া আরবী ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; আমি তাহাদের মধ্যে আমার মাতৃভাষা শুনিয়া অত্যন্ত আশ্বাসিত হইলাম, এবং তাহাদিগকে আমার দুর্ভাগ্যের কথা বলিলাম। তাহারা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, “এই সকল লোক নরহত্ব, তুমি বড় অদ্ভুত উপায়ে ইহাদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছ।”

আমি এই লোকগুলির সঙ্গে থাকিলাম। যথেষ্ট পরিমাণ মরিচ সংগ্রহ হইলে তাহারা জাহাজ ছাড়িয়া তাহাদের দেশে ফিরিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে তাহাদের দেশে উপস্থিত হইলাম। তাহারা আমাকে সঙ্গে লইয়া তাহাদের রাজার নিকট লইয়া গেল। রাজা আমার সকল কাহিনী শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, এবং আমাকে পরিচ্ছন্ন প্রদান করিয়া আমাকে বিশেষ যত্ন করিবার জন্ত তাঁহার কন্দর্ভচারিগণকে আদেশ করিলেন। আমি এই রাজার দয়ার আপনাকে নিরাপদ ও সুখী মনে করিতে লাগিলাম। কিছুদিনের মধ্যেই আমি রাজা মহাশয়ের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলাম; সে জন্ত রাজকন্দর্ভচারিগণ সকলেই আমাকে অত্যন্ত ষাতির যত্ন করিতেন, অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের বহুলোকের সহিত আমার আত্মীয়তা ও বন্ধুতা সংস্থাপিত হইল।

এ দেশে আসিয়া এক অদ্ভুত ব্যবহার দেখিলাম। রাজা হইতে সামান্ত প্রজা পর্যন্ত কেহই জীন বা লাগামের ব্যবহার জানে না। আমি রাজাকে সুবিধা বুঝাইয়া দিলাম, রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে জীন ও লাগাম প্রস্তুত করিবার কৌশল জিজ্ঞাসা করিলেন; আমি একজন মিস্ত্রীকে দিয়া তাহা প্রস্তুত করাইলাম। রাজা জীন-লাগামে অধারোহণ করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন, আমার প্রতি পুরস্কার-প্রদানের আদেশ হইল। নগরের অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও জীন-লাগাম দিয়া অধারোহণে অভ্যাস আয়ত্ত করিলেন। আমার ভক্তবৃন্দ ও অনুচরগণ সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি হইল।

জাত রাজ্যে
সমায়



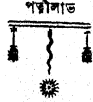
আমি প্রায় প্রতিদিনই রাজসভায় উপস্থিত থাকিতাম। একদিন রাজা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “সিন্ধবাদ, আমি তোমাকে বিশেষ স্নেহ করি, আমার প্রজাপণও তোমাকে আন্তরিক প্রদান করিয়া থাকে; আমি তোমাকে একটি অস্ত্ররোধ করিব, তোমাকে তাহা রক্ষা করিতে হইবে।” আমি শুনিলেও তাহার অস্ত্ররোধরক্ষায় সন্মত হইলে, তিনি বলিলেন, “তুমি এখানে একটি সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ কর, তাহা হইলে আর স্বদেশের প্রতি তোমার আকর্ষণ থাকিবে না, তুমি আমাদের দেশেই চিরজীবন বাস করিবে।” আমি রাজ-আজ্ঞার প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না, রাজা স্বয়ং চেষ্টা করিয়া একটি সুন্দরী, ধনবতী, গুণবতী যুবতীর সহিত আমার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পর আমি আমার জ্বর গৃহে বাস করিতে লাগিলাম। বলা আবশ্যক, আমি সুখী হইয়াছিলাম, তথাপি আমি চিরজীবন এই প্রবাসে বাস করিব, এরূপ আমার অভিপ্রায় ছিল না, সুযোগ পাইলেই আমি জ্বীকে লইয়া পলায়ন করিব, আমার মনে মনে এই প্রকার সংকল্প ছিল। বোগাদে আমার রাজপ্রসাদতুল্য গৃহ, আমার অতুল ঐশ্বর্য, বহুবান্ধব প্রিয়জনগণের কথা আমি কোন দিনই ভুলিতে পারি নাই।

মনে মনে এই সকল কথা আন্দোলন করি, কিন্তু উপায় দেখিতে পাই না। অবশেষে একদিন আমার সুপরিচিত একটি প্রতিবাদীর পত্নীবিয়োগ হইল। আমি সেই বন্ধুকে সাধনা করিয়া বলিলাম, “তোমার স্ত্রী অকালে প্রাপত্যাগ করিলেন, আল্লার বাহা ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল, আল্লার মজ্জাতে তুমি দীক্ষাবী হও।” বন্ধু বিলাপ করিয়া বলিলেন, “তুমি আমাদের দেশের আচার-ব্যবহারের কথা জান না বলিয়াই এরূপ বলিতেছে, আমার জীবনও শেষ হইয়া আদিরাছে। আমার স্ত্রীপত্নীর দেহের সহিত আমার দেহও সমাহিত করা হইবে, এ দেশের ইহাই নিয়ম। স্বামী মরিলে জ্বীকে সহমরণে বাইতে হয়, স্ত্রী মরিলে স্বামীকে সহমরণে বাইতে হয়, চিরকাল এই নিয়মে কাজ হইতেছে; আমাকেও এই নিয়ম পালন করিতে হইবে, অস্ত্র উপায় নাই।”

বন্ধুর কথা শুনিয়া ভয় ও বিষয়ে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কি কুসংসিদ্ধ বর্কর নিয়ম! দেখিলাম, অবিলম্বে বন্ধুপত্নীর সহিত বন্ধুর সমাধির আরোহণ হইতে, লাগিল, আশীষবন্ধু ও প্রতিবাদিপণ দলে দলে



প্রথমদী



সমাধি-
বিলাপ



মৃত্যুপথযাত্রী বন্ধুর গৃহে সমবেত হইল। বন্ধুগণের মৃতদেহ বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে সুসজ্জিত হইল, তাহার পর সেই মৃত্যুর স্বামীকেও সজ্জিত করিয়া দশনানভিমুখে লইয়া যাওয়া হইল।

মীর সহমরণ



একটি উচ্চ পর্বতশিখরে আসিয়া, একটি গভীর গুহাঘারে শব নামান হইল, গুহাটির দ্বার প্রস্তরের দ্বারা আবৃত ছিল, সেই প্রস্তরখণ্ড অপসারিত করিয়া শববাহিগণ মৃতদেহটি বজ্রালঙ্কারমণ্ডিত অবস্থাতেই সেই গুহামধ্যে নামাইয়া দিল, তাহার পর সেই মৃত্যুর হতভাগ্য স্বামীকে সাত খণ্ড ঋটি ও এক পাত্র জল দিয়া নিষ্ঠুররা সেই গুহাগর্ভে নামাইয়া দিল। এইরূপে হতভাগ্যকে জীবন্ত সমাহিত করিয়া, গুহাদ্বার প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা পুনরুদ্ধার বন্ধ করিয়া, সকলে গৃহে প্রত্যাপন করিল। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি মর্শ্বাহত হইলাম; রাজাকে বলিলাম, “মহাশয়, এমন পৈশাচিক দৃশ্য আর কুত্রাপি দেখি নাই, জীবিত ব্যক্তিকে মৃতব্যক্তির সহিত সমাহিত করা বড়ই বর্বরপ্রথা, আমি অনেক বেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন প্রথা পরিত্যজ এই প্রথম পাইলাম। এ কি কুংসিত নিয়ম!” রাজা বলিলেন, “সিন্ধবাদ, এ বিষয়ে আমার কোন হাত নাই। ইহা এ দেশের সামাজিক নিয়ম, আজ যদি আমার রাণীর মৃত্যু হয়, তবে আমাকেও এই নিয়মে বাধ্য হইতে হইবে, আমিও রাণীর সহিত জীবিত ভূগর্ভে সমাহিত হইব!” আমি কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “বিদেশী সম্বন্ধে কি এই নিয়ম?” রাজা হাসিয়া বলিলেন, “কোন বিদেশী যদি এ দেশের রমণীকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহাকেও আমাদের দেশের নিয়ম অনুসারে মৃত্যু পত্নীর সহিত সমাহিত হইতে হইবে। আমরা না কখন, যদি তোমার পত্নী তোমাকে রাখিয়া পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে তোমাকেও তাহার মৃতদেহের সহিত সমাহিত হইতে হইবে।”

আমি এই কথা শুনিয়া, মহা ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলাম; এ বিপদ হইতে পরিত্রাণের কোনই উপায় খুঁজিয়া পাইলাম না। নরভুক্ত জাতির হস্তে নিহত হওয়া অপেক্ষা ইহা কোনরূপে বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমার মনে হইল না। আমার জীবন সামান্য অমূল্য হইলেই আমার অন্তরাখ্যা কীপিয়া উঠিত। অবশেষে সত্য সত্যই আমার জীবন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া শব্যাগত হইলেন, অবশেষে তাঁহার মৃত্যু হইল।

আশ্চর্য্যকার আর কোন উপায় নাই। আমাকে আমার জীবন সহিত সমাহিত করিবার জন্য মহা সমারোহে আয়োজন হইতে লাগিল। রাজা আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ পাত্রমিত্র লইয়া সমাধিস্থলে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রধান প্রধান নগরবাসীগণও সজ্জিত হইলেন, চারিদিকে আনন্দোৎসব উপস্থিত হইল, কেবল আমি আতুলভাবে কঁাদিতে লাগিলাম।

বর্বর প্রথা
জীবন্ত সমাধি



অবশেষে আমাকে আমার জীবন সহিত মৃতদেহের সহিত পর্বতশৃঙ্গে উপনীত করা হইল। আমি রাজার চরণ দুখানি ধরিয়া প্রাণভিক্ষা চাহিলাম,—বলিলাম, আমি বিদেশী, আমার মার্জনা করুন,—কিন্তু তাহাতে রাজার হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল না, কেহই আমার কাতর-প্রার্থনার কর্পাপাত করিল না। আমি সাতখানি ঋটি ও এক পাত্র জল সহ সেই গুহাগর্ভে আমার পত্নীর মৃতদেহের সহিত নিক্ষিপ্ত হইলাম। রাজকর্মচারিগণ আমাদের দেহ রক্ষা করিয়া, সেই মহা অন্ধকারপূর্ণ পর্বতগুহার নামাইয়া দিল, আমার কাতর আবেদন তাহাদের কর্ণে পৌছিল না, তাহার। গুহাযুগ প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আমার জীবন্ত সমাধি হইল!

গুহাগর্ভে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, পর্বতগাত্রের একটি ফাটল দিয়া গুহামধ্যে অল্প আলোক ও বায়ু প্রবেশ করিতেছে। গুহাটি বিস্তীর্ণ, বোধ হয় দশ হাত গভীর। মৃতদেহ হইতে পুতিগন্ধ উঠিয়া

শীতই আমাকে কিশুৎ করিয়া তুলিল, সে দুর্গন্ধ অসহ্য, শত শত শবের গলিত দেহ হইতে সেই পুতিগন্ধ উঠিতেছিল; আমার নিশ্বাস রোধ হইয়া আসিল। আমি সেই গুহার এক প্রান্তে পড়িয়া অশ্রুশ্রবণে ভাসিতে লাগিলাম। হায়! এতবার এত বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়া শেষে কি এই ভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে হইবে? ইহাই কি আমার ইচ্ছা? যদি আমি বাড়ী ছাড়িয়া না আসিতাম, তাহা হইলে কত সুখে আমার কালাতিপাত হইত, এমন বিপদে কখন পড়িতে হইত না। খোদা মালিক! আমি কাতরভাবে আল্লাকে ডাকিতে লাগিলাম; আমার কাতর আর্তনাদ সেই গুহাগর্ভেই বিলীন হইল।

কিন্তু সেই সমাধিগুরুদেরও আমার জীবনধারণের আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠিল। মাছুষ সহজে প্রাণের আশা ত্যাগ করিতে পারে না। আমি অবসরদেহে কিশুৎ বলসক্করের অভিশ্রমে সেই রুটি ও জল পান করিলাম। যে জল ও রুটি ছিল, তাহা ধারা করেক দিন দেহরক্ষা করিলাম, তাহার পর আর কোন সঞ্চয় রহিল না, আমি ক্ষুধা ও তৃষ্ণার আকুল হইয়া পড়িলাম; বৃষ্টিলাম, অনাহারে ও পিপাসাতেই আমার প্রাণবায়ু বহির্গত হইবে।

আমি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম; ক্ষুধার আর নড়িবার শক্তি রহিল না। এই ভাবে একদিন বসিয়া আছি, দেখিলাম, ধীরে ধীরে গুহাঘারের প্রস্তরখণ্ড উন্মোচিত হইল। তাহার পর সেই পথে গুহামধ্যে একটি মৃতদেহ ও একটি জীবিতদেহ উপর হইতে ধীরে ধীরে নামাইয়া দেওয়া হইল। মৃতবাক্তি পুরুষ। দেখিলাম, পাখণ্ডরা ত্রীকে স্বামীর মৃতদেহের সহিত গুহার নিক্ষেপ করিয়াছে। রমণী গুহাগর্ভে অবতরণ করিবামাত্র আমি কথেকথও বৃহৎ অস্থি সংগ্রহ করিয়া সেই বিধবার মস্তকে সজোরে আঘাত করিলাম। কয়েকবার আঘাতেই তাহার প্রাণ বহির্গত হইল, সে হয় ত মনে করিল, ভূতের হাতেই তাহার প্রাণ গেল। যাহা হউক, হতজ্ঞান হইয়া আমাকে এই পিশাচের কার্য করিতে হইল। জীবনের মায়ায় মানুষকে এমন পৈশাচিক আচরণও করিতে হয়।

ত্রীলোকটিকে নিহত করিয়া আমি তাহার জল ও রুটি ধারা উদর পূর্ণ করিলাম, ক্ষুধার প্রাণ বহির্গত হইতেছিল, তৃষ্ণার বুক কাটিয়া বাইতেছিল, রুটি খাইয়া ও জল পান করিয়া অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইলাম। এই রুটি ও জলে কয়েক দিন চলিল। ইতিমধ্যে আর একটি মৃতদেহ ও জীবিত বাক্তি সেই গুহাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল। সেবার দেখিলাম, জীবিত বাক্তি পুরুষ, ত্রীর সহিত তাহাকে সমাহিত করা হইয়াছে। এই সময় নগরের মড়ক উপস্থিত হওয়ায় আমার পানাহারের আর কোন কষ্ট রহিল না।

পরে একদিন আমি একটি রমণীকে পূর্বোক্ত প্রকারে নিহত করিয়া পানাহারের সংস্থান করিতেছি, এমন সময় সেই অন্ধকারের মধ্যে আমি যেন কাহার পদশব্দ ও নিশ্বাসের শব্দ শুনিতে পাইলাম। আমি শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলাম; বোধ হইল, কেহ যেন আমার অগ্রে অগ্রে ছুটয়া পলাইতেছে। ক্রতবেগে তাহার অঙ্গুলরণ করিতে লাগিলাম, অবশেষে অনতিদূরে একটি আলোকচ্ছটা দেখিতে পাইলাম; কোন নক্ষত্রের আলোক বলিয়া অনুমান হইল। আমি সেই আলোকে দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলাম। কখন তাহা অস্তিত্ব হইল, আমার দৃষ্টিপাচর হয়। এই ভাবে চলিতে চলিতে অবশেষে আমি একটি ক্ষুদ্র গুহাঘার উপস্থিত হইলাম; বৃষ্টিলাম, কোন বস্ত্রজঙ্ঘ এই পথে সমাধিগুহার প্রবেশ করিয়া, মৃতদেহ তদ্রূপ করিতেছিল, আমি তাহারই অনুসরণ করিয়া এই গুপ্তপথে আসিয়াছি।

আমি গুহা পরিত্যাগ করিয়া আবার পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিলাম। উর্কে নির্মল আকাশ, চতুর্দিক আলোকময়, আমি প্রাণলাভ করিলাম। উত্তর করতল যুক্ত করিয়া আমি প্রাণ ভরিয়া আল্লার নাম লইলাম; বৃষ্টিলাম, আমার কাতর প্রার্থনা গুহাগর্ভ হইতে ঈশ্বার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল।

সমান-গহ্বরে
মৃত্যুই কি
ভাগ্যলিপি!



আলার কীর্ণ-
আলোক



গুহার বাহিরে আসিয়া, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া, আমি চতুর্দিক্ ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। এ স্থানটি সমুদ্র ও নগরের মধ্যস্থল। কিন্তু নগরের সহিত এ স্থানের কোন সন্ধন নাই, উচ্চপর্কতল্শ্র আকাশ স্পর্শ করিয়া সমুদ্রকূল ও নগরের মধ্যে ব্যবধান স্ফটিক করিয়াছে।

১২ পৃষ্ঠা
১২৫৫

আমি পুনর্বার গুহাগর্ভে প্রবেশ করিলাম, তাহার পর যে কিছু খাজদ্রব্য, মণিসুজ্ঞা, হীরকাদি ও স্বর্ণালঙ্কার পাইলাম, তাহা সংগ্রহ করিয়া একটি গুপ্তস্থানে সেই সকল দ্রব্য লুকাইয়া রাখিলাম, এবং সমুদ্রতীরে আসিয়া উদ্ধারের উপায় দেখিতে লাগিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে দুই তিন দিনের মধ্যেই একখানি জাহাজকে পা'ল তুলিয়া যাইতে দেখিলাম। আমি যে স্থানে বসিয়া ছিলাম, জাহাজখানি তাহার নিকট দিয়াই যাইতেছিল, আমি বস্ত্র আন্দোলিত করিয়া জাহাজের আরোহিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম; আমার উচ্চ আহ্বানধ্বনিও বোধ হয়, তাহারা শুনিতে পাইয়াছিল, তাহারা আমাকে লইবার জন্ত একখানি নৌকা পাঠাইয়া দিল। আমি সেই নৌকাযোগে জাহাজে উপস্থিত হইলাম। জাহাজের আরোহিগণ আমাকে সেই সমুদ্রতীরে একাকী উপস্থিত হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমার ইতিহাস এতই অদ্ভুত যে, তাহা তাহারা কোন ক্রমে বিশ্বাস করিবে না। তাহারা আমি সে কথা গোপন রাখিয়া বলিলাম, “আমি একজন সদাগর, আজ হুদিন জাহাজ ভাঙ্গিয়া এই সমুদ্রতীরে পড়িয়াছিলাম, আমার যথাসর্ব্বশ জাহাজের সঙ্গে ডুবিয়া গিয়াছে।” জাহাজের আরোহিগণ সকলেই আমার কথা বিশ্বাস করিয়া আমার সহিত আশ্চর্য্য সহ্যভূতি প্রকাশ করিল।

আমি গুহাগর্ভ হইতে যথেষ্ট ধনরত্ন অলঙ্কারাদি সঞ্চয় করিয়াছিলাম। অতঃপর আমরা কয়েকটি দ্বীপে উপস্থিত হইলাম, এবং সেই সকল স্থানে বাণিজ্য শেষ হইলে জাহাজ কেলা দ্বীপে আসিয়া নঙ্গর করিল। এই দ্বীপে অপর্যাপ্ত নীসকের খনি ছিল, আমরা প্রচুর পরিমাণে নীসা ও কপূর লইয়া জাহাজে উঠিলাম।

১৩ পৃষ্ঠা
১৩৫৫

কৈলাষীপের রাজা অত্যন্ত ধনবান্ ও প্রতাপশালী; তাহার রাজত্ব বহুদূর বিস্তীর্ণ; কিন্তু এই দেশের লোকগুলি এমন অসভ্য যে, তাহারা পরমভূক্তির সহিত নরমাংস ভক্ষণ করে। এই দ্বীপে বাণিজ্য শেষ হইলে আমরা জাহাজ ছাড়িয়া, আরও কয়েকটি বন্দর ঘুরিয়া স্বদেশে আসিলাম। এবারও আমি যে ধনরত্ন সঙ্গে আনিয়াছিলাম, তাহা অপর্যাপ্ত, আমি সেই ধন কিঞ্চিৎ পরিমাণে গরীব-দুঃখীকে দান করিলাম, কিছু মন্দিরদেও প্রদান করিলাম। তাহার পর আমার বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে প্রমত্ত হইয়া, আমি আমার সুদীর্ঘ প্রবাসভাটনা ও বিপদের কষ্ট ভুলিলাম। পরমহুখে দিন কাটিতে লাগিল।

গল্প শেষ করিতে রাত্রি গভীর হইল। সিন্ধবাদ নাটকের চতুর্থ সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণ করিয়া, শ্রোতৃগণ বিষয়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে তিনি বন্ধুগণকে বিদায় দান করিলেন, শ্রমিক সিন্ধবাদকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের জায় শত মুদ্রা দান করিয়া, তিনি তাহাকে ও অত্যন্ত বন্ধুগণকে পরদিন তাঁহার গৃহে আসিয়া তাঁহার পঞ্চমবার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণের জন্ত অনুরোধ করিলেন।

পরদিন বন্ধুগণ যথাসময়ে তাঁহার গৃহে সমাগত হইলে, মহানন্দে সকলে পানাহারে প্রবৃত্ত হইলেন। পানাহারের পর সিন্ধবাদ তাঁহার পঞ্চমবারের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।



দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিশ্রান্ত লুণ্ঠভোগের পর আমার মন পুনর্বার প্রবাসযাত্রার জন্য অধীর হইয়া উঠিল। আমি পণ্ড্যব্রাদি সংগ্রহ করিয়া পঞ্চমবার সমুদ্রযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম এবং নিকটস্থ বন্দরে শকটযোগে সেই সকল সামগ্রী প্রেরণ করিলাম। অতঃপর আর কোন কাণ্ডের উপর বিশ্বাসস্থাপন না করিয়া নিজেই একখানি জাহাজ ক্রয় করিলাম এবং তাহাতে পণ্ড্যব্রা বোঝাই দিয়া দেখিলাম, তাহাতে আরও অনেক অধিক দ্রব্য আঁটিতে পারে, সুতরাং আমি সেই জাহাজে আরও কয়েকজন সঙ্গীগণের জিনিস লইলাম।

সুবাসন পাইয়া জাহাজ চলিতে লাগিল। আমার জাহাজ সর্বপ্রথমে একটি মরুদ্বীপে নঙ্গর করা হইল। সেখানে আমরা একটি রুকপক্ষীর ডিম্ব দেখিতে পাইলাম। ডিম্বটি ফুটিয়া তখন ছানা বাহির হইতে আরম্ভ হইয়াছে;—দেখিলাম, ছানাটির দেহ তখনও অপূর্ণ। আমার সঙ্গী সঙ্গীগণরা তাহাদের হস্তস্থিত অস্ত্র ধারী ডিম্বটি ভাঙ্গিয়া, রুক-শাবকটিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ব্যঞ্জন রান্ধিয়া খাইল। আমি পূর্বেই তাহাদিগকে এতদপ কার্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহারা আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিয়াছিল, কর্পণাতাই করে নাই।

সঙ্গীগণরা আহার শেষ করিয়া উত্তিবার পূর্বেই আমরা আকাশে দুই খণ্ড সূর্যহং মেঘ দেখিতে পাইলাম; তাহারা আকাশ অঙ্গকার করিয়া উড়িয়া আসিতেছিল। আমাদের কাপ্তেন বলিলেন, “ইহা মেঘ নহে, নিহত রুক-শাবকের পিতামাতাই মেঘের স্তায় পক্ষ বিস্তার করিয়া আসিতেছে।” কাপ্তেন তৎক্ষণাৎ আমাদিগকে জাহাজে উঠিতে অনুরোধ করিলেন। বিলম্বে বিপদে পড়িতে হইবে ভাবিয়া আমরা তৎক্ষণাৎ জাহাজে উঠিয়া জাহাজ ভাঙ্গাইয়া দিলাম।

রুকপক্ষী দুইটি সেই দ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাহাদের শাবকের অর্দশনে অত্যন্ত কাতরবধে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার পর তাহারা যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল, সেই দিকে উড়িয়া গেল। আমরা ক্রতবেগে ভিন্ন দিকে ধাবিত হইলাম।

কিন্তু পক্ষী দুইটি উড়িতে উড়িতে পুনর্বার আমাদের জাহাজের উপর দেখা দিল। আমরা সত্যের দেখিলাম, তাহাদের প্রত্যেকের নখরে এক একটি সূর্যহং প্রস্তুতরূপ! তাহারা আমাদের জাহাজের ঠিক উর্কে আসিল, একটি পক্ষী প্রস্তুত নিক্ষেপ করিল। তখন জাহাজের কাপ্তেন অতি সুরক্ষণে জাহাজের গতি পরিবর্তন করিলেন। চক্ষুর নিম্নে জাহাজখানি এত দূরে সরিয়া গেল যে, সেই প্রস্তুতরূপ জাহাজের উপর না পড়িয়া মহাশব্দে সমুদ্রগর্ভে পড়িল। দ্বিতীয় পক্ষীর নিক্ষিপ্ত প্রস্তুতের আঘাত হইতে জাহাজখানি কিন্তু আঘতকৃত করিতে পারিল না, জাহাজ ঘুরিতে না ঘুরিতে বহু উর্ক হইতে প্রস্তুতখানি আসিয়া তাহার উপর নিপতিত হইল এবং জাহাজ সহস্র খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। জাহাজের আরোহী ও নাবিকগণ—বাহারা প্রস্তুতরাতে ময়িল না, তাহারা জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। জাহাজ চূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও জলে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু জলমগ্ন হইবার পূর্বেই জাহাজের একখণ্ড কাষ্ঠ আমার হস্তগত হওয়ায় তাহাই অবলম্বন করিয়া জলে ভাসিতে লাগিলাম এবং সোভাগ্যক্রমে তরঙ্গবেগে আমি একটি দ্বীপে নিক্ষিপ্ত হইলাম। এই দ্বীপের ভীতভাগ সমুদ্র হইতে অনেক উচ্চ, অতি কষ্টে তীরে উঠিয়া বাসের উপর শয়ন করিলাম এবং কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া দ্বীপ-প্রদক্ষিণের জন্য যাত্রা করিলাম। কিছু দূরে আসিয়া আমার মনে হইল, আমি একটি পরম রমণীয় উদ্ভানে প্রবেশ করিয়াছি। চারিদিকে অতি সুদৃশ্য বৃক্ষশ্রেণী, নানা জাতীয় ফল পাখিরা গাছে বুলিতেছে এবং কতকগুলি তখনও অশ্লক অবস্থায় রহিয়াছে। সেই উদ্ভানভূমির মধ্যে স্থানে স্থানে নির্মল-সজলসুপ্ন শোভাবিনী প্রবাহিত থাকিয়া উদ্ভানের শোভা ও উর্বরতা শতগুণে বর্ধিত করিয়াছে। আমি উপর পরিপূর্ণ করিয়া ভূমি ফল ভক্ষণ করিলাম, সুপের জলে পিপাসা নিবারণ করিলাম; তাহার পর বৃক্ষশ্রেণীে হরিষ্রণ ভূষণব্যায় শয়ন করিলাম।

সিদ্ধ-
বাসন
পঞ্চম
সমুদ্র-
যাত্রা



রাত্রি আসিল ; কিন্তু এরূপ নির্জনপ্রদেশে একাকী সেই রাত্রিকালে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না, প্রতি মুহূর্তে ষাণ্ড জন্তর আক্রমণের আশঙ্কায় নিদ্রার বড় ব্যাধাত হইল। আমি সেই অন্ধকার রাত্রিতে বৃত্ত আকাশতলে নির্জন অরণ্য প্রদেশে একাকী শয়ন করিয়া নিজের গুরুত্বকে শত শত খিঙ্কার প্রদান করিতে লাগিলাম ; ইচ্ছা করিয়া এই বিপদের মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কি কুকর্ষই করিয়াছি ভাবিয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলাম। এইরূপ হুস্টিভাণ্ড ও বিলাপে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত হইল, প্রভাতে হৃৎযন্ত্রের যেন আবার নবজীবন লাভ করিলাম ; আমার হুস্টিভাণ্ড ও অপ্রসন্নতার অনেক লাঘব হইল, আমি উঠিয়া সেই সকল বৃক্ষের মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

পার বিবম
বিপদ



অনেককাল পরে একটি ক্ষুদ্র নদীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একজন চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধ বসিয়া আছে ; আমি তাহার সম্মুখে আসিয়া অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইলাম। সে আমাকে দেখিয়া কেবল একটু মাথা নাড়িয়া প্রত্যভিবাদন করিল, কোন কথা বলিল না। সে সেখানে কি করিতেছে, কোথা হইতেই বা আসিল, তাহা জিজ্ঞাসা করায় সে কোন উত্তর দিল না, কেবল তাহাকে স্বক্কে লইয়া আমাকে নদী পার হইবার জন্ত ইঙ্গিত করিল ; সে যেরূপ ভাব প্রকাশ করিল, তাহাতে বুঝিলাম, সে কিছু ফল-সংগ্রহের আশিপ্রায় করিয়াছে।

চলৎশক্তিহীন বৃদ্ধকে এমন



নির্জন স্থানে অসহায় অবস্থায় দেখিয়া আমার মনে করুণার সঞ্চার হইল, আমি তাহাকে স্বক্কে লইয়া নদী পার হইলাম এবং তাহাকে নামিতে বলিলাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমার স্বক্কে হইতে অবতরণ করিবার জন্ত তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না ; বরং সে তাহার লোমাবৃত পদদ্বয় দ্বারা আমার কণ্ঠদেশ দৃঢ়রূপে পরিবেষ্টন করিয়া আমার ঘাড়ের কায়েমী রকমের আসন স্থাপন করিল এবং আমার কণ্ঠদেশ এরূপ সবলে আকর্ষণ করিতে লাগিল যে, আমার কণ্ঠরোধের উপক্রম হইল, আমি হাঁপাইতে লাগিলাম।

কিন্তু বৃদ্ধটির সে দিকে দৃষ্টি নাই, অবিচলিতভাবে সে আমার স্বক্কে বসিয়া রহিল। তবে হস্তের

বন্ধন একটু শিথিল করাত আমি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। আমি একটু দাঁড়াইব ভাবিতেছি, এমন সময়ে সে আমার পাশ্বেদেশে ও উদরে পদাঘাত করিয়া আমাকে চলিতে বাধ্য করিল। আমি তাহাকে একা

গাছোড়
বান্দা
স্বক্কে

ফলপূর্ণ বৃক্ষের মূলদেশে লইয়া চলিলাম। আমার স্বন্ধে বসিয়া বৃক্ষ গাছ হইতে প্রচুর ফল পাড়িয়া খাইতে আরম্ভ করিল; বৃক্ষ চলৎশক্তিবিহীন বটে, কিন্তু খাইল অনেক! হতভাগার পেটটা যেন জ্বালায় মত! লমস্ত দিনের মধ্যে সে একবারও আমার কাঁধ হইতে নামিল না। রাত্রিকালে যখন শয়ন করিলাম, তখনও সে আমার স্বন্ধদেশে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া পড়িল। প্রভাতে পুনর্বার তাহাকে ঘাড়ে লইয়া উত্তিবার জন্ত সে পা দিয়া আমাকে পুনঃ পুনঃ খোঁচাইতে লাগিল। আমি মহা বিপন্ন হইয়া পড়িলাম, কিন্তু এই আপদের হাত হইতে উদ্ধারলাভের কোন উপায় দেখিলাম না। আমার মন বড়ই চিন্তাকুল হইয়া উঠিল। একটা প্রকাণ্ড বোঝা কয়েক দিন ধরিয়া ক্রমাগত ঘাড়ে বহিয়া আমার দেহও অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, দেহের এই ক্লান্তি ও মনের অবসন্নতা দূর করিবার জন্ত আমি একপ্রকার ফলের রস হইতে উৎপন্ন মত্ত প্রচুর পরিমাণে পান করিলাম। ইহাতে আমার দেহে নববলের সঞ্চার হইল, যথেষ্ট পরিমাণে প্রকৃষ্ণতাও লাভ করিলাম; এমন কি, মত্তপানে উন্মত্ত হইয়া আমি নৃত্য আরম্ভ করিলাম দেখিয়া, বৃক্ষও সেই মত্তপানের জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। আমি তাহাকে আকর্ষণ মত্তপান করাইলাম; তখন সে নেশায় বিভোর হইয়া তাহার নিজের ভাষায় গান আরম্ভ করিয়া দিল এবং তাহার পদধরের বন্ধন খুলিয়া হস্তপদ আশ্বাসন করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল; আমিও স্বেচ্ছায় বৃক্ষীয়া আমার স্বন্ধদেশে হইতে তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলাম; সে ভূমিতে পড়িবামাত্র একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিলাম, সে তৎক্ষণাতঃ পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হইল। এইরূপে আমি বৃক্ষের কবল হইতে নিষ্কলিতলাভ করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, একখানি জাহাজ স্থপের পানীয়জল সংগ্রহের জন্ত সমুদ্রে নসর কেবিরিছে। আমি জাহাজস্থ ব্যক্তিগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে আমার বিপদের কথা বলিলাম। আরোহিণ্য আমার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিল; তাহারা বলিল, “এই বৃক্ষ যে তোমার প্রাণবধ করে নাই, ইহাই বিচিত্র; এই সকল মানুষ ভয়ানক বকমের নরপশু।”

আমি সেই সকল বোকের সহিত জাহাজের উপর উপস্থিত হইলাম। কপ্তেন আমাকে ভদ্রভাবে গ্রহণ করিলেন। সে স্থান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া আমরা একটি বন্দরে উপস্থিত হইলাম, সেখানে সকল গৃহই প্রস্তর-নির্মিত।

এখানে সদাগররা অনেকই জাহাজ হইতে নামিলেন। একজন সদাগরের অনুরোধে আমিও নামিলাম; তাহার পর কয়েকজন লোকের সহিত আমি কতকগুলি বস্তা লইয়া অরণ্যে প্রবেশ করিলাম। অরণ্যে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, প্রচুর নারিকেলগাছ, অদৃশ্য নারিকেল, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও অধিক বানর। আমরা বানরগুলির দিকে চিল ছুড়িতে লাগিলাম, বানরগুলি ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত বৃক্ষচূড়া হইতে নারিকেল ছিড়িয়া আমাদের দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। এই উপায়ে আমরা বহুসংখ্যক নারিকেল সংগ্রহ করিয়া বাজারে আনিলাম, বাজারে বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ অর্থলাভ করা গেল। এই ভাবে কিছুদিন ধরিয়া নারিকেল সংগ্রহ করা হইল, আমিও কিছু অর্থোপার্জন করিলাম।

আমাদের জাহাজখানি এখানে নারিকেলের জন্ত অনেক দিন প্রতীক্ষা করিবে জানিয়া আমি সেই বন্দর হইতে অল্প একখানি জাহাজে সেই দ্বীপ পরিত্যাগ করিলাম। সেখান হইতে আমরা কুমারীদ্বীপে উপস্থিত হইলাম, এই দ্বীপে প্রচুর চন্দনতরু জন্মে, স্থানীয় অধিবাসিগণ মত্তপান করে না, আইনামুতাবে তাহা নিষিদ্ধ। আমরা এখানে অনেক গোলমরিচ ও চন্দন-কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া মুক্তা-উত্তোলন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার



নিকটে যে অর্থ ছিল, তদ্বারা বহুসংখ্যক ডুবুী নিয়ন্ত্রণ করিলাম। আমি অল্পদিনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে স্বরূপে স্বপ্নগোল মুক্তা-সঙ্কেতে সমর্থ হইলাম।

আশাতিরিক্ত মুক্তা সংগৃহীত হইলে আমরা বাসোরা অভিমুখে জাহাজ ভাঙ্গাইলাম। বাসোরা হইতে বোম্বাদে উপস্থিত হইয়া আমি আমার সংগৃহীত গোলমরিচ, চন্দন-কাঠ ও মুক্তা বিক্রয় করিয়া প্রভূত অর্থ লাভ করিলাম। আমার লাভের দশমাংশ আমি গুরীব-ছাথীকে প্রদান করিলাম এবং আমার প্রবাস-স্বাস্থি দূর করিবার জন্ত আমি বহুজনের সহিত বিবিধ আন্দোলন রত হইলাম।

সিন্দবাদ তাঁহার পঞ্চমবার সমুদ্র-ভ্রমণের কাহিনী সমাপ্ত করিয়া, সিন্দবাদ মজুরের হস্তে শত মুদ্রা প্রদান করিলেন, বহুগণকেও সে দিনের জন্ত বিদায় দান করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছিল।

পরদিন যথাসময়ে সঙ্কলিত সিন্দবাদের গৃহে উপস্থিত হইলে, পান-ভোজনের পর তিনি তাঁহার বহু সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্দ-
বাদের
মুদ্র-
যাত্রা



আপনারা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিবেন যে, এতবার বিপদে পড়িয়াও আমি সমুদ্রযাত্রার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কিছুদিনের মধ্যে আবার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল; এক বৎসরের মধ্যে পুনর্বার সমুদ্রযাত্রা করিলাম।

এবার আর পারস্ত উপসাগরের পথে সমুদ্রযাত্রা না করিয়া আমি স্থলপথে পারস্ত ও ভারতের ভিতর দিয়া এক বন্দরে উপস্থিত হইলাম। এবার কিছু দীর্ঘকালের জন্ত সমুদ্রযাত্রার ইচ্ছা ছিল, দীর্ঘ-পর্গাটনে সমুদ্রক একজন কাপ্তেনের সহিত আমি বন্দোবস্ত করিলাম।

কয়েকদিন পরে কাপ্তেন লম্বা দিগন্ত হইল। তাহার পর সে ডেকের উপর পাগুড়ী কেনিরা, দাড়ি-চুল ছিড়িয়া, বকে করাঘাত করিয়া বিলাপ ও পরিতাপ আরম্ভ করিল। আমরা এত গুরুতর বিপদে পড়িয়াছি বলিয়া বুঝিতে পারিলাম না। কাপ্তেনকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল, “দর্শনাশ হইয়াছে, জাহাজ যে ভাবে চলিতেছে, এ ভাবে চলিলে আর পনের দিনটিও মধ্যে আমাদের প্রাণ যাইবে। রক্ষার কোনই উপায় দেখি না, এখন যদি আল্লা রক্ষা করেন।”

অতি অল্পকালের মধ্যেই জাহাজ এক পর্বতের পাদদেশে আসিয়া পড়িল এবং মজীর কলপী মত শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল। আমরা বহু কষ্টে আমাদের মূল্যবান দ্রব্যাদি লইয়া তীরে উঠিলাম।

তীরে উঠিলাম বটে, কিন্তু কাপ্তেনের কথা শুনিয়া মনে বড় ভয় জন্মিল। কাপ্তেন বলিল, “এ স্থান হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন কোন রকমে সম্ভব হইবে না, এখানে কোন জাহাজ আসিতে পারে না।”—দেখিলাম, স্থানটি বহুসংখ্যক জাহাজের ভয়াবশেষে আচ্ছন্ন। ইতস্ততঃ কত বনিকের কত পদাশ্রয় পড়িয়া আছে, তাহার সংখ্যা নাই।

তরফত
প



আমরা তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম;—দেখিলাম, এই পার্শ্বপ্রদেশ চুনি, পারা ও হীরকাদিতে পরিপূর্ণ। পাহাড় হইতে আগকাতরার মত এক প্রকার পদার্থ নদীবোতের ভাষা সমুদ্রে পতিত হইতেছে। অরণ্যে বহুসংখ্যক মূল্যবান কাঠ দেখিলাম। উর্দ্ধে গিরিশিখর এত উচ্চ যে, তাহাতে আরোহণ করা অসম্ভব। কিন্তু পর্বতগাত্র হইতে একটি ক্ষুদ্র নদী বিধগত হইয়া, পাহাড়ের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

আমরা সেই নির্জন সমুদ্রতীরে পড়িয়া রহিলাম, অনাহারে আমাদের সহযাত্রীগণ একে একে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। আমার নিকট কিছু খাণ্ডসামগ্রী ছিল, আমি তাহা লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, তাহা আহাৰ করিয়া আমার ক্ৰধানিবৃত্তি হইতে লাগিল, আমি কেবল সেই জন্তই প্রাণধারণে সমর্থ হইলাম, অবশিষ্ট সকলেই প্রাণত্যাগ করিল।

তখন সেই স্থান হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলাম। উদ্ধারের অল্প কোন উপায় নাই দেখিয়া আমি বহু চেষ্টার একখানি ভেলা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বহনযোগ্য হীরক ও চুপিপায়া প্রভৃতি বোঝাই করিয়া নদীর জলে ভাসাইয়া দিলাম। ভাবিলাম, নদীর উৎপত্তিস্থল যখন আছে, তখন এই নদী নিশ্চয়ই কোন না কোন স্থলে গিয়া শেষ হইয়াছে।

অনেকবার অনেক বিপদে পড়িয়াছি, কিন্তু প্রতিবারই আলার অমুগ্রহে রক্ষা পাইয়াছি। আমি একটি ক্ষুদ্র ভেলার আরোহী, অজ্ঞাত নদীপথে ভাসিয়া চলিয়াছি, আমি কি সেই বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া পুনর্বার অধিক ঐশ্বর্যের অধিকারী হইব না? আশা মায়াবিনী!

আমার নিকট অধিক বাতাস্রবা অবশিষ্ট ছিল না, ভেলার উপর উঠিয়া অতি অল্প পরিমাণে আহাৰ করিতে লাগিলাম, পাছে শীঘ্রই সমস্ত নিশেষ হইয়া যায়! তব্তরবেগে ভেলা ভাসিয়া চলিল। দুই তিন দিন এই ভাবে চলিলাম। নদীর উভয় পার্শ্বে গগনচুম্বী পর্বত, তাহার মধ্যপথে নদী আঁকিয়া বাকিয়া চলিয়াছে।

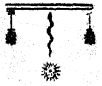
অবশেষে একদিন দেখিলাম, সমুখে এক গহ্বর বা হুড়ঙ্গমধ্যে নদীর স্রোত প্রবাহিত। আতকে শরীর শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় নাই, আমি ভেলার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম, শ্রান্ত ও ক্লান্তিতে আমার চৈতন্য যোগ হইল।

কতক্ষণ বা কতদিন ঘুমাইয়াছিলাম, বলিতে পারি না। যখন জাগিলাম, দেখিলাম, একটি স্বন্দর শক্তগ্রামল জনপদের নিকটে আসিয়াছি, নদীর তীরে আমার লা বাঁধা রহিয়াছে, অদূরে কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ মহুয়মৃষ্টি। আমি মাধুযগুলিকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলাম, তাহাদিগকে সেলাম করিলাম, তাহারাও কি কতকগুলি কথা বলিল, কিন্তু একবর্ণও বুঝিলাম না।

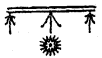
তথাপি আমার মনে আনন্দের সঞ্চার হইল। যতই কুস্থান হউক, দোকালয় তা' বটে; প্রাণরক্ষার কিছু সম্ভাবনা জন্মিয়াছে। আমি বসিয়া আলার নাম করিতে লাগিলাম। ঐ সকল কৃষ্ণাঙ্গগুলির মধ্যে এক জন লোক আমার ভাষা বুঝিল। সে আমার কথা শুনিয়া আমার নিকটে আসিয়া বলিল, “ভাই, আমাদের দেখিয়া অবাক হইও না। আমরা এই দেশেই বাস করি। আমাদের জমীতে জলসেচনের জন্ত আমরা নদীর ধারে আসিয়াছি। আমরা দেখিলাম, যে পর্বত হইতে এই নদী বাহির হইয়াছে, সেই পর্বতের দিক হইতে কি একটা ভাসিয়া আসিতেছে; দেখিবামাত্র আমরা তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলাম;—দেখিলাম, এই ভেলাতে তুমি শয়ন করিয়া আছ। তখন ভেলা টানিয়া আনিয়া কুলে রাখিয়াছি। এখন তোমার ইতিহাস বল, শুনি, পাহাড়ের দিক হইতে ভেলার চড়িয়া কি জন্ত এ তা'বে ভাসিয়া আসিতেছে, জানিবার জন্ত আমরা বিশেষ উৎসুক হইয়াছি।”

আমি বলিলাম, “আজ্ঞা তোমাদের মঙ্গল করুন। আগে কিছু খাইতে দাও, ক্ষুধা-তৃষ্ণার কাতর হইয়া পড়িয়াছি।”—আমাকে তাহার প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন খাইতে দিল, তাহা খাইয়া শীতল জলপান করিয়া, আমার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে, আমি তাহাদিগকে আমার বিপদের কথা বলিলাম। তাহারা

ক্ষুদ্র ভেলার
অজ্ঞাত-যাত্রা
যাত্রা



পার্বত্য
নদীপথে
নিরুদ্দেশ-
অভিযান



তুমিরা অত্যন্ত আনন্দিত হইল এবং তাহাদের রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট এই সকল কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আরোহণের জন্ত আমাকে অর্থ আনিয়া দিল। সেই অর্থে আরোহণ করিয়া আমি রাজদর্শনে চলিলাম, রুম্বাক্ষ দেশীয়গণ আমার পথিপ্ৰদর্শক হইল।

স্বর্গদীপ
ভারতবর্ষ

এই দীপের নাম স্বর্গদীপ। রাজধানীতে আমরা রাজার নিকট উপস্থিত হইলাম। ভারতবর্ষের রাজ্যগণকে যে কেতায় অভিভাবদ করিতে হয়, তাহা আমার জানা ছিল, আমি তদনুসারে রাজার প্রতি



সারভ-
নজাতি
কাশে

সম্মান প্রদর্শন করিলাম। রাজা সমুদ্রচিন্তে আমাকে তাঁহার দক্ষিণ পাশ্বে উপবেশন করাইয়া প্রথমে আমার নাম ধাম ইত্যাদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিলে, তিনি আমাকে বলিলেন, “তুমি আমার রাজ্যে কিরূপে উপস্থিত হইলে? কোথা হইতেই বা আসিতেছ?”

আমি কোন কথা গোপন না করিয়া রাজার নিকটে সবিস্তার সকল কথা প্রকাশ করিলাম। তিনি আমার ইতিহাস স্নেহে লিখিয়া লইলেন। তিনি আমার মণিমাণিক্যাদি স্নেহে পরীক্ষা করিলেন;—বলিলেন, তাঁহার রক্তভাণ্ডারে এমন রক্ত একখানিও নাই। আমি রাজাকে হীরক-রত্নাদি সমর্পণের প্রস্তাব করিলে, তিনি আমাকে ধন্বাদ করিয়া বলিলেন, আমার জন্যে তাঁহার আবশ্যক নাই।

রাজা আমার বাসস্থান স্থির

করিয়া দিলেন, আমার সুখ-স্বচ্ছন্দতা দেখিবার জন্ত রাজকর্মচারীগণকে আদেশ দিলেন। আমার দ্রব্যসামগ্রী আমার বাসায় সুরক্ষিত হইল। প্রত্যাহ করেক ঘণ্টা করিয়া আমাকে রাজদরবারে হাজির থাকিতে হইত।

এই দীপে কিছুদিন বাস করিবার পর আমি স্বদেশপ্রত্যাবর্তনের জন্ত রাজা মহাশয়ের অমুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার প্রার্থনা সম্বরণ করিয়া, আমাকে তাঁহার রাজভাণ্ডার হইতে বহু ধন-রত্ন প্রদান করিবার জন্ত অমুমতি করিলেন।

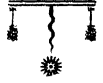
আমি তাঁহার নিকট বিদায় লইবার সময় তিনি আমার হস্তে আমাদের দেশবিখ্যাত দার্শনিকশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলভূষণ হারুণ-অল-রসিদের জন্ত একখানি পত্র ও কিছু মুদ্রাবান্ উপহার প্রদান করিলেন।

আমি তাহা মহাসমাদরে গ্রহণ করিলাম, অনন্তর রাজা জাহাঙ্গের কাশ্মির ও কশ্মীরগণকে ডাকিয়া আমার প্রতি বিশেষ যত্ন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

রাজা আমাদের খালিফের জন্ত যে পত্রখানি প্রদান করিলেন, তাহার আধার এক প্রকার চর্মনির্মিত, বর্ণ পীত। এই পত্রের উপর ভারতবর্ষের ভাষায় লিখিত ছিল—

“সহস্র হস্তীর অধীশ্বর, লক্ষ হীরকখচিত রত্নোদ্ভাসিত প্রাসাদসৌধরাজী ও বিংশ সহস্র হীরকখচিত মুকুটের অধিকারী ভারতবর্ষের রাজচক্রবর্তীর নিকট হইতে মহামহিমায়িত বোণদাদের সুলতান, খালিফ হারুণ অল-রাসিদের সমীপে”

ভারতসম্রাটের
সৌভাগ্য



আমি এই পত্র ও উপহার লইয়া বাসোরা অভিমুখে যাত্রা করিলাম, এবং নিক্সিয়ে বাসোরার উপস্থিত হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই বোণদাদে পদার্পণ করিলাম। আমি সর্বপ্রথমে ভারতেশ্বরের পত্র উপহারসময়ে বোণদাদাধিপতির নিকট লইয়া চলিলাম। আমার বহুসংখ্যক ভৃত্য উপহারস্বরূপে লইয়া চলিতে লাগিল।

আমি খালিফের নিকট উপহারস্বরূপে ও পত্র সমর্পণ করিয়া ভারত-নৃপতির মহরকাহিনী ও তাঁহার ঐশ্বর্যের কথা সবিস্তারে নিবেদন করিলাম।

খালিফ দৃষ্টান্তে উপহার গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের অধীশ্বর লিখিত পত্রখানি পাঠ করিলেন। পত্রপাঠ করিয়া খালিফ বলিলেন, “এই রাজাটি পরম গুণবান্ বটে, পত্রের ইচ্ছা প্রকাশ। তোমার কথা শুনিয়া বুঝিলাম, এইরূপ রাজাটি প্রজাপ্রাণমনের উপবৃত্ত, আর এমন রাজার প্রজারাও সুখী।” আমাকে বিদায়দান করিবার সময় খালিফ উপবৃত্ত পুরস্কারে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন।

এইরূপে সিন্দবাদ নাবিক তাঁহার যষ্ঠবার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শেষ করিলে বহুগুণ উঠিলেন, শ্রোতা সিন্দবাদকে সে দিনও শতমুদ্রা প্রদান করা হইল। সিন্দবাদ তাঁহার বহুগুণকে তাঁহার শেষবার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শ্রবণের জন্ত পরদিন তাঁহার গৃহে আসিবার অনুরোধ করিলেন।

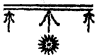
পরদিন বণ্যসময়ে বহুগুণ উপস্থিত হইলে, প্রীতিভোজের পর সিন্দবাদ তাঁহাদের নিকট তাঁহার সপ্তম অর্থাৎ শেষবার সমুদ্রযাত্রার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে বিষয়পূর্ণ-হৃদয়ে শুনিত লাগিলেন।



যষ্ঠবার সমুদ্র হইতে ফিরিয়া আমি আর সমুদ্রগমনের নামও অনেক দিন করি নাই; বিশেষতঃ আমার যে বয়স হইয়াছিল, তখন বিশ্রামের আবশ্যক। অবশ্য তখনও যৌবন সম্পূর্ণভাবে বিদায় লয় নাই। তবে পুনঃ পুনঃ বিপদে পড়িয়া আমি একেবারে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম, স্মরণীয় দীর্ঘকাল ধরিয়া আমি গৃহে বসিয়া বিরামলাভ করিতে লাগিলাম।

একদিন আমি করেক জন বন্ধুর সহিত হাশ্তানোদে প্রবৃত্ত আছি, এমন সময়ে আমার এক জন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, খালিফের এক জন কশ্মীরী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি বলিলেন, “খালিফ আমাকে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের আদেশ করিয়াছেন।” কশ্মীরী মহাশয়ের সহিত রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলাম। খালিফ আমাকে বলিলেন, “সিন্দবাদ, তোমাকে আমার একটি কাজ করিতে হইবে, তুমি স্বর্ণবীণের রাজার নিকট আমার প্রেরিত পত্র ও উপহার লইয়া গমন কর, তিনি আমাকে যে সকল উপহার প্রেরণ করিয়াছেন, আমি তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিব।”

সিন্দ-
বাদের
শেষ
সমুদ্র-
যাত্রা



খালিকের
কাশেখ
অলজব্বানী



খালিকের কথা শুনিয়া আমার মস্তকে ঘেন বজ্রাঘাত হইল। আমি বলিলাম, “জাহাপনা, আপনি আমাকে যে আদেশ করিবেন, আমি তাহা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ সমুদ্রযাত্রা করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছি, দেহে আর তেমন বল নাই, মনে উৎসাহ নাই। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর কখন বোঙ্গাদ নগর পরিত্যাগ করিব না।”—আমি আমার বার বার সমুদ্রযাত্রার বিপৎপূর্ণ কাহিনী তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম। খালিক ধীরভাবে আমার কথাগুলি শুনিয়া কহিলেন, “বার বার যখন বিপদ, কষ্ট, অসুবিধা সহ্য করিয়াছ, তখন আমার অহুরোধে আর একবার সহ্য করিতে হইবে, তোমাকে অল্প কোথাগ ঘাইতে হইবে না, তুমি স্বর্ণদ্বীপের রাজ্যের নিকট উপহার পৌঁছাইয়া দিয়াই দেশে ফিরিতে পারিবে।”

বুলিলাম, খালিক আমাকে কিছুকালের জন্ত দেশান্তরিত না করিয়া ছাড়িবেন না, হুতরাং তাঁহার আদেশ-প্রতিপালনে সম্মতি জ্ঞাপন করিতে হইল। আমার সম্মতি শ্রবণে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইয়া আমাকে পাথের স্বরূপ কয়েক সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন।

উপহার ও পত্র লইয়া যথাকালে বোঙ্গাদ নগর পরিত্যাগ করিলাম এবং জাহাজে চড়িয়া স্রবাতাসে অল্পদিনের মধ্যেই স্বর্ণদ্বীপে উপস্থিত হইলাম। স্বর্ণদ্বীপের রাজা প্রথম পুলকিতচিত্তে আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি খালিকের প্রেরিত উপহার ও পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিলাম। রাজা আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে স্বল্পর উপহার প্রদান করিলেন, কয়েক দিন তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া আমি স্বদেশপ্রভাগমনের অমুমতি প্রার্থনা করিলাম। তিনি প্রথমে কোন প্রকারে আমাকে ছাড়িতে চাহিলেন না, অনেক অল্পময়-বিনয়ে সম্মতি লাভ করিলাম এবং জাহাজে চড়িয়া, স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলাম। কিন্তু আলার ইচ্ছা অন্তরূপ ছিল, যত সহজে আমি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিব ভাবিয়াছিলাম, তত সহজে পারিলাম না, সে কথা বলিতেছি।

জলদস্যুর
হাছাড়া লুণ্ঠন



জাহাজে উঠিবার তিন চারি দিন পরে একদল জলদস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, তাহাদের হস্তে আমি বন্দী হইলাম, তাহারা আমাদের জাহাজ অধিকার করিল। জাহাজের যে সকল আরোহী দস্যুগণের বিরুদ্ধতরুণ করিল, তাহারা সকলেই তাহাদের হস্তে নিহত হইল। আমি ও অল্প কয়েক জন সঙ্গী তাহাদের কার্যের কোন প্রতিবাদ না করায় আমাদের প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু দস্যুগণ আমাদের বস্তাদি কাড়িয়া লইয়া, ছিন্ন বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া আমাদেরিকে একটি দ্বীপে লইয়া গেল; সেখানে আমাদেরিকে দাসবাসবাদীয় নিকট বিক্রয় করিল।

ব্রাহ্ম-বলিক
কীতদাস



এক জন ধনাঢ্য সদাগর আমাকে ক্রয় করিলেন। আমি সেই সদাগরের সঙ্গে তাঁহার গৃহে উপনীত হইলাম। কয়েক দিন পরে সদাগর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বাণিজ্যাব্যবসায় বৃত্তি কি না। আমি তাঁহাকে বলিলাম, “আমি নিজে সদাগর ছিলাম, এই কার্যে আমার বিলম্বণ ব্যুৎপত্তি আছে।” সদাগর অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ধনুর্ধারী দ্বারা নীকার করিতে পারি কি না। আমি বলিলাম, “বাল্যকাল হইতে আমার যথেষ্ট নীকারের সখ ছিল।” আমার কথা শুনিয়া তিনি আমাকে ধনুশের প্রদান করিয়া, তাঁহার হস্তিগুঠে আরোহণ করাইয়া আমাকে গভীর জঙ্গলে লইয়া চলিলেন। জঙ্গলে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে নামাইয়া দিয়া বলিলেন, “এই গাছে চড়িয়া ধনুর্ধারী হস্তে বসিয়া থাক, এই গাছের নীচে দিয়া বহুহস্তী যাইবে, এই অরণ্যে বহুগণ্যাক হস্তী আছে। হস্তী দেখিলেই তাহার প্রাণবধ করিবে, যদি কৃতকার্য হও, আমাকে জানাইবে।” সদাগর

আমাকে কিঞ্চিৎ খাওয়া প্রদান করিয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন, আমি গাছে উঠিয়া সমস্ত রাত্রি হস্তীর আশায় বসিয়া রহিলাম।

রাত্রিতে কোন হস্তী দেখিতে পাইলাম না। পরদিন প্রভাতে দলে দলে হস্তী সেই বৃক্ষতল দিয়া চলিতে আরম্ভ করিল, আমিও তাহাদের উপর বাণবৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলাম; কিন্তু একটির অধিক হস্তীর প্রাণবধ করিতে পারিলাম না। অত্যাশ্চর্য হস্তীগুলি পালায়ন করিল। আমি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া নগরে ফিরিয়া আমার প্রভুকে হস্তিবধের কথা অবগত করিলাম। তিনি মহাখুশী হইয়া আমার সঙ্গে জঙ্গলে আগিলেন। জঙ্গলে একটি প্রকাণ্ড গর্ভ বনন করিয়া আমরা সেই হস্তীটিকে তাহার মধ্যে পুতিয়া ফেলিলাম। এই হস্তীর মাংস পচিয়া গেলে তাহার পীত ও হাড় ভিন্নদেশে পাঠাইবেন, ইহাই আমার প্রভুর ইচ্ছা ছিল। তিনি এই নিয়মে গজবস্ত্র, অস্ত্র ও মুক্তা সংগ্রহ করিতেন।

তাই মাস ধরিয়া এই ভাবে হস্তী শীকার করিলাম, এমন এক দিনও যায় নাই, যে দিন একটা না-একটা হস্তী বধ করিয়াছি। আমি প্রত্যহ এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া শীকার করিতাম না; কখন এ গাছে, কখন ও গাছে আরোহণ করিয়া শীকার করিতে হইত। এক দিন দেখিলাম, কতকগুলি হস্তী সেই অরণ্যে আসিয়া জমিল, কিন্তু তাহারা চলিয়া গেল না, আমি যে গাছে ছিলাম, সেই গাছের নীচে আসিয়া ভাঙ্কর গর্জন করিতে লাগিল। এককালে বহু হস্তীর গর্জনে চতুর্দিক্ প্রকম্পিত হইতে লাগিল, পদভরে মেদিনী ভাঙিতে লাগিল। তাহারা আমাকে দেখিয়াছিল। আমি যে বৃক্ষে ছিলাম, তাহারা সেই বৃক্ষমূল স্ব স্ব দণ্ড দ্বারা পারবেষ্টন করিয়া ক্রুদ্ধভাবে আমার দিকে চাহিতে লাগিল; আমি ভয়ে গাছে বসিয়া কাঁপিতে লাগিলাম, আমার হাত হইতে তীর-ধনু খসিয়া পড়িল।

আমার দিকে অনেকক্ষণ পর্বাশ্রিত একদৃষ্টে চাহিয়া সস্তীপেক্ষা বৃহৎ-দন্তবিশিষ্ট একটি হাতী তাহার সেই বিশাল দণ্ড-দ্বারা বৃক্ষটিকে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। প্রথমে বৃক্ষটি প্রবলবেগে আন্দোলিত হইল, তাহার পর গজদন্তের পুনঃ পুনঃ আঘাত সহ করিতে না পারিয়া, তাহা সমূলে উৎপাটিত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, সেই সঙ্গে আমিও ভূতলে নিপতিত হইলাম। হাতীটা তৎক্ষণাত্ আমাকে ধুঞ্চে তুলিয়া লইল, তাহার পর সমস্ত হস্তী দলবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল, আমি হাতীর কাঁধের উপর মৃতবৎ পড়িয়া রহিলাম। অবশেষে সেই হস্তীটা পর্যন্তের একটি নির্জন অংশে আমাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল, একটি হাতীও আর দেখানে রহিল না। প্রথমে এই ঘটনা আমার নিকট স্বপ্নবৎ অসম্ভব মনে হইল। হস্তীর এই বিচিত্র ব্যবহারের কোন কারণ বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তুকাল পরে আমি উঠিয়া সেই স্থানটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, দেখানে সহস্র সহস্র হস্তিদন্ত ও মৃত হস্তীর অস্থি স্থাপ্যকারে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই দৃশ্য দেখিয়া আমি সেই হস্তীর অদ্ভুত ব্যবহারের কারণ বুঝিতে পারিলাম;—বুঝিলাম, ইহারা আমার হস্তিবধের কারণ বুঝিয়া আমাকে তাহাদের সমাধিক্ষেত্রে আনিয়া ফেলিয়াছে। আমি দেখানে আর অধিকক্ষণ অপেক্ষা না করিয়া সূর্য্যোদয় পৰ্য্যন্তের পর নগরে প্রত্যাগমন করিলাম; অরণ্যের ভিতর হইতে আসিবার সময় আর একটি হস্তীও দেখিতে পাইলাম না।

আমার প্রভু মনে করিয়াছিলেন, আমি অরণ্যে হস্তী কর্কশ নিহত হইয়াছি; সুতরাং তিনি আমাকে দেখিয়া বিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিলেন, এবং এই করেকদিন আমি কোথায় কি ভাবে কাটায়াছি, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার মুখে সকল কথা শুনিয়া তাহার আনন্দ ও বিষয়ের সীমা রহিল না। পরদিন আমাকে সঙ্গে লইয়া তিনি হস্তীদিগের সমাধিক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন এবং যথাকালে দেখানে

হস্তী-শীকার

অভিধান



হস্তীর করণা



হস্তি-সম্মতি-
ভূমিতে
সম্পদ-হাসি



উপস্থিত হইয়া স্তম্ভীকৃত অসংখ্য গজদন্ত ও অস্ত্র দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়া পড়িলেন, আমাদের আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “ভাই, আজ হইতে তুমি আর আমার দাস নহ, তুমি আজ যে আমাদের অমূল্য ধন দেখাইলে, আমার বিশ্বাস আছে, ইহার সাহায্যে আমি অল্পদিনের মধ্যেই মহা ধনবান হইতে পারিব; আশা তোমার মঙ্গল করুন।” আমি পূর্বের এ বনে হস্তীশিকারের জন্ত আমার

বহুসংখ্যক ভৃত্যকে প্রেরণ করিয়াছি, কিন্তু সকলকেই হস্তিকবলে নিহত হইতে হইয়াছে। আমি তোমাকে পুরস্কারস্বরূপ যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিব।”

এই ঘটনার কয়েকদিন পরে আমার প্রভু আমাকে স্বাধীনতা দান করিলেন। আমার অর্গলাভ ও যথেষ্ট হইল, কিন্তু আমাকে বহু দিন জাহাজের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে হইল। জাহাজ আদিলে আমি তাহাতে আরোহণ করিলাম, প্রচুর পরিমাণে গজদন্ত ও মস্তক লইলাম, এতদ্বারা আমার প্রভু আমাকে সেই দেশের উত্তম্যাপ্য বস্তুসমূহ প্রদান করিলেন।

আমি একখানি জাহাজ আরোহণ করিলাম, কিন্তু আমার জর্জের তখনও শেষ হয় নাই, সমুদ্রপথে জাহাজ চলিতে চলিতে একস্থানে

ভীষণ ঝড়বৃষ্টিতে আক্রান্ত হইলাম। জাহাজের অধ্যক্ষ এইরূপ আকস্মিক বিপৎপাতে বিচলিত হইলেন। অবশেষে জাহাজের মাঝলে আরোহণ করিয়া কি দেখিতে লাগিলেন, পরক্ষণেই তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন, “সর্বনাশ, আর আমাদের রক্ষা নাই।” ব্যাপার কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন যে, “আমরা সমুদ্রের যে অংশে উপনীত হইয়াছি, এখানে আসিলে কোনও জাহাজ পরিব্রাজ্য পায় না, এখানে ভীষণাকার মংস্ত জাহাজ গিলিয়া ফেলে।” এই কথা শুনিয়া জাহাজে হাঙ্গার-ধ্বনি উঠিল, সকলেই প্রাণের আশা বিসর্জন দিলেন।

সেই মুহূর্ত্তে অদূরে এক পর্বতপ্রমাণ মংস্ত ভাসিয়া উঠিল। পরমুহূর্ত্তে দ্বিতীয় মংস্তও জলের উপর দেখা দিল। আমরা ভয়বশে নাম দ্রুত করিতে লাগিলাম, জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিল; তৃতীয় আর একটি মংস্ত এই সময় জলমধ্য হইতে উথিত হইয়া, তাহার বিরতি বদন বিস্তার করিয়া জাহাজখানিকে গ্রাস করিতে আসিল। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে প্রলয়ঝটিকা বেগে জাহাজ ঢলিয়া উঠিল, পরক্ষণেই ভীষণ তরঙ্গমাতে জাহাজ ভাসিয়া গেল। আমরা সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইলাম। মংস্ত-বিবরের পরিবর্তে সমুদ্রগর্ভে পড়িয়া

ক্রীত-
দাস-
আলি-
ঙ্গন

বিরাট
সমুদ্রবন্তের
জাহাজ-গ্রাস
উদ্ভব



জীবনশাশ্বত হইয়া পড়িলাম। ভগবানের দয়ায় একখানি বৃহৎ কাঠের আশ্রয় পাইলাম। অন্যহারে তৃষ্ণায় ছই বিন যাপনের পর সমুদ্রতরফ আমাকে একটি বীশে নিক্ষিপ্ত করিল।

অতিকষ্টে বীশ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিলাম, প্রচুর মিষ্ট ফল ও জল এখানে বিজ্ঞমান। স্থপিশপাশ দূর করিয়া, ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিয়া দেখিতে পাইলাম, বীশের মধ্যে একটি নদী প্রবাহিতা, পূর্ব্বদ্বারে নদীতে ভেলা ভাসাইয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলাম, ভাবিলাম, এবারও হয় ত ভগবানের দয়ায় মুক্তিলাভ করিতে পারি। বীশে বহু চন্দনতরু দেখিতে পাইলাম। কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া আরণ্যগত্যার সাহায্যে একখানি বড় ভেলা নির্মাণ করিলাম। কিছু পানীয় ও ফল সংগ্রহ করিয়া লইয়া ভেলার আরোহণ করিলাম। নদীর তীর প্রোত ক্রতবেগে ভেলা ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

তিন দিন নদীপ্রোতে ভেলার ভাসিবার পর একটা পাহাড়ের কাছে আসিয়া, নদীপ্রোত পাহাড়ের অঙ্ককারপূর্ণ গুহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে দেখিলাম। পূর্ব্বদ্বারের অভিজ্ঞতা দ্বন্দ্বকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। তীরের দিকে ভেলা লইয়া ঘাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল। স্রোতোবেগে গহ্বরমুখে ভেলা ক্রত ভাসিয়া চলিল। ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া তখন ভেলার উপর সোজা শয়ন করিলাম; প্রাপের আশা রহিল না। কিয়ৎকাল পরে শীতল বাতাসের স্পর্শে চাহিয়া দেখিলাম, যুক্তহানে ভেলা আসিয়া পড়িয়াছে। তীরের দিকে চাহিবামাত্র বৃত্তিতে পারিলাম, একটি ক্ষুদ্র জনপদের পাদদেশ ঘোত করিয়া নদীটি বহিয়া চলিয়াছে। আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া তীরের লোকজন জ্ঞান ফেলিয়া ভেলাটিকে গতিহীন করিয়া ফেলিল। তীরে উপনীত হইলে জনৈক বৃদ্ধ শেখ পন্ন সমাদরে আমাকে তাঁহার আলয়ে লইয়া গেলেন।

কয় দিন তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিলাম। শেখমহোদয়ের আমার চন্দনকাঠের ভেলাটি একসহস্র বর্গমুদ্রায় ক্রয় করিলেন। চন্দনকাঠের দাম এই অঞ্চলে অত্যন্ত অধিক। কিছু দিন পরে শেখমহোদয়ের আমার নিকট প্রস্তাব করিলেন, তাঁহার একমাত্র কস্তা ব্যতীত অন্য কোনও আত্মীয়স্বজন নাই; আমি যদি তাঁহার তরুণী সন্দরী কস্তার পাণিগ্রহণ করি, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন, তাঁহার বিপুল সম্পত্তিরও গতি হয়। আমি বিপত্নীক, যৌবন তখনও প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে নাই; হস্তগত বিবাহ সম্মত হইলাম। অনবদ্য সন্দরীকে বিবাহ করিয়া প্রণয়ানন্দে আমার দিন চলিয়া যাইতে লাগিল। ষষ্ঠমহাংশ ইহার কিছুকাল পরে পরলোকে যাত্রা করিলেন। তরুণী ভাৰ্যা ও প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হইয়া, আমি সেখানে বসবাস করিতে লাগিলাম। নাগরিকগণ আমাকে তাহাদের প্রধানরূপে স্বীকার করিয়া লইল।

ক্রমে আমি জানিতে পারিলাম, এই জনপদের কতকগুলি নাগরিক প্রতি মাসের শেষে পক্ষীর আকার ধারণ করিয়া, আকাশমার্গে কয় দিন উড়িয়া বেড়ায়। আমি এই সুযোগে আকাশভ্রমণের সোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাদের এক জনকে সম্মত করাইলাম। তার পর প্রেমময়ীকে কোনও কথা না জানাইয়া একদিন পাখীর পূর্বে আরোহণ করিলাম। নীলিম আকাশের অজ্ঞাত লোকে পাখী আমার বহন করিয়া লইয়া চলিল। স্বর্গোত্তানের অপ্সরাসিগের সঙ্গীত ও কলকঠের স্বরকার আমার কর্ণে প্রবিলম্বিত হইল। আনন্দে অভিভূত হইয়া ভগবানের স্মরণ করিলাম। অমনই স্বর্ণ হইতে বিদ্রাবশিখা নির্গত হইয়া পাখীর দলকে আক্রমণ করিল। অনেক পাখী তাহাতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। শুধু আমি বাহার পূর্বে আরোহণ করিয়াছিলাম, সে পড়িয়া মরিল না। তবে, সেই পক্ষী চঞ্চল হইয়া আমাকে এক পক্ষীর উপর নামাইয়া দিয়া গেল।

অদৃষ্ট-স্রোতের
অনুভব

পক্ষিপূর্বে
স্বর্গযাত্রা
অভিধান

শরতনের
অমৃত

ক

পর্বে দ্বিগুণ হইয়া আমি প্রমাদ গলিলাম। হৃদয়ী বুঝী শরী, গৃহপরিজন হইতে বিমুক্ত হইয়া মন অত্যন্ত ব্যাকুল হইল। হারি! কেন আমার এ চরিত্র হইল! কয়েক দিন পরে পর্বেতে হই জন হৃদয়ী বুঝীর সহিত দেখা হইল। তাঁহার দেবদূত বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাকে একটি স্বর্ণদণ্ড দান করিয়া গেলেন। এক দিন দেখিলাম, এক সপ্ত একটি মাহুকে প্রায় প্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। মাহুকেটি আমার কাছে কাতরভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিল। স্বর্ণদণ্ডের দ্বারা সপ্তকে আশ্বাস করিলাম। সে মাহুকেটকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। দেখিলাম, লোকটি আমার পূর্ণপরিচিত পক্ষী। সে আমাকে তাঁহার পৃষ্ঠদেশে বহন করিয়া আমার স্ত্রীর কাছে পৌঁছিয়া দিল। প্রথমতঃ আমাকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহার কাছে গুলিলাম, ঐ সকল লোক শরতনের অমৃত। তাঁহার পরামর্শানুসারে সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া প্রচুর অর্থ পাইলাম। তার পর একখানি জাহাজ নির্মাণ করাইয়া কয়েক জন লোক সহ বাদোয়ার যাত্রা করিলাম। স্ত্রীকে সঙ্গে আনিলাম।

অনন্তর বাগদাদে নিরাপদে প্রত্যাগমন করিয়া খালিফের নিকট উপস্থিত হইলাম এবং তাঁহাকে দৈত্যকাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করিলাম। খালিফ আমার কথা শুনিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলেন এবং বলিলেন, “দীর্ঘকাল আমার অদর্শনে তিনি চিন্তাকুল ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস ছিল, আল্লা আমাকে নিরাপদে রূপে লইয়া আসিবেন।”

গজদন্ত এবং মংস্ত প্রভৃতি অজুত ব্যাপারের কাহিনী শ্রবণ করিয়া, তিনি অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন; কিন্তু আমার কথা অস্বীকার নহে ভাবিয়াই তিনি ইহা বিশ্বাস করিলেন এবং তাঁহার কার্যসাধন করিতে গিয়া আমাকে অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে বুঝিয়া, তিনি বহুমূল্য উৎকৃষ্ট পুরস্কারে আমাকে পুরস্কৃত করিলেন। আমি মহানন্দে রাজসভা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। অতঃপর আর কখনও আমি গম্ভীর্য্য করি নাই।

সে ভাণ্য

শুলভ নহে!

ক



সিন্দবাদ তাঁহার বিচিত্র কাহিনী শেষ করিয়া বলিলেন, “বহুগুণ, এখন তোমরা বুঝিতেছ, অন্ন চেষ্টায় কিংবা অন্ন ভাগবীকারে আমি এই অজুল সম্পত্তিলাভে সমর্থ হই নাই; পৃথিবীতে সহজে কেহ উন্নতি লাভ করিতে পারে না।” প্রমিক সিন্দবাদ সকল কথা শুনিয়া সিন্দবাদের করচূড়ন করিয়া বলিল, “মহাশয়, আমি স্বীকার করিতেছি, আপনাকে এই অবস্থালভের জন্ত নানা প্রকার ভরসার বিপদে পড়িতে হইয়াছে, কিন্তু আপনি আল্লার অমৃতগ্রহে সকল বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া, পরম সুখে—সৌভাগ্যে কালযাপন করিতেছেন। আমি আমার জীবনে কখনও আপনার ছায় বিপদে পড়ি নাই এবং আপনার অতীত জীবনের কষ্টের সহিত আমার জীবনের তুলনা হইতেই পারে না। আপনি যাহা সন্ধান করিয়াছেন, তাহার বিনিময়ে এই সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করিতে আপনার অধিকার আছে। আল্লা করুন, যেন আপনি সুস্থরীয়ে দীর্ঘজীবী হইয়া এই প্রকার সুখভোগ করিতে পারেন।”

সিন্দবাদ প্রমিক সিন্দবাদকে সে দিনও একশত মুদ্রা উপহার প্রদান করিয়া বলিলেন, “ভাই, আজ হইতে তুমি মুটেগিরি ত্যাগ কর, তোমাকে আমি বহুরূপে গ্রহণ করিলাম, যত দিন আমরা বাঁচিব, উভয়ে একত্র বাস করিব।”



শাহারজাদী সিন্ধুনাথ খালিকের সমুদ্রযাত্রার কাহিনী শেষ করিয়া, জলতানকে বলিলেন, “আহা! আমি আপনাদের নিকট খালিক হারুণ-অল-রসিদ বাগদাদের একটী যাত্রা বৈশাখ-মাসে কাহিনী বর্ণনা করিয়াছি, অল্পমতি হইলে আরও একটি বলিতে পারি।”

শাহারজাদীর যৌবন-বিবাহের-গল্পমথুরার আবেশে জলতানের মনে প্রচুত আনন্দ-সঞ্চার হইতেছিল, সুতরাং তিনি আনন্দে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন শাহারজাদী হাসি হাসি মুখে আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন :—

এক দিন খালিক হারুণ-অল-রসিদ জাহার প্রধান উজীর সাক্ষরকে সঙ্গে লইয়া উজীরের ভ্রমণে বহির্গত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন, —বলিলেন, “আমি নগরের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিতে আসি, আমার রাজ্যের বিচারকগণের সম্বন্ধে লোকের ক্রিয়াকর্মসম্বন্ধে, তাহা সবিস্তারে জানিব। যদি কোনও বিষয় কোন প্রকার গুরুতর অভিযোগ শুনিতে পাই, তবে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সেই বিচারকের আসনে অপেক্ষাকৃত কর্তব্যপারায়ণ ও কর্মদক্ষ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিব; যদি কাহারও স্বার্থের প্রমাণ শুনিতে পাই, তাহা হইলে তাহাকে অপেক্ষাকৃত উন্নতপদে প্রতিষ্ঠিত করিব।”

নির্দিষ্ট সময়ে খালিক উজীর ও সর্দার খোজা মস্করের সহিত ছয়বেশে নগরভ্রমণে বাহির হইলেন। সেই রাত্রিতে খালিক নগরের বিভিন্ন অংশে ভ্রমণ করিতে করিতে চতুর্দিকে এক স্থানে দেখিলেন, একটি দীর্ঘবেশে গুরুতরবয়স্ক বৃদ্ধ মন্তকের উপর স্থলীকৃত জাল লইয়া এক দিকে ধাবিত হইয়াছে, তাহার হস্তে তালপত্রনির্মিত একটি ঝোড়া ও একগাছি লাঠি। এই বৃদ্ধকে দেখিয়া খালিক বলিলেন, “ইহাকে দেখিয়া অত্যন্ত নোক বলিয়াই বোধ হয়, ইহাকে ইহার অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করা যাক।” খালিকের আদেশে উজীর সেই বৃদ্ধকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “তাই, তোমার পরিচয় জানিতে আমাদের বড় আগ্রহ হয়।” বৃদ্ধটি মবিনের উত্তর করিল, “মহাশয়, আমি মন্ত-বাবনারী; কিন্তু এই বাতলায়ে সকল লোকের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা দরিদ্র। আজ মধ্যাহ্নকালে আমি দাহ ধরিতে গিয়াছিলাম, কিন্তু এত রাত্রি পর্যন্ত চেষ্টা করিয়াও একটি মাছ পাই নাই। আমার গৃহে স্ত্রী ও পুত্র কয়েকজন, আমি এক দিনও তাহাদের উদরপূর্ণ করিয়া আহার দিতে পারি না।”

সেই জেলের কথা শুনিয়া খালিকের মনে করুণার সঞ্চার হইল; তিনি জেলেকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “নদীর ধারে ফিরিয়া গিয়া আর একবার জাল ফেলিয়া দেখ, জালে বাহা উঠিলে, তাহা লইয়া আসিয়া তোমাকে এক শত টাকা দান করিব।” জেলে খালিকের কথা শুনিয়া মহা উৎসাহে টাইব্রিস্ নদীর তীরে প্রত্যাগমন করিল। খালিকও উজীর এবং সর্দার-খোজার সহিত তাহার অনুসরণ করিলেন। নদীতীরে উপস্থিত হইয়া জেলে মনে মনে বলিল, “হা আল্লা! ইহায়া আমাকে বাহা দিতে চাহিলেন, তাহা লইয়া আসিয়া এক ভাগও যদি দেন, তাহা হইলেও আমার স্ত্রী-পুত্র দুই দিন পেট ভরিয়া আহার করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারে।”

এই কথা বলিয়া, জেলে নদীতে জাল ফেলিয়া, তাহা টানিয়া তীরে তুলিলে দেখা গেল, জালে একটি সিন্দুক উঠিয়াছে; সিন্দুকটি দৃঢ়রূপে বদ্ধ। খালিকের আদেশে উজীর জেলেকে এক শত টাকা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিয়া তাহাকে সে স্থান হইতে বিদায় দান করিলেন। তাহার পর যোজা মস্কর সেই সিন্দুক খাড়ে লইয়া খালিকের আদেশে তাহার অনুসরণ করিল। তৎক্ষণাৎ প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া খালিক সিন্দুকটি খুলাইলেন; দেখিলেন, তাহার ভিতর তালপত্রের একটি প্রকাণ্ড ঝোড়া, ঝোড়ার মুখ লাগে কিংবা দিয়া বাঁধা। ছুরি দিয়া সেই বন্ধন ছিন্ন করিয়া, খালিক সেই ঝোড়ার ভিতর হইতে একটি

আপাতত
পুস্তকের
আশা



জলনিয়ন্ত্রিত
সিন্দুকে
হতমীর
মৃতদেহ



বড় বাড়ি বাহির করিলেন; বাড়িটি একখানি পুরাতন কার্পেট দিয়া বাঁধা, তাহার চারিদিকে দড়ী জড়ান। দড়ী কাটা, কার্পেটের আবরণ খুলিয়া, তাঁহারা সেই বাড়ির ভিতর বাহা দেখিতে পাইলেন, তাহাতে তাঁহাদের বিস্ময়ের নীমা রহিল না;—দেখিলেন, তাহার মধ্যে একটি স্বন্দরী যুবতীর মৃতদেহ খণ্ড খণ্ড করা রহিয়াছে। খালিকের বিস্ময় অবিশেষে ক্রোধে পরিণত হইল; তিনি তাঁহার উজীরের প্রতি সন্দেহপূর্ণভাবে চাহিয়া বলিলেন, “রে কুসুর! তুই এই ভাবে আমার রাজ্যের দ্রুতগণের গুপ্তকাণ্ডারির সন্ধান রাখিস? হত্যাকারিগণ আমার রাজ্যে নির্ভয়ে আমার প্রজাগণকে বধ করিয়া, এই ভাবে টাইগ্রিস



জাফেল
সিন্দুক

নদীর জলে নিক্ষেপ করে, মহা বিচারের দিন আমার নিকট আমি কি জবাব দিব? যদি তুই এই রমণীর সন্ধান করিতে না পারিস, তাহা হইলে আমি তোমার চল্লিশ জন আত্মীর সহিত তোমার প্রাণ বধ করিব। আমি তিন দিন মাত্র সময় প্রদান করিলাম, এই সময়ের মধ্যেই কার্যোদ্ধার করা চাই।”

উজীর মহা চিন্তাকুলচিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, “হায়! এবার আর আমার পরিত্রাণ নাই। এই প্রকাণ্ড বাগদাদ নগরে লক্ষ লক্ষ লোকের বাস, হত্যার বিপুমাত্র কারণ না জানিয়া এই সকল লোকের ভিতর হইতে কিরূপে আমি হত্যাকারীকে খুঁজিয়া বাহির করিব? কে জানে, হত্যাকারী এই রমণীর প্রাণবধ করিয়া কোন দূর-দেশান্তরে

পলায়ন করে নাই? অজ্ঞ কোন লোক হইলে হয় ত কোন নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাজাইয়া, তাহাকে খালিকের নিকট দোষী প্রমাণ করিয়া, খালিককে সন্তুষ্ট করিত, কিন্তু আমি তাহা পারিব না, ইহাতে যদি আমার প্রাণ যায়, তাহাতেও আক্ষেপ নাই।”

উজীরের আজ্ঞায় প্রহরীগণ নগরের প্রত্যেক অংশে তন্ন তন্ন করিয়া অপরাধীর অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাহাদের কোন চেষ্টাই সফল হইল না। তিন দিনের ছই দিন চলিয়া গেল; উজীর এই হত্যারহস্তের কোন তথ্যই আবিষ্কার করিতে পারিলেন না। ভয়ে ও হুশিয়ার তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, বুঝিলেন, জামা না বাঁচাইলে আর এ যাত্রা কিছুতেই তাঁহার রক্ষা নাই।

তৃতীয় দিনে খালিকের একজন কর্মচারী উজীরের গৃহে উপস্থিত হইয়া, উজীরকে তাঁহার অশ্রমরূপ করিতে বলিলেন। খালিক উজীরকে তলুক দিয়াছিলেন। উজীর কশ্মির-কলেবরে খালিকের নিকটে উপস্থিত হইলে খালিক তাঁহাকে সেই হত্যাকারী সন্ধকে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। উজীর অবনতমস্তকে বলিলেন, “জাঁহাপনা, এই হত্যাসন্ধকে এ পর্যন্ত আমি কোন রহতাই ভেদ করিতে পারি নাই; আমি বহু অশ্রমস্থান করিয়াছি, কিন্তু কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারিল না।” খালিক চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, “রে নরাত্ম, আমি তোমার কোন কৈফিয়ৎ শুনিতে চাই না, আমি আদেশ করিতেছি, বাতকগণ কলাই তোমার চল্লিশ জন আত্মীরের সহিত তোমার প্রাণ বিনাশ করিবে। আমি ফাঁসীর হুকুম দিলাম।”

মহাশয়গোহে ফাঁসীর আয়োজন হইতে লাগিল। প্রধান উজীর ও তাঁহার আত্মীয়গণের দাঁনী দেখিবার জন্য টোলসহরতে নগরবাসিগণকে আকান করা হইল। উজীর তাঁহার আত্মীয়গণ সহ বধ্যভূমিতে নীত হইলেন। এতগুলি নিরপরাধ লোকের প্রাণদণ্ড হইতেছে দেখিয়া, নগরবাসিগণ একবাঁকো বিলাপ ও আক্ষেপ করিতে লাগিল, খালিকের সাম্রাজ্যের মধ্যে ইহাদের ছায় পরোপকারী, দাতা ও নিঃস্বার্থপর ব্যক্তি অধিক ছিলেন না।

ফাঁসীর সকলই প্রস্তুত, এমন সময় একটি অল্পবয়স্ক যুবক যুবকরূপে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি উজীরের নিকটে আসিয়া তাঁহার করচূষন করিয়া বলিলেন, “উজীর মহাশয়, আপনি বিনা দোষে দণ্ডভোগ করিতেছেন, আমি আপনার পরিবর্তে ফাঁসী যাইব; কারণ, আমিই সেই রমণীর হত্যাকারী, আমিই এই অপরাধের জন্য দণ্ডভোগের যোগ্য।”

উজীর এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব্বে সবদে উৎফুল্ল হইলেও যুবকের মুখ দেখিয়া, তাহাকে অপরাধী মনে করিতে পারিলেন না। যুবকের প্রতি ক্রোধের পরিবর্তে তাঁহার মনে কল্লণার সঞ্চার হইল। তিনি যুবককে এ সন্ধকে প্রেরণ করিতে যাইবেন, এমন সময় একজন দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি সেই জনতা ভেদ করিয়া, উজীরের সমীপস্থ হইয়া বলিলেন, “মহাশয়, এই যুবক বাহা বলিতেছে, তাহা সত্য মনে করিবেন না, আমিই সেই রমণীকে হত্যা করিয়াছি, আমিই দণ্ডভোগের যোগ্য। নির্দোষীকে অপরাধী ভাবিয়া দণ্ডস্থান করিবেন না।” যুবক বলিলেন, “মহাশয়, আমি বাস্তব বলিয়াছি, তাহাই সত্য, রমণীর আর কোন হত্যাকারী নাই, আমার প্রতি দণ্ডবিধান করিয়া আপনার কর্তব্য সম্পাদন করুন।” দীর্ঘাকৃতি ব্যক্তি কহিলেন, “কেন বাপু, জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া এরূপ গর্হিত আচরণ করিতেছ? আমি পৃথিবীতে অনেক দিন আসিয়াছি, বহু স্বহৃদঃখ ভোগ করিয়াছি; স্বতরাং জীবনে আমার পুঁহা নাই, আমার জীবনের পরিবর্তে তোমার জীবনরক্ষা হউক।”—উজীরকে বলিলেন, “মহাশয়, আপনি আমার প্রাণদণ্ডজ্ঞা করুন, আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছি।”

তখন কে প্রকৃত অপরাধী, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, উজীর তাঁহাদের দুজনকেই খালিকের নরিকটে উপস্থিত করিলেন। খালিক তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমাদের মধ্যে কে প্রকৃত হত্যাকারী, তাহা সত্য করিয়া বল।” উভয়েই আপনাকে হত্যাকারী বলিয়া স্বীকার করিলেন। তখন খালিক উজীরকে বলিলেন, “উভয়কেই ফাঁসিকাঠে লটকাইয়া দাও, ইহাদের উভয়ের একজন হত্যাকারী হইলেও আর একজন মিথ্যা বলিয়া স্বীকারে বিয় ঘটাইতেছে, তাহারও প্রাণদণ্ড হউক।”—এ কথা শুনিয়া উজীর করযোড়ে বলিলেন, “জাঁহাপনা, এই উভয় ব্যক্তির মধ্যে যদি একজন হত্যাকারী হয়, তাহা হইলে সে অপরাধে অন্য ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আদেশ সমত নহে।”



হুমকী-হত্যার
আগ্রহবান



এই কথা শুনিয়া যুবক বলিলেন, “আমার বিয়া করিয়া বলিতেছি, আমি এই যুবতীর হত্যাকাণ্ডী ; আমি তাহাকে হত্যা করিয়া প্রথমে তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করি, তাহার পর তাহাকে টাইগ্রলের জলে নিক্ষেপ করি, আজ চারদিন হইল, এ ঘটনা ঘটয়াছে। যদি আমার এ কথা সত্য না হয়, তাহা হইলে শেষ দিনের দিন আমি বৈ আমাকে দণ্ড না করেন। আমি সত্য কথা বলিলাম, আমার প্রাণবন্তের আদেশ হউক।” এই কথা শুনিয়া প্রৌঢ় ব্যক্তি কোন উত্তর করিলেন না। ঈশরের শপথ লইয়া এইরূপ দৃঢ়তার সহিত অপরাধ স্বীকার করায় খালিক যুবকের নিকটে চাহিয়া সন্দেশ বলিলেন, “রে নরায়ন, তুই কি জ্ঞাত এইরূপ শৈশবিক কার্য্য করিয়াছিল, তাহা বল; এখন কেনই বা বগুভোগের জন্ত অপরাধ স্বীকার করিতেছিস?” যুবক সন্দেশে বলিলেন, “হে মহাশয়! রাজ্যে দাদশাহ, আমার কাছিনী গ্রহণ করল, তাহা হইলেই সকল কার্য্য সুবিধেতে পারিবে। আমার এই ইতিহাস-প্রকাশে দাদশাহের উপকার হইতে পারিবে।” যক্ষিক তখন তাহাকে তাঁহার হত্যাকাণ্ড বিবরণ বলিবার জন্ত আদেশ করিলেন। যুবক বলিতে পারিলেন—

যুবক
ও
তাহার
প্রিয়
তমা



*

জাঁদগল, যে যুবতীকে আমি হত্যা করিয়া টাইগ্রলের জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম, সে আমার বিবাহিতা পত্নী, এবং ঐ ব্যক্তি, যিনি তাহাকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া দণ্ডভোগ করিতে চাহিতেছেন, তিনি আমার জ্বর পিতা এবং আমার পিতৃব্য। ইহার কস্তার দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় তাহার সহিত আমার বিবাহ হয়, তাহার পর একাদশ বৎসর অতীত হইয়াছে। এই যুবতীর গর্ভে আমার তিনটি পুত্র হইয়াছে, তাহারা সকলেই জীবিত আছে। আমার স্ত্রী কখনও আমার অমৃত্যুর কোন কার্য্য করে নাই। সে দম্পতী ও বুদ্ধিমতী ছিল, আমাকে সুখী করিবার জন্ত সে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত; আমিও তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতাম এবং তাহার সকল প্রার্থনাই পূর্ণ করিতাম।

হই মাত্র পূর্বে তাহার বীড়া হয়, আরোগ্যের জন্ত আমি কোন চেষ্টাই করি নাই। এক মাস পরে সে অনেক দুঃস্থ হইয়া উঠে এবং মানাপারে নান করিতে থাকিতে চাহে। যাইবার পূর্বে সে আমাকে বলিল, “তাই, আমার আপেল খাইবার বড় ইচ্ছা হইয়াছে, যদি আপেল সংগ্রহ করিতে পার, তাহা হইলে তাহা খাইয়া আমার অকট দুঃস্থ হয়; অনেক দিন হইতে আমার আপেল খাইবার ইচ্ছা হইয়াছে।”—আমি আমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া বলিলাম, “আমি সাধ্যানুসারে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিব।”

আপেলের
আগ্রহ



আমি তৎক্ষণাৎ বাজারে চলিয়া গেলাম এবং বহুসংখ্যক ফলের দোকানে আপেলের সন্ধান করিতে লাগিলাম, কিন্তু এক টাঙ্কা পর্যন্ত দাম দিতে স্বীকার করিয়াও বাজারে একটিও আপেল মিলাইতে পারিলাম না। অনেকখানি পরিশ্রম অনর্থক বাজে খরচ হইল তাহা বিধায় বিধায়মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মানাপার হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমার স্ত্রী আপেলের বিরুদ্ধে অস্থির হইয়া উঠিল, সমস্ত রাত্রি আর তাহার নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই আমি শহর-সরিকটস্থ লম্বত ফলের বাগানে আপেলের সন্ধানে গুহ্রিলাম, কিন্তু সে হ্রদত ফল কোথাও মিলাইতে পারিলাম না। অবশেষে এক বাগানের বৃদ্ধ মালী বলিল, “বাগসোয়ার বাগিকের বে বাগান আছে, সেখানে ভিন্ন এখন আর কোথাও আপেল পাওয়া হইবে না।”



বলিযাছি, আমি আমার জীকে প্রাণাধিক ভালবাসিতাম, আপেল না পাইয়া আমি ঘরে বড় কষ্ট পাইলাম, যেমন করিয়াই হউক, আপেল সংগ্রহ করিতে হইবে জাখিয়া আমি বাগসারার বাতী করিলাম। আমি দেখান্বে, একজন জরুরি গিরাছিলাম যে, এক গজের মধ্যেই গৃহে কিরিয়া আসিতে পারিলাম। এতোকটির মুখা এক এক টীকা দিয়া আমি তিনটি আপেল জর করিরাছিলাম। বাগানে তিনটির অধিক আপেল ছিল না। আমি আপেল লইয়া গৃহে কিরিলাম বটে, কিন্তু তখন দেখিলাম, আমার জীরা আপেলের লোভে গৃহেইরাছে, তাহার গীড়া আমার বাড়িয়া উঠিয়াছে। আমি তাহার রোগশান্তির কোন উপায় দেখিলাম না; আপেল তিনটি আমার জীরা শব্দেপ্রাণে প্রকিয়া গছিল।

কয়েক দিন পরে একদিন বাজারে দেখিলাম, একটি দীর্ঘাকৃতি কুম্ভবর্ণ দান একটি আপেল লইয়া এক দোকানে প্রবেশ করিতেছে। আমি বাগসারো হইতে যে আপেল আনিরা-ছিলাম, ইহা যে তাহারই একটি, তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলাম; কারণ, আমি জানিতাম, বোগদানে কিংবা তাহার নিকটবর্তী কোন স্থানে তখন আপেল মিলিবার সম্ভাবনা ছিল না। আমি সেই ক্রীতদাসের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “তাই, এ আপেল তুমি কোথায় পাইলে?”—



সংস্কৃত-
ভাষা
ভাষা



যুবক মুদ্রহস্তে উত্তর দিল, “ইহা আমি আমার উপপত্নীর নিকট উপহার পাইয়াছি। আমি আজ তাহাকে দেখিতে গিরাছিলাম;—দেখিলাম, তাহার বড় অস্থখ। আমি তাহার শয্যাপ্রান্তে তিনটি আপেল দেখিরা-ছিলাম। অসময়ে সে এমন আপেল কোথায় পাইল, এ কথা জিজ্ঞাসা করার আমার উপপত্নী বলিল, তাহার স্বামী পনেরো দিনের পথ হইতে ইহা আনিরা-সিয়াছে। আমার উত্তরে একত্র আমার করিয়া উঠিয়া আনিবার সময় এই আপেলটি লইয়া আনিয়াছি।”

সেই দ্বাদশের মধ্যে এই কথা শুনিয়া আমি ক্রোধে দিগ-বিদিক্জননপুত্র হইলাম, বাজারে আমার দোকান ছিল, তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া আসিলাম। আমার জীরা শয্যকক্ষে প্রবেশ করিয়া আপেলের সন্ধান লইলাম;—দেখিলাম, শয্যাপ্রান্তে দুইটি আপেল প্রকিয়া আছে। আর একটি আপেল কি হইল, জিজ্ঞাসা করার আমার জী সেই আপেল দুইটির দিকে চাহিয়া বাতাবিক স্বরে বলিল, “তাই ত, আর একটা দেখিতেছি না কেন, কোথায় গেল, তাহা বলিতে পারি না।”—আমার জীরা কথা শুনিয়াই তাহার প্রতি আমার লক্ষ্য

দুঃস্থ হইল। বুঝিলাম, বাজারে দাসের মুখে বাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্য। ক্রোধে আত্মলব্ধ করিতে পারিলাম না, আমার কটিদেশে তীক্ষ্ণধার ছুরি ছিল, তাহা সবেগে আমার জীর বন্ধস্থলে বিদ্ধ করিলাম; কিন্তু তাহাতেও আমার ক্রোধশান্তি হইল না, তাহার দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটি ঝোড়ার মধ্যে পুরিলাম, তাহার পর সেই ঝোড়ার মুখ লাল কিতা দিয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া ঐ ঝোড়া পুরাতন কার্পেটে মুড়িয়া একটা সিন্দূরের ভিতর পুরিলাম এবং রাত্রিকালে সেই সিন্দুকটা কাঁধে লইয়া টাইগ্রিস নদীর জলে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন আমার ছোট ছেলে ছটি ঘুমাইতেছিল—বড়ট বাড়ীতে ছিল না। আমি আমার জীর দেহ নদীতে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিলে দেখিলাম, আমার বড় ছেলেটি ঘরে বসিয়া কাদিতেছে। আমি তাহাকে রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, “বাবা, আজ সকাল-সকাল আমি ঘায়ে কাঁদিতাম; তাঁহার বিছানা হইতে একটা আপেল লইয়া রাস্তায় যাই, সেখানে তাহা লইয়া ফেলা করিতেছিলাম, এমন সময় একটা কালো লোক আসিয়া আমার হাত হইতে তাহা কাড়িয়া লইয়া চমিয়া গেল, আমি তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িয়া আপেলটি চাহিলাম; বলিলাম, ‘এ আপেল আমার বাবের, মার বড়-বাবার, বাবা মার জন্ত পনেরো দিনের পথ হইতে বড় কষ্টে তিনটি আপেল আনিয়াছেন, ইহা তাহারই একটি, উহা আমাকে কিরাইয়া দাও,’ কিন্তু লোকটি আমার কথা শুনিয়া না, আমাকে মারিয়া ফেলিয়া পলাইল, আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আপেল হারাইয়াছি, মা জ্বর ত কত বঁধ করিবেন।”—ছেলে আবার কাদিতে লাগিল।

গল্পের প্রবন্ধন



ছেলের কথা শুনিয়া আমার চৈতন্যদায় হইল;—বুঝিলাম, সেই নরায়ণ আমার পুত্রের নিকট হইতে যে কুরুট কথা সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহা হইতেই সে এমন একটি অদম্ব্য গল্প রচনা করিয়া আমাকে প্রবন্ধিত করিয়াছে। একটা অপরিচিত কৃষ্ণবর্ণ দাসের মুখে এমন একটা অবিখ্যাত কথা শুনিয়া আমি আমার তিরদিনের সুখঃখভাগিনী সাধবী পত্নীর বুক ছুরি বিধাইয়া দিলাম! শোক, হঃখে, অশ্রুতাপে আমি বুক ও মাথা চাপড়াইতে লাগিলাম। আমার পিতৃবা তাঁহার কন্ডাকে দেখিবার জন্ত সে দিন আমার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি তাহার নিকট কোন কথা গোপন করিলাম না, কিরূপে এবং কি জন্ত তাঁহার কন্ডাকে হত্যা করিয়াছি, তাহা বুঝিয়া বলিলাম। সকল কথা শুনিয়া আমার পিতৃবা কিছুক্ষণ ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, কন্ডার গুণবান্ধি শ্রবণ করিয়া আত্মলভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমার উজ্জ্বল গৃহকেণে পড়িয়া তিন দিন কাটিলাম।

জাঁহাপনা, এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, আমি কিরূপ পাণী, অশ্রুতাপে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, এখন প্রাণদণ্ড করিয়া আমার কুরুটের প্রতিফল প্রদান করুন।

খালিক যুবকের কথা শুনিয়া বিশ্বয়দাগরে মগ্ন হইলেন। তিনি দেখিলেন, যুবক যেরূপ অশ্রুতাপ হইয়াছে, তাহাতে দণ্ড অপেক্ষা সে মার্জনারই অধিক উপযুক্ত। যুবকের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে করুণাশঙ্কার হইল; তিনি বলিলেন, “এই যুবকের অপরাধ দ্বয়ের নিকট মার্জনার, মনুষ্যের নিকটও যুবক মার্জনার পাত্র। সেই নরশিচক্র ক্রীতদাস যুবতীর প্রাণনাশের প্রকৃত কারণ; অতএব উজীর, তোমার প্রতি আদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি তিন দিনের মধ্যে সেই চরাচারকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করিবে, নতুবা তোমার শিরশ্ছেদন হইবে।”

উজীরের নৃতন
বিপদ



হস্তভাগ্য উজীর আপনাকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেছিলেন, আবার কোথা হইতে একটা প্রকাণ্ড আপদ আসিয়া ছুটিল। যাহা হউক, তিনি খালিকের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া, অশ্রুশাশিতে ভাসিতে

ভানিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন; কারণ, তিনি বুঝিয়াছিলেন, বোম্বা নগরের ভায় হুভির্প নগরমধ্যে সহস্র সহস্র কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাসের ভিতর হইতে অপরাধী যুবককে খুঁজিয়া বাহির করা মাল্ভবের পক্ষে অসম্ভব। পরমেশ্বর যদি দয়া করেন, তাহা হইলেই প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান হইতে পারে।

খালিফ এবারও অপরাধীর সন্ধানের জন্য তিন দিন মাত্র সময় দিয়াছিলেন, বৃথা চিন্তায় ও নিফল চেষ্টায় দুই দিন কাটিয়া গেল; তৃতীয় দিনে উজীর জাকর মুতার অল্প প্রস্তুত হইয়া, তাঁহার সম্পত্তির একখানি চরম দানপত্র প্রস্তুত করিলেন। তাহার পর কাজি ও কয়েক জন সাকীকে ডাকাইয়া আনিলেন।

তাঁহাদের সম্মুখে উইলে স্বাক্ষর করিয়া, তিনি তাঁহার পরিবারবর্গের নিকট অস্তিম বিদায় গ্রহণ করিলেন; —গৃহে ক্রন্দনের রোল উঠিল। ইতিমধ্যে এক জন রাজকর্মচারী উজীরের নিকট আসিয়া জানাইল, খালিফ তাঁহার অন্ততকর্তব্যাতায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে তলব দিগাছেন। উজীর রাজপ্রাসাদে বাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার পাঁচ ছয় বৎসরের একটি কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া ধাত্রী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল।

উজীর এই কন্যাটিকে বড় ভাল-বাসিতেন; তিনি তাহাকে ক্রোড়ে তুলিয়া সজলনয়নে তাহার মুখচূষন করিলেন। মুখচূষনকালে তিনি দেখিলেন, তাঁহার কন্যার বকের কাছে ত্রিগন্ধযুক্ত কি একটা ফল রহিয়াছে; কি ফল, জিজ্ঞাসা করায় বলিকা বলিল, “বাবা, ইহা একটি আপেল; ইহার উপর খালিফের নাম লেখা আছে, আমাদের চাকর রোহান দুই টাকায় ইহা আমার কাছে বিক্রয় করিয়াছে।”

আপেল ও চাকর এই কথা দুইটি শুনিয়া, উজীর আনন্দে ও বিস্ময়ে লাকাইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার কন্যার হস্ত হইতে আপেলটি গ্রহণ করিয়া, তাঁহার সেই ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন, “হতভাষা, এ আপেল তুই কোথায় পাইলি?” ভৃত্য বলিল, “হজুর, আপনার দিবা, আমি ইহা কোন স্থান হইতে চুরি করিয়া আনি নাই; আজ কয়েক দিন হইল, আমি পথ দিয়া বাইতে বাইতে দেখিলাম, কয়েকটি ছেলে-মেয়ে সেই পথে খেলা করিতেছে; তাহাদের মধ্যে এক জনের হাতে একটি আপেল; আমি তাহার হাত হইতে আপেলটি কাড়িয়া লইলাম; ছেলেটি আমার নিকট তাহা চাহিয়া বলিল, ‘এ আপেল তাহার নহে, তাহার



উজীরের
অস্তিম বিদায়

সাক্ষী-
হস্তা
দাসেন
সন্ধান

না'য়; তাহার মাতা অত্যন্ত পীড়িত বলিয়া তাহার পিতা বহু দূর হইতে এইরূপ ভিনটি আপেল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে।' ছেলোটর কথা শুনিয়াও আমি তাহাকে আপেল প্রদান করিলাম না, বাড়ী লইয়া আসিলাম এবং আপনার কন্ডার কাছে দুই টাকার ইছা বিক্রয় করিলাম।"

জাকর বৃক্ষিলেন, এই দুরাখাই একটি নিরুপকটরিত্রা সাধার প্রাণনাশের কারণ। তিনি তাহার সেই ক্রীতদাসকে সঙ্গে লইয়া খালিকের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে সকল কথা জ্ঞাত করিলেন।

খালিক সকল কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন; তাহার পর সক্রোধে বলিলেন, "যে দুরাচার মিথ্যাকথা বলিয়া এ ভাবে একটি ভদ্র পরিবারের সর্বনাশ করিতে পারে, তাহার প্রাণদণ্ড হওয়াই উচিত।" উজীর বলিলেন, "জাহাপনা যাহা বলিতেছেন, তাহার উপর কোন কথাই চলিতে পারে না, সত্যাই ইহার অপরাধ অমার্জনীয়। কিন্তু আমি কায়েরা নগরের উজীর নোরেদীন আলী ও বসোরার উজীর বদরেদীন হাসেনের যে গম জানি, তাহা ইছা অপেক্ষাও বিষয়কর, জাহাপনার আদেশ হইলে আমি তাহা বলিতে পারি। জাহাপনা দেখিবেন, আমার দ্রুত মার্জনালাভের যোগ্য কি না।" খালিক উজীরকে গম বলিবার আদেশ প্রদান করিলে, উজীর বলিতে লাগিলেন :—



মোহে-
জীম
আলী
ও
মদরে-
জীম
হায়েম



জাহাপনা, পূর্বকালে মিশর দেশে এক স্থলতান ছিলেন, তিনি কেবল স্ববিচারক ছিলেন না; দয়া, সম্মতি, পরোপকার প্রভৃতি রাজত্বের তিনি অঙ্গভূত ছিলেন। তাহার পরাক্রমে রাজগণ সর্বদাই ভীত থাকিতেন। তাহার উজীর অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, বিজ্ঞানে তিনি অধিষ্ঠীত ছিলেন, গুণের তিনি উপযুক্ত পুরস্কার দান করিতেন। উজীরের দুই পুত্র, পুত্র দুটি বড় রূপবান, গুণেও তাহার পিতার সমকক্ষ ছিলেন। উজীরপুত্রদ্বয়ের ছোটটির নাম সামসোদীন মহম্মদ, ছোটটির নাম নোরেদীন আলী।

উজীরের মৃত্যু হইলে স্থলতান তাহার পুত্রদ্বয়কে ডাকিয়া অনেক সামান্যদান করিলেন, তাহার পর তাহাদিগের দুই ভ্রাতাকেই অমাত্যপদে নিযুক্ত করিলেন। উভয়েই স্থলতানের উজীরপদে নিযুক্ত হইয়া, তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, পিতার আশ্বস্তিক্রিয়া সম্পাদনের জন্য বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন এবং সকল কার্য শেষ হইলে বাসস্থানে তাহার রাজসভার উপস্থিত হইয়া কার্যভার গ্রহণ করিলেন।

স্থলতান যখন মৃগয়ায় বাহির হইতেন, তখন দুই ভ্রাতার এক জন স্থলতানের সহিত থাকিতেন। এক দিন স্থির হইল, স্থলতানের সহিত বড় ভাই সামসোদীন মৃগয়ায় গমন করিবেন। যে দিন বাইবার কথা, তাহার পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে দুই ভ্রাতা নানা বিষয়ে আলাপ করিতেছিলেন; কথাপ্রসঙ্গে সামসোদীন মহম্মদ তাহার সহোদরকে বলিলেন, "ভাই, আমরা এখনও বিবাহ করি নাই, বেশ সুখে আছি, শান্তিরও অভাব নাই। আমার মনে কিন্তু একটা চিন্তার উদয় হইয়াছে, যদি বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা যেন এক দিনে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের দুইটি সহোদরা ভগিনীকে বিবাহ করি। তুমি এ বিষয়ে কি বল?"

উজীর-

আত্মঘরের

বিবাহ-রহত



—নোরেদীন বলিলেন, "দাদা, আপনি অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, আপনি যাহা বলিবেন, আমি তাহাতে সম্মত আছি।" সামসোদীন বলিলেন, "আমার ইচ্ছা এখানেই শেষ হয় নাই, আমার আরও কিছু কামনা আছে, যদি তোমার ও আমার এক দিনে একটি পুত্র ও একটি কন্যা-সন্তান জন্মিত হয়, তাহা হইলে আমরা তাহাদিগের পরস্পরের সহিত বিবাহ দিয়া,

“স্বপ্নের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিতে পারি।” ছোট ভাই বলিলেন, “উত্তর প্রান্তর, তাহাই হইবে, কিন্তু নিজ বিবাহের আপনি কি মনে করেন, আমীর পুত্র আপনার কন্ডাকে বিবাহ করিগ, আপনার কন্ডাকে কোন সম্পত্তির অধিকারিণী করিবে?” সামসোদ্দীন বলিলেন, “বিবাহের চুক্তিপত্র লেখা-পড়া করিবার সময় তুমি আমার কন্ডাকে তিন হাজার টাকা, তিনধানি জমীদারী ও তিনটি দাসী দিবে।” নোরেদ্দীন বলিলেন, “এ প্রস্তাবে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি না। ছেলে মেয়ে অপেক্ষা অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ, মেয়ের জন্য কিছু অর্থ দান করা আপনারই উচিত, কিন্তু আপনি তাহা না করিয়া, অন্তের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছেন। এরূপ ব্যবহার বড় অভয়া।”



নোরেদ্দীন কথাটি বাস্তবিকই রহস্তভাবে বলিয়াছিলেন; কিন্তু সে দিন তাঁহার দাদার মেজাজ ভাল ছিল না, তিনি নোরেদ্দীনের কথায় বড় বিরক্ত হইলেন; সজ্ঞাধে বলিলেন, “তোমার পুত্র হস্তভাণ্য হইবে, তুমি আমার কন্ডা অপেক্ষা তোমার পুত্রকে শ্রেষ্ঠ বল? তুমি মনে করিচ্ছ, আমরা উভয়েই সমান। তুমি আমার যে অপমান করিচ্ছ, তাহাতে তুমি আমার কন্ডাকে তোমার সর্ব্ব দান করিলেও তোমার পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিব না।” অদ্ভুত কলহ! উত্তর ভ্রাতার বিবাহই হয় নাই, অথচ স্ব স্ব পুত্র-কন্ডার বিবাহ লইয়া উভয়ে মহাবিবাদে প্রবৃত্ত! সামসোদ্দীনের ক্রোধ কিছুতেই শান্ত হইল না; তিনি বলিলেন, “কাল প্রভাতে যদি স্নানভানের সহিত আমাকে মুগয়ার বাইতে না হইত, তাহা হইলে আমি তোমার দাণ্ডিকতার উপবৃত্ত প্রতিকণ প্রদান করিতাম। আমি মুগয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়া, এই অপমানের প্রতিশোধ প্রদান করিব, তুমি কি বিবেচনা কর, আমি অন্তের সম্পত্তি হস্তগত করিবার চেষ্টায় আছি?” তদনন্তর উভয়ে প্রস্থান করিলেন।

সামসোদ্দীন পরদিন প্রত্যুষে উঠিয়া রাজপ্রাসাদে গমন করিলেন এবং স্নানভানের সহিত কায়েম নগরভিত্তিতে মুগয়াবাত্রা করিলেন। নোরেদ্দীনের সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না, তিনি ভ্রাতার ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন; তিনি স্থির করিলেন, গৃহ পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। অনন্তর এক দিন ধনরত্ন ও কিছু বাস্তবসম্পত্তি একটি অশ্বতরের পৃষ্ঠে স্থাপন করিয়া তিনি গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন; গৃহস্থ দাসদাসীগণকে বলিলেন, “আমি স্থানান্তরে বাইতেছি, সেখানে একাকী যাওয়া দরকার, তাই কাংসকেও সঙ্গে লইলাম না। আমার তিন চারি দিন বিলম্ব হইবে।”



বহু পথ অতিক্রম করিয়া নোরেদ্দীন আরবের মরুপথে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু সহসা তাঁহার অশ্বতর খোঁড়া হইয়া গেল, স্তব্ধতা তাঁহাকে পদব্রজেই চলিতে হইল। নোরেদ্দীন পথে চলিতে চলিতে দেখিলেন, এক জন অস্বারোহী সেই পথে বাদোয়ার বাইতেছে; অস্বারোহী তাঁহার প্রতি রূপারবণ হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় অশ্বপৃষ্ঠে লইয়া চলিলেন। বাদোয়ার উপস্থিত হইয়া, নোরেদ্দীন অস্বারোহীকে ধন্তবাদ দিয়া, অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং নগরমধ্যে বাগা খুঁজিতে লাগিলেন। কিছু দূরে এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া, অজ্ঞাত লোকের জ্ঞায় তিনি পথের এক প্রান্তে সরিয়া দাঁড়াইলেন। সম্ভ্রান্ত মহাশয় বিশেষ সমারোহে দলবল লইয়া রাজপথ অতিক্রম করিতেছিলেন। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি সামান্য লোক নহেন, তিনি বাদোয়ার স্নানভানের উজ্জী। তিনি শাস্ত্রিকার জ্ঞাত রাজ্য দেখিতে আসিয়াছেন।

উজ্জীর মহাশয় ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, সহসা নোরেদ্দীনের সুগৌরব স্বর্ণের সুখের উপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। উজ্জীর তাঁহার পরিচ্ছদ দৃষ্টে বিদেশী বৃত্তিতে পারিয়া, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নোরেদ্দীন

আগী সন্নিহিত বসিলেন, “আমি মিশর হইতে আসিতেছি, কারো নগরে আমার জন্ম। আমার এক জন আত্মার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, সেই জন্ত আমি পৃথিবীভ্রমণে বাহির হইয়াছি, জীবনে আর গৃহে কিরিয়া যাইবার ইচ্ছা নাই।”

উজীর বসিলেন, “বৎস, পৃথিবী বড় দুঃখময় স্থান। তুমি যে সন্মত করিয়াছ, তাহা পরিত্যাগ কর, তাহাতে আরও অধিক দুঃখ পাইবে। আমার সঙ্গে এসো, তোমার মনোবাণী বাহ্যতে দূর হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিব।”

স্বর্গী পত্নী
প্রথম
উপভোগের
স্বপ্ন



নোরদীন বৃদ্ধ উজীরের অনুসরণ করিলেন, শীঘ্রই পরস্পরের পরিচয় পাইলেন এবং উভয়ে উভয়ের প্রতি অস্বস্তি হইয়া উঠিলেন। এক দিন উজীর নোরদীন আলীকে গোপনে বসিলেন, “দেখ বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক দিন যে বাচিব, সে সম্ভাবনা নাই। আমার একটি পরম রূপবতী স্ত্রীলা কন্তা আছে, তাহার বিবাহের বয়স হইয়াছে; আমার কন্তা সর্বপ্রকারে তোমারই উপযুক্ত। আমাদের রাজসভার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের পুত্রের সহিত আমার কন্তার বিবাহের জন্ত উৎসাহ আছেন, কিন্তু আমি কাহারও প্রস্তাবে সম্মতি দান করি নাই। আমি তোমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করি, বংশগৌরবেও তুমি আমার অপেক্ষা হীন নহ। আমি স্থলতানের নিকট তোমাকে পরিচিত করিয়া দিব। আমি বৃদ্ধবয়সে শাস্তিলাভের ইচ্ছা করিয়াছি; আমি কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে, তুমিই বাহ্যতে আমার পদে নিযুক্ত হইতে পার, তাহারও ব্যবস্থা করিব।”

উজীরের কথা শুনিয়া নোরদীন আলী আনন্দ ও রুতজতাপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উজীর তখন স্থলতানের অমাত্য ও তাঁহার বহুগণকে আহ্বান করিয়া, বিবাহের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান লোক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইলেন। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ উৎসবস্থলে সমাগত হইলে, উজীর তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বসিলেন, “মহাশয়গণ, আমি আপনাদিগের নিকট একটি কথা এত দিন গোপন রাখিয়াছিলাম, আজ প্রকাশ করিতেছি। আমার একটি ভ্রাতা আছেন, তিনি মিশরের স্থলতানের উজীর, সেই উজীরের একটি পুত্রকে তিনি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সহিত আমার কন্তার বিবাহ দিয়া, আমাদের উভয় পরিবারের একত্ব সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। আমার এই ভ্রাতৃপুত্র এখানে আসিবামাত্র আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম, এখন তিনি আমার কন্তার পাণিগ্রহণ করিবেন। আজ আমি বিবাহের দিন স্থির করিয়াছি; আপনাদের নিকট আমার প্রার্থনা, আপনারা বিবাহসভার উপস্থিত থাকিয়া এই বিবাহ সম্পন্ন করাইবেন।” সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন। যথাকালে কাজী আসিয়া, নোরদীনের সহিত উজীরকন্তার বিবাহ সম্পাদন করিলেন।

বিবাহের পর নোরদীন আনাদি শেব করিয়া, অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, তাঁহার শত্রুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। উজীর তাঁহার জামাতাকে নিকটে বসাইয়া সম্মুখে বসিলেন, “বৎস, তুমি কে এবং কি কার্যে নিযুক্ত ছিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছ, তোমার ভ্রাতার সহিত বিবাহই যে তোমার দেশত্যাগের কারণ, তাহাও বলিয়াছ; কি লইয়া বিবাহ, তাহা আমি এত দিন জানিতে পারি নাই, সেই বিবাহের কারণ জানিবার জন্ত আমার গুণ্ডহুকা জন্মিয়াছে, তুমি এখন আমার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিতে পার; কারণ, আমি তোমার একমাত্র হিতৈষী আত্মীয়, আমার নিকট তোমার কোন কথা গোপন করা উচিত হইবে না।”

নৌরেদীন আলী উজীরের নিকট তাঁহার সহোদরের সহিত বিবাহের সকল কার্য বুলিয়া বলিলেন। সকল কথা শুনিয়া উজীর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; তাহার পর বলিলেন, “আমি তোমার কাছে বড়ই অদ্ভুত কথা শুনিলাম। কাল্পনিক বিবাহ লইয়া যে এমন বিবাদ হইতে পারে, এ কথা আর কখনও শুনি নাই। এমন ভুল বিষয় লইয়া তোমাদের দুই সহোদরের মধ্যে বিবাদ হইয়াছে শুনিয়া, আমি আশ্চর্য্য বড়ই হুঃখিত হইলাম। আমার বোধ হয়, তুমি যে কথা কোতুক করিয়া বলিয়াছিলে, তাহা সত্য মনে করিয়াই তোমার সহোদর তোমার প্রতি অত্যধিক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। বাহা হউক, তোমাদের এ বিবাদ আমার পক্ষে অমুকুলই হইয়াছে, এই বিবাদের ফলেই আমি তোমার স্বায় রূপবান ও গুণবান যুবককে জামাতারূপে লাভ করিয়াছি। বাহা হউক, রাত্রি ক্রমে অধিক হইতেছে, তুমি এখন শয়নকক্ষে যাও, বিশ্রাম কর গে; আমার কছা তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। আমি কাল সকালে তোমাকে স্নানতানের সহিত পরিচিত করিয়া দিব, তোমার বাহাতে চাকরীর সুবিধা হয়, সে চেষ্টাও করা যাইবে।”

নৌরেদীন আলী তাঁহার নববিবাহিতা পত্নীর সহিত স্নান করিতে শয়নকক্ষে চলিলেন। আশ্চর্য্যের কথা এই যে, যে দিন উজীরকন্ডার সহিত নৌরেদীন আলীর বিবাহ হইল, ঠিক সেই দিনই কারয়োতে সামসোদীন মহম্মদের বিবাহ হইল।

নৌরেদীন আলী কারয়ো পরিভাগ করিবার একমাস পরে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সামসোদীন মহম্মদ স্নানতানের সহিত যুগল হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া নৌরেদীন আলীর সহিত স্নানকক্ষের জন্ত তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন; কিন্তু দেখিলেন, ভ্রাতার কক্ষ শূন্য; ভূত্যাগণের মুখে শুনিলেন, তিনি চারিদিনের মধ্যে দিয়ারিবার সম্ভাবনা জানাইয়া কারয়ো ভাগ করিয়াছেন, কোথায় গিয়াছেন, কেহই জানে না। সামসোদীন এই কথা শুনিয়া বড় হুঃখিত ও অশ্রুতপ্ত হইলেন; তাঁহার কঠিন কথা শুনিয়াই যে তাঁহার ভ্রাতা গৃহভাগ করিয়াছেন, তাহা বৃষ্টিতে আর তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি ভ্রাতার সন্ধানের জন্ত একজন অখারোহীকে অমুরোধ করিলেন, এই অখারোহী ডামস্কু যাইতেছিল। অখারোহী কোন সন্ধান পাইলেন না, নৌরেদীন তখন বাসোরার বিরাজমান।

সামসোদীন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভ্রাতার অমূল্যমানের জা লোক প্রেরণের সংকল্প করিলেন। ইতিমধ্যে তাঁহার বিবাহের সন্ধ্য উপস্থিত হইল। কারয়ো নগরের কোন মহা ধনবান ব্যক্তির একটি পরম রূপবতী কছা ছিল, সামসোদীন সেই কছার পাণিগ্রহণ করিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে দিন বাসোরায় উজীরকন্ডার সহিত নৌরেদীন আলীর বিবাহ হইল, ঠিক সেই দিনই সামসোদীন কারয়ো নগরে লক্ষপতির কছার পাণিগ্রহণ করিলেন।

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে। উভয় ভ্রাতাই সুন্দরী যুবতী পত্নী লাভ করিয়াছিলেন। পুন্সবাসর রজনীতে উভয় ভ্রাতাই যুবতী পত্নীকে সম্ভাষণ করায় একই দিনে উভয়ের পত্নীই গর্ভে সন্তানধারণ করিলেন। বিধিলিপি! নয় মাস পরে যে দিন সামসোদীন মহম্মদের পত্নী কারয়ো নগরে এক কছা-সন্তান প্রসব করিলেন, ঠিক সেই দিনই নৌরেদীন আলীর বাসোরা নগরে একটি রূপবান পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইল। যুব উজীর তাঁহার দোহিত্রের জন্যে আনন্দোৎসুক হইয়া, নগরবাসিগণকে মিষ্টান্ন ও অজ্ঞাত উপহার বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং নৌরেদীনকে লইয়া স্নানতানের সন্যাসে উপস্থিত করিলেন। উজীর তাঁহার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে নৌরেদীন আলী বাহাতে সেই পদে নিযুক্ত হইতে পারেন, উজীর তাহারও বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

নিয়তির
বিধানে
একই দিনে
জাতিস্বরের
বিবাহ



একই দিনে
উভয় ভ্রাতার
সন্তান-লাভ

কিছুদিন পরে উজীরের চেষ্টা সফল হইল। নৌরোদ্দীনকে রাজা তাঁহার উজীরপদে নিযুক্ত করিয়া, বৃদ্ধ উজীরকে রাজকাৰ্য্য হইতে বিদায় দান করিলেন। নৌরোদ্দীন বিশেষ যোগ্যতার সহিত তাঁহার কৰ্ত্তব্যপালন করিতে লাগিলেন। নৌরোদ্দীন আলীর সহিত উজীর-কন্ডার বিবাহের চারি বৎসর পরে উজীরের মৃত্যু হইল। কন্ডা-জামাতাকে স্থানী দেখিয়া তিনি নিরুদ্বেগে পরলোকযাত্রা করিলেন।

নৌরোদ্দীনের পুত্র বদরোদ্দীন সপ্তম বৎসরে পরাৰ্পণ করিলে, তাহার হৃদয়কার জন্ত নৌরোদ্দীন অতি সুশুভিত মৌলবী নিযুক্ত করিলেন। বালক অন্নদিনের মধ্যে কোরাণ কঠিন করিয়া দেলিল। অন্নদিনের মধ্যেই সে এমন সুশুভিত হইয়া উঠিল যে, দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে আর শিক্ষকের আবশ্যক হইল না। বদরোদ্দীনের চেহারা এমন সুন্দর ছিল যে, যে তাহাকে দেখিত, সেই মুগ্ধ হইত; তাহার সুমধুর স্বভাবের গুণে সকলেই তাহাকে অন্তরের সহিত যৎপরোনাস্তি স্নেহ করিত।

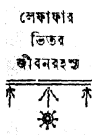


স্বপ্ন কি চিরস্থায়ী?

বিশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সৰ্ব্বশাস্ত্রে সুশুভিত হইয়া উঠিলে, নৌরোদ্দীন একদিন তাঁহার পুত্র বদরোদ্দীনকে স্থলতানের নিকট উপস্থিত করিলেন। স্থলতান উজীরপুত্রের রূপ ও গুণে মুগ্ধ হইয়া, তাহাকে একটি উচ্চ রাজকৰ্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। নৌরোদ্দীনের স্থখের আর সীমা রহিল না।

কিন্তু আল্লা চিরকাল মানুষের অদৃষ্টে সমান সুখ দান করেন নাই। কিছুদিনের মধ্যেই নৌরোদ্দীন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইলেন, তাঁহার জীবনের আর কোন আশা রহিল না। তখন তিনি বদরোদ্দীনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “বৎস, এ পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে, আমি বুঝিতেছি, অতি অল্পকালের মধ্যেই আমাকে ইহলোক পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমি এ সময় তোমাকে কয়েকটি উপদেশ প্রদান করিব, তদনুযায়ী চলিলে তোমার উপকার হইবে। প্রথমতঃ তুমি তোমার পূৰ্ব্বপুরুষগণের কোন পরিচয়ই অবগত নহ, আমি তোমাকে আমার বংশের পরিচয় প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর।

“আমি মিশর দেশে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা সেই দেশের স্থলতানের উজীর ছিলেন। তোমার জ্যেষ্ঠা—আমার দাদা ও আমি উভয়ে আমাদের পিতার মৃত্যুর পর সেই স্থলতানের উজীরী লাভ করি। তোমার জ্যেষ্ঠার নাম শামসোদ্দীন মহম্মদ, আমি বহদিন তাঁহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমার বিশ্বাস, তিনি এখনও জীবিত আছেন। তাঁহার সহিত মনোমালিন্য হওয়ায় আমি সেই রাজ্য ত্যাগ করিয়া এখানে আসি, এখানে আদিয়া আমি তোমার মাতাকে বিবাহ করি এবং রাজ্যের উরুপদ লাভ করি। অন্তান্ত বিশেষ বিবরণ তুমি এই লেকাকার ভিতর রক্ষিত কাগজ পাঠে জানিতে পারিবে। তুমি অবসরকালে এই কাগজখানি পাঠ করিবে, আমি বহুস্ত ইহা লিখিয়াছি। যে সকল কথা ইহাতে লিখিত আছে, তাহার মধ্যে তুমি দেখিবে, ইহাতে আমার বিবাহের ও তোমার জন্মের তারিখ লিখিত আছে। এই উভয় তারিখ জানা তোমার ভবিষ্যতে আবশ্যক হইবে; সুতরাং তুমি এই কাগজপত্র সযত্ন রক্ষা করিবে।” বদরোদ্দীন অক্ষুণ্ণ লোচনে পিতার হস্ত হইতে লেকাকারখানি গ্রহণ করিলেন, এবং শিশুদম্ভীপে প্রতিজ্ঞা করিলেন, এই সকল কাগজপত্র তিনি চিরজীবন সযত্ন রক্ষা করিবেন, কখন ভ্রমেও উহা হস্তান্তর করিবেন না।



লেখকাকার ভিতর কীবনবহস্ত



প্রগলভতা বর্জ্বনী

নৌরোদ্দীন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, “যতক্ষণ আমার জীবন আছে, তোমার কল্যাণজনক কয়েকটি কথা বলিয়া যাই, তুমি মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর। তুমি সৰ্ব্বদা এই উপদেশ স্মরণ রাখিবে যে, কাহারও সহিত প্রগলভভাবে আলাপ করা উচিত নহে, যাঁহারা প্রগলভতাদোষশূন্য, তাহাদের জীবন অনেক পরিমাণে নিরাপদ; অতএব কাহারও সহিত অতিরিক্ত বাক্যালাপ করিবে না।

“আমার দ্বিতীয় উপদেশ এই যে, কাহারও প্রতি অত্যাচার করিবে না, যদি অত্যাচার কর, তাহা হইলে তোমার বহু শত্রুর সৃষ্টি হইবে। মহাবাহুদয় জয় করিতে হইলে দয়া, সদ্ধয়তা, পরের দোষ উপেক্ষা প্রভৃতি সঙ্গুণের আবশ্যক। শত্রুতা দ্বারা মহাবাহুদয় জয় করা যায় না, উৎপীড়ন করিলে কাহাকেও বহুদুঃখ লাভ করা যায় না, অতএব অত্যাচার ও উৎপীড়ন হইতে সর্বদা দূরে রহিবে।

“আমার তৃতীয় উপদেশ, ক্রোধের সময় তুমি যে সকল কথা বলিবে, তদনুসারে কখনও কাজ করিবে না। একটি প্রবাদ আছে, বোবার শত্রু নাই। এই উপদেশটি অল্প মূল্যবান্ নহে; কোন বিষয়ে নিরুক্তর থাকিলে আমাদিগকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয় না, কিন্তু কথা বলিয়া অনেক সময়ই অমুতাপ জন্মে।

“আমার চতুর্থ উপদেশ, কখনও মত্তপান করিবে না। মত্তপান সকল সর্বনাশের মূল।

“পঞ্চম উপদেশ, কখন অমিতব্যয়ী হইবে না, যদি পরিমিত ব্যয় কর, তাহা হইলে তোমাকে কখনও অর্থাভাবে কষ্টভোগ পাইতে হইবে না। কিন্তু তাই বলিয়া কুপণতা করিয়া যে যথাসর্ব্ব সঞ্চয় করিবে, কোন প্রকার সন্ধ্যা করিবে না, তাহা আমি বলিতেছি না। যদি তোমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছলও না থাকে, তথাপি যে সকল বিষয়ে অর্থব্যয় কর্তব্য, তাহাতে ব্যয় করিবে। অর্থের সুব্যবহার করিলে প্রকৃত সঞ্চয় অনেক পাইবে, কিন্তু যদি অপব্যবহার কর, তাহা হইলে অনেক অপদার্থ লোক তোমার তোষামোদে প্রবৃত্ত হইলেও সঙ্গুণশালী ভ্রমলোক তোমাকে ঘণা করিবেন। সাধুলোকের নিকট যাহাতে ঘৃণাতাজন হইতে হয়, এরূপ কার্য করিবে না।”

নোরেন্দীন আলী তাঁহার অন্তিম সময় পর্যন্ত পুত্রকে হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। নোরেন্দীন প্রাণত্যাগ করিলে, বদরেন্দীন অত্যন্ত শোকাবুল হইলেন। তিনি এরূপ অধীর হইলেন যে, অনেক দিন পর্যন্ত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না, এমন কি, রাজসভায় পর্যন্ত উপস্থিত হইলেন না। তিনি রাজকর্মে এই ভাবে উপেক্ষা করিলে, মুলতান তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া নূতন উজীরকে আদেশ করিলেন, ‘মৃত উজীর নোরেন্দীন আলীর হাবরাহাবর যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমস্ত সরকারে বাজেয়াপ্ত কর। মৃত উজীরের পুত্র তাহা কোন অংশ পাইবে না।’—মুলতান বদরেন্দীনকে শ্রেষ্ঠার করিয়া কারারুদ্ধ করিবার আদেশও প্রদান করিলেন।

বদরেন্দীনের এক জন বিশ্বস্ত ভৃত্য মুলতানের আদেশের সংবাদ পাইয়া, অবিলম্বে তাহার প্রভুর নিকট উপস্থিত হইল এবং সকল কথা প্রকাশ করিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ করিল। বদরেন্দীন কারারুদ্ধ হইবার আশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়া ছদ্মবেশে পলায়ন করিলেন। তিনি প্রথমে তাঁহার পিতার সমাধিমন্দিরে উপস্থিত হইয়া, সে রাত্রি সেইখানেই গোপনে বাস করিবার সঙ্কল্প করিলেন। নোরেন্দীন এই সমাধিগৃহে তাঁহার জীবিতাবস্থার নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

বদরেন্দীন পথে একজন ইছদী সদাগরের সাক্ষাৎ পাইলেন। এই সদাগরটির প্রচুর অর্থ, তিনি বিষয়-কার্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছিলেন, সেই সময়ে নগরে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। ইছদী ধনপতির নাম আইজাক। আইজাক বদরেন্দীনকে চিনিতেন এবং তাঁহাকে দেখিবামাত্র সদস্যানে অভিবান্দন করিলেন; কিন্তু বদরেন্দীন হাসানকে অত্যন্ত চিন্তাকুল দেখিয়া, সদাগরের মনে বড় বিষয়ের সঙ্কারণ হইল। তিনি বদরেন্দীনকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বদরেন্দীন বলিলেন, ‘নিষ্প্রিতাবস্থায় পিতাকে ঋণে দেখিয়াছি, অতি দুঃখ! তাই তাঁহার সমাধিমন্দিরে প্রার্থনা করিতে গিয়াছিলাম।’ ইছদী সদাগর তখনও বদরেন্দীনের মনস্তাপের প্রকৃত কারণ জানিতে পারেন নাই। তিনি বলিলেন, “বহাছভব, আপনার পিতার

নীতি-উপদেশ
বর্ণন
↑
↓

ছদ্মবেশে
সমাধিমন্দিরে
↑
↓

ইহুদীসভাপণের
অবাচিত কল্পনা



কয়েকখানি পণ্যদ্রব্য-পূর্ণ জাহাজ আসিতেছে। সেই সকল জাহাজ এখনও সমুদ্রে রহিয়াছে। আপনি যদি অল্পগ্রহে পূর্বক সেই সকল পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করেন, তাহা হইলে আমি নগদ মূল্যে সমস্ত ক্রয় করিয়া লইতে পারি। আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি, আপনার যে সকল জাহাজ বন্দরে উপস্থিত হইবে, তাহার জন্ত আমি আপনাকে সহস্র মুদ্রা অগ্রিম প্রদান করিব। টাকা আমার সঙ্গেই আছে, কেবল আপনার অমুখতির অপেক্ষা।”

সর্বস্বান্ত হইয়া বদরেন্দীন বিদেশে পলায়ন করিতেছিলেন, স্মরণ্য এ সময়ে সহসা এমন একটা লাভের সম্ভাবনা তাহার নিকট ঈশ্বরপ্রেরিত অল্পগ্রহের জায় বোধ হইল। তিনি ইহুদীর কথায় সম্মত হইলে, ইহুদী তাহাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়া, তাহার জাহাজের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইল। বদরেন্দীন ইহুদীর অমুখ্যে তাহাকে তাহার জাহাজ বিক্রয়ের একখানি কবলা প্রদান করিলেন, ইহুদীও একখানা রসিদ লিখিয়া তাহাকে প্রদান করিল। অনন্তর বদরেন্দীন পিতার সমাধিস্থলে উপস্থিত হইলেন এবং পিতার সমাধিবন্দীর উপর পড়িয়া নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া, বহু বিলাপ-পরিভাষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর রাত্রি অধিক হইলে, সেই স্থানেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

সেই সমাধিস্থানের একটি দৈত্য বাস করিত, সে নৈশভ্রমণের জন্ত সমাধিগর্ভ হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, একটি রূপবান্ যুবক সেখানে নিদ্রামগ্ন রহিয়াছে। বদরেন্দীনকে দেখিয়া দৈত্য মনে মনে তাহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিল। এমন রূপ সে আর কখন কোথাও দেখে নাই।

পরে দৈত্য পক্ষিস্বাক্ষর করিয়া উড়িয়া গেল, উড়িতে উড়িতে একটি পরীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে পরস্পরে অভিধানাদি শেষ করিলে দৈত্য পরীকে বলিল, “তুমি যদি আমার সঙ্গে আমার বাসস্থানে যাও, তাহা হইলে তোমাকে আমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুন্দর মল্লভ দেখাইতে পারি। এমন রূপ আর কখন দেখে নাই, দেখিয়া তাহার রূপের সহস্রবার প্রশংসা করিবে।” পরী দৈত্যের কথা শুনিয়া তাহার সহিত সমাধিক্ষেত্রে অবতরণ করিল, দৈত্য বদরেন্দীনকে দেখাইয়া সহাজে বলিল, “তুমি ত অনেক রাজ্যে ঘুরিয়াছ; বল দেখি,—এমন রূপ, এমন কাস্তি আর কোথাও দেখিয়াছ কি?”

সুন্দর মুখের
সর্বত্র জয়



পরী বিশেষ মনোযোগের সহিত বদরেন্দীনকে দেখিল। অবশেষে দৈত্যকে বলিল, “এই যুবক যে অতি সুপুরুষ, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আমি এইমাত্র কারো নগরে যে রূপ দেখিয়া আসিলাম, তাহা ইহা অপেক্ষা কতগুণ শ্রেষ্ঠ, তুমি তাহা না দেখিলে কিরূপে বুঝিবে? আমার অমুখ্যে, তুমি একবার আমার সঙ্গে গিয়া তাহাকে দেখ।” দৈত্য বলিল, “তা আমি অনায়াসে যাইতে পারি, কিন্তু কি সে পুরুষ, না রমণী?” পরী বলিল, “মিশরের সুলতানের এক উজীর আছেন, তাহার নাম সামসোদ্দীন মহম্মদ। আমি যাহার কথা বলিতেছি, সেই-যুবতী সামসোদ্দীনের কন্যা, বয়স প্রায় বিশ বৎসর। এমন সুন্দরী তুমি পৃথিবীর কোথাও দেখে নাই। তুমি আমি স্কেন, কেহই দেখে নাই। আমাদের পরীদলেও এমন সুন্দরী নাই। মিশরদেশের সুলতান এই কন্যার রূপের খ্যাতি শুনিয়া উজীরকে বলিয়াছিলেন, ‘উজীর, তোমার একটি সুন্দরী যুবতী কন্যা আছে, তুমি তাহাকে আমার হস্তে সম্ভাদান কর, আমি তাহাকে বিবাহ করিব।’ উজীর এ কথা শুনিয়া আনন্দিত হওয়া দূরের কথা, কিঞ্চিৎ চিন্তাকুল হইলেন। অবশেষে বলিলেন, ‘খোদাবন্দ, আমি আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নিকট প্রতিক্রমিত ছিলাম, তাহার পুত্র জন্মিলে সেই পুত্রের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। আমি বহুদিন হইতে নৌরেন্দীনের কোন সন্ধ্যা পাই নাই, কিন্তু আজ চারি দিন হইল শুনিয়াছি, আমার ভ্রাতা বাসোরার সুলতানের উজীরপদে নিযুক্ত থাকিয়া, বহু

সম্মান অর্জন করিয়াছিলেন, সম্ভ্রতি তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন। বদরেকীন নামে তাঁহার একটি কুড়ি বৎসর বয়স পুত্র আছে, আমি আমার ভ্রাতার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা প্রতিপালন করিবার সংকল্প করিয়াছি। সুতরাং আপনার আদেশ পালন করিতে না পারিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইতেছি।”

‘মিসরের সুলতান, সামসোদীন মহকদের কথা শুনিয়া ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইলেন। অতি কর্কশস্বরে তাঁহাকে তিরস্কৃত করিলেন; তাহার পর সক্রোধে বলিলেন, “রে নিমকহারাম, তুই কিরূপে বেগমাপাত্রের তোর কস্তার বিবাহ দিস্, তাহা আমি দেখিব। আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোকে এই নগরের অতি কুৎসিত, নীচবংশোদ্ভব কোন ক্রীতদাসের সহিত তোর সুলতানী-কস্তার বিবাহ দিতে বাধ্য করিব।” সুলতান তৎক্ষণাৎ উজীরকে পদচূত করিলেন, উজীর মহা-বিষমুগ্ধ হইয়া প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহার দৃষ্টান্তের সীমা রহিল না।’

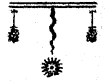
পরী বলিতে লাগিল, ‘আজ সুলতান আদেশ করিয়াছেন, সামসোদীনের কস্তার সহিত সুলতানের অতি কুৎসিত বিকলাঙ্গ দাসের বিবাহ হইবে। এই দাসটি সুলতানের সহিস, তাহার পৃষ্ঠে একটি কুঁজ আছে। এই কুঁজের হস্তেই সামসোদীনকে কড়া সম্ভ্রদান করিতে হইবে। বিবাহের সকল আয়োজন প্রস্তুত দেখিয়া আসিয়াছি। আমি



কায়রো তাপকালে দেখিয়াছি, সেই কুমারীকে যুবতীগণ বিবাহযোগ্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিতেছে। সেই যুবতীকে তুমি যদি একবার দেখ, তাহা হইলে একবারে অবাক হইয়া যাইবে।’

অনন্তর পরী দৈত্যকে বলিল, “এই যুবক অপেক্ষা যে পৃথিবীতে আর কেহ অধিক রূপবান—রূপবতী আছে, তাহাকে না দেখিলে তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করিবে না। যাহা হউক, আমি যাহা বলিতেছি, তাহা সত্য। আমি আরও বলিতেছি যে, সেই যুবতীকে এই যুবকের হস্তেই সমর্পণ করিব, কুঁজ দাসের সঙ্গে কখন তাহার বিবাহ হইতে দিব না; আমার বিবেচনা হয়, সুলতানের এই প্রকার অজ্ঞার আদেশের বিরুদ্ধ কার্য

প্রত্যাখ্যান
প্রতিশোধ



বাসক-
সন্তজা



কর। আমাদের কোনক্রমে অলস হইবে না।" দৈত্য সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "তুমি অতি উত্তম প্রস্তাব করিয়াছ, আমি সানন্দে ইচ্ছাতে সম্মত হইলাম, চল আমরা হুলতানের অস্ত্রাঘাটের বিক্রেতা কার্য করিয়া বৃদ্ধ উজীর ও তাঁহার কন্ডার প্রকৃত হিতসাধন করি। আমি এ জন্ত চেষ্টার ক্রটি করিব না, কিন্তু তুমিও কৃতকার্য না হইয়া এই কার্যভার ভ্যাগ করিতে পারিবে না। এই যুবককে না জানাইয়া আকাশ-পথে কাররো নগরে লইয়া যাইব, তাহার পরে যাহা অবশিষ্ট কার্য, তাহা তোমাকে করিতে হইবে।"

আকাশপথে
বর ঢালান



অনন্তর দৈত্য বদরেন্দ্রীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, আকাশ-পথে মহাবেগে কাররো অভিমুখে ধাবিত হইল এবং যে গৃহে বর বিবাহসজ্জার সজ্জিত হইতেছিল, সেই গৃহঘরে তাঁহাকে স্থাপন করিল।

সহসা বদরেন্দ্রীর নিদ্রাভঙ্গ হইল। নিদ্রাভঙ্গে তিনি দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি কোথায় আসিয়াছেন, ব্যস্তভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় দৈত্য তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে ইঙ্গিত করিল। তাহার পর তাঁহার হস্তে একটি মশাল প্রদান করিয়া বলিল, "যাও, অদূরে একটি স্নানাগার দেখিবে, সেখানে অনেক লোক দেখিতে পাইবে, তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া বিবাহসভায় যাইবে। তুমি বরকে দেখিলেই চিনিতে পারিবে, সে কুংসিত, বিকলাঙ্গ ও ক্রীতদাস। সেই বরের দক্ষিণপার্শ্বে সর্বদা থাকিবে; এই টাকা লইয়া যাও, যে সকল লোক সেখানে নৃত্যগীত করিতেছে, এই টাকায় তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবে। যদি কোন দাসীকে দেখিতে পাও, তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিতে বিম্বৃত হইবে না। বত টাকা আবশ্যক, এই বলি হইতে লইবে। মুষ্টি পূর্ণ করিয়া টাকা তুলিবে, থরের ভয় করিও না; এই অর্থের পলি অক্ষরন্ত। তুমি কোন কার্যে বিম্ময় প্রকাশ করিও না, কাহাকেও ভয় করিও না। আমরা যাহা করিব, তাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে। তোমার মঙ্গলের জন্তই আমি তোমাকে এ উপদেশ প্রদান করিতেছি, কদাচ ইহার অগ্ৰাণ্য করিবে না।"

বদরেন্দ্রী স্নানাগারের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সেখানে বহু ভ্রাতা অপেক্ষা করিতেছে। তিনিও মশাল ধরাইয়া, তাহাদের সহিত মিশিয়া পড়িলেন এবং ক্রমে ক্রমে বরের নিকটস্থ হইলেন। বর অস্বাভাবিক হইতে বহির্গত হইতেছিল।

বদরেন্দ্রী নৃত্যকর ও গায়কগণকে দেখিতে পাইলেন, তাহারা বরের অগ্রগামী হইয়াছিল। বদরেন্দ্রী পৈতৃক উপদেশ অমুসারে তাঁহার পলি হইতে এক এক মুষ্টি টাকা লইয়া, তাহাদিগকে দান করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে মুক্তহস্তে ধনদান করিতে দেখিয়া, সকলেই সবিষয়ে তাঁহার সুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। যে ব্যক্তি একবার তাঁহাকে দেখিল, সেই তাঁহার রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হইল।

বিবাহ-সভায়
যুগল বর।



অনেক পথ ঘুরিয়া বর ও বরযাত্রী দল সামসৌন্দর্যের গৃহঘরে উপস্থিত হইল, গৃহঘরে সামসৌন্দর্যের বহুগণ হুলতানের ভ্রাতাগণের পথরোধ করিলেন, মশাল লইয়া তাহাদিগকে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দিলেন না। কিন্তু নৃত্যকর ও গায়কগণ বলিল, যদি এই রূপবান যুবককে উজীরপ্রাসাদে প্রবেশ করিতে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাসাদে প্রবেশ করিবে না। তাহারা আরও বলিল, 'এই যুগল যুবক নিশ্চয়ই কাহারও ক্রীতদাস নহে, কোন বিদেশী, কোড়হলের বশবর্তী হইয়া এই বিবাহ দেখিতে আসিয়াছে।' নৃত্যকর ও বাজকগণের চেষ্টায় বদরেন্দ্রী বিবাহ-সভায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন এবং ক্রমে বরের দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বর উজীরকন্ডার পার্শ্বে একটি অতি উৎকৃষ্ট ও সুসজ্জিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়া, কালোরাপের ছটায় গৃহ উদ্ভল করিয়া তুলিতেছিল।

সামসোদীনের কথা বহুলা হীরকরস্মিতে ভূষিত হইয়া সভার উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখে কোন প্রকার আনন্দের চিহ্ন ছিল না; পাশ্বে একটি কুংসিত দাসকে তাঁহার পানিগ্রহণার্থ উপবিষ্ট দেখিয়া তিনি কি প্রকারে আনন্দ প্রকাশ করিবেন? বিবাহ-সভার স্থলতানের বহুসংখ্যক প্রধান কর্মচারীর পত্নী উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব স্বামীর পদোচ্চিৎ আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বদরেকদী হাসেনকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, রমণীগণ একদুট্টে তাঁহার স্বর্গীয় রূপস্থাপন করিতে লাগিলেন। তিনি আসন গ্রহণ করিলে রমণীগণ তাঁহাকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্ত স্ব স্ব আসন পরিত্যাগ করিলেন; যুবকের রূপলাবণ্য সকলের মনে ঘোহের সঞ্চার হইল।

একটি অতি কুংসিত বিকলাঙ্গ ক্রীতদাসের পাশ্বেই পরম রূপবান্ যুবক উপস্থিত থাকার, সেই কুজকে আরও অধিক কুংসিত দেখাইতে লাগিল। রমণীগণ বলাবলি করিতে লাগিলেন, “এই রূপবান্ যুবকই আমাদের কনের বর হইবার উপযুক্ত। এ কুংসিত কুজটাকে কে এখানে পাঠাইল? ইহাকে দূর করিয়া দাও।” স্বন্দরীগণ এমন বিবাহের ঘটক স্থলতানের বিককে নানা প্রকার কঠিন মন্তব্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন।

কেন ক্রী-আচার অহুসারে সাতবার বেশ পরিবর্তন করিলেন। সাতবার তাঁহাকে সে জন্ত বিবাহসভা হইতে উঠিয়া বাইতে হইল, কিন্তু তিনি একবারও সেই কুজের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন না, তাঁহার সশ্রম কটাক্ষ বদরেকদীনের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। বদরেকদী মুক্তহস্তে কনের দামীগণকে অর্থদান করিতে লাগিলেন। সকলেই টাকার জন্ত তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইল। সকলেরই ইচ্ছা হইল, এই মনোহরকান্তি যুবকের সহিতই উজীরকন্ডার বিবাহ হউক; এমন কি, তাহারা কুজটাকে গুনাইয়াই এ কথা বলিতে লাগিল।

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, স্বন্দরীগণ একে একে বিবাহসভা পরিত্যাগ করিলেন। আবার বেশপরিবর্তনের জন্ত কনেকে কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হইল। বিবাহ-সভায় কেবল রহিলেন বদরেকদী, কুজ বর এবং কয়েক জন ভৃত্য। কুজটা বদরেকদীকে দেখিয়া ঈর্ষানলে প্রজ্বলিত হইতেছিল, সে সকোপদৃষ্টিতে পুনঃ পুনঃ বদরেকদীনের দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে বলিল, “তুমি এখনও এখানে রহিয়াছ কেন, অজ্ঞ সকলে গেল, তুমিও চলিয়া যাও।” বদরেকদী অজ্ঞ উপায় না দেখিয়া উঠিয়া যাইতেছেন, এমন সময় দ্বারপ্রান্তে সেই পরী ও দৈত্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল, “কোথার যাও? তুমি এখন বাসর ঘরে যাও, কুজ পলায়ন করিয়াছে, তুমি একেবারে কনের গৃহে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাহাকে গোপনে বলিবে, তুমিই তাহার বর; স্থলতান পরিহাসক্লে এই কুজটাকে বিবাহের জন্ত পাঠাইয়াছিলেন, কুজ-সহিস এতক্ষণ আত্মবলে ফিরিয়া ছোলা চিবাইতেছে। তুমি সহজেই উজীরকন্ডাকে বিবাহে রাজী করিতে পারিবে। বিকলাঙ্গ সহিসটার অজ্ঞ কোন ভয়ের কারণ নাই। উজীরকন্ডা তোমারই, তাহার নহে।”

যখন দৈত্য বদরেকদীকে এইরূপ উৎসাহিত করিতেছিল, সেই সময়ে সহিস সে উৎসবকক্ষ পরিত্যাগ করিল। সহিস যেখানে উপস্থিত হইয়াছিল, সেখানে দৈত্য একটি স্রুৎং কুক্ষণ বিড়ালমুষ্টিতে আবিস্কৃত হইয়া, ভয়ঙ্কর চীৎকার আরম্ভ করিল। সেই চীৎকারে বিরক্ত হইয়া, কুজ তাহাকে তাড়াইবার জন্ত উত্তর হস্ত তুলিয়া ‘দূর দূর’ করিতে লাগিল। কিন্তু বিড়াল তাহাতে ভয় পাওয়া দূরের কথা, পৃষ্ঠদেশ উচ্চ করিয়া, দীপ্তচক্রে একদুট্টে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু হইতে যেন আগুনের হুকা বাহির হইতে লাগিল, বিড়ালটা আরও অধিক চীৎকার করিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ গর্ভভের দেহের ভায় বৃদ্ধি পাইল। এই বিকট দৃশ্য দেখিয়া কুজ-সহিসের মনে ভয়ের সীমা রহিল না। সাহায্যের জন্ত কুজটা লোক ডাকিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ভয়ে তাহার বাক্যানুষ্টি হইল না; হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল।

স্বন্দরীহুল-
গববিগীর বর
বিকলাঙ্গ
ক্রীতদাস ?



বর অপসারণ
সুকৌশল



দৈত্যের হস্ত



তাহার মনে অধিকন্তর উৎপাদনের জন্য দৈত্য সহসা বিভ্রাণমুগ্ধি ত্যাগ করিয়া, মহিষ-মুগ্ধি ধারণ করিল। তাহার পর গর্জন করিয়া বলিল, 'রে হতভাগা কুজ !' মহিষের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র সহিসের বুকিলোপ হইল, সে গৃহতলে পড়িয়া কমাণ দিয়া তাহার চক্ষু ঢাকিয়া কাতরভাবে বলিল, 'মহিষরাজ, তুমি আমাকে যে আদেশ করিবে, তাহাই আমি পালন করিব, তোমার ও রূপ আর আমাকে দেখাইও না, আমি তবু মুগ্ধিত হইয়া পড়িব, আর আমার এত সাধের বিবাহে কাটা পড়িবে,' মহিষ ঘোরতর গর্জন করিয়া বলিল, 'মুখ, তুই আমার প্রিরপাত্রীকে বিবাহ করিবি, তোর এত বড় স্পর্ধা ?' সহিস বলিল, 'মহিষরাজ ! আমার অপরাধ মার্জনা করন, আমি না বুঝিয়া এই কুর্কর্ষ করিতে আসিয়াছি ; আমি জানিতাম না যে,



সুন্দরী-সোহাগ

উজীরকতা একটা মহিষের প্রেমে পাগলিনী। যাহা হউক, এখন তুমি আমাকে যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।' দৈত্য বলিল, 'যদি তুই স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে এই ঘর ছাড়িয়া কোথাও যাস্ কিম্বা কাহারও সহিত কথা কহিস্, তাহা হইলে আমি শত্রুদের দিবা করিয়া বলিতেছি, আমি এক কিলে তোর মস্তক চূর্ণ করিয়া ফেলিব। যদি তুই এখন এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, তোর আন্তরালে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিস্, এবং এ দিকে আর কিরিয়া না আসিস তাহা হইলে আমি তোর প্রাণবধ না করিয়া তোকে ছাড়িয়া দিতে পারি।' দেখিতে দেখিতে দৈত্য মহিষ-দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভীষণকার মনুষ্যমুগ্ধি ধারণ করিল এবং সেই সহিসের পদবধ ধরিয়া, তাহাকে নতমুণ্ডে করেকবার শৃঙ্গে ঘুরাইয়া বলিল, 'যদি স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে গৃহত্যাগ করিস্, তাহা হইলে এই ভাবে তোকে তুলিয়া এক আঘাতে তোর মস্তক চূর্ণ করিব।'

এ দিকে বদরেশ্বরী হাসেন পরী ও দৈত্যের কথা ভরসা পাইয়া, বিবাহগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং একাকী উজীরকতার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে উজীরকতা নূতন সযোহন বেশে সজ্জিত হইয়া, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। উজীরকতার সঙ্গে এক জন প্রবীণ দানী আসিতছিল, সে দ্বারদেশে আসিয়া বিদায় লইল, গৃহে কে আছে, তাহা কিরিয়াও দেখিল না। উজীরকতা কুজ কুংসিত বিকলাঙ্গ সহিসের পরিবর্তে বরান্দনে সেই পরম সুন্দর যুবককে উপস্থিত দেখিয়া বিমরে অভিভূত হইলেন, কিন্তু বদরেশ্বরী হাসেন তাঁহাকে অতি আদরে সোহাগভরে গ্রহণ করিলেন। যুবকী প্রেম-পুলকিত-চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি বহু, এখানে এখন কিরূপে আসিলে ? আমার অন্তরান হইতেছে,

তুমি এক জন বরষাত্রী।” বদরেন্দ্রীস সহজে বলিলেন, “না সুলক্ষী, আমি সেই কুংসিত কুজটার সঙ্গে কোন সখ্য রাধি না।”—উজীরকন্ডা বলিলেন, “তুমি কে, আমার এমন রূপবান স্তম্ভবান হব স্বামীর নিন্দা করিতেছ ?”—বদরেন্দ্রীস বলিলেন, “না প্রিয়জন, তোমার সুখিয়ার ভুল হইয়াছে, তোমার স্তার এমন রূপবতী স্তম্ভবতী সুবতীর সহিত একটা বিকলাঙ্গ কুংসিত সহিসের বিবাহ হইতে পারে না; আমিই তোমার যোগ্য বর। সুলতান বিক্রম করিবায় জন্ম এই কুজটাকে এখানে পাঠাইয়াছিলেন, আমার সহিত তোমার বিবাহ দেওয়াই তাঁহার প্রকৃত অভিপ্রায়। তুমি ত নিজেই দেখিয়াছ, বিবাহ-সভার যত লোক উপস্থিত ছিল, এমন কি, নর্তক ও গারকগণ পর্যন্ত এই কুজটাকে লইয়া কত বিক্রম করিয়াছে! সহিস তাহার আশ্রয়ে ফিরিয়া গিয়া এতক্ষণ মহানন্দে ছোলা চিবাইতেছে, কুহিটর জন্ম আর চিন্তিত হইও না, তাহাকে আর এখানে আসিতে হইবে না।”

মনোমত
দ্রুত-দিলন



এই কথা শুনিয়া উজীরকন্ডার অল্পম মুখে হাসির গোলাপ ফুটয়া উঠিল, যেন বর্ষার মেঘ কাটিয়া গিয়া শরতের পূর্ণচন্দ্র আকাশে সমুদিত হইল। বদরেন্দ্রীসের অসুন্দর রূপ দেখিয়া তাঁহার প্রাণে আনন্দের ভূকান উঠিল, ক্ষম স্বখে নাচিতে লাগিল; আনন্দে গলগলন্ববে উজীরকন্ডা বলিলেন, “আমি তাই, একবার স্বপ্নেও এত সুখের প্রত্যাশা করি নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, আমার জন্মই চিরদুঃখে কাটিয়া যাইবে। আজ যে আমার অদৃষ্টে এত সুখ লিখিয়াছেন, আমার অদৃষ্টে যে তোমার মত পরম সুলক্ষ স্বামী জুটিল, এ কথা যেন স্বপ্ন, এ আনন্দ আমি আর মনে ধরিয়া রাখিতে পরিতোছি না।”

বিশ্ববর্ষীর অপরাধ লাঘবায় তরুণ যুবক, অলোকসামাজ্যে বিশ্বাসিত বর্ষীয় তরুণী পত্নীকে বক্ষোদেপে নিপীড়িত করিয়া, অজস্র চুপন প্রেমনিবেদন করিতে লাগিলেন। কল্পদেবও অবসর বুঝিয়া শর-সন্ধান করিয়া উভয়ের হৃদয় বিক করিয়াছিলেন। উদ্ভাস্ত যৌবনের অনাস্বাদিত রসধারার তরুণ-তরুণী ভ্রমর হইয়া মদনোৎসবে রত হইলেন। উজীরনন্দিনী বৃষ্টিতে পারিলেন, স্বামীর সহবাসে সেই রজনীতেই তিনি সন্তানজননী হইবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছেন। প্রমোদরস্বে উভয়েই পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, কিয়ংকাল কথোপকথনের পর বদরেন্দ্রীস ও উজীরকন্ডা শয়ন করিলেন। বদরেন্দ্রীস তাঁহার পরিচ্ছদ, পাণ্ডী ও ইন্দ্রনীল সন্ধ্যাপ্রদত টাকার থলি একখানি চেয়ারের উপর রাখিয়া শয়ন করিলেন, অবিলম্বে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। উজীরকন্ডাও অল্পক্ষণের মধ্যে নিদ্রিত হইলেন। তখন পরীর নিকট আসিয়া দৈত্য বলিল, “প্রভাতের আর অধিক বিলম্ব নাই, যে কাজ আরম্ভ করা গিয়াছে, তাহা অবিলম্বে শেষ কর।”

চুপন
প্রেম-নিবেদন



পরী সেই শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া, বদরেন্দ্রীসকে তাঁহার নিদ্রিতাবস্থায় জোড়ে তুলিয়া লইল এবং আকাশপথে মহাবেগে উড়িয়া দামারস নগরে উপস্থিত হইল। তখন প্রভাতকাল সমাগতপ্রায়; পূর্ণচন্দ্রে উবার আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে, দার্শনিক মূলমানগণ শয্যা ত্যাগ করিয়া নমাজের জন্ম প্রস্তুত হইতেছেন। পরী বদরেন্দ্রীসের নিদ্রিত দেহ নগরের দেউড়ীর নিকট রাখিয়া দৈত্যের সহিত প্রস্থান করিল।

ক্রমে দুই একজন করিয়া দেউড়ীর সন্নিকটে অনেক লোক উপস্থিত হইল, তাহারা শয়নের পরিচ্ছদে একটু যুবককে উদ্ধতস্থলে ত্রুণশয্যায় শায়িত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। কিন্তু বাপার কি, তাহা কেহই বৃষ্টিতে পারিল না, কিন্তুগেই বা বৃষ্টিবে। একজন আর একজনকে বলিল, ‘দেখ দেখ, একটা মাতাল এখানে চিৎ হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্ত রাত্রি অবিশ্রান্ত মদ খাইয়া মাতলামী করিয়াছে, তাহার পর শেঘরাত্রি হইতে এখানে পড়িয়া ঘুমাতেছে।’ কিন্তু যুবকের দেহের শোভা দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইল। তাহাদের কলরবে বদরেন্দ্রীসের ঘুম ভাঙিয়া গেল। তিনি সন্ধ্যায়

প্রমোদ-বিনি
অবসানে
কোথায় ?



দেখিলেন, উজীর-পুত্রীও নাই, সে হৃদয়ঙ্গিত গৃহও নাই, তিনি একটা অপরিচিত সহরের পথে ধারে পড়িয়া আছেন, আর একদল লোক তাঁহাকে ঝেঁটন করিয়া কলরব করিতেছে। বদরেকীন উঠিয়া বলিলেন, “যহাশয়গণ! আমি কোথায় আসিয়াছি, দয়া করিয়া বলুন, আর আপনারা আমার কাছে কি চান? এত ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছেন কেন?” একজন যুবক বলিল, “ওহে পথিক, তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ? এই নগরের দেউড়ী খুলিলে আমরা পথে বাহির হইয়াই দেখিলাম, তুমি ঘাসের উপর পড়িয়া ঘুমাইতেছ। আমরা তোমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলাম, ক্রমে বেশী লোক জুটিতে লাগিল। তুমি কি রাতে এখানে ছিলে না? দামাঙ্গ নগরের দেউড়ীতে পড়িয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ, কোথায় আসিয়াছি, এমন অসম্ভব কথাও তো কাহারও মুখে শুনি নাই।”

বদরেকীন সবিস্ময়ে বলিলেন, “আজ্ঞা! এমন কথাও ত কোথাও কখন কাহারও মুখে শুনি নাই, আমি বদরেকীন হাসেন দামাঙ্গ নগরের দেউড়ীর ধারে পড়িয়া।—মশায়, আপনারা নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন। আমার গুব শরণ আছে, কাল রাত্রে কায়েরা নগরের একটি উৎসব-গৃহে আমি শয়ন করিয়াছিলাম!”—বদরেকীনের এই কথা শুনিয়া সমস্ত লোক হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল, বলিল, ‘এ লোকটার মাথা একবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছে।’

অবশেষে একজন বৃদ্ধ বদরেকীনকে বলিলেন, “বৎস, নিশ্চয়ই তোমার কোন ভুল হইয়াছে; এট যে দামাঙ্গ নগর, তাহাতেও আর কোন সম্ভাব্য নাই। তুমি বলিতেছ, কাল রাত্রে কায়েরা নগরে উৎসব-ভবনে নিমজিত ছিলে। কায়েরা হইতে দামাঙ্গ যেন কতদূর, তাহা অবগতই তোমার জানা আছে, হুতরাং তুমি যে কালরাত্রিতে কায়েরোতেই ছিলে, তাহা আমরা কিরূপে বিশ্বাস করি?” বদরেকীন বলিলেন, “আম্নার দিবা করিয়া বলিতে পারি, কাল সমস্ত রাত্রি আমি কায়েরা নগরে অতিবাহিত করিয়াছি।” আবার চারিদিকে হাসির লহর উঠিল। সকলে হাততালি দিয়া একবাক্যে বলিয়া উঠিল, “পাগল, পাগল! একবারেই উম্মাদ হইয়াছে।” কেহ কেহ বা বলিল, “আহা, এমন চেহারা, এই বয়স, এত অল্প বয়সেই কাজের বাহির হইয়া পড়িল! কি হতভাগা!”—অবশেষে পূর্বোক্ত বৃদ্ধটি বলিলেন, “যুবক, তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। তুমি এমন পাগলের মত কথা আর বলিও না। যদি তোমার ঘুমের ঘোর না ভাঙ্গিয়া থাকে, উঠিয়া চোখে মুখে জল দাও, সকল কথা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ।” বদরেকীন বলিলেন, “ভাল করিয়া ভাবিবার কিছু নাই, কালরাত্রে কায়েরা নগরে আমার বিবাহ হইয়াছে, আমি আমার নবপরিণীতা পত্নীর সহিত প্রমোদশয্যা একত্র শয়ন করিয়াছিলাম। আজ সকাল বেলা দামাঙ্গ নগরে কিরূপে আসিলাম?”

বৃদ্ধ বলিলেন, “এতক্ষণে বুঝিয়াছি, তুমি বাপু ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলে, তাহার পর সহসা তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে, তাই এখনও সার্বাস্ত হইতে পার নাই।”—বদরেকীন একবারে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “না মহাশয়, আপনি ভুল বুঝিয়াছেন। ইহার মধ্যে একটা কিছু রহস্ত আছে, কিন্তু তাহা যে কি, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। আমার টাকার থলি, বিবাহের পরিচ্ছদ—পাগড়ী এ সকল কোথায়?”

কোন মীমাংসা হইল না। চারিদিক হইতে সকলে “পাগল! পাগল!” বলিয়া তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। অবশেষে চতুর্দিকে কেবল সেই এক শব্দ—“পাগল, পাগল!” অনেক জানে না যে, কেন তাহার পাগল পাগল করিয়া চীৎকার করিতেছে, কিন্তু তথাপি তাহার চীৎকার করিতেছে। সকলে বড় তামাশার বিষয় পাইল। অবশেষে বদরেকীন একজন হোটেলওয়ালার দোকানে প্রবেশ করিয়া, নিস্তার লাভ করিলেন।

এই হোটেলওয়াল পূর্বে একদল অস্বাভাবিক আরব দল্লার সদস্য ছিল। সেই স্থানীয় অথবা চুনামের স্ত্রী সাধারণত তাকে ভয় করিত। তাহার সর্বোপ দৃষ্টিপাত মাত্র জনতা দূর হইল। তখন সে বদরেরদীনকে নিকটে বসাইয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। বদরেরদীন হাসেন তাঁহার আশ্চর্যজনককাহিনী বৃত্তব জানিতেন, হোটেলওয়ালকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, তিনি বাসোয়ার তাঁহার পিতার সমাধিস্থলে শয়ন করিয়াছিলেন—জাগিয়া দেখিলেন, তিনি কারোর উজীরকন্ডার বিবাহ-সভার, পরে প্রেমোদ-বাসের নিশা-বাগন করিয়াছেন। আবার প্রভাতে জাগিয়া দেখিতেছেন, তিনি মহন্ত মহন্ত ক্রোশ দূরবর্তী দামাঙ্গ নগরের রাজপথে। এ অসম্ভব বাপোয়ার কোন কারণ তিনি জানিতেন না, হোটেলওয়ালও তাহা বৃত্তিতে পারিল না।

অবশেষে হোটেলওয়াল বলিল, “তোমার কেছা খুব বহৎ আচ্ছা বটে, কিন্তু একটা কথা শুন, আবার যে সকল কথা বলিলে, এ সকল কথা আর কাহারও কাছে খুলিয়া বলিও না। জ্ঞান তোমার মঙ্গল করিবেন, আমার একদল বিশ্বাস হইতেছে; কিন্তু যতদিন তোমার সে শুভদিন না আসে, ততদিন তুমি আমার আশ্রয়েই বাস করিতে পার। মসজিদে আমার পুত্রাদি নাই, তুমি ইচ্ছা করিলে আমার দস্তকপুস্ত্র হইয়া থাকিতে পার। কিছুদিন পরে নগরে বাহির হইলে আর কোন লোক তোমাকে পাগল পাগল বলিয়া খেপাইয়া তুলিবে না।”

বদরেরদীন অগত্যা সেই হোটেলওয়ালার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। তিনি দেখিলেন, ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নাই। হোটেলওয়াল বদরেরদীনকে তাহার পদোচ্চিত পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত করিয়া, কাজীর নিকট লইয়া গেল। কয়েকজন সাক্ষী সংগ্রহ করা হইল। কাজী শাস্ত্রাভাসারে বদরেরদীনকে সেই হোটেলওয়ালার দস্তকপুস্ত্রপদে নিযুক্ত করিলেন। বদরেরদীন কেবল হাসেন এই সংস্কৃত নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহার নূতন পিতার দোকান পাচকের কার্যে প্রসূত হইলেন।

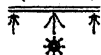
দামাঙ্গদের কথা ছাড়িয়া এখন কারায়োর কথা বলি। প্রভাতে সামসোদীন মহম্মদের কন্ডার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষু মেলিয়া বদরেরদীন হাসেনকে দেখিতে পাইলেন না; ভাবিলেন, তাঁহার প্রিয়তম স্বামী তাঁহার নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কায় ঘরে ঘরে উঠিয়া বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন। কক্ষগৃহে বসিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার পিতা সামসোদীন সেই গৃহদ্বারে সমগত হইলেন। তিনি কন্ডার দ্রুতগতির কথা ভাবিয়া সমস্ত রাত্রি বিদ্রোহ করিয়াছেন, আজ সকালে একবার কন্ডার অশ্রুতে অক্ষ মিশাইয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবেন ভাবিয়া, কন্ডার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। গৃহদ্বারে পিতার কণ্ঠস্বর শুনিয়া কেশবশ শয্যত করিয়া, উজীরনন্দিনী দ্বার খুলিয়া দিলেন; ভক্তির পিতার করচূষন করিয়া সহস্রো তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন।

সামসোদীন মহম্মদ কন্ডার এই প্রেম-প্রফুল্লভাব দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইলেন, তাহার পর তাঁহার বিষয় ক্রোধে পরিণত হইল। তিনি সর্বোপে বলিলেন, “হতভাগিনি, আমার কন্ডা হইয়া একটা নীচবংশোদ্ভব কুজ সহিসের সহিত তোর বিবাহ হইল, আর তাহার সহিত রাত্রিবাস করিয়া তুই মহাপ্রহর! আমার মন্তক অবনত হইয়াছে, আর তুই মনের আনন্দে হাসিতেছিস, আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি!” যুবতী বলিলেন, “হা বাবা, স্বপ্নের মতই!—সেই কুজিত কুজটার সহিত আমার বিবাহ হয় নাই, বিবাহ-সভায় তাহার লালনার মীমা ছিল না, সেই লালনার কুজটা পলায়ন করিয়াছিল। রাজপুত্রের জায় রূপানর স্নানর যুবকের সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে।” সামসোদীন কন্ডার কথার বিশ্বাস করিলেন না; বলিলেন, “নিরীক্স বালিকা, তুমি কি অসম্ভব কথা বলিতেছে, সেই বিকলাঙ্গ কুজ সাহিসটা—” যুবতী বলিলেন, “বাবা, একশ বার সেই হতভাগার নাম করিবেন না, সে উৎসব বাড়ুক;

কেছা খুব
বহৎ আচ্ছা



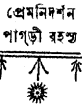
নৈবাস্তের পক্ষে
প্রেমের কমল
ফুটিল কেন?





সে আমার গুকে আসে নাই, আমার বিবাহ-বাসরে আমার সুরোগা স্বামীই ছিলেন, তিনি বোধ হয় শীঘ্রই ফিরিবেন, জানি না প্রাতে কোথায় উঠিয়া গিয়াছেন।”

স্বাক্ষরে উপস্থিত হইয়া সামসোদীন দেখিলেন, কুজ সহিল সেই গৃহে দুইশা উর্কে তুলিয়া নতমস্তকে অবস্থান করিতেছে, যেন সে কোন প্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করিতেছে। সামসোদীন বলিলেন, “হতভাগা, তুই এখানে শুভাবে রহিয়াছিস কেন? সোজা হইয়া দাঁড়া।” দৈত্য তাহাকে যেভাবে রাখিয়া গিয়াছিল, সে সেই ভাবেই ছিল, স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে সে নড়িবে না, দৈত্যের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল; ইতরাং বলিল, “স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে আমি সোজা হইতে পারিতেছি না, মহিষের সেরূপ আদেশ নাই। কাল রাত্রে বিবাহ-উৎসবের সময় একটা কালো বিড়াল আসিয়া আমাকে ভর দেখাইতে লাগিল, তাহার পর বিড়ালটা একটা মহিষের মত হইয়া আমাকে যে কথা বলিয়াছে, তাহা আমার বেশ মনে আছে। আপনি এখন যান, স্বর্ঘ্য উঠিলে আমি নিজের আস্তাবলে যাইব।” সামসোদীন কুজটাকে ধরিয়া তাহাকে সোজা করিয়া দাঁড় করাইলেন, কিন্তু সে মুহূর্তকাল আর সেখানে অপেক্ষা করিল না। দ্রুতবেগে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইল এবং স্নানতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, দৈত্যহস্তে রাত্রে সে যে লাক্ষ্মী ভোগ করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিল; শুনিয়া স্নানতানের মনে অত্যন্ত চমকিত্তার সঞ্চার হইল।



সামসোদীন কস্তার কক্ষে গুনঃ প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি কলাকার ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়াছি, তুমি আমাকে তোমার স্বামীর কোন নিদর্শন দেখাইতে পার, তাহার সহক্রে কোন কথা জান?”—কস্তা বলিলেন, “যাহা জানিতাম, সকলই আপনাকে বলিয়াছি। তাঁহার নিদর্শনের মধ্যে ঐ তো দেখিতেছি তাঁহার পাগড়ী ও শোখা খোলা রহিয়াছে।” সামসোদীন, অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বদরেকদীরের পাগড়ী ও পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, পাগড়ীর এক প্রান্তে কি একখানি কাগজ সেলাই করিয়া সযতনে সংরক্ষিত। সামসোদীন বলিলেন, “ইহা কোন রাজার উজীরের পাগড়ী হইবে, কিন্তু সাধারণ প্রচলিত পাগড়ীর মত নহে। যাহা হউক, একখানা কাগজ সব্বত্র দেখাই করা দেখিতেছি, ইহা হইতে যদি কোন সন্ধান পাওয়া যায়, কাঁচি আন, দেখি।” কাঁচি দিয়া কাটরা পত্রখানি বাহির করা হইল। এ পত্র সেই পত্র, যাহা নৌরেকদীন মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্রকে প্রদান করিয়াছিলেন; পাছে হারাইয়া যায়, এই ভবে বদরেকদীন পত্রখানি সর্বদা পাকড়ীতে সযত্নে রাখিতেন। পত্রপাঠ করিয়া এবং ইচ্ছা দাদাগর-প্রদত্ত খলিফার ভিতর পণ্যস্রবা বিরুদ্ধরূপে টাকা দিবার অঙ্গীকার পর দেখিয়া, সামসোদীন সকল কথা বৃত্তিতে পারিলেন। টাংকার করিয়া তিনি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

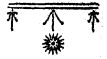
মুচ্ছাভঙ্গে সামসোদীন তাঁহার কস্তাকে সোধন করিয়া বলিলেন, “মা, যাহা ঘট্যাছে, তাহা বড়ই বিচিত্র। কিন্তু আমার রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নহে, তিনি আমার মনোবাঞ্ছা যে এ ভাবে পূর্ণ করিবেন, এ কথা এক দিনও ভাবি নাই। তুমি যাহাকে বিবাহ করিয়াছ, সে আমার ভাতৃপুত্র। আমার প্রিয়তম সহোদর নৌরেকদীরের পুত্র। আমি আমার ভ্রাতার নিকট প্রতিশ্রুত ছিলাম, আমার কস্তা ও তাহার পুত্র হইলে, পুত্রকস্তার বিবাহ দিব। আজ্ঞা আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছেন।” সামসোদীন তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার বিবাহ ও সন্তানের জন্ম ঠিক এক দিনেই হইয়াছে দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হইলেন, এবং স্নানতানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে সকল কথা বলিলেন। এমন বিস্ময়কর কাহিনী স্নানতান কখনও শ্রবণ করেন নাই, কিন্তু বদরেকদীরের পাগড়ী ও ইচ্ছাদীপ্রদত্ত রসিদ দেখিয়া তিনি আর কোন কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না। উজীরের সকল অপরাধ মার্জনা করিলেন।



নারেদীন ও বসেদীন]

প্রমোৎপন্ন

১৫৩



সামসোদ্দীন মহম্মদ একটা কথা কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না, জামাতা প্রভাতে উঠিয়া অদ্ভুত হইলেন কেন? সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার সন্ধান মিলিল না, তখন তিনি কারায়ার সর্বত্র তাঁহার অনুসন্ধানের জন্ত লোক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কোথাও বদরেকদানের সন্ধান পাওয়া গেল না। তখন তিনি নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ঘটনা ঘটিয়াছে ভাবিয়া, বিবাহ-রাত্রির সকল ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া, বদরেকদানের পাগড়ী ও টাকার থলিয়ার সহিত সাবধানে সিন্দকের মধ্যে রাখিয়া দিলেন। বৎসরের পর বৎসর অতীত হইল, বদরেকদান ফিরিল না।

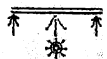
বিবাহরাত্রিতেই উজীরকন্ডার গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। নয়মাস পরে তিনি পূর্ণচন্দ্রে জ্বর সুরুয়ার এক পুত্র প্রসব করিলেন। বৃদ্ধ উজীর যথাকালে তাহার নামকরণ করিলেন, শিশুর নাম হইল আজিজ। আজিজের বয়স সাত বৎসর হইলে সামসোদ্দীন তাহাকে বিজ্ঞালয়ে ভর্তি করিয়া দিলেন। আজিজ অসাধারণ বুদ্ধিমান ছিল, মনোযোগ দিয়া বিজ্ঞাভ্যাস করিলেও সে বড় দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল; সহপাঠীদের প্রতি বড় অত্যাচার করিত। শিক্ষক তাহাকে অত্যন্ত আদর করিতেন এবং তাহার দোষের প্রতি লক্ষ্য করিতেন না।

বালকরা বিরক্ত হইয়া, অবশেষে এক দিন আজিজকে শাস্তিদানের জন্ত এক ষড়যন্ত্র করিল। তাহারা একটি খেলিবার দল করিল; নিয়ম করিল, যে সকল বালক তাহাদের নিজের ও পিতামাতার নাম না বলিতে পারিবে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া খেলা করা হইবে না। সকল বালক স্ব স্ব নাম বলিয়া দলে ভর্তি হইল। আজিজকে তাহার মাতা-পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, “আমার মার নাম সৌন্দর্যের রাণী, আমার বাবার নাম সামসোদ্দীন মহম্মদ।” এ কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, সকলে বলিল, “তুমি যাহাকে বাবা বলিয়া জান, সে তোমার বাবা নহে, তোমার মায়ের বাবা। তোমার বাবা নাই।” “নিয়ম, এক দৈত্য আসিয়া সহিসটাকে তাড়াইয়া দিয়া তোমার মাকে বিবাহ করিয়াছিল। তোমার বাবার নাম বলিতে না পারিলে আমাদের দলে তোমাকে খেলিতে লইব না।”

আজিজ কাদিতে কাদিতে গৃহে আসিয়া পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিল। উজীরকন্ডা শাস্ত্রনয়নে পুত্রের মুখচূষন করিয়া বলিলেন, “কেন বাবা, তোমার পিতা সামসোদ্দীন মহম্মদ, তাহা কি তুমি জান না, তোমাকে আমার কে এত বেহ করে?” আজিজ বলিল, “না, তুমি আমাকে মিথ্যা কথা বলিতেছ।” আজিজ তাহার সহপাঠিগণের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিল, সকল কথা বলিল। উজীরকন্ডা আর আশ্চর্যম্বশ করিতে পারিলেন না, অঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাদিতে লাগিলেন। স্মরণীয় বিরহের কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

এই সময় উজীর সামসোদ্দীন কন্ডার নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কন্ডাকে তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কন্ডা সকল কথা বলিলেন। শুনিয়া উজীরও অশ্রুতাগ করিতে লাগিলেন। তিনি কন্ডাকে শাস্ত্যাদান করিবার জন্ত বলিলেন, “হা, তুমি স্থির হও, আমি আজই তোমার স্বামীর সন্ধানে যাত্রা করিব। যে বাহাই বসুক, কোন দৈত্য যে তোমাকে বিবাহ করে নাই, তাহা আমি জানি।” অনন্তর উজীর স্থলভানের নিকট দীর্ঘকালের জন্ত বিদায় গ্রহণ করিয়া, জামাতার সন্ধানে গৃহত্যাগ করিলেন। তাঁহার কন্ডা ও দৌহিত্র আজিজ তাঁহার সঙ্গে যাত্রা করিল।

উনিশ দিন ক্রমাগত পথ-পার্থক্যের পর, সামসোদ্দীন কন্ডা ও দৌহিত্রকে লইয়া বাম্বাক্স নগরের অগ্নিতে উপস্থিত হইলেন। শিবির নগরপ্রান্তে সংস্থাপন করিয়া, সামসোদ্দীন জামাতার সন্ধানে বাহির হইলেন। আজিজ নগর দর্শনের জন্ত ব্যাকুল হইলে, আজিজের মাতা একটি ভৃত্যের সঙ্গে আজিজকে নগরে পাঠাইয়া দিলেন।



আজিজ হুন্সর বেশে সজ্জিত হইয়া, একখানি বেত্রদণ্ড হস্তে লইয়া ভূতোর সঙ্গে নগরে প্রবেশ করিল। পথের শোক বিষয়সমূহে আজিজের হুন্সর মুখ দেখিতে লাগিল। বাজারে ঘুরিতে ঘুরিতে আজিজ বদরেকদীন হাসেনের হোটেলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। আজিজকে দেখিবার জন্ত তাহার চারিদিকে তখন অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল।

অজ্ঞাত
পিতৃ-সম্মেলন



আজিজকে দেখিবামাত্র বদরেকদীন হাসেন মনে অপূর্ণ আনন্দ অনুভব করিলেন। আজিজের নিকট আসিয়া বলিলেন, “বৎস, তুমি একবার আমার হোটেলে এস, আমি তোমাকে কিছু খাবার খাইতে দিব।” বদরেকদীনের নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। আজিজ তাঁহার কথায় মুগ্ধ হইয়া ভূতাকে সঙ্গে লইয়া, হোটেলে প্রবেশ করিল। আজিজের ভূতা প্রথমে বড় প্রতিবাদ করিয়াছিল, বলিয়াছিল, ‘উজীরের ছেলে তুমি, তুমি সামান্য খাবারওয়ালার দোকানে খাবার খাইতে যাইবে, তাহা কিছুতেই হইবে না।’ কিন্তু আজিজ সে কথার কর্ণপাত না করিয়া বলিয়াছিল, ‘ঐ হোটেলওয়াল! যে কোন উজীরের ছেলে নয়, তাহা কে বলিতে পারে। হুবহু পড়িলে আমাকেও একদিন হোটেল খুলিতে হইবে, সাহসকে ঘৃণা করিতে নাই।’

বদরেকদীন হাসেন ভূতাকে নানা কথায় সন্তুষ্ট করিলেন। বদরেকদীনের প্রতি তাহার মনে যে ঘৃণাভাব ছিল, তাহা দূর হইল। আজিজ পরম হঠাৎ আশ্চর্য করিতে লাগিল। বদরেকদীন প্রাণপণে অতিথিগণের সন্তোষনাথনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আজিজের হুন্সর মুখের দিকে চাহিয়া বদরেকদীন ভাবিতে লাগিলেন, দেশে থাকিলে এতদিন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী তাঁহাকে এইরূপ একটি পরম হুন্সর পুত্ররূপ উপহার দান করিতে পারিতেন। স্বীয় দুর্ভাগ্যের কথা মনে করিয়া তিনি অশ্রুতাগ করিতে লাগিলেন। আজিজ অল্পকাল পরেই ভূতোর সহিত হোটেল ত্যাগ করিল। বদরেকদীন হাসেন তৎক্ষণাৎ দোকান বন্ধ করিয়া আজিজের অস্থগাবন করিলেন। কাক্সি দাস তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, “আবার যে তুমি আমাদের সঙ্গে আসিতেছ, তোমার মংলবটা কি?” বদরেকদীন বলিলেন, “রাগ করিও না, নগরে আমার কিছু প্রয়োজন আছে, তাই যাইতেছি।” আজিজকে লইয়া ভূতা সামসোদীনের শিবিরের দিকে চলিল, বদরেকদীনের দিকে আর তাহার। কিরিয়াও চাহিল না। অবশেষে আজিজ শিবিরে প্রবেশাশ্রিত হইয়া দেখিল, হোটেলওয়াল! তাহাদের তাম্বুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আজিজের মনে বড় ভয় হইল; সে ভাবিল, হয় ত দাদামহাশয় ইহার দোকানে মিষ্টান্ন খাওয়ার কথা শুনিতে পাইবেন, তাহা হইলে ত বড় বিপদ! আজিজ একখানি ইট তুলিয়া সজ্জোর বদরেকদীনের লগাটে নিক্ষেপ করিল। কপাল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। দুই হাত বিয়া রক্ত মুছিতে মুছিতে বদরেকদীন দোকানে কিরিয়া আসিল; ভাবিল, বালকের কোন দোষ নাই, সে তাহার অনিশ্চিন্তা করিয়া, আশ্রয়কার জন্ত এই কাজ করিয়াছে। রাগ আজিজের উপর না হইয়া, তাঁহার নিজের দণ্ড অশ্রুের উপর হইল। অবশেষে পৃথিবীতে হুবহু কষ্টের সীমা নাই ভাবিয়া, সকলই আল্লাহর এক্সিয়ার ভাষিয়া তিনি মন সংযত করিলেন।

অনেক বেশ ঘুরিয়া অবশেষে সামসোদীনের বাসারায় উপস্থিত হইলেন। স্বলতান তাঁহার পরিচয় পাইয়া, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের অমুখিত প্রদান করিলেন। স্বলতান সামসোদীনের দেশভ্রমণের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কথা আনিতে পারিলেন। তখন তিনি সামসোদীনকে বলিলেন, “আমার উজীর নৌরেকদীনের অনেক দিন মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যুর দুই মাস পরে মহা একদিন বদরেকদীন কোথায় চলিয়া গিয়াছে, অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহাকে পাওয়া যায় নাই, তাহার মাতা এখনও এখানে জীবিতা আছেন, তিনি আমারই উজীরের কন্যা।” সামসোদীন সেই বিবহার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

রক্তধারায়
মেহের
প্রতিদান



নৌরেন্দ্রের বিধবা পত্নী তাঁহার পুত্রের সহিত, যে বাড়ীতে বাস করিতেন, তথায় উপস্থিত হইয়া সামসোদীন দেখিলেন, প্রানাদোপম সৌখ্য, মার্শেলনির্মিত স্তম্ভরাজী শোভা পাইতেছে, গৃহে শিরচাতুর্দোহ ও অভাব নাই। সামসোদীন তাঁহার ভ্রাতার নাম গৃহদ্বারে স্বর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত দেখিলেন। তিনি ভ্রাতার গৃহদ্বার চুম্বন করিয়া, তাঁহার ভ্রাতৃভাষার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে পরিচয় প্রদান করিয়া, সেখানে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য জানাইলেন। বিধবা এককাল পরে তাঁহার বাহীর সহোদরকে দেখিয়া আর আশ্চর্যবশত করিতে পারিলেন না; বেগে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি সামসোদীনের মুখে তাঁহার কল্পার সহিত পুত্রের বিবাহের কথা শুনিয়া বুঝিলেন, হয় ত তাঁহার পুত্র এখনও কোথাও জীবিত আছে। তিনি তাঁহার পুত্রবধু ও পৌত্রকে দেখিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে সামসোদীন তাঁহাদিগকে নৌরেন্দ্রের গৃহে লইয়া চলিলেন। পুত্রবধু ও পৌত্রের মুখ দেখিয়া বিধবার হৃদয় অনেক পরিমাণে শান্ত হইল। সামসোদীন বদরেন্দ্রীকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন বলিয়া, বিধবাকে তাঁহার সঙ্গে মিশরে যাত্রা করিবার জন্ত অতুরোধ করিলেন। সামসোদীন তাঁহাকে লইয়া বাসোরা পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় দামাস্কু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দামাস্কু উপস্থিত হইয়া, তিনি মিশরের স্থলতানের নিমিত্ত সেই রাজ্যের সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের জন্ত চারিদিকে লোক প্রেরণ করিলেন। সামসোদীন দ্রুতপা দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন শুনিয়া, রাজ্যের সন্মগ্নগণ প্রতিদিন বহু লণাদ্রব্য লইয়া, তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

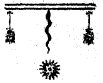
একদিন আজিজ তাহার ভৃত্যকে বলিল, “বাসোরা যাইবার পূর্বে আমি হোটেলওয়ালার কপালে ইট মারিয়াছিলাম, সে এখন কেমন আছে, তাহা জানিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। আমাকে একবার বাজারে লইয়া চল।” আজিজের মাতার অমুমতি লইয়া ভৃত্য আজিজকে বাজারে লইয়া চলিল।

আজিজ ও তাঁহার ভৃত্য বাজারের মধ্যে আসিয়া দেখিল, বদরেন্দ্রী তখনও পূর্ববৎ মিঠাই প্রস্তুত করিতেছেন। বদরেন্দ্রীকে দেখিয়া আজিজ জিজ্ঞাসা করিল, “ওগো হোটেলওয়াল, তুমি আমাকে চিনিতে পার কি?” আজিজের মুখের দিকে চাহিয়াই বদরেন্দ্রী তাহাকে চিনিতে পারিলেন, পূর্ববৎ তাঁহার হৃদয়ে স্নেহের সঞ্চার হইল। তিনি অনেককণ পর্যন্ত কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু বরিতে লাগিল। বদরেন্দ্রী আজিজকে কিছু মিষ্টদ্রব্য খাইবার জন্ত অতুরোধ করিলেন; বলিলেন, “সেবার আমি আপনাদের সঙ্গে আপনাদের তাবুর কাছে গিয়া বড়ই অজ্ঞার কর্ত্ত করিয়াছি, আমার সে অপরাধ মার্জনা করুন। আমার মনে এমন স্নেহের উদয় হইয়াছিল যে, আমি আপনাদের সঙ্গে না গিয়া থাকিতে পারি নাই।”

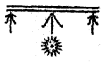
আজিজ বলিল, “তুমি আমাকে যদি আর বিরক্ত না কর, কি আমার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিবিরে না যাও, তবে আমি তোমার দোকানের মিঠাই খাইতে পারি, কিন্তু তুমি আমার প্রতি এত ভালবাসা দেখাইতেছ কেন, তাহা ত বুঝিতে পারি না।” বদরেন্দ্রী আজিজের কথায় সন্তুষ্ট হইল, আজিজ মিঠাই ভোজন করিল। বদরেন্দ্রী আপনাদের জীবন ধন মনে করিতে লাগিলেন। তিনি আজিজকে ও তাহার ভৃত্যকে অতি উৎকৃষ্ট গোলাপ-সুবাসিত সরবৎ পান করিতে দিলেন। সন্তুষ্ট হইয়া আজিজ বলিল, “আমার দাদা মহাশয় যে কয়দিন এখানে থাকেন, আমি প্রত্যহ তোমার দোকানে আসিব, তোমার দোকানের খাবার জিনিসগুলি বড় ভাল।”

আজিজ শিবিরে প্রত্যাপনন করিলে তাহার মাতা তাহাকে আহ্বারে বলাইয়া, সে বাজারে কি কি জিনিস দেখিয়াছে, সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আজিজ সে দিন আর ভাল করিয়া খাইতে পারিল না; বদরেন্দ্রীর দোকানে তাহার উদর পূর্ণ হইয়াছিল। আজিজের জন্ত তাহার পিতামহী কয়েকখানি শিষ্টক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আজিজ খাইল না দেখিয়া তিনি তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

নিরক্ষিত
জামাতার
সম্মানে



স্নেহের
সম্মোহন
আকর্ষণ



আজিজ বলিল, “ঠাকুমা, তুমি এ কি পিঠা তৈয়ারী করিয়াছ! আজ বাজারে এক হোটেলওয়ালার হোটেলের পিঠা খাইয়া আসিয়াছি, তেমন পিঠা তুমি তৈয়ারী করিতে পার না।”

এই কথা শুনিয়া বদরেকীনের জননী ভৃত্যকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তুই বাছাকে বাজারে লইয়া গিয়া ভিখারীর ছেলের মত বার বার দোকানে মিঠাই খাইতে দিস্, এই জন্য কি জোর হাতে ছেলে দেওয়া হইয়াছে?” রাগ করিয়া তিনি সামসোদীনের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং কৰ্ত্তব্য কর্শ্মে অমনোযোগী ভৃত্যের প্রতি গুরু দণ্ডানের জন্ত তাঁহাকে অশ্লরোধ করিলেন।

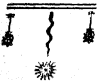
সামসোদীন মহম্মদ ভৃত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগের কথা শুনিয়া তাহাকে আহ্বান করিলেন এবং ঠাকুণী যে কথা বলিতেছেন, তাহা সত্য কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। সামসোদীন মহম্মদ রাগী লোক ছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাণসম প্রিয় দৌহিত্রের প্রতি অন্তায় অমর তিনি যে কোন মতেই সহ্য করিবেন না, ভৃত্য সাবান তাহা ভালই জানিত। পাছে কোন শাস্তি হয়, এই ভয়ে ভৃত্য প্রথমে বাজারে গিয়া হোটেলওয়ালার দোকানে খাবার খাইবার কথা অস্বীকার করিল; কিন্তু আজিজ বলিল, “দাদামহাশয়, আমরা হোটেলওয়ালার রকম পিঠা খাইয়া আসিয়াছি, তেমন সুস্বাদু পিঠা আর কখন খাই নাই, খুব বেশী রকম খাওয়া হইয়াছে।” তিনি বলিল, “না মহাশয়, আমরা বাজারে গিয়া কোথাও কিছু খাই নাই, সত্য কথা বলিতেছি।” আজিজ বলিল, “দাদামহাশয়, কেবল পিঠা নয়, সরবৎ যে খাইয়াছি, অতি আশ্চর্য্য! বড় দেলখোস সরবৎ!” সামসোদীন ভৃত্যকে বলিলেন, “তুই মিথ্যাবাদী, আমি আমার নাতির কথা অবিশ্বাস করিয়া তোয় কথা বিশ্বাস করিব, ভাবিতেছিস্? যাহা হউক, আমার ঐ টেবলের উপর যে সমস্ত খাবার আছে, তাহা যদি তুই খাইতে পারিস্, তবে তোর কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব।”

দেলখোস
সরবৎ



সামসোদীনের টেবলে পাঁচ ছয় সের নানাবিধ মিঠাই সুপাকারে সজ্জিত ছিল। ভৃত্য সাবান উদর পূর্ণ করিয়া হোটেল হইতে খাইয়া আসিয়াছিল, এক বিন্দু খাদ্যবস্তুর স্থানও আর তাহার উদরে ছিল না, সুতরাং সে কিছু খাদ্য মুখে তুলিয়াই ফেলিয়া দিল; বলিল, “কাল আহার বড় গুরুতর হইয়াছিল, সে জন্য কিছুই ক্ষুধা নাই।” তখন উজীর ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন, “এই হারামজাদকে আচ্ছা করিয়া গ্রহণ কর।” ভৃত্যগণ সামসোদীনের আদেশ উৎসাহের সহিত পালন করিতে লাগিল। সাবান বাঁড়ের মত চীৎকার করিয়া কাদিতে কাদিতে বলিল, “হোটেলওয়ালার দোকানে পিঠা খাইয়াছি, এখানেও খাইতেছি, হোটেলওয়ালার পিঠা এখানকার পিঠা অপেক্ষা হাজার গুণে ভাল; সেই চমৎকার পিঠা খাইবার পর এ পিঠা মুখে দেওয়া যায় না।” নৌরেকীনের বিধবা পত্নী এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “সাবান নিশ্চয়ই রাগ করিয়া মিথ্যা কথা বলিতেছে, আমার অপেক্ষা আর কেহ ভাল পিঠা করিতে পারে, তাহা না দেখিলে বিশ্বাস করি না। আমি সেই হোটেলওয়ালার পিঠা দেখিতে চাই।”

পিষ্টক-রহস্তে
সমস্তা-সমাধান



তখন সামসোদীনের আদেশে সাবান বদরেকীনের দোকান হইতে পিষ্টক ক্রয় করিয়া আনিয়া পিষ্টক মুখে দিয়াই নৌরেকীনের পত্নী সহসা মুছিতা হইয়া পড়িলেন। সামসোদীন নিকটেই ছিলেন, তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবধূর চোখে-মুখে লীতল জল ঢালিয়া অনেকক্ষণ পরে সুস্থ করিয়া তুলিলেন। জ্ঞানলাভ করিয়া তিনি বলিলেন, “এ আমার সম্ভানের হাতের পিঠা, এমন পিঠা আর কেহ গড়িতে জানে না।” সামসোদীন বলিলেন, “এ কথা কি করিয়া বিশ্বাস করা যায়? আপনি ও আপনার পুত্র ভিন্ন পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট পিঠা কেহ গড়িতে পারেন না, এ কথা কি আপনি জোর করিয়া বলিতে পারেন?”—বিধবা বলিলেন, “না, তাহা বলিতেছি না, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পিঠা হইতে পারে, কিন্তু ইহার ভিতর যে একটা বিশেষত্ব আছে, তাহা

আমার নিজস্ব, আমার পুত্রকেই কেবল তাহা শিখাইয়াছিলাম। এ শিঠিতে সেই বিবেক দেখিতে পাইতেছি।” সামসোদীন বলিলেন, “বোধিদি, আপনি এরূপ অধীর হইবেন না, হোটেলওয়ালগা যখন এই নগরেই আছে, তখন তাহাকে এখানে লইয়া আসিলেই আপনার সকল সন্দেহ দূর হইবে, কিন্তু আপনি প্রতিজ্ঞা করুন যে, এই ব্যক্তি আপনার পুত্র হইলে আপনি কিবা আপনার পুত্রবধূ,—আমার কস্তা এখানে তাহার সহিত আলাপ-পরিচয় করিবেন না,—তাহাকে কোন কথা জানিতে দিবেন না, কারণ, দামাঙ্কসে এই সকল কথা প্রকাশ হয়, ইহা আমার ইচ্ছা নহে। কারয়ো নগরে উপস্থিত হইয়া যথাকর্তব্য করা যাইবে।”

অনন্তর তিনি তাহার পক্ষাশ জন ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া আদেশ করিলেন, “তোমরা এখনই বাজারে যাও, সাবান যে হোটেল দেখাইয়া দিবে, সেই হোটেল যে ব্যক্তি পিষ্টক প্রস্তুত করে, তাহার দোকান লুঠ করিয়া, তাহাকে অবিলম্বে এখানে বাধিয়া লইয়া আসিবে, কিন্তু সাবধান, তাহাকে আঘাত করিবে না।”

সামসোদীনের ভৃত্যবর্গ দলবদ্ধ হইয়া দামাঙ্কসের বাজারে উপস্থিত হইল, এবং বদরেকদীর পোকানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “এই ভৃত্যকে যে শিঠি বিক্রয় করিয়াছ, তাহা কাহার প্রাপ্ত ?” বদরেকদীন বলিলেন, “উহা আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করিয়াছি, এরূপ শিঠি আমার মাতা ভিন্ন আর কেহই প্রস্তুত করিতে পারে না।” এই কথা শুনিবামাত্র ভৃত্যগণ দোকানের সমস্ত জিনিস নষ্ট করিয়া, এমন কি, উনান পর্যন্ত চূর্ণ করিয়া বদরেকদীনকে বন্দন করিয়া সামসোদীনের জাহাজে লইয়া আসিল।

শিবিরে উপনীত হইয়া সামসোদীনকে অভিধান করিয়া বদরেকদীন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, “মহাশয়, আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে, আপনার ভৃত্যগণ আমার পোকান লুঠ করিয়া, আমাকে বন্দন করিয়া লইয়া আসিল ?” সামসোদীন ক্রিম কোণ প্রকাশ করিয়া সগজ্জনে বলিলেন, “দে বর্ষর, সত্য করিয়া বল, এ শিঠি তোর স্বহস্তে প্রস্তুত কি না ? এরূপ শিঠি যে প্রস্তুত করে, তাহাকে মূলে চড়াইয়া আমি তাহার প্রাণ সংহার করিব। এই কঠোর শাস্তি তাহাকে লইতে হইবে।” বদরেকদীন ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, “খোদা ! এ যে ভয়ানক শাস্তি দেখিতেছি, ঋণাশ পিঠা করিয়াছি বলিয়া আমার প্রাণদণ্ড হইবে ?” সামসোদীন গভীর স্বরে বলিলেন, “হাঁ, আমি তোকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তোর প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিব, এ ক্ষমতা আমার অধিকার লইয়াছি।”

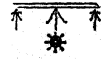
বদরেকদীর মাতা ও স্ত্রী পরদার অন্তরাল হইতে বদরেকদীনকে দেখিতেছিলেন, যদিও বহুদিন পরে তাহার তাহাকে দেখিলেন, তথাপি মুহূর্ত্তমধ্যে চিনিতে পারিলেন। অত্যধিক আনন্দবেগে তাহার মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু পূর্বে কোন কথা প্রকাশ করিবেন না প্রতিজ্ঞা করার, তাহার মুচ্ছাভঙ্গে অতি কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া রহিলেন।

বদরেকদীনকে লইয়া সামসোদীন পরিবারবর্গের সহিত কারয়ো নগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর সামসোদীন তাহার কস্তাকে বলিলেন, “মা, তোমার বিবাহরাত্রি যেখানে যে দ্রব্য যে ভাবে ছিল, সেই সকল দ্রব্য ঠিক সেই ভাবে সজ্জিত করিয়া রাখ; বিবাহরাত্রের সমস্ত আয়োজনের কথা আমি সবিস্তারে লিখিয়া লিপ্যুকে রাখিয়াছি, যদি তোমার কোন ভুল হয়, সেই কাগজখানি বাহির করিয়া পাঠ করিলেই সকল কথা তোমার মনে পড়িবে। বিবাহ-উৎসবের যে সকল আয়োজন বাহিরে হইয়াছিল, আমি সেই সকল আয়োজন ঠিক করিতেছি।”

সমস্ত আয়োজন ঠিক হইলে, উজ্জীর তাহার কস্তার শরনকক্ষে প্রবেশ করিয়া, যে আসনে বদরেকদীর পাগড়ী, টাকার খলি, পরিচ্ছদ ছিল, সেই আসনে তাহা পূর্ব্ববৎ রাখিয়া কস্তাকে বলিলেন, “আজ রাত্রে সেই বিবাহরাত্রের স্তায় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তোমাকে শরন করিতে হইবে। বদরেকদীন রাত্রে তোমার

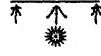
জামাতা-হরণ

অভিধান



বিবাহ-স্বপ্নের

সভা-সজ্জা



নিকট আসিলে কিরিবার বিলম্বের জন্য তাহাকে সামরে অনুযোগ করিবে; তাহার পর তাহাকে শয়ন করিতে বলিবে। যাহা যাহা ঘটে, সমস্ত কাল সকালে আমাকে ও তোমার শান্ত্তীকে জানাইবে।”

যদি কি
এতই মধুর ?



রাত্রিকালে বদরেকদীন নিদ্রিত হইলে, সামসোদ্দীনের আদেশানুসারে ভূতাগণ তাঁহার নিদ্রিত অবস্থাতেই তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া, বিবাহ-রাত্রিতে তিনি যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, সেইরূপ পরিচ্ছদ পরাইয়া দিল। বদরেকদীন পশ্চিমে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া তখন গভীর নিদ্রার অভিভূত, তিনি কিছুই জানিতে পারিলেন না। পরিচ্ছদ পরিবর্তন হইলে ভূতাগণ তাহাকে সজ্জিত বিবাহসভায় আনিয়া শয়ন করাইল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, তিনি উঠিয়া বসিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে কিছুতেই বিখাদ

করিতে পারিলেন না। দেখিলেন, বহুকাল পূর্বে তাঁহার বিবাহসভায় যে সকল দৃশ্য দেখিয়াছিলেন, আজ এত কাল পরে ইন্দ্রজালের স্তায় তাহাই তাঁহার চক্ষুর উপর ভাসিতেছে। তিনি চারিদিকে বিম্মতপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিলেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তাহাকে কাষ্ঠশিল্পের আবদ্ধ করিয়া কারোতে লইয়া আসা হইয়াছিল। তিনি কোথায় আসিয়াছেন, সামসোদ্দীন তাহাও জানিতে দেন নাই, কিন্তু সেই বিবাহ-সভার তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে তাঁহার মনে পড়িল, এখানেই তিনি সেই রাত্রিতে বরবেশে বসিয়াছিলেন এবং শত শত স্তম্ভরী রমণীতে সভা পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার মনে হইল, রমণীগণ অলক্ষণবার্হা চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু আলোকের ঐচ্ছল্য এবং আলোকবানের স্তম্ভ তেমনি অবিকৃত রহিয়াছে। বদরেকদীন আসনে বসিয়া



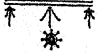
চিত্তার
প্রশান্তি

উভয় করতলে চক্ষু মার্জনা করিয়া বলিলেন, ‘আল্লা, এ কি সভা! না আমি স্বপ্ন দেখিতেছি?’ তাঁহার মন এরূপ অস্থির হইয়া উঠিল যে, কিছুতেই তিনি স্থিতি পাইতেছিলেন না। তাই মনের চাক্ষুস্য দূর করিবার জন্য কোন উপকরণ পাওয়া যায় কি না, তাহার অনুসন্ধান জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই দেখিতে পাইলেন, সম্মুখেই আধার সমেত একখানি কোরাণ রহিয়াছে। পরম আনন্দে তিনি কোরাণ-পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। অলক্ষণের মধ্যেই তাঁহার চিত্ত বিমল শান্তিধারার বিদ্য হইয়া উঠিল। সেই সময় তাঁহার স্ত্রী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বদরেকদীন নিবিষ্টচিত্তে কোরাণ পাঠ করিতেছিলেন, তাঁহার স্ত্রীর উপস্থিতি তিনি জানিতেই পারিলেন না।

স্বামীকে তদবস্থ দেখিয়া বদরেশ্বরের জী স্বাভাবিক মধুর কণ্ঠে বলিলেন, “প্রিয়তম, তুমি এখানে ? এসো, রাত্রি অধিক হইয়াছে, আমরা শয়নকক্ষে বাই।”

অতর্কিতভাবে একদিনের পরিচিতা জীর কণ্ঠস্বর কাণে ধাইতেই বদরেশ্বর বিষমেরে স্তম্ভিত হইলেন ; কিন্তু তখন তাঁহার মনের অবস্থা এইরূপ যে, নিজের উপর তাঁহার কোনরূপ কর্তৃত্ব ছিল না । সুতরাং তিনি উঠিয়া সবিস্ময়ে সভরে, মাতালের ভায় টলিতে টলিতে জীর অঙ্গসরণ করিয়া তাঁহার শয়নকক্ষধারে উপস্থিত হইলেন ।

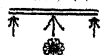
প্রমোদ-কক্ষ
সামর-আশ্রয়



বদরেশ্বরের জী অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে বলিলেন, “প্রিয়তম, তুমি ঘরে দাঁড়াইয়া কি করিতেছ, ঘরে আসিয়া শয়ন কর । শয্যা হইতে তুমি অনেকক্ষণ উঠিয়া গিয়াছ, হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া আমার পাশে তোমাকে না দেখিতে পাইয়া বড়ই আশ্চর্য্য বোধ করিতেছিলাম ।”—বদরেশ্বর জীর কথা শুনিয়া ধীরে ধীরে স্বপ্নাবিষ্টের স্তায় জীর শয়নকক্ষে উপস্থিত হইলেন ; কিন্তু শয্যায় শয়ন করিলেন না । চেয়ারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাগড়ী, পোষাক ও টাকার থলি যেমন তিনি রাখিয়াছিলেন, সে সকল প্রযা সেই ভাবেই আছে । তাঁহার মনে হইল, তিনি যাহা দেখিতেছেন, তাহা দশ বৎসর পূর্ব্বের দৃশ্য ; তাহা হইলে কি স্বপ্নধারে তিনি এ দশ বৎসর অতিবাহিত করিয়াছেন ? ললাটে হাত দিয়া দেখিলেন, আক্কেল গোষ্ঠীভাবে তাঁহার ললাটে যে ক্ষত করিয়া দিয়াছিল, সে ক্ষতচিহ্ন তখনও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই । ইহাও কি স্বপ্ন ! বদরেশ্বর তাঁহার পাগড়ী ও টাকার থলি উত্তম-রূপে পরীক্ষা করিলেন, তাহার পর শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন, “এ সকল সত্য না ভুলকী, আমি যে কিছুই বৃকিতে পারিতেছি না ।” তাহার পর তাঁহার জী আবার কাতরভাবে বলিলেন, “প্রিয়তম, ওখানে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছ, এখনও রাত্রি আছে, শয়ন কর ।” বদরেশ্বর তাঁহার জীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি সত্যই কি তোমার নিকট হইতে এই রাত্রিকালেই উঠিয়া গিয়াছি ?” উজীরকন্ঠা বলিলেন, “তুমি এরূপ অস্বস্ত প্রশ্ন করিতেছ কেন ? তোমার মন বড় অস্থির দেখিতেছি, এই একটু আগে কত সোহাগ করিয়াছ, আমার রূপের প্রশংসা করিয়া বিমুগ্ধভাবে কত প্রেম নিবেদন করিয়াছ, এত শীঘ্র তাহা ভুলিবার কারণ কি ? সে সকল কি তবে মন-মজান ছলনা মাত্র ?”

বদরেশ্বর বলিলেন, “আমি কিছুই বৃকিতে পারিতেছি না । আমি তোমার কাছে শয়ন করিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ হয়, কিন্তু তাহার পর আমি যে দশ বৎসর দামাঙ্কসে বাস করিয়াছি, তাহা ত’ ভুলিতে পারিতেছি না । আজ রাত্রে আমি তোমার শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিলে এ দশ বৎসরের স্মৃতি কোথা হইতে আসিল ?” উজীরকন্ঠা বলিলেন, “তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখিয়াছ ।” এই কথা শুনিয়া বদরেশ্বর উচ্চহাস্তে বলিলেন, “ইহা অপেক্ষা অসম্ভব কথা আর কিছুই নাই, দামাঙ্কসের সকল কথাই আমার উজ্জলভাবে মনে পড়িতেছে । তবে বহু দিন পূর্ব্বের এক বিচিত্র স্বপ্নের কথা আমার বেশ মনে আছে, পিতার সমাধি-মন্দির হইতে হঠাৎ আলোকদীপ্ত, রূপ-তরঙ্গ-উজল, স্রগন্ধিত বিবাহ-সভার কোন মায়াবলে উপনীত হইয়াছিলাম ;—সৌভাগ্যবশে তোমারই মত বিদ্বাং-শিখারপিণী হুম্মরীর সহিত মিলনানন্দে বিভোর হইয়া প্রমোদনিশা বাগান করিয়াছিলাম । হাঁ, একরাত্রে তোমারই পার্শ্বে শয়ন করিয়া প্রমোদ-ক্লান্তিতে অবসর হইয়া, সুকোমল বাহুলতা উপাধানে নিদ্রিত হইয়াছিলাম । কিন্তু সে বিচিত্র স্বপ্নস্বপ্নের অবসানে জাগিয়া দেখিলাম, প্রভাতে আমি সহস্র কোশ দূরবর্তী দামাঙ্কসের নগরধারে পড়িয়া আছি । আমি বিশ্বাস করিলাম না যে দামাঙ্কসে আসিয়াছি, কিন্তু লোক আমাকে পাগল মনে করিয়া উপহাস করিতে লাগিল, অবশেষে আমি অগত্যা এক হোটেলওয়ারাশ প্রায় প্রবেশ করিলাম । সেই হোটেলেরই আমার দশ বৎসর কাটয়া গিয়াছে । তাহার পর কোথাকার এক জন ওমরাহ আমার দোকান লুণ্ঠ করিয়া আমাকে এখানে বাধিয়া আনিয়াছেন এবং প্রাণদণ্ড করিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়াছেন ।” উজীরকন্ঠা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি এমন কি অপরাধ করিয়াছ যে, সে লজ্জা তোমার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল ?” বদরেশ্বর

প্রমোদ-নিশার
বিচিত্র স্বপ্ন



অবিয়াম চূষনে
বিরহ-সম্ভাপ
প্রশমিত



বলিলেন, “আমার অপরাধ—আমি তাঁহার ভৃত্যের নিকট যে শিষ্টক বিক্রম করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার মুখরোচক না হওয়াতেই আমার প্রতি এই দণ্ড—এমন অজুত দণ্ড আবার রাজ্যে আর কেহ পাইয়াছে বলিয়া জানি না।”

যাহা হউক, অনেক কথার আলোচনার পর বদরেদীন শয্যা শয়ন করিলেন; স্ত্রীপুত্র বিবাহের সস্তাপ-জালা—মিলনের প্রেমাক্রান্তে প্রশমিত হইল। স্ত্রীমরীর অভিমান—প্রেমদানের পাশা সাক্ষ হইতে মিলন-রজনীর অবসান হইল, কিন্তু অবিয়াম চূষন-আকাজ্জার নিবৃত্তি হইল না। প্রবল স্রুথের আবেশে বিনিদ্র-বন্ধনী যেন মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল; স্বপ্নকে সত্য ও সত্যকে স্বপ্ন বলিয়া বারম্বার মনে হইতে লাগিল।

প্রভাতে উজীর সামসোদীন মহম্মদ শয়নকক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়া, বদরেদীনকে সাদরে আব্বান করিলেন। বদরেদীন হার খুলিয়া দেখিলেন, শিষ্টক-নির্দোষের দোষে যিনি তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিয়াছিলেন, তিনিই তাঁহাকে আব্বান করিতেছেন। ভয় ও বিস্ময়ে বদরেদীনের হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু উজীর সহান্তে সকল কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার ভয় দূর করিলেন এবং বলিলেন, “দৈত্যের অল্পগ্রহেই এই বিবাহ হইয়াছিল।” সামসোদীন তাঁহার নিজের ও তাঁহার ভ্রাতা নৌরেদীনের সকল কথা বদরেদীনকে সবিস্তারে বলিলেন।

জ্যোতিষতত্ত্বের মুখে সকল কথা শুনিয়া বদরেদীনের মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হইল; অন্তরঙ্গ পরেই তিনি তাঁহার মাতা ও পুত্র আজিজের সাক্ষাৎ পাইলেন। আজিজকে দেখিবামাত্র তাঁহার রক্ত পুত্রস্নেহ শতধারায় উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। মাতার কোড়ে মস্তক রাখিয়া তিনি শিশুর স্তায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পবিত্র অশ্রুধারায় স্তম্ভীত কালের অদর্শনজনিত মনঃকষ্ট বিদ্যোত হইয়া গেল।

অনন্তর উজীর সামসোদীন মহম্মদ স্নলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল কথা বিবৃত করিলেন। স্নলতান উজীরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। উজীরের গৃহে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

উজীর জাকর বদরেদীন হাসেনের এই কাহিনী শেব করিয়া খালিফ হারুণ-অল-রসীদকে বলিলেন, “জাহাপনা, আমার এই গল্প কি সন্মতিক আশ্চর্যজনক নহে? যদি ইহা আপেলের কাহিনী অপেক্ষা অধিক বিশ্বদ্রকর হয়, তাহা হইলে আমার প্রার্থনা, আমার এই দাসের প্রাণদণ্ডাভ্যাস রহিত করুন।” খালিফ তখন অল্পগ্রহ পূর্ব্বক, উজীরের ক্রীতদাস রোহানকে মুক্তিদান করিলেন এবং সেই সাধ্বী পত্নীহতাকারী যুবকের সহিত তাঁহার একটি স্ত্রীমরী ক্রীতদাসীর বিবাহ দিয়া, তাঁহাকে বহুসংখ্যক উপহারে পুরস্কৃত করিলেন। পত্নীহত্যা যুবক খালিফের নিকট চির-অল্পগ্রহীত হইয়া রহিলেন।

এই গল্প শেষ হইলে শাহারজাদী স্নলতান শাহরিয়াকে প্রভাতী-বিদায়-চূষনে শ্রীতি প্রদান করিয়া বলিলেন, “হে স্নলতানশ্রেষ্ঠ! আমি আপনাকে যে গল্প বলিলাম, তাহা অপেক্ষাও অধিক আশ্চর্য্য একটি গল্প জানি, আগনি তাহা শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন। আপনার অমুমতি হইলে আগামী কলা রাত্রে তাহা বলিতে পারি।” স্নলতানের গল্পশ্রবণের ইচ্ছার সঙ্গে শাহারজাদীর রূপস্বধাপানের প্রথম বাসনা দিন দিন অত্যন্ত বলবতী হইতেছিল, শাহারজাদীর মুখে তিনি যতই নূতন নূতন গল্প শ্রবণ করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার বিময় বৃদ্ধি হইতেছিল। তিনি এমন অল্পপম স্ত্রীমরীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়া, গল্পশ্রবণের স্রুথের সঙ্গে প্রেমোদ-পিগাসার তৃপ্তি হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিতে ইচ্ছা করিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, সৌন্দর্য্যরাগীর সকল গল্প শুনিয়া, কিছুদিন স্বপ্নসজ্জা করিয়া তাহার পর প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেই চলিবে।

পরদিন শেখরাগ্নিতে দিনারজাদী বখানিম্মে উঠিয়া, তাঁহার ভগিনীকে বলিলেন, “দিদি, তুমি যে নূতন গল্পট বলিতে চাহিয়াছ, তাহা বল।” স্নলতানের সম্মতি লইয়া শাহারজাদী বলিতে আরম্ভ করিলেন।



তাহার দেশের সীমান্তস্থিত কাসপার নগরে, পূৰ্ণকালে এক জন দরজী বাস করিত। দরজীর একটি পরমা স্ত্রম্বরী স্ত্রী ছিল, এই স্ত্রী যেমন স্ত্রম্বরী, তেমনই গুণবতী ছিল বলিয়া, দরজীর হৃদয়ের সীমা ছিল না। এক দিন সে তাহার দোকানে পোষাক সেলাই করিতেছে, এমন সময় একটি কুহুদেহ কুজ আসিয়া, তাহার দোকানের দ্বারে বসিয়া, করতাল বাজাইয়া মনোমলে গান আরম্ভ করিল। তাহার গান ও বাজ শুনিয়া, দরজী বড় খুসী হইল। সে মনে মনে ভাবিল, যদি ইহাকে আমার স্ত্রীর নিকট লইয়া গিয়া, ইহার গান শুনাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি বড় সন্তুষ্ট হইবেন। অনন্তর দরজী কুজের নিকট এই প্রস্তাব করিলে, সে মানিলে সন্তুষ্ট হইল। দরজী তাহার দোকান বন্ধ করিয়া, কুজকে লইয়া গৃহে চলিল।

দরজীর স্ত্রী তখন আহারের আয়োজন করিতেছিল। দরজী কুজকে লইয়া গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি জনে একত্র থাইতে বসিল। থাইতে থাইতে কুজের গলার মস্তুর একটি বড় কাঁটা বিধিয়া গেল, অবিলম্বে তাহার মৃত্যু হইল। এই দুর্ঘটনায় দরজী ও তাহার স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত ভীত হইল। তাহারা বুঝিল, যদি রাজকৰ্মচারিণের কর্ণে এই সংবাদ প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নরহত্যার অভিযোগে দণ্ডিত হইতে হইবে, সুতরাং তাহারা মৃতদেহটি স্থানান্তরিত করিবার জন্ত বাস্তব হইয়া উঠিল।

দরজীর বাড়ীর নিকট এক জন ইহুদী চিকিৎসক বাস করিতেন। দরজী ও তাহার স্ত্রী কুজের মৃতদেহ বহিয়া সেই চিকিৎসকের বাড়ী লইয়া গেল এবং মৃতদেহটি দরজার সিঁড়ির উপর স্থাপন করিয়া, দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। দরজী খুলিয়া একজন স্ত্রম্বরী দাসী বাহির হইয়া আসিলে-দরজী তাহাকে বলিল, “আমরা একটি রোগী আনিয়াছি, তাহার পীড়া অত্যন্ত অধিক, চিকিৎসক মহাশয়কে একবার ডাকিয়া দিলে বড়ই উপকৃত হইব।” দরজী এই বলিয়া দাসীর হস্তে একটি টাকা প্রদান করিল। দাসী চিকিৎসককে সংবাদ প্রদান করিতে চলিল। দরজী ও তাহার স্ত্রী সেই মৃতদেহটি বহন করিয়া, দ্বারপ্রান্তে রাখিয়া গৃহে চম্পট দিল।



কুজ ও
দরজীর
বিস্ময়-
কর
কাহিনী
✽ ✽ ✽

মৃতদেহ
চালান
✽ ✽ ✽

এই প্রাণশোনাঙ্গী চিকিৎসকের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার হস্তে টাকাট প্রদান করিয়া, রোগীর আগমন সংবাদ দিল। এই সুসংবাদ পাইবামাত্র সেই ইহুদী চিকিৎসক দাগীকে বলিল, ‘একটা আলো লইয়া আমার পশ্চাতে আর।’ তাহার পর অন্ধকারের মধ্যেই ডাক্তার দ্রুতবেগে ঘরের দিকে আসিল; ষাণ্মাস্ত্রে কুঞ্জের মৃতদেহ পড়িয়া ছিল, ইহুদী তাহার উপর আসিয়া পড়িল এবং বিরক্ত হইয়া সেই মৃতদেহে পদাঘাত করিল, সঙ্গে সঙ্গে হুমড়ী খাইয়া ইহুদী একবারে সিঁড়ির নীচে আসিয়া পড়িল। দাগী আলো লইয়া আসিলে ডাক্তার সভয়ে দেখিল, তাহার স্নানবথান পদসঞ্চালনেই রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

খুনের দাগে
চিকিৎসক



ডাক্তার তখন রাজকম্ভারিগণের হস্ত হইতে পরিদ্রাব্যবস্ত্রের অভিপ্রেতে সেই মৃতদেহটিকে তাহার দ্বীপ শরনক্ষে লইয়া গেল এবং ক্রমে এই দেহ স্থানান্তরিত করা যায়, তৎপক্ষে দ্বীপের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল। অনেক পরামর্শের পর চিকিৎসকের দ্বীপ বলিল, “এক উপায় করা যাউক, আমাদের বাড়ীর পাশে যে যে মূল্যমানট আছে, আমাদের ছাদের উপর উঠিয়া, তাহার চিন্দীর ভিতর দিয়া এট মৃতদেহ নামাইয়া দেওয়া যাউক।”

এই মূল্যমানট স্থলতানের ভাগ্যবিত্ত ছিল। স্থলতানের সাময়িক বায়ের জন্ম যে সকল তৈল, স্নাত, মল্লা প্রভৃতি সামগ্রীর আবশ্যক হইত, তাহা সে নিজের বাড়ীতেই জমা করিয়া রাখিত। এই ভাগ্যবিশেষটিকে ইহুদী প্রভৃতি চতুর্পদে পরিপূর্ণ ছিল।

ইহুদী চিকিৎসক দ্বীপ পরামর্শই উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়া, কুঞ্জের মৃতদেহ লইয়া ছাদের উপর উঠিল; তাহার পর তাহাতে দড়ী বাধিয়া ধীরে ধীরে সেই ভাগ্যবিত্ত চিন্দীর পথে মৃতদেহ নামাইয়া দিল। যখন তাহার দেহটি মৃতদেহ গৃহমধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছে, তখন তাহার দড়ী টানিয়া লইয়া, নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দ্বীপ বন্ধ করিয়া দিল।

স্থলতানের ভাগ্যবিত্ত সে দিন একটা বিবাহের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিতে রাত্রি কিছু অধিক হইল, দীপ হস্তে লইয়া সে গৃহে প্রবেশ করিয়া, সহসা সন্নিবেশ দেখিতে পাইল, চিন্দীর নীচে একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে।

শব-সংগোপন-
নৈপুণ্য



ভাগ্যবিত্ত লোকটা কিছু সাহসী ছিল, সে মনে করিল, নিশ্চয়ই কোন চোর ভাগ্যবিত্ত হইতে জিনিসপত্র চুরি করিতে আসিয়াছে। সে মনে মনে বলিল, ‘আনি ভাবিতাম, জিনিসপত্র ইহুদে লইয়া যায়, এতদিনে বুঝিলাম, চিন্দী দিয়া চোর নামিয়াই আমার সর্বনাশ করে, আজ উহাকে ভাল রকম শিক্ষা দিতে হইবে।’—এইরূপ মতলব আঁটিয়া, ভাগ্যবিত্ত মহাশয় লগুড়-হস্তে সেই কুঞ্জের দিকে ধাবিত হইল এবং কুঞ্জের দেহের উপর প্রচণ্ডবেগে লগুড়ঘাট করিতে লাগিল। কুঞ্জের দেহটি অবিলম্বে ভূতলগামী হইল। তখন ভাগ্যবিত্ত লম্বা থানাইয়া সভয়ে দেখিল, চোর মরিয়া গিয়াছে। ভাগ্যবিত্ত তখন লম্বাটী কেঁপিয়া, চুল ছিঁড়িয়া, আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, ‘হায় হায়, যদি ইহাকে একটু কন করিয়া ঠেসাইতাম, তাহা হইলে এ বিপদে পড়িতে হইত না। এখন প্রাণরক্ষার আর কোন উপায়ই দেখিতেছি না, এই কুজো বেটাই আমার সর্বনাশ করিল।’—কিন্তু ক্রমে অধিক রাত্রি হইয়া আসিতেছে, আর অধিক বিলম্বের সময় নাই দেখিয়া, সে কুঞ্জের মৃতদেহ গৃহে লইয়া বাহ্যপথে বাহির হইল এবং অদূরবর্তী স্নানাগারের সম্মুখিত একটি দোকানের সম্মুখে তাহাকে বসাইয়া রাখিয়া, দ্রুতবেগে গৃহে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

আরওপরে, এক জন খুঁটান সদাগর সেইপথে গৃহে কিরিতেছিল। সদাগরটি স্থলতানের বাবস্ত্রীয় জবা সরবরাহ করিত। লোকটা অত্যন্ত মত্ত ছিল। পথে ফিরিবার সময় হঠাৎ তাহার দান করিবার ইচ্ছা

আমার কথা শুনিয়া, সুন্দরী হৃষ্টচিত্তে আমাকে তাঁহার সুখপত্র দেখাইলেন। কি সুন্দর মুখ! যেন সুন্দরী
আকাশে শরতের পূর্ণচন্দ্র ভাসিতেছে। আমি সে মুখ দেখিয়া কামশরে প্রস্ফুট হইলাম, মনে মনে ভাবিলাম,
যদি এই রমণীকে লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে আমার জীবন সুখের চরমসীমার উপস্থিত হইবে।
রমণী বস লইয়া চলিয়া গেলে আমি দোকানীকে বুতীর পরিচয় দিচ্ছায়া করিলাম; শুনিলাম, তিনি
এক খনকুবের আদীরের কস্তা। আদীর মৃত্যুকালে তাঁহার কস্তাকে অগাধ ঐর্ষ্যা দান করিয়া গিয়াছেন।

সেদিন আমি ভাল করিয়া আহাৰ করিতে পারিলাম না, সেই মনোমোহিনী সুন্দরী আমার হৃদয়
সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়াছিল। পরদিন আমি পুনর্বার বদরেশ্বরের দোকানে উপস্থিত হইলাম, মনে মনে
ভাবিতে লাগিলাম, আজ কি সে সুন্দরী আর আসিবেন না? আর কি তাঁহাকে দেখিয়া এ তাপিত চিত্ত
শীতল করিতে পারিব না? এইরূপ নানা কথা ভাবিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, বুতী পূর্বদিন অপেক্ষাও
উৎকৃষ্ট সাজে সজ্জিত হইয়া, রূপের তরঙ্গ ভুলিয়া, দাসীসঙ্গে বদরেশ্বরের দোকানে প্রবেশ করিলেন।
তিনি দোকানীর প্রতি লক্ষ্য মাত্র না করিয়া আমাকে বলিলেন, “দেখুন মহাশয়, আমি আমার কথা
ঠিক রাখিয়াছি, আপনি কাল আমার বশে উপকার করিয়াছেন—আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, আজ
আমি আপনার প্রাণ্য টাকা লইয়া আসিয়াছি। আপনি একজন অজ্ঞাতকুললীলা রমণীর প্রতি বিশ্বাস
স্থাপন করিয়া যেদণ্ড ভদ্রতচরণ করিয়াছেন, তাহাতে চিরজীবন আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।”

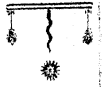
আমি বলিলাম, “আপনি অনর্থক কেন এত ব্যস্ত হইয়াছেন, আমি তা’ বলিয়াছি, আপনার টাকার অল্প
কোন চিন্তা করিতে হইবে না।” সুন্দরী বলিলেন, “সে কি মহাশয়, আপনি আমার এতদূর উপকার
করিয়াছেন, আর আমি তাহা এক দিনেই ভুলিয়া যাইব? আমাকে এতদূর অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন না?”—
বলিয়া, রমণী আমার হাতে টাকার তোড়া দিয়া আমার পাশে বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোহন কটাক
সন্ধান করিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে আমি সেই বুতীকে আমার মনের কথা জানাইলাম, আমি যে তাঁহার মোহন রূপ দেখিয়া
সম্মত হারাইয়াছি, তাহাও তাঁহাকে ইচ্ছিতে জানাইলাম। সুন্দরী আমার কথা শুনিয়া তাড়াতাড়ি
উঠিয়া, দোকান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, তিনি আমার কথা শুনিয়া
বিরক্ত হইয়াছেন। রমণী যতদূর চলিলেন, আমি সতৃষ্ণনয়নে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম, অবশেষে তিনি
অদৃষ্ট হইলে, আমিও নিরাশ হৃদয়ে দোকান হই ত উঠিলাম।

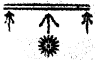
পথে চলিতে চলিতে বোধ হইল, হঠাৎ কেহ পশ্চাৎ হইতে আমার বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিল।
আমি কিরিয়া চাহিলাম; যে রমণী আমার নয়ন-মন মোহিত করিয়া আমার হৃদয়ে রাখিয়া
সেই বুতীর দাসীই আমার বস্ত্র ধরিয়া আকর্ষণ করিয়াছে। দাসী আমাকে বলিল, “আমার মনিব
ঠাকুরাণী আপনার সঙ্গে এই একটি কথা বলিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, যদি আপনি তাঁহার কথা শুনিতে ইচ্ছা
করেন, তবে আমার সঙ্গে আসুন।” আমি তৎক্ষণাৎ দাসীর অহুগমন করিলাম, দেখিলাম, আমার নয়ন-
রঞ্জিনী হৃদয়হারিণী রমণীর আর একটি দোকানে বসিয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন।

সুন্দরী আমাকে তাঁহার পাশে বসাইয়া সুমধুর স্বরে বলিলেন, “আমি কাপড়ের দোকান হইতে আপনার
কথা শুনিয়া হঠাৎ উঠিয়া আসিয়াছি বলিয়া, আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। আমি ঐ দোকানীটার সাহায্যে
আপনার কথার কোন উত্তর দেওয়া সম্ভব মনে করি নাই। আপনি যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহাতে
আমার মনে পরম সন্তোষ হইয়াছে; আপনাকে দেখিয়া অবধি আমি আপনার হস্তে আমার মন-প্রাণ

শ্রোম-উপহার
প্রাণ-বিনিময়



মোহন রূপের
শ্রেণিক কথা
ফাঁদ।



সমর্পণ করিয়াছি। আপনার সহিত পরিচিত হওয়ার পর কেবল আপনার কথাই সর্বদা আমার মনে
হইতেছে। যে মুহূর্তে আপনাকে দেখিয়াছি, তখন হইতেই আমার হৃদয়ে প্রেমের আগুন জ্বলিয়া
উঠিয়াছে।” সুবতীর কথা শুনিয়া আমার মন আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। স্বমধুরহাসিনী বলিলেন,
“কিন্তু আমাদের মিলন হইবে কোথায়? যদি তুমি সম্মত মনে কর, তাহা হইলে আমি তোমার
গৃহে যাই, আর তোমার আপত্তি না থাকিলে তুমি আমার গৃহেও যাইতে পার।” আমি বলিলাম,
“আমি এই নহরে অপরিচিত ব্যক্তি, এক খা সাহেবের বাড়ী ভাড়া লইয়া এখানে অবস্থান করিতেছি। আপনার
মত সন্তোষমহিলাকে আমি সেখানে যাইতে বলিতে পারি না, দে আপনার পরস্পরের গোপ্যস্থানও নহে।
যদি আপনি আমাকে আপনার গৃহ দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি সেখানে উপস্থিত হইয়া আপনার
আদেশ প্রতিপালন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।” সুবতী আমার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, আমাকে তাঁহার গৃহের
সন্ধান বলিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি আবার সেই সম্মোহন হাসি হাসিয়া, আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

প্রমোদ-মন্দিরে
লেন-ইঙ্গিত



বৃহস্পতিবার প্রভাতে আমার স্বন্দরীর প্রাসাদে যাইবার কথা ছিল। আমি প্রত্যয়ে গাত্ৰোত্তান করিয়া,
স্বন্দর পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, পর্দারোহণে আমার ক্ষুদ্রেশ্বরীর প্রমোদ-মন্দিরে যাত্রা করিলাম। সঙ্গে
কিছু অর্থ থাক। আবগ্ৰক বস্ত্রায়া, পঞ্চাশটি স্বর্ণমুদ্রা লইলাম, একজন পথপ্রদর্শক লইয়া স্বন্দরীর গৃহদ্বারে
উপস্থিত হইলাম এবং সেই স্থান হইতে আমার পথপ্রদর্শককে বিদায় করিলাম; তাহাকে বলিলাম,
‘আগামী কলা প্রভাতে এখানে আসিয়া আমাকে বাসায় লইয়া যাইবে।’

আমি সুবতীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে কড়াবাত করিলাম। দুই জন শ্বেতবর্ণ দাসীশু দ্বার খুলিয়া
দিল। আমাকে দেখিয়া ‘বলিল, ‘মহাশয়, আসুন—আসুন, আমাদের কত্রীতাক্ষণী আপনাই প্রতীক্ষা
করিতেছেন। আজ রুহিদীন হইতে তিনি আপনার কথা ভিন্ন অন্য কোন কথা বলেন নাই।’ আমি
সুবতীর সুপ্রশস্ত অট্টালিকায় প্রবেশ করিলাম। অতি স্বন্দর গুরী, চতুর্দিকে বাগান, গৃহগুলি পরম
রমণীয়। বাগানে বিহঙ্গমকুল মধুরস্বরে গান করিতেছে, নানাজাতীর ফল চতুর্দিকে মাধুর্য্য বিকাশ করিতেছে,
স্বগন্ধে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। কৃত্রিম নিষ্কর হইতে বর বর শব্দে মুক্তাবিন্দুর স্রাব সুবিলম্ব স্বচ্ছল করিতেছে।

আমি প্রাসাদ-বাতারনের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বাগানের শোভা দেখিতেছি, এমন সময় সেই চাক-
হাসিনী রমণীত্ব হাসিতে হাসিতে আমার নিকটে আসিলেন। নানাবিধ অলঙ্কারে তিনি ভূষিতা হইয়া
আদিরাছিলেন। তখন তাঁহার অবগুণ্ঠন ছিল না, স্তম্ভরা আমি প্রাণ ভরিয়া তাঁহার রূপ-শোভা নিরীক্ষণ
করিতে লাগিলাম। সতাই সুবতী নিবৃত্ত স্বন্দরী। পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসার পর, আমি প্রিয়তমার সহিত
একটি হুকোমল গাণিচার উপবেশন করিলাম। আমরা নির্জনে পরস্পরের প্রাণের কথা প্রকাশ করিতে
লাগিলাম; হৃদয়গ আত্মা দ্রব্যাদি স্তম্ভজিত করিতে লাগিল।

প্রমোদ-নিশাথ
মিলন-মাহুরী



আহারাদির পর আবার আমাদের প্রেমালোপ আরম্ভ হইল, সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের কথা শেষ হইল না।
সন্ধ্যার সময় নানারকম ফল ও উৎকৃষ্ট মদ্য আসিল। আমরা মত্তগানে রত হইলাম, স্বন্দরী দাসীগণ নৃত্য-গীতে
আমাদের আমোদ বৃদ্ধি করিতে লাগিল। প্রিয়তমা দুই একটি গান করিলেন, তেমন সঙ্গীত আমি কখন
শুনি নাই। স্বন্দরী একদিনেই আমার সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইলেন। পূর্বে কখনও কোনও
স্বন্দরীকে এমন মন প্রাণ দিয়া ভালবাসি নাই। এই নবীন স্বন্দরীকে শ্যাসদিনীরূপে পাইয়া, আমার হৃদয়
এক অকৃতপূর্ণ পুলকসরে শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার স্তম্ভা ও হুকোমল বরবপু বকে নিশীড়িত করিয়া, আমি
স্বাভাব্য কোমল অঙ্গে দেহ ঢালিয়া দিলাম। সমস্ত রাত্রি আমাদের পরম স্নেহে যেন মুহূর্তে অতিবাহিত হইল।

পরদিন প্রভাতে আমি যুবতীর নিকট বিদায় লইলাম। তাঁহার গৃহভাগ করিবার সময়, আমি যে পঞ্চাশখানি স্বর্ণমুদ্রা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, তাহা হুম্মরীর বালিশের নীচে অতি সতর্কভাবে রাখিয়া দিলাম, প্রিয়তমা তাহা জানিতেও পারিলেন না। আমি বিদায় লইবার পূর্বে চুশন-নদিরার স্রীতি উৎপাদন করিয়া যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আবার কখন আসিবে?’ আমি বলিলাম, ‘প্রাণেশ্বরী, তুমি আমার জীবনের জীবন, তোমাকে ছাড়িয়া কি অধিক কাল থাকিতে পারি? স্বর্গান্তের যে বিলম্ব; স্বর্গান্তের পর আর কোথাও থাকিব না।’ প্রমোদিনী আমার সঙ্গে হারপ্রস্থ পর্যন্ত আসিলেন।

বাজারে আসিয়া আমি একটি বাসি ও কতকগুলি উৎকৃষ্ট পাণ্ড্রব্য কিনিয়া, আমার প্রিয়তমাকে উপহার পাঠাইলাম। সমস্ত দিন আমার বৈমরিক কাজকর্ম শেষ করিয়া সাংঘকে লুপ্ত হইয়া, গর্দভারোহণে পুনর্বার আমার ননোমোহিনীর গৃহে প্রত্যগমন করিলাম। তরুণী আমাকে পূর্বদিনের স্নায় আগ্রহভরে গ্রহণ করিলেন, পূর্বদিনের স্নায় অশ্রান্ত আমোদ-প্রমোদ চলিতে লাগিল। সে দিনও আমি গোপনে হুম্মরীর বালিশের নীচে পঞ্চাশটি মোহর রাখিলাম। প্রত্যহ এই ভাবে আমাদের আমোদ-প্রমোদ চলিতে লাগিল, আমিও প্রত্যহ পঞ্চাশ মোহর হিসাবে আমার জুয়রগীর বালিশের নীচে রাখিতে লাগিলাম।

কিন্তু প্রত্যহ পঞ্চাশ মোহর হিসাবে ব্যয় করিয়া, কিছু দিনের মধ্যেই আমার ভরানক অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। আমি একবারে কপর্দকশূন্য হইয়া পড়িলাম। এ অবস্থার কি কর্তব্য ভাবিতে ভাবিতে আমি রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং একটি উৎসবস্থানে আসিয়া এক জন ধনবান ব্যক্তির একটি টাকার থলি চুরি করিলাম। সেই থলিতে টাকা আছে কি মোহর আছে, তাহা প্রথমে বুঝিতে না পারিলেও এই চৌর্য্যে আমার মনে যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার হইল। কারণ, থলিটি বেশ ভারী বোধ হইল।

সেই ধনবান ব্যক্তি কিন্তু অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার টাকার থলি চুরি গিয়াছে। তিনি আমার উপর সন্দেহ করিয়া, আমাকে এমন বেত্নাঘাত করিলেন যে, আমাকে তৎক্ষণাৎ ভূমিশয়া গ্রহণ করিতে হইল। অনেকে আমার পঞ্চাবলম্বন করিয়া সেই ব্যক্তিকে তিরস্কার করিতে লাগিল। আমি টাকা চুরি করিয়াছি, তাহা আমাকে দেখিয়া কেহই বিশ্বাস করিল না। ইতিমধ্যে এক জন কোতোয়াল সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সে সকল কথা শুনিয়া আমাকে বাধিয়া আমার পরিচ্ছদের ভিতর টাকার থলি লুকান আছে কি না, তাহা পরীক্ষার জন্ত তাহার অধীনস্থ প্রহরিগণকে আদেশ করিল। শীঘ্রই আমার কাপড়ের ভিতর হইতে চোরামাল বাহির হইয়া পড়িল, আমি লজ্জা ও অপमानে জ্ঞানশূন্য হইলাম।

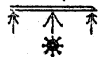
বাহার টাকা, তাঁহাকে টাকার সন্ধ্যা জিজ্ঞাসা করিবারাত্র তিনি বলিলেন, ‘থলিতে আমার হুড়ি টাকা আছে।’ কোতোয়াল থলি খুলিয়া দেখিল, সত্যই হুড়ি টাকা আছে। তখন আমার অপরাধ সম্বন্ধে আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। আমাকে অপরাধ স্বীকার করিতে হইল। অপরাধ স্বীকার করিবার পর বিচারকের আদেশে আমার দক্ষিণ হস্তের মনিবন্ধ পর্যন্ত ছিন্ন করা হইল। যে হস্তে চুরি করিয়াছিলাম, জন্মদ সেই হস্ত কাটিয়া দিল। বিচারক আমার দক্ষিণ পা-খানিও ছেদন করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি বাহার টাকা চুরি করিয়াছিলাম, তাঁহার নিকট অল্পমর-বিনয় করার তিনি বিচারকে অল্পরোধ করিয়া, আমাকে সেই দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেন।

কোতোয়াল চলিয়া গেলে, সেই ধনবান ব্যক্তি আমাকে বলিলেন, ‘ভাই, আমি বুঝিয়াছি, নিদারুণ অর্থকষ্টে পড়িয়াই তোমার স্নায় ভগ্নলগ্নান এই হীনকর্ম করিয়াছিল, তুমি আমার টাকার তোড়া লইয়া যাও, আমি ইহা তোমাকে দান করিলাম। এই টাকার জন্ত তোমাকে যে নিদারুণ কষ্ট ও ক্রটি সহ্য করিতে হইত,

প্রেমের দ্বারে
সর্বস্বান্ত



প্রেমদ্বারের
যোগ্য পুরস্কার



সে জ্ঞান আমি আন্তরিক চূষিত হইয়াছি।” আমি অতি কষ্টে আমার বাসায় ফিরিয়া আসিলাম, রক্তাক্তাবে আমার দেহ অবসর হইয়া পড়িল।

মের মদিরায়
ঘুণা-উপশম
প্রয়াস

অত্যপার ছিন্নহস্তে আমার প্রিয়তমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ঘাইব, সে প্রবৃষ্টি আমার হইল না। বুলিলাম, সে যখন আমার ছিন্নহস্তের কারণ অবগত হইবে, তখন সে নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু পরদিন মন প্রবোধ মানিল না, গুপ্তপথ দিয়া আমার প্রাণাধিকার প্রদোদ-মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। উপস্থিত হইয়া আমি দাঁড়াইতে পারিলাম না, মাথা ঘুরিয়া উঠিল, অবিলম্বে আমি একটি শোকার উপর শয়ন করিলাম।

আমি গৃহে আসিয়াছি, সংবাদ পাইয়া আমার প্রিয়তমা সেই কক্ষে ছুটিয়া আসিলেন; আমাকে বলিলেন,



“প্রাণনাথ! তোমাকে এত

কাহিল দেখিতেছি কেন?

তোমার কি হইয়াছে, শীঘ্র

খুলিয়া বল।” আমি সত্য

কথা গোপন করিয়া বলিলাম,

“বোধে ঘুরিয়া বড় মাথা ধরি-

য়াছে, মাথার ব্যথায় অত্যন্ত

কাতর হইয়াছি।” আমার

প্রেয়সী বলিলেন, “আমার মাথা

থাও, সত্য কথা বল, তুমি যে

সত্য কথা গোপন করিতেছ,

তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি।”

আমি কেন উত্তর করিলাম

না, আমার চক্ষু দিয়া অবিরল-

ধারে অশ্রু বরিতে লাগিল।

আমি সমস্ত দিনের মধ্যে

আর তাহার সহিত ভাল

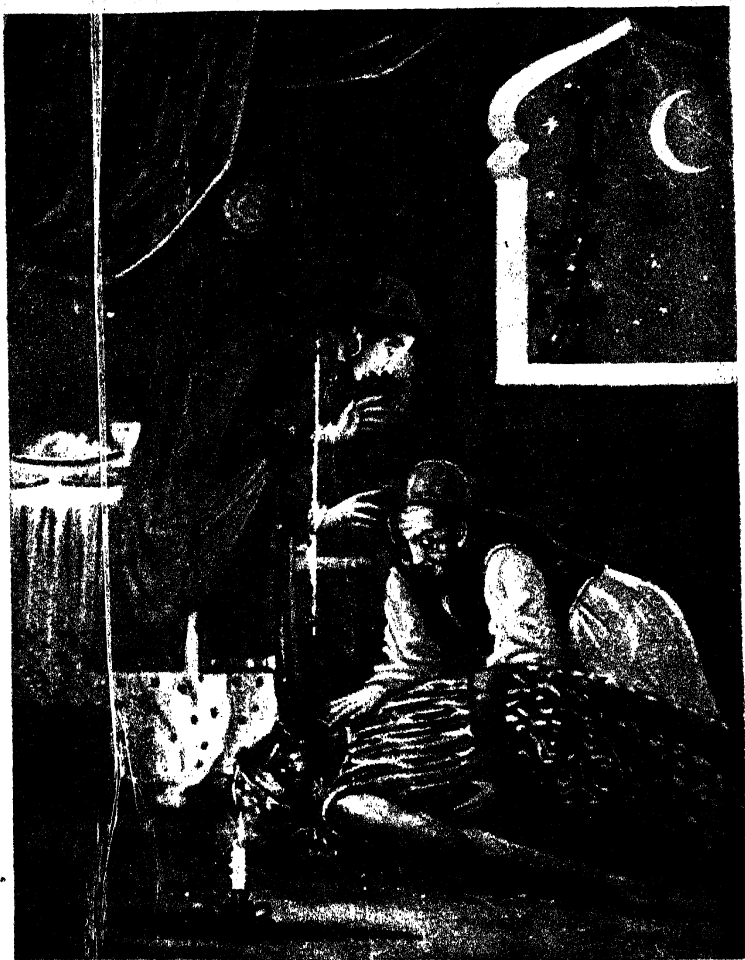
করিয়া আলাপ করিতে পারি-

লাম না। সন্ধ্যাকালে ভৃত্যগণ

ধাবার দিয়া গেলে, যুবতী কিছু

আহারের জ্ঞান আমাকে অস্বপ্নে করিলেন। কিন্তু কিছু আহার করিতে হইলেই আমাকে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিতে হইবে, আর কোন কথা গোপন রহিবে না, সেই জ্ঞান আমি বলিলাম, “আমার একটুও ক্ষুধা নাই, আমি কিছু খাইব না।” প্রিয়তমা আমার মুখের কাছে এক পাত্র উৎকৃষ্ট মজা ধরিয়া বলিলেন, “ইহা খাও, অস্বপ্ন মারিয়া বাইবে, শরীরেও বল হইবে।” আমি বাম হস্ত বাহির করিয়া মজাপাত্র ধরিলাম। স্ত্রী বলিলেন, “তুমি বাম হস্তে পাত্র ধরিতেছ কেন? দক্ষিণ হস্তে তোমার কি হইয়াছে?” আমি বলিলাম, “অত্যন্ত জ্বলিয়াছে, ভগ্নানক বেদনা।” তিনি আমায় হৃদয়বিদারক ভাষায় বলিলেন, “আমি জানি তোমার পক্ষিপক্ষী অত্যাচারে হতভম্ব হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিলাম না। মজাপাত্র শরীরে ক্রিয়া হইয়াছে, আমি নিশ্চিত হইলাম, এক ঘুরে রাহি কাটিয়া গেল।

ফুল
কমল
অশ্রু
জলে
ভাসিল



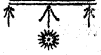
হইল। আর অল্পকাল পরেই ভোর হইবে, অতঃপর প্রান্তঃস্থান সারিবার উদ্দেশে সে টলিতে টলিতে হানামের দিকে চলিল। এমন সময় স্বপ্নাকারে সে দেখিতে পাইল, একজন লোক নীরবে পাড়াইয়া দহিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে একব্যক্তি তাহার মাথার চুপি খুলিয়া লইয়াছিল। খুশান ভাবিল, এই চোর তাহার বস্ত্রাদি চুরি করিবার অভিপ্রায়ে পাড়াইয়া আছে। মাতাল খুশান ক্রোধে অধীর হইয়া, কুজের বন্দোবদেশে মৃত্যুবাণত করিল। কুজের দেহ ভূমিতলে পড়িয়া গেল। চোরের দেহের উপর বসিয়া মাতাল, উচ্চৈঃস্বরে লোক ডাকিতে লাগিল।

তাহার চাঁৎকার শুনিয়া, একজন প্রহরী ঘটনাকালে আসিয়া দেখিল যে, এক জন খুশান এক মূল্যমানকে প্রহার করিতেছে। প্রহরী বলিল, 'তুমি এক জন মূল্যমানকে কেন মারিতেছ?' খুশান বলিল, 'এই লোকটা মানাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাই আত্মরক্ষার জন্য উহাকে মারিতেছি।' প্রহরী বলিল, 'আর মারিও না, উহাকে ছাড়িয়া দাও।' তারপর তাহাকে তুলিতে গিয়া প্রহরী দেখিল, লোকটা মরিয়া গিয়াছে। তখন সে খুশান ও কুজকে লইয়া, দেশের কাজীর কাছে গেল।

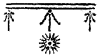
কাজী প্রহরীর নিকট সকল কথা অবগত হইয়া, খুশানকে বলিলেন, 'তুমি এই কুজকে হত্যা করিয়াছ, এজন্য তুমি প্রাণদণ্ড হইবে।' খুশান বলিল, 'জা ভগবান! আমি একটি দুখি মারিয়াছি, তাহাতেই লোকটা মরিয়া গেল।' কিন্তু বিচারে তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দহিত হইল না। কুজকে আদেশানুসারে মাদাময়ে দাঁদীক প্রস্তুত হইল। জলাদ খুশানটির গলদেশে রজু আরোপ করিয়া, তাহাকে উপরে টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় মূল্যমানের ভাগুরী সেখানে উপস্থিত হইয়া কাজীকে বলিল, 'ছজুর, উহাকে দাঁদী দিবে না। আমি কুজকে হত্যা করিয়াছি।' কাজী এই সংবাদ শ্রবণে বিস্মিত হইলেন। তখন ভাগুরী সকল কথা খুলিয়া বলিল। কাজী এই কথা শুনিয়া খুশান মদাগরকে ছাড়িয়া দিয়া, তাহার পরিবর্তে উক্ত ভাগুরীকে দাঁদীকাঠে তুলিবার চক্রম দিলেন। ভাগুরীর গলায় কাঁস দেওয়া হইবে, এমন সময়ে ইহা চিকিৎসক আসিয়া বলিল, 'মহাশয়, আপনারা যে মূল্যমানকে অপরাধী স্থির করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতেছেন, প্রকৃত পক্ষে তাহার কোন অপরাধ নাই, এই নরহত্যার জন্য আমিই দায়ী।' অনন্তর চিকিৎসক তাহার কাঁঠিকাহিনী দৃষ্টিতে বর্ণনা করিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজী ভাগুরীকে ছাড়িয়া চিকিৎসকেরই প্রাণদণ্ডের অমূল্য প্রদান করিলেন, এমন সময় সেই জনতার ভিতর হইতে পুর্বেই দরজী আসিয়া করযোড়ে কহিল, 'আপনারা একটু নিরীহ লোকের প্রাণদণ্ড করিয়া মহাপাপ করিবেন না। এই কুজের মৃত্যুর জন্য যদি কাহারও দণ্ড হওয়া উচিত হয়, তবে সে দণ্ড আমারই প্রাপ্য।'—দরজী কুজের সমস্ত কথা বিবৃত করিল। সকল কথা শুনিয়া কাজী বলিলেন, 'দেখা যাইতেছে, অপর কেহই দোষী নহে—এই বণিক, ভাগুরী ও চিকিৎসককে ছাড়িয়া, অবিলম্বে দরজীর প্রাণদণ্ড হউক।' দরজী বধাংশের উপর উঠিল।

এ দিকে এই সমস্ত ঘটনা মূল্যমানের কর্ণগোচর হইল। এই বিষয়কর বাপায় অবগত হইয়া, তিনি তৎক্ষণাত কাজীকে উক্ত কয় ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া দরবারে উপস্থিত হইবার আদেশ করিলেন। তখনও দরজীর প্রাণদণ্ড সম্পন্ন হয় নাই। সকলে দরবারে উপস্থিত হইলে, মূল্যমান সমস্ত বিবরণ অবগত হইয়া, তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তার পর বলিলেন, 'এমন বিপত্তি-কাহিনী আমি কখনও শুনি নাই। তোমাদের মধ্যে কেহ কি এমন ঘটনার কথা শুনিয়াছে?' এমন সময়েই কুতাজলিপুটে বলিল, 'ছজুরের অমূল্য হইলে আমি যে গল্প শুনি, তাহা বর্ণনা করিতে পারি; উহা আমারই জীবনে ঘটয়াছিল।' মূল্যমান তাহাকে বলিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

খুশানের
দেশা ছুটি!



কাজীর বিচার-
প্রহেলিকা!



লোভনীর
কাঁদী-বহন



কৃত

১৮৮১-

১৮৮২

১৮৮৩

১৮৮৪

১৮৮৫

১৮৮৬

১৮৮৭

১৮৮৮

১৮৮৯

১৮৯০

১৮৯১

১৮৯২

১৮৯৩

১৮৯৪

১৮৯৫

১৮৯৬

১৮৯৭

১৮৯৮

১৮৯৯

১৯০০

১৯০১

১৯০২

১৯০৩

১৯০৪

১৯০৫

১৯০৬

১৯০৭

১৯০৮

১৯০৯

১৯১০

১৯১১

১৯১২

১৯১৩

১৯১৪

১৯১৫

১৯১৬

১৯১৭

১৯১৮

সদাগর বলিল, “হে শক্তিমান নরায়ণ! আমার জগন্মুখ মিশরের কার্যে নগরে। আমার পিতা কষ্ট জাতীয় স্থান। তিনি বাবসা বাণিজ্য করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি শৈশবক বাবসা অবলম্বন করিলাম। এক দিন দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময় এক প্রিয়দর্শন যুবা আমার দোকানে গর্দভারোহণে আসিল। সে দেখিতে যেমন সুগন্ধ, তাহার পোষাক-পরিচ্ছদও তেমনি বহুমূল্য। সে আমাকে তৃতীয় নমুনা দেখাইয়া বলিল যে, আমি উহা ক্রয় করিতে পারি কি না। আমি সম্মত হইলে, সে আমাকে বলিল যে, এক দিন সকালে তাহার বাড়ীতে গেলে সে সমস্ত ভুট্টা আমাকে প্রদান করিবে। মাল বিক্রয় হইয়া গেলে, পরে সে আমার নিকট আসিরা, তাহার প্রাপ্য মূল্য লইয়া যাইবে। লাভের অংশ আমি রাখিতে পারি। আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া নমুন লইয়া বাজারে গেলাম। লাভের অংশ আমি রাখিতে দ্রব্য বিক্রয় করিতে চাহিয়াছিল, বাজারে তদপেক্ষা শতকরা দশ টাকা দর বেশী পাইলাম।

বিলম্ব দশ টাকা লাভ হইল দেখিয়া আমি বড় খুশী হইলাম, সদাগর যুবকের সহিত দেখা করিতে চলিলাম, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে আমাকে তাহার গুদানে লইয়া গেল; আমি দেখানে সমস্ত মাল গুন করিলাম; সর্বসমেত দেড়শত বস্তা মাল হইল। গাধার পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, আমি তাহা বিক্রয় করিয়া আসিলাম, আমি আমার নিজের লাভের অংশ রাখিয়া, সদাগরকে তাহার প্রাপ্য টাকা প্রদান করিতে গেলে সে বলিল, “আমার এখন টাকার আবশ্যক নাই। তুমি তোমার কাছে রাখিয়া দাও, দরকার পড়িলে তোমার নিকট হইতে আমি লইব।”—সদাগরের এই বিচিত্র ব্যবহারে আরও খুশী হইয়া, আমি বাড়ী ফিরিলাম।

এক মাল পরে সদাগর আমার নিকটে আসিয়া, তাহার প্রাপ্য টাকা চাহিল। সদাগর গাধা চড়িয়া আমার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিল। আমি বলিলাম, “টাকা ঠিক করাই আছে, কিন্তু আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, গাধা হইতে নামিয়া বিশ্রাম ও আহাতি দিওন।”—সদাগর বলিল, “না, এখন আমার বিশ্রামের সময় নহে, এখনই আমাকে কার্যান্তরে যাইতে হইতেছে, তুমি টাকাগুলি বাহির করিয়া রাখ, আমি আসিয়াই তাহা লইব।”—সদাগর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল, এক মাসের মধ্যে আর সে ফিরিয়া আসিল না।—আমি মনে মনে ভাবিলাম, এই যুবক আমাকে অত্যন্ত বিশ্বাস করে দেখিতেছি, আমার সহিত ইহার বিশেষ পরিচয় নাই, তথাপি সে আমার হাতে যাড়ে চারি হাজার টাকা অনায়াসে বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছে; অল্প লোক হইলে নিশ্চয়ই ভাবিত, আমি টাকাগুলি লইয়া পলায়ন করিব। তৃতীয় মাসের শেষে সদাগর বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, আমার গৃহে উপস্থিত হইল। আমি তাহাকে দেখান্যাত্ন তাহার নিকট গিয়া বলিলাম, “আমি আপনার টাকা ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি, নামিয়া আসুন, টাকাগুলি গণিয়া তোঁড়া সমেত আপনার হাতে প্রদান করিতেছি।”—সদাগর বলিল, “সে জ্ঞান ভূমি এত ব্যস্ত হইও না, আমার বিশেষ তাড়াহাড়ি নাই; আমি জানি, ভাল লোকের হাতেই আমার টাকা আছে। আমার হাতে এখন যে টাকা আছে, তাহাতেই কাজকর্ম চলিতেছে, অর্থাৎ হইলে তোমার নিকট আসিয়া টাকা লইয়া যাইব। এক সময়ে পরে আমার টাকার দরকার হইতে পারে, সেই সময় আসিব, এখন বিদায়।”—সদাগর তাহার গর্দভের পৃষ্ঠে বেত্রাবৃত করিয়া, কয়েক মূহুর্তমধ্যে আমার দৃষ্টিগত হইতে অদৃষ্ট হইল। আমি তখন মনে করিলাম, এ লোকটি ভ'টাকা লইতে ক্রমেই বিলম্ব করিতেছে, পরের হাতে কে এত দিন অনর্থক টাকা ফেলিয়া রাখে? দেখিতেছি, ইহার ব্যবসায়বুদ্ধি এখনও পরিপক্ব হয় নাই! এই টাকা ব্যবসারে লাগাইয়া আমি ৩ পরমা উপাধ্বন করি না কেন?

আমার অল্পমান মিথ্যা হয় নাই, আর এক বৎসর কাল পর্যন্ত সদাগরের কোন সদান পাইলাম না। “এক বৎসর পরে সে পূর্ববৎ পরিচ্ছদে ভসি হইয়া, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিল, কিন্তু তাহাকে কিছু বিনয় বোধ হইল। আমি তাহাকে আমার গৃহে পরীক্ষণ করিয়া আতিথ্যগ্রহণের জন্ত অনুরোধ করিলাম। সদাগর সম্মত হইয়া বলিল, “আমি তোমার গৃহে যাইতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমার জ্ঞাত তুমি যে কতকগুলি অর্থব্যয় করিবে, তাহা হইবে না।”—আমি তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, তাহাকে আমার গৃহে আনিলাম। সদাগর যথাকালে আমার সহিত আহার করিতে বসিল, আহারকালে সদাগরের একটি বিশেষত্ব দেখিলাম, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা একবারও সে খাতদ্রব্য স্পর্শ করিল না, বাম হস্তেই আহারকার্য সম্পন্ন করিল। আমি এরূপ ব্যবহারের কোনই কারণ বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু কি কারণে সে এরূপ করে তাহা জানিতে বড়ই উৎসুক হইলাম।

অবশেষে আমি তাহাকে তাহার বাম হস্তে আহারগ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার কথা শুনিয়া সদাগর একটি দাঁব নিখাদে তাগ করিল এবং কোন উত্তর না দিয়া পরিচ্ছদের ভিতর হইতে তাহার দক্ষিণ হস্তটী বাহির করিয়া আনাকে দেখাইল। আমি সবিস্ময়ে দেখিলাম, তাহার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধ পর্যন্ত কঙ্কিত—মৃষ্টির অংশ নাই।

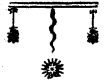
আমার কৌতূহল বৃদ্ধি হইল, আমি সবিনয়ে সদাগরকে বলিলাম, “আপনার দক্ষিণ হস্ত কিরূপে ছিন্ন হইল, তাহা জানিবার জন্ত আমি বড়ই উৎসুক হইয়াছি। যদি আপনার বিশেষ আপত্তি না থাকে, তাহা হইলে আমার কৌতূহল দূর করুন।”—আহারা দি শেষ হইলে সদাগর অশ্রুপূর্ণলোচনে আমাকে তাহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

সদাগর যুবক আমাকে বলিল, “আমার বাসস্থান বোঙ্গাদ নগরে। আমার পিতা বোঙ্গাদেশের মধ্যে এক জন গণ্যমান্য ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। আমি কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া, মিসর দেশের অনেক অদ্ভুত কাহিনীর কথা সর্বদা শ্রবণ করিতাম। ঐ সকল অদ্ভুত কথা শুনিয়া শুনিয়া, আমার মনে মিসরগমনের ইচ্ছা বশবর্তী হইয়া উঠিল; এ বিষয়ে আমি আমার পিতার প্রতি প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু তিনি আমার মিসরযাত্রার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন না। উহার কিছু দূর পরে পিতার মৃত্যু হইলে, আমি স্বাধীন হইয়া পুনর্ব্বার কারো-যাত্রার সংকল্প করিলাম; বোঙ্গাদ ও মোসন নগরে উৎসর্গ বহুবিধ মূল্যবান পণ্যদ্রব্য লইয়া, কারো নগরের অভিমুখে বাণিজ্যযাত্রা করিলাম।

কারো নগরে উপস্থিত হইয়া, আমি মেসরোর বা সাহেবের বাড়ীতে বাসা লইলাম। উটের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া, যে সকল জিনিসপত্র আনিয়াছিলাম, তাহা একটি শুদাম ভাড়া করিয়া তথায় সঞ্চিত রাখিলাম। ইচ্ছা ছিল, একবারে জিনিসগুলি বিক্রয় করিয়া ফেলিব, কিন্তু দেখিলাম, সে ভাবে বিক্রয় করিলে লাভ হওয়া দূরের কথা, আসল দামও উঠিবে না; অগত্যা কোন বন্ধুর পরামর্শে আমি খুচরা হিসাবে হানীর বাসদাঙ্গিণকে তাহা বিক্রয় করিলাম; নগদ দাম পাইলাম না, তাহারার রীতিমত রসিদ দিয়া জিনিস লইলেন, কথা থাকিল, তাহারার জিনিস বিক্রয় করিয়া টাকা দিবেন।

পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিয়া, আমি নানাবিধ আনোদে লিপ্ত হইলাম। আমার সমানবয়স্ক কয়েকটি মিসরীর যুরকের সহিত আমার বন্ধু হইয়াছিল, আনোদে করিয়া কিছু অবসর পাইলে আমি বাসদাঙ্গিণের দোকানে গিয়া, তাহাদের খাতাপত্র পরীক্ষা করিতাম, আমার জিনিস যাহা বিক্রয় হইত, তাহার টাকাও লইয়া আসিতাম।

শ্রেমলীলার
পুরস্কার-
সহস্ত বিরুতি



মিসরের
বাণিজ্য-শ্রেমাদে

মিসরের
বাণিজ্য-শ্রেমাদে

স্বপ্নের চক্ষে
প্রেমের ভাষা



এক সোমবারে আমি কারগোর বাজারে বরেন্দীন নামক একজন ব্যবসায়ীর দোকানে বসিয়া আছি, এমন সময় একটি সম্ভ্রান্তমহিলা মূল্যবান পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া, একটি পরিচারিকার সহিত দোকানে প্রবেশ করিয়া আমার নিকট উপবেশন করিলেন। আমি রমণীর সৌন্দর্যদর্শনে পুলকিত ও মুগ্ধ হইয়া, তাঁহার পরিচয় জানিবার জন্ত ব্যাঘ্র হইলাম। তাঁহার অবগুষ্ঠনের ভিতর দিয়া ক্রমবর্ধিত আগ্রহ চক্ষু ছুটি একবার দেখিয়া হইলাম, এমন স্বন্দর চক্ষু কখনও দেখি নাই, তাঁহার মধুর স্বর শুনিয়া আমার প্রাণ অবীর হইয়া উঠিল।

রমণীটি সেই দোকানে কিছু সওদা করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার কিছু বেশী কাপড়ের প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোন কাপড়ই তাঁহার মনোনীত হইল না। অবশেষে দোকানী তাঁহাকে একখানি অতি উৎকৃষ্ট বস্ত্র দেখাইয়া বলিল, 'ইহা আপনার পছন্দ না হইলে আর উপায় নাই, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র আপনি কারগোর বাজারে খুঁজিয়া পাইবেন না।'—রমণী বস্ত্রখানি দেখিয়াই পছন্দ করিলেন; দোকানদার দাম বলিয়া, এগার শত টাকা! কিন্তু রমণীর নিকট টাকা ছিল না, তিনি সেই দামেই কাপড় কিনিতে সম্মত হইয়া কাপড়খানি লইয়া যাইতে চাহিলেন;—বলিলেন, পরদিন দাম আনিয়া দিবেন। দোকানী রমণীর কথা শুনিয়া সন্নিহিত বলিল, 'ঠাকুরাণি, এ জিনিষ আমার হইলে, আপনার কথা অম্বলারে এ জিনিষ আমি অন্যায়ে ছাড়িয়া দিতে পারিতাম; একদিন বিলম্বে দাম পাইলেও কোন ক্ষতি হইত না, কিন্তু এই জিনিষ আমার নহে, ঐ যে ভদ্রলোকটিকে দেখিতেছেন, কাপড় উহারই; আজ আমি বাহা বিক্রয় করিব, তাহার হিসাব শেষ করিয়া সমস্ত টাকা উহাকে প্রদান করিব, একজন অসীকারে আমি এই সকল জিনিষ লইয়াছি।' দোকানী রমণীর অনুরোধে বস্ত্রখানি ছাড়িয়া না দেওয়াতে রমণী অত্যন্ত অবমানিত ও বিরক্ত হইয়া, দোকানীকে অনেক কটুবাক্য বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ দোকান হইতে উঠিয়া প্রস্থান করিতে উদ্বৃত্ত হইলেন।

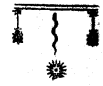
প্রবাসোক্তা
অভিমানিনী



বলিয়াছি, রমণীর রূপে আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম। স্বন্দরী কাপড় না পাইয়া উঠিয়া যাওয়াতে আমি চঞ্চল হইলাম; তাঁহাকে ডাকিয়া বসাইলাম, দোকানীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এগার শত টাকার কম মূল্যে সে সেই বস্ত্র বিক্রয় করিবে না, ছাড়ার টাকা সে আমাকে প্রদান করিবে, একশত টাকা লাভ করিবে। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তুমি আমার নামে বরচ লিখিয়া লও, তোমার লাভের জন্য নগদ এক শত টাকা দিতেছি, কাপড়খানি তুমি ইহাকে প্রদান কর।'—দোকানী আমার প্রস্তাবে আর আপত্তি করিয়া 'না, কাপড় স্বন্দরীর হস্তে প্রদান করিগ। সৌন্দর্য্যবাহী' সুমধুর হাসি হাসিয়া, আমাকে অশেষ দয়াদ করিলে, আমি তাঁহাকে বলিলাম, 'দানের জন্য আপনি বাস্তব হইবেন না, কাল পরন্তু যে দিন হয় পাঠাইয়া দিবেন, আর যান আপনি অম্বগ্রহ পূর্ব্বক ইহা আমার প্রদত্ত উপহার বলিয়া গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি যৎপদোনাতি অম্বগ্রহীত হইব।' স্বন্দরী এবার মুক্তকণ্ঠে আমার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; দেখিলাম, তিনি আমার ব্যবহারে অত্যন্ত প্রকৃত হইয়াছেন; সে আনন্দের উচ্ছ্বাস তাঁহার স্বন্দর চোখে যেন বিদ্যুৎ-তরঙ্গ প্রবাহিত হইল।

সৌন্দর্য্যবাহী প্রকৃত্য দর্শনে আমি উৎকর্ষ হইয়া, তাঁহার নিকট একটি প্রস্তাব করিতে সাহসী হইলাম;—বলিলাম, 'আপনি যদি অম্বগ্রহ পূর্ব্বক আপনার অবগুষ্ঠন খুলিয়া, একবার আপনার স্বন্দর মুখখানি দেখিতে যেন, তাহা হইলে মনে করিব, আমি মহা সৌভাগ্যবান,—আপনি স্বদ সময়ে সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়াছেন।'





যখন আমি নিম্নিত ছিলাম, সেই সময় যুবতী কোতুহলবশে আমার পরিচ্ছদের ভিতর হইতে আমার দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া দেখিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে আমি জাগিয়া দেখিলাম, স্বন্দরী অত্যন্ত বিম্ব হইয়াছেন, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চক্ষু ছুটি ফুলিয়া উঠিয়াছে। তিনি আমাকে আমার অসুখ-শয্যে আর কোন প্রশ্ন করিবেন না। যুবতী প্রাণপণে আমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, তাঁহার শুশ্রূষা-নৈপুণ্যে আমি কিছু দিনে সুস্থ হইয়া উঠিলাম। অবশেষে আমি একদিন বিদায় প্রার্থনা করিলে যুবতী বলিলেন, 'এ অবস্থার আমি তোমাকে কখনই ছাড়িয়া দিতে পারিব না। আমি বুঝিতেছি, তোমার এই বিপদের একমাত্র কারণ আমি; তোমার এই যন্ত্রণা ও কষ্ট দেখিয়া আমি যে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিব, সে রূপ আশা করি না, আমার বিবরণসম্পত্তি বাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করিয়া যাইতেছি।' এই বলিয়া যুবতী সহরের কাজীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কাজী আসিলে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "এই যুবককে আমি ভালবাসি। ইহার সহিত আমার পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত করিয়া আপনার কর্তব্য পালন করুন। আমার যথাসম্ভব এখন ইহার।' কাজী যথার্থি আমাদের উদ্বাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দিলেন। যুবতী তাঁহার সঙ্গ আমার নামে লেখাপড়া করিয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তিনি পুনঃপুনঃ বলিলেন, 'তুমি জান না প্রিয়তম, আমি তোমাকে কত ভালবাসি, আমার সঙ্গের তোমারই।' তিনি আমার হস্তে তাঁহার সিন্দকের চাবী প্রদান করিলেন। আমার দক্ষিণ হস্তের চিত্তার যুবতী দিন দিন ক্রীণ হইতে লাগিলেন, অবশেষে পাঁচ ছয় সপ্তাহ পরেই আমার প্রিয়তমা আমাকে চিরজুখে ভাসাইয়া ইহলোক পরিভাগ করিলেন।

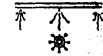
যুবক এই পরিস্থিতি বলিয়া আমাকে বলিলেন, "আমি বাম হস্তে কেন আহার করিতেছি, তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছেন, এজন্য আশা করি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি আপনার সাধুতার জন্য আপনার নিকট বিশেষ বাধিত আছি। আমার সহিত আপনার বন্ধুত্বের উপহারস্বরূপ আমি আমার ভূতাবিক্রমলক্ষ টাকাগুলি আপনাকে প্রদান করিলাম। আমি আমার প্রিয়তমার মৃত্যুর পর কারো নগরে বাস করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, এই নগর পরিত্যাগ করিয়া যাবৎ সঙ্গ করিয়াছি। যদি আপনি আমার সহিত দেশান্তরে গমন করেন, তাহা হইলে দুই বন্ধুতে একত্র বাবসার-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হই।" আমি যুবকের বন্ধুতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

অনেক দেশ পর্যটন করার পর এখানে আসিয়া, আমার বন্ধু পার্শ্বে গমন করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, কারণ, সেখানে বাস করিতে তাঁহার বাসনা বলবতী হইয়াছিল, আমি এই নগরেই সেই সময় হইতে বাস করিতে লাগিলাম। ইহাই আমার উপজ্ঞান, এ কাহিনী কি স্থলতান অতি অদ্ভুত বলিয়া মনে করেন না?

কাসগারের স্থলতান খুতান সদাগরের কথা শুনিয়া সক্রোধে বলিলেন, "যে নিকোঁধ, আমার কুজু ভাঁড়ের অপূর্ণ মৃত্যুকাহিনীর সহিত একটা যুবতীর প্রণয়কাহিনীর তুলনা করিতে চাস? তুই একটা গদ্বল, আমি তোদের চারিজনকেই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিব।"

স্থলতানের এই কথা শুনিয়া, তাঁহার ভাণ্ডারী ভয়ে তাঁহার চরণগ্রাস্তে নিপতিত হইয়া বলিল, "জাহাপনা! ক্রোধ সযশ করুন, আমি আপনার কুজু ভাঁড়ের মৃত্যু-রহস্ত অপেক্ষা অনেকাংশে অদ্ভুত ও রোমাঞ্চকর একটা কাহিনী জানি, আপনি দয়া করিয়া তাহা শ্রবণ করিলে দৃষ্টচক্ষে আমাদের চারিজনকেই মার্জনা করিবেন।"

স্থলতান বলিলেন, "আচ্ছা, তোর গল্প বল—তুনি।" ভাণ্ডারী তখন বলিতে আরম্ভ করিল।—



জীবন সফল মনে করিয়াছিলাম, তুচ্ছ টাকার কথা তখন মনেই আসে নাই। দোকানদারগণ শীঘ্র টাকা না পাইলে আমাকেই ধরিলে, তখন আমি কোথা হইতে এত টাকা দিব ভাবিয়া, বড়ই চিন্তিত হইলাম। আবার আমার মনে সাহস আসিল, এমন অল্পমাত্রা সুন্দরী কখনই আমার সঙ্গে প্রবেশনা করিবেন না।

ক্রমে একমাস অতীত হইল, যুবতীর আর সাফাং পাইলাম না, তাহার কোন সন্ধানও করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার আশঙ্কা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দোকানদারেরা তাহাদিগের প্রাণ্য টাকা কর্তৃক অত্যন্ত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিল। তখন অগত্যা আমি আমার দোকানের জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া, তাহাদের দেনা-পরিশোধের সঙ্কল্প করিলাম। কিন্তু সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার পূর্বেই একদিন প্রভাতে



ঘটিত
কথা
স্তম্ভ



রমণীকে পূর্ববৎ পরিচরিকা ও খোজা সঙ্গে লইয়া, গর্দভারোহণে আমার দোকানে প্রবেশ করিতে দেখিলাম; দেখিয়া আমার মনে আনন্দের সীমা রহিল না। কয়েক মুহূর্তমধ্যে রমণী আমার হস্তে মোহরের তোড়া প্রদান করিলেন। যুবতীর প্রতি আমার বিশ্বাস ও ভালবাসা সহস্রগুণ বদ্ধিত হইল।

সুন্দরী সেদিন আমাকে আরও নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অবশেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি বিবাহ করিয়াছি কি না? আমি তখন একটু সাহস পাইলাম। যুবতীর সহচর খোজা মোহরগুলি গণিতে গণিতে আমাকে বলিল, “আপনি আমার মনিবকে ভালবাসেন, তাহা আমরা বুঝিয়াছি, আপনি সে কথা প্রকাশ করেন না কেন? আমাদের মনিব ঠাকুরাণী কিন্তু আপনার

পীরিতে একবারে হারভুড় খাইতেছেন। তিনি যে বাজারে আসেন, সে কেবল জিনিস কিনিবার জন্ত নহে, আপনাকে দেখাই তাহার এখানে আসিবার প্রদান উদ্দেশ্য। আপনি প্রত্যাব করিলে আমার ঠাকুরাণী আপনাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইবেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।”

১৬

১৬

আমি খোজার হস্তে গোপনে কয়েকটি টাকা দিয়া বলিলাম, “জামার প্রতি তোমার ঠাকুরাণীর কিরূপ ভাব, তাহা জানিয়া আমাকে বলিও।” খোজা এক দিন আসিবে বলিয়া আমাকে সম্মানে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। সুন্দরীও আমার দোকান পরিত্যাগ করিলেন। আমি দোকানদারদের প্রাণ্য টাকা চুকাইয়া দিলাম।

কয়েক দিন পরে খোজা আমার দোকানে প্রত্যাগমন করিয়া, আমাকে বলিল যে, যুবতী আমার বিরহে পাগলিনীপ্রায় হইরাছেন, যদি তিনি তাঁহার ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে এত দিন আমাদের মিলন হইত। কিন্তু তিনি স্বাধীন নহেন, তিনি বোন্দানোষিত খালিফের প্রিয়তমা সহচরী, খালিফ-মহিষী তাঁহাকে একনগ্ন চক্ষুর আড়াল করিতে পারেন না। যুবতী খালিফ-মহিষী জোবেদীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। অবশেষে যুবতী খালিফ-মহিষীর নিকট আমাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাতে জোবেদী বলিয়াছেন, “আমার ইহাতে আপত্তি নাই, তুমি বিবাহ করিয়া সুখী হও, সে সুখের কথা, কিন্তু তুমি যাহাকে বিবাহ করিতে চাও, সে তোমার যোগ্য পতি হইবে কি না, তাহা জামিতে চাই।” আমাকে দেখিয়া মহিষী জোবেদীর মত হইলে আর বিবাহে আপত্তি নাই বুঝিলাম, আমাকে খালিফের প্রাসাদে বাইতে হইবে। আমি খোজাকে বলিলাম, “তুমি বাছা বলিবে, আমি তাহাই করিব।” খোজা বলিল, “তোমাকে খালিফের প্রাসাদে জেনানামহলে বাইতে হইবে, সেখানে কোন পুরুষের গমনের অধিকার নাই, মহারাজী জোবেদীর আদেশে আমি অতি গোপনে তোমাকে সেখানে লইয়া যাইব। কিন্তু তোমাকে বিশেষ সাবধানে থাকিতে হইবে, নতুবা, তোমার শির যাইবার আশঙ্কা আছে।”

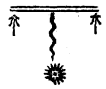
পীরিতের জ্ঞান অনেকই প্রাণ দেয়, আমিও না হয় বিপদে পড়িব, না হয় প্রাণ যাইবে, তবু এ রূপসী যুবতীর আশা ছাড়িব না, এই ভাবিয়া আমি খোজার প্রভাবে সম্মত হইলাম। খোজা তখন বলিল, “টাইগ্রস্ নদরী তীরে খালিফ-মহিষী জোবেদীর যে প্রার্থনা-মন্দির আছে, আজ ঠিক সন্ধ্যাকালে তুমি সেই মন্দিরে উপস্থিত হইয়া প্রতীক্ষা করিবে; যতক্ষণ নমাজ শেষ না হয়, ততক্ষণ তোমাকে তথায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে।”—তাহাই হইল, আমি প্রার্থনা-মন্দিরে গিয়া প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

নমাজ শেষ হইলে দেখিলাম, সন্ধ্যার অন্ধকারে একখানি নৌকা তীরবেগে তীরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছে; দেখিলাম, নৌকার দাঁড়ী সকলেই খোজা, খোজার নৌকা হইতে নামিয়া মসজিদের মধ্যে কতকগুলি সিদুক লইয়া গেল। আমার পরিচিত খোজাটিকেও আমি তাহাদের মধ্যে দেখিলাম। খোজার দল নামিলে আমার চিত্তহারিণী যুবতীও সেই নৌকা হইতে নামিয়া আসিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, “এখানে গল্প করিয়া আমাদের সময় নষ্ট করিবার অবসর নাই।” সুন্দরী একটি সিদুক খুলিয়া আমাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে বলিলেন; মধুরস্বরে কহিলেন, “প্রিয়তম, তোমার কোন ভয় নাই; আমি যাহা করিব, তাহাতে আমাদের উভয়েরই মঙ্গল হইবে।”—আমি নির্ভয়ে সিদুকের মধ্যে প্রবেশ করিলে যুবতী তালা বন্ধ করিলেন। অনন্তর সিদুকগুলি পুনরুর নৌকার উপর লইয়া যাওয়া হইল। নৌকা তখন নদীবক্ষে ভাসিয়া খালিফ-মহিষী জোবেদীর অন্তঃপুরের দিকে চলিতে লাগিল।

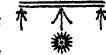
সিদুকের মধ্যে বসিয়া আমি নানা কথা ভাবিতে লাগিলাম, আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, কিন্তু তখন আর আক্ষেপ করিয়া কোন ফল ছিল না, আমি মনে মনে আমার নাম করিতে লাগিলাম।

সিদুকগুলি প্রাসাদে উপনীত হইলে, তাহার অভ্যন্তরস্থ দ্রব্যাদি পরীক্ষার জ্ঞে খোজা সর্দারের নিকট লোক পাঠান হইল, কিন্তু তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, খোজা সর্দার বলিল, “এত রাত্রে আর আমি সিদুক পরীক্ষার জ্ঞে ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারি না, সিদুকগুলি তোমারা এখানে লইয়া এনো, আমি একে একে পরীক্ষা করিয়া ছাড়পত্র দিতেছি।” আমি সজরে দেখিলাম, আমি যে সিদুকে বসিয়াছিলাম, তাহাই সর্বপ্রথমে খোজা সর্দারের নিকট লইয়া যাওয়া হইল। আমি সিদুকের মধ্যে বসিয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলাম, অজ্ঞান নদীকে কি লিখিয়াছেন, ভাবিয়া বড়ই হুশিস্তা হইল।

জীবন বিপন্ন
না করিলে কি
পীরিত জন্মে?



রূপসী-বাসীর
প্রেমিক-হরণ



হুলতান
হারেমে
পুরুষ চালান



যে সুবর্তীর নিকট সিদ্ধকের চাবী ছিল, সে সন্দির খোজাকে বলিল, ‘আমি এ সিদ্ধকের চাবী তোমাকে দিখ না। উহার মধ্যে মহামূল্য জব্বাদি আছে, খোর মহিষী জোবেদীর এ সকল সামগ্রী, তাঁহার আদেশ, চাবী যেন কাহাকেও দেওয়া না হয়। তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ইহার চাবী তোমার হস্তে প্রদান করিতে পারি না। বিশেষতঃ এই সিদ্ধকের মধ্যে নজ্জার জেমজেম করণার জল কতকগুলি বোতলে পূর্ণ আছে, যদি দৈবাৎ ভূমি একটা বোতল ভাঙ্গিয়া ফেল, তাহা হইলে জোবেদী ঠাকুরাণী তোমাকে যে কি ভয়ানক শাস্তি দিবেন, তাহা কিছু ভাবিতেছ কি?’—এই কথা শুনিয়া খোজা সন্দিরের মনে বড় ভয় হইল, সে আর সিদ্ধক খুলিতে চাহিল না। তৎক্ষণাৎ সে সিদ্ধক অন্তরে লইয়া বাহিতে আদেশ প্রদান করিল।

অল্পক্ষণ পরে ‘খালিক আসিতেছেন, খালিক আসিতেছেন’ এই শব্দ কানে গেল, আমি আরও ভীত হইলাম। মনে হইল, আমার অস্তিম কাল উপস্থিত। খালিক সিদ্ধক দেখিয়া, সিদ্ধকে কি আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন। বাদী লবিনয়ে বলিল, ‘জোবেদী ঠাকুরাণী কতকগুলি জিনিসপত্র পরিদ করাইয়া, এই সকল সিদ্ধকে বোঝাই দিয়া আনিয়াছেন।’—খালিক বলিলেন, ‘সিদ্ধক খোল, কি জিনিস দেখি।’—ভগ্নে আমার মজ্জার উপক্রম হইল।

বাদী বাদীর
সাবাস
হাফাহরী



বাদী কিন্তু সহজে সিদ্ধক খুলিল না; বলিল, ‘ঠাকুরাণী বলিয়াছেন, তাঁহার আদেশ ভিন্ন যেন সিদ্ধক খোলা না হয়, তাঁহার আদেশ না পাইলে জাঁহাপনা এ সকল সিদ্ধক খুলিতে আমার ভরসা হয় না।’—খালিক সজ্ঞে কক্ষশব্দে বলিলেন, ‘আমার ভকুম, সিদ্ধক খোল, ভকুমখানিক কাজ না করিলে তোকে কুত্তা দিয়া খাওয়াইব।’ বাদী অগত্যা সিদ্ধক খুলিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে বাদী অজ্ঞাত সিদ্ধক খুলিতে লাগিল, এবং বিলম্ব করিবার ভয় এক একটী জিনিস তুলিয়া খালিকের সম্মুখে ধরিয়া, তাহার গুপের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিল; কিন্তু খালিক ক্রান্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না। সকল সিদ্ধক খোলা হইল, কেবল আমি যেটির মধ্যে বসিয়াছিলাম, সেইটিই অবশিষ্ট রহিল। আমি বুকিয়ায়, আমার অস্তিমকাল নিকটবর্তী হইয়া আসিয়াছে, এখন আল্লা বাহা করেন।

আমি যে সিদ্ধকে ছিলাম, খালিক অবশেষে তাহা খুলিবার আদেশ করিলেন। বাদী বলিল, ‘জাঁহাপনা, এবার আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে। মহিষী জোবেদীর অল্পপাছততে আমি এ সিদ্ধক খুলিতে পারিব না। আমার প্রতি এ বিষয়ে বিশেষ নিষেধ আছে, জাঁহাপনা, মহিষীর আগমন পরাস্ত অপেক্ষা করিলে সকল দিক্ রক্ষা হয়।’ খালিক বলিলেন, ‘তুই মহিষীর প্রিয় বাদী বলিয়া আমার কথা অগ্রাহ্য করিস? আমি কালই তোকে শুলে চড়াইব।’—আমি খালিকের আদেশ শুনিয়া ভাবিলাম, আমি মরিয়া গিয়াছি, জ্ঞানাবে আমার মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া এই সিদ্ধকে পুরিয়া আমার গোর দিয়াছে।

যাহা হউক, আমার সৌভাগ্য বশত সহসা এই সময়ে বাহিরে খালিকের কি কাজ পড়িল, তিনি আর সিদ্ধক খুলিয়া দেখিবার অবসর পাইলেন না, সিদ্ধক না দেখিয়াই প্রস্থান করিলেন। আমার মৃতদেহে জীবনসঞ্চার হইল।

কিয়ৎকাল পরে আমার প্রিরতমা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধক হইতে আমাকে বাহির করিলেন। সিদ্ধকের মধ্যে বসিয়া আমি যে কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, সেজন্ত তিনি বিস্তর আক্ষেপ করিলেন;—বলিলেন, ‘প্রাণাধিক, আমি তোমাকে বড় ভালবাসি, এত ভালবাসি যে, আমার জীবন বিপন্ন করিয়াও আমি মিলনকামনার তোমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার সেহে বতস্পদ প্রাপ্ত আছে, ততস্পদ কেহ তোমার কেশস্পর্শ করিতে পারিবে না।’—আমি বসিয়ায়, ঠিক বলিয়াছি



চুয়ন বিড়ম্বনা

র উপকাস

চুয়ন বিড়ম্বনা

যা হউক, কিছুদিনের মধ্যেই আমার কত আরোগ্য হইল। আমি স্বপ্ন হইবার পর, আমার যুবতী পর্ষী আমাকে তাঁহার শয়ন কক্ষে লইয়া গেলেন। তিনি যে আমাকে শান্তিপ্রদান করিয়াছেন, এক্ষত্বে প্রকাশ করিয়া, তিনি সাদরে আমাকে তাঁহার পার্শ্বে আশ্রয় করিলেন। বিবাহের পর এই আমাদের প্রথম মধু-খামিনী। নানা কষ্টভোগের পর নিরুপম সৌন্দর্য্য-উজ্জ্বলিত দেহ অধিকার করিতে পাইয়া, আমি সমস্ত চুঃখ বিস্মৃত হইলাম। মদন-উৎসবে সমস্ত রজনী আমরা যাপন করিলাম। আমি অনেক দিন পরমসুখে প্রাণাদে বাস করিয়াছিলাম। একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন, “খালিক-মহিষী আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দান করিয়াছেন; আমরা ইচ্ছা করিলে অস্ত্র-গৃহ-নির্মাণ করিয়া বাস করিতে পারি। প্রাণাদের বাহিরে স্বাধীনভাবে বাস করি, ইহাই আমার ইচ্ছা।” অনন্তর আমার স্ত্রী আমার হস্তে দশ সহস্র টাকা দান করিয়া, আমাকে একটি সুন্দর বাড়ী ক্রয়ের জন্ত অনুরোধ করিলেন। আমি নগরমধ্যে একটি সুসজ্জিত গৃহ ক্রয় করিয়া, প্রেমামনে বিভোর হইয়া পরমসুখে বাস করিতে লাগিলাম। দাস-দাসীরও অভাব রহিল না, কিন্তু হার, আল্লা আমার সকল স্রুৎ অকালে হরণ করিলেন। এক বৎসর যাইতে না যাইতে আমার স্ত্রী পরলোকগমন করিলেন। আমি পুনর্বার বিবাহ করিয়া, সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল, আমি গৃহ বিক্রয় করিয়া নানা প্রকার পণ্যদ্রব্য কিনিয়া, পারভ্রাভিমুখে যাত্রা করিলাম। সেখান হইতে সমরকন্দের ভিতর দিয়া আমি এই নগরে আসিয়াছি এবং এখানে বাস করিতেছি।

ভাণ্ডারীর গল্প শেষ হইলে, কাসগারের সুলতান বলিলেন, “এ গল্প খুব আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু আমার কুজভাঁড়ের গল্পের গুণ অদ্বুত নহে।” তখন ইন্দী-চিকিৎসক করোডে বলিল, “জাঁহাপনা, আমার গল্প শুনিলে নিশ্চয়ই মোহিত হইবেন।” সুলতান তাহাকে গল্প বলিতে আদেশ করিলেন।

*** **

ইন্দী-চিকিৎসক বলিতে আরম্ভ করিল :—আমি দামাধর নগরে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমি এই ব্যবসারে প্রবৃত্ত হইলে, সেই দেশের শাসনকর্ত্তা মহাশয় একটি রোগীর চিকিৎসার্থ তাঁহার ভৃত্য দ্বারা আমাকে আশ্রয় করেন। আমি রোগীর গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একটি সুন্দর যুবক রোগবন্ত্রণায় বড় কষ্ট পাইতেছেন। আমি রোগীর পার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহার হাত দেখিতে চাহিলাম, কিন্তু বিশ্বয়ের কথা কি বলিব, তিনি আমাকে তাঁহার বাস হস্ত দেখিতে দিলেন। আমি ভাবিলাম, হয়ত' যুবকটি জানেন না যে, চিকিৎসককে কোন্ হাত দেখাইতে হয়, নতুবা তাঁহার এ ব্যবহারের আর কি কারণ থাকিতে পারে? আমি কোন প্রশ্ন না করিয়া যুবকের বামহস্ত গ্রহণ করিয়া, তাঁহার নাড়ীর বেগ পরীক্ষা করিলাম।

নয় দিন ধরিয়া আমি তাঁহার চিকিৎসা করিলাম, কিন্তু দেখিলাম, এই নয় দিনই তিনি আমাকে তাঁহার বাম হস্ত দেখাইলেন। দশম দিনে আমি তাঁহার আরোগ্যদানের ব্যবস্থা লিলাম। দামাধরের শাসনকর্ত্তা আমার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট হইয়া, আমাকে একটি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন এবং আমাকে তাঁহার পারিবারিক চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন।

চিকিৎসা-
নয়
বিশিষ্ট
কাহিনী
ক
গ
ক

জানাগারে
বহুস্তোম্যটন



যুবক আমার চিকিৎসানৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া, আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিলেন এবং আমাকে তাঁহার জানাগারে লইয়া গেলেন। ভূত্যগণ তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া ফেলিলে দেখিলাম, তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি নাই। আমি আরও বুঝিলাম, হাতটি অধিক দিন কাটা যায় নাই এবং এই বাস্তব্বেদনই তাঁহার রোগের কারণ। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া, আমার মনে যুগপৎ দুঃখ ও বিষয়ের সঞ্চার হইল। আমার মনের ভাব যুবক বলিলেন, ‘আপনি বিস্মিত হইবেন না, একদিন আমি আপনাকে আমার এই বাস্তব্বেদনের কাহিনী বলিব, তখন ব্রূতিতে পারিবেন, এক্ষণ অদ্বুত কাহিনী আপনি জীবনে কোথাও কোন দিন শুনেন নাই।’

জানাগার হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, আমি তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলাম। আমি তাঁহাকে কথাপ্রসঙ্গে বলিলাম, ‘আপনি নগরবাহিরে কোন উদ্যানভবনে বাস করিয়া, যদি কিছুদিন নির্মল বায়ু সেবন করেন, তাহা হইলে আপনার শরীর শীঘ্রই স্বস্থ হইবার সম্ভাবনা।’—নগরবাহিরে দামাঙ্গের শাসনকর্ত্তা মহাশয়ের একটি উদ্যানভবন ছিল, আমি যুবকের আগ্রহে তাঁহার সহিত সেখানে যাত্রা করিলাম।

একদিন যুবক তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।—মোসলের কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা ভাই-ভগিনীতে দশটি। কিন্তু আমার পিতার ভিন্ন তাঁহার সহোদরগণের সন্তান হয় নাই। আমি পিতার একমাত্র সন্তান। তিনি আমার সুশিক্ষার জন্য বিস্তর ব্যয় ও আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে আমি সম্ভ্রান্ত-সমাজে মিশিতে আরম্ভ করিলাম। এক ক্ষুদ্রবয়ে আমি আমার পিতা ও পিতৃব্যগণের সহিত মোসলের সমাজে নমাজ করিতে গিয়াছিলাম, নমাজ শেষ হইলে সকলে চলিয়া গেল, কেবল আমরা কয়েকজন গালিচার উপর বসিয়া নানা বিষয় আলাপ করিতে লাগিলাম। ক্রমে ভ্রমণ-বিষয়ের প্রশঙ্গ উঠিল, সকলেই নানা স্থানের সুন্দর দেশের গল্প করিতে লাগিলেন। আমার এক কাকা বলিলেন, ‘পৃথিবীতে যত দেশই থাক, মিসর দেশের তার সুন্দর স্থান আর কোথাও নাই।’—আমি তাঁহার কথা শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম, সেই দিন হইতে মিসর-দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আমার হৃদয়ে বলবতী হইয়া উঠিল।

আমার পিতা ও মিসরের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি বলিলেন, ‘মিসরের সুন্দরীর মত সুন্দরী আর কোথাও নাই, এত ঐশ্বর্য আর কোন দেশেই নাই, নীলের মত নদ আর কোন দেশে আছে? কি নির্মল জল! কেমন শতশ্রীমতা ভূমি! কারাগার মত নগর কি আর কোথাও আছে? পিরামিড কি অত্যশ্চর্য্য সামগ্রী, দেখিয়া বিষয়ে স্তম্ভ হইয়া থাকিতে হয়। আমি যৌবনকালে কয়েক বৎসর মিসরে বাস করিয়াছিলাম, জীবনে আর তেমন সুখের সময় আসিল না।’

পিতার ও আমার পিতৃব্যের মুখে মিসরের এইরূপ গৌরবকাহিনী শ্রবণ করিয়া আমার মনে হইল, যেমন করিহাই হউক, মিসর দর্শন করিতে হইবে। আমি পিতাকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত করিলাম, তিনি বলিলেন, ‘তুমি ছেলেমানুষ, দেশপট্টনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তুমি মিসর-দর্শনে লাভবান না হইয়া ক্ষতিগ্রস্তই হইবে, তাহা ব্রূতিতে পারিতেছি।’ অবশেষে আমি আমার এক কাকার শরণ লইলাম। তিনি আমার জন্য ওকালতী করিয়া পিতার মত করাহিতে সন্মত হইলেন, কিন্তু পিতা সম্পূর্ণ মত দিলেন না, স্থির হইল, তাঁহারা আমাকে দামাঙ্গের রাখিয়া মিসরযাত্রা করিবেন। আমাকে অগত্যা সেই প্রস্তাবেই সন্মত হইতে হইল;—পিতৃ-আজ্ঞা!

আমি পিতা ও কাকাদের সঙ্গে মোসল হইতে যাত্রা করিলাম। দামাঙ্গ নগরে উপস্থিত হইলে সেখানকার সৌন্দর্য্য দর্শনে আমি মোহিত হইলাম। দামাঙ্গের আমরা একজন খা সাহেবের গৃহে বাস।

মিসর-সুন্দরীর
নাম লালসা
উল্লেখ



লইলাম। আমরা নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলাম, অল্প দিনের মধ্যেই তাহা বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ পাইলাম, তখন আমার পিতা ও কাকার আমাকে সেই নগরে রাখিয়া দানাস্থান বিভাগ করিলেন।

আমি স্বাধীন হইয়া সাবধানে অর্থব্যয় করিতে লাগিলাম। বলিয়াছি, ব্যবসানে অনেক টাকা লাভ পাইয়াছিলাম, প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া লইলাম, এবং তাহা সুন্দররূপে সজ্জিত করিলাম। এই গৃহ একজন জহুরীর—তাহার নাম মদোন আবদাল রহমন। এই প্রকাণ্ড বাড়ীর জন্য আমাকে মাসিক ছই সেরিক (প্রায় সাত টাকা) মাত্র ভাড়া দিতে হইত। আমি এখানে আমার নবপরিচিত বন্ধুবান্ধবের সহিত পরমভ্রমে ও আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলাম।

একদিন অপরাহ্নে আমি আমার বারান্দায় বসিয়া বায়ুসেবন করিতেছি, এমন সময় একটি অবগুষ্ঠনবতী রমণী আমার গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘আমি কোন প্রকার পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ার্থে রাখিয়াছি কি না?’—রমণী আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমার গৃহক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। আমি তাঁহার অসুখমন করিয়া, তাঁহাকে গৃহমধ্যে ব্রথাগনে উপবেশন করিতে অসুরোধ করিলে তিনি উপবেশন করিলেন। আমি বলিলাম, ‘এখন আমার কাছে কোন পণ্যদ্রব্য নাই, আপনাকে কিছু জিনিস দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া আমি হ্রস্বিত হইলাম।’—বৃথতী অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিয়া, ভুবনমোহন হাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়া বলিলেন, ‘আপনি ফোত তাগ করুন, আমি আপনার নিকট কোন জিনিসের জন্য আসি নাই, আপনার সঙ্গে কিছুকাল আমোদ-প্রমোদ করিব বলিয়াই আসিয়াছি।’

আমি রমণীর কথা শুনিয়া পরম আশ্চর্য্যিত হইলাম; ভৃত্যগণকে কিছু সুমিষ্ট ফল ও কয়েক বোতল উৎকৃষ্ট মদ্য আনিবার আদেশ প্রদান করিলাম। মস্তপানে আমাদের প্রাণ খুলিয়া গেল, আমরা পরমানন্দে মধ্যাহ্নের পূর্ণ্য অতিবাহিত করিলাম। তখন আমার প্রথম যৌবন; দেহের রূপ ও শক্তি উভয়ই ছিল। সুন্দরীর সঙ্গমুখ কাহাকে বলে, তাহার কোনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান আমার ছিল না। এই লোক-মোহিনী তরুণী উপাচারিকা হইয়া আমার সহিত প্রমোদ-নিশা যাপনের অভিপ্রায় প্রকাশ করার আমি কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিলাম। তরুণী সুন্দরীর দেহে উচ্ছ্বসিত যৌবনের বিজ্ঞানপ্রবাহ বহিতেছিল। সেই তরঙ্গে যৌবন-স্বপ্ন সার্থক করিবার অবাচিত সুযোগকে কোন্ যুবক উপেক্ষা করিতে পারে? আমিও পারিলাম না। সারা রজনী আমি তরুণীর আলিঙ্গনে যাপন করিলাম। পরদিন প্রভাতে রমণী যখন বিদায়গ্রহণ করিবেন, সেই সময় আমি তাঁহার হস্তে দশটি সেরিক প্রদান করিতে উত্তম হইলাম, রমণী তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, ‘ও কি কথা, আমি উহা কখনই লইব না, কোন স্বার্থলোভে ত’ আমি এখানে আসি নাই। তুমি আমার মনে বড় কষ্ট বিলে, আমার এ কষ্ট দূর হয়, যদি তুমি আমার নিকট হইতে দশটি সেরিক গ্রহণ কর।’—সুন্দরীর আগ্রহে তাঁহার নিকট হইতে দশ সেরিক গ্রহণ করিলাম। বৃথতী বলিলেন, ‘জিনিসের পরে সন্ধ্যাকালে আমি আবার আসিব, তুমি প্রস্তুত থাকিও।’—আলিঙ্গন-চূষনে আমার অকৃত পিঙ্গাঙ্গা কথঞ্চিৎ প্রশমিত করিয়া, বৃথতী বিদায়গ্রহণ করিলেন, আমার হৃদয় অবসর হইল, আমার মন সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তিনদিন পরে সন্ধ্যাকালে বৃথতী আবার আসিলেন, আবার সেই ভাবে অকৃত আমোদ-প্রমোদে প্রমোদ-নিশার অবদান হইল। প্রভাতে বিদায়গ্রহণকালে প্রেমময়ী আমাকে আবার দশটি সেরিক প্রদান করিলেন, পাছে তিনি অসুস্থ হন, এই ভরে আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না।

অতিস্মারিকা
উভাগমন



উপাচারিত
যৌবন দান



তৃতীয়বার স্বভাবী আমার গৃহে আসিলেন। মহানন্দে ও পরম নিশ্চিন্তিতে আমাদের মস্তপান চলিতে লাগিল। স্বন্দরী মস্তপানে প্রহসিতা হইয়া মুক্তচন্দ্রে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “প্রিয়তম, প্রাণাধিক, আমার সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর? আমি কি স্বন্দরী?—তোমার মনের মত নই?”—আমি সহজে বলিলাম, “প্রিয়তমে, তুমি রূপসীরাণী! তুমি আমার প্রাণপ্রেয়সী, তুমি আমার হৃদয়রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী, তুমি আমার স্নহতানি, আমার জীবনের সকল সুখ তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে।”—স্বভাবী বলিলেন, “বাও বাও প্রাণনাথ, তুমি আর মন-রাখা কথা বলিও না, আমাকে দেখিয়া তুমি এই কথা বলিতেছ, কিন্তু যদি তুমি আমার সম্বন্ধে দেখ, তাহা হইলে তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়। আমি তাহাকে তোমার কথা বলিয়াছি, সে তোমাকে দেখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, তাহাকে আমি তোমার কাছে লইয়া আসিব।”—আমি বলিলাম, “তোমার যেকোন ইচ্ছা করিতে পার, কিন্তু প্রিয়তমে! তুমি নিশ্চয় জানিও, আমার এ চক্ষু তোমার রূপে যেমন মুগ্ধ হইয়াছে, এমন আর কাহারও রূপ দেখিয়া হইবে না,—আর কাহারও পীড়িতে এমন মজিবে না।”—“আচ্ছা, তা দেখা যাইবে, দেখি, তোমার হৃদয় আমার প্রতি কেমন।”—বলিয়া আসক্তা স্বভাবী-মোহন কটাক্ষে বিদ্বাং হানিলেন।

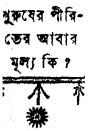


এ সম্বন্ধে আর কোন কথা হইল না। পরদিন প্রভাতে যথারীতি বিদায়-চূষন প্রদান করিয়া, স্বভাবী প্রস্থান করিলেন; প্রস্থানের পূর্বে আমার হস্তে পূর্ব্বং টাকা প্রদান করিলেন, কিন্তু এবার দেখিলাম, দশটির পরিবর্তে তিনি পনেরটি সেরিফ দান করিয়াছেন; আমাকে লইতে হইল। তিনি বলিলেন, “হুই দিনের মধ্যে আমার সম্বন্ধে লইয়া আসিব। তুমি তাহাকে ভালরূপে অভ্যর্থনা করিবে, সন্ধ্যার পরই আমাদের আসিবার সুযোগ।”

আমি গৃহকক্ষগুলি আরও উত্তমরূপে সজ্জিত করিলাম, এবং যথাসময়ে আমি অধীর আগ্রহে স্বন্দরীদ্বয়ের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার অববাহিত পরেই স্বন্দরীদ্বয় আমার গৃহে পদাৰ্পণ করিলেন। অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিলে দেখিলাম, আমার প্রেরণীর কথা একটুও মিথ্যা নহে, তাঁহার সম্বন্ধে সত্যই অপকল্প স্বন্দরী এবং অপেক্ষাকৃত বয়স্কিনী। এমন বর্ণ, এমন রূপ, এমন বেশভূষা, সর্বোপরি এমন মনোহর কটাক্ষ ও স্তম্ভিত কর্তব্যর যে, আমি বোধ করিলাম, পৃথিবীতে এমন স্বন্দরী আর দ্বিতীয় নাই।—আমি স্বন্দরীর প্রতি অত্যন্ত সৌজন্ত প্রকাশ করিয়া, দুই চারিটি কথা বলিতেই উভয় স্বভাবী হাসিয়া বলিলেন, “ও সকল ভ্রমতার কথা এখন থাকুক, এসো, আমাদের-প্রমোদ করা যাক, আমাদের বাহা শ্রেষ্ঠ সুখ, তাহা উপভোগ কর।”



আমার প্রেরণীর সম্বন্ধে আমার পাশে বসিয়া, হাসি হাসিমুখে আড়নয়নে ক্রমাগত আমার দিকে চাহিতে লাগিলেন। মরি মরি, কি নরলতাপূর্ণ হাস্য, কি প্রেম-উজ্জলিত নয়নভঙ্গিমা! আমি আর কোন প্রকারে আত্মসংবরণ করিতে পারিলাম না, তাঁহাকেই আমার হৃদয়রাজ্যের রাণী বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। আমার প্রাণ তাঁহার প্রায়লালনার আকুল হইয়া উঠিল। নবীন স্বন্দরীও কত আদরের—কত সোহাগের কথা বলিয়া আমার হৃদয় গলাইয়া ফেলিলেন।



আমার ভাব দেখিয়া, আমার প্রথম প্রেরণী কেবল হাসিতে লাগিলেন;—বলিলেন, “কেমন, আমি যাহা বলিয়াছিলাম, তাহাই ঘটিল কি না? তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যেই তোমার প্রতিজ্ঞা ভুলিলে, ছি, ছি, পুরুষের পীরিত বড় অসার!”—আমি বলিলাম, “তোমার মন বড় কুৎসিত, আমি কি পীরিতে পড়িয়া এত আদর-বসন্ত দেখাইতেছি? উনি কত ভাগ্যে আমার গৃহে আসিয়াছেন, আমার বসন্তর সাধ, তাঁহার আদর করিব, ইহাই তা’ ভ্রমতার নিয়ম।”

ক্রেমঃ আমাদের মজ্ঞান চলিতে লাগিল, শেষে আর কোন সন্কেচ রহিল না, আমি ও নবগতা প্রেমিকা—
উভয়ের পরস্পরের প্রতি প্রেমের ইজ্জতি প্রকাশ পাইতে লাগিল। প্রথমা যুবতী তখন মধুর হাসি হাসিয়া
বিলীন, “ভাই, আমার সখী আজ আমাদের অতিথি। হুতরাং উহার প্রতি আমাদের সম্মান প্রকাশ
করা কর্তব্য। আজ রজনীতে তুমি উহাকে তোমার শয্যাসজ্জিনী করিলে অতিথির প্রতি সম্মান প্রকাশ
করা হইবে।” আমি ইহাতে মোখিক আগতি প্রকাশ করিলাম, কিন্তু আমার প্রণয়িনী তাহাতে
কর্ণপাত না করিয়া, নবীনা প্রেমিকাকে আমার সহিত রাতিয়াপনের জন্য শীড়ানীড়ি করিতে লাগিলেন।
তাহার আদেশে শয্যারও সেই প্রকার বন্দোবস্ত হইল। সখীর সহিত আমাকে একঘরে থাকিবার ব্যবস্থা
করিয়া দিয়া আমার প্রণয়িনী
কক্ষান্তরে চলিয়া গেলেন।

নবীনা সুন্দরীকে এমনভাবে
পাইয়া, আমিও আর ধৈর্যধারণ
করিতে পারিলাম না। হুতরাপানে
তখন আমাদের ইন্দ্রিগুণি মত্ত
হইয়া, উত্তিয়াছিল। হিতাহিত
বিবেচনাও তখন ছিল না। চক্ষের
জার বিদল রূপজ্যোতিঃ-প্রভা-
বিতা, আদ্যবপানমত্তা তরুণীকে
আমার হৃদয়ে ধারণ করিলাম।
ননে হইল, স্বর্ণরাজা আমার
করায়ত্ত। মদনোৎসবে নিশার
অধিকাংশকাল অতিবাহিত করি-
বার পর নিভ্রাধোরে আনন্দ
আচ্ছন্ন হইলাম। প্রভাতে নিভ্রা-
ভঙ্গ হইলে অহুভব করিলাম,
সুন্দরী তখনও আমার পার্শ্বে
শায়িতা। কিন্তু আমার দেহ
যেন শ্বেদজলে আর্দ্র বলিয়া বোধ
হইল। শয্যা হইতে উত্তিয়াই যাহা

দেখিলাম, তাহাতে আমার নেশা ছুটিয়া গেল। দেখিলাম, যুবতীর গগদেশ অস্বাধাতে ছিন্ন—তরুণী রক্তাক্ত
দেহে নিশ্পন্দভাবে রহিয়াছেন। আমার বজ্রাঘিও রক্তরঞ্জিত। শয্যাত্যাগ করিয়া শঙ্কিত হৃদয়ে
প্রথমা প্রণয়িনীর সন্ধান করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহার বেখা পাইলাম না। তখন সুখিলাম, জরীবশে
সুন্দরী, আমার নবীনা প্রণয়িনীকে হত্যা করিয়া গলাইয়াছে।

কি করিব, কিছুই ভাবিয়া পাইলাম না। অবশেষে সেই দিন রাতিতে চক্ৰালোকে আমি গৃহের মধ্যে
স্বতঃ কয়েকখানি মার্বেল টালি ছুড়িয়া ফেলিয়া, একটি গছের খনন করিলাম। তরুণীর মৃতদেহ সেই



সখীর প্রণয়-
লীলাঃ কপনে
প্রণয়িনীর
আগ্রহ



আমার
হান্না
প্রেমা-
লিঙ্গন



প্রমোদ-শয্যা
বিশিষ্ট
দেশান্তরে
পলায়ন



গর্ভে সমাহিত করিয়া, আবার পূর্ববৎ টালিগুলি আঁটিয়া দিলাম। তাহার পর আমি বহুত্যাগ করিয়া বাহির হইতে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, বাহার গৃহ ভাড়া লইয়াছিলাম, তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম, বলিলাম, “আমি বেশদ্রব্যে যাত্রা করিব, আপনি এই চাকী রাখুন, আমি এক বুৎসরের বাড়ীভাড়া অশ্রম দিয়া যাইতেছি।”—তাহার পর আমার যাহা কিছু অর্থাদি ছিল, তাহা লইয়া অধারোহণে কায়েদে যাত্রা করিলাম।

কারো নগরে উপস্থিত হইয়া, আমার কাকাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম, তাঁহারা আমাকে সহসা সেখানে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কারণ, তেমন অসময়ে আমার সেখানে উপস্থিত হইবার কোন হেতুই ছিল না।

বাৰা ও কাকারা সেখানকার কাজ শেষ করিয়াছিলেন, তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া মৌল-যাত্রা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, কিন্তু আমি সে প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। তাঁহাদের বাগা ছাড়িয়া নগরের এক প্রান্তে গিয়া আমি গোপনে বাস করিতে লাগিলাম, তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করিলাম না।

তাঁহারা কারো পরিত্যাগ করিলে আমি অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইলাম। তিন বৎসর কারো নগরে বাস করিলাম। আমি যতদিন কারো নগরে ছিলাম, নিয়মিতরূপে দানারূপ নগরে আমার বাড়ীভাড়া পাঠাইতাম। কারণ, সেখানে প্রত্যাগমন করিয়া কয়েক বৎসর বাস করিবার বাসনা ছিল।

কিছুদিন পরে অর্থাভাব হইলে আমি কারো হইতে দানারূপে কিরিয়া চলিলাম। আমি জহরীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে সে মহানন্দে আমার অভ্যর্থনা করিল। আমি তাহার সহিত আমার বাগার উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, যে ভাবে আমি দ্বার বন্ধ করিয়া গিয়াছিলাম, তাহা সেই ভাবেই বন্ধ করা আছে; দ্বারে মোহর করিয়া গিয়াছিলাম, মোহর অবিকৃত রহিয়াছে। দ্বার খুলিয়া আমি দেখিলাম, যাহা যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা সেই স্থানেই সেই ভাবে আছে, কিছুই স্থানান্তরিত হয় নাই।

ঘর পরিষ্কার করিবার সময় যে ঘরে আমি নব প্রশ্রয়ীকে লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিয়াছিলাম, সেই ঘরে এক ছড়া মুক্তানালী কুড়াইয়া পাইলাম। মাগাছড়াটি স্মরণে হুজাপা মুক্তার গাথা। আমি তাহা দেখিবামাত্র বুঝিলাম, যে যুবতী নিহত হইয়াছে, ইহা তাহারই মালা। মালা দেখিয়া আমার মনে পূর্বকথা স্মরণ হইল, চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। আমি মাগাছড়াটি দ্বারে বৃকে লইয়া অহুরাগভরে চুপন করিতে লাগিলাম।

মনিসর্পন
সামলা
হীন



বড় প্রথম হইয়াছিল, কয়েক দিন বিশ্রাম করিলাম; বিশ্রামান্তে আবার আমোদ-প্রমোদে মত্ত হইলাম। ক্রমে আমার টাকা কুরাইয়া আসিল, শেষে এমন হইল যে, আমার গৃহের সাজদজ্জা বিক্রয় না করিলে আর দিন চলে না।

এই অবস্থা ঘটিলে আমি ভাবিলাম, প্রথমে আর ঘরের সরঞ্জাম বিক্রয় করি কেন? যুতা যুবতীর যে মূল্যবান মুক্তার মালা আমার কাছে রহিয়াছে, তাহাই প্রথমে বিক্রয় করি, তাহাতে অনেক টাকা পাওয়া যাইবে, কিছু দিন বেশ ফুষ্টি চলিবে।

বাজারে আসিয়া, একজন দালালের নিকট উপস্থিত হইলাম, তাহাকে গোপনে ডাকিয়া মুক্তানালী দেখাইলাম। সে মালা দেখিয়া তাহার অশেষ প্রশংসা করিল,—বলিল, “এ যে অতি মহামূল্য দ্রব্য।”—দালাল সদাগরগণকে সেই মালা দেখাইতে লইয়া গেল, আমি একজন রত্নবাবাদায়ীর দোকানে বসিয়া ফলাফলের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি ভাবিলাম, চই হাজার সেরিফ নিশ্চয়ই পাইব। কিন্তু

দালাল কিরংক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া যাহা বলিল, তাহাতে হরিষে বিবাদ উপস্থিত হইল। সে বলিল, মুক্তাগুলি খুঁটা মতি, মালার দাম পঞ্চাশ সেরিফের অধিক হইবে না।—আমার টাকার বড় দরকার, আমি তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া বলিলাম, “বাহা হয়, তাহাতেই বিক্রয় করিয়া টাকা আনিয়া দাও।”

আমি বুঝিতে পারি নাই যে, একজন জহরী এই মালা আমার কি না, তাহা পরীক্ষার জহরী মালার এই দাম বলিয়াছিল। মালাটি বাস্তবিক খুঁটা মতি ছিল না, কিন্তু আমি তাহা পঞ্চাশ সেরিফেই বিক্রয় করিতে চাইতেছি শুনিয়া, সেই জহরী দালালকে লইয়া কোতোয়ালে নিকট উপস্থিত হইল এবং বলিল, ‘এ জিনিষ চোরাই মাল, দুই সহস্র সেরিফ মূল্যের এই মুক্তামালা চোর পঞ্চাশ সেরিফে বিক্রয় করিতে আসিয়াছে।’

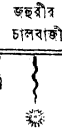
কোতোয়াল আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আমি পঞ্চাশ সেরিফে ঐ মালা বিক্রয় করিতে প্রস্তুত আছি কি না? আমি তাহা স্বীকার করিলে, কোতোয়াল হুকুম করিল, আমি যতক্ষণ চোরা স্বীকার না করি, ততক্ষণ লোহদণ্ড দ্বারা আমাকে প্রহার করা হইবে। তাহাই হইল, আঘাত-বহুলায় কাতর হইয়া আমাকে মিথ্যাকথা বলিতে হইল; কহিলাম, “আমি মালা চুরি করিয়াছি।” শুনিয়া কোতোয়াল আমার দক্ষিণ হস্ত ছেদনের আদেশ করিল।

যে জহরীর নিকট আমি ঘর-ভাড়া লইয়া বাস করিতেছিলাম, আমার দুর্নীতির পরিচয় পাইয়া, সে অনেক তিরস্কারের পর তাহার গৃহ পরিত্যাগ করিবার জ্ঞান আমাকে আদেশ করিল। আমি অনেক অশ্রু-বিনয় করিয়া আরও তিন দিন সেই গৃহে বাস করিবার অনুমতি পাইলাম।

কিন্তু তখনও আমার দুঃখের অবসান হয় নাই, যে জহরী আমাকে ধরাইয়া দিয়াছিল, তিনদিনের মধ্যেই সে একদল পুলিশ-কর্মচারী লইয়া, আমার বাসায় উপস্থিত হইল। তাহাদের অভিপ্রায় কি, জিজ্ঞাসা করিবার তাহার আমার হাত-পা বধিয়া ফেলিল। তাহার কোণে গর্জন করিয়া বলিল, “এই মুক্তামালা দামাধরের শাসনকর্তার, তিন বৎসর হইল, তিনি ইহা হারাইয়াছেন; কেবল তাহাই নহে, সেই সঙ্গে তাঁহার একটি স্ত্রী কন্ডাও কোণায় অন্তর্হিত হইয়াছে। আমি বলিলাম, “আমাকে শাসনকর্তা মহাশয়ের নিকট লইয়া চল, আমি তাঁহার নিকট সকল কথা বলিব, তিনি আমার প্রতি যে দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন, আমি তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিব।”

আমি দামাধরের শাসনকর্তার সম্মুখে নীত হইয়া, তাঁহাকে সকল কথা গুলিয়া বলিলাম, তিনি তাহা বিশ্বাস করিয়া আমাকে মুক্তিদানের আদেশ করিলেন, এবং যে জহরীর ধৃততার আমার প্রতি এরূপ দণ্ডবিধান করা হইয়াছিল, সেই ধৃতের প্রতি তাহার দক্ষিণ হস্ত ছেদনের আদেশ প্রদত্ত হইল।

অনন্তর শাসনকর্তা মহাশয় আমাকে বলিলেন, “বৎস, এই মুক্তামালা যে কিরূপ তোমার হস্তগত হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রবণ করিলাম। জানা কখন যে কাহার প্রতি কোন্ অপরাধে কি দণ্ডের বিধান করেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না। তোমার কাহিনী শুনিয়া আমি কদরে যে আশ্বাস পাইলাম, তাহার তুলনা হয় না। আমার কাহিনী আমি তোমাকে বলিতেছি; তুমি যে দুই যুবতীর কথা বলিলে, তাহারা আমার দুই কন্ডা। প্রথমে যে যুবতী তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া তোমার প্রণয়প্রার্থনা করিয়াছিল, সে আমার জ্যেষ্ঠা কন্ডা; আমি কায়রো নগরে আমার ভ্রাতৃশৃঙ্খের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। বিধবা হইয়া হতভাগিনী আমার গৃহে ফিরিয়া আইসে এবং কায়রো নগরে সে যে প্রকার দুর্নীতি শিক্ষা করিয়াছিল, এখানে তাহারই পরিচয় দিতে আরম্ভ করে। তাহার



শাসনকর্তা
রূপসী
কন্ডাধর
গ্রেমলীল

এখানে আসিবার পূর্বে আমার দ্বিতীয়া কন্ডা—তোমার আলিঙ্গনপাশে বাহার মৃত্যু হয় বলিতেছে, সে বিশেষ স্থলীলা ও সচরিত্রা ছিল, কিন্তু তাহার জোষ্ঠা ভগিনীর সহবাসে ও দৃষ্টান্তে তাহার চরিত্রও ক্রমে কলঙ্কিত হইয়া উঠে।

মোদাদিনীর
স্তিতিসমার
অনুস্তাপ



“আমার দ্বিতীয়া কন্ডার অন্তর্দর্শন বাবুল হইয়া, আমি জোষ্ঠা কন্ডাকে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করি, কিন্তু দৃষ্টান্তবিরোধে রোদন করিতে করিতে বলিল, ‘বাবা, সে তাহার উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া বাহিরে গিয়াছে দেখিরাছি, তাহার পর আর তাহাকে কিরিতে দেখি নাই।’—আমি তাহার অন্তর্দর্শনে চারিদিকে লোক পাঠাইলাম, কিন্তু কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। আমার জোষ্ঠা কন্ডা অন্ততপ্ত হইয়া দিব্যরাত্রি ক্রন্দন করিতে লাগিল, আমি ভাবিতাম, সে তদীয় বিরহেই রোদন করিতেছে, সেটাই যে—তাহার কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রাণহরী, তাহা আমি জানিতাম না। যাহা হউক, নিরন্তর অনুতাপনে দগ্ধ হইয়া, শেষে সেও প্রাণত্যাগ করিয়াছে; তাহার পূর্বে সে তাহার মাতার নিকট নিজের দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াও গিয়াছে, স্বতরাং বৎস, এখন বুঝিতেছি, আমি তোমাদেই জ্ঞায় চর্ভগ্যা। এস, আমরা একত্রে বাস করি, এবং পরস্পর স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরস্পরের জন্মে শান্তি দান করি। আমার তৃতীয়া কন্ডা অতীব স্থলীলা, এবং সর্লপেক্ষা অধিক সুন্দরী, আমি তাহাকে তোমার হস্তেই সমর্পণ করিব। আশা করি, তুমি তাহাকে বিবাহ করিা অতঃপর স্থখী হইবে। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইব, আমার পুত্রসন্তান নাই।”

তৃতীয়
দী-লাভের
পাভাগ্য



আমি তাহার পরতলে পড়িয়া তাঁহার মনে যে কষ্ট দিয়াছি, সেজ্ঞান ক্রমাগত প্রার্থনা করিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং সম্মুখে বলিলেন, ‘বণেষ্ঠ হইয়াছে, এ সকল কথাই আলোচনা করি আর অবগত নাই।’—অনন্তর অবিলম্বে সাক্ষী ডাকিয়া তিনি তাঁহার তৃতীয়া কন্ডার সহিত আমার বিবাহ দিলেন। তাহার পর আমি অবগত হইলাম, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, পিতৃব্য আমাকে স্বদেশে উপস্থিত হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি অধিকার করিবার জ্ঞান অহুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। যে লোক এই পত্র লইয়া আমার সন্ধানে আসিয়াছিল, এক দিন পথে হঠাৎ তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, কিন্তু আমি আমার যশুরকে তাহার এই ব্রদ্ধাবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলাম না। আমি আমার কাকাকে আমার সকল সম্পত্তি ভোগ করিবার জ্ঞান অহুরোধ করিলাম। আপনি এখন আমার দক্ষিণ হস্তক্ষেত্রে কান্ধিনী স্তনিলেন, চিকিৎসার সময় আপনাকে বাম হস্ত দেখাইয়া যে অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছি, অবস্থা-বিবেচনায় তাহা মার্জনা করুন।

ইহুদী চিকিৎসক বলিল, “এই যুরকের চিকিৎসার পরেও অনেক দিন আমি দামাস্কাসে বাস করিয়াছি, দামাস্কাসের শাসনকর্ত্তা সেই যুরকের যশুরের মৃত্যুর পর দেশপর্ধ্যটনের ইচ্ছা বলবতী হওয়ায়, আমি পারস্ত দেশ ও ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিয়া, আপনার রাজধানীতে আসিয়া বাস করিতেছি। এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমার এই কাহিনী অতি অদ্ভুত কি না?”

স্বলতান বলিলেন, “অদ্ভুত বটে, কিন্তু কুজ ভাঁড়ের গল্পের মত নহে। তোমাদের সকলেরই ফাঁদী হইবে।” তখন দরজী সভয়চিত্তে স্বলতানের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার অহুমতি প্রার্থনা করিল। স্বলতান তাহাকে গল্প বলিবার অহুমতি দান করিলে, সে বলিতে আরম্ভ করিল।



এই নগরে একজন বণিক আজ দুই দিন হইল আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়া দেখিলাম, সেখানে আরও বিশ জন নিমন্ত্রিত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছে।

গৃহস্থানী বাহিরে গিয়াছিলেন; দেখিলাম, কিয়ৎকাল পরে তিনি একটি সুপরিস্ফুটনশোভিত স্তম্ভের যুবককে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিতেছেন; যুবকটি খঞ্জ। আমরা গৃহস্থানীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তাহার পর যুবককে আমাদের পার্শ্বে উপবেশনের জন্ত অনুরোধ করিলাম। যুবক বসিলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অদূরবর্তী আসনে একটি নাপিতকে দেখিয়াই আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া বাইবার উপক্রম করিলেন; তাহা দেখিয়া আমরা সকলে বিস্মিত হইলাম। গৃহস্থানী তাঁহার এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যুবক বিরক্তভাবে বলিলেন, “না মহাশয়, আমাকে এখানে আর একদণ্ডও থাকিবার জন্ত অনুরোধ করিবেন না, ঐ ওখানে নাপিত বসিয়া আছে, আমি এক্ষণে দ্রুত লোকের সহিত একত্র বসিতে ইচ্ছা করি না।”

আমরা যুবকের কথা শুনিয়া আরও অধিক বিস্মিত হইলাম। না জানি, নাপিতের কি অপরাধ, তাহা বুঝিতে না পারিয়া নাপিতের প্রতি আমাদের মনেও অশ্রদ্ধার স্বভাব হইল। আমরা কোতূহলান্বিত হইয়া যুবককে তাঁহার ক্রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবক বলিলেন, “না মহাশয়, আমি এখানে আর মুহূর্ত্তনাত্র অপেক্ষা করিব না। এই নাপিত আমার খঞ্জ হওয়ার কারণ; এমন কি, আমি যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি, তাহাও উহার জন্ত। যাহাতে ঐ দ্রুতগতির যুবদর্শন করিতে না হয়, সেই জন্ত আমি বোম্বাদ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি; কিন্তু হতভাগাটী দেখিতেছি, এখানেও আসিয়া জুটিগাছে। আমি আজই এ নগর ত্যাগ করিব, যেখানে গেলে আর কখনও উহার যুবদর্শন করিতে না হয়, আমি সেইখানেই থাকিবার প্রয়াস পাইব।”—যুবক কিছুতেই সেখানে দাঁড়াইবেন না, আমরাও তাঁহাকে ছাড়িব না, অবশেষে তিনি আমাদের অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া আসনে বাসলেন এবং নাপিতের দিকে গৃষ্ঠদেশ স্থাপন করিয়া দীর্ঘে দীর্ঘে তাঁহার পূর্ণকাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

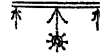
আমার পিতা বোম্বাদের একজন প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র। তিনি আমাকে তাঁহার পদোচিত শিক্ষা প্রদান করিতে ক্রটি করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর আমি তাঁহার পরিত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলাম, এবং সেই সম্পত্তির অপব্যয় না করিয়া তাঁহার সদ্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম। সর্বসাধারণে আমার সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আমাকে আশ্চর্যকর শ্রদ্ধা করিতে লাগিল।

যৌবনপথে পদার্পণ করিলেও প্রণয়ের সহিত আমার কোন পরিচয় হয় নাই। বলিতে কি আমি স্ত্রীজাতিকে রণার্থ জ্ঞান করিতাম, কখনও তাহাদের সংস্পর্শে আসিতাম না। একদিন রাজপথে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, একদল স্ত্রীলোক আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি তাহাদিগের দৃষ্টিপথ হইতে দূরে বাইবার জন্ত আর একটি ক্ষুদ্র পথগ্রান্তে একটি গৃহের সম্মুখস্থ একখানি চৌকিতে উপবেশন করিলাম। আমার সম্মুখে একটি গৃহ, গৃহের একটি বাত্যান উন্মুক্ত ছিল, সেই বাত্যায়নপথে সহসা একটি স্তম্ভরী যুবতীর মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই মুখখানি বড়ই সুন্দর—তাহা দেখিয়া আমার চক্ষু যেন বলিয়ায় গেল! স্তম্ভরী আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই হৃদয় হস্ত করিলেন, সে হাসি আমার প্রাণ কাড়িয়া লইল, আমি স্ত্রীজাতির প্রতি যুগা ভুলিলাম, প্রেমপূর্ণদৃষ্টিতে যুবতীর মুখের দিকে চাহিলাম, কিন্তু যুবতী আমার হৃদয় জগ করিয়া, জানালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন; আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

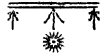
সদ্যজী-

কথিত

কাহিনী



তাহা না,
প্রাণের দাসী!



আমি আসন ত্যাগ করিয়া উঠিব, এমন সময় দেখিলাম, একজন কাজী অথতরে আরোহণ করিয়া কয়েকজন দল্লীর সহিত সেই গৃহদ্বারে অবতরণ করিলেন। আমি বুঝিলাম, এই কাজীই আমার চিত্ত-হারিণীর পিতা হইবেন।

প্রেমজ্বর কি
ইম্বে সারে ?



বাড়ী ফিরিলাম, কিন্তু যে মন লইয়া গিয়াছিলাম, সে মন আর ফিরিল না; প্রেমের প্রথম আক্রমণ আমার ভ্রুসং বোধ হইল। আমার জ্বর হইল। বাড়ীর সকলেই মহাচিন্তিত হইলেন। সকলে আমার হঠাৎ অসুখ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত কারণ আমি কাহারও নিকট প্রকাশ করিলাম না। আমি কোন কথা বলিলাম না দেখিয়া, তাঁহাদের আশঙ্কা সমধিক বদ্ধিত হইল। চিকিৎসা আরম্ভ হইল, কিন্তু ঔষধে রোগশাস্তি হওয়া দূরের কথা, প্রতিদিন রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে আমার আত্মীয়গণ আমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলেন। আমাদের বাড়ীর কাছে একটি বৃদ্ধা বাস করিত, আমার রোগের কথা শুনিয়া সে আমাকে দেখিতে আসিল, অনেকদূর মনোযোগ সহকারে আমাকে দেখিয়া বৃদ্ধা,—কিরাণে বলিতে পারি না, আমার প্রকৃত ব্যাধি নির্ণয় করিল। বৃদ্ধা আমার সহিত গোপনে আলাপ করিতে চাহিলে, কক্ষ হইতে সকল লোক বাহির হইলেন, সে কক্ষে কেবল আমি ও বৃদ্ধা রহিলাম।

বৃদ্ধা আমাকে স্নেহপূর্ণ স্বরে আমার রোগের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া, কোন উত্তর পাইল না দেখিয়া, দীর্ঘভাবে আমাকে বলিল, “বৎস, তুমি আমার নিকট অনর্থক প্রকৃত কথা লুকাইতেছ, আমি তোমার রোগ কি, বুঝিতে পারিয়াছি; তুমি প্রেমজ্বরে আক্রান্ত হইয়াছ, আমি তোমার ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারি, কিন্তু কোন সন্দেহী তোমার মন চুরি করিয়াছে—কাহার প্রণয়-লালায় তুমি প্রেমজ্বরে কাতর হইয়াছ, তাহা আমাকে না বলিলে আমি কোন ফল দেখাইতে পারিব না। যদি তুমি সকল কথা খুলিয়া বল, তবে আমি তোমার উপকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারি।”

প্রথম-
ফলা-তৃণালী
দ্বার সাবান
দুটিয়ালী !



বৃদ্ধার কথা শুনিয়া যদিও আমার মনে আশার সঞ্চার হইল, তথাপি আমি তাহার নিকট হৃদয়দ্বার উন্মোচিত করিতে পারিলাম না। আমি তাহার দিকে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম। বৃদ্ধা বলিল, “বুঝিয়াছি, বাছা, লজ্জায় তুমি কোন কথা বলিতে পারিতেছ না। যদি তুমি মনে করিয়া থাক, তোমার গোপনীয় কথা আমাকে বলিলে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, তবে সে ভয় ত্যাগ কর। তোমার মত অনেক যুবকই ঐ প্রেমব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিল, কিন্তু আমি সকলকেই আরোগ্য করিয়াছি, তোমারও পীড়া আরোগ্য করিতে পারিব, এ ভরসা আমার বিলক্ষণ আছে। প্রেমের দূতিয়ালী করিয়াই বৃদ্ধা হইয়াছি—এই মিলনের ঘটকালীতেই আমার বিশেষ আনন্দ।”

আমি বৃদ্ধাকে আমার মনোবিকারের সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম। বৃদ্ধা বলিল, “বাছা, তুমি ঠিকই অনুমান করিয়াছ, তোমার চিত্তহারিণী এই সহরের প্রধান কাজীর কন্যা। তিনি যে তোমার মন চুরি করিয়াছেন, এ সংবাদে আমি আশ্চর্য্য বোধ করিতেছি না, মেয়েটি যেন সত্যই পরী। বোম্বাদ নগরে এমন স্নন্দরী যুবতী দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কথা পাড়াই দাও। মেয়েটির সেমাক বড় বেশী, কাজীও বড় কঠোরপ্রকৃতি, মেয়েদের তিনি বড় শাসনে রাখেন। যদি তুমি আর কোন যুবতীর পীরিতে পড়িতে, আমি অবিলম্বে কার্য্যোদ্ধার করিতে পারিতাম, কিন্তু তুমি বড় কঠিন হলে তোমার ভালবাসা সমর্পণ করিয়াছ, দেখা যাক, কতদূর কি করিয়া তুলিতে পারি। ফল কথা তুমি নিরাশ হইও না।”



পরদিন বৃদ্ধা আমার নিকট উপস্থিত হইল, তাহার মুখ দেখিয়াই বৃথিলান, সে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। তথাপি আমি ধৈর্য ধরিয়া সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলাম। বৃদ্ধা মুখ ভার করিয়া বলিল, “বলিয়াছি ত’ বাছা, বড় কঠিন স্থান। তুমি বাহাকে ভালবাসিয়াছ, সে যুবতী বড় কঠিনজন্মের, পরের জন্ম দণ্ড করিতে পারিলেই তাহার আনন্দ। আমি তোমার বিরহবাধির কথা স্তম্ভরীকৈ বলিলাম, সে মনোযোগের সহিত সকল কথা শুনিল, কিন্তু তাহাকে যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলাম, তখন সে ভয়ানক রাগ করিয়া বলিল, ‘বুড়ি, এমন কথা মুখে আনিব না, আমি তোমার মুখ দেখিতে চাহি না, তুই এখান হইতে দূর হইয়া যা!’”

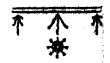
বুড়ী অবশেষে বলিল, “কিন্তু তুমি হতাশ হইও না। আমি যখন দুতিরালীর ভার লইয়াছি, তখন তোমার কার্যোদ্ধার করিবই করিব,”—বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়াও আমি আশ্রয় হইতে পারিলাম না। স্বচতুরা বৃদ্ধা বহু কৌশল খাটাইয়াও আমার মনোমোহিনীর মন কোন প্রকারেই নরম করিতে পারিল না; আমি প্রতিদিন অধিকতর অধীর হইয়া উঠিতে লাগিলাম, চিকিৎসকগণ পরস্পর আমার প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিলেন।

অবশেষে একদিন সেই বৃদ্ধা আসিয়া যে কথা বলিল, তাহাতে আমার দেহে নবজীবনের সঞ্চার হইল। বৃদ্ধা বলিল, “এক দিনে তোমার রোগ সারাইবার ব্যবস্থা করিয়াছি। কাল সোমবার ছিল, আমি তোমার জন্মমোহিনীর নিকট গিয়া প্রথমে দীর্ঘনিশ্বাস ও অশ্রুতাগ করিতে লাগিলাম। যুবতী বলিল, ‘আইবুড়ী, তোমার এমন কি ক্রোধ হইল যে, তুই কাঁদিতেছিস্?’ আমি বলিলাম, ‘আমি তোমাকে যে যুগের কথা সে দিন বলিয়াছিলাম, সে বৃদ্ধি আর বাড়ে না, তোমাকে ভালবাসিয়া তোমার অদর্শনেই তাহার প্রাণ বাহির হইবে। তুমি কি নিষ্ঠুর!’—আমি তাহাকে আরও কত কথা বলিলাম, তাহার সংখ্যা নাই। যুবতীর মন নরম করিবার জন্য আমাকে অনেক বক্তৃতা করিতে হইল; তুমি কিরূপে তাহার মুখ দেখিয়া পাগল হইয়াছ, সে কথাও বলিলাম। অবশেষে তাহার বিরহে তোমার প্রাণনাশের উপক্রম শুনিয়া যুবতীর মন একটু নরম হইল; সে বলিল, ‘বুড়ী, তুই যত কথা বলিলি, সমস্তই কি সত্য?’—আমি বলিলাম, ‘আমার দিবা, তিনি দিনকে দিন এবং রাত্তিকে রাত্তি করিতেছেন, যাহা বলিলাম, তাহার একটা কথাও মিথ্যা নহে।’—যুবতী বলিল, ‘তুই কি মনে করিস্, আমাকে দেখিলেই তাহার বাধি আরোগ্য হইবে?’—আমি বলিলাম, ‘সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই, তুমি একবার তাহার সঙ্গে দেখা করিলেই ছোঁকার বাঁচিয়া যায়।’—যুবতী অবশেষে তোমার সঙ্গে দেখা করিতে সম্মত হইয়াছে। কিন্তু দেখা মাত্র, সে তাহার পিতার সম্মতি ভিন্ন তোমাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, তাহার সহিত তোমার মিলনের কোন আশা নাই, তাহাও বলিয়াছে। আজ মঙ্গলবার, আগামী শুক্রবার মধ্যাহ্নকালে স্তম্ভরীর পিতা যখন মসজিদে নমাজ করিতে বাইবেন, ঠিক সেই সময় তুমি যুবতীর গৃহে উপস্থিত হইলে তাহার সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু তাহার পিতার প্রত্যাশমনের পূর্বেই তোমাকে ফিরিয়া আসিতে হইবে।” বৃদ্ধার কথা শুনিয়া আমি যেন মৃতপ্রাণে নবজীবন পাইলাম। এই কথা শুনিবামাত্র আমার রোগের অধিক উপশম হইল। আমার আত্মীয়স্বজনগণ আমাকে স্তুতি দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বৃদ্ধাকে আমি যথোচিত পুরস্কার প্রদানে সঙ্কল্প করিয়া, উৎকণ্ঠিত জ্বরে আগামী শুক্রবারের প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

শুক্রবার নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বৃদ্ধা আমার গৃহে উপস্থিত হইল। আমি সর্বোৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া কাকীর গৃহে বাইব, এমন সময় বৃদ্ধা বলিল, “তুমি একবার কামাইয়া লও, তাহা হইলে তোমাকে

বিরহব্যাধি
উপশমে বৃদ্ধা
যুবতীর নৈপুণ্য

দরিদ্র-মিলনের
অধীর প্রতীক্ষা



আরও সুন্দর দেখাইবে।” আমার মনোমোহিনীর নিকট সুন্দর দেখাইবার জন্য আমার মনে যথেষ্ট আগ্রহ ছিল, আমি একটা ভৃত্যকে নাপিত ডাকিয়া আনিতে আদেশ করিলাম। ভৃত্য এই হতভাগা নাপিতটাকে আনিয়া হাজির করিল।

ছাড়বাম্বা
নাপিত



নাপিত আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি, আপনাকে কামাইতে হইবে, না অন্ত করিতে হইবে?” আমি বলিলাম, “অস্ত্রের আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র আমাকে কামাইয়া দাও, আমার সম্বর বাহিরে যাইতে হইবে।” সে বলিল, ‘বাহিরে যাইবেন, আজ উত্তম দিন, আজ ৬৫৩ সালের ১৮ই সফর শুক্রবার, অতি উত্তম দিন’,—বলিয়াই সে জ্যোতিষের নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিল।

আমি তাহার বক্তৃতায় বিরক্ত হইয়া বলিলাম, “রেখে দাও তোমার ভাল দিন, আমি তোমাকে দিন দেখাইবার জন্য ডাকি নাই, শীঘ্র কামাইতে হয় কামাও, না হয় চলিয়া যাও। তোমার বক্তৃতা শুনিয়া আমার কোন উপকার হইবে না, তোমার নিকট আমি কোন উপকারের প্রত্যাশা করি না।”

নাপিত আমার কথায় কর্ণপাত করিল না, সে যে নানা শাস্ত্রবিৎ, ব্যাকরণ হইতে কাব্য-জ্যোতিষ হইতে দর্শন—কল শাস্ত্রে যে তাহার সমান ব্যাপ্তি আছে, তাহাশ প্রতিপন্ন করিবার জন্য কত প্রণালি বকিল, তাহার বংশের পরিচয় দিল, তাহার ভ্রাতৃগণের ইতিহাস বলিল, শেষে মৃত্যুগীত আরম্ভ করিল। আমি ঘণ্টা দুই সময় অপব্যয় করিলাম, তাহার পর যখন তাহার বাড়ি ধরিয়া তাহাকে বলিয়া করিব, তখন সে ক্ষুর লইয়া বসিল; কামাইতে বসিয়াও তাহার মুখ ধামিল না, হাত অপেক্ষা তাহার মুখ দ্রুত চলিতে লাগিল। অবশেষে কমানো হইলে আমি পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া বাড়ীর বাহির হইলাম, নাপিত তখনও আমার ছাড়ে না। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, ‘আপনি কোথায় যাইবেন?’—আমি বলিলাম, ‘নিমন্ত্রণে।’—সে বলিল, ‘কখনও কোথাও একাকী নিমন্ত্রণে যাইবেন না, আমি ভৃত্য আছি, আমাকে সঙ্গে লইন, আপনার পিতা আমাকে বড় অহুগ্রহ করিতেন।’

আমি এই হতভাগার হস্ত হইতে কিরূপে মুক্তিলাভ করিব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম, কিন্তু মুক্তিলাভের ত’ কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না, শেষে তাহাকে নানা কথায় প্রমোদিত করিয়া দিলাম, কিন্তু কিছু দূর গিয়াই দেখি, সে আবার অহুসরণ করিতেছে। আমি কাজীর গৃহস্থারে আসিয়া দেখিলাম, সে পথের মোড়ে রহিয়াছে, তাহার দৃষ্টি আমার উপর। আমি তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইলাম, কিন্তু তখন আশ্রয়-গোপন করিবার আর উপায় নাই, কাজীর দ্বার মুক্ত দেখিয়া আমি তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিলাম।

মিলনের
কণ্টক



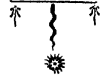
দেখিলাম, সুন্দরী আমার প্রতীকা করিতেছেন, আমার নয়নরঞ্জিনী জয়মোহিনীকে দেখিয়া, আমার স্নায়ের সকল বেদনা দূর হইল, সকল চাক্ষুষ যুগিয়া গেল। আমি তাঁহার সহিত তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আলাপ আরম্ভ করিলাম। তবে মাত্র আলাপ আরম্ভ করিয়াছি, এমন সময়ে রাজপথে অনেক লোকের গোলমাল শুনিতে পাইলাম। যবতী ভাড়াভাড়ি পথের দিকের জানালা খুলিয়া দেখিলেন, তাঁহার পিতা কাজী উপাসনা সমাপনাতে ফিরিয়া আসিতেছেন। আমি সেই বাতায়নপথে চাহিয়া দেখিলাম, পথের ধারে যে বেঞ্চির উপর বসিয়া আমি সেই যুবতীকে দেখিয়াছিলাম, নাপিত বেটা সেই বেঞ্চিতে বসিয়া আছে, তাহাকে দেখিয়া রাগে আমার সন্মুখ অসিয়া গেল!

কাজীর গৃহপ্রত্যাগমনে—বিশেষতঃ নাপিতটাকে সেভাবে সেখানে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, আমার মনে বড় ভয়ের স্ফূর্তি হইল। কিন্তু আমার প্রাণপ্রতিমা বলিলেন, “ভয় কি? তুমি ভয় করিও না, বাবা আমার ঘরে প্রবেশই আসেন না।” তথাপি তাঁহাকে আমার পলায়নের পথ মুক্ত রাখিতে বলিলাম। কিন্তু হারাম-জানা নাপিতের জ্ঞান আমাকে বড় কষ্ট পাইতে হইল; আমি স্তম্ভিতচিত্তে বসিতে পারিলাম না।

কাজী বাড়ী ফিরিয়াই একজন অবাধা ভৃত্যকে লগুড়াবাত করিতে আরম্ভ করিলেন। ভৃত্যটা উচ্চৈঃস্বরে চীংকার আরম্ভ করিল; এমন কি, সে স্বরে রাজপথ পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। নাপিত ভাবিল, পীরিত করিতে গিয়া আমি ধরা পড়িয়াছি, আমার প্রাণরক্ষা করি, সে ভৃত্যের চীংকারশব্দকে আমার আঁতর্নাদ স্থির করিয়া, কাপড় ছিড়িয়া মাটাতে লুটাইয়া কাদিতে লাগিল, পথের লোকের সাহায্য চাহিয়া বলিতে লাগিল, ‘কে কোথায় আছে রে ভাই, দোড়িয়া আইস, আমার মনিবকে কাজী সাহেব খুন করিয়া ফেলিল!’—কেবল তাহাই নহে, সে ছুটিয়া গিয়া আমার ভৃত্যগণকে পর্য্যন্ত সংবাদ দিল, আমি খুন হইয়াছি, সুনিয়া আমার ভৃত্যেরা লাঠি নোটা লইয়া কাজীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, এবং দ্বার বন্ধ দেখিয়া দ্বারে ভয়ঙ্কর আঘাত করিতে লাগিল। দ্বারে কে গোলমাল করিতেছে দেখিবার জ্ঞান কাজী সাহেব একজন ভৃত্যকে পাঠাইয়া দিলেন, ভৃত্য তাঁহার নিকট গিয়া সংবাদ দিল, ‘জুজুর, হাজার খানেক লোক আসিয়া দ্বারে গোলমাল বাধাইয়াছে, বোধ করি, বাড়ী লুণ্ঠ করবে, এতদূর হয় ত’ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।’

কাজী বিহ্বল হইয়া আসিয়া, গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার ক্রুদ্ধ ভৃত্যগণ তাঁহাকে দেখিয়া বলিল, ‘হতভাগা কাজী, নগরের কুকুর, তুমি আমাদের প্রভুর গায়ে হাত দিচ্ছ?—তাঁহার প্রাণবধের চেষ্টা করিস? তোর এত বড় আশ্পদী? তিনি তোর কি করিয়াছেন?’—কাজী বিস্ময়াভিত্ত হইয়া বলিলেন, ‘তোমরা বল কি? তোমাদের মনিবকে আমি কি জ্ঞান করি? তিনি কে, তাহাই জানি না। তোমরা বরং আমার বাড়ীর মধ্যে আসিয়া দেখিতে পার।’—নাপিত বেটা বলিল, ‘হাঁ, তুমি আমাদের মনিবকে লাঠি দিয়া ঠেসাইতেছিলে, আমি স্বকর্ণে তাঁহার চীংকার শুনিয়াছি, তাহাতেই ত’ আমি লোকজন ডাকিলাম।’—কাজী বলিলেন, ‘আমি আমার একজন চাকরকে ঠেসাইতেছিলাম, তোমাদের মনিব কে? তিনি কি আমার বাড়ীতে আসিয়াছেন? কি জ্ঞান তিনি আমার বাড়ীতে আসিবেন, আর কাহার কাছেই বা আসিলেন? আমি তো মসজিদ হইতে এই মাত্র নামাজ সারিয়া আসিতেছি।’—নাপিত বলিল, ‘বুদ্ধ কাজী, তুমি বড় দুরাচার, তোমার ঐ দীর্ঘ দাড়ী এক একগাছি করিয়া উৎপাটন না করিলে তোমার শিক্ষা হইবে না; তোমার মেয়ের সঙ্গে আমাদের মনিবের—বিস্ময় কি না—পীরিত আছে, মধ্যাহ্নে নামাজের সময় তোমার মেয়ে আমাদের মনিবমহাশয়কে নিমন্ত্রণ করাতেন ত’ তিনি তোমার বাড়ীতে আসিয়াছেন, তুমি কোথা হইতে সে সংবাদ পাইয়াছ, তাড়াতাড়ি বাড়ী আসিয়াই তাঁহার পিঠে লগুড়াবাত আরম্ভ করিয়াছ। মনে করিও না, তুমি কাজী বলিয়াই কঁাকি দিয়া এড়াইয়া যাইবে, খালিকের কাণে এ কথা উঠিবে, তাহার পর তোমার কাজীগিরী বুঢ়িয়া যাইবে, হাতে দড়ী উঠিবে,—বিস্ময় কি ত?’ কাজী বলিলেন, ‘একুশ কলহের কোন আবশ্যক নাই, আমি তোমাদের ছকুম দিলাম, তোমরা আমার গৃহে প্রবেশ কর, তোমাদের প্রভুকে খুঁজিয়া লও।’ নাপিত তখন আমার ভৃত্যগণকে সঙ্গে লইয়া, কাজীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল; উষ্মন্তের মত তাহার প্রত্যেক গৃহে তন্ন তন্ন করিয়া আমার অহসন্ধান করিতে লাগিল।

পীরিতের দ্বারে
লাঠিপেটার
হটুগোল!



গোশন-
পীরিতের
বিষম বিজ্ঞাট



আমি ঘরের ভিতর হইতে নাপিতের সকল কথাই শুনিয়াছিলাম। আমি বুঝলাম, তাহার আমাকে খুঁজিতে খুঁজিতে ঘরটার শয়নকক্ষেও উপস্থিত হইতে পারে; সুতরাং কোথায় লুকাই, সেই চিন্তায় অস্থির হইয়া উঠিলাম। লুকাইবার উপযুক্ত স্থানও দেখিতে পাইলাম না; অবশেষে দেখিলাম, একটা বড় সিন্দুক এক কোণে খালি পড়িয়া রহিয়াছে, অগত্যা আমার সেই সিন্দুকে প্রবেশ করাই কর্তব্য মনে করিলাম। আর ইতস্ততঃ না করিয়া, আমি সেই চিত্তবিমোহিনী রুম্মুন্নির আখাস দ্বারা গ্রহণ করিয়া, সিন্দুকেই আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

নাপিত কোন ঘরে আমাকে না পাইয়া, অবশেষে সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সিন্দুকের কাছে আসিয়া সিন্দুক খুলিয়া দেখিল, এবং আমাকে দেখিতে পাইবামাত্র কোন কথা না বলিয়া সেই



সিন্দুক ঘাড়ে লইয়া চলিল, ক্রমে বাটার বাহিরে পথে আসিয়া উপস্থিত হইল।

আমি লজ্জায় লোকজনকে দূর দেখাইতে পারিব না স্থির করিয়া, সিন্দুকের মধ্যে আর বসিয়া থাকা কর্তব্য মনে করিলাম না। নাপিত সিন্দুক নামাইয়া দশজনের নিকট আমাকে হস্তাস্পদ করিবার পূর্বেই আমি সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া, তাহার বন্ধদেশ হইতে লক্ষ্যপ্রদান করিলাম। যেমন লক্ষ্যদান, অমন পড়িয়া আমার একখানি পা সাংঘাতিক ভাবে আহত হইল। তথাপি আমি লজ্জাভরে প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম, কিন্তু হতভাগা নাপিত আমার সঙ্গ ছাড়িল না, সে আমার পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে বলিতে লাগিল, 'দাঁড়ান মহাশয়, অত দৌড়ান কেন ?

আমি আপনার জন্ত কি কম কষ্টটা স্বীকার করিয়াছি, আমি না থাকিলে ত' আপনার পীরিতের ফল হাতে হাতেই পাইতেন, গোপনে পীরিত করিতে গেলে এ রকম কষ্ট মধ্যে মধ্যে পাইতেই হয়।' আমাকে দৌড়িতে দেখিয়া ও নাপিতের চাঁৎকার শুনিয়া পথের লোক করতালি দিয়া আমাকে বিক্রম করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা আমার পশ্চাতে পশ্চাতে দ্রুতপদে ধাবিত হইল।

নাপিত তাহার পর আমার এই কলঙ্কের কথা নানা রকম শাখাপল্লবে ভূষিত করিয়া, সমস্ত শহরে বলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার উপর আমার যেক্রম রাগ হইয়াছিল, তাহাতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল,

সিন্দুকে
লুকাই
২গো-
পন

তদুপে
৪-৪টনা

৮

তাহাকে ধরিয়া একদিন গোরসই করি, কিন্তু আরও অধিক কলঙ্কপ্রকাশের ভয়ে তাহা করিতে কাত্য থাকিতে হইল। তাহার পর হইতে সে বাহাকে পেখিতে পার, তাহার কাছেই আমার গল্প বলে, আর সে যেন আমার কতই উপকার করিয়াছে, এই ভাব প্রকাশ করে। শেষে তাহার নষ্টামীর জ্ঞান আমাকে নগর ছাড়িয়া পলাইতে হইল, লোকের কাছে আমার মুখ দেখান কঠিন হইয়া উঠিল। আমি আমার আত্মীয়স্বজনের নিকট বিদায় লইয়া বোম্বাদ হইতে বিদেশে যাত্রা করিলাম।

এখানে আসিয়া একদিনও ভাবি নাই যে, সেই দুর্ভাগ্য নাপিতের সহিত আবার আমার সাক্ষাৎ হইবে, কিন্তু এখানে আসিয়াও নিস্তার নাই; দেখি, তত দূরদেশ হইতেও হতভাগাটা এখানে আসিয়া জুটিয়াছে, ইহার জ্ঞান আমি বোঁড়া হইয়াছি, আমাকে পিরাইতের আশা বিসর্জন দিতে হইয়াছে, লোকের কাছে অপদস্থ হইয়াছি, শেষে আত্মীয়স্বজন, স্বদেশ সকল ত্যাগ করিয়া এই প্রবাসে আশিতে বাধা হইয়াছি। আপনারা কি মনে করেন, আমি আবার ঐ দুরাচারের মুখদর্শন করিব? আমি এখন বিদায় হইলাম, যত শীঘ্র সম্ভব, এ নগরও ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব।”

যুবক তাঁহার কাহিনী শেষ করিয়া আমাদের নিকট হইতে প্রস্থান করিলেন। যিনি তাঁহাকে নিমন্ত্ৰণ করিয়াছিলেন, তিনি দুঃখিতচিত্তে যুবককে বিদায় দান করিলেন, এবং অজ্ঞাতসারে তাঁহার মনে কষ্ট দিয়াছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

রাজী বলিতে লাগিল;—ভদ্র যুবকটি চলিয়া গেলে আমরা নাপিতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “হনি যে সকল কথা বলিলেন, তাহা কি সত্য? যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তুমি অমার্জনীয় অপরাধ করিয়াছ।” নাপিত এতক্ষণ কোন কথা বলে নাই, নিরবৃত্তিতে স্থিরভাবে বসিয়াছিল, এতক্ষণ পরে সে মুখ তুলিয়া বলিল, “মহাশয়গণ, এই যুবক যে সকল কথা বলিলেন, তাহার সকলই সত্য, একটি কথাও মিথ্যা নহে। তথাপি আমি যে কোনরূপ অজ্ঞায় করি নাই, আমার কর্তব্যপালন করিয়াছি, এ কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইব না। আপনাবাই বিবেচনা করিয়া দেখুন, যদি আমি তাঁহাকে কাজীর বাড়ী হইতে পে ভাবে উদ্ধার না করিতাম, তাহা হইলে কি তাঁহার প্রাণরক্ষা হইত? একখানি পা হারাইলেও যে তাঁহাকে জীবন হারাইতে হয় নাই, ইহাই তাঁহার পরম লাভ; কিন্তু তাহাতে সন্দেহ না হইয়া আমার উপর অনর্গক রাগ করিয়া মনে কষ্ট পাইতেছেন, আমি কি তাঁহার জ্ঞান কম বিপদ মাথায় করিয়া কাজীর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিলাম? পৃথিবী নিমকহার্য্যে পরিপূর্ণ, ইহাই তাহার উজ্জ্বল চূড়ান্ত। এই যুবকের উপকার করিলাম, আর তিনি, প্রত্যাশারস্বরূপ আমার বদনাম রটাইয়া বেড়াইতেছেন। ইনি বলিলেন, আমার ক্ষুর অপেক্ষা আমার মুখ বেশী চলে, কিন্তু এ কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা, আমি বাজে কথা একটিও বলি না। তাহার চূড়ান্তস্বরূপ আমার জীবনের একটি ঘটনার কথা বলিতেছি শুধুন।” নাপিত তাহার জীবনের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

পিরাইতের
আশা বিস-
র্জনে অহতাপ
↑
↓
✱

যুবক ক্ষুর?
↑
↓
✱





খালিক মুন্ডানদের বিহার রাজত্বকালে তাঁহার রাজধানীতে দশজন দম্ভা ভীষণ অত্যাচার আরম্ভ করে ; তাহাদের ভয়ে পথে লোক চলিতে পারিত না। লোকের ধনপ্রাণ রক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে এ কথা খালিকের কণ্ঠে প্রবেশ করিল ; তিনি সহর-কোতোয়ালকে ডাকিয়া বলিলেন, “আজই দম্ভা দশজনকে ধরিয়া আনিতে হইবে, নতুবা তোমার প্রাণদণ্ড করিব।” কোতোয়াল সেই দিনই বহুশ্রমসাধ্য প্রহরীকে চতুর্দিকে পাঠাইয়া দশজন দম্ভাকেই ধৃত করিয়া ফেলিল।

সে দিন বায়রাম উৎসব ছিল। সহর লোকে লোকারণ্য, চতুর্দিকে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদ চলিতেছিল। আমি টাইগ্রস্ নদীতীরে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলাম, দশজন লোক ও কয়েক জন প্রহরী একখানি নৌকায় চড়িয়া সহরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমি সেই নৌকার উঠিলাম ; তাবিলাম, ইহার নিশ্চয়ই উৎসব দেখিতে যাইতেছে, আমিও তাহাদের সহিত যাই। নৌকার উঠিয়া বৃষ্টিতে পারিলাম, আরোহী দশজন অপর কেহই নহে, সেই দশজন দম্ভা। কিন্তু তখন আর তাবিলা কোন ফল নাই, প্রহরীগণ নদীতীরে উপস্থিত হইয়া, নৌকা বাধিয়া, দম্ভাদলকে বাধিয়া লইয়া চলিল, আমিও সেই সঙ্গে বাধা পড়িয়া রাজদরবারে চলিলাম, কিন্তু আমি কোন কথা বলিলাম না।

খালিকের সভায় আমরা নীত হইলে, ক্রুদ্ধ খালিক আদেশ করিলেন, “অবিদ্যাঘে দম্ভা দশজনের শিরশ্ছেদন কর।” বাতক দশজন দম্ভার সহিত আমাকেও বাধিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড় করাইল, আমি তখনও কোন কথা বলিলাম না। সৌভাগ্যক্রমে আমি সকলের শেষে দাঁড়াইয়াছিলাম, খালিকের আদেশে বাতক দশজন দম্ভার মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফাস্ত হইলে, খালিক সক্রোধে বলিলেন, “আমি দম্ভাগণের শিরশ্ছেদনের আদেশ করিলাম, একজন এখনও বাঁচিয়া রহিল কেন ?” বাতক বলিল, “শাহানশা, আপনার আদেশে দশজন দম্ভারই প্রাণবধ করিয়াছি, এ বাক্তি দশজনের মধ্যে নহে।”—খালিক তখন দম্ভাগণের মুণ্ড গণিয়া দেখিলেন, বাতকের কথা সত্য ; তখন তিনি অত্যন্ত বিম্বিত হইয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কে ?”—আমি বলিলাম, “জাঁহাপনা, আমি আপনার রাজধানীর একজন নিরীকরোধী নাপিত।” তিনি বলিলেন, “তুমি এ ডাকাতের দলে কেন ?” আমি সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। খালিক আমার কথা শুনিয়া আমার বাক্যসংঘর্ষজ্ঞের বিস্তার প্রশংসা করিলেন। আমি বলিলাম, “জাঁহাপনা, আমরা সাত ভাই, কিন্তু মৌনব্রতে আমিই বিজয়লাভ করিয়াছি, সেই জন্য লোকে আমাকে গম্ভীর লোক বলে।”—



খালিক সহাস্তে বলিলেন, “তাহারা তোমার ঠিক নামই দিরাছে, প্রাণনাশের শব্দভেদে তুমি যখন কথা বল নাই, তখন তোমার বাক্যসংঘর্ষ প্রশংসনীর সম্ভে নাই। তোমার অজ্ঞাত ভ্রাতৃগণও কি তোমার ছাত্র এইরূপ অসাধারণ-গুণশালী ?” আমি বলিলাম, “জাঁহাপনা, আপনার অমুমতি হয় ত আমি তাহাদের কাহিনী কীর্তন করি ; দেখিবেন, আমার চরিত্রে ও তাহাদের চরিত্রে আকাশপাতাল তফাৎ। তাহারা সকলেই বড় বেলী কথা বলে, চেহারাতেও আনাদের পরস্পরের মধ্যে আকাশপাতাল তফাৎ। আমার প্রথম ভাই কুজ, দ্বিতীয় ভাই দস্তহীন, তৃতীয় ভাই অক, চতুর্থ একচক্, পঞ্চম কাণকাটা, ষষ্ঠ ঠোটকাটা। তাহাদের প্রত্যেকের জীবনের ইতিহাস বড়ই বিচিত্র, ধৈর্যধারণ করিয়া শ্রবণ করিলে জাঁহাপনা আমোদিত হইবেন সম্ভে নাই।”

খালিক আমার কথা শুনিয়া আমার ভ্রাতৃবর্গের কাহিনী শ্রবণের জন্য ঐহিক প্রকাশ করিলেন, আমি তাঁহাকে একে একে আমার ছয় ভ্রাতার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলাম, খালিক ও তাঁহার অমাত্যগণ মনোযোগের সহিত আমার বর্ণিত কথা শুনিতে আরম্ভ করিলেন।





। ভাতার কাছিনা ।

পিরীতের দায়

[১০৪]

জাহাপনা, আমার প্রথম ভ্রাতা কুজ, তাহার নাম বাসুক, সে দরজীর ব্যবসায় করিত। একটা কলের অপর পার্শ্বে রাস্তার ধারে তাহার দোকান ছিল, কিন্তু সে কাজকর্ম অধিক জানিত না বলিয়া অতি কষ্টে দিন কাটিত। যে কলের সম্মুখে তাহার দোকান ছিল, সেই কলের অধিকারী বেশ সম্মতিগর ব্যক্তি, তাহার স্ট্রীটিও পরনা হুম্মরী। একদিন সকালে আমার দাদা দোকানে কাজ করিতে করিতে পথের অল্প দূরত্বে গেল। সেই কলবাড়ীর দিকে চাহিতেই কলওয়ালার হুম্মরী জীকে জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল। তাহার রূপ দেখিয়াই দাদার মন খারাপ হইয়া গেল, দাদা হাঁ করিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু যুবতী একবারও তাহার দিকে চাহিল না, কিয়ৎকাল পরে সে জানালা বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল, দাদা সেই দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিল; কিন্তু জানালা আর খুলিল না, রূপসীও দেখা দিলেন না।

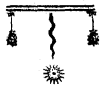
জানালার দিকে চাহিয়া কাপড় সেলাই করিতে করিতে দাদা যত্নে আঙ্গুল বিধাইয়া ফেলিল, সমস্ত দিনে বেশী কাজ হইল না। সন্ধ্যা হইলে অগত্যা দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী যাইতে হইল, কিন্তু বাড়ী ফিরিয়াও দাদার মনের উদ্বেগ কমিল না। প্রত্যয়ে আসিয়া দাদা দোকান খুলিল, পূর্বদিনের মত একবার ক্ষণকালের জন্য হুম্মরীকে দেখিতে পাইল, তাহাতেই জীবন ধ্বংস মনে করিল; কিন্তু হুম্মরী তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। তৃতীয় দিন হুম্মরী পূর্ববৎ জানালার নিকট আসিয়া পথের দিকে চাহিতেই দেখিল, দাদা হুট হাটে লইয়া একদৃষ্টে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। যুবতী বিশেষ বুদ্ধিমতী, দাদার মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিল।

রূপসী অত্যন্ত সুরমিকা, দাদার মনের ভাব বুঝিয়া, তাহার মনে রাগের সঞ্চার না হইয়া রসের সঞ্চার হইল। হুম্মরী দাদার দিকে সগ্রহম কটাক্ষ সঞ্চালন করিয়া হাসিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিল। দাদা এমনই বেতুৰ যে, যুবতীর সেই হাসিতেই সে মুগ্ধ হইয়া গেল, ভাবিল, হুম্মরী তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, কুলমান ভুলিয়া তাহাকে ভজনা করিবে।

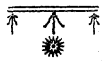
দাদাকে লইয়া একটু রঙ্গ করিবার বাসনা যুবতীর মনে বলবতী হইয়া উঠিল। সে একখানি উৎকৃষ্ট কাপড় রেশমী রম্যালে বাঁধিয়া একজন দাসীর মাধ্যমে দাদার দোকানে পাঠাইয়া বলিয়া দিল, “এই কাপড় কাটিয়া একটি পেশোয়ায় প্রস্তুত করিতে হইবে।” দাসী দাদার দোকানে আসিয়া সেই কথা বলিলে দাদার মন আনন্দে নাচিতে লাগিল; তাহা হইলে, হুম্মরী তাহার পিঠীর তরফে তুলিয়া একবার তুলিতেছে, একবার উঠিতেছে। দাদা দাসীকে দিয়া বলিয়া পাঠাইল, “আমি সকল কাজ ফেলিয়া তোমার ঠাকুরাণীর কাজ আগে করিব। কাল সকালে পেশোয়ায় প্রস্তুত হইয়া থাকিবে।” দাদা প্রাণপণ যত্ন করিয়া সেই দিনেই পোষাকটি প্রস্তুত করিয়া ফেলিল। পিঠীর তরফে দার প্রাণের দার অপেক্ষাও যে অধিক।

পরদিন দাসী আসিয়া দেখিল, দরজীর কথা ঠিক, পোষাক প্রস্তুত। পোষাকটি পরিগাঢ়রূপে ভাঁজ করিয়া দরজী দাসীর হস্তে প্রদান করিল, অনেক মোলায়েম কথাও বলিল। দাসী মুহুরে বলিল, “আমি একটা কথা বলিতে তুলিয়া গিয়াছি। ঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তোমার মত রমিক পুরুষের রাত্রি কিরূপে কাটে?—তিনি তোমার বিরহে কাল রাত্রিতে চক্ষু পাতা বুজিতে পারেন নাই। এ মহুরে তিনি অনেক মাছ দেখিয়াছেন, কিন্তু তোমার মত রূপবান পুরুষ একটিও তাঁহার নজরে পড়ে নাই;—কিবা কুজের শোভা! ঠাকুরাণী তোমার কুজ দেখিয়াই পাগলিনী!” লোভে দাদার মুখে লাল গড়িতে লাগিল;—বলিল, “তোমার ঠাকুরাণী ভ’ একরাতি ঘুমাইতে পারেন নাই, আমি তোমার ঠাকুরাণীর রূপের কথা ভাবিয়া চারি রাত্রি চক্ষু মুদ্রি নাই।—তাঁহাকে কথাটা বুঝাইয়া বলিও, আমি তাঁহার দাসদাস।”—দাসী হাসিতে হাসিতে বিদায় লইল; দাদা ভাবিল, কার্যোদ্ধারের আর বিলম্ব নাই, অতীত সুপ্রসন্ন।

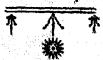
প্রথম
ভ্রাতার
কাহিনী



গব্যাক্ষপে
কটাক্ষের
টেলিগ্রাম



সুরমিকের
রাত কাটে
কিভাবে?



খের
হাসির
দিন।



কিয়ৎকাল পরে দাসী দাদার দোকানে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “ঠাকুরাণী তোমার কাজে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন। পেশোয়াজিট বড় সুন্দর হইয়াছে। তাঁহাকে আর একটি সাতিনের পোষাক প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে; এই সাতিন লও।”—দাদা আনন্দে বিম্বল হইয়া বলিল, “তার জ্ঞাত চিন্তা কি? আমি আজ সন্ধ্যার আগেই ইহা শেষ করিয়া দিব, তোমার ঠাকুরাণীর কাজ—সৰ্ব্বাগ্রে তাহা আমি করিব।” কল-ওয়ারার জী ঘন ঘন বাতায়ন-সন্নিবন্ধে আসিয়া দাদাকে প্রস্তুত করিতে লাগিল, বিধুমুখের মধুর হাসি দেখিয়া দাদা একেবারে অধীর হইয়া পড়িল। সন্ধ্যা না হইতেই সাতিনের পোষাক প্রস্তুত হইয়া গেল। দাসী আসিয়া অনেক বাহবা দিয়া হাসিমুখে তাহা লইয়া গেল, কিন্তু দাদাকে একটি পরমাণু দিল না,



দাদাও পিরীতের খাতিরে একটি পরমাণু চাহিল না, দোকান বন্ধ করিয়া বাড়ী গিয়া রাত্রে উপবাসে কাটাইল; পরদিন অন্ন-সংগ্রহের জ্ঞাত প্রতিবাসীর নিকট তাহাকে ঋণ করিতে হইল।

পরদিন দাসী আসিয়া বলিল, “মনিবমহাশয়কে ঠাকুরাণী তোমার কাজ দেখাইয়াছিলেন, আমার মনিব তোমার কাজ দেখিয়া বড় খুসী হইয়াছেন, তিনিও তোমাকে কাজ দিবেন, তাহা হইলেই তোমার বাহা মংলব, তাহা সহজেই সিদ্ধ হইবে, তুমি আমার মনিববাড়ী অসঙ্কেটে গাইতে পারিবে, কেহ কোন ঝকম সন্দেহও করিবে না।”

এই কথা শুনিয়া দাদার মন গাליয়া গেল; ভাবিল, সুন্দরী সত্য সত্যই তাহার জ্ঞাত আহার-

নিদ্রা ভাগ করিয়াছে; দাসীর কথা শুনিয়া সে কলে কলওয়ারার সঙ্গে দেখা করিতে চলিল। কলওয়ারা দরজীকে বিশটি জামা প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত কাপড় তাহার হস্তে প্রদান করিল।

পাঁচ ছয় দিন পরিশ্রম করিয়া দরজী পরম যত্নে কুড়িটি জামা প্রস্তুত করিল। জামা প্রস্তুত হইলে কলওয়ারা তাহাকে পায়জামা প্রস্তুত করিতে দিল, তাহাও বিশ পঁচিশটা হইবে। দরজী সকল কাজ শেষ করিলে কলওয়ারা তাহাকে তাহার মজুরী প্রদান করিতে গেল, কলওয়ারার জী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল, সে দাদার দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিতেই দাদা বলিল, “না, টাকা আর আবশ্যক নাই, আপনি বড়লোক, প্রতিবাসী, আমি না হয় আপনার কয়েকটা কাজ অমনি করিয়া দিলাম। কত কাজ করিতেছি, আপনার কাজে মজুরী

না হয় নাই লইলাম, তাহাতে ক্ষতি কি? দয়া করিয়া আপনারা মনে রাখিবেন।” হতভাগা বে হত দিয়া কলওয়ালার জামা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল, তাহা পর্যন্ত তাহাকে ধার করিয়া কিনিতে হইয়াছিল।

বাঁধা হউক, কলওয়ালার বাড়ী হইতে কিরিয়া, দাদা আমার নিকট আসিয়া কিছু খাবার চাহিল; বলিল, “ধরিদদারের কাছে মজুরী পাওয়া যায় নাই, পরগা না পাইলে রাত্রে খাওয়া হইবে না।” আমি তাহাকে কয়েক গণ্ডা পরগা দিলাম, তাহাতেই সে ছই চারি দিন চলাইল।

কয়েকদিন পরে কলওয়ালার দরজীর দোকানে উপস্থিত হইল, আবার তাহাকে একটা পোষাক প্রস্তুত করিতে দিল। দাদা কাপড় লইয়া আসিয়া, দিনরাত্রি খাটিয়া কাজ শেষ করিল, কিন্তু পাছে প্রেরণী রাগ করিয়া পিরীত চটাইয়া ফেলে, এই ভয়ে একটি পরগাও লইতে সাহস করিল না; পিরীতের আগ্রহে, ক্ষুধার তাড়নায়, নিষাক্ষণ অর্থকষ্টে দাদার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠিল।

কলওয়ালার স্ত্রী কেবল অর্থপিষাচিনি ছিল না, দাদা তাহার পিঠীতে পড়িয়াছে; সুস্থিরা, সে তাহাকে উপযুক্ত দণ্ডদানের জন্ত স্বামীকে অমরোধ করিল। একদিন সন্ধ্যাকালে বাবুবুকে কলওয়ালার নিমন্ত্রণ করিল, তাহাকে অতি যৎসামান্য খাণ্ডদ্রব্য দিয়া বলিল, “ভাই, আজ রাত্রি বেশী হইল, এত রাত্রে আর বাড়ী গিয়া কি করিবে, আমার বাড়ীতেই আজ ওইয়া থাক।” দাদা ইহাতে চরিতার্থ বোধ করিল। দাদাকে একটা কুঠুরীতে শয়ন করিতে দিয়া কলওয়ালার ও তাহার স্ত্রী অস্ত্র কক্ষে শয়ন করিতে গেল। মধ্যরাত্রে কলওয়ালার দাদার শয্যার কাছে উঠিয়া আসিয়া বলিল, “ভাই, ঘুমাইয়াছ কি? আমার গাধাটার হঠাৎ অসুখ হইয়াছে, তুমি যদি আমার কলটা খানিকক্ষণ ঘুরাও, তবে বড় উপকার হয়।” দাদা কলওয়ালাকে বাধিত করিবার জন্ত তৎক্ষণাৎ শয্যাভ্যাগ করিল এবং কলঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কলওয়ালার তাহাকে তাহার কলে গাধার মত করিয়া বাধিয়া তাহার নিতম্বে বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল। দাদা বলিল, “ও কি মশাই, মারেন কেন?” কলওয়ালার বলিল, “না মারিলে গাধা কল টানে না। তোমাকে তাহার হানে নিহত করিয়াছি, যে ভাবে তাহাকে চালাই, তোমাকেও সেই ভাবে চালাই হইবে।” দাদা নির্বাকভাবে তাহা সহ করিতে লাগিল, কলওয়ালার পুনঃ পুনঃ বেত্রাঘাতে তাহার পৃষ্ঠ ও নিতম্ব ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। সমস্ত রাত্রি কল ঘুরাইবার পর প্রভাতে দাদা আসিয়া দাদাকে ছাড়িয়া দিল। দাদা বলিল, “তোমার কষ্টের কথা শুনিয়া আমার ও ঠাকুরাণীর কল সমস্ত রাত্রি ঘুম হয় নাই। আমাদের মূনিব তোমার সঙ্গে একটু চালাকী করিয়াছেন, সে জন্ত তুমি মনে কোন দুঃখ করিও না।” দাদার সর্বাঙ্গ দিয়া তখন পরবিগলিতভাবে ঘর্ম ও রক্ত ঝরিতেছিল, তাহার কথা কহিবারও সামর্থ্য ছিল না। সেই এক রাত্রে চাবুকে দাদার চৈতন্যসঞ্চার হইল, তাহার পিরীতের বাধি একেবারে সারিয়া গেল।

ধর্মদিক এই কাহিনী শ্রবণ করিয়া হাসিতে লাগিলেন, উৎসাহিত হইয়া নাপিত বলিতে লাগিল, “জাঁহাপনা, এখন আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার কাহিনী শ্রবণ করুন।”

পিরীতের দায়ে
স্বামী টান।



প্রথম-ব্যাধি
প্রশমন
চাবুক!



তীয়
তাহার
বহিনী



আমার বিত্তীয় ভ্রাতার নাম বাক্‌বারা ;—বাক্‌বারা, দস্তহীন। বাক্‌বারা একদিন একটি নির্জন পথে ভ্রমণ করিতে করিতে একটি বৃদ্ধকে দেখিতে পাইল ; বৃদ্ধা তাহাকে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া তাহার একটা কথা শুনিবার জন্ত অল্পরোধ করিল। সে বাক্‌বারাকে বলিল, “তুমি যদি আমার সঙ্গে বাহিতে সম্মত হও, তাহা হইলে তোমাকে আমি একটি প্রমোদ অট্টালিকায় লইয়া বাহিতে পারি। সেখানে তুমি একটি যুবতীকে দেখিতে পাইবে, তাহার যে কি অল্পময় রূপ, তাহার আর কি পরিচয় দিব, যুগ্মখানি যেন পুর্নিমার চাঁদ ! তিনি তোমাকে কত আদর-বন্দ করিবেন, তোমাকে অতি উৎকৃষ্ট সুরা পান করিতে দিবেন, আমোদ-প্রমোদও খুব হইবে।” বাক্‌বারা বলিল, “তুমি সত্য বলিতেছ ত ?”—দ্রীলোকটি বলিল, “সত্য ভিন্ন আমি কখনও মিথ্যাকথা বলি না, ষাট সত্য কথা, কিন্তু তুমি সেখানে গিয়া অল্প কথা বলিবে, বৃদ্ধমানের মত চলিবে, কোন অশ্লীল কাজ করিবে না।”—বাক্‌বারা বৃদ্ধার সহিত চলিল। একটি সুবৃহৎ অট্টালিকার দেউড়ীতে অনেক লোক বসিয়া ছিল, তাহারা বাক্‌বারাকে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু অবশেষে বৃদ্ধার ইচ্ছিতে তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল। বাক্‌বারাকে পুনর্বার বাবহার সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া বৃদ্ধা তাহাকে ভিতরে লইয়া চলিল।

প্রমোদ-
প্রাসাদে
(সময়)।



ভিতরে প্রবেশ করিয়া বাক্‌বারা দেখিল, প্রকাণ্ড অট্টালিকা, প্রাঙ্গণে একটি স্তম্ভর বাগান। বাক্‌বারা একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধার উপদেশে একটি সোফায় উপবেশন করিল। স্তম্ভরী তখনও সে কক্ষে প্রবেশ করেন নাই। বাক্‌বারা বসিয়া বসিয়া চারিদিকের শোভা দেখিতে লাগিল। অবশেষে বাক্‌বারা কতগুলি দাসীগণবৃত্তা স্তম্ভরীকে দেখিতে পাইল, সেই সকল দাসীর সহিত তরুণী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বাক্‌বারা তাঁহাকে দেখিয়া আসন হইতে উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। যুবতী প্রশংসিত্তে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে দেখিয়া বড় খুসী হইলাম, আশা করি, তুমি এখানে তোমার আশাহরুপ স্রাবাদি পাইবে।” বাক্‌বারা যুবতীর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবাদ দিল।

অবিলম্বে দাসীগণকে বাস্তব্রবা আনিবার আদেশ প্রদান হইল। নানা প্রকার ফলমূল ও মিষ্টান্ন আনীত হইল। যুবতী দেখিলেন, বাক্‌বারার দস্ত নাই, দেখিয়া স্তম্ভরী ও তাহার দাসীরা হাস্য করিতে লাগিল। বাক্‌বারা ভাবিল, যুবতী তাহার সাহচর্যালাভের আনন্দে হাসিতেছেন। বাক্‌বারা যুবতীকে বলিল, “দাসীগুলি এখানে কেন ? উহাদিগকে বাহির করিয়া দিন, আমার একটু ক্ষুধা করি, গোপনে কথাবার্তা বলি।” যুবতী এই কথা শুনিয়া দাসীগণকে বিদায় দিলেন এবং বাক্‌বারাকে নানা প্রকার মিষ্টবাক্যে ও ভ্রমিষ্ট ভাবে আপ্যায়িত করিতে আরম্ভ করিলেন।

স্তম্ভরী
বাহাগের
দাপই



আহারের পর নৃত্য-গীত আরম্ভ হইল, দশজন দাসী বাজনা বাজাইয়া গান করিতে লাগিল, কেহ কেহ নৃত্য আরম্ভ করিল। কিরংকণ নৃত্য-গীতের পর যুবতী তাঁহাকে এক গ্লাস মদ্য আনিয়া দিবার জন্ত একটি দাসীকে আদেশ করিলেন। স্তম্ভরী প্রথমে মত্তপান করিয়া আর এক গ্লাস বাক্‌বারাকে পান করিতে দিলেন। বাক্‌বারা যুবতীর হস্ত চুম্বন করিয়া মহা তৃপ্তিভরে সেই মত্ত পান করিল, রূপসী বাক্‌বারাকে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া, নানা রসের কথা বলিতে লাগিলেন, কোমল হাত দুইখানি দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। বাক্‌বারা ভাবিল, সে সশরীরে স্বর্গে গিয়াছে, কিন্তু দাসীগুলি তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতে-ছিল বলিয়া, বাক্‌বারা যুবতীকে আলিঙ্গন করিতে সাহস করিল না। যুবতী বাক্‌বারার গাত্রে সাদরে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কখন বা বাক্‌বারার পিঠ চাপড়াইয়া সোহাগ-প্রকাশ করিতে লাগিলেন।



সেই সোহাগের চপেটাঘাত ক্রমে জোরে জোরে চলিতে লাগিল; অবশেষে চপেটাঘাত বরদাস্ত করা বাব্বার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল, বাব্বার রাগ করিয়া কিছু দূরে সরিয়া বসিবার জন্ত উঠিয়া দাঁড়াইল, এমন সময়ে সেই বৃদ্ধা তাহার দিকে সতর্কপন্থিতে চাহিল। বাব্বার বুঝিল, বৃদ্ধার উপদেশ লগ্নাঙ্ক করিতেই বৃদ্ধা বিরক্ত হইয়াছে। বাব্বার হতভম্ব হইয়া আবার প্রেমিকার পার্শ্বে আসিয়া বসিল, যুবতী আবার চপেটাঘাত আরম্ভ করিলেন। দাসীরাও সেই আমোদে যোগদান করিল, কেহ তাহার নাক ধরিয়া, কেহ কাণ ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ সজোরে তাহার পৃষ্ঠে ঘুটাঘাত করিতে লাগিল। বাব্বার দেখিল, পীরিত করিতে আসিয়া প্রাণ লইয়া টানটানি!

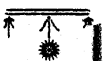
প্রমোদিনী
রঙ্গিনীর
সশ্রোণ
চপেটাঘাত



কিন্তু ইহাতেও বাব্বারার ধৈর্যভঙ্গ হইল না, সে অবলীলাক্রমে নাসিকা ও কর্ণমন্দির পরিপাক করিতে লাগিল। অবশেষে স্থলদ্বী বলিলেন, “হে রসিকরাজ, তুমি বড় সাহসী পুরুষ, আমি তোমার হাতে আত্ম-সমর্পণ করিতেছি, আমাকে লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার।”—বাব্বার হাসিয়া বলিল, “বড় খুশী হইলাম, আমার বড় সোভাগ্য—আপনিও আমাকে লইয়া যেকুল খুশী করিতে পারেন।”—যুবতী তখন রোপানিধিত গোলাপবাগে গোলাপজল ও উৎকৃষ্ট চন্দন আনিবার আদেশ করিলেন, যুবতী বাব্বারকে গোলাপ ও চন্দনে অভিষিক্ত করিলেন।

অতঃপর স্থলদ্বী বাব্বারাকে একজন দাসীর সহিত কক্ষান্তরে উঠিয়া যাইবার জন্ত আদেশ করিলেন। বাব্বার বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আমাকে ইহারা কোথায় লইয়া যাইবেন?”—বৃদ্ধা বলিল, “আমাদের মনিবঠাকুরাণী তোমার স্বাবেশ দেখিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তোমার দীতহীন মুখখানি সে বেশে পরম শোভা দারণ করিবে। ইহারা তোমার দাড়ী-গৌফ কামাইয়া জুতে রং করিয়া স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদে সজ্জিত করিবেন।” বাব্বার বলিল, “আমার জু কেন, আমার সর্দাঙ্গ রং কর, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই, কারণ, খুইরা ফেলিলেই রং উঠিয়া যাইবে; কিন্তু আমি আমার দাড়ী-গৌফ কামাইব না, দাড়ী-গৌফ গজাইতে অনেক বিলম্ব হইবে। আমি দাড়ী-গৌফ ফেলিলে ভ্রমলোকের সঙ্গে মিশিব কি করিয়া?”—বৃদ্ধা বলিল, “এই ত তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছ, পিরীতের জন্ত লোক প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়, আর তুমি সামান্য দাড়ী-গৌফ বিসর্জন দিতে আপত্তি করিতেছ?—ছি! তুমি বড় অরসিক! আমার মনিবঠাকুরাণী তোমাকে এত ভালবাসেন, তোমাকে খুশী করিবার জন্ত তাহার এত চেষ্টা, আর তুমি তাহার সামান্য অনুরোধ না রাখিয়া তাহার মনে কষ্ট দান করিবে? দাড়ী-গৌফের মায়া এতটা আমোদ নষ্ট করিবে?”

প্রেমের দ্বারে
দাড়ী-গৌফ
বিসর্জন



বাব্বার অগত্যা দাড়ী-গৌফ কামাইতে রাজী হইল। অনন্তর তাহাকে জন্ত কক্ষে লইয়া গিয়া দাসীরা তাহার দাড়ী-গৌফ কামাইয়া দিল। গৌফ কামাইবার সময় বাব্বার বিবেশ আপত্তি করিল না বটে, কিন্তু দাড়ী কামাইবার সময় সে কিছু অধীর হইয়া পড়িল। তাহার আপত্তি দেখিয়া দাসীরা বলিল, “দাড়ীওরাগা স্ত্রীলোক পৃথিবীতে সর্দাঙ্গ দেখা যায় না, স্ততঃ দাড়ী থাকিলে স্ত্রীলোকের পরিচ্ছদ খাপ খাইবে না, সমস্ত আমোদ মাটা হইবে।”—বাব্বার তখন অগত্যা স্থির হইয়া রহিল, দেখিতে দেখিতে দাড়ী ক্ষুরের মুখে সাফ হইয়া গেল! তাহার পর দাসীরা জু রং করিয়া তাহাকে রমণীর পরিচ্ছদে সজ্জিত করিল।

অতঃপর বাব্বারকে সেই রঙ্গিনী ও তাহার সখীগণের নিকট উপস্থিত করিল, সকলে হাততালি দিয়া হাসিতে লাগিল, বাব্বারের অপরাধ স্তুতি দেখিয়া স্থলদ্বী হাসিতে হাসিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন।

নগদেহে
ত্যা-উন্নাস



যুবতীর এই ভাব দেখিয়া বাক্‌বারা কিছু অপ্রতিভ ও অগ্রসর হইল। রঙ্গবিলাসিনী বলিলেন, “তোমার কাছে
ভেঁটে লাগিয়া আমি সামলাইতে পারিতেছি না। মনে কর ভাই, তুমি আমার ননোর, এখন একটি অম্বরোধ
রাখিলেই, আমার সঙ্গে নৃত্য কর।”—রমণীর পরিচ্ছদে সজ্জিত বাক্‌বারা খেই খেই করিয়া স্তম্ভরী ও তাঁহার
সখীগণের সহিত নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে রমণীগণ বাক্‌বারাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করিতে আরম্ভ
করিল। তারপর বৃদ্ধা বাক্‌বারার কাণে কাণে বলিল, “এইবার তোমার অশ্রু ফিরিবে। স্তম্ভরী এইবার
নগদেহে দোড়াইতে আরম্ভ করিবেন। তুমিও সম্পূর্ণ নগদেহে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দোড়াইতে আরম্ভ করিবে।
স্বরাপানে স্তম্ভরীর মনে উত্তেজনায় স্ফার হইতেছে। নগদেহে তুমি তাঁহার পিছু পিছু ছুটিয়া তাঁহাকে আয়ত্ত



প্রম-
নকর
বান্ধা
বস্ত্র



করিতে পারিলেই তোমার সকল
সাধ পূর্ণ হইবে। বাক্‌বারা মত্ত
পানে তখন এমন অভিভূত
হইয়াছিল যে, সে সানন্দে এই
প্রস্তাবে সম্মত হইল। তরুণীস্তম্ভরী
তখন অঙ্গবাস পরিচ্যাপ করি-
লেন। তাঁহার নগদেহের সৌন্দর্য্য
গৃহ যেন আলোকিত হইয়া
উঠিল। বাক্‌বারাও সমগ্র অঙ্গ-
বরণ তাগ করিল। তরুণী মনো-
মোহিনী তখন নানা উদ্ভাসনাকর
ভঙ্গী সহকারে বাক্‌বারাকে প্রলুব্ধ
করিয়া দোড়িতে আরম্ভ করিল।
স্তম্ভরী যুবতীকে তদবস্থায় দেখিয়া
বাক্‌বারা মদনোন্মত্ত হইয়া তাঁহার
পশ্চাদ্ভাবন করিল। স্তম্ভরী এক
ঘর হইতে অল্প ঘরে হাসিতে
হাসিতে প্রবেশ করিলেন, বাক্-
বারাও তাঁহাকে ধরিবার জন্ত
উন্মত্তের মত ধাবিত হইল।
তাঁহার সর্ক-দেহ তখন বাসনার

তাড়নায় ধর ধর করিয়া কম্পিত হইতেছিল;—ঘন ঘন তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছিল;—নয়নযুগল আরম্ভ
হইয়া উঠিয়াছিল। কিছুকাল এইভাবে দোড়াদোড়ি করিতে করিতে বাক্‌বারা একটা অন্ধকারময়
গলির মধ্যে আসিয়া পড়িল। রমণীগণ তৎক্ষণাৎ সম্মুখের দরজা বন্ধ করিয়া দিল, বাক্‌বারা
অন্ধকারের মধ্যে আর কিছুই দেখিতে পায় না, অনেক চেষ্টায় কিছু দূর অগ্রসর হইয়া, দূরে একটি
আলোক দেখিতে পাইয়া, সে সেই দিকে অগ্রসর হইল;—দেখিল, সম্মুখে রাজপথ; পথে আসিতেই
লোকেরা দেখিল, একটি অদ্ভুত চেহারার মানুষ, দাড়ী-গৌর কামান, জ রং করা, দেহ নগ্ন। তাহার

স্বাক্ষরকে দেখিয়াই 'পাগল পাগল' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, হাসি ও করতালিতে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। কেহ কেহ তাহাকে উদ্ভাব ভাবিয়া বৈরাগ্যত করিল। ইতিমধ্যে সেই পথ দিয়া একটা গাধা ঘাইতে দেখিয়া, তাহার গাধাটাকে ধরিয়া বাক্ষরাকে তাহার পিটে চড়াইল এবং নগর প্রদক্ষিণ করাইতে লাগিল।

ক্রমে সহর ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার কোতোয়ালের বাড়ীর কাছে আসিলে, গোণমালা শুনিয়া কোতোয়াল গোণমালার কারণ অনুসন্ধানে জানিলেন, আমার ভ্রাতা উজীর সাহেবের রক্ষিতা মুন্সীর অন্তঃপুর হইতে অতি অতুলবেশে পথে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াই লোকে হাসি-ভাষা করিতেছে। কোতোয়াল সাহেব তৎক্ষণাৎ বাক্ষরাকে শত বৈরাগ্যভাষার আদেশ করিলেন; তাহার পর তাহাকে নগর হইতে দূর করিয়া দিলেন।

নাগিত বলিল, "আমার দ্বিতীয় ভ্রাতার ইতিহাস এই প্রকার। এখন তৃতীয় ভ্রাতার কাহিনী অনুগ্রহ করিয়া শ্রবণ করুন।"

*** **

আমার তৃতীয় ভ্রাতা অন্ধ, তাহার নাম ফাকিক্। ফাকিক্ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিত। সে নগরের পথবাট এমন সুন্দররূপে চিনিতে যে, তাহাকে কাহারও সাহায্য লইয়া কোন গৃহস্থের বাড়ী ঘাইতে হইতে না; সকলের গৃহস্থারে গিয়া কড়া নাড়িত এবং বতক্ষণ কেহ আসিয়া দ্বার খুলিয়া না দিত, ততক্ষণ কোন কথা বলিত না।

একদিন সে এক গৃহস্থের গৃহস্থারে উপস্থিত হইয়া কড়া নাড়িল, 'কে কড়া নাড়ে' বলিয়া গৃহস্থ ভিতর হইতে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু ফাকিক্ নিরুত্তর! অবশেষে গৃহস্থ দরজা খুলিয়া তাহাকে দেখিতে পাইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও বাপু—ফাকিক্ বলিল, "আমি অন্ধ, আমার মঙ্গল করুন, আমাকে কিছু ভিক্ষা দাও।"—গৃহস্থ বলিল, "হাত বাড়ো।"—সে কিছু অর্থপ্রত্যাশায় হস্ত প্রসারিত করিল। গৃহস্থ তাহাকে কিছু না দিয়া তাহার হাত ধরিয়া সিঁড়ির উপর দিয়া বিতলে টানিয়া লইয়া গেল; তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও?"—ফাকিক্ বলিল, "বলিয়াছি ত' আমি অন্ধ, কিছু ভিক্ষা দাও, আমার তোমার মঙ্গল করিবেন।"—গৃহস্থ বলিল, "আমি প্রার্থনা করি, পরমেশ্বর তোমাকে দৃষ্টিশক্তি দান করুন, এখানে কিছু মিলিবে না।"—ফাকিক্ বিরক্ত হইয়া বলিল, "এ কথা আগে বলিলেই পারিতে, আমাকে উপরে টানিয়া আনিয়া অনর্থক হর্যাপ করা কেন?"—গৃহস্থ বলিল, "আমি যখন দ্বারে কড়া নাড়ে কে, বলিয়া পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম, তখন তুমি উত্তর না দিয়া আমাকে হর্যাপ করিলে কেন?" ফাকিক্ বলিল, "যদি কিছু না দিবে ত' আমাকে যেমন আনিয়াছ, তেমনই নীচে রাখিয়া এসো, আমি সিঁড়ি ঠিক করিয়া ঘাইতে পারিব না।" গৃহস্থ বলিল, "তাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু নাই, আমি ঘাইতে হই, তুমি নিজেই বাও, আমি নামাইতে পারিব না।" অন্ধ রাগ করিয়া গৃহস্থকে গালি দিতে দিতে নীচে নামিতে গেল, কিন্তু সকল সিঁড়ি বহিয়া নামিতে না নামিতে মধ্যপথে যেমন তাহার পদচলন হইল, এমনই সে ধূপ করিয়া একেবারে নীচে পড়িয়া গেল; তাহার মাথা ও কোমরে অভ্যন্ত আঘাত লাগিল। বহু কষ্টে উঠিয়া সে বাহিরে আসিল, গৃহস্থকে আরও অধিক ক্রুদ্ধিত ভাষায় গালি দিতে লাগিল।

তৃতীয়
ভ্রাতার
কাহিনী

অন্ধ ভ্রাতার
সহিত পরিচয়

অনন্তর পথে আসিয়া দুইজন পরিচিত অন্ধের সহিত তাহার মিলন হইল। তাহারা সেই পথ দিয়া ভিক্ষা করিতে বাইতেছিল। তাহারা ফাকিককে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হে, কি মিলিল?” ফাকিক তাহার দুর্দশার কথা বলিয়া বলিল, “আজ ত’ ভাই কিছুই ভিক্ষা মিলাইতে পারিলাম না, চল বাসায় যাই, আমাদের গুপ্তধন হইতে কিছু অর্থ লইয়া খাবার কিনিতে হইবে, আর উপায় কি?” তিনজননে তখন তাহার বাসায় চলিল।

যে গৃহস্থের বাড়ীতে ফাকিক ভিক্ষা করিতে গিয়াছিল, সে জানালা হইতে অন্ধের কথা শুনিতে পাইল। সে লোকটা চোর—অত্যন্ত ধূর্ত। অন্ধগণের গুপ্তধন আছে শুনিয়া তাহা অপহরণের ইচ্ছা তাহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অন্ধদ্বয়ের অনুসরণ করিল। অন্ধেরা একটি বৃদ্ধার বাড়ীতে বাসা লইয়া সেখানে বাস করিত। অন্ধেরা সেই গৃহে উপস্থিত হইল, চোরও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। ফাকিক তাহার বন্ধুদ্বয়কে বলিল, “আগে ভাই দরজা বন্ধ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখি, এ ঘরে অস্ত্রলোক আসিয়াছে কি না?” এই কথা বলিয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিল এবং লাঠি দিয়া ঘরের চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে লাগিল। চোরটা ধরা পড়িবার ভয়ে, আড়া হইতে একগাছি দড়ি কুলিতেছে দেখিয়া, তাহা ধরিয়া শূন্যে কুলিতে লাগিল। অন্ধেরা তাহার অস্তিত্ব বুঝিতে না পারিয়া নিশ্চিন্তমনে বলিল। তখন ফাকিক বলিতে লাগিল, “ভাই, তোমরা আমাকে তোমাদের সকল ধনের তহবিলদার নিযুক্ত করিয়াছ, আমি তোমাদের কাজ অতি সাবধানে চালাইতেছি, আমি বিশ্বাসঘাতক নহি, আমরা যে টাকা এ পর্যন্ত ভিক্ষা করিয়া উপার্জন করিয়াছি, তাহা একত্র করিলে দশ সহস্র মুদ্রা হইবে। সমস্ত টাকা আমি তোড়ান্বী করিয়া রাখিয়াছি।” ফাকিক কতকগুলি ছিন্নবস্ত্রের ভিতর হইতে দশটা তোড়া বাহির করিয়া বলিল, “হেছা হইলে তোমরা টাকাগুলি গণিয়া দেখিতে পার, আগে তোড়াগুলি গণিয়া দেখ, ঠিক আছে কি না?—অপর অন্ধদ্বয় বলিল, “তোমার কথায় ভাই আমাদের অবিশ্বাস নাই, টাকা ঠিক আছে, রাখিয়া দাও।” ফাকিক বলিল, “আজ আমাকে ইহা হইতে এক টাকা লইতে হইতেছে, আজ ত’ কিছু ভিক্ষা মিলে নাই, কিছু খাজদ্রব্য ক্রয় করা আবশ্যক।” একজন অন্ধ বলিল, “আমি যথেষ্ট ভিক্ষা পাইয়াছি, একজন ভাললোক আমাকে নানারকম ফলমূল ও মিঠাই ভিক্ষা দিয়াছেন, এস, সকলে তাহা আহার করি।”

অন্ধ খাজদ্রব্য বাহির করিলে সকলে আহার করিতে লাগিল, চোরও ফাকিকের পার্শ্বে বসিয়া, সেই সকল দ্রব্য আহার করিতে লাগিল। চোর অতি ধীরে ধীরে আহার করিতেছিল, তথাপি তাহার চর্ণগুণ্ড ফাকিক শুনিতে পাইল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, “আমাদের সর্বনাশ হইয়াছে, আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই বাহিরের লোক আসিয়াছে!” সে হাত বাড়াইয়া চোরকে ধরিয়া ফেলিল, এবং ‘চোর চোর’ শব্দে চীৎকার করিয়া তাহাকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল; অন্ধ দুইজন অন্ধও তাহার উপর পড়িয়া কিল, চড়, লাথি প্রভৃতি মারিতে লাগিল, চোরও তাহাদিগকে যথাসাধ্য প্রহার করিয়া ‘চোর চোর’ করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

পল্লীবাগিন্স চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিল, বহুকষ্টে তাহাদের হাত-হাতি বন্ধ করিয়া, তাহাদের বিবাদের কারণ জানিতে চাহিল। আমার ভাই বলিল, “মশায়, এই বেটা চোর, আমাদের যে কিছু সামান্য টাকা আছে, তা চুরি করিবার জন্য এখানে আসিয়াছে।” চোর তৎক্ষণাৎ চক্ৰ ছুটি বন্ধ করিয়া বলিল, “না মশায়, এই অন্ধ মিথ্যাকথা বলিতেছে, আমি ইহাদের

জন সঙ্গী, আমাকে টাকার ভাগ দিতে হইবে বলিয়া, ইহারা আমাকে ধরিয়া মারিতে আরম্ভ করিয়াছে, আপনারা বিচার করুন।” প্রতিবাদিগণ চারিজনকে ধরিয়া কাজীর নিকট লইয়া গেল।

কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া চোর চক্ষু ছুটি মুদিয়াই বলিল, “হজুর, আমরা চারিজনই সমান অপরাধী, কিন্তু আমাদের প্রতিজ্ঞা আছে, আমরা লাঠি না খাইয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ করিব না, আমাদের অপরাধ জানিতে চান ত’ আগে আমাদেরগকে বেত্রাবাস্ত করুন, আমার পিঠেই বেত্রাবাস্ত আরম্ভ করিতে পারেন।” ফাকিক্ কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কাজী তাহাকে চুপ্ করিয়া থাকিতে বলিলেন।

দ্বিশ ঘা বেত খাইয়া চোর এক চোখ খুলিল, এবং বিচারকের দয়াপ্রার্থনা করিতে লাগিল, বিচারক অন্ধকে এক চক্ষু খুলিতে দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং পুনর্বার অধিক বেগে বেত্রাবাস্তের আদেশ করিলেন। আরও পাঁচ সাত ঘা বেত খাইয়া চোর দুই চক্ষু খুলিল। বিচারক জিজ্ঞাসা করিলেন, “রে নরাধম, একপ ব্যবহারের অর্থ কি? তোর কি অন্ধ নহিস্?”—চোর বলিল, “হজুর, আমি আপনাকে আমাদের গুপ্তকথা বলিব, কিন্তু আমার অপরাধ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হউক, অভয় দান করিলে আমি সকল কথা বলিতে পারি।”

কাজী তাঁহার ভূতাগণকে বেত বন্ধ করিতে বলিয়া চোরকে বলিলেন, “আমি তোকে ক্ষমা করিব, স্বীকার করিতেছি, তুমি সকল কথা খুলিয়া বল।” চোর বলিল, “যখন অভয় দান করিলেন, তখন আর বলিতে বাধা কি? মহাশয়, আমরা চারি ভাই, সকলেই আমরা অন্ধের ভাণ করিয়া লোকের স্বদয়ে সহায়ত্বের উদ্দেশ্য করি, তাহাতে আমাদের ভিক্ষার সুবিধা হয়। অন্ধের ভাণ করিয়া আমরা অন্তঃপুরেও খাইয়া থাকি। সুরসিকা যুবতীদের ঘোবনের উত্তেজনাতে চরিতার্থ করিয়া, আমরা গদম স্রুথ ও অর্থ উপার্জন করিয়া থাকি। এই উপায়ে আমরা চারিজন প্রায় দশ হাজার টাকা ভিক্ষা আদায় করিয়া জমায়াছি। আজ সকলে গৃহে আসিলে, আমি আমার সঙ্গিগণের নিকট আমার নিজের প্রাপ্য অংশ বাড়াই হাজার টাকা চাহিলাম, কিন্তু তাহার আমার অংশ আমাকে প্রদান করিতে সম্মত হইল না; তাবিল, আমি আমার ভাগ গ্রহণ করিয়া উহাদিগকে ধরাইয়া দিখ। আমি টাকা আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করায় উহারা আমাকে ফেলিয়া দিয়া কিল, চড়, লাঠি মারিতে আরম্ভ করিল; কি করি, আত্মরক্ষার জন্য আমাদেরও দুই চারিটি বুঁদী মারিতে হইল। এখন ধর্ম্মবতার সকল কথা শুনিলেন, আমার বাড়াই হাজার টাকা আমাকে প্রদানের আদেশ করুন, টাকা লইয়া আমি বাড়ী চলিয়া যাই। ইহারা এখনও চক্ষু মুদিয়া আছে, কিন্তু আশা করি, আমাকে যে পরিমাণ বেত্রাবাস্ত করিয়াছেন, তাহার তিনগুণ বেত্রাবাস্তে ইহাদের চক্ষু খুলিতে পারে।

ফাকিক্ বলিতে চাহিল, “এ চোর মিথ্যাকথা বলিয়া আমাদের সর্বনাশের চেষ্টায় আছে”—কিন্তু কাজী তাহাকে কথা কহিতে দিলেন না, অত্যন্ত ক্রুদ্ধের বলিলেন, “রে হুট! তোরা অন্ধ সাক্ষিয়া এই ভাবে লোককে প্রতারিত করিস্, আমি তোদের প্রাণদণ্ড করিব।”—ফাকিক্ বলিল, “আমরা সাক্ষী, আমরা সত্যই অন্ধ, এ বোটা চোর আমাদের—”

কথা শেষ হইতে না হইতে কাজী সাহেব সরোবে প্রত্যেক অন্ধের প্রতি দুই শত বেত্রাবাস্তের আদেশ দিলেন। কাজীসাহেব মনে করিলেন, যন্ত্রণা পাইলেই ইহারা চক্ষু খুলিবে, কিন্তু কেহই চক্ষু খুলিল না। চোরটা ক্রমাগতই বলিতে লাগিল, “আর ভাই, বুধা অন্ধ সাক্ষিয়া কোন লাভ নাই, বিজ্ঞা জাহির হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু না খুলিলে আর পরিত্রাণ নাই।”—অবশেষে সে কাজীকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

গল্পের কৌশলে
অন্ধত্বের
সর্বনাশ



অন্ধের ভাণে
অন্তঃপুর-
বিহার।



“খোদাবন্দ, ইহারা কিছুতেই চক্ষু খুলিবে না, চিরকাল অন্ধ জাতিয়া প্রভারণা করিয়া আসিয়াছে, এখন খুলিতে ইহাদের চক্ষুগন্ধা হইতেছে। আপনি এখন ইহাদিগকে ক্ষমা করুন, অনুগ্রহ করিয়া আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, আমি আমাদের দশ হাজার টাকা আনিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিতেছি।”

দাঁড়ীর বিচার।



কাজী তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া দশ হাজার টাকা আনিয়া লইলেন এবং চোরকে আড়াই হাজার টাকা দান করিয়া, অবশিষ্ট টাকা আশ্বাস্য করিয়া অন্ধ তিনজনকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিলেন।

লাকিরের এই ধর্ষণার কথা শুনিয়া, আমি তাহার সন্ধান লইলাম এবং তাহাকে গোপনে নগরে আনিয়া লুকাইয়া রাখিলাম। আমি কাজী সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিতে পারিতাম বটে, কিন্তু পাছে আমাকে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই আশঙ্কায় আমি সে চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইলাম। চোরটা অনায়াসে বিনা দণ্ডে অব্যাহতি লাভ করিল।

নাশিতের এই গল্প শুনিয়া অন্তান্ত লোকের হৃদয় খালিও হে হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। নাশিত তাহার তৃতীয় ভ্রাতার কাহিনী শেষ করিয়া চতুর্থ ভ্রাতার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

*** **

চতুর্থ
ভ্রাতার
কাহিনী



আমার চতুর্থ ভ্রাতার নাম আলকুজ, সে একচক্ষুহীন। সে কসায়ের কাজ করিত। মেড়ার লড়াই দেখাইয়া সহরে অনেক গণ্যমান্য লোকের নিকট সে পরিচিত হইয়াছিল। সে দোকানে অতি উৎকৃষ্ট মাংস রাখিত, এমন ভাল মাংস সহরের আর কোন কসায়ের দোকানে পাওয়া বাইত না। তাহার যথেষ্ট টাকা ছিল, যেখানে ভাল ছাগল-ভেড়া পাইত, অধিক মূল্যে তাহাই কিনিয়া আনিত; ভাল জিনিস কিনিবার অল্প অর্থব্যয়ে কিছুমাত্র ক্লেশভা করিত না।

একদিন সে দোকানে বসিয়া আছে, এমন সময় এক বৃদ্ধ, ভায়ার দোকানে মাংস কিনিতে আসিল। বৃদ্ধের দাড়ী যেমন লম্বা, তেমনি শাদা, বৃদ্ধ আসিয়া তিন সের মাংস কিনিল, এবং চক্চকে নুতন কয়টি টাকা বাহির করিয়া দান দিল। আলকুজ দেখিল, টাকাগুলি অত্যন্ত নুতন, সে বাস্তবের একটি স্বতন্ত্র খোপে টাকাগুলি রাখিয়া দিল, অল্প টাকার সহিত তাহা মিশাইল না।

বৃদ্ধ প্রত্যাহ আলকুজের দোকানে আসিয়া তিন সের মাংস ক্রয় করিত এবং সেই প্রকার চক্চকে নুতন টাকা প্রদান করিত। আলকুজও সেই সকল টাকা বাস্তবের স্বতন্ত্র খোপে রাখিত। পাঁচ মাস এই ভাবে গেল, নুতন টাকা অনেকগুলি জুটিল। সেই টাকা দিয়া আলকুজ কতকগুলি ভাল মেথ কিনিবার অভিপ্রায় করিল। অনন্তর বাস্তব খুলিয়া টাকা বাহির করিতে গিয়া দেখে, টাকা নাই। কতকগুলি শুক গাছের পাতা গোল করিয়া কাটা, তাহাই খোপে পড়িয়া রহিয়াছে,—দেখিয়া তাহার চক্ষু খির! সে বাড়ির মত চীৎকার করিয়া পাড়ার লোক জুটাইল, এবং বৃদ্ধ বাহুবিস্তারল তাহার বিরূপ সর্পনাশ করিয়া গিয়াছে, তাহা বলিল; টাকার শোকে সে মাথা ও বৃদ্ধ চাপড়াইতে লাগিল; কাদিতে কাদিতে বলিল, “বুড়োবেটার একবার দেখা পাইলে হয়। ইতিমধ্যে বৃদ্ধও সেই হানে আসিয়া উপস্থিত হইল। আলকুজ তাহাকে দেখিবামাত্র মহাক্রোধে তাহার উপর পড়িয়া তাহার পাকা দাড়ী টানিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে করিতে বলিল, “মুসলমানগণ, এই চষ্ট আমাকে প্রভারণা করিয়াছে, তোমরা সকলে মিলিয়া ইহাকে প্রতিফল প্রদান কর।” গোলমাল শুনিয়া দোকানে অনেক লোক আসিয়া জুটয়াছিল,

বৃদ্ধ বাহুবিস্তার



*



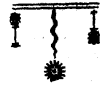
তাঁহাদের নিকট আলকুজ আভোপান্ত সমস্ত ঘটনা বলিল। আলকুজের কথা শুনিয়া, বুদ্ধ কোন প্রকার বিষয় বা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া বলিল, “ভাল চাও ত’ আমাকে ছাড়িয়া দাও, নতুবা তোমাকে এমন জন্ম করিব যে, তখন আর অমৃত্যুও করিলেও বাঁচিবে না।” আলকুজ বলিল, “তুমি আমাকে কি জন্ম করিবে? আমি কাহারও সঙ্গে প্রভারণা করি না, মিথ্যা বাটপাড়ির মধ্যেও থাকি না, টাকা দিয়া ছাগল ভেড়া কিনি, মাংস বিক্রয় করি। তুমি আমাকে ভয় দেখাইয়া কি করিবে?” বুদ্ধ বলিল, “তোমরা সকলে সাক্ষী, এই কসাই মেঘমাংস বলিয়া নরমাংস বিক্রয় করে।” আলকুজ বলিল, “তোবা, তোবা, এই লোকটা আসল বাটপাড়।” বুদ্ধ বলিল, “কখনই নর, আমার কথায় ঈহার অবিশ্বাস হইবে, তিনি ইহার দোকানের মধ্যে গিয়া দেখিয়া আসিতে পারেন; এখনও মৃত্যুকাটা একজন মহাত্ম্যের ধড় ইহার দোকানে মেঘের মত করিয়া ঝুলাইয়া রাখিয়াছে।

সেই দিন সকালে আলকুজ একটি মেঘ কাটিয়া দোকানে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিল। যে সকল লোক বুদ্ধের কথা শুনিয়া, তাহারা সেই কথা কতদূর সত্য, জানিবার জন্ম আলকুজের দোকানে প্রবেশ করিল; —দেখিল, সত্যই একটি মহাত্ম্যের ধড় দড়ি দিয়া ঝুলানো রহিয়াছে। এই বুদ্ধটি সত্যই বাহুকর, বাহুবিন্ধ্য-বলে সে গাছের পাতাকে নূতন টাকার রূপান্তরিত করিয়া আলকুজকে প্রভাবিত করিয়াছিল, এখন আবার মেঘদেহকে মুহূর্ত্তমধ্যে নরদেহে পরিবর্ত্ত করিয়া ফেলিল।

যাহারা সেই নরদেহ দেখিল, তাহারা বুদ্ধকে ছাড়িয়া আলকুজকে মারিতে নারিতে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। এই অবসরে বুদ্ধ একটি অশূলী দ্বিয়া তাহার এক চক্ষু উৎপাটন করিয়া লইল; তাহার পর সকলে আলকুজকে লইয়া কাজী সাহেবের নিকট উপস্থিত করিল। মৃতদেহটাও কাজীর নিকট লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, তিনি তৎক্ষণাৎ আলকুজের অপরাধের চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলেন। বুদ্ধ বলিল, “এই ছদ্মচ্যুর মেঘমাংস বলিয়া নরহত্যা করিয়া তাহার মাংস বিক্রয় করে, অবিলম্বে ইহার প্রাণদণ্ড হওয়া কৰ্ত্তব্য।”—আলকুজ বুদ্ধের প্রদত্ত টাকা পত্র পরিত্যক্ত হওয়ার কাহিনী সবিস্তারে বলিল; কিন্তু কাজী আলকুজের কথার বিশ্বাস করিলেন না; তিনি আলকুজের প্রতি দৃষ্টান্ত বোদ্ধাধাতের আদেশ প্রদান করিলেন; তাহার পর তাহার দোকানে যে কিছু টাকা-কড়ি ছিল, সমস্ত বাজেয়াপ্ত করিয়া আলকুজকে দেশ হইতে নির্বাসিত করিয়া দিলেন। নির্বাসনের পূর্বে গর্দভে আরোহণ করাইয়া আলকুজকে তিন দিন ধরিয়া নগরের সমস্ত পথে ঘুরাইয়া আনা হইল।

যে সময় আলকুজের এই বিপদ ঘটে, তখন আমি বোম্বাদে অশুপস্থিত ছিলাম। যতদিন দেহের বেদনা দূর না হইল, ততদিন আলকুজ গোপনে বাস করিতে লাগিল। তাহার পুত্রের আত্মতই গুরুতর হইয়াছিল। যখন সে চলিতে পারিল, তখন শুশ্রূষা দিয়া একটি দূরবর্তী নগরে উপস্থিত হইল। সেখানে দুই একদিন বিশ্রাম করিয়া আলকুজ একদিন নগরপ্রান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে দূরে বহু অস্বাভাবিক পদশব্দ শুনিতে পাইল। আলকুজ তখন একটি স্তব্ধ অট্টালিকার দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছিল। অস্বাভাবিকতার পদশব্দে সে ভাবিল, রাজকৰ্মচারিগণ তাহাকে ধরিবার জন্ম আসিতেছে। আলকুজ তৎক্ষণাৎ সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিল। দ্বার বন্ধ করিয়া সেই সুশ্রুত অট্টালিকার প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র দুইজন বলবান প্রহরী আসিয়া তাহার ঘাড় ধরিল;—বলিল, “আমার মজি, তুমি নিজে আনিয়াই কাদে পা ধিয়াছি।” গত তিন দিন রাত্রিতে তুমি আমাদের এতই বিরক্ত করিতেছি যে, আমরা এ তিন দিন একটিবারও চক্ষু মুদ্রিতে পারি নাই। আজ তোকে ধরিয়াছি, আর তোর রক্ষা নাই।”

মেঘদেহ বাহুবলে মহাত্ম্যদেহে পরিণত!



গাধা প্রহরীরা বাধা



এই কথা শুনিয়া আলকুজের ভয় ও বিশ্বয়ের পরিসীমা রহিল না। সে মনিয়ে সেই প্রহরীদ্বয়কে বলিল, “জাই তোমরা কি বলিতেছ, আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। তোমরা নিশ্চয়ই আর কাহাকেও মনে করিয়া আমাকে এই সকল কথা বলিতেছ।” প্রহরী বলিল, “আরে থাম, তুই যে একজন ডাকাত, তা কি আমরা জানি না? তুই ও তোর সঙ্গিগণ আমাদের মনিবের সর্বস্ব লুণ্ঠ করিয়া লইয়া গিয়াছিলি, তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া শেষে তাঁহার প্রাণহরণের পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াছিলি; দেখি, তোর হাতে ছোরা আছে কি না? কাল রাত্রে তোর হাতে ছোরা দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তোকে ধরিতে পারি নাই।”— হুর্ভাগ্যক্রমে আলকুজের কাপড়ের মধ্যে একখানি ছোরা লুকানো ছিল, তাহা বাহির হইয়া পড়িল। প্রহরী বলিল, “এখনও মিথ্যাকথা বলিতে সাহসী হইতেছিস? চোর না হইলে কে এ ভাবে সঙ্গে ছোরা লইয়া বেড়ায়?”—আলকুজ প্রাণের দায়ে তাহার কাহিনী বলিল, কিন্তু তাহার পাঠের ক্ষতচিহ্ন তখনও শুকাল নাই, তাহা দেখিয়া প্রহরী বলিল, “তবে রে পাজী” মাথুলোকের পিঠে কি এই রকম মারের দাগ থাকে?”

কাত সন্দেহে
নির্ঘাতন



প্রহরীদ্বয় অবিলম্বে আলকুজকে কাজীর কাছে লইয়া গেল। কাজী তাহাকে বলিল, “তুই চুরি করিতে পরের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলি, উপযুক্ত দণ্ডের জন্ত প্রস্তুত হ’!”—আলকুজ কাজীকে নিজের ইতিহাস বলিয়া নির্দোষিতা প্রমাণের চেষ্টা করিল, কিন্তু কাজী তাহার কথার বিশ্বাস করিলেন না; তাহার পর তাহার পিঠ দেখিয়া, তাহাকে পুরাতন গাজী স্থির করিয়া, একশত বেত্রাঘাতের আদেশ করিলেন। এতদ্বিত্ত তাহাকে গাধার উপরে চড়াইয়া, নগরভ্রমণ করান হইল; একজন রাজকৃত্য সঙ্গে সঙ্গে টাংকার করিয়া বলিতে লাগিল, “যে পরের গৃহে চুরি করিবার জন্ত প্রবেশ করে, তাহার এই শাস্তি।” ক্রমে আমার কর্ণে এই সকল কথা প্রবেশ করিলে, আমি আলকুজকে গোপনে বোণাদে আনিয়া গুপ্তভাবে রাখিলাম।

নাশিত বলিল,—এই কথা শুনিয়া, খালিক আলকুজের দ্রবদৃষ্টের জন্ত দুঃখ প্রকাশ করিলেন এবং আমাকে পুরস্কার প্রদান করিয়া বিদায় করিতে চাহিলেন। আমি বলিলাম, “জীহাপনা, আমার অবশিষ্ট দুই ভ্রাতার কাহিনী অল্পগ্রহ পূর্বক প্রবণ কখন, তাহাও অল্প বিশ্বয়কর নহে।”—খালিকের আদেশে নাশিত তাহার পক্ষম ভ্রাতার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

*** **

জীহাপনা, আমার পক্ষম ভ্রাতার নাম আলুনদার, প্রথমে সে অত্যন্ত অলস ছিল; পিতার স্বদেই সে তাহার জীবিকাতার দিরা নিশ্চিন্ত ছিল। অবশেষে পিতার মৃত্যু হইলে, তাঁহার তাক্ত সম্পত্তি ভাগ করিয়া, আমরা প্রত্যেকে একশত টাকা হিসাবে পাইলাম। এতগুলি টাকা এক সঙ্গে হাতে আসায়, আলুনদার এ টাকা লইয়া কিরূপে ব্যয় করবে, প্রথমে এই চিন্তাতে বিব্রত হইয়া পড়িল। অবশেষে সে এই টাকা দিয়া, কাচের বাসন কিনিয়া ব্যবসায় করিবার ইচ্ছা করিল। কাচের জিনিস খুড়ি-বোকাই করিয়া আনিয়া সে বাজারে একখানি ক্ষুদ্র দোকান ভাড়া লইল, তাহার পর সেই দোকানের জিনিসগুলি ঝোড়া সমেত রাখিয়া ফ্রেতার জন্ত অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রেতা জুটিল না। ভায়া তখন তাহার ভবিষ্যৎ চিন্তা আরম্ভ করিল। পাশেই এক দরজীর দোকান, দরজী শুনিতে পাইল, ভায়া বলিতেছে, “এক শত টাকা দিয়া আমি এই জিনিসগুলি কিনিয়াছি, ইহা খুচরা বিক্রয় করিয়া আমি দুই শত টাকার সংস্থান করিব। ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আমার ক্রমে টাকা বাড়িবে, আমি অবশেষে ইহা হইতে চারি হাজার টাকা লাভ করিব। চারি হাজার হইতে আট হাজার টাকা জমিতে অধিক বিলম্ব হইবে না। যখন দশ হাজার টাকা জমিবে, তখন আমি একখানি জহরতের দোকান করিব। ক্রমে আরও অনেক টাকা উপার হইবে, বিশ পঁচিশ হাজার টাকা জমিলে আমি ঘরবাড়ী করিব, একজন বড়লোক বলিয়া সর্বজন-পরিচিত হইব। বাড়ীতে সর্বদা নৃত্যগীত চলিবে, ক্রমে যখন লক্ষ টাকা জমিবে, তখন আমীর-ওমরাহগণ আমার সহিত বহুবাহুপনের জন্ত লাগারিত হইবে, আমি তখন আর সাধারণলোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব না। উজীরকছাটি শুনিয়াছি বড়ই রূপসী, বড়ঘরের কছাও বটে, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ত উজীরের কাছে লোক পাঠাইব। উজীর আমাকে সংপাত্র বৃষ্টিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আমার হস্তে কছা সম্প্রদান করিবে।—না করিবে কেন? আমি ত’ আযোগা বর নই,—ধন, মান, নাম, রূপ, গুণ সকলই আমার আছে।”

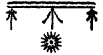
“উজীরকছাকে বিবাহ করিয়া আমি তাহার জন্ত দশটি যুবতী দাসী কিনিব। আমার স্ত্রী তাহার ঘর হইতে কখনও বাহির হইতে পারিবে না, আমাকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করিবে। আমি যখন তাহার নিকট যাইব, বাদশাহের মত বেশভূষা করিয়া যাইব, তাহাকে বৃত্তিতে দিব, আমি তাহার অপেক্ষা ধনে মানে অনেক শ্রেষ্ঠ। আমি কিন্তু তাহার সঙ্গে অধিক কথা কহিব না; এক এক সময় ভারী রাগ করিব। আমার স্ত্রী আমাকে সম্ভট করিবার জন্ত যখন পায়ে ধরিয়া মাগিবে, তখনও রাগ ধামিবে না, এমনই করিয়া পদাঘাতে তাহাকে তফাৎ করিব।”

আল্‌নাশার চিন্তায় এমন বিভোর হইয়াছিল যে, যে সত্য সত্যই সজোরে পদাঘাত করিল, কিন্তু সেই আঘাত তাহার করুণামূলক—রূপবতী উজীরকছার দেহে না লাগিয়া একশত টাকা মূল্যের কাচের দ্রব্যপূর্ণ ঝোড়ায় লাগিল; পদাঘাতের বেগে ঝোড়াটা নীচের বাস্তায় পড়িয়া পেল—দেখিতে দেখিতে কাচের বাসনগুলি চূর্ণ হইয়া শত শত খণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল।

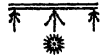
এক দরজী আমার ভ্রাতার প্রলাপ শুনিতেছিল, সে সেই ব্যাপার দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। দরজী বলিল, “তোমার স্ত্রী তোমার নিকট কোন অপরাধে অপরাধী নহে, তথাপি নির্দয় হইয়া এমন ভাবে তাহাকে পদাঘাত করিলে? ইহাতে তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। যদি উজীরের কছার পরিবর্তে তুমি আমার কছার সহিত এমন ব্যবহার করিতে, তাহা হইলে আমি তোমার পৃষ্ঠে এক শত বেত্রাঘাত করিতাম, তাহার পর তোমাকে গাধার চড়াইয়া নগর ঘুরাইতাম।”

এইবার আল্‌নাশারের চৈতন্যোদয় হইল। সে বুক চাপড়াইয়া, চুল ছিঁড়িয়া বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিল। বাজারের সকল লোক তাহার কি হইল দেখিতে আসিল। কেহ তাহার নির্মূল্যতা হাঙ্গল, কেহ তাহার দৃষ্টে আশা বলিল। সে বলিয়া আক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি সম্ভ্রান্ত্র্যবৃত্তী একটি অশ্রুতরে আরোহণ করিয়া, সেই স্থান দিয়া স্থানান্তরে বাইতেছিলেন। আল্‌নাশারের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে করুণার স্ফূর্ত্ত হইল। তিনি সেইখানে থামিয়া, আল্‌নাশারের ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, লোকগুলি অন্ধৃত কারণ গোপন করিয়া বলিল, “লোকটি বড় গরীব, এক হুড়ি কাচের বাসন মাত্র তাহার

ঘরের প্রাসাদ
পদাঘাতে
চূর্ণ।



পদাঘাত
বিড়ম্বনা!



সমল ছিল, দৈবক্রমে পারের আবাঁত লাগিয়া বাসনগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাই সে কাঁদিতেছে।” হুন্দরী তাঁহার সহচর খোজাকে বলিলেন, “তোমার কাছে যত টাকা আছে, সমস্ত ঐ সোকাটাকে প্রদান কর।”—
খোজার কাছে পাঁচ শত স্বর্ণ-মুদ্রা ছিল, তাহা সমস্তই আলনাঙ্গারের হস্তে প্রদত্ত হইল, আলনাঙ্গার কখনও ততগুলি টাকা একত্র দেখে নাই, সে মোহরের খলি পাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল; হুন্দরীকে



করুণা-
অঙ্গীর
দান



আশীর্বাদ করিতে করিতে দোকান বন্ধ করিয়া সে তৎক্ষণাৎ গৃহে চলিল।

তাহার গৃহে প্রবেশের অন্তর্যমণ পরে একটি জীলোক আসিয়া তাহাকে বলিল, ‘বাছা, নমাজের সময় হইয়াছে, আমাকে এক ঘটা জল দাও, হাত-পা ধুইব।’ আলনাঙ্গার দেখিল, রমণী বৃদ্ধা; সে তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিল। আলনাঙ্গার ইতিমধ্যে মোহরগুলি একটি গেজের মধ্যে পুরিয়া ফেলিল। বৃদ্ধা নমাজ শেষ করিয়া উঠিয়া আলনাঙ্গারকে এই উপকারের জন্ত অশেষ ধন্যবাদ প্রদান করিল।

বৃদ্ধার বেরূপ পরিচ্ছদ এবং সে বেরূপ অহনয়বিনয় আরম্ভ করিল, তাহা দেখিয়া আলনাঙ্গার মনে করিল, বৃদ্ধা তাহার নিকট কিছু ভিক্ষা চাহে; আলনাঙ্গার

তাহাকে দুইটি মোহর দান করিতে গেল। বৃদ্ধা বলিল, “আপনি আমাকে এত দ্রবস্থাপন মনে করিবেন না যে, আমি আপনার ভিক্ষা লইব, আমি কি ভিক্ষার জন্ত আপনার ঘরে আসিয়াছি? আমি বাঁহার দাসী, তাঁহার টাকারও অভাব নাই, রূপেরও অভাব নাই।”

আলনাঙ্গার রূপের কথা শুনিয়া গলিয়া গেল। সে সেই বৃদ্ধার কাছে তাহার মনিবাকুরাণীকে দেখিবার প্রস্তাব করিল, বৃদ্ধা আনন্দের সহিত তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল; বলিল, “আপনি ইচ্ছা করিলে তা’ তাঁহাকে বিবাহই করিতে পারেন; তাহা হইলে আপনি অগাধ সম্পত্তির অধিকারী হইবেন। আপনি আমার সঙ্গে চলুন।”

আলনাঙ্গার বৃদ্ধার ধূর্ততা বুঝিতে না পারিয়া, পাঁচশত খান মোহর লগ্নে লইয়া, বৃদ্ধার অঙ্কশয়ন করিল। বৃদ্ধা একটি স্নবহুৎ অটালিকার দ্বারদেখে তাহাকে লইয়া আসিয়া, দ্বারের কড়া নাড়িতেই একটি গ্রীকদাসী

পাটিনীর
শিলকাল
ভাষা।



দ্বার খুলিয়া দিল। বৃদ্ধা আলনাগারকে অসুস্থিত কক্ষে উৎকৃষ্ট আশনে বসাইয়া, তাহার ননিব-
ঠাকুরাণীকে সংবাদ দিতে গেল; অনতিবিলম্বে একটি মধুরহাসিনী রূপবতী যুবতী আসিয়া, সেই কক্ষে
প্রবেশ করিল। রূপ দেখিয়াই আলনাগারের মাথা ঘুরিয়া গেল। যুবতী আসিয়া, তাহার পাশে বসিয়া,
হাসিয়া হাসিয়া ভালবাসার কথা বলিতে লাগিল, তাহার পর বলিল, “এখানে আমোদ-প্রমোদের সুবিধা
হইবে না, চল, কক্ষান্তরে যাই।” যুবতী আলনাগারের হাত ধরিয়া আর এক কক্ষে উপস্থিত হইল।
সেখানে কিছুকাল গল্প করিয়াই, “আসিতেছি” বলিয়া যুবতী উঠিয়া গেল, আলনাগার বসিয়া রহিল।
কিয়ৎক্ষণ পরে একটি কৃষ্ণবর্ণ কাক্রী দাস আলনাগারের সমুখে উপস্থিত হইল, তাহার হস্তে তীক্ষ্ণধার স্বর্ণ।
সেই বিকটমুষ্টি ও বিশাল বজ্র দেখিয়াই আলনাগারের হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। কাক্রী দাস কর্ণশব্দে
বলিল, “কে তুমি?—এখানে কেন আসিয়াছি?” আলনাগার ভয়ে কথা পর্য্যন্ত বলিতে পারিল না।
তখন কাক্রীটা আলনাগারের নিকট হইতে তাহার মোহরগুলি কাড়িয়া লইয়া, তাহার দেহে খড়্গের উঠা দিক
দিয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে লাগিল। আলনাগার ভূমিতলে পড়িয়া মৃতবৎ অবস্থান করিতে লাগিল।
কাক্রীটা ভাবিল, আলনাগারের প্রাণবিরোগ হইয়াছে, তখন সে গ্রীক-দাসীটিকে এক পিগলা লবণ
স্নানিতে বলিল; কাক্রী দাস সেই লবণ দিয়া আলনাগারের ক্ষত মর্দন করিতে লাগিল; আলনাগারের
কাটাধারে গুন পড়াতে তাহার ভরানক যন্ত্রণা হইতে লাগিল, কিন্তু তথাপি সে একটুও নড়িল না;
মৃতের স্থার পড়িয়া রহিল। তখন কাক্রীটা আলনাগারকে টানিয়া, অদূরবর্তী একটি হুড়ঙ্গের মধ্যে ফেলিয়া
দিয়া, হুড়ঙ্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কাক্রী-হস্তে
শ্রোমিক-লাতন।
↑ ↓

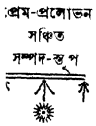
আলনাগার হুড়ঙ্গের মধ্যে পড়িয়া কিছুকাল অজ্ঞান হইয়া থাকিল, কিন্তু তাহার প্রাণবিরোগ হর
নাই; অনেকক্ষণ পরে জ্ঞানসঞ্চার হইল, সে হুইদীন অনাহারে সেই হুড়ঙ্গমধ্যে থাকিয়া, পলাইবার চেষ্টায়
দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে হুড়ঙ্গ হইতে বাহির হইল। পরদিন প্রভাতে বৃদ্ধা গৃহ হইতে বাহির হইবামাত্র
সেই দ্বার দিয়া আলনাগার পথে বাহির হইল এবং আমার নিকট উপস্থিত হইয়া, সকল কথা
প্রকাশ করিল।

একমাস শয্যাগত থাকিয়া আলনাগার নীরোগ হইল। তখন সে সেই বৃদ্ধাকে তাহার অত্যা-
চারের প্রতিকলদানে কৃতদণ্ডন হইয়া, একটি তোড়াতে কতকগুলি কাচ পুরিয়া তাহা কতিদেশে বাধিল
এবং একখানি ছোরা পরিচ্ছদের নীচে লুকাইয়া বৃদ্ধের ছদ্মবেশে সেই স্ত্রচতুরা বৃদ্ধার গৃহদ্বারে আসিয়া
অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ক্রমে প্রভাত হইলে আলনাগার দেখিল, বৃদ্ধা নূতন কোন শিকারের সন্ধানে রাজপথে চলিয়াছে,
আলনাগার বৃদ্ধার নিকটে আসিয়া মোলোয়েমস্বরে বলিল, “মা, আমি পারস্যদেশে হইতে আসিয়াছি, আমার
সঙ্গে পাঁচ হাজার মোহর আছে, কতক মোহর আমাকে ভাঙ্গাইতে হইবে, কোথায় ভাঙ্গাইব বলিতে
পার?” বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ বলিল, “সে জ্ঞা চিন্তা কি, আমার সঙ্গে আইস, আমার ছেলে তোমার
মোহর ভাঙ্গাইয়া দিবে। ভাগ্যে তুমি আমাকে এ কথা বলিলে, অন্য কাহারও কাছে বলিলে হয় ত
তোমাকে কোন বিপদে পড়িতে হইত!”—বৃদ্ধা আলনাগারকে আবার সেই বাড়ীতে লইয়া গেল।
কিয়ৎকাল পরে সেই কৃষ্ণবর্ণ কাক্রীটা আসিয়া তাহাকে তাহার সঙ্গে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল;
কাক্রী আগে আগে চলিল, আলনাগার পশ্চাতে চলিতেছিল, সেই অবসরে আলনাগার তাহার হুড়ঙ্গ ছোরা
বাহির করিয়া কাক্রীর মুণ্ডচ্ছেদন করিল এবং তাহার মুণ্ড ও দেহ টানিয়া লইয়া পিঠা সেই গুপ্তহুড়ঙ্গে নিক্ষেপ

প্রতিহাসা
চরিতার্থ
↑ ↓

করিল। কিয়ৎকাল পরে ক্রীতদাসীটা এক পিালা লবণ লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইল, কিন্তু আলনাঙ্গারকে ছোঁরাহস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া, সে ভয়ে পলাইবার চেষ্টা করিল, আলনাঙ্গার দ্রুতবেগে তাহার চুল ধরিয়া ছোঁয়ার এক আঘাতে তাহার প্রাণনাশ করিল এবং তাহাকেও সেই হুড়কের মধ্যে নিক্ষেপ করিল। গোলামাল শুনিয়া বৃদ্ধা আলনাঙ্গারের নিকটে উপস্থিত হইল, তাহার পর বিপদ দেখিয়া যেমন সে পলায়ন করিতে বাইবে, অমনি আলনাঙ্গার তাহার বাড়ি ধরিয়া সক্রোধে বলিল, “হারাঙ্গাদি, তুই কি আমাকে চিনিব?” বৃদ্ধা কাদিতে কাদিতে বলিল, “তোমাকে আমি কোন পুরুষে দেখি নাই, কেমন করিয়া চিনিব?”—আলনাঙ্গার বলিল, “মনে করিয়া দেখ, আমার বাড়ীতে তুই নমাজ করিতে গিয়া কি বলিয়াছিলি?”—বৃদ্ধা তাহার পদতলে পড়িয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল; কিন্তু আলনাঙ্গার তাহার কাতরতায় কর্ণপাত না করিয়া, ছোঁয়ার এক আঘাতে তাহার শিরশ্ছেদন করিল, তাহার পর তাহার দেহও সেই হুড়কে নিক্ষেপ করিয়া ছোঁরাহস্তে দ্রুতগতি হুন্দরী যুবতীর কক্ষে উপস্থিত হইল।



হুন্দরী তাহাকে দেখিয়াই মুচ্ছিতার ঝায় হইয়া পড়িল; তাহার পর তাহার প্রাণদানের জন্য কাতরভাবে অনুরোধ করিতে লাগিল। আলনাঙ্গার যুবতীকে প্রাণভিক্ষা দান করিয়া বলিল, “হুন্দরি, তুমি এই সকল পিশাচের সহিত কিরূপে একত্র বাস কর, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।” যুবতী বলিল, “আমি কোন সন্তান সদাগরের স্ত্রী। ঐ বৃদ্ধা একদিন আমাদের বাড়ী গিয়া আমাকে বলে, ‘ঠাকুরানি, আমাদের বাড়ীতে একটি বিবাহ আছে, আপনি সেই বিবাহে উপস্থিত থাকিলে আমরা বড়ই আনন্দিত হইব।’—জনিয়া আমি বহুমুগা উৎকণ্ঠ বস্ত্রাঙ্কুরে সাজ্জত হইয়া বিবাহ দেখিতে চলিলাম। বৃদ্ধা আমাকে এখানে আনিয়া আটকাইয়াছে, আজ তিন বৎসর ধরিয়া আমি এখানে অববদ্ধ আছি, এতদিনে তুমি আমাকে উদ্ধার করিলে।”—আলনাঙ্গার বলিল, “ঐ কাক্সী দাসটা যে ভাবে অর্থোপার্জন করিত, তাহাতে বোধ হয়, এতদিনে সে বহু অর্থ সংগ্ৰহ করিয়াছে।” যুবতী বলিল, “অত্যন্ত অধিক, তুমি আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমাকে তাহা দেখাইতেছি।”—আলনাঙ্গার যুবতীর সঙ্গে গিয়া দেখিল, একটি কক্ষে পুঞ্জীভূত অর্থ রহিয়াছে। আলনাঙ্গারের মনে বিশ্বাসের সীমা রহিল না। রাশি রাশি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা স্তূপাকারে সজ্জিত রহিয়াছে, আলনাঙ্গার লুপ্তদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। যুবতী বলিল, “এ সকলই তোমাকে দিলাম, লোকজন আনিয়া সমস্তই তুমি উঠাইয়া লইয়া যাও।”

আলনাঙ্গার গৃহে ফিরিয়া দশজন লোক সংগ্রহ করিয়া, যুবতীর গৃহে প্রত্যাগমন করিল; আদিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই, সেই অন্ন সময়ের মধ্যেই রক্ষিণী সমস্ত ধন লইয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে, শূন্য গৃহ, তবে গৃহে তখনও শাস্ত্রসজ্জা পূর্ণবৎ ছিল। টাকা ও মোহর না পাইয়া আলনাঙ্গার সেই সকল শাস্ত্রসজ্জাই নিজগুহে লইয়া আসিল।

জীর উদাস



পরদিন প্রভাতে কোতোয়ালী হইতে বিশজন সিপাহী আসিয়া, আলনাঙ্গারকে কাজীর কাছে ধরিয়া লইয়া গেল। কাজী বলিলেন, “তুমি কাল তোমার গৃহে যে সকল জিনিসপত্র রাজপথ দিয়া লইয়া গিয়াছ, তাহা কোথায় পাইয়াছ?”—আলনাঙ্গার বলিল, “মহাশয়, আমি আপনাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারি, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন, একরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন।”—কাজী সেইরূপ অঙ্গীকার করিলে আলনাঙ্গার সকল কথা বলিল, অবশেষে কাজী সাহেবকে জানাইল, কাজী ভৃত্যটা তাহার যে পাঁচ হাজার মোহর কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার বিনিময়ে সেই মূল্য পরিমাণ দ্রব্য সে রাখিয়া, অবশিষ্ট দ্রব্য কাজীকে প্রদান করিতে প্রস্তুত আছে।



কাজী তৎক্ষণাৎ আমার ভ্রাতার গৃহে গৌর পাঠাইয়া সমুদয় জব্বা উঠাইয়া লইয়া গেলেন, এবং তাহা আশ্রয় করিয়া আমার ভ্রাতাকে দেশত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন। তিনি আরও জানাইলেন, তাঁহার আদেশ পালন না করিলে আলনাশারের প্রাণদণ্ড করা হইবে। আলনাশার প্রাণভয়ে বোম্বাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া নগরান্তরে গমন করিল। শেষে একদল দল্লী তাহাকে ধরিয়া, তাহার সর্ব্ব্ব কাড়িয়া লইয়া, তাহাকে উদ্ধার করিয়া ছাড়িয়া দিল।

নাশিত বলিল, “আমি ভার্য্যর এই দুর্দ্দশার সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহার অমুসন্ধানে বাহির হইলাম, অনেক চেষ্টার তাহার সন্ধান পাইয়া তাহাকে গোপনে বোম্বাদ নগরে লইয়া আসিলাম, এবং আমার অত্যন্ত ভ্রাতার দ্বারা তাহাকেও পরম যত্নে প্রতিপালন করিতে লাগিলাম।”

নাশিত তাহার পঞ্চম ভ্রাতার কাহিনী শেষ করিয়া, ষষ্ঠ ভ্রাতার কাহিনী বর্ণনার জন্ত খালিফের অমুমতি প্রার্থনা করিল। খালিফের কোতুহল উজ্জ্বলিত বর্দ্ধিত হইতেছিল, সুতরাং তিনি অমুমতি দান করিলে নাশিত আবার বলিতে আরম্ভ করিল।

*** **

আমার ষষ্ঠ ভ্রাতার নাম সাকাবাক্। তাহার ঠোট কাটা। পৈতৃক অর্থের যে শত মুদ্রা তাহার নিজের অংশে পড়িয়াছিল, তাহা লইয়াই সে অর্থোপার্জনে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু অধুনা সাকাল অর্থ খোয়াইয়া অবশেষে সে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। শীঘ্রই সে এই কার্য্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিল, বড়লোকের ঘরে উপস্থিত হইয়া, কন্ঠচরী বা ভূতাগণকে উৎকোচদানে বশীভূত করিয়া, সে ধনবান ব্যক্তিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিত এবং এমন ভাবে তাঁহাদের হৃদয় সহানুভূতিতে আদ্র করিত যে, তাঁহাদের নিকট হইতে টাকা আদায় না করিয়া ছাড়িত না।

একদিন সে দেখিল, একট প্রকাণ্ড অট্টালিকার দ্বারে বহুসংখ্যক ভূতা বসিয়া আছে। সাকাবাক্ ভূতাগণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “তাই এ বাড়ী কাহার?” ভূতারা তাহার প্রশ্নে বিশ্বর প্রকাশ করিয়া বলিল, “তুমি কোথা হইতে আসিবে? এ বাড়ী কাহার, তাহা জান না? এ যে এক রাজপুত্রের বাড়ী।”—সাকাবাক্ জানিত, রাজপুত্রগণ সাধারণতঃ সমুদয় হইয়া থাকেন, তাই সে ভূতাগণকে বলিল, “তাই, আমাকে কিছু ভিক্ষালাভের সুবিধা করিয়া দিতে পার?”—একজন দ্বারবান বলিল, “আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমাকে রাজপুত্রের নিকট লইয়া যাইতেছি, তিনি তোমাকে খুলী করিয়া বিদায় করিবেন।”

আমার ভ্রাতা দ্বারবানের নিকট এতখানি সম্মদরতার আশা করে নাই, সে সমুদ্রচিহ্নে তাহার অমুগমন করিল। সন্মুখের সে অনেকগুলি মুশোভিত কক্ষের ভিতর দিয়া একট কক্ষে উপস্থিত হইল। সেখানে একজন বৃদ্ধ একখানি সোকার বসিয়াছিলেন, তাঁহার সুদীর্ঘ সূক্ষ্ম দাড়ী গৌর দেখিয্য সাকাবাক্ স্থির করিল, এই ব্যক্তিই এ গৃহের অধিকারী। বাস্তবিক তিনিই রাজপুত্র। রাজপুত্র তাহাকে সদয়ভাবে ক্রিয়ঙ্গসা করিলেন, “তুমি কে?” সাকাবাক্ বলিল, “আমি ক্ষুধিত ভিক্ষুক, আপনার নিকট ভিক্ষালাভের আশায় আসিয়াছি।”

তিনি সাকাবাক্কে কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিশ্বর প্রকাশ করিলেন; বলিলেন, “আমি বোম্বাদ নগরে থাকিতে তোমার মত লোক অনাহারে থাকে, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য, ইহা কখনই হইবে না। তোমাকে



ভিন্ন-নিপুণ
রাজপুত্র



আর কোথাও অন্নের চেষ্টার ফিলিতে হইবে না।—সাকাবাক তাঁহার স্বয়ং অধিকতর বিগলিত করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, “মহাশয়, আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আজ সমস্ত দিন আমার কিছুই আহার হয় নাই।”—রাজপুত্র বলিলেন, “কি, এত বেলা পর্য্যন্ত তুমি অনাহারে আছ? আহা! না জ্ঞানি, তোমার কত কষ্টই হইতেছে। ওরে!—কে আছিল, শীঘ্র এক পাত্র জল লইয়া আয়, হাত ধুই।”

জলও আসিল না, কেহ সেখানে উপস্থিতও হইল না; কিন্তু রাজপুত্র যেন ছুইহাত ধুইতেছেন, এই ভাবে হাত কচলাইতে লাগিলেন; সাকাবাককে বলিলেন, “এসো ভাই, হাত ধোও।” সাকাবাক রাজপুত্রকে স্তুমী করিবার আশার সেই ভাবে ছুই হাত কচলাইতে লাগিল।

তাহার পর রাজপুত্র খাদ্যদ্রব্য আনিবার অল্পমতি করিলেন, কিন্তু কেহই খাদ্যদ্রব্য আনিব না। রাজপুত্র তথাপি আহারের ভাণ করিয়া ক্রমাগত হাত মুখে তুলিয়া যেন খাদ্যদ্রব্য আহার করিতেছেন, এই ভাবে চর্ণ করিতে লাগিলেন; সাকাবাককে বলিলেন, “এসো ভাই, খাও।”—সাকাবাকও তাঁহার দৃষ্টান্তের অহুকরণ করিল। রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন “কেমন ভাই, এমন উৎকৃষ্ট খাবার আর কোথাও খাইয়াছ কি?”—সাকাবাক বলিল, “কোথাও না, জীবনে এমন খাবার দেখি নাই, অতি উত্তম—অতি উত্তম।” রাজপুত্র বলিলেন, “পেট ভরিয়া খাও, যে বাবুর্জী এই সকল উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য রন্ধন করে, তাহাকে মাসে পাঁচ শত মোহর বেতন দিতে হয়।—ওরে! মাংস লইয়া আর।”—কেহ মাংস না আনিলেও রাজপুত্র পূর্ব্ব যেন মাংস চর্ণ করিতে লাগিলেন, সাকাবাক বলিল, “ওঃ! বড় খাইয়াছি, পেট একদম ভরিয়া গিয়াছে।” রাজপুত্র ছাড়িলেন না, আর নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্য—হংসমাংস, হুমিট চাটুনি, মধু, নানাবিধ কলের আচার প্রভৃতি আনিবার জন্ত ফরমায়ের করিলেন। কিছুই আসিল না, তথাপি তিনি পরিতৃপ্তির সহিত সেগুলি আহার করিতে লাগিলেন; শতমুখে তাহার প্রশংসা করিলেন; কখন বা আমার ভাতার মুখের কাছে হাত আনিয়া তাহার মুখে খাদ্যদ্রব্য পদান করিতেছেন, এই ভাব দেখাইতে লাগিলেন; ভাইও পরম আগ্রহের সহিত খাইতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশেষে রাজপুত্র কিছু মিঠাই আনিবার কথা বলিলে, ভাতা বলিল, “না, আর আমি খাইতে পারিব না, পেট একেবারে দম্ভ হইয়া উঠিয়াছে।”

রাজপুত্র তখন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “বেশ,—বেশ, গুরুতর আহারের পর কিঞ্চিৎ মজ্ঞান কষ্টব্য।” সাকাবাক বলিল, “আমাকে মাপ করিবেন, আমি মজ্ঞান করি না।” কিন্তু রাজপুত্র তাহাকে মদ না খাওয়াইয়া কিছুতেই ছাড়িলেন না, যে ভাবে আহার হইয়াছিল, সেই ভাবেই মজ্ঞান হইল।

নাবজ্ঞানের
মনব কায়া



মজ্ঞান করিয়া সাকাবাক বলিল, “মহাশয়, অতি উৎকৃষ্ট মজ্ঞ, কিন্তু—কিছু পান্সে বোধ হইল, তেমন স্বাদ নাই ত!”—রাজপুত্র বলিলেন, “স্বাদ কিছু কম বটে, তা আমি খুব কাঁচাওলা মদ তোমাকে দিতে পারি—ওরে কে আছিল?” আবার সেইরূপ ভাবেই উৎকৃষ্ট মজ্ঞ আসিল, এবার সাকাবাক নেশায় যেন একেবারে ভোঁ! সে রাজপুত্রকে এক মুঠাঘাত করিল। রাজপুত্র হাত ধরিয়া বলিলেন, “আঃ! কর কি? একটুকু মদ খাইয়াই নেশা হইল? সেই জন্তই ত’ তোমাকে বেশী কাঁচাওলা মদ দিই নাই। তুমি নিতান্ত পাত্তমাতাল!”—সাকাবাক বলিল, “মজ্ঞপানে আমি বেহুঁস হইয়া এই অস্তার কার্য্য করিয়াছি, আমাকে মাপ করুন, পূর্ব্বই ত’ বলিয়াছি, আমি মজ্ঞপানে অভ্যস্ত নই।”

রাজপুত্র হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “আমি অনেক দিন হইতে তোমার মত একজন লোকের খোঁজ করিতেছিলাম। আমি কেবল তোমার অপরাধ মার্জনা করিলাম না, আজ হইতে তুমি

প্রবরস্ত হইল। তেঁরাকে আর কোথাও যাইতে হইবে না, তুমি আমাকে আজ বড় ভ্রমী করিয়াছ। যাহা হউক, এস এখন প্রকৃতকি কিছু আহার করা যাক।” রাজপুত্র তখন করতালি প্রদান করিবামাত্র কয়েকজন চুতা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে আহাৰীয় জব্য আনিতে আদেশ করিলেন। এবার সত্য সত্যই পরিতোষ পূৰ্বক উত্তরের ভোজন ও মত্তপানের পর কয়েকটি হুম্মরী নর্তকী আসিয়া, বাজব্বয় বাজাইয়া নৃত্যগীত করিতে লাগিল। সাকাবাক একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার ভাগ্যের প্রশংসা করিতে লাগিল। নৃত্যগীত শেষ হইলে রাজপুত্র পরম সন্তুষ্ট হইয়া সাকাবাককে একটি মূল্যবান পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন।

রাজপুত্র আমার ভ্রাতার গুণে

এমন মুগ্ধ হইলেন যে, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি তাহাকে তাঁহার সমস্ত গৃহের ও কাজকর্মের পরিদর্শকপদে নিযুক্ত করিলেন। সাকাবাক বিশ বৎসরকাল প্রভুর সন্তোষ সহকারে তাহার কর্তব্য সম্পাদন করিল। অবশেষে বার্ককা উপস্থিত হইলে প্রকৃতির অজন্ম: বিধানে তাঁহার মৃত্যু হইল। রাজপুত্রের পুত্র-কন্যাদি কেহ ছিল না, তাঁহার সম্পত্তি সরকারে রাজস্বগণ্ড হইয়া গেল, সমস্ত সঙ্গে সাকাবাক যাহা কিছু সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহাও গেল। সন্দেহান্ত হইয়া সাকাবাক মকামলগে যাত্রা করিল, কিন্তু পথে একদণ্ড হ্রদ্বাস্ত দম্মার হস্তে অত্যাচারী তীর্থধাত্রিগণের সহিত তাহাকে বন্দী হইতে হইল।

দম্মাগণ সাকাবাককে ক্রমাগত বেদ্রাঘাত করিতে লাগিল, যদি



কেহ কিছু অর্থ দান করিয়া তাহাকে উদ্ধার করে, এই আভিপ্রায়ে দম্মারা তাহাকে দিবারাত্রি পীড়ন করিতে লাগিল। দম্মাগণকে তাহার ভ্রববহার কথা জানাইলেও তাহাদের মনে দম্মার সঞ্চার হইল না। অবশেষে তাহার নিকট টাকা পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া, দম্মাপতি ক্রুদ্ধ হইয়া, ছুরি দ্বারা সাকাবাকের অধরোষ্ঠ বিখণ্ডিত করিয়া দিল।

দম্মাপতির একটি হুম্মরী স্ত্রী ছিল, দম্মাপতি স্থানান্তর গমন করিবার সময় সাকাবাককে তাহার স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া যায়। স্ত্রীটি সাকাবাককে ভালবাসিয়া কেঁচি, নানা প্রকার প্রশ্নের লক্ষণও দেখাইতে লাগিল; কিন্তু পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয় ভাবিয়া, সাকাবাক্তাহার প্রতি অস্বস্তি প্রকাশে বিরত রহিল। পরন্তু স্ত্রীলোকটি কিছুতেই বিরত হইল না, অবশেষে সে একদিন তাহার স্বামীর সম্মুখেই সাকাবাককে

দম্মা-
প্রমো-
দিনী
প্রমত্ত

দম্মা-শিবিরে
ভীষণ নিগ্রহ



বিজ্ঞপ করিল, সাক্ষাৎকও সেদিন তাহার দুর্ভাগ্য বশতঃ বিজ্ঞপের উত্তর প্রদান করিল। দম্ব্যপতি তৎক্ষণাৎ বুকিল যে, ইহার পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তখন দম্ব্যরাজ আমার ভ্রাতার প্রতি যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিয়া, তাহাকে এক মরুপর্কতে নির্ক্ষিপিত করিয়া আসিল। পরে লোকমুখে ভ্রাতার নির্ক্ষাসন-সংবাদ পাইয়া আমি দেখানে গমন করিলাম এবং তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিলাম।

প্রেমব্যাধি
আবেগের
পুঙ্খবান !



নাপিত বলিল, “আমি খালিফ মন্তোনসার বিহার নিকট এই কাহিনী কীর্তন করিলে, খালিফ আমাকে মুক্তকণ্ঠে সাধুবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, “তোমাকে লোকে নির্ক্ষাক্ মহুজ্জ নাম দিয়া তোমার প্রতি স্তুতিচার করিয়াছে; কিন্তু তুমি আমার রাজ্যভাগ করিয়া চলিয়া যাও, ইহা আমার ইচ্ছা, তাহার বিশেষ কারণও আছে; অতএব অবিলম্বে এ রাজ্য পরিত্যাগ কর, এ রাজ্যে আ। কখনও পদার্পণ করিও না।” অগত্যা আমিও বোন্দাদে পরিত্যাগ করিতে হইল। বহু বৎসর ধরিয়া আমি অনেক রাজ্যপরিভ্রমণের পর সংবাদ পাইলাম, খালিফের মৃত্যু হইয়াছে, তখন আমি বোন্দাদে প্রত্যাগমন করিলাম, কিন্তু দেখিলাম, আমার ভ্রাতৃগণ সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। আমি বোন্দাদে প্রত্যাগমনের পর ঐ খঞ্জ যুবকটির প্রেমব্যাধি আরোগ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দূরের কথা, তিনি কি ভাবে আমার সহিত ব্যবহার করিলেন, তাহা আপনারা দেখিয়াছেন। বাহা ইউক, তাহার প্রতি আমার যথেষ্ট অস্বরাগ ছিল, তিনি আমার ভয়ে বোন্দাদে পরিত্যাগ করিলেও আমি তাহার অহুসরণে নিবৃত্ত হইলাম না, অনেক সন্ধানে আজ ইহাও তাহাকে এখানে দেখিতে পাইলাম; কিন্তু তিনি আমার প্রতি বিাগ প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেলেন।”

দরজী নাপিতের কাহিনী কীর্তন করিয়া বলিতে লাগিল,—“নাপিতের কথা শুনিয়া বৃথিতে পরিলাম, সে প্রকৃতই দোষী, ভদ্রসমাজে তাহার স্থান হইতে পারে না, তথাপি আমরা তাহার সহিত একত্র বসিয়া আহারাদি শেষ করিলাম, সন্ধ্যা হইলে নির্মিত্ত ব্যক্তিগণ স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন। আমি দোকানে আসিয়া বসিবার অল্পকাল পরে আপনার কুঞ্জ ভাঁড়কে দেখিলাম, তাহার গান শুনিয়া আনন্দিত হইলাম এবং তাহার নৃত্যগীতে আমার ক্রীকে আনন্দিত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে আমার গৃহে লইয়া চলিলাম, দেখানে কিরূপে তাহার মৃত্যু হইল, তাহা পূর্বেই জাঁহাপনার গোচর করিয়াছি।”

কাসগারের স্থলতান এই সকল কাহিনী—বিশেষতঃ খঞ্জ যুবকের প্রেমকাহিনী শ্রবণ করিয়া, অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং চারিজনকেই ক্ষমা করিয়া বলিলেন, “সেই অজ্ঞত নাপিত কোথায়, তাহাকে আমি দেখিতে চাহ।”—স্থলতান দরজীর সহিত লোক পাঠাইয়া অবিলম্বে তাহাকে রাজসভায় ধরিয়া আনাইলেন।

স্থলতান দেখিলেন, নাপিতের বয়স প্রায় নব্বই বৎসর হইবে; দাড়ী গোঁফ ও ক্র পাকিলা সাদা হইয়া গিয়াছে, নাক অতিরিক্ত লম্বা, কাণ দুটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে; তাহার মুখ দেখিয়াই স্থলতানের হৃদয়সংকট করা কঠিন হইয়া উঠিল।

‘নির্ক্ষ-ক-
মহু-য্যর’
কৌতুহল



স্থলতান বলিলেন, “হে নির্ক্ষাক্ মহুজ্জ, তোমার মুখে একটি গল্প শুনিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইয়াছে, একটি গল্প বল।”

নাপিত বলিল, “খোদাবন্দ, এই চারিজন লোক এখানে কোন অপরাধে মর্দাতে পড়িয়া আপনার মার্জনাভিক্ষা করিতেছে, আর ঐ কুজুটাই বা এখানে মর্দার মত পড়িয়া রহিয়াছে কেন, জানিবার জন্য বড় উৎসুক হইয়াছি। অগ্রে আমার এই কৌতুহল নিবারণ করুন।”

সং: ১১/৬০ নং ১৮

স্বলতান সকল কথা বলিলে, নাপিত কুজের সর্বাঙ্গ বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। স্বলতানের সম্মুখে নাপিত একরূপ বেগদবী প্রকাশ করিতেছে দেখিয়া স্বলতান নাপিতের উপর রাগ করিলেন। তখন নাপিত বলিল, “খোদাবন্দ, এই লোকটা মরে নাই, অজ্ঞান হইয়া আছে মাত্র, দেখুন, আমি উহার প্রাণদান করি।—আমি কেবল নির্ভীক মনুষ্য নহি, আমি অশেষ-গুণাবিত, চিকিৎসাশাস্ত্রেও আমার ক্ষমতা আছে।”

নাপিত একটা সন্ন্যাসী দিয়া কুজের গলার কাঁটা টানিয়া বাহির করিল। দেখিতে দেখিতে কুজ বাঁচিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কাসগারের স্বলতান নাপিতের গুণদর্শনে এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাহাকে বৃত্তিধান করিয়া, রাজসভায় রাখিলেন; দরজী, ভাণ্ডারী, চিকিৎসক ও ঘৃষ্ঠান সদাগরকে বহুমুগা পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

কুজের
পুনরুত্থান
↑
সূর্য

কুজের যুযু উপনকে যে সকল কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল, স্বলতান শাহারজাদীর মুখে তাহা শ্রবণ করিয়া, দিনাজাদী অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিলেন; স্বলতান শাহরিয়ারও সেই প্রশংসার যোগদান করিলেন। স্বলতান শাহারজাদী বলিলেন, “স্বলতান যদি আমাকে নিশাশেষে বধ না করেন, তাহা হইলে খালিফ হারুণ-অল-রশিদের প্রিয়বস্ত্র আবুল হাসেন আলী, আবু বেকার ও সামসেল নীহারের এমন এক অপূর্ণ কাহিনী বলিতে পারি, যাহা এ সকল গল্প অপেক্ষাও মনোরম।”—শাহারজাদীর সৌন্দর্য্য ও গল্প-ব্রূহাণানে প্রনত স্বলতান সেই কাহিনীশ্রবণের আগ্রহ প্রকাশ করিলে, শাহারজাদী প্রেমোজ্জ্বল মুখে হাসিরা হুগা উচ্ছ্বিত করিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন।

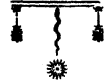


খালিফ হারুণ-অল-রশিদের রাজত্বকালে বোম্বাদ নগরে একজন চিকিৎসক বাস করিতেন, তাঁহার নাম আবুল হাসেন আবু তাহের। লোকটির টাকাকড়ি ছিল, লোকজনের সহিত মিশিবারও ক্ষমতা ছিল। বুদ্ধিমান ও নম্র বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিত। খালিফ তাঁহাকে বড় বিশ্বাস করিতেন, তিনি প্রত্যহই সন্তঃপুরস্থ হুন্দরীগণের যে সকল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তাহা সকলেরই মনোনীত হইত।

তাঁহার গৃহে বহু সৎলোকের সমাগম হইত। তাঁহাদের মধ্যে যে যুবকের সহিত আবু তাহেরের সর্বাঙ্গাঙ্গ অধিক বন্ধুত্ব হইয়াছিল, তাঁহার নাম আবুল হাসেন আলী আবু বেকার। আবু বেকার পারস্ত দেশের রাজকুমার। এই যুবক যেমন হৃৎকুশ ছিলেন, সেইরূপ অদ্যমান্ত গুণেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। যে তাঁহাকে দেখিত, তাহাকেই তাঁহার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতে হইত। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেমন মিষ্ট ছিল, বর্ণনাভঙ্গীও সেইরূপ সুন্দর ছিল। এইরূপ নানাগুণে-ভূষিত ব্যক্তির প্রতি গুণগ্রাহী আবু তাহের যে অন্নদিনের মধ্যেই অমররক্ত হইয়া পড়িবেন, ইহা কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

রাজকুমার আবু বেকার একদিন আবু তাহেরের গৃহে গমন করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে কিয়ৎকাল অবস্থানের পর দেখিলেন, দশজন দাসী-পরিবেষ্টিত হইয়া, একটি রূপবতী যুবতী একটি কক্ষ ও

আবদুল
হাসেন
ও
দামামেল
নীহারের
কাহিনী



চোখে-মুখে
প্রেমের ভাষা



শেতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বতর হইতে অবরোধ করিয়া, সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন। আবু বেকার সদস্যানে
সুন্দরীর অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাকে সুবর্ণখচিত আগনে উপবেশন করাইয়া, তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান
হইলেন। সুন্দরী অবগুষ্ঠন উদ্যোচন করিলে তিনি দেখিলেন, মুখখানি বড় সুন্দর, এমন সুন্দর মুখ তিনি আর
কখন দেখেন নাই; ভ্রমরকৃষ্ণ, আরত চকু দেখিয়াই আবু বেকার মোহিত হইলেন, তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া
উঠিল, আবু বেকারকে দেখিয়া সুন্দরীর হৃদয়ও আগোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারা পরস্পর
পরস্পরের প্রতি চাহিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে কক্ষান্তরে আবু তাহেরের সহিত সুন্দরীর প্রয়োজনীয় কাজ শেষ হইল। তাঁহার



সহিত যে কথা ছিল, তাহা শেষ
করিয়া সুন্দরী আবু বেকারের
পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু
তাঁহাকে বলিলেন, “ইনি পার্শ্ব-
রাজকুমার; নাম আবুল হাসেন
আবু বেকার। সম্ভ্রান্তি ইনি
বোঙ্গাদ নগরে অবস্থান করিতে-
ছেন।”

আবু বেকার এইরূপ উচ্চ-
বংশোদ্ভব, এই পরিচয় পাইয়া,
সুন্দরী অপাত্রে প্রণয়স্থাপন করেন
নাই ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি উৎফুল্ল
হইলেন; আবু তাহেরকে বলি-
লেন, “আপনি যে দিন আমার
গৃহে বাইবেন, সেদিন অল্পগ্রহ
করিয়া আপনার বন্ধুকেও সঙ্গে
লইয়া বাইবেন। আপনারদের
উভয়েরই নিমন্ত্রণ থাকিল, আমি
যথাসময়ে দাসী পাঠাইয়া দিব।
আপনি যদি অল্পগ্রহ করিয়া

আমার এই অল্পরোধ রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমি আপনার উপর বড় রাগ করিব, এ জীষনে
আর কখন আপনার গৃহে পদার্পণ করিব না।”—আবু তাহের মুহূর্ত্তে বলিলেন, “আপনার অল্পরোধ
আমি কখনও অগ্রথা করিব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।” যুবতী তাঁহার অশ্বতরে আরোহণ করিয়া
যে ভাবে আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে প্রস্থান করিলেন।

যুবতী চলিয়া গেলেও আবু বেকার অনেকক্ষণ পর্যন্ত সপ্রেম-দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিলেন,
আবু তাহের তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “তোমার এই ভাব দেখিয়া লোক হাসিবে।” আবু বেকার
বলিলেন “ভাই, এত দিনে আমার মনপ্রাণ সকলই চুরি গেল, এই রমণী আমাকে তাঁহার প্রেমকাঁদে

প্রথম
মিলনে
প্রেমের
ফাঁদ

বন্দী করিয়াছেন, আমি তাঁহার বিরহ-যজ্ঞ সাহা করিতে পারিব না। বল ভাই, এরমণী কে ?”—
আবু তাহের বলিলেন, “হিন বিখ্যাত সামসেল নীহার, ইনি আমাদের খালিফের প্রধান সখী ; খালিফ
ইহাকে অত্যন্ত প্রেম করিয়া থাকেন। আমার প্রতি আদেশ আছে, যুবতী যখন যে দ্রব্য চাহিবেন,
আমাকে তাহাই সরবরাহ করিয়া দিতে হইবে।”

আবু তাহের এই যুবতী-সখীকে তাঁহার বন্ধুর সহিত নানা কথা বলিতে লাগিলেন ; তাঁহাকে বুঝাইয়া
দিলেন, এই যুবতীর প্রতি অমূল্য হইলে ভবিষ্যতে তাঁহার যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে ; কিন্তু আবু
বেকারের চিন্তাবিকার তাহাতে দূর হইল না, বরং যুবতীকে লাভ করিবার আশা দুরাশামাত্র বুঝিয়াও তিনি
অধিকতর আগ্রহান্বিত হইলেন।

আবু বেকারের এই অবস্থা হইলেও যুবতীর মানসিক অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিল। তিনি
ক্রমাগত চিন্তা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে তাঁহার প্রেমাঙ্কুরা পরিতৃপ্ত হইতে পারে। তিনি বিরহ-
যজ্ঞের অধীরা হইয়া, আবু তাহেরের নিকট একটি দাসী পাঠাইয়া, তাঁহাকে প্রাসাদে উপস্থিত
হইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন ; আবু বেকারকে সঙ্গে লইয়া আসিবার জন্তই বিশেষ অনুরোধ করিলেন।
দাসী যে সময় আবু তাহেরের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন আবু বেকার সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। দাসী
আসিয়া তাহার বক্ষ্য নিবেদন করিলে, উভয়েই তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাসীর অন্তঃস্বামী করিলেন এবং যথা-
সময়ে খালিফের প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। সামসেল নীহারের জন্ত প্রাসাদের একটি অংশ নির্দিষ্ট
ছিল, সেখানে দুই বন্ধুতে প্রবেশ করিলে, দাসী তাঁহাদিগকে আসনগ্রহণের জন্ত সন্নিবেশ অনুরোধ
জানাইল। সামসেল নীহারের মহলের ঐশ্বর্য দেখিয়া পারস্ত-রাজকুমার মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, পৃথিবীতে
এমন সুন্দর স্থান, এত ঐশ্বর্যের সমাবেশ তিনি আর কোথাও দেখেন নাই। কিছুকাল পরে ক্রমবর্ধ
কায়োভ্য অতি উপাদের ও মুখপ্রিয় খাজদ্রব্যসমূহ লইয়া আসিল। প্রেমের হাসি হাসিয়া প্রেমময়ী
তাঁহাদিগকে আহ্বারার্থ অনুরণ করিলেন, এবং সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্যগুলি আহ্বার করিবার জন্ত সাদরে
অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে অজান্ত ভূতেরা উৎকৃষ্ট মত্ত লইয়া উপস্থিত হইল। আহ্বার শেষ হইলে তাঁহারা পরিতৃপ্তির
সহিত মত্তপান করিলেন। অনন্তর স্বর্ণপাত্রের বিবিধ প্রকার গন্ধদ্রব্য ও চন্দন আনীত হইলে, যুবকর
তাহা দ্বারা দাড়ী-গৌক ও পরিচ্ছদ সুরক্ষিত করিয়া লইলেন।

আহ্বারাদি শেষ হইলে তাঁহারা সেই অপূর্ণ প্রাসাদের শোভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চারিদিকে
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিচিত্র ভাস্কর্য সন্ধান করিয়া, তাঁহারা পুনঃ পুনঃ বিষয় প্রকাশ করিলেন। সামসেল
নীহারের এই পরম রমণীয় প্রাসাদের নাম “আনন্দ-নিকেতন।” আবু তাহের তাঁহার বন্ধুকে কথাপ্রসঙ্গে
পুনর্বার এই প্রণয়ব্যাখ্যা হইতে স্তব্ধ হইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন এবং ইহাতে তাঁহার মনের আশা
নাই, তাঁহাও পুনঃ পুনঃ জানাইয়া দিলেন।

কিন্তু তাঁহাদিগের কথা শেষ হইতে না হইতেই নর্তকী ও গায়িকাদল আসিয়া, তাঁহাদের চিত্তবিনোদনের
জন্ত নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। গায়িকাদল যে গান করিল, তাহা রাজপুত্র আবু বেকারের হৃদয়ভাবেরই
প্রতিচ্ছবি। সেই গান শুনিয়া তিনি মোহিত হইলেন, তাঁহার হৃদয়ের আবেশ শতগুণে উজ্জ্বলিত
হইয়া উঠিল। তিনি শতগুণে গায়িকার প্রশংসা করিলেন। অবশেষে বিশজন সুন্দর পরিচ্ছদধারী ভৃত্য
একখানি সুদৃশ্য রোপ্য-সিংহাসন লইয়া আসিলে, সামসেল নীহার সেই সিংহাসনে উপবেশন করিলেন



এবং মন্তক আন্দোলন করিয়া যুবকদ্বয়কে অভিবাধন করিলেন। তাঁহার দৃষ্টি পারস্ত-রাজকুমারের মুখমণ্ডলে আবদ্ধ রহিল। উভয়ের হৃদয় উভয়ের নিকট প্রকাশিত হইল, কেহই মনোভাব গোপন করিতে পারিলেন না।

অতঃপর পুনর্বার নৃত্যগীত আরম্ভ হইল। এবারও সেই প্রেমের সঙ্গীত। সঙ্গীতের তিতর দিয়া যেন দীর্ঘনিশ্বাস ও আকুলতা অনুরণিত হইতে লাগিল। উভয়ের প্রাণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা হ্রতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। আবু বেকার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি অগায়ক ছিলেন, বীণার সহিত সুর মিশাইয়া মধুর স্বরে গান করিতে লাগিলেন; তাঁহার হৃদয়ের সকল ভাব গানে উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।—ক্রমে গান থামিয়া গেল, বীণার স্বাক্ষর নীরব হইল।

সুরভবকে
প্রশংসা-নিবেদন

এবার সামসেল নীহার গান আরম্ভ করিলেন। কি সুন্দর কণ্ঠস্বর! কি সুন্দর সঙ্গীত! মানবীকর্ষে তাহা সম্ভব বলিয়া আবু বেকারের বিশ্বাস হইল না। সঙ্গীতের প্রত্যেক তরঙ্গ আবু বেকারের হৃদয়কে যেন বুঝাইয়া—ভাষাইয়া কোন অজ্ঞাত রাজ্যে লইয়া গেল, তিনি আত্মবিস্মৃতের ভাষা বসিয়া রহিলেন, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইল; নয়নে স্বন্দরীর রূপ-মাধুরী দেখিতে দেখিতে, কর্ণে সেই মধুর ধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে তিনি সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত চিত্রাপিতের ভাষা স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। এইরূপে প্রণয়ী ও প্রণয়িনী—যুবক ও যুবতী স্ব স্ব সঙ্গীতে তাঁহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। সঙ্গীত শেষ হইলে যুবতী উঠিলেন, যুবকও আসন ত্যাগ করিলেন, দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উভয়ে উভয়ের আলিঙ্গনাপাশে আবদ্ধ হইলেন। তাঁহাদের মানসিক বিকার এত প্রবল হইয়াছিল যে, যদি দাসীগণ তাঁহাদিগকে না ধরিত, তাহা হইলে উভয়েই মৃচ্ছিত হইয়া ধরাভাগে নিপতিত হইতেন। দাসীগণ প্রণয়-যুগলকে ধরিয়া একখানি মোফার উপর উপবেশন করাইল এবং তাঁহাদের চক্ষুতে ও মুখে গোলাপ দিগ্ধন করিয়া, তাঁহাদের চৈতন্য-সঞ্চার করিল।

সংজ্ঞালাভ করিয়া, সামসেল নীহার চতুর্দিকে দৃষ্টিনিষ্কপ করিলেন, কিন্তু আবু তাহেরকে দেখিতে পাইলেন না। আবু তাহের তখন লজ্জিত হইয়া কক্ষান্তরে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, তাঁহাদের এই প্রণয়ভিনয় লইয়া হয় ত কোন বিপদ উপস্থিত হইবে। সামসেল নীহার প্রকৃতিস্থ হইবামাত্র, আবু তাহের তাঁহার সন্নিকটবর্তী হইলেন।

আবু তাহের সামসেল নীহারের নিকট উপস্থিত হইলে, যুবতী করুণস্বরে বলিলেন, “আবু তাহের, আপনার অল্পগ্রহ ভিন্ন আমি কখনই পারস্ত-রাজকুমারের সহিত মিলিত হইতে পারিতাম না, একজ্ঞ আপনার নিকট আমি অশেষ প্রকারে কৃতজ্ঞ, এ কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করা কদাচ আমার সাধ্য হইবে না। আপনার অল্পগ্রহেই আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রূপবান্ ওপবান্ ব্যক্তির প্রণয় লাভ করিয়াছি, আমি চিরজীবন একজ্ঞ আপনার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া রহিব।” আবু তাহের মাথা নাড়িয়া সামসেল নীহারের কথায় সায় দিলেন।

নিরাশার
মের অবসান

তাঁহার পর সামসেল নীহার পারস্ত-রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “রাজপুত্র, আমি বুঝিয়াছি, আপনি সত্যই আমাকে ভালবাসেন। আমার প্রতি আপনার প্রণয় বতই অধিক হউক, আপনার প্রতি আমার প্রণয়ও সামান্য নহে, ইহাও সমান প্রবল। আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রণয় বতই প্রগাঢ় হউক, এ প্রণয়ের ফল কেবল যত্না, কষ্ট, অন্তর্দাহ, নিরাশা; ইহা ভিন্ন আর কোন ফল দেখিতে পাইতেছি না। আলা বাহা করেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকা ভিন্ন আমাদের অজ উপায়



নাই; অদৃষ্টে বাহা আছে, তাহা লইয়াই আশাদিগকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। আপনার প্রতি আমার ভালবাসা, আমার হৃদয়ের সর্বস্ব অধিকার করিয়াছে।" আবুল হাসেন বলিলেন, "ঠাকুরানি, আপনি বাহা বলিলেন, আমিও তাহা ভিন্ন অন্য কিছু বলিবার তাহা পাইতেছি না। যদি আপনি আমার প্রণয়ে মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ করেন, তাহা হইলে আমার প্রতি বড়ই অত্যাচার করা হইবে। এ প্রেম চিরস্থায়ী, ইহা জীবনের অঙ্গীভূত, যখন জীবন বাইবে, তখন আমাদের সমাধিতে পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব বর্তমান রহিবে; দারিদ্র্য, দুঃখ, পীড়ন, নিন্দা, কোনপ্রকার বাধা ইহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না; কখনই এ প্রণয়ের হ্রাস হইবে না।" আবুল হাসেনের চক্ষুপ্রান্ত হইতে অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল, সামসেল নীহারও অশ্রুশ্রোতে বাধা দান করিতে পারিলেন না।

আবু তাহের বলিলেন, "ঠাকুরানি, আপনারা এ ভাবে আক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরের প্রণয়ধাতে সন্মত হইয়াছেন বলিয়া জানিল প্রকাশ করুন। আপনার এই দুঃখের কোন কারণ আমি অজ্ঞান করিতে পারিতেছি না। এখন এই প্রথম মিলনের মধ্যেই যখন আপনার এত আক্ষেপ, তখন বিরহকালে কি করিয়া যে আপনি দৈর্ঘ্যধারণ করিবেন, তাহা আমি অজ্ঞান করিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছি না। আমার অনেকদুঃখ এখানে আসিয়াছি, আর অধিককাল এখানে থাকাও সম্ভব নহে।"

সামসেল নীহার বলিলেন, "নিষ্ঠুর, এ কথা বলিতে কি আপনার মনে একটুও কষ্ট হইল না? আমার চক্ষু অশ্রু দেখিয়া, আমার মনের কষ্ট বুঝিয়াও আপনি কি করিয়া এমন কঠিন কথা বলিতে পারিলেন? হা অদৃষ্ট! আমি যে স্বপ্ন চাই, তাহা সর্বক্ষণ আমাকে ভোগ করিতে দিতেছ না কেন? কেন আমার প্রণয়স্পন্দ প্রিয়তমের সহিত মিলনের মধ্যে বিচ্ছেদ আসিয়া, আমার প্রাণিত স্বপ্নের মধ্যে বাতানর সৃষ্টি করিতেছে?"

কণিক মিলনে
তৃপ্তি কোথায়?
সুখ দুঃখ

অনন্তর সামসেল নীহার একজন দাসীকে ইঞ্জিত করিতেই সে গোপাটেবিলে কতকগুলি স্নিগ্ধ ফল আনিয়া রাখিল। সামসেল নীহার দুই একটি স্নিগ্ধ ফল তুলিয়া আবুল হাসেনের মুখে দিলেন, আবুল হাসেনও কয়েকটি ফল স্বহস্তে তাঁহার প্রণয়িনীর মুখে তুলিয়া মিলেন। সামসেল নীহার আবু তাহেরকেও তাঁহাদের ফলাহারে যোগদান করিতে বলিলেন। আবু তাহের অস্বরোধ এড়াইতে না পারিয়া দুই একটি ফল মুখে তুলিলেন। তাহার পর স্বর্ণভূষায়ে জল ও রৌপ্যানিধিত গামলা অনীত হইলে, সকলে হাত-মুখ প্রক্ষালন করিলেন। তাঁহার্য উপবেশন করিলে, দশজন নৃত্য-গীতকুশলা সুলক্ষী দাসীকে নিকটে রাখিয়া সামসেল নীহার অজ্ঞাত দাসীগণকে বিদায় করিয়া দিলেন। এক পিয়াল স্নানপত্র মত্ত হস্তে লইয়া সামসেল নীহার আবার করুণস্বরে গান আরম্ভ করিলেন, একজন দাসী বীণা বাজাইতে লাগিল। সঙ্গীত শেষ হইলে সামসেল নীহার সেই মত্তপাত্র নিঃশেষিত করিলেন, এবং আর এক পাত্র তাঁহার প্রিয়তমের হস্তে প্রদান করিলেন। আবুল হাসেনও তাহা হস্তে লইয়া হৃদয়সম্বোধন করে গান করিলেন, দাসী বীণার স্বর দিতে লাগিল। তাঁহার প্রাণের অর্থ এই যে, "হে আমার প্রিয়তমা হৃদয়খনি, আমি তোমার বিরহ স্বরন করিয়া, এতই অধীর হইয়া পড়িয়াছি যে, আমি বাহা পান করিতেছি, তাহা সুরা না আমার নয়নাশ্রু, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না।"—সামসেল নীহার আর এক পাত্র সুরা আবু তাহেরের হস্তে প্রদান করিলে, আবু তাহের ধন্যবাদ প্রদান করিয়া তাহা গলাধঃকরণ করিলেন।

প্রেমসঙ্গীতে
প্রাণ-বিনিময়

আবার সঙ্গীত আরম্ভ হইল। সামসেল নীহার গান করিতে লাগিলেন। আবুল হাসেন মত্তস্বপ্নের জ্বালা সেই স্নানপত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এমন সময় সহসা একজন দাসী মহাভীতভাবে সেই কক্ষ

প্রবেশ করিয়া সংবাদ দিল, খালিফের সন্দির খোজা মসরুর ও দুইজন কর্মচারী কোন বিশেষ কার্যাপ্রয়োজে বাহিরের কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের প্রার্থনা করিতেছে।

এই সংবাদে আবু তাহের ও আবুল হাসেনের চিন্তিত্বের সীমা রহিল না, তাঁহাদের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, বুকের মধ্যে কাঁপিতে লাগিল, তাঁহারা কি করিবেন, স্থির করিতে না পারিয়া, অস্থির হইয়া উঠিলেন। সামসেল নীহার অবিলম্বে তাঁহাদিগের ভয় দূর করিলেন।

সামসেল নীহার কথার কথার মসরুর ও দুইজন কর্মচারীকে কিছুকাল দ্বার-প্রান্তে আবদ্ধ রাখিতে আদেশ করিয়া দাসীকে বিদায় করিলেন। অবিলম্বে সেই কক্ষের বাত্যায়নশ্রেণী বন্ধ করা হইল, বাত্যায়নের দিকের বেশী-শব্দাশ্রেণী ফেলিয়া দেওয়া হইল; তাহার পর আবুল হাসেন ও আবু তাহের একটি দ্বার দিয়া সেই কক্ষ-প্রান্তবর্তী উপবনে প্রবেশ করিলেন; সামসেল নীহার বহু তাঁহাদিগকে উপবনমধ্যে লইয়া গেলেন, তাঁহার পশ্চাতে দ্বার বন্ধ হইল। তিনি আবুল হাসেন ও আবু তাহেরকে বলিলেন, “আর কোন ভয় নাই, আপনারা এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ।” কিন্তু তথাপি তাঁহাদের ভয় দূর হইল না।

আবুল হাসেন ও আবু তাহেরকে উপবনে রাখিয়া আসিয়া, সামসেল নীহার পুনর্বার তাঁহার সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, এবং মসরুর ও কর্মচারিদ্বয়কে নিকটে আহ্বান করিতে আদেশ দিলেন। বিশজন কাক্সী খোজা দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। খোজাগণের প্রত্যেকের কটদেশে এক একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি, স্বর্ণালঙ্কৃত কোমরবন্ধে সেই তরবারি আবদ্ধ। মসরুর ও কর্মচারিদ্বয় কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আনতমস্তকে অভিবাধন করিতে করিতে সামসেল নীহারের সম্মুখে অগ্রসর হইল। সামসেল নীহার সিংহাসন হইতে উঠিয়া মুহূর্ত্তে খোজা সর্দারকে তাহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মসরুর অবনতমস্তকে সদস্বরে বলিল, “ঠাকুরানি, খালিফের আদেশে আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। খালিফ আদেশ করিয়াছেন, তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ব্রহ্ম থাকিতে পারিতেছেন না, আজ সন্ধ্যাকালে তিনি আপনার কামরার পদার্পণ করিবেন। আপনি বাহ্যতে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইতে পারেন, সে জন্য আপনাকে সংবাদ প্রদান করিতে আদিয়াছি; তাঁহার আশা আছে, আপনি তাঁহাকে সন্দর্শন করিয়া, তাঁহারই দ্বারা আনন্দলাভ করিবেন।”

সামসেল নীহার ভূমিতলে অবনত হইয়া খালিফের আদেশের অঙ্গুমোদন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “তুমি খালিফকে আমার সম্মান জানাইয়া বলিবে, তাঁহার এই আদেশে আমি প্রথম পারিতোষ ও গৌরব বোধ করিলাম, এ দাসী তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত থাকিবে।” অনন্তর তিনি খালিফের উপযুক্ত আয়োজনের জন্য দাসীগণকে আদেশ প্রদান করিলেন।

সন্দির খোজা মসরুর প্রস্থান করিলে, সামসেল নীহার আবুল হাসেনকে শীঘ্র বিদায় করিতে হইবে, এই আশঙ্কার অত্যন্ত মর্শ্শ-শিঙিত হইলেন। তিনি অশ্রুপূর্ণাচোচনে বুকের দিকের নিকট উপস্থিত হইলে, আবু তাহের তাঁহার অশ্রুধার মুখ দেখিয়া কোন প্রকার বিপদের আশঙ্কায় অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। সামসেল নীহার আবুল হাসেনকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “প্রিয়তম, প্রাণাধিক! আমার সহিত তুলনায় আমি অপেক্ষা তুমি অনেকাংশে সৌভাগ্যবান, আমার অধর্শনে তোমার কষ্ট হইবে সত্য, কিন্তু আমাকে পুনর্বার দেখিবার আশার ভূমি সে কষ্ট সহ্য করিতে পারিবে; আমার বয়সের আর সীমা নাই, আমি কেবল যে আমার ছন্দবৈচিত্র্যের বিষয়-বস্তুর সন্ধান করিব, তাহাই নহে, আমি তোমাকে ভালবাসিয়া যাহাকে চাই চকুর বিধ করিয়াছি, তাঁহাকেই আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে হইবে, তাঁহার সহিত আশোদ-প্রমোদ ও প্রেমোলাপ

শ্রমমৈত্রাজের
দায়নাহ

৩০

করিতে হইবে, এ ঘটনার কি তুলনা আছে ?”—সামসেল নীহার কাতরভাবে রোদন করিতে লাগিলেন, বিরহের পূর্বেই তিনি বিরহ-যন্ত্রণার দগ্ধ হইতে লাগিলেন। আবুল হাসেন তাঁহাকে শাস্তনাদানের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কথা রাছির হইল না।

আবু তাহেরের তখন মনের ভাব, কিরূপে এই সিংহের গুহা হইতে তাঁহারা বাহির হইবেন। তিনি মিত্রবাক্যে উভয়কে শাস্তন করিলেন, ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে বলিলেন। সামসেল জানাইলেন, “খালিকের আগমনের অধিক বিলম্ব নাই, এ অবস্থায় অধীর হইয়া থাকিলে বিশেষ বিপদের আশঙ্কা আছে।” সামসেল নীহার বহু কষ্টে প্রিরতমের নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে খালিকের অভাবনার জ্ঞাত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন।

বিশাসী ভ্রাতা, আবুল হাসেন ও আবু তাহেরকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল, তাহার পর একটি সুপ্রকাণ্ড হলঘরে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদিগকে নির্ভয়ে বাহির হইয়া যাইতে বলিল। সে পক্ষান্তের দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আবু তাহের ও আবুল হাসেন সেই হলঘরের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলেন, সহসা যদি এখানে খালিক কিম্বা তাঁহার কোন কর্মচারী আদিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে আর পলায়নের পথ নাই ভাবিয়া, তাঁহারা অত্যন্ত ভীত হইলেন, এবং এদিক্ ওদিক্ চাহিতে চাহিতে চলিতে লাগিলেন।



বিদায়-
অন্ত
শাস্তা



হঠাৎ বাতায়নপথে উজ্জল আলোক দেখা গেল। তাঁহারা বাতায়নের নিকটে উপস্থিত হইয়া আলোকের কারণ কি, দেখিবার জ্ঞাত কোতুহলী হইলেন,—দেখিলেন, একশত যুবতী দাসী একশত মণাল হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের পশ্চাতে আর একশত বয়োবিকা যুবতী ;—রক্ষীর বেশ, অস্ত্রশস্ত্রে তাহারী সজ্জিতা। তাহাদের পশ্চাতে খালিক, খালিকের দক্ষিণ পার্শ্বে মসরুর, বামে ওয়ালিক— দ্বিতীয় খোজা মদার।

বিশভিজন স্তম্ভী যুবতী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া, খালিক কার্পেট-আবৃত পথ দিয়া, সামসেল নীহারের কক্ষভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই বিশ্বেশিত যুবতীর রূপ অতুল্য, তাহাদের কণ্ঠে হীরক-হার, কর্ণে হীরক-জ্বল। তাহারা সকলেই বায়ু বাজাইতে বাজাইতে খালিকের সঙ্গে যাইতেছিল। সামসেল নীহার খালিককে দেখিয়াই তাঁহার পদতলে নিশ্চিত হইয়া, তাঁহার আত্মরক্ষা করিলেন। সেই সময়ে তিনি মনে

প্রমোদ-বাসনের
শোভাযাত্রা



আত্মনিবেদনের
বকম।



মনে বলিলেন, 'হে পারস্তরাজকুমার, আমি এখন যাহা করিতে বাধ্য হইয়াছি, যদি তুমি তাহা দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে তুমি বুঝিতে, আমার বাতনা কত অধিক। আমি কেবল এই ভাবে তোমার চরণেই দুটাইয়া পড়িতে বাধ্য করি, অজ্ঞ কাহারও চরণে নহে, তোমাকে এ ভাবে অত্যাচার্য্যনা করিতেই আমার ক্ষমার আনন্দসংকার হয়।'

খালিক সামসেল নীহারের বিনয়প্রকাশে সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "হৃন্দরি, উঠ, আমি অনেক দিন তোমাকে না দেখিয়া ক্ষুব্ধ আছি, আমার কাছে বসিয়া আমার মনোবেদনা দূর কর।"—খালিক হৃন্দরীর হাত ধরিয়া তাঁহাকে উঠাইলেন এবং তাঁহাকে লইয়া রোপা-সিংহাসনে বসিলেন। বিশজন দাসী তাঁহাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া স্বতন্ত্র আসনে উপবেশন করিল। বাহারা মশালহস্তে আসিয়াছিল, তাহার বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিল।

চতুর্দিক্ আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়া দিবালোকের ঋয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, খালিক তাহা দেখিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

পারস্তরাজকুমার ও আবু তাহের তখনও প্রাদাদের মধ্যে হুলবরে অবস্থান করিতেছিলেন, এই আলোকদাম ও উজ্জ্বল দৃশ্য দেখিয়া আবু তাহের সন্মুখে বলিলেন, "আজ যাহা আমার চক্ষিপথে পতিত হইল, এমন হৃন্দরী দৃশ্য জীবনে কখনও দেখি নাই, সকলই স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইয়াছে। কি বিপুল ঐশ্বর্য্য, কি অতুলনীয় শোভা!"

আবুল হাসেন কোন কথা বলিলেন না, তিনি তখন প্রেমজরে জরজর, বিরহবিধে মর-মর, তিনি বলিলেন, "ভাই আবু তাহের, তুমি যে সকল দৌন্দর্য্য উপভোগ করিতেছ, আমি তাহা উপভোগ করিতে পারিতেছি না। আমার হৃদয়! আমার হৃদয় প্রেমমগ্নে আত্মহারা; এই সকল দৃশ্য কেবল আমার সন্তাপ বাড়িতেছে। আমি বুঝিতেছি, আমার প্রতিদ্বন্দ্বী কিরূপ প্রবল! আমার অগুণ বড় মন্দ, কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্বে আমি আপনাকে সকলের অপেক্ষা হ্রস্ব মনে করিতেছিলাম, এখন বোধ হইতেছে, আমার অপেক্ষা হ্রস্বী আর কেহই নাই। এখন মনে হইতেছে, মৃত্যু ভিন্ন আর কিছুই আমার মনে শান্তিদান করিতে পারিবে না। আমার ধৈর্য্য চূর্ণ হইয়াছে, আমি বিরহবাতনার অভিভূত হইয়াছি, আমার সাহস লোপ পাইয়াছে।"—এমন সময় প্রাদাদান্তরালবর্ত্তী উপবনে কোন শব্দ শুনিয়া হাসেন নীরব হইলেন।

প্রমোদ-স্বপ্ন-
ভঙ্গে মুচ্ছা



ঐ শব্দ বাগানের দিক্ হইতেই আসিয়াছিল, দাসীগণ খালিকের আদেশে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছিল, এই সঙ্গীত অত্যন্ত রূপসম্পন্ন এবং আকুল উজ্জ্বলে পরিপূর্ণ, সেই সঙ্গীত শুনিয়া সামসেল নীহারের হৃদয়ে বিরহবেদনা অত্যন্ত প্রবল লইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে খালিকের সম্মুখও তাঁহার চক্ষুসহ হইল, এত বস্ত্রা সহ করিতে না পারিয়া তিনি মুচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ইহাতে কিম্বদীপগণ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্ত সরেগে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, সেই জন্তই ঐ শব্দ। দাসীগণ সকলে ধরাধরি করিয়া সামসেল নীহারকে কক্ষান্তরে লইয়া চলিল।

আবুল হাসেন বাতায়নপথে এই দৃশ্য দেখিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি তাঁহার বস্তুর পাদদেশে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। আবু তাহের ইহাতে বড়ই বিগ্ন হইলেন, তিনি বস্তুর মুচ্ছান্তরের জন্ত নানা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। ঠিক এই মুহূর্ত্তে একজন দাসী সেই হুলবরে প্রবেশ করিয়া, আবু তাহেরকে বলিল, "যদি নির্বিঘ্নে বাহির হইতে চান, তবে

এই সময় আমার অনুগমন করুন, এখন সকলেই ব্যস্ত; কেহ কোন দিকে লক্ষ্য করিবে না, এখন এখান হইতে পলায়ন না করিলে পরে পলায়ন দুর্ভট হইবে।" আবু তাহের বলিলেন, "হায় হায়! কিরূপে এখন পলায়ন করিব? আবুল হাসেনের কিরূপ অবস্থা চাহিয়া দেখ।" দাসী আবুল হাসেনকে আচেন্তন দেখিয়া দ্রুতবেগে জল; আনিতে গেল এবং পাত্রপূর্ণ হালীতল গোলাপ-জল লইয়া আবিলম্বে সেইখানে প্রত্যাগমন করিল।

চোখে-মুখে জলের ধারা দেওয়াতে কিছুকাল পরে আবুল হাসেনের চৈতন্যসঞ্চার হইল। তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া, আবু তাহের অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলিলেন, "বন্ধু! উঠ, পলায়নের এই প্রশস্ত সময়, এখন যদি আমরা এ স্থান ত্যাগ না করি, তবে আমাদের প্রাণরক্ষা করাই দুর্ভট হইবে।" আবুল হাসেন তখনও অত্যন্ত দুর্বল, তিনি স্বয়ং উঠিতে পারিলেন না, আবু তাহের ও দাসী তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইলেন, তাঁহার পর তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র নৌঘাটের নিকট উপস্থিত হইলেন, এই ঘাট টাইগ্রিস নদীর দিকে উদ্ভুক্ত, ঘাট-প্রান্ত হইতে পথ নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। দাসী করতালি প্রদান করিবামাত্র একটি অদ্ভুত স্থান হইতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকা তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দাসী উভয় বন্ধকে সেই নৌকার উপর উঠাইয়া দিয়া খালের ধারে পাড়াইয়া রহিল। নৌকার উত্তীর্ণা, আবুল হাসেন বামহস্ত তাঁহার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া, দক্ষিণ হস্ত অঙ্গুরবর্তী প্রাসাদের দিকে প্রসারিত করিয়া, অতি মৃদুবেগে বলিলেন, "প্রাণেশ্বর, আমার দ্বারে যে অগ্নি জলিতেছে, সেই অগ্নি তোমার বিরহে আমার মৃত্যুকাল পর্যন্ত জলিতে থাকিবে, তাহাতেই দগ্ধ হইয়া আমি এ জীবন ত্যাগ করিব।"

খাল হইতে নৌকা টাইগ্রিসবন্ধে আসিয়া পড়িল। আবুল হাসেন তখনও অত্যন্ত কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, আবু তাহের ঐধ্যধারণের জন্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। নৌকা ভীয়ে আসিয়া লাগিল, আবু তাহের আবুল হাসেনকে অবতরণ করিতে বলিলেন, কিন্তু তখনও তিনি বদ্ধ দুর্বল।



প্রেম-
কেন্দ্র
চপটি!

শ্রেয়স্বতি
কবরের সাথী



আমরাগোপনে
বিরহজ্বালায়
অবসানপ্রয়াস



তাহাকে চলাপাতিহীন দেখিয়া, আবু তাহের বড় চিন্তিত হইলেন, নিকটেই আবু তাহেরের এক বন্ধুর গৃহ ছিল, সেখানে আবুল হাসেনকে অতি কষ্টে টানিয়া লইয়া চলিলেন। বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইলে বন্ধুটি পরম সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন এবং এত রাত্রিতে তাঁহারা কোথা হইতে আসিতেছেন, তাহা জানিতে চাহিলেন। আবু তাহের বলিলেন, “ভাই, আজ সন্ধ্যার সময় উনিলাম, আমার একজন দেনাচার দীর্ঘকালের জন্ত বিদেশে যাত্রা করিতেছেন, শুনিয়া আমি টাকাগুলি আদায়ের চেষ্টায় তাঁহার গৃহে গিয়াছিলাম, কিন্তু আমি তাঁহার বাড়ী চিনিতাম না বলিয়া, আমার এই বন্ধুটিকে সঙ্গে লইতে গিয়াছিলাম, ইনি তাঁহার বাড়ী চিনিতেন। অনেক সন্ধ্যানে সেই ব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইলাম, সেখানে হইতে ফিরিয়া আসিতেছি, পথে সহসা আমার এই বন্ধুটি পীড়িত হইয়া পড়িলেন, স্তব্ধরূপে অগত্যা অসময়ে তোমার গৃহে আসিয়াই আশ্রয় লইতে হইল। আজ রাতে আমরা এখানে বিশ্রাম করিবার ইচ্ছা করিতেছি।”

বন্ধুটি আবু তাহেরের এই কথায় বিশ্বাস করিয়া, তাঁহাদের বিশ্রামের আয়োজন করিয়া দিলেন। আবুল হাসেন শয়ন করিয়া নিদ্রিত হইলেন কষ্টে, কিন্তু তাঁহার নিজা নানা প্রকার কষ্টদায়ক স্বপ্নে পরিপূর্ণ হইল। অতি কষ্টে রাত্রি অতিবাহিত হইলে, আবু তাহের প্রত্যুষেই বন্ধুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং আবুল হাসেনকে সঙ্গে লইয়া গৃহে প্রত্যাপন করিলেন। এই পথপর্যটনে আবুল হাসেন অন্ততঃ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন, তিনি আবু তাহেরের গৃহে উপস্থিত হইয়াই সোফার উপর পড়িয়া হাঁপাতে লাগিলেন। আবুল হাসেন তখন আর গৃহে বাইতে অশক্ত দেখিয়া, আবু তাহের অগৃহেই তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আবুল হাসনের অন্তরের সংবাদ শুনিয়া বন্ধুগণ আবু তাহেরের গৃহে দেখিতে আসিলেন।

অপরাত্নকালে আবুল হাসেন তাঁহার বন্ধুর নিকট বিদায় চাহিলেন, কিন্তু তাঁহার দৈহিক দুর্বলতার কথা বিবেচনা করিয়া, আবু তাহের তাঁহাকে সেদিন সেই গৃহেই বিশ্রাম করিতে বলিলেন। সন্ধ্যাকালে আবু তাহের বন্ধুর চিন্তে প্রকৃতসংস্কারের অভিপ্রায়ে নৃত্যগীতের আয়োজন করিলেন, কিন্তু নৃত্যগীত-শ্রবণে আবুল হাসনের চিত্ত প্রস্থুর না হইয়া আরও অধিক বিষন্ন হইল, তাঁহার প্রিয়তমার সহবাসচঞ্চের কথাই পুনঃ পুনঃ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। আবু তাহের তাঁহার অবস্থা দেখিয়া পুনর্বার তাঁহাকে উপদেশ দান করিতে আরম্ভ করিলেন। আবুল হাসেন বলিলেন, “ভাই আবু তাহের, তুমি আমার পরম বন্ধু, আমাকে যে উপদেশ দান করিতেছ, তাহা অতি সঙ্গত উপদেশ, তাহাও বুঝিতেছি, কিন্তু ভাই, তোমার উপদেশে অল্পসারে চলা যে আমার পক্ষে কত দুঃসহ, তাহা ত’ তুমি বুঝিতেছ না। আমি তোমার উপদেশের মূল্য বুঝিতেছি, কিন্তু তাহা আমার নিকট নিরর্থক হইতেছে। সামসেল নীহারের প্রতি অহরহ আমার জীবননাশের কারণ হইবে, তাহা আমি জানি, কিন্তু এই অহরহ আমার সমাধিক্ষেত্রেও আমার অহুগমন করিবে।”

আবু তাহেরের সহিত আবুল হাসেন তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। আবু তাহের বিদায় লইবেন, এমন সময় আবুল হাসেন সন্নিবেশে বন্ধুকে বলিলেন, “ভাই, আমার ভাব দেখিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিও না, তোমার হিতকর উপদেশে অল্পসারে আমি যে চাপিতে পারিতেছি না, তাহা আমার হৃদয়গত বলিতে হইবে, কিন্তু ভাগ্যের উপর কাহারও হাত নাই, তুমি আমার পরম বন্ধু, এখন বন্ধুর কাল কল্প। আমার সামসেল নীহারের যদি কোন সংবাদ পাও, তবে তাহা আমাকে জানাইয়া আমার দক্ষ হৃদয় শীতল করিও, তোমার নিকট এখন কেবল আমি এই অহুগৃহেই প্রার্থনা করিতেছি। আমি দেখিয়া আসিয়াছি, যে আমার বিরহে দুঃখিতা হইয়াছে, তাহার পর তাহার সুখভোগ হইয়াছে কি না, এখন

সমাধিই
এ অহরহের
সমাধি



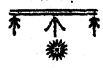
কেমন আছে, তাহা কিছুই আমি জানিতে পারিতেছি না।—আবু তাহের বলিলেন, “তুমি এ জন্ত কোন চিন্তা করিও না, আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, তাহার মুহূর্ত্তে তাহার কোন অপকর হয় নাই, তাহার পরিচরিকা আমার নিকট শীঘ্রই উপস্থিত হইয়া, আমাকে সকল কথা জ্ঞাত করিবে, এ বিশ্বাস আমার আছে।”

আবু তাহের বন্ধুর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া, অগৃহে প্রত্যাপন করিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে সামসেল নীহারের দাসীর আশ্রয় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না, এমন কি, তৎপরদিবসও দাসীর সাক্ষাৎ মিলিল না, তখন আবু তাহের বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। এতকাল আবুল হাসেনের সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াও তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না, সুতরাং তিনি বন্ধুকে দেখিতে চলিলেন। বন্ধুগৃহে উপস্থিত হইয়া আবু তাহের দেখিলেন, আবুল হাসেন শয্যা শয়ন করিয়া আছেন, কঠিন পীড়ার আক্রান্ত, কয়েকজন চিকিৎসক ও বন্ধু তাহার শয্যাগ্রাস্তে উপস্থিত হইয়া, তাহার রোগ আবিষ্কারের জন্ত যৎপরোনাস্তি আয়াস স্বীকার করিতেছেন। আবু তাহেরকে দেখিয়া আবুল হাসেন বৃহৎ হস্ত করিলেন, এই হস্তের দুইটি অঙ্গ—একটি তোমাকে দেখিয়া স্তম্ভী হইলাম, দ্বিতীয়টি এই সকল চিকিৎসক কি বোকা, ওষধ খাওয়াইয়া আমার ব্যাধি আরোগ্য করিতে চাহে!

কিছুকাল পরে চিকিৎসক ও অস্ত্রাভিযুক্ত বন্ধুগণ বিদায়গ্রহণ করিলেন, আবু তাহের একাকী আবুল হাসেনের শয্যাগ্রাস্তে উপস্থিত রহিলেন। আবু তাহের জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, এখন কেমন আছে?”—আবুল হাসেন নৈরাশ্রবিষজ্ঞিত-স্বরে বলিলেন, “আর কেমন আছে, পীরিতে প্রাণদ উপস্থিত আর কি! সামসেল নীহারের প্রতি অসুযোগ আমাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই অধিক বাতন দান করিতেছে, বন্ধু আমার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর হকীমচিকিৎসকদল আমাকে বিরক্ত করিয়া মারিল। লোক আশিত্যেছে—আশিত্যেছেই, ইহারা আমাকে কোনমতে শান্তিতে থাকিতে দিবে না। অতন্তরা প্রকাশ না করিলে আর ইহাদিগকে দূর করিবার উপায় দেখিতেছি না। কেবল তোমার সহবাসেই বাহা কিছু শান্তি ও আনন্দ পাই, কিন্তু তুমিও চরিত্র হইয়া উঠিয়াছ। বাহা হউক, সামসেল নীহারের—আমার প্রাণতোষিণী প্রিয়তমার কি সংবাদ আনিয়াছ বল, বলিয়া আমার ভাপিত চিত্ত শীতল কর, তাহার দাসী কি আসিয়াছিল? কি সংবাদ আনিয়াছ, শীঘ্র বল।”—

আবু তাহের বলিলেন, “তোমার প্রিয়তমার নিকট হইতে আমি আর কোন সংবাদই পাই নাই, দাসী এ পর্যন্ত আমার নিকট আসে নাই।” এই কথা শুনিবামাত্র আবুল হাসেনের নেত্র অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না, তাহার হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। তাহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া আবু তাহের বলিলেন, “ভাই, তুমি বৃথা মনঃকষ্ট পাইতেছ, আমার অসুযোগে তুমি শান্ত হও, এখনই হয় ত’ কেহ এখানে আসিয়া পড়িবে, তখন তাহার নিকট তোমার মনের ভাব গোপন করা কঠিন হইবে।”—আবুল হাসেন বলিলেন, “বন্ধু, আমি মনের ভাব মনের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে পারি বটে, কিন্তু যথেষ্ট কথা না বলিলেও, আমি যে অশ্রুগোপনে অসমর্থ। সামসেল নীহারের স্তম্ভসংবাদ না পাইলে যে আমি কোন প্রকারেই ধৈর্যধারণ করিতে পারিতেছি না। তাহার বিধে আমি কিরূপে প্রশংসা করিব?” আবু তাহের বলিলেন, “ভাই, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি নিশ্চয় জানিও, তোমার প্রিয়তমা সুস্থলে আছেন, এ বিষয়ে তুমি কোন সন্দেহ করিও না। তিনি কোন সংবাদ পাঠাইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু আমি বুঝিতেছি, তিনি সংবাদ পাঠাইবার সুবিধা পান নাই বলিয়াই সংবাদ

উপরে কি
শ্রেম-ব্যাধি
সারে?



পীরিতে
প্রাণদ!



খালিকের
প্রমোদিনী
তাহার



পাঠাইতে পারেন নাই, আজ নিশ্চয়ই তাঁহার সংবাদ শুনিতে পাইবে।* এই প্রকার নানা সাধনাবাক্য বসিয়া আবু তাহের বস্তুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

গৃহে প্রত্যর্গমন করিয়া আবু তাহের দেখিলেন, সামসেল নীহারের প্রিয়তম বানী তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া আবু তাহের অমঙ্গল আশঙ্কার ভীত হইলেন। তিনি গায়ত্রী নীহারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতেই দানী বলিল, “অগ্রে আপনাদের কুশল-সংবাদ বসুন, আপনাদের জন্ত বড় দুঃখিতা হইয়াছিল। রাজপুত্রের অবস্থা কিরূপ, তাহা আমরা কিছুই জানিতে পারি নাই, ইহাই ক্ষুণ্ণতার প্রধান কারণ।” আবু তাহের দাসীকে সকল সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। সকল কথা শুনিয়া দানী বলিল, “আমায় ঠাকুরাণীর অবস্থাও রাজপুত্রের অবস্থা অপেক্ষা ভালো নহে, বরং অধিকতর শোচনীয়। আপনাদিগকে নোকায় উঠাইয়া দিয়া আমি সামসেল নীহারের কক্ষে প্রত্যর্গমন করিয়া দেখি, তখনও তাঁহার মূর্ত্যভঙ্গ হয় নাই, সকলই সমস্তে তাঁহার পরিত্রাণ করিতেছে, খালিক তাঁহার পাশে কাতরভাবে বসিয়া আছেন, তিনি সকলকে, বিশেষতঃ আমাকে এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু আমরা সকলই প্রকৃত কথা গোপন করিলাম। ঠাকুরাণীর অবস্থা দেখিয়া আমরা কেহই অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রাপণ যত্নে শুশ্রূষার পর মধ্যরাত্রে তাঁহার চৈতন্যলক্ষ্য হইল। তাহা দেখিয়া খালিক মহা আনন্দিত হইলেন, তিনি সামসেল নীহারকে তাঁহার মূর্ত্যায় কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। খালিক নিকটে বসিয়া আছেন দেখিয়া সামসেল নীহার উত্তিরার চেষ্টা করিলেন, খালিক তাঁহাকে উত্তিতে নিষেধ করিলেন সামসেল নীহার খালিকের চরণচূষন করিয়া বলিলেন, ‘জাহাপনা, আমার নিকট প্রার্থনা করি, যেন আপনার চরণতলে এ অধীনী কিঙ্করী মৃত্যু হয়, আমার প্রীতি আপনায় বে কত মগ্ন, তাহার বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি।’

“খালিক বুঝতীর হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, ‘আমিও তোমার ভালবাসার যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। আমার অনুরোধ, তুমি শরীরের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। তুমি হয় ত’ আজ কোন প্রকার অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া এই বিশদ তাকিয়া আনিয়াছ। তোমার স্বাস্থ্যের বাহা প্রতিভুল, একপ কাজ আর কদাপি করিও না। তুমি যে কি কিং সুস্থ হইয়াছ, ইহাই পরম সুখের বিষয়। তুমি এখন এইখানেই বিশ্রাম কর, আজ রাত্রে আর তোমার শরনকক্ষে বাইবার আবশ্যক নাই।’—খালিক অনেক কিঙ্করীকে মগ্ন আনিতে বলিলে, কিঙ্করী স্বর্ণপাত্রে উৎকৃষ্ট মদ্য লইয়া খালিকের নিকট উপস্থিত হইল। খালিক স্বহস্তে তাহা একটু একটু করিয়া সামসেল নীহারকে পান করাইলেন। ইহাতে সামসেল নীহারের দেহে কি কিং বলের সঞ্চার হইল, তখন খালিক তাঁহার নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।

“খালিক উত্তিয়া গেলে সামসেল নীহার আমাকে তাঁহার নিকটস্থ হইবার জন্ত ইঙ্গিত করিলেন, তিনি আমাকে আপনাদের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বাহা বাহা জানিতাম, সকল কথা তাঁহাকে নিবেদন করিলাম; তবে পাছে তিনি পুনর্বার অধিক কাতর হন, এই ভয়ে রাজপুত্রের মূর্ত্যায় কথা বলিলাম না। ঠাকুরাণী সকল কথা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস জেলিয়া বলিলেন, ‘প্রিয়তম, তোমাকে বতর্কণ না দেখি, ততক্ষণ আমার আর কিছুই ভাল লাগিবে না, আমি সকল আনন্দ, সকল প্রমোদ পরিত্যাগ করিলাম। তোমাকে না পাইলে আর আমার এ অঙ্গপ্রবাহ থাকিবে না।’—তিনি পুনর্বার সময়ে অকৃত্যাক্ষণ করিতে লাগিলেন, তাহার পর আমার ফোড়ে দ্বিতীয়বার মূর্ত্তিতা হইয়া পড়িলেন। আমি ও আমার সখীগণ

বিদায়ের
সোহাগ-চূষন



অনেক কষ্টে তাঁহার সূক্ষ্মত্ব করিয়া, অনেক প্রকার সাধনা দান করিয়া। তিনি বহু বিলাস ও কাণ্ডের প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমার একজন সখী তানপুরা হাতে লইয়া গান আরম্ভ করিতেই সামসে।

নীহার ইহাতে তাহাকে নিমেষ করিলেন ; তাহাকে ও অস্তিত্ব দানীকে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ দিলেন। কেননা আমি একাকী গৃহে থাকিলাম, তাঁহার সহিত গেই গৃহে রাতিযাপন করিলাম। হা আলা, সে যেকি কষ্ট! সমস্ত রাত্রি তিনি কাটাইলেন, আর ক্রমাগত পারত-রাজকুমারের নাম করিতে লাগিলেন।

পঞ্চদিন থাকিলেই আদেশে রাজপ্রাণের সকল চিকিৎসক সামসে নীহারকে দেখিতে আসিলেন। চিকিৎসকরা যে সকল ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে বাধি অস্ত্রোপা না ইয়া আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাত্রিতে সামসে নীহার একটু সুস্থ হইলে, আমাকে ডাকিয়া আবুল হাসেনের সংবোধন করিলেন।

দানীমুখে সকল কথা শুনিয়া আবু তাহের তাহাকে সকল সংবাদ সম্বন্ধে বলিলেন, আবুল হাসেনের মনের ভাবও কিরূপ খোচরী, তাহাও প্রকাশ করিলেন ; বলিলেন, “সামসে নীহারকে ঔষধধারণ করিতে বিশেষভাবে অঙ্গরোধ করিবে ; অস্ত্রাধা যদি থাকিলে উপস্থিতকালে কোন প্রকারে তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কোনরূপে আমাদের প্রাণরক্ষা হইবে না, সততকৈই প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। খালিক কাহাকেও মার্জনা করিবেন না।”

দানীর সহিত কথা শেষ হইলে সে বিদায়গ্রহণ করিল। আবু তাহের তাঁহার আবশ্যকীয় কতকগুলি কাম শেষ করিয়া অপরাত্রে পুনরায় বন্ধুর সহিত শালাং করিতে চলিলেন ;—প্রত্যন্তে আবুল হাসেনকে তিনি বেগুন দেখিয়াছিলেন, অপরাত্রেও তাঁহাকে সেইরূপই দেখিলেন। আবুল হাসেন আবু তাহেরকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বলিলেন, “তাই আবু তাহের, তোমার অনেক বন্ধু আছে সত্যকই নাই, কিন্তু তোমার মূল্য আমি যত বুঝি, তাহারা সেরূপ বৃদ্ধিতে পারে না ; আমার ভ্রাতৃ তুমি যৎপরোয়ি চেষ্টা, যত ও পরিশ্রম করিতেছ, কষ্টবীরেরও তোমার ক্লান্তি নাই। তোমার এই রোগ ও বন্ধুত্বের কথা আমি কখনই বিস্মৃত হইব না।”

আবু তাহের বলিলেন, “রাজপুত্র, তুমি এ সকল বাস্তব কথা কেন বলিতেছ ? তোমার একটি চকু বাঁচাইবার জন্য আমি যে আমার একটি চকু নষ্ট করিতে প্রস্তুত, কেবল তাহাই নহে, আমি তোমার জন্য আমার প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে পারি, ইহা শুধু কথার কথা মাত্র মনে করিও না। সামসে নীহারের দানী প্রত্যন্তে আমার নিকট আসিয়াছিল, তাঁহার বিরহে তোমার মনে যে ব্যথা হইরাছে, তোমার বিরহে তিনিও ততোধিক ব্যথা পাইতেছেন, তাহা দানী-মুখে অবগত হইরাছি।” আবুল হাসেন আবু তাহেরের মুখে আত্মপূর্ণিক সকল কথা শ্রবণ করিলেন, সকল কথা শুনিয়া তাঁহার নয়ন হইতে দ্রব-নিমজিত-ধারে অশ্রু পড়িতে লাগিল।

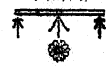
উত্তর বন্ধুত্ব কথা কহিতে কহিতে রাত্রি অধিক হইল, সুতরাং আবুল হাসেন আবু তাহেরকে সে রাত্রি তাঁহার গৃহে বাস করিবার জন্য অঙ্গরোধ করিলেন। উভয়ে একত্র রাত্রিযাপন করিলেন।

পরদিন প্রত্যন্তে আবু তাহের বন্ধু-গৃহ হইতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হুর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি ক্রীড়াকো তাঁহার নিকটে আলিভেছে, তিনি অরকালের মধ্যে তাহাকে চিনিতে পারিলেন। সেই ক্রীড়াকো আর কেহই নহে, সামসে নীহারের দানী। দানী একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহা আবু তাহেরের হস্তে অর্পণ করিল, সামসে নীহার পত্রখানি তাঁহার প্রিয়তম প্রেমাল্প আবুল হাসেনকে

প্রেমোদাসিনীর
মুখ।



প্রেম-দৈবাতের
মর্পবেদনা



লিখিয়াছিলেন। পত্রখানি দেখিয়া সেই দাসীর সহিত আবু তাহের প্রকৃতবদনে তৎক্ষণাৎ আবুল হাসেনের গৃহে পুনঃ প্রত্যাপন করিলেন।

আবু তাহেরকে কিরিয়া আনিতে দেখিয়া, আবুল হাসেন উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বন্ধু, সংবাদ কি?” আবু তাহের বলিলেন, “সংবাদ ভাল, তুমি বাহা ইচ্ছা করিতেছিলে, আল্লা তাহাই পূর্ণ করিয়াছেন। ককাদুরে গামসেল নীহারের দাসী প্রতীক্ষা করিতেছে, সে তোমার পত্র আনিয়াছে, তোমার অনুমতি হইলেই সে তোমার নিকট আসিয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিতে পারে।”—আবুল হাসেন বলিলেন, “বন্ধু, অবিলম্বে দাসীকে আমার এই কক্ষে লইয়া আইস।” আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আবুল হাসেন শয্যার উপর উপবেশন করিয়া দাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আবুল হাসেন দাসীকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিয়া, তাহাকে কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন, দাসী সবিনয়ে বলিল, “রাজপুত্র, আপনি প্রেমে পড়িয়া নিম্নস্তর বে সকল কষ্ট সহ্য করিতেছেন, তাহা আমার অবগত হইয়াছি। আমি আশা করি, আমাদের ঠাকুরাণীর নিকট হইতে আমি যে পত্র আনিয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া আপনার যত্নসার অনেক লাভব হইবে।”—পত্রখানি দাসী আবুল হাসেনের হস্তে অর্পণ করিল। আবুল হাসেন পত্রখানি পরমাত্মে গ্রহণ করিয়া, প্রথমে তাহা চুম্বন করিলেন, তাহার পর খুলিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন।

“পারস্তরাজকুমার আলী আবু বেকারের নিকট অধীনী গামসেল নীহারের নিবেদন। যে দাসী আপনার নিকট এই পত্র লইয়া বাইতেছে, সে আপনাকে আমার অবস্থার কথা জানাইবে। কারণ, আপনার বিরহে আমি এতদূর কাতর হইয়াছি যে, আমি আপনাকে আমার সম্বন্ধে কোন কথাই লিখিতে পারি না। আপনার অদর্শনে আমি পাগলিনীর স্তার হইয়া এই পত্রে আমার মনোভাব-প্রকাশের চেষ্টা করিতেছি। হায়, আপনার সঙ্গে কথা না কহিলে কি আমার এ মগ্ন-হৃদয় শীতল হইবে?”

“লোকের বলে, মৈরুখো সকল বেদনার অবদান হয়, কিন্তু আমি যতই মৈরুখাৱণ করিতেছি, আমার বেদনা যে ততই বাড়িয়া বাইতেছে। যদিও আমার চিত্তপটে আপনার মুক্তি অঙ্কিত আছে, কিন্তু আপনাকে না দেখিয়া আমি কোনক্রমে সুস্থ হইতে পারিতেছি না। আমি আপনার বিরহে যে পরিমাণে কাতর হইয়াছি, আপনি কি আমার বিরহে সেরূপ কাতর হইয়াছেন?—হাঁ, হইয়াছেন বৈ কি; আপনার সেই মগ্ন-হৃদয়ে আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। যদি আমার আশা পূর্ণ হইত, তাহা হইলেই আমার অনন্তজন্মে তসিভান, কিন্তু আমাদের সেই আশা পূর্ণ হইবার পথে বিঘ্ন বাধা—যোর অন্তরার বর্তমান।

“পত্রে আমি বাহা লিখিতেছি, তাহা আমার অন্তরের কথা। পত্রে এই সকল কথা প্রকাশ করিতেও আমার মনে বড় সুখোদয় হইতেছে। আমার হৃদয়ের এই দিবারুপ কত আপনি করিয়াছেন, কিন্তু সেজন্য আমি অসুখী নই, আপনার বিরহে অলঙ্ঘ্য বাতনা ভোগ করিলেও আমি আপনাকে ভাবিয়াইয়াই সুখী, সে সুখের সহিত কোন বাতনারই তুলনা চলিতে পারে না। যদি আমি মধ্যে মধ্যে আপনাকে দেখিতে পাই, তাহা হইলে সে জন্য আমি সকল অসুখি ও কষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। আপনি যদি আমার হন, আপনাকে যদি পাই, তাহা হইলে পৃথিবীতে আমি আর কোন সুখেরই কামনা করি না।

“মনে করিবেন না, আমি বাহা লিখিতেছি, আমার মনের ভাব তাহা হইতে ভিন্নরূপ; আমার মনে মনে বাহা হইতেছে, লেখনীর সাধ্য কি, তাহা অবিকল বর্ণনা করে। আমি বত কথাই লিখি না কেন, তাহা হইতে আমার মনের সকল ভাব ঠিক ব্যক্ত হওয়া অসম্ভব। যতক্ষণ আপনাকে আমি দেখিতে না পাইতেছি, ততক্ষণ আমার চক্ষু হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইবে। আমার হৃদয় অহরহ; আপনাকেই চাহিতেছে, আপনার

প্রথমপত্রে
সে চুম্বন
ক

দ্বিতীয়পত্রে
মের বাগিচা
ক

কথা শ্রবণ করিয়া আমি ক্রমাগত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছি। আমার চিন্তা কেবল আপনি,—প্রিয়তম রাজপুত্রের সুস্থিই আমার মনের অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। আমি আমার নিকট আখ্যাত দুই করিবার জন্য প্রতিনিয়ত প্রার্থনা করিতেছি। আমি যে বাতনা সহ্য করিতেছি, যে দুখে, বিদায় ও সন্তাপ ভোগ করিতেছি, তাহাই আমি পরে আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি।

“আমি বড়ই হতভাগিনী, হাঁহাকে ভালবাসিলাম, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না! যদি আমি আপনার প্রণয়ের পরিচর না পাইতাম, তাহা হইলে, হয় ত’ এতদিন আমার প্রাণধারণ কষ্ট হইত। আপনি

বলুন, সত্যই আমাকে ভালবাসেন কি না? আমি অতি যত্নে আপনার পত্র সঙ্গ্রহের পাঠ করিব, তাহা অতি সাবধানে রাখিব, আপনার পত্র পাঠ করিলে আমার এ বাতনার অনেক লাঘব হইবে। আশা করি, আল্লা অলবাহ আমাদের মিলন ঘটাইবেন, তখন আমার আমার প্রাণ খুলিয়া পরস্পরের মনের কথা বলিব, এখন বিদায়!

“আবু তাহেরকে আমার বিনয়-নমস্কার জানাইবেন, তাঁহার নিকট আমরা উভয়েই অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।”

আবুল হাসেন কতবার সেই প্রেম-পূর্ণ লিপি পাঠ করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। পাঠ করিতে করিতে কখন তাঁহার মনে অশ্রু-স্রোত বহে, কখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করেন, কখন হা হতাশি বলিয়া খেদ করেন, কখন বা

আনন্দে—স্বপ্নে তাঁহার বদন-মণ্ডল প্রসীদিত হইয়া উঠে। কয়েকবার পুনঃ পুনঃ পাঠের পর, আবু তাহের তাঁহাকে বলিলেন, “দাদী আর অধিককাল তাঁহার গৃহে অপেক্ষা করিতে পারিবে না, ব্রতরাজ অবিলম্বে ইহার উত্তর প্রেরণ করা উচিত।”—বন্দর এই কথা শুনিয়া আবুল হাসেন বলিলেন, “আমি কিরূপে এ প্রশ্নের উত্তর লিখিব, কেমন করিয়া আখ্যাত মনের তাব ভাবের প্রকাশ করিব?—তাহা যে একান্ত অসম্ভব। আমার চিত্ত বিকল, আমি কি কোন কথা লিখিতে পারিব? কিন্তু উত্তর না পাইলেই বা আমার প্রিয়তমা কি মনে করিবেন, তাহা হইলে হয় ত তিনি শোকে আরও অধীর হইয়া পড়িবেন। উত্তর লেখাই কর্তব্য।”

আবুল হাসেন দোহাত, কলম ও কাগজ বাহির করিয়া, একখানি পত্র লিখিলেন, অকস্মেৎ তাহা সমাপ্ত



করিয়া, অর্থাৎ তাহাদের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, “তাই, পড়, আমি চক্ৰ হুদিয়া তুমি।” আবু তাহের বন্ধু হইতে পত্র লইয়া পাঠ করিলেন :—

“পত্রের সন্ধানে আমার নিকট হইতে সামসেল নীহারসদীপে—

তোমার পত্র পাইবার পূর্বে আমি শোক-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়াছিলাম, কিন্তু পত্রখানি দেখিয়া আমার মন প্রফুল্ল হইল। সত্যই তোমাকে আমার প্রতিশ্রুত পদতলে সেই দিন সমস্ত কষ্টের সন্ধান বিস্ময়ে মুক্তি হইতে দেখিয়া, আমার প্রতি তোমার ভালবাসার পরিচয় বত জ্বলি হইয়াছিল। পত্র-পাঠ তাহা অপেক্ষা অধিক সুখী হইয়াছিল। আমার মন এই পত্রের প্রতি, তোমার পত্র অধিকতর হইতে আর প্রকাশ করিয়াছে। আমি বুঝিতে পারি, তুমি আমার দ্বারা কষ্ট পাতনা সহ্য করিতেছ, আমিও যে তোমার বিরুদ্ধে বড় অধিক কষ্ট পাইতেছি, তাহাও তুমি বুঝিয়াছ। আমি, অনেক শান্তিলাভ করিলাম। তোমার বিরুদ্ধে কখন আমার মন-প্রবণতা আর নির্বাক প্রকৃতি হইবে, কখন আমার জন্মের মধ্যে অন্যতম দারিদ্র্য অগ্নিতে থাকে; কিন্তু সেই অগ্নিই আমাকে জীবিত রাখিয়াছে। আমার সেই যে পত্রের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছি, তাহার পর যুদ্ধ-কালও আর শান্তিভোগ করিতে পারি নাই; তোমার পত্র পাঠ করিয়া মনে কিঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছি। তোমার ভালবাসা লাভ করিয়া আমি কত যে অনুগ্রহীত হইয়াছি, তাহা ভাবার প্রকাশ হইতে পারে না। আমি তোমার পত্র সহস্রবার চুপ করিয়াছি, কতবার পাঠ করিয়াছি, তাহার মন্থনা নাই; যতই পড়িতেছি, ততই নতুন নতুন আনন্দে জন্ম পূর্ণ হইতেছে। প্রিয়তম, জীবনে এ প্রকারের বিরক্তি নীরাক হইবে না। এ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আমি কোন দিনও অসন্তোষাবাক্য উচ্চারণ করিব না। আমি, আমি, আমার তোমার দেখা পাইব, তোমার জন্মের জন্ম মিলাইয়া এ দারুণ বিরহ-বেদনার হ্রাস করিব, প্রেমের কথা কাণে কাণে বলিব। যেন তোমাকে ভালবাসিয়াই আমার প্রেম বহির্ভূত হয়। আর কেনী কি জিহ্বা, আমার অঙ্গুলিতে চক্ৰ দৃষ্টি চলিতেছে না, তাই আর অধিক লিখিতে পারিলাম না। এখন বিদায়।”

পত্র পাঠ করিয়া আবু তাহেরের মনকোণেও অশ্রু লগিত হইল। তিনি পত্রখানি তাঁহার বন্ধুর হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, “শ্রীক হইয়াছে, ইহার কোন কথা বদল করিবার আবশ্যক নাই।”—আবুল হাফস পত্রখানি মুক্তি। তাহা মোহর করিলেন, দাসী পত্র লইয়া আবু তাহেরের সহিত প্রস্থান করিল। পথে চলিতে চলিতে আবু তাহেরের বড় হৃদয়তা হইল, তিনি যে তাঁহাদের এই প্রেমব্যাপারের সহিত মিলিত আছেন, এ কথা তাঁহার মনে আকস্মিকের স্ফূর্তি হইল। কারণ, তিনি বুঝিলেন, প্রেমবিহীন বৈরাগ্য বড়োড়ি আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে এ ব্যাপার যে দীর্ঘকাল গোপনে রহিবে, তাহার ক্ষতি অল্পই সম্ভবনা। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, সামসেল নীহার যদি খালিকের অহুগ্রহীত না হইতেন, তাহা হইলে ইহাদের মিলনের কষ্ট আমি কখনো ভেটাই করিতাম; কিন্তু খালিকের আবেশের দ্বারা, তাঁহাদের স্থানান্তরিত করে, এত সাধা কাহার? ইহা প্রকাশ হইলে খালিকের ক্রোধ প্রথমেই সামসেল নীহারের উপর নিপতিত হইবে, তাহার পর আবুল হাফসের প্রেম বহির্ভূত, আমাকেও যে বিপদে পড়িতে হইবে, তাহাও সন্দেহ নাই। আমার সকল সুখ, সকল সম্মান, সকল সন্তোষ লুপ্ত হইবে; অথচ ইহাদের উপভোগ করিতে পারিব না; অতএব এ ব্যাপার হইতে আমার সরিয়া পড়ানই কর্তব্য।

আবু তাহের সমস্ত দিন ধরিয়া এই সকল কথা চিন্তা করিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে তিনি আবুল হাফসের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে প্রবৃত্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য উপদেশ দান করিলেন; এই প্রেমের পরিণাম

নে এ
নিলের
ন নাই!
*

য-প্রমো-
মিলনের
কাহনা
*

কল কিরণ বিষয় হইবে, তাহাও বুঝাইয়া দিলেন, কিন্তু আবু হাসেন পাগল হইয়াছিলেন, তিনি বুঝিলেন না। একত্রে গিয়া যার, তাহাও স্বীকার, তথাপি সামনেল নীহারের চিত্রা—তাঁহার আশা ছাড়িবেন না, বন্ধকে স্পষ্টবাক্যে এই কথা বলিলেন।

আবু তাহের বন্ধুর হৃদয় দেখিয়া বড় ব্যথিত ও কিঞ্চিৎ বিরক্তও হইলেন, অধিক কথা না বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া গৃহে চলিয়া আসিলেন এবং এ অবস্থার কি কর্তব্য, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি গৃহে ঘনিষ্ঠ এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় তাঁহার এক জহরী বন্ধু তাঁহার সন্নিহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। জহরী দেখিয়াছিলেন, সামনেল নীহারের দাসী ঘন ঘন আবু তাহেরের নিকট বাজারাত আরম্ভ করিয়াছে। আবুল হাসেনের গৃহে তাহার প্রতিবিম্ব তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, এবং আবুল হাসেনের পীড়ার সম্বন্ধে তাঁহার অবস্থিত ছিল না। এই সকল দেখিয়া জহরীর মনে বড় মনোহর উদয় হইয়াছিল। আবু তাহেরকে জহরী জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভাই, একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, ঠিক উত্তর দিবে ত? সামনেল নীহারের দাসী তোমার সহিত এত ঘন ঘন সাক্ষাৎ করে কেন? আগে ত’ এরূপ ছিল না।” আবু তাহের বলিলেন, “দাসী-বাসীর কথা কেন জিজ্ঞাসা কর?—হাতে ত’ বেশী কাজ নাই, দ্রুত গর করিয়া যার, আর কি?”—জহরী বলিলেন, “ভাই, তুমি সত্যকথা খুলিয়া বলিলে না, তোমার জ্ঞান শুনিয়া বুঝিয়া, ভিতরে কোন সন্দেহ রহিত আছে।”

জহরী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আবু তাহেরকে প্রকৃত কথা খুলিয়া বলিবার জন্ত অহরোধ করিলে, আবু তাহের বলিলেন, “ভাই, এ গোপনীয় কথা আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে, এরূপ হইল আমার ছিল না, কিন্তু তুমি আমার বিশ্বাস বন্ধ, যদি তুমি প্রতিজ্ঞা কর, কাহারও নিকট এ কথা প্রকাশ করিবে না, তাহা হইলে তোমাকে আমি সকল কথা বলিতে পারি।”—জহরী তৎক্ষণাত্ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। তখন আবু তাহের জহরী-বন্ধুর নিকট আবুল হাসেন ও সামনেল নীহারের প্রণয়কাহিনী শ্রবিত্তার বর্ণন করিলেন, তাহার পর এই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িলে তাঁহাকেও যে বিপদে পড়িতে হইবে, তাহাও জহরী-বন্ধুকে জানাইলেন।

জহরী সকল কথা শুনিয়া ব্যংগোন্মত্ত বিম্বিত হইলেন। অবশেষে তিনিও বলিলেন, “যদি প্রশস্তমূল লক্ষ্য সাধন না হয়, তাহা হইলে উভয়েরই সর্বনাশ হইবে। এ ব্যাপার কখনও অধিক দিন গোপনে থাকিতে পারে না। ইহার পরিণামফল কিরণ শোচনীয় হইবে, তাহা আমি মনস্তক্ষে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তুমি ভাই, সময় থাকিতে সন্নিহিত ঠাঁও, নতুবা তোমাকেও মহা বিপদে পড়িতে হইবে;—সর্বস্বাভ্য ত’ হইবেই, প্রণয়কথাও করিতে পারিবে না।”—আবু তাহেরকে এই উপদেশ দান করিয়া জহরী বানান্তরে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থানের পূর্বে তিনি আবার আবার নামে দিয়া করিয়া বলিলেন, “এ কথা কর্ণভিত্তে প্রবেশ করিবে না।”

হুই দিন পরে আবু তাহেরের আত্ম কোন সন্ধান না পাইয়া জহরী আবু তাহেরের কোন প্রতিবাসীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, আবু তাহের দেখপর্ষাটনে যাত্রা করিয়াছেন। আবু তাহেরের অবদানে আবুল হাসেন কিরণ বিচলিত হইবেন ও তাঁহার প্রণয়শাস্ত্রের সহিত মিশেন হতাশ হইয়া কিরণ কষ্ট পাইবেন, তাহা ভাবিয়া জহরী আবুল হাসেনের কষ্টে অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। জহরীর সহিত আবুল হাসেনের সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল। তিনি তাঁহার নিকট কিছু জহরী বিক্রয় করিয়াছিলেন। একদিন জহরী আবুল হাসেনের সহিত



সাক্ষ্য করিতে সম্মত করিলেন, এবং আবুল হাসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া গোপনে বলিলেন, “রাজপুত্র, যদিও আমি আপনার নিকট সুপরিচিত নহি, তথাপি আপনাকে কোন গুরুতর বিষয়ে অনুরোধ করিবার জন্ত আমি আপনার সহিত সাক্ষ্য করিতে আসিয়াছি, আমার খুঁটা মার্জনা করিবেন।”

জহরী আবু তাহেরের নগরতাগের কথা আবুল হাসেনকে জানাইলেন। আবুল হাসেন এই কথা শুনিয়া বিরহে হৃৎবেগ প্রিয়মাণ হইলেন। তিনি এখনও মনে করেন নাই, তাঁহার প্রাণের বন্ধু আবু এ অবস্থায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাইবেন। বন্ধুর ব্যবহারে তিনি মনে গভীর বেদনা পাইলেন।

অনেকক্ষণ চিন্তার পর আবুল হাসেন একজন ভৃত্যকে আবু তাহেরের গৃহে প্রেরণ করিলেন; তাহাকে বলিলেন, “শীঘ্র দেখিয়া আয়, আবু তাহের সত্যই বসোরার চলিয়া গিয়েছেন কি না? আমি অবিলম্বে এই সংবাদ জানিতে চাই।” জহরী আবুল হাসেনের সহিত আরও অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু আবুল হাসেন কোন কথার উত্তর দিলেন না, অত্যন্ত বিমর্ষভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

ভূতা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, “আবু তাহের সত্যগতাই দুই দিন পূর্বে বসোরা যাত্রা করিয়াছেন। আবু তাহেরের গৃহে একটি দাসীর সহিত আমার সাক্ষ্য হইল, সে আপনার সহিত গোপনে সাক্ষ্যের জন্ত প্রাণে প্রকাশ করিল; সুতরাং আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি; অল্পমতি হইলে আপনার নিকট তাহাকে এইখানে উপস্থিত করিতে পারি।”

আবুল হাসেন বুকিলেন, ঐ দাসী তাহারই প্রিয়তমার নিকট হইতে আসিয়াছে। জহরী তখন আবুল হাসেনের নিকট হইতে উদ্ভূত চলিলেন। দাসীর সহিত আবুল হাসেনের কথাবার্তা চলিতে লাগিল, কথা শেষ হইলে দাসী প্রস্থান করিল।

প্রিয়তমার
দীর অঙ্গসংগ



কিয়ৎকাল পরে জহরী ফিরিয়া আসিয়া বলিল, “রাজপুত্র, আমি বুঝিতেছি, খালিকের প্রাণে আপনার কোন গোপনীয় কার্য আছে।”—আবুল হাসেন বলিলেন, “তুমি কিরূপে জানিলে?”—জহরী বলিল, “ঐ যে দাসী এখনই আপনার নিকট বিদায় লইয়া গেল, তাহারই মুখে শুনিয়াছি। আমি জানি, সে খালিকের প্রাণে অল্পমতি সাক্ষ্যের নামে নীহারের প্রিয়তমা কিংবদন্তী, সে কখনও কখনও আমার দোকানে আসিয়া তাহার মনিবের জন্ত জহরত ক্রয় করিয়া থাকে। আমি ইহাও জানি যে, এই দাসী নামসেল নীহারের সকল গোপনীয় সংবাদ রাখিয়া থাকে, দাসীকে আমি বড় গভীরভাবে কয় দিন হইতে ঘুরিতে দেখিতেছি।”

এই কথা শুনিয়া আবুল হাসেনের মনে বড় ভয় হইল; তিনি ভাবিলেন, লোকটা নিশ্চয়ই আমাদের ভিতরের কথা কিছু কিছু জানে, নতুবা এভাবে কথা বলিবে কেন?—আবুল হাসেন কয়েক মুহূর্ত্ত নির্ভীক রহিলেন; কি করিবেন, কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি জহরীকে বলিলেন, “তোমার কথায় আমার বোধ হইতেছে, তুমি এ সম্বন্ধে কোন কোন কথার জান, আমি তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছা করি।”

প্রশ্ন-মিলনে
আশ্রয়যোগ



জহরী আবু তাহেরের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা সকলই বলিলেন; অবশেষে আবু তাহের আশ্রয়স্থলেই বসোরা-যাত্রা করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন। অনন্তর তিনি অত্যন্ত সহৃদয়তা দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, “রাজপুত্র, আপনাকে এই বিপদে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়া আবু তাহেরের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। আমি আপনাকে এই ভাবে বিপর্যে দেখিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি, আপনি অল্পমতি করিলে আমি যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিতে পারি। আবু তাহেরের উপর আপনি যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন, আমাকেও যদি সেইরূপ বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে আমি বোধ করি, আপনার কোন

না কোন উপকারে লাগিতে পারি। আমার জীবন পর্যন্ত আপনার কার্যে উৎসর্গ করিতে আমি কৃতসম্মত আছি। আল্লার দিবা করিয়া বলিতেছি, আমাদের পবিত্র ধর্মে বাহা কিছু শ্রেষ্ঠ জবাব, সকলের দিবা করিয়া বলিতেছি, আপনারদের গুপ্তকথা কেহই জানিতে পারিবে না। আপনার একটি বন্ধু গিয়াছে, আর একটি বন্ধু তাহার স্থান পূরণ করিবে।”

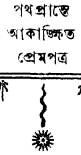
আবুল হাসেন এই কথার মনে বল পাইলেন, আবু তাহেরের অভাবদুঃখ তাহার মনে হইতে বিদূষিত হইল, তিনি জহরীর সাহায্যগ্রহণে সন্মত হইলেন। তখন কি ভাবে কার্য করিলে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে, সে সম্বন্ধে হুজ্জনে নানাবিধ আলোচনা হইতে লাগিল। দাসীটি বাহাতে জহরীকে বিশ্বাস করে, সেই জন্তই চেষ্টা করা সর্বপ্রথম কর্তব্য বলিয়া স্থির হইল। সে যে সকল চিঠিপত্র আনিবে, তাহা জহরীকে প্রদান করিবে, কারণ, দাসী সর্বদা আবুল হাসেনের গৃহে আসিলে লোকের সন্দেহ বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই সকল বিষয়ের আলোচনার পর জহরী উত্তিলেন এবং আবুল হাসেন তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারেন, পূর্বের স্থা পশ্চিমে উঠিলেও তাঁহার বিশ্বাসঘাতক হইবার সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি কথা বলিয়া স্বগৃহে প্রত্যাপন করিলেন।

জহরী গৃহে বাইতে বাইতে সহদা দেখিলেন, পথে একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্রখানি মোহর করা ছিল না, জহরী তাহা কুড়াইয়া লইয়া আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—
“পারস্যরাজকুমারের প্রতি সামসেল নীহারের নিবেদন—

“দাসীমুখে তোমার দুঃখের কথা শুনিয়া আমি বড়ই কষ্ট পাইলাম, আবু তাহেরকে হারািয়া সত্যই আমার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি; কিন্তু সেজন্ত তোমার উৎসাহের যেন অভাব না হয়। বিপৎকালে বন্ধু পরিত্যাগ করিলে, তাহা দুঃখের বিষয় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে শাস্তি অবলম্বন করিয়া ধৈর্যধারণই কর্তব্য। এক্ষণে যেন আমরা মুহূর্তের জন্যও পরস্পরের প্রতি প্রেমহীন না হই। দুঃখ ভিন্ন পৃথিবীতে কে সুখলাভ করিতে পারে? আমাদের এই সকল কষ্টের অবশ্যে আমরা অবশ্যই সুখী হইব। এখন বিদায়।”

সামসেল নীহার দাসীমুখে আবু তাহেরের নগরভাগ-বৃত্তান্ত শুনিয়া, এই পত্রখানি লিখিয়া, তাহা আবুল হাসেনের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, পত্রখানি আবুল হাসেনের নিকট আনিবার সময় দাসী অসাবধানতা বশতঃ পথে ফেলিয়াছিল। যখন সে জানিতে পারিল, পত্রখানি পড়িয়া গিয়াছে, তখন সে তাহা খুঁজিতে খুঁজিতে দেখে যে, জহরী তাহা কুড়াইয়া লইয়া পাঠ করিতেছেন। দাসী সেই পত্র জহরীর নিকট চাহিল, জহরী পত্র প্রদান করিলেন না, তাহার কথার কর্ণপাতও করিলেন না। দাসী জহরীর অহমস্বরূপ করিল; ক্রমে জহরী তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে দাসীও পত্রখানি প্রাপ্তির আশার তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। দাসীকে তাঁহার নির্জন কক্ষে লইয়া গিয়া জহরী বলিলেন, “এ পত্র যে সামসেল নীহার আবুল হাসেনকে লিখিয়াছেন, তাহা বুঝিয়াছি, আমি সত্যি এই প্রেমিকবৃন্দের হিতাকাঙ্ক্ষী, তুমি এই পত্র লইয়া যাও, আমি আবুল হাসেনের নিকট প্রতীক্ষা করিয়াছি, আবু তাহের তাহার যেরূপ হিতৈষী, আমিও তজ্জপ। আমি ইহাদের মিলনসকলের যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তাহা আবুল হাসেনকে বলিয়াছি, তোমাকেও বলিতেছি; তুমি তোমার ঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া এ সকল কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিবে।”

দাসী সন্তুষ্ট হইয়া, পত্র লইয়া, আবুল হাসেনের নিকট উপস্থিত হইল। আবুল হাসেন সেই পত্র পাঠ করিয়া যে উত্তর লিখিলেন, তাহা দাসী জহরীর নিকট লইয়া আসিল। জহরী সেই পত্র পাঠ করিয়া দাসীর হস্তে প্রত্যাপন করিলেন। দাসী বলিল, “আমি ঠাকুরাণীর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার প্রতি



বিষাদস্থাপন করিতে অজরোধ করিব, আবু তাহের তাঁহার যেরূপ উপকার করিগছেন, আশা করি, আপনিও তরূপ উপকার করিতে সক্ষম হইবেন। ঠাকুরাণী যে পত্র পাঠাইবেন, তাহা আমি লইয়া আসিয়া আপনার হস্তেই প্রদান করিব।”

পরদিন সামসেল নীহারের দাসী জহরীর নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া বলিল, “আমি ঠাকুরাণীকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়াছি। তিনি আপনার দল্লভ্যতার পরিচয় পাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রথমে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চান, তাঁহার আদেশ অনুসারে আমি আপনাকে লইতে আসিগাছি, আপনি আমার সহিত সামসেল নীহারের নিকট চলুন।”

জহরী এবার বড় বিপদে পড়িলেন, কিয়ৎকাল চিন্তার পর তিনি বলিলেন, “তোমার ঠাকুরাণী এই আদেশপ্রদানের পূর্বে সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা ত’ বোধ হয় না। আবু তাহেরের প্রতি খালিফের আদেশ ছিল, তিনি প্রাসাদের সর্বত্র গমন করিতে পারিবেন, হুতরাং তিনি প্রাসাদের কোন স্থানে গমন করিলে প্রহরিগণ তাঁহাকে আটকাইত না। এমন কি, তিনি অকুণ্ঠিতভাবে সামসেল নীহারের মহলেও প্রবেশ করিতে পারিতেন, আমার সে স্তুবিধা নাই, আমি কোন সাহসে সেখানে প্রবেশ করি? তুমিই বৃত্তিতে পারিতেছ, নির্বিঘ্নে আমার সেখানে বাওয়া অসম্ভব। তুমি তোমার মনিব ঠাকুরাণীকে এ কথা বুঝাইয়া বলিবে। তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিলেই আমার কথা যে অসঙ্গত নহে, তাহা বৃত্তিতে পারিবেন।”

দাসী বলিল, “আপনার কোন ভয় নাই, আপনি চলুন। আপনার যদি বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলে সামসেল নীহার কখনই এরূপ আদেশ প্রদান করিতেন না। আপনাকে সাবধানে লইয়া ঘাইবার অনুমতি আমি পাইগাছি, সেইরূপেই লইয়া যাইব। আপনি বৃত্তিতে পারিবেন, আপনার ভয় নিতান্তই অনর্থক।”

দাসী কথায় জহরী সাহস পাইয়া, তাহার সহিত সামসেল নীহারের মহলে প্রবেশ করিলেন। প্রাসাদে প্রবেশ করিতে তাঁহার আপদ-মস্তক কাঁপিতে লাগিল। তাঁহাকে এইরূপ কল্পিতকলবের হইতে দেখিয়া দাসী বলিল, “আপনার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে প্রাসাদে প্রবেশ করা আপনার পক্ষে বড়ই অপ্রীতিকর হইবে বোধ হইতেছে। আপনি বাড়ী ফিরিয়া যান, আমি আমার মনিব ঠাকুরাণীকে আপনার ভয়ের কথা বলিব, তাহা হইলে তিনি স্বয়ং আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ করিবেন।”—দাসী একাকী সামসেল নীহারের নিকট উপস্থিত হইয়া, জহরীর ভয়ের কথা তাঁহাকে জানাইলে, সামসেল নীহার স্বয়ং জহরীর সহিত সাক্ষাতের জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

যথাসময়ে সামসেল নীহার জহরীর গৃহে উপস্থিত হইলে, জহরী বিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন। সামসেল নীহার জহরীর নিঃস্বার্থ পরোপকারবৃত্তিতে মুগ্ধ হইয়া, তাঁহাকে অমধ্যাধ্যক্ষ প্রদান করিলেন, তাহার পর প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সামসেল নীহার জহরীর গৃহ ত্যাগ করিলে, জহরী সামসেল নীহারের আগমনকাহিনী আবুল হাসেনকে বলিবার জন্ত তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। আবুল হাসেন জহরীর অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় পাইয়া আবু তাহেরের শোক বিস্তৃত হইলেন, মহানন্দে তাঁহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন ও সুখত্বের অনেক কথা প্রকাশ করিলেন।

জহরী গৃহে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, সামসেল নীহারের দাসী তাঁহার অপেক্ষার বসিয়া আছে। দাসী বলিল, “ঠাকুরাণী রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত অভ্যস্ত উত্তরক হইয়াছেন, আপনার গৃহই সাক্ষাতের উৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া তিনি মনে করেন। এ বিষয়ে আপনার মত কি?”



জহুরী বলিলেন, “ইহাতে আমার অমত নাই, কিন্তু এই মিলনের জন্ত আমি আমার অপেক্ষাও একটি উৎকৃষ্ট গৃহ ঠিক করিতে পারি। সেই গৃহে এখন কেহই বাস করে না, আমি তাঁহাদের জন্ত গৃহ উত্তমরূপে সজ্জিত করিয়া রাখিব।”

দাসী সামসেল নীহারের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিল। সামসেল নীহার এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জহুরী তাঁহার সম্মতি জানিবামাত্র বহুবান্ধবগণের নিকট হইতে গৃহ-সজ্জার নানাবিধ আসবাব চাহিয়া লইয়া, সেই গৃহ সজ্জিত করিয়া দিলেন। তাহার পর নির্দিষ্ট দিনে আবুল হাসেন কোন ভৃত্যকে সঙ্গে না লইয়া, একাকী জহুরীর সঙ্গে গুপ্তপথ দিয়া, সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যার পূর্বে দুই জন খোজা ও সেই দাসীকে সঙ্গে লইয়া সামসেল নীহার সেই গৃহে উপস্থিত হইলেন।

আবার বহুদিন পরে প্রশয়িগুণের মিলন হইল। দুইটি মিলনব্যাকুল হৃদয় বিচ্ছেদের বন্ধিআলার পুড়িয়া নরিতছিল। এত দিন পরে জনহীন কক্ষে পরস্পর পরস্পরকে কাছে পাইয়া, আনন্দে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। নদীর প্রবল প্রবাহধারা যেন মিলন-প্রত্যাশী সমুদ্রের বক্ষেদেশে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পারশ্ব-রাজকুমার এ পর্যন্ত জন্ত কোনও রমণীর প্রণয়ে আত্মনিবেদন করেন নাই। সামসেল নীহারের দ্বারা পূর্ণ-যৌবন স্বপ্নহীনরূপে বক্ষেদেশে নিশীড়িত করিয়া তিনি অনির্লচনীয়া হুখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। উভয়ে নানা কথায় সময়ক্ষেপণ করিতে লাগিলেন, অজস্র-চুপনে পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রণয় নিবেদন করিলেন, মনের বেদনা প্রকাশ করিতে উভয়েরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আহা!দির বিশেষ আয়োজন ছিল, প্রশয়িগুণ দ্বারা আহা করিলেন, তাহার পর তাঁহারা উৎকৃষ্ট সুরা পান করিলেন। সামসেল নীহার বিরহ-বেদনা ভুলিয়া একটি বীণা-হস্তে যেমন গান করিতে বাইবেন, এমন সময় এক জন ভৃত্য অত্যন্ত ব্যস্তভাবে জহুরীর নিকট আসিয়া প্রকাশ করিল, “কতকগুলি অস্বাভাবিক ব্যক্তি দ্বারদেশে আসিয়া, দ্বার ভাঙ্গিয়া, বাড়ীর মধ্যে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহাদিগকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করার তাহারা কোন উত্তর দিল না, শীঘ্রই দ্বার ভাঙ্গিয়া এখানে উপস্থিত হইবে।” জহুরী এই সংবাদ শুনিবামাত্র দ্বারদেশে আসিলেন, এবং দ্বার-প্রান্তে লুকাইয়া দেখিলেন, প্রায় দশ জন অস্বাভাবিক ব্যক্তি দ্বার ভাঙ্গিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। জহুরী প্রাণভয়ে সেই ভরন ত্যাগ করিয়া, একটি প্রতিবাণীর গৃহে প্রবেশ করে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। তিনি মনে করিলেন, খালি গোপনে সামসেল নীহারের অভিসারবার্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে ধরিবার জন্ত এই সকল লোক প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি উৎকণ্ঠিতভাবে উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন। মধ্যরাত্রি পর্যন্ত মহা গুণ্ডগোল চলিল। অবশেষে সমস্ত গোলযোগ থামিয়া গেল। তখন জহুরী তাঁহার প্রতিবাণীর নিকট একখানি তরবার চাহিয়া লইয়া, গোলযোগের কারণ নির্ণয় করিতে বাহির হইলেন। তিনি প্রথমে স্বগৃহে উপস্থিত হইলেন, তাঁহার ভৃত্যকে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তিনি যাহাদিগকে খালিফের অমুচর মনে করিয়াছিলেন, তাহারা দস্যুদল; ডাকাতি করিবার জন্ত তাহারা ঐ বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল; মূল্যবান আসবাবগুলি লুণ্ঠন করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছে।

জহুরী এই কথা শুনিয়া একবারে বসিয়া পড়িলেন। সেই গৃহ হস্তসজ্জিত করিবার জন্ত তিনি বহুগণের নিকট হইতে নানাবিধ মূল্যবান দ্রব্যাদি ধার করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, এখন তিনি কিরূপে তাঁহাদিগকে সেই সকল দ্রব্য প্রত্যর্পণ করিবেন, ভাবিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি তাঁহার অদূরদর্শিতার জন্ত অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, এবং আবু তাহেরকে তাঁহার অপেক্ষা অনেক অধিক দূরদর্শী ও বিচক্ষণ বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।



দস্তাকবলে
প্রেমিক-
প্রেমিকা



ডাক্তারির পরদিন মধ্যাহ্নকালে ভৃত্য আসিয়া জহুরীকে সংবাদ দিল, এক জন অপরিচিত লোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। জহুরী সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তিকে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করাইতে অনিচ্ছুক হইয়া, বাহিরে আসিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। লোকটি তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, “মহাশয়, যদিও আমি আপনার অপরিচিত, তথাপি আপনি আমার অপরিচিত নহেন।” জহুরী বলিলেন, “আম্বন, বাড়ীর ভিতরে যাই, বাহা কথা থাকে, সেখানে হইবে।” অপরিচিত ব্যক্তি বলিল, “আমি এ বাড়ীতে কাজ নাই, আপনার আর একখানি বাড়ী আছে, সেইখানে চলুন।” জহুরী বলিলেন, “আপনি কিরূপে সে বাড়ীর কথা জানিলেন?”—অপরিচিত ব্যক্তি সহান্তে উত্তর করিল, “আমি যে তাহা জানি, তাহা ত’ আপনি বুঝিয়াছেন, এখন আম্বন, আপনি ইতস্ততঃ করিবেন না, আমি আপনাকে একটি স্নানবাণ দিব।” জহুরী বলিলেন, “সে গৃহে ডাক্তারি হইয়া গিয়াছে, ধার-জানালা ভাঙ্গা, সেখানে কোন গোপনীয় কথা চলিতে পারিবে না।”—“তবে আমার সঙ্গে আম্বন” বলিয়া সেই ব্যক্তি জহুরীকে সঙ্গে লইয়া চলিল। সমস্ত দিন সে চলিতে লাগিল, জহুরী বিস্মিত হইলেন।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। পথশ্রমে দেহ ক্লান্ত। জহুরীর ঐর্ষ্য লুপ্ত হইল, অবশেষে উভয়ে টাইগ্রিস নদীর তীরদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীতীরে একখানি নৌকা রাখা ছিল, সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া তাঁহারা উভয়ে অপর পারে উপস্থিত হইলেন। অতঃপর অনেক পথ ঘুরিয়া উভয়ে একটি গৃহঘারে সমাগত হইলে, অপরিচিত ব্যক্তি ধার উন্মুক্ত করিল। জহুরী গৃহে প্রবেশ করিলে, সেই অপরিচিত ব্যক্তি গৃহঘার উত্তমরূপে অর্গলবদ্ধ করিয়া, জহুরীকে লইয়া একটি কক্ষে উপস্থিত হইল।

সেই কক্ষে দশ জন লোক বসিয়া ছিল, তাহার জহুরীকে তাহাদের পার্শ্বে উপবেশন করিতে বলিল। লোকগুলিকে এই অপরিচিত স্থানে দলবদ্ধ অবস্থার দেখিয়া, জহুরীর মনে বিশেষ ভয়ের সঞ্চার হইল; কিন্তু তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইরাছিলেন, বসিয়া পড়িলেন। দশ জন লোক প্রথমে আহ্বাতি করিল, তাঁহাকেও তাহাদের সঙ্গে আহ্বাতি করিতে অমুরোধ করিল, আহ্বাতির পর জহুরীর নিকট পূর্বরাত্রির সমস্ত ঘটনা জানিতে চাহিল। এক জন বলিল, “আমাদের কাছে কোন কথা গোপন করিও না, আমরা প্রণয়িগুণের নিকট সকল কথা শুনিয়াছি, তথাপি তোমার কাছে আর একবার আত্মপূর্বিক শুনিতে চাই।”

জহুরী বুঝিলেন, ইহারা পূর্বরাত্রির দস্যাদল। জহুরী সবিনয়ে দস্যাদলপতিকে বলিলেন, “মহাশয়, সেই যুবক-যুবতীর কোন সংবাদ না জানিয়া আমি বড় চিন্তিত হইয়াছি, আপনি যদি তাঁহাদের সংবাদ জানেন, বলিয়া চিন্তা দূর করুন।” দলপতি বলিল, “আপনি কোন চিন্তা করিবেন না, আমরা তাঁহাদিগকে অতি উৎকৃষ্ট বানানে রাখিয়াছি। তাঁহারা নিরাপদে আছেন।” দস্যাপতি দুইটি স্বতন্ত্র কক্ষের দিকে অঙ্গুলী প্রদারণ করিয়া বলিল, “তাঁহাদিগকে দুইটি বিভিন্ন কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন, আপনি তাঁহাদের সকল বিবরণ অবগত আছেন, আপনি তাঁহাদের সম্বন্ধে সকল কথা খুলিয়া বলুন, কোন কথা গোপন করিবার আবশ্যক নাই; কারণ, তাহাতে আপনার বা তাঁহাদের কোন অপকার হইবে না। আমরা তাঁহাদের প্রতি যথোচিত ভদ্রতা প্রকাশ করিয়াছি, আপনার প্রতিও কোন প্রকার অত্যাচার আমরা বোধ হয় প্রকাশ করি নাই।” জহুরী আশ্বস্ত হইয়া দস্যাদলের নিকট আবুল হাঙ্গেন ও সামসেল নীহারের পরিচয় ও তাঁহাদের প্রণয়কাহিনী প্রকাশ করিলেন।

এই অদ্ভুত বিবরণ শ্রবণ করিয়া দস্যাদল বলিল, “এই রমণীই কি স্বকীর্ত্তি প্রাপ্তি পালিকের আদরিণী প্রিয়তমা সামসেল নীহার আর পুরুষটি স্থবিখ্যাত পারস্তরাজপুত্র আলী আবুল হাঙ্গেন?” অনন্তর দস্যাদল

অভিসারিকার
পরিচয়



অবিলম্বে সামসেল নীহারের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল এবং কাতরভাবে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার বলিল, যদি তাহার পূর্বরাত্রিতে তাঁহার পরিচয় পাইত, তাহা হইলে কখনও তাঁহাকে সে ভাবে আবদ্ধ করিত না। কেবল ইহাই নহে, তাহার যে সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহাও জহুরীকে প্রত্যর্পণ করিতে কৃতসম্মত হইল, এবং সামসেল নীহারকে কোন নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আসিতে প্রতীকৃত হইল।

সামসেল নীহার এবং আবুল হাসেন বলিলেন, যদি তাহার তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন প্রকাশ না করে, তবে তাঁহার তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। তাহার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে, উভয়ে গৃহকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সামসেল নীহারের ভৃত্যস্ব ও দাসীরা কি হইল, তাহা জহুরী আবুল হাসেনের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তিনি তাহাদের কোন সংবাদই রাখেন না। দস্থ্যদল তাঁহাদিগকে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছে, এবং সেই গৃহে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, এই মাত্র তিনি অবগত আছেন।

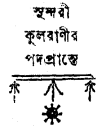
দস্থ্যদল সামসেল নীহার, জহুরী ও আবুল হাসেনকে লইয়া নদী পার হইল, এবং নদীতীরে আসিয়া গুপ্তপথ দিয়া অপরপারে প্রস্থান করিল। তখন রাত্রি গভীর হইয়াছিল।

তীরে উঠিয়া সামসেল নীহার, আবুল হাসেন ও জহুরী রাজপথে অগ্রসর হইবেন, এমন সময় কোতোয়াল আসিয়া তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল; এত রাত্রিতে তাঁহার কোথা হইতে আসিতেছেন ও কোথায় যাইবেন, তাহাও জানিতে চাহিল। ইহাতে সকলেই ভীত হইলেন, বিশেষতঃ সামসেল নীহার ও আবুল হাসেন মহা ভীত হইয়া পড়িলেন। জহুরী দেখিল, এ সময় হতভুদ্ধ হইলে সকলেরই প্রাণনাশের সম্ভাবনা বলবতী, সুতরাং তিনি বলিলেন, “মহাশয়, আমরা সকলেই এই নগরের সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তি, নোকা হইতে আমরা এই মাত্র অবতরণ করিলাম। নোকার অস্তিত্ব আরোহী সকলেই দৃষ্ট, তাহার আমাদের গৃহ ভাঙ্গিয়া, সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া, আমাদের গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছি। তাহার আমাদের যে সকল সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহাও আংশিকরূপে আমাদের প্রত্যর্পণ করিয়াছে।” দস্থ্যদল যে সকল দ্রব্য ফিরাইয়া দিয়াছিল, জহুরী তাহা কোতোয়ালকে দেখাইলেন।

কোতোয়াল এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইল না, সে আবুল হাসেনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, “সত্য করিয়া বল, এই রমণীট কে? তুমি কিরূপে ইহার সহিত পরিচিত হইলে? ইনি তোমার সঙ্গেই বা কেন? সহরের কোন্ অংশে তোমার বাস?”

এই প্রশ্নের উত্তর কি করিবেন, আবুল হাসেন তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া নির্বাক্ রহিলেন, কিন্তু সামসেল নীহার আর সময় নষ্ট করা কর্তব্য জ্ঞান করিলেন না; তিনি বুঝিলেন, কোতোয়াল সামান্য গোলামাল করিলে, সকলেরই প্রাণ নষ্ট হইবে, সুতরাং কোতোয়ালকে কিছু দূরে ডাকিয়া, দুই একটি কথা বলিলেন। কোতোয়াল তাঁহার কথা শুনিয়াই অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহার অধীনস্থ গ্রহরিগণকে তৎক্ষণাৎ ছিথানি নোকা আনিতে আদেশ করিলেন।

নোকাধর কূলে নীত হইলে সামসেল নীহার একখানি নোকার আরোহণ করিলেন, অস্ত্রখানিতে জহুরী ও আবুল হাসেন উঠিলেন। নোকা চলিতে লাগিল।





নৌকার আরোহণ করিয়া আবুল হাশেম বখামমের গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন; কিন্তু তিনি দুশ্চিন্তায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন; সামসেল নীহারের কি অবস্থা ঘটিল, তাহা জানিতে না পারিয়া, তাঁহার আক্ষেপের লীমা রহিল না। তিনি কয়েক দিন শযায় শয়ন করিয়া রহিলেন, কেবল তাঁহার শ্রিয়তম বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু তিনি কেন নিরুদ্দেশ হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও নিকট ঘূণাকারও প্রকাশ করিলেন না।

দুই এক দিন পরে জহরী তাঁহার এক জন বন্ধুর দোকানে বেড়াইতে গিয়া ফিরিবার সময় দেখিলেন, পথে একটি স্ত্রীলোক তাঁহাকে নিকটে আসিবার জন্ত ইঙ্গিত করিতেছে। জহরী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, এই স্ত্রীলোক সামসেল নীহারের কিস্করী। তিনি তাহাকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন, এবং তাহার সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার জন্ত তাহাকে তাঁহার অনুগমন করিতে অনুরোধ করিলেন। কিছুদূর একটি পুরাতন নির্জন মসজিদ ছিল, উভয়ে তথ্যে প্রবেশ করিয়া, জহরী দানীকে দস্তাদলের হস্তে নিশ্চিত হওয়ার পর কি কি ঘটনা ঘটয়াছে, তাহা তাহাকে বিবৃত করিতে বলিলেন; কিন্তু দানী তাঁহার বিবরণ অগ্রে শুনিবার জন্ত এমন আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল যে, তাঁহাকেই প্রথমে তাঁহার কাহিনী তৎসাক্ষে আত্মপূর্বিক বলিতে হইল।

সকল কথা শুনিয়া দানী বলিল, “দস্তাদল উপস্থিত হইলে আমি তাহাদিগকে খালিকের রক্ষা সৈন্ত বলিয়া মনে করিলাম; তাহালাম, খালিক এই গুপ্তপ্রাণকাহিনী অবগত হইয়া আমাদের প্রাণবধের জন্ত এই সকল সৈন্ত প্রেরণ করিয়াছেন; সুতরাং নিজের প্রাণরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে আমি ক্রতবেগে সেই গৃহের ছাদে উঠিয়া লুকাইয়া রহিলাম। অজ্ঞ দুই জন ভ্রাতাও আমার অনুসরণ করিল। ছাদে উঠিয়া দেখিলাম, এক ছাদ হইতে অজ ছাদে যাওয়া যার, সুতরাং ক্রমে আমরা বহু ছাদের উপর দিয়া পলাইয়া এক জন ভল্লোকে গৃহে উপস্থিত হইলাম, তিনি আমাদের পরম সমাদরে স্থান দিলেন। সেইখানেই আমরা রাত্রিযাপন করিলাম।

“পরদিন প্রভাতে গৃহস্থানীকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, আমরা সামসেল নীহারের মহলে প্রত্যাগমন করিলাম। ঠাকুরাণীর কি হইল, জানিতে না পারিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। সামসেল নীহারকে ত্যাগ করিয়া, আমাদের ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া, অজ্ঞ দানীগণও অত্যন্ত ভীত হইল। আমরা তাহাদিগকে বলিলাম, ‘ঠাকুরাণীকে তাঁহার কোন বান্ধবীগৃহে রাখিয়া চলিয়া আসিয়াছি, তিনি আমাদের ডাকিয়া পাঠাইলে আমরা গিয়া তাঁহাকে লইয়া আসিব।’ আমাদের এই উত্তরে দানীগণের চিন্তা ও ভয় দূর হইল।

“কিন্তু সমস্ত দিনের মধ্যে আমরা চিন্তা দূর হইল না। রাত্রিতে আমি নদীর দিকের গুপ্তপ্রাণ খুলিয়া নদীর ধারে আসিয়া ঠাঁড়াইলাম, কিরংকণ পরে খালে একখানি নৌকা দেখিয়া আমি মাঝিকে ডাকিলাম; তাহাকে বলিলাম, ‘নৌকা বাহিরা নদীতীর অবধেণ করিয়া দেখ, যদি কোন রমণীকে দেখিতে পাও, তাহাকে এখানে লইয়া আসিবে।’

“মথ্যরাত্রি পর্যন্ত অবধেণ করিলাম। গভীর রাত্রিতে দেখিলাম, সেই নৌকার দুই জন আরোহী ও একটি আরোহিণী নদীতীরে আসিলেন, লোক দুজন আরোহীকে তীরে তুলিলেন; দেখিলাম, সেই আরোহিণীই সামসেল নীহার। তাঁহার আদেশে আমি হাজার মোহরের একটি তোড়া আনিয়া, যে প্রহরির হাতকে নদীতীরে আনিয়াছিলাম, তাহাদিগকে পুরস্কার দান করিলাম। তাহার পর দানীদিগের সহায়তার সেই



গুপ্তপথ দিয়া ঠাকুরাণীকে তাঁহার মহলে লইয়া আসিলাম। শয্যায় শয়ন করিবারাত্রি সামসেল নৌহার মুক্তি হইয়া পড়িলেন, সমস্ত রাত্রির মধ্যে আর তাঁহার মুচ্ছাভঙ্গ হইল না, আমরা প্রাণপণে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলাম।

“মুচ্ছাভঙ্গে তিনি কেবল অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইতে লাগিল। আমি সবিনয়ে তাঁহাকে তাঁহার উদ্ধারের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি রোদন করিতে করিতে বলিলেন, ‘বাঁদী, সে দুঃখের কথা আর জিজ্ঞাসা করিস্‌নি, হার! দম্ভ্য-হস্তে যত দিন আমার প্রাণ বহির্গত না হইবে, তত দিন আমার যত্নস্বার অবসান হইবে না।’

প্রাণ-বক্তিতার
বিবহ-উচ্ছ্বাস
ক
↑
ক
✱

“আমি তাঁহার মুক্তিলাভের সংবাদ-শ্রবণের জন্ত পুনঃ পুনঃ আগ্রহ প্রকাশ করিলে, অবশেষে তিনি বলিলেন, ‘তবে শোন, দম্ভ্যদল যখন সেই গৃহে প্রবেশ করিল, তখন আমি মনে করিলাম, আমার অন্তিমকাল উপস্থিত হইয়াছে, রাজপুত্রের প্রাণরক্ষারও কোন উপায় নাই। বাহা হউক, মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইলাম না, কারণ, আমরা উভয়ে একত্র মরিতে পাইব ভবিষ্য আমার মনে একটু আনন্দই হইয়াছিল; কিঞ্চিৎ দম্ভ্যরা আমাদেরকে না মারিয়া সমস্ত জবাসামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া আমাদেরকেও সঙ্গে লইয়া চলিল।

“পথে তাহারা আমাদের নাম জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। আমি বলিলাম, আমি এক জন নর্তকী, আবুল হাসেনকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, তিনি এই নগরের এক জন অধিবাসী। তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলে, দম্ভ্যদল আমার বসনভূষণাদি পরীক্ষা করিল। আমার আশ্চর্যে সকল বহুমূল্য হীরকালঙ্কার ছিল, তাহা দেখিয়া তাহারা বলিল, ‘তুমি সামান্য স্ত্রীলোক নহ, একজন নর্তকী এত অলঙ্কার কোথায় পাইবে? সত্য বল, তুমি কে?’

“আমার কাছে কোন উত্তর না পাইয়া, তাহারা আবুল হাসেনকে এই প্রশ্ন করিল। তিনি বলিলেন, ‘আমরা এক জহরীর গৃহে আসিয়াছিলাম,’ অনন্তর তিনি জহরীর নাম ও তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন। এক জন দম্ভ্য বলিল, ‘আমি সেই জহরীকে জানি, কাল আমি তাহাকে এখানে লইয়া আসিব, তাহার পর বাহা কর্তব্য, করা যাইবে। তাহার পর আমাদের গৃহনিকে সত্বর কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল।

“পরদিন জহরী সেখানে আনীত হইলে, সে আমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিল। তখন দম্ভ্যদল আমাদের নিকটে আসিয়া ক্ষমাপ্রার্থনা করিল; আমাদের তিন জনকে একখানি নৌকায় তুলিয়া টাইগ্রিস-তটে লইয়া গেল। আমরা নদীপার হইয়া একদল গ্রহরীর হাতে পড়িলাম। গ্রহরী-সদার আমাদের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া ছাড়িতে চাহিল না, তখন অগত্যা তাহাকে নিষ্কল ডাকিয়া আমার পরিচয় দিলাম। তখন সে আমার পদতলে পড়িয়া আমার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিল; হুইখানি নৌকা লইয়া আসিল, একখানি নৌকায় চড়িয়া আবুল হাসেন ও জহরী গৃহে ফিরিলেন, অতঃপাশিতে আমি আসিয়াছি। তাহার পর বাহা হইয়াছে, তুমি সকলই জানিস্। আমাদেরকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে গিয়া জহরী অনেক কষ্ট সহ্য করিয়াছেন, আমাদের জন্ত তাঁহাকে বিস্তর ক্ষতিস্বীকারও করিতে হইয়াছে, আমি আদেশ করিতেছি, কাল তুমি হুই হাজার মোহর লইয়া জহরীকে দিয়া আসিবি। আবুল হাসেন কেমন আছে, তাহারও খবর লইবি। আমার জন্ত প্রাণনাথ বড়ই যত্না ভোগ করিয়াছেন, আমি অতি অভাগিনী।”

দাসী জহরীকে বলিল, “তাঁহার আদেশে আমি আপনার কাছে গমন করিয়াছিলাম, আপনার বাড়ীতে আপনারকে দেখিতে না পাইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় পথে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। আমি আপনাকে



দেখিতে না পাইয়া মোহরের তোড়া একটি পরিচিত লোকের জিম্মার রাখিয়াছি, আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমি লইয়া আসিতেছি।”

অরক্ষণের মধ্যে দাসী মোহরের তোড়া লইয়া সেই মসজিদে ফিরিয়া আসিল এবং জহুরীর হস্তে তাহা সমর্পণ করিয়া বলিল, “আপনি আপনার ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই অর্থ গ্রহণ করুন।”

জহুরী বলিলেন, “আমার ক্ষতিপূরণের কোন আবশ্যক ছিল না, সামসেল নীহার যে নির্বিকল্পে প্রাণদে পৌছিয়াছেন, ইহাই পরম স্নেহের কথা। বাহা ইউক, তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিবার সাধ্য আমার নাই, সুতরাং তাঁহার প্রেরিত মোহর গ্রহণ করিলাম। তাঁহাকে বলিবে, যত দিন আমি বাঁচিব, তাঁহার অনুগ্রহ আমার স্মরণ থাকিবে।” দাসী পুনর্বার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে আশা দিয়া মসজিদ হইতে প্রস্থান করিল। মোহরের তোড়া লইয়া জহুরী পরমানন্দে গৃহে ফিরিলেন।

জহুরীর আনন্দের সীমা রহিল না, এতগুলি মোহর, তাহার উপর সামসেল নীহার ও আবুল হাসেনের গুপ্তপ্রণয়-ব্যাপারে কোন অনর্থ সংঘটিত হয় নাই, এই সুসংবাদ। জহুরী এই অর্থ দ্বারা পুনর্বার বহুবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া সামসেল নীহার ও আবুল হাসেনের জন্য প্রমোদগৃহে সজ্জিত করিলেন। তাহার পর তিনি আবুল হাসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাত্রা করিলেন।

পুনরায়
প্রমোদগৃহ-
সজ্জা।



জহুরী আবুল হাসেনের গৃহে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, তিনি গৃহে প্রত্যাগমনের পর হইতে অত্যন্ত সন্তোষের অবস্থার নিপতিত ছিলেন; এমন কি, তাঁহার জীবনের আশা পর্য্যন্ত ছিল না এবং তিনি একটি কথাও বলিতেছেন না। জহুরী নিশ্চয়ই তাঁহার কক্ষ প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন, আবুল হাসেন শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, চক্ষু মুদিত, মুখ শুষ্ক। তাঁহার অসুস্থ দেখিয়া জহুরীর মনে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইল। জহুরী আবুল হাসেনকে নমস্কার করিয়া তাঁহার পাশে বসিলেন, এবং তাঁহাকে প্রফুল্ল হইবার জন্য অহুরোধ করিলেন।

আবুল হাসেন আহার ত্যাগ করিয়াছিলেন, জহুরী তাঁহাকে আহারের জন্য বিশেষ অহুরোধ করিলেন এবং বলিলেন, “আপনি আহার করিয়া কিঞ্চিৎ স্নেহ হইলে আমি আপনাকে সুসংবাদ দিব।”

অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আবুল হাসেনকে কিঞ্চিৎ আহার করিতে হইল। আহারের পর আবুল হাসেন জহুরীর নিকট বর্ণিত সকল কথা শুনিতে পাইলেন। আবুল হাসেন কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, কেবল অশ্রু-তাগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে কৃতজ্ঞতার চিন্তা করিয়া প্রিয়তম বন্ধু জহুরীকে তিনি সুলাবান্দ জহুরীর উপহার প্রদান করিলেন।

জহুরী উপহারগ্রহণে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেও অবশেষে আবুল হাসেনের আগ্রহাতিশয়ো তাঁহাকে উদ্ধা গ্রহণ করিতে হইল। রাত্রিকালে উভয়ে একত্র নানাবিধের কথাপকথন করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্রভাতে জহুরীর হাত ধরিয়া আবুল হাসেন ফীলসফের বলিলেন “তাই, তুমি বৃষ্টিয়াছ, আমার আর কোন আশা নাই; আমি আমার প্রিয়তমকে দুইবার পাইয়াও হান্নাইলাম। এখন আমার মৃত্যু তির অল্প পথ নাই। যদি আমাদের ধর্ম্ম আত্মহত্যা মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত না হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি এই জীবনের অবদান করিতাম; কিন্তু তাহার আবশ্যক নাই। আমি বুঝিতেছি, আমার মনোমোহিনীর বিরহে আমি আর দীর্ঘকাল প্রাণধারণ করিতে পারিব না। যদি তুমি পুনর্বার আমার প্রিয়তমার দাসীর সাক্ষাৎ পাও, তাহাকে দিয়া সামসেল নীহারকে বলিয়া পাঠাইবে, তাঁহার বিরহেই আমি প্রাণত্যাগ করিব, তাঁহার প্রতি আমার যে অহুরোধ আছে, তাহা আমার সঙ্গে সমাধিভূমি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া রহিবে।”

এ প্রেম সমাধি-
ভূমি অধিকার
করিবে।



সেই দিনেই সামসেল নীহারের দাসী জহরীর নিকট উপস্থিত হইল। জহরী তাহার মুখ দেখিয়াই ব্রিলেন, কিছু শোচনীয় ব্যাপার ঘটয়া গিয়াছে। জহরী তাহাকে সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, দাসী কম্পিতস্বরে বলিল, “আমাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে, কাল আপনার নিকট হইতে প্রাসাদে ফিরিয়া গিয়া যে ভয়ানক সংবাদ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি—মৃত্যু।”

“আমাদের সঙ্গে যে দুই জন খোজা আপনার গৃহে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে এক জন কোন অজ্ঞায়কর্মে করাত্তে সামসেল নীহার তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। ইহাতে সে ক্রুদ্ধ হইয়া সামসেল নীহারের মহল পরিত্যাগ করিয়া, আমাদের গ্রহবিদলভুক্ত এক জন খোজার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। ক্রমে এ কথা খালিকের কণে উঠিয়াছে, তিনি আজ প্রভাতে বিশজন খোজা পাঠাইয়া সামসেল নীহারকে তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন। কি হইয়াছে না হইয়াছে, জানা জানেন, আমি কিন্তু গতিক ভাল বলিয়া মনে করিতেছি না।”—দাসী আর কোন কথা না বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

জহরী এই সংবাদে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বজ্রাহতের ছায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিলেন। যখন তাঁহার মোহ দূর হইল, তখন তিনি দ্রুতবেগে আবুল হাসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া অধীরভাবে বলিলেন, “সুবরাহ, দৈর্ঘ্য ও সাহস অবলম্বন করুন, অতি দ্রুতসংবাদ প্রবণের অল্প প্রস্তুত হউন।”

আবুল হাসেন রুদ্ধনিশ্বাসে বলিলেন, “আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি, দুই কথার তোমার বক্তব্য শেষ কর। আবগুরু হইলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিব, সে জন্ত আমি সর্বক্ষণই প্রস্তুত রহিয়াছি।”

জহরী দাসীদ্বারা যে সংবাদ শুনিয়াছিলেন, তাহা আবুল হাসেনের গোচর করিলেন; তাহার পর বলিলেন, “বুঝিতেছেন, আর বাঁচিবার আশা নাই, সুতরাং এ ভাবে বসিয়া থাকিবেন না, এখনই উঠুন, এখন সময় বড় মূল্যবান। যাহাতে খালিকের ক্রোধ হইতে আশ্রয়লাভ করিতে পারেন, তাহার উপায় করুন।”

ভয়ে, শোকে, দ্রুতসংবাদ অধীর হইলেও আবুল হাসেন জহরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কুমি কি করিতে বল? আমি বল, বুদ্ধি, আশা, সাহস সকলই হারা হইয়াছে।” জহরী বলিলেন, “অল্প কোন উপায় নাই, অবিলম্বে দ্রুতগামী অথি আরোহণ করিয়া, বোন্দাদ নগর পরিত্যাগ করিয়া আনোয়ারে যাত্রা করুন। কাল প্রত্যয়ে সেখানে উপস্থিত হইতে পারিবেন, সেখানে হইতে পুনরবার নতুন অথি আরোহণ করিয়া স্থানান্তরে যাত্রা কর্তন হইবে না।”

আবুল হাসেন এই উপায়ই সঙ্গত মনে করিলেন। তিনি তাঁহার জননী নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া, কতকগুলি ধনসম্পদ সঙ্গে লইয়া, জহরী ও কয়েকজন ভৃত্য সমভিব্যাহারে অখারোহণে বোন্দাদ নগর পরিত্যাগ করিলেন।

পথিমধ্যে শেখরাগ্নিতে তাঁহার একমল দহা কর্তৃক অক্রান্ত হইলেন। দহা-দলের সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ হইল। আবুল হাসেনের ভূতাগণ দহা-হস্তে গ্রাণ হারাইল। অবশেষে আবুল হাসেন ও জহরী তাঁহাদের অর্ধাঙ্গির সহিত দহাহস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন। দহাদল অর্ধাঙ্গি লুপ্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

আবুল হাসেন জহরীকে বলিলেন, “ভাই, যথেষ্ট হইয়াছে, আর নয়, আমি এখানেই পড়িয়া থাকি, আমার জীবনে আর কি প্রলোভন আছে?—আমার প্রাণাধিকা সামসেল নীহার যে পথে গিয়াছেন, আমিও



সাঁন্দা-নির্ভর-
তীরে নিরাশ।



সেই পথে সেই প্রেমময়ীর অহুসরণ করিব। সৌন্দর্য-নির্ভরিতার সমীপবর্তী হইয়াও আমি সে রূপস্বথাপানে আমার শিশানিত চিত্ত তৃপ্ত করিতে পারিলাম না;—আশা-মরীচিকার ছলনার বারংবার বিভ্রমিত হইলাম মাত্র—আমার মত হতাশা অগতে কে আছে? আমার জন্মরঙ্গী সামসেল নীহারের বিরহ-বেদনার যে দাবদাহে প্রতিনিয়ত বিমগ্ন হইতেছি—মৃত্যুর শীতলস্পর্শ বাতীত সে যন্ত্রণার উপশম সম্ভব নহে!”

জহরী বলিলেন, “আল্লার বাহা ইচ্ছা, তাহাই পূর্ণ হয়, একজ্ঞ আমাদের আক্ষেপ করা বৃথা, আমরা বেন বিনা প্রতিবাদে তাঁহার সকল বিধান সন্মত করিতে পারি। চলুন, আর রাহি নাই, প্রভাতে বাহা হয়, করা যাইবে।” তখন অস্ত্র উপায় না দেখিয়া আবুল হাসেন জহরীর সহিত চলিতে লাগিলেন। কিছু দূরে একটি মসজিদ ছিল, তাহার দ্বার উন্মুক্ত, উভয়ে সেই মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

প্রভাতে এক জন লোক সেই মসজিদে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার প্রভাতী প্রার্থনা শেষ হইলে, তিনি দেখিলেন, এক কোণে দুই জন লোক উপবিষ্ট। লোকদুটিকে বিদেশী পথিক বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। তিনি জহরী ও আবুল হাসেনের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। জহরী বলিলেন, “আমরা পথিক, বোম্বাদ নগর হইতে আসিতেছি, পথে দস্যুদল আমাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। এখন আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়, এ অপরিচিত স্থলে এমন কাহাকেও চিনি না যে, তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ করি।”

আগন্তুক বলিলেন, “আপনারা আমার সঙ্গে আসুন, আমি বখাওয়া আপনাদিগের সাহায্য করিব।”

জহরী আবুল হাসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কি করা যায়?”—আবুল হাসেন বলিলেন, “এ ব্যক্তি আমাদের অপরিচিত বটে, কিন্তু ইহার সঙ্গে গেলে কোন পরিচিত লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইলেও হইতে পারে; সুতরাং ইহার গৃহে না যাওয়াই আমার বিবেচনার সঙ্গত।”

আগন্তুক ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন জহরী বলিলেন, “আপনার অহুসরণে আমরা বিশেষ বাধিত হইলাম, কিন্তু আপনার গৃহে যাইতে আমাদের একটি আপত্তি আছে। দেখিতেছেন, আমরা প্রায় উল্লভ অবস্থার আছি, দস্যুরা আমাদের পরিধের বস্ত্র পর্যন্ত কাড়িয়া লইয়াছে, এ অবস্থায় আমরা কিরূপে আপনার অহুসরণ করি?”—আগন্তুক নিজ পরিধেরের একাংশ ছিন্ন করিয়া, অবিলম্বে তাহা জহরী ও আবুল হাসেনকে প্রদান করিলেন। অগত্যা তাহাই পরিধান করিয়া তাঁহারা আগন্তুকের সহিত তাঁহার গৃহে চলিলেন। আগন্তুক বিশেষ বস্ত্রের সহিত অতিথিসংকার করিলেন, কিন্তু আবুল হাসেন পথপ্রদে-মনঃকষ্টে এমন কাতর হইয়াছিলেন যে, তিনি উখানশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার জ্ঞান জহরী বড় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

আবুল হাসেনের পীড়া ক্রমে বর্ধিত হইল, অবশেষে এই অপরিচিত গৃহে বান্ধববান্ধিত স্থানে তাঁহার আশ্রয়লাভ উপস্থিত হইল। আবুল হাসেন জহরীর হাত ধরিয়া অতি কাতরভাবে বলিলেন, “ভাই, চলিলাম, আমার জ্ঞান তোমাকে বহু কষ্ট পাইতে হইল, তোমার নিকট আমি কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা প্রকাশ করিতে পারি না; বড় দুঃখ, এ ঋণ শোধ করিতে পারিলাম না। আজ আমি এ স্থানে এ ভাবে

প্রেম-পরিণাম



কেন প্রার্থনা করিতেছি, তাহা তুমি সকলের অপেক্ষা ভাল জান। মুক্তকালে মাতার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, ইহাই আমার বড় দুঃখ; আর মুক্তার পর প্রিয়তমা সামসেল নীহারের সহিত মিলিত হইতে পারিব, ইহাই আমার পরম শান্তি! আমার মৃতদেহ বোম্বাদে লইয়া গিরা মায়ের নিকট সমর্পণ করিবে, তিনি যেন অশ্রুধারার আমার সমাধি সিক্ত করিতে পারেন। তাঁহার উপাসনার যেন আমার আত্মার উদ্ধার হয়।”— আবুল হাসেন আর অধিক কথা বলিতে পারিলেন না, তাঁহার প্রাণবিহ্বল দেহপিঞ্জর ত্যাগ করিল।



প্রেমের
প্রতি-
দানে
জীবন-
দান



জহরী বোম্বাদ নগরে প্রত্যাপন করিয়া আবুল হাসেনের মাতার নিকট পুত্রের মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। বৃদ্ধা বহু বিলাপ ও পরিতাপের পর প্রিয়পুত্রের মৃতদেহ আনয়নের জন্ত দাসদাসী লইয়া বোম্বাদ নগর ত্যাগ করিলেন।

অনন্তর জহরী শোকাকুলচিত্তে অবনতবদনে গৃহে কিরিত্তেছেন, এমন সময়ে পথে সামসেল নীহারের দাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দাসীর নয়নে অশ্রুধারা করিতেছিল, সে তাঁহার সহিত বীরে বীরে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইল।

দাসী তাঁহাকে জানাইল, “সামসেল নীহার ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন।”

জহরী সবিধানে বলিলেন, “হার! স্বর্ণের ছুটি কুহুধ একসঙ্গে খরিদা পড়িল! তাঁহাদের প্রেম এ পৃথিবীর নহে—সত্যই স্বর্গীয়। সামসেল নীহার কিরূপে প্রাণত্যাগ করিলেন, বল।”

আবুল হাসেনের মৃত্যুসংবাদে সামসেল নীহারের দাসী লগাটে কন্ডাখাত করিয়া বলিল, “হার, হার! দুজনেই চলিয়া গেলেন! আবুল হাসেনের কিরূপে মৃত্যু হইল, আপনি এ সংবাদ অগ্রে বলুন, আমি শুনিবার জন্ত বড়ই কাতর হইয়াছি। আমার কথা আমি পরে বলিতেছি।”

দুটি ফুল এক-
সাথে ফিল।



জহরী আবুল হাসেনের পলারন ও মৃত্যুকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিলেন। সমস্ত শুনিয়া দাসী অশ্রু-পূর্ণাশ্রুতনে বলিতে লাগিল, “আমি আপনাকে পূর্বেই বলিয়াছি, খালিক সামসেল নীহারকে তাঁহার সমক্ষে ধরিয়া লইয়া সিঁধ্যাছিলেন, খালিক তাঁহার ও আবুল হাসেনের প্রণয়কাহিনী চুই জন খোজার মুখে সবই শুনিয়াছিলেন। আপনি হয় ত মনে করিতেছেন, এই সংবাদে খালিক ক্রোধে প্রলীণ হইয়া সামসেল নীহারের মন্তকক্ষেদনের আদেশ দান করিয়াছেন! একথা কখনও মনে করিবেন না। তিনি বিন্দুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, সামসেল নীহারের হৃদয়-বেদনার তাঁহার প্রতি সহানুভূতিভরে খালিকের চক্ষু আর্দ্র হইল। খালিক সামসেল নীহারকে সম্মুখে আনয়ন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার মুখে কিছুমাত্র ভয় কিংবা বিষয়ের চিহ্ন নাই, কেবল অশ্রুস্রাবিতে নয়নকমল ছাট ছলছল করিয়া ভাসিতেছে। খালিক বলিলেন, ‘সামসেল নীহার, তুমি যে এভাবে অশ্রুস্রাবী হইয়া, আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, ইহা আমি কখনও মনে করি নাই; তুমি জান, আমি নিরস্তর তোমার প্রতি কিরূপ অহুসার প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি, ইহা মোখিক প্রণয়-মাত্র নহে, তাহার পরিচয়ও বোধ করি তুমি কিছু কিছু পাইয়াছ। আমার এখনও কোন ভাবান্তর উপস্থিত হয় নাই, আমি এখনও তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি। তোমার শত্রুগণ আমার নিকটে তোমার বিক্ষোভে যে সকল কথা বলিয়াছে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না, তুমি ক্ষোভ দূর কর, যে ভাবে প্রত্যাহ আমোদ-প্রমোদ কর, আজও তাহাই কর।’—খালিক তাঁহাকে প্রাসাদের এক কক্ষে প্রবেশ করিয়া মনস্থির করিবার জন্য অহুরোধ করিলেন।

“সামসেল নীহারের মন সন্ধ্যত হইল না; তিনি খালিকের অহুসারের অল্পযুক্ত মনে করিয়া আরও হুঃখিতা ও বাখিতা হইলেন।

“পায়কালে খালিক নর্তকীরূপে পরিবৃত্ত হইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। চতুর্দিকে আলোকমালা প্রজলিত হইল, ফুলের গন্ধে কক্ষ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। খালিক সামসেল নীহারকে তাঁহার ক্রোড়-সম্মুখ-কটে উপবেশন করাইয়া, তাঁহাকে সুমিষ্ট ফলমূল ভোজন করিবার জন্য অহুরোধ করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে আর খালিকের কোন অহুরোধ রক্ষা করিতে হইল না। তিনি খালিকের পাদমূলে নিপতিত হইয়া মুহূর্তের মধ্যে প্রাণত্যাগ করিলেন, আনন্দ-সঙ্গীত ধামিগা গেল, চতুর্দিকে হাহাকার উঠিল। খালিক সুরং তাঁহার প্রিয়তমাবিরোগে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। খালিক আদেশ করিলেন, ‘উৎসবের আলোক নির্বাণ কর, বাজবজলসুহ বন্ধ কর।’ তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইল।

“সমস্ত রাত্রি আমি মৃতদেহের নিকট বসিয়া অশ্রুত্যাগ করিলাম। এখন আমার একটি কার্য অবশিষ্ট আছে। সামসেল নীহারের দেহের সহিত আবুল হাসেনের দেহ একত্র করিয়া তাহা সমাহিত করিতে চাই, ইহাই আমার একমাত্র বাসনা।”—দাসী নীরব হইল।

কিন্তু তাহার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিল না, নগরবাসিগণ যখন সামসেল নীহারের সমাধিস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমাধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিল, তখন দাসী তাহাদের নিকট সামসেল নীহার ও আবুল হাসেনের প্রণয়কাহিনী কীর্তন করিল, সকলে একবাক্যে প্রশংসায়ুগলের দেহ একত্র সমাহিত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। তদনুসারে উভয় দেহ একত্র সমাহিত হইল। এখনও দেশবিশেষের মূলমানগণ এই সমাধিস্থলকে পবিত্র তীর্থ মনে করিয়া এখানে আসিয়া উপাসনা করেন।



দিনারজাদী শাহারজাদীর এই গল্প শ্রবণ করিয়া মোহিত হইলেন। শাহারজাদী বলিলেন, “সুলাতান যদি দয়া করিয়া প্রভাতে আমার প্রাণদণ্ডের আদেশ না করেন, তাহা হইলে আমি আর একটি কাহিনী বলিব, তাহা ইহা অপেক্ষাও সুন্দর।” সুলাতান শাহারজাদীর অন্তর্যম যৌবন ও রস-উজ্জ্বলিত গল্পহরীতে তৃপ্ত হইতেছিলেন; তিনি নূতন গল্প শ্রবণের জন্য উৎসুক হইয়া সে দিনও তাঁহার প্রাণদণ্ড প্রদান করিলেন না। পরদিন শেবরাত্রিতে শাহারজাদী নূতন কাহিনী আরম্ভ করিলেন।



পারস্তদেশ হইতে কুড়ি দিন জাহাজ চালাইয়া খালেদানদীপে উপস্থিত হইতে পারা যায়। এই দীপ কয়েকট সুরুহং প্রদেশে বিভক্ত। নগরগুলি সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও জনপূর্ণ। এই দেশে পূর্বকালে এক জন সুলাতান ছিলেন, তাঁহার নাম সা জামান। সুলাতানের চারিটি মহিষী, সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজ-কন্যা; এতদ্বিন্ন রাজার বাটটি উপপত্নী ছিল।

সা জামান ধন, জন ও ঐশ্বর্য লইয়া মহাসুখে রাজ্য করিতেন। তাঁহার রাজ্যে কোন প্রকার অশান্তি ছিল না, কেবল এক বিষয়ে তাঁহার সুখের অভাব ছিল, অনেক বরস হইলেও তাঁহাকে পুত্র-মুখ-সম্পর্শন-সুখ হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল। এতগুলি স্ত্রী—কেহই পুত্ররত্নের মুখ সম্পর্শন করিতে পারেন নাই, একজ্ঞ সুলাতানের মনে কষ্টের সীমা ছিল না। এ বিপুল রাজ্যসুখ তাঁহার অবশ্রমানে কে ভোগ করিবে, এই চিন্তাই রাজার মনে প্রবল হইয়াছিল। অবশেষে তিনি এক দিন তাঁহার উজীরকে বলিলেন, “উজীর, যাহাতে এই কষ্ট নিবারণ হয়, তাহার কোন উপায় যদি তোমার জ্ঞান থাকে, আমাকে বলিয়া আমার উদ্দেশ্য পূর কর।”

উজীর বলিলেন, “সুলাতান, আপনাকে যে সুখ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছেন, কুত্র মহাশয়ের সাধ্য কি যে তাহা আপনাকে প্রদান করে? আমার বিবেচনার রাজ্যের ফকিরগণকে নিমন্ত্রণ করা উচিত, তাহাদিগের নিকট আপনি আপনার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলে, তাহারা একটা উপায় করিলেও করিতে পারেন।”

সুলাতান এই প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, প্রধান উজীরকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, বহুসংখ্যক ফকিরকে নিমন্ত্রিত করিলেন এবং তাহাদিগকে আহারাদি প্রদান করিয়া, তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

অবশেষে এক জন ধার্মিক ফকির সুলাতানের ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া আলীক্বাদ করিলেন, ‘সম্বৎসর-কালের মধ্যেই সুলাতান পুত্রমুখ দর্শন করিবেন।’ ফকিরের বাক্য মিথ্যা হইবার নহে, আরদিনের মধ্যেই প্রধান মহিষী গর্ভবতী হইলেন এবং কালকালে তিনি পূর্ণচন্দ্রের ভায় রূপবান্ এক সন্তান প্রসব করিলেন। সুলাতান পুত্রের নাম রাখিলেন, কামারাল জামান।

সুলাতান পুত্রটিকে মহাযত্নের সহিত শিক্ষাদান করিতে লাগিলেন, কামারাল জামান অসাধারণ মেধাসম্পন্ন ছিলেন; আরবদেশেই তিনি বহু বিজ্ঞা আরম্ভ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার চরিত্র, শিক্ষা, রূপ ও গুণ একজ্ঞ অশিয়া তাঁহার বুদ্ধ শিতায় মনে অল্পম আনন্দবিধান করিতে লাগিল।

যেহে-
হাফ
গ্রেম-
কাহিনী



পুত্রলাভের
প্রার্থনা





পুত্র পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিলে, হুগতান এক দিন উজীরকে আস্থান করিয়া বলিলেন, “উজীর, আমি সুদীর্ঘ-কাল ধরিয়া রাজ্যশাসন করিলাম, আমার দেহে আর বল নাই, মনে উৎসাহ নাই, আমি এখন অবসর গ্রহণ করিবার মানস করিয়াছি; আমার পুত্রটিও সর্বগুণে গুণাধিত ও অশিক্ষার শিক্ষিত হইয়াছে, উপযুক্ত পুত্রহস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করাই আমার কর্তব্য, এ বিষয়ে তোমার মত কি?”

উজীর বলিলেন, “জাঁহাংনা, রাজকুমার এখনও শিশু বলিলেই হয়, তিনি নবযৌবনে পদার্পণ করিতেছেন মাত্র। রাজ্যশাসনের গুরুভার বহন করিবার যোগ্যতা এখনও তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথমে তাঁহাকে বিবাহ দিয়া, তাঁহাকে সাংসারিক শিক্ষা দান করিতে হইবে, ইহা তাঁহার চরিত্রের পক্ষেও মঙ্গলজনক হইবে; ক্রমে তিনি রাজকর্মে অভ্যস্ত হইলে, পরে রাজ্যশাসন তাঁহার পক্ষে হৃত্র হইবে না।”

হুগতান উজীরের এই পরামর্শ সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন। তখন তিনি তাঁহার প্রিয় পুত্র কামারাল জামানকে নিজের নিকটে আস্থান করিলেন।

হুগতাননন্দন জানিতেন, তাঁহার পিতা একটি নির্দিষ্ট সময়ের তাঁহাকে আস্থান করেন, সে দিন অসময়ে তাঁহাকে আস্থান করিয়াছেন দেখিয়া, তিনি অত্যন্ত বিস্ময়গত হইলেন। অবিলম্বে পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া নতদৃষ্টিতে দণ্ডারমান হইলেন।

হুগতান রেহপুর্গের পুত্রকে সোধন করিয়া বলিলেন, “বৎস! আমি তোমাকে একটি বিশেষ কারণে আস্থান করিয়াছি, তুমি আমার একমাত্র পুত্র, আমার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, কেবল সিংহাসন নহে, আমার ষণ্ডও তোমাকে রক্ষা করিতে হইবে। সংসারে প্রবেশের প্রথম দ্বার—বিবাহ; আমি তোমার বিবাহ দিতে চাই,—এ সম্বন্ধে তোমার মত কি?”

রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া অবনত-মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, সর্বাঙ্গ ধামিয়া উত্তীর্ণ, অবশেষে তিনি অতি ধীরে ধীরে পিতাকে বলিলেন, “বাবা, এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে, আপনার আদেশ শুনিয়া আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি। আমার এত অল্পবয়সে আপনি যে আমাকে এই কঠিন বন্ধনে ফেলিবেন, তাহা আমি একবারও মনে করিতে পারি নাই। আমি কখনও বিবাহ করিব কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ আছে, কারণ, বিবাহ দ্বয়ের কারণস্বরূপ, বিবাহিত জীবন বড় দুঃখময়, ইহাই আমার বিশ্বাস; আমি দেখিতেছি, সংসারে মানুষ যত দুঃখ, কষ্ট বা ব্যতনা ভোগ করে, রমণী তাহার প্রধান কারণ; পুস্তকাদিতেও পাঠ করিয়াছি, ইহারা সর্বপ্রকার পাপের জননী। হয় ত’ কালে আমার এই মত পরিবর্তিত হইতে পারে, কিন্তু যত দিন আমার মত পরিবর্তিত না হয়, তত দিন আমাকে এজ্ঞ আদেশ করিবেন না।”

পুত্রের কথা শুনিয়া হুগতান মনে বড় কষ্ট পাইলেন—পুত্রের ব্যবহারে বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি কোন দিন ব্যগ্রেও ভাবেন নাই, তাঁহার পুত্র তাঁহার আদেশ-পালনে এরূপ অবহেলা করিবে। তিনি পুত্রকে বৎসরোনাতি ঘেহ করিতেন, মৌখিক অসন্তোষ প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, “আমি হঠাৎ তোমাকে কোন কাজে বাধ্য করিতে চাই না, আমি তোমাকে সময় দিলাম, তুমি এ বিষয়ে ভাল করিয়া চিন্তা কর; তুমি জাবিরা দেখিও, এই সুবৎস রাজ্য তোমাকে শাসন করিতে হইবে, কিন্তু গৃহস্থান্তরে প্রবেশ না করিয়া কেহ রাজকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে না, রাজ্য-শাসন স্বকিরের কর্তব্য নহে; সুতরাং রাজকর্তব্য

বিবাহিত
জীবন দুঃখময়।



পালনের অল্পরোধেও তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে, বিশেষতঃ আমার বংশ তোমাতেই শেষ হইয়া যায়, ইহা আমার ইচ্ছা হইতে পারে না, বংশরক্ষার্থ তোমাকে বিবাহ করিতে হইবে, এই বংশ আমার বা তোমার নিজস্ব নহে, ইহা পিতৃপুরুষের ধারা, ইহা অবশ্যই রক্ষণীয়।”

স্বলতান পুত্রকে এক বৎসর সময় দিলেন। এক বৎসর অতীত হইলে, তিনি আবার রাজপুত্রকে তাঁহার সন্নিকটে উপস্থিত করিলেন, বলিলেন, “বৎস! তোমাকে যে বিষয় বিবেচনার জন্ত এক বৎসর সময় দিয়াছিলাম, তৎসম্বন্ধে কিরূপ বিবেচনা করিয়াছ, আজ আমি জানিতে চাই। এক বৎসর অতীত হইয়াছে; স্বতরাং আমার বিশ্বাস, তুমি সকল কথা ভালরূপে বিবেচনা করিয়াছ। আমি আশা করি, তুমি এখন বিবাহের জন্ত সম্পূর্ণ প্রস্তুত।”

কামারাল জামান সঙ্কর স্থির করিয়াছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন, “হাঁ, সকল বিষয়ে বিবেচনা করিয়াছি। বিবেচনা করিয়া দেখিলাম, জীবনে প্রকৃত সুখলাভের জন্য বিবাহ না করাই কর্তব্য; স্বতরাং আমি বিবাহ করিব না। এইরূপ সংকল্প করিয়াছি। হুম্মরী সঙ্গিনী আমাদের সর্বপ্রকার অনিষ্টের মূলস্বরূপ, প্রত্যহ চক্ষুর উপর তাহার শত শত দুষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। রমণীজাতির উপর আমার বড়ই ঘৃণা, আপনি অল্পগ্রহ পূর্বক আমাকে ক্ষমা করুন, রমণীর সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে আমার ইচ্ছা নাই, এমন কি, জীবনে আমি হুম্মরী রমণীর মুখ দর্শন করিব না।”

সে জামান ভিন্ন অন্য কোন স্বলতান হইলে, তাঁহার আদেশের প্রতি এই প্রকার অবজ্ঞা-প্রদর্শনে নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইয়া অতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা করিতেন, কিন্তু সে জামান ভিন্ন প্রকৃতির নরপতি ছিলেন। পুত্রের ব্যবহারে তাঁহার প্রতি কোপ প্রকাশ না করিয়া, তিনি পুত্রকে মিথ্যাকে বুঝাইতে লাগিলেন, পরে পুত্রকে বিধায় দান করিয়া এ সম্বন্ধে কি কর্তব্য, উজীরকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর বলিলেন, “রাজকুমারকে আর এক বৎসর চিন্তা করিবার সময় দেওয়া উচিত, বিবাহ যে তাঁহার একান্ত কর্তব্য, এ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে। আরও এক বৎসর পরে যদি তাঁহার মতপরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে রাজদরবারে আহ্বান করিয়া, রাজ্যের মঙ্গলার্থ তাঁহাকে বিবাহ করিতে হইবে, ইহা সর্বজনসমক্ষে তাঁহাকে বুঝাইতে হইবে। রাজপুত্র বুদ্ধিমান, সমগ্র দরবারের অল্পরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমার অল্পরোধে আপনি ধৈর্যধারণ করিয়া আরও এক বৎসর প্রতীক্ষা করুন, ধৈর্যধারণ ভিন্ন পুথিবীতে কোন কার্য সফল হয় না।”

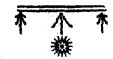
অনিচ্ছাসম্বন্ধে স্বলতানকে এই উপদেশ গ্রাহ্য করিতে হইল। সভ্যভঙ্গে উজীরকে বিদায় দান করিয়া, স্বলতান তাঁহার মহিষীর মহলে প্রবেশ করিলেন। তিনি কামারাল জামানের জননীকে পুত্রের বিবাহে অনিচ্ছার কথা জ্ঞাপন করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “আমি জানি, তোমার পুত্র আমার অর্পণকা তোমার অধিক অমুগত; সে আমার আদেশ অগ্রাহ্য করিতেছে বটে, কিন্তু তোমার অল্পরোধ রক্ষা করিতে পারে, তুমি তাহাকে এ জন্ত বিশেষ অল্পরোধ কর। তাহাকে জানাইবে, সে যদি আমার আদেশ-পালনে অদম্বত হয়, তাহা হইলে আমাকে বাধ্য হইয়া, তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিতে হইবে, রাজ্য ও বংশরক্ষার্থ তাহাকে বিবাহ করিতে হইবে, এ বিষয়ে অধিক কথা বলিতে ইচ্ছুক নহি।”

কামারাল জামানের মাতা কতিপয় পুত্রের আচরণের কথা শুনিয়া বড় বেদনা পাইলেন, স্বামীকে জানাইলেন, তিনি এ বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

হুম্মরী সঙ্গিনী
অনিষ্টের মূল



বিবাহে সম্মতির
আশায়
সম্মতদান



কয়েকদিন পরে কামারাল জামান মাতৃ-সরিধানে উপস্থিত হইলে, কতিমা বলিলেন, “বাহা, তুমি বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অসম্মত হওয়ার, আমরা মনে বড় কষ্ট পাইয়াছি, তোমার এমন অসম্মত আমাদের কারণ ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি পুস্তকাদিতে নারীজাতির অনেক ভ্রূশীতি ও নীচাশয়তার কাহিনী পাঠ করিয়াছ সত্য, কিন্তু পৃথিবীতে সকলেই কিছু এইরূপ নহে; সুনীলা, সঙ্করিত্রা, পতিব্রতা নারীও পৃথিবীতে অনেক আছেন, তাহারা সত্যই পৃথিবীর অলঙ্কাররূপ। পৃথিবীতে যেমন নর-পিশাচিনী আছে, তেমনই নর-পিশাচ আছে, তাই বলিয়া কি বিবাহ করিবে না স্থির করিতে হয়? তুমি পুস্তকাদিতে কত নরাধমের কাহিনী পাঠ করিয়াছ, আবার কত মহাগ্রাণ

দেবচরিত্র পুরুষের পুণ্যকথাও অবগত আছ, বস্তুতঃ পৃথিবী ভাল-মন্দে মিশান, মন্দ তাগ করিয়া ভাল গ্রহণ করিলে পরিণামে কখনও অহুতাপ করিতে হয় না।”

কামারাল জামান বলিলেন, “মা, আপনি যে কথা বলিলেন, তাহা সত্য। আপনার জ্ঞান গুণবতী, ধর্মপ্রাণা রমণী পৃথিবীর অলঙ্কার-রূপ, কিন্তু পিশাচীর সংখ্যাও অগণ্য। আপনি মন্দ হইতে ভাল বাছিয়া লইতে বলিতেছেন, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই কি ভাল পাওয়া যায়? পশ্চাৎ অহুতাপ অপেক্ষা একেবারে অহুতাপের কারণ না হওয়াই ভাল, সেই জন্য আমি বিবাহ করিব না বলিয়াছি। আপনি জানেন, বাবা বিবাহের জন্য শীড়াপীড়ি করিতেছেন, সম্ভবতঃ তিনি কোন রাজকন্যার সহিত আমার বিবাহ

দিবেন, সে স্বন্দরী হইতে পারে, কিন্তু তাহার স্বভাবের পরিচয় কোথায় পাইব? হয় ত, তাহার দক্ষিণবাহুর রাজা নষ্ট হইয়া বাইবে, তখন কিরূপে এ রাজা রক্ষা করিব? অবশ্য ভ্রষ্টা স্ত্রীকে তাগ করিতে পারি, কিন্তু তাহাতে আমার মানসিক শাস্তি একেবারে নষ্ট হইয়া বাইবে। আমি বিবাহ না করিলে বংশরক্ষা হইবে না, এই কথা আপনি বলিতে পারেন, কিন্তু মা, কত পুত্র ত’ পিতা জীবিত থাকিতেই ইহলোক তাগ করে, তাহাতে কি কোন ক্ষতি হয়?—আপনি আর আমাকে বিবাহের জন্য অক্লেশে করিবেন না, আমি বিবাহ করিব না স্থির করিয়াছি।”



মাতৃ-
অনু-
ব্রোধ

স্বন্দরীর
দৃষ্টির পরিচয়
ত’ অজ্ঞাত?



মহিমা পুস্তকে নানা প্রকার বুঝাইলেন, কিন্তু কামারাল জামানের গম্ভীর বিচলিত হইল না। অবশেষে একদিন হুলতান রাজকুমারকে দরবারে আদর্শন করিলেন। কুমার দরবারে উপস্থিত হইলে, হুলতান তাঁহাকে বলিলেন, “পুত্র, তোমাকে বিবাহের জন্য আমি বহুদিন হইতে অক্লান্ত করিতেছি; কিন্তু তুমি এমনই দুর্নীল যে, মাতৃ-আজ্ঞা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করিয়াছ। তোমার ব্যবহারে আমার ঐর্ষ্যাচ্যুতি হইয়াছে, আজ আমি ও আমার দরবারই অমাত্যগণ সকলে বলিতেছি, রাজ্যপালনার্থ ও বংশ-রক্ষার্থ তোমার বিবাহ করা আবশ্যক, তোমাকে বিবাহ করিতেই হইবে, তোমার কোন আপত্তিতে আমরা কর্ণপাত করিব না।”

কামারাল জামান সংক্ষেপে বলিলেন, “আমার খ্রিয়সম্বল আছে, আমি কখনও বিবাহ করিব না।” এই কথা শুনিয়া হুলতান ক্রোধে গর্জন করিয়া উঠিলেন, কর্কশস্বরে বলিলেন, “হস্তভাণ্ডা সম্ভান, পিতৃ-আজ্ঞা মাতৃ-আজ্ঞা ও রাজ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তোমাকে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে। দ্বিতদিন তুমি বিবাহ করিতে সম্মত না হও, তখন আমি তোমাকে নির্কাসনের আদেশ প্রদান করিলাম।” রাজা ভৃত্যস্বরের প্রতি আদেশ করিবারাত্রি, তাহার রাজকুমারকে দ্বিত করিয়া নির্কাসনে লইয়া চলিল, নগর হইতে অনেক দূরে একটি পুরাতন নির্জন মন্দিরে তাহার নিভৃত-বাসের স্থান নির্দিষ্ট হইল, একটি শয্যা, কয়েকখানি পুস্তক ও একটি ভৃত্য মাত্র তিনি কারাগারে সন্নিবরণ প্রাপ্ত হইলেন।

কামারাল জামান হুলতানের আদেশে কিছুমাত্র হুঃখিত হইলেন না, তিনি পুস্তকগুলি পাইয়া বিশেষ দৃষ্ট হইলেন। দিবসে তাহাই তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত পাঠ করিলেন, সাংকালে কোরাণ পাঠ করিয়া আরাধনা করিলেন, তাহার পর রাত্রি সমাগত হইলে, তিনি দীপ নির্কাসন না করিয়াই শয়ন করিলেন।

এই মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি পুরাতন কূপ ছিল। কূপের মধ্যে দৈত্যরাজ দামরিরাতের কন্যা মৈমুনী নামে একটি পরী বাস করিত। মদ্যরাগ্রিতে পরী কূপ হইতে বাহির হইয়া, নৈশভ্রমণে বাত্মা করিবে, এমন সময়ে কামারাল জামানের শয়নকক্ষে দীপালোক দেখিতে পাইল। এ স্থানে সে কখনও আলোক দেখে নাই, সে বিন সহসা আলোক দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, এবং সেখানে কে কি অভিশ্রায়ে আলোক লইয়া আসিয়াছে, জানিবার জন্য সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, দ্বারের গ্রহরী তাহাকে দেখিতেও পাইল না। পরী কামারাল জামানকে দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া রহিল; কামারাল জামানের মদ্ববদন বসনে আরত থাকিলেও পরী বৃষ্ণিল, এই বুঝক পরম রূপবান। রাজপুত্রকে ভাল করিয়া দেখিবার বাসনা তাহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। সে অতি ধীরে রাজপুত্রের মুখের বদন অপসারিত করিলে, দেখিতে পাইল, অতুল্য লাভ্যমণ্ডিত সৌন্দর্য্য-শাস্ত্র বৃষ্ণিল। মনুষ্যের এমন সুন্দর রূপ সে আর কখনও দেখে নাই। পরী মনে মনে বলিতে লাগিল, “মরি মরি, কি রূপ! চক্ষুর কি শোভা! কেমন বন্ধন চক্ষু! এমন সুন্দর বুঝককে কে এখানে নির্কাসিত করিয়াছে? তাহার মনে কি কিছুমাত্র দয়া-ময়া নাই? নিশ্চয়ই এ রাজপুত্র, রাজপুত্রের প্রতি এ অত্যাচার কেন?”

পরী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নির্নিমেঘলোচনে রাজপুত্রের রূপ নিরীক্ষণ করিল। তাহার পর তাহার গম্ভ ও লগাটে অতি ধীরে চুপন করিয়া, মুখের বস্ত্র পূর্বে যে ভাবে ছিল, সেই ভাবে টানিয়া দিয়া পাখা মেসিয়া আকাশপথে উড়িয়া গেল। অনেক দূরে উঠিয়া সে অদূরে একটি শব্দ শুনিতে পাইল, কোথা হইতে শব্দ আসিতেছে, জানিবার জন্য সে শব্দ লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে ধাবিত হইল; কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিল, একজন দৈত্য ঝড়বেগে স্থানান্তরে ঘাইতেছে, তাহারই শব্দ। এই দৈত্যটি সন্ধ্যামনের প্রাধান্য বীকায় না করায় পরী ও অজ্ঞাত দৈত্যগণ ইহার বিরোধী ছিল। দৈত্য সন্ধ্যা দেখিল, তাহার শব্দপক্ষীর একটি পরী তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উড়িয়া আসিতেছে।



এই মৈত্রেয় নাম দানহাস্। দানহাস্ পরীকে অদূরে দেখিয়া সন্নিবেশিত, "মৈত্রেয়ী পরী, পরীরাজো কুমি হুন্দরী-শ্রেষ্ঠ, আজ অগ্রহ করিয়া আমার প্রাণদান কর, তুমি আমাকে যে আদেশ করিবে, আমি তাহাই পালন করিব। আমি কখনও তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।"

মৈত্রেয়ী বলিল, "রে চরাচর মৈত্রেয়! তোর সাধা কি যে আমার অনিষ্ট করিস্! আমি তোকে ভয় করি না। বাহা ইউক, আমি তোর কোন অপকার করিব না, মাছি মারিয়া কেন হাত পঙ্ক করিব, তাহাতে আমার গোরব নাই। বাহা ইউক, আমি বাহা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দে, তুই কোথা হইতে আসিতেছিস্, দেখিবার মত কি দেখিয়াছিস্, আর আজ রাত্রে কি করিয়াছিস্, তাহার পরিচয় প্রদান কর।"

দানহাস্ করযোড়ে বলিল, "হুন্দরী! আজ তোমাকে এক অপূর্ণ কথা শুনাইব। আমি চীনরাজ্য হইতে উড়িয়া আসিতেছি। চীন একটি প্রকাণ্ড দেশ, এমন ধনজনপূর্ণ দেশ পৃথিবীতে আর নাই। সেই দেশের এখন বিনি রাজা, তাহার নাম গাইউর, তাহার একটি কন্যা আছে, এমন রূপবতী নারী আমি পৃথিবীর আর কোন দেশে দেখি নাই, সেই যুবতী যে কত হুন্দরী, তাহা আমি, কি তুমি, কি আমাদের দৈত্য-কুল কেহ ভাবায় প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। না দেখিয়া সে রূপ কেমন, তাহা অহুভব কথা বার না। তাহার চুল পায়ের গোড়ায় পড়িয়াছে, সে চুল রেশমের মত কুঞ্চিত, তাহার শোভাই বা কত! রূপালখনি যেন একখানি দর্পণ, চক্ষু কালো কালো, চোখে যেন আশ্রিত জলিতেছে, নাক বড় বেশী লম্বাও নয় খুব খাটোও নয়, মুখখানি ছোট, ওষ্ঠে যেন সিন্দূর মাখান রহিয়াছে এমনটী লাল, পীতগুলি এক একটি মুক্তার মত, যেন কে কতকগুলি মুক্তা একত্র গাঁথিয়া রাখিয়াছে। যুবতী যখন কথা বলে, তখন যেন বীণার বজ্রের হ্রস্ব, তাহার বুদ্ধির কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না, নরলোকে এত বুদ্ধি কাহারও দেখি নাই। তাহার কুচযুগের সহিত তুলনা করিলে অতি শুভ্র কমল-কলিকাকেও লজ্জার নতমস্তক হইতে হয়। বলিতে কি, পৃথিবীর মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ হুন্দরী, এমন হুন্দরী "মাহুয়ের মধ্যে নাই; কিন্তু এই হুন্দরীর রূপ দেখিয়া চক্ষু সার্থক করা সকলের তাগো ঘটে না। বাহার সহিত তাহার বিবাহ হইবে, সেই ভাগ্যবান যুবক ভিন্ন অন্তে তাহার বদনচন্দ্রমা দর্শন করিতে পারিবে না। তাহার পিতা তাহার জন্ত এক সাতমহল পুরী নির্মাণ করিয়া, তাহাকে তাহারই মধ্যে রাখিয়াছেন। প্রথম মহল শুভ্র প্রস্তরনির্মিত, আর শেষ মহল—বেথানে সে বাপ করে, স্বর্ণনির্মিত, অজ্ঞাত মহলগুলি নানা বিভিন্ন ধাতু দ্বারা নির্মিত। এই শেষ মহলে বাগান আছে, কোমরা আছে, বিল আছে, কুঞ্জবন আছে, রাজকন্ডার স্তম্ভবৃক্ষমন্ডার জন্ত বাহা বাহা আবশ্যক, সকলই আছে।

"রাজকন্ডার রূপের কথা শুনিয়া অনেক দেশের রাজপুত্র তাহাকে বিবাহের জন্ত প্রত্যাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কন্ডার সম্মতি ভিন্ন রাজা কাহারও সহিত তাহার বিবাহ দিবেন না। রাজকন্ডা বিবাহে অসম্মত। সে বলে, 'এত সুখ আর কোথায় মিলিবে? এমন সুখের রাজ্য আর কোথায় পাইব? বিবাহ করিয়া কেন অন্তের কিস্তী হইতে বাইব? স্বাধীন আছি, বেশ আছি, বিবাহ করিব না।'

"সেবে এক রাজা রাজকন্ডাকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানান, এই রাজা চীনের রাজা অপেক্ষাও ধনবান, তাহার অতুল ঐশ্বর্য, কিন্তু তাহাকে বিবাহ করিতেও রাজকন্ডার প্রস্তুতি হইল না, সেই রাজার প্রজ্ঞাবও অগ্রাহ হইল। অনন্তর চীনদেশাধিপতি রাজকন্ডাকে পুনঃ পুনঃ এই বিবাহে সম্মত হইবার জন্ত অহুরোধ করিলেন। রাজকন্ডা বলিলেন, 'আগনি যদি আমি পীড়াপীড়ি করেন, তাহা হইলে আমি যুদ্ধে চুরি মারিয়া এ প্রাণ ত্যাগ করিব, তখন আগনি আর কাহাকে অহুরোধ করিবেন?'





“তীনরাজ কস্তার কথা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, ‘তুমি সত্যই পাগল হইয়াছ, আমি তোমার সঙ্গে সেইরূপই ব্যবহার করিব।’ রাজা তাঁহার কস্তাকে সেই প্রাণদায়ের একটি কন্কে বন্ধিনী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার সেবার জন্য কেবল নশ জন দাসী আছে, প্রধানী দাসী রাজকস্তার দাসী। রাজা রাজকস্তাকে বিবাহে অসম্মত দেখিয়া, রাজকস্তা পাগল হইয়াছে স্থির করিয়া, দেশবিশেষে যোষণা করিয়া দিরাছেন, বিনি রাজকস্তার বাণি আরোগ্য করিতে পারিবেন, রাজা তাঁহারই হস্তে কস্তা সম্পর্জন করিবেন।



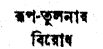
“আমি রাজকস্তাকে প্রত্যহই দেখিতে বাই। তাহার রূপে মুগ্ধ হইলেও আমি কোনও দিন রাজকস্তার দ্বেষ স্পর্শ করি নাই। আমি যে এত হিংস্র-প্রকৃতির দৈত্য, তদ্বৎসি তাহাকে দেখিলে আমার মনে হর, যদি রাজকস্তার কোম উপকার করিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার জীবন সার্থক হইত। আমার অজরোধ, সেই রাজকস্তাকে দেখিয়া তুমি তোমার মন তুল্য কর, জীবন ধন্য কর, তাহাকে দেখিলে তোমার অশ্রুর অহংকার ভুঁকিয়া যাইবে, সে সৌন্দর্য্যের কব্জি তোমার মাথা নোহাইতে হইবে। বসি তুমি যাও, তাহা হইলে আমি তোমাকে পথ দেখাইয়া দিয়া যাইতে পারি।”

দৈত্যের এই কথা শুনিয়া পরী কোন উত্তর করিল না, কেবল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ইহাতে দৈত্যের মনে বড় বিস্ময় জন্মিল, দৈত্য তাহার হাতের কপের জিনিষের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরী তখন হাসি বন্ধ করিয়া বলিল, “তুই মনে করিস, তুই যাহা দেখিয়াছিল, তাহা অপেক্ষা হৃদয়ের পৃথিবীরে আর কিছু নাই। আমি ভাবিয়াছিলাম, কি অদ্ভুত কথাই না তুই বলি! তুই যে আমার কথা বলি, সে বাহার পারের আভ্যন্তরও সমান নয়, এমন এক রূপবান রাজপুত্রকে আজ আমি দেখিয়া আসিয়াছি। তুই যদি একবার তাহাকে দেখিস, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবি, যাহুর রূপ কতদূর মনোহর হইতে পারে।”

দান্বাস বলিল, “মৈতুনী হৃদয়, এ রাজপুত্র কে?” পরী রাজপুত্রের পরিচয় দিল এবং রাজপুত্রও যে দৈত্যবর্ণিত রাজকস্তার মত বিবাহে অসম্মত, তাহাও জানাইল। শেষে বলিল, “বিবাহে অসম্মত হওয়াতেই, তাহার পিতাও তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া আমার বাসস্থানের নিকটে একটা মন্দিরের মধ্যে তাহাকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।”

দান্বাস বলিল, “পরী হৃদয়, আমি হৃদয় এই যুবকে স্বয়ং না দেখিতেছি, ততক্ষণ সে রাজকস্তা অপেক্ষা অধিক হৃদয়, তাহা স্বীকার করিতে পারিতেছি না, তোমার ভয়েও সে সকল কথা স্বীকার করিব না। আমি যে রাজকস্তার কথা বলিতেছি, যাহুর তাহা অপেক্ষা হৃদয় হইতে পারে না।”

পরী বলিল, “খাম, খাম রে হৃদয় দৈত্য, আমি বলিতেছি, তুই সে রূপ দেখিস নাই বলিয়াই তোর ভ্রম ঘুটিতেছে না।” দৈত্য বলিল, “আমিও তাহা বলিতেছি, আমার রাজকস্তাকে যদি তুমি একবার দেখ, তাহা হইলে তোমারও ভ্রম ঘুটিবে। আমার অজরোধ, তুমি প্রথমে আমার রাজকস্তাকে দেখ, তাহার পর আমাকে তোমার রাজপুত্র কিম্বা, তাহা দেখাও, তাহা হইলে আমাদের তর্কের মীমাংসা হইতে পারে।”



মৈতুনী বলিল, “আমার এখন তীনদেশে যাইবার অবসর নাই। তুই এক কাজ কর, তুই তীনরাজের কস্তাকে লইয়া আর, আমার রাজপুত্রের পাশে তাহাকে আনিয়া রাখ, তখন হৃদয়ের রূপের ভুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবি, কে অধিক হৃদয়।”



দান্হাস্ অগত্যা পরী প্রত্যবে সন্মত হইয়া, চীনদেশে করিয়া যাইবে, এমন সময়ে পরী বলিল, “থাম্, রাজপুত্র কোথায় আছে, আগে আমার সঙ্গে আসিয়া দেখিয়া যা, তাহার পর রাজকন্তাকে লেখানে লইয়া আসি।” পরী দান্হাসকে সঙ্গে লইয়া, রাজপুত্র কামারাল জামানের নির্বাণন-মন্দির দেখাইয়া দিল।

সৈন্ত্য বাহুদেয়ে চীনদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিল, রাজকন্তা পাণ্ডুর উপর অস্ত্রের নিস্তার অভিযুক্ত। সে তাকে সেই অবস্থাতেই কোলে তুলিয়া লইয়া, আকাশপথে উঠিল, তাহার পর প্রত্যবে রাজপুত্রের কর্ণাঙ্গারে প্রবেশ করিয়া, রাজকন্তাকে রাজপুত্রের পার্শ্বে শয়ন করাইল। বৈতা ও পরী উভয়ে কতক্ষণ



সোম্মহা
পরীকা

পর্যন্ত নির্ভীক-ভাবে উভয়ের সোম্মহা নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর দৈতা পরীকে বলিল, “রূপসী দেখ, রাজকন্তার রূপ দেখ, আমি ত’ বলিয়াছি, রাজকন্তাই অধিক সুন্দরী, এবার তোমার চক্ষু-বর্ণের বিবাদ দূর হইয়াছে ত’ ? এখনও কি কোন সন্দেহ আছে ?”

দৈতী বলিল, “সন্দেহ! সন্দেহ ত’ সম্পূর্ণই আছে। আমি বলিতেছি, রাজপুত্র রাজকন্তা অপেক্ষাও সুন্দর। অনেক গুণে অধিক সুন্দর; উভয়ের সোম্মহাের তুলনাই হয় না, রাজকন্তা। সুন্দরী স্বীকার করি, কিন্তু ভাল করিয়া তুলনা কর, দেখিতে পাইবে, রাজপুত্রই শ্রেষ্ঠ।”

সোম্মহা-তর্কের
সম্বন্ধ

দৈতা বলিল, “সুন্দরী, যদি আমি চিরজীবন ধরিয়া তুলনা করি, তাহা হইলেও আমাকে স্বীকার করিতে হইবে, রাজকন্তাই অধিক সুন্দরী।”

পরী বলিল, “তোমার কথা আমি স্বীকার করিতে পারি না, দেখিতেছি, তুমিও আমার কথা স্বীকার করিবি না, মধ্যস্থ তির আমাদের এ তর্কের মীমাংসা হইবে না।”

“মধ্যস্থের কথাই আমি মানিব, কিন্তু এখন মধ্যস্থ কোথায় পাওয়া যাইবে?” দৈত্য এই কথা বলিবামাত্র পরী মুক্তিকার সজোরে পলায়াত করিল, তৎক্ষণাৎ ভূমিতল বিদীর্ণ হইয়া একটি কৃষ্ণবর্ণ ভীষণাকৃতি দৈত্য ভূগর্ভ হইতে নির্গত হইল। সে কুস্র, খণ্ড, তাহার এক চক্ষু নাই এবং মস্তকে ছয়টি শৃঙ্গ, তাহার নখগুলি বাহুদের নখের মত বাকী ও ধারাল।—এই দৈত্যের নাম কাসকাস।

কাসকাস ভূগর্ভ হইতে উঠিয়া পরীর পদতলে নিপতিত হইল। পরী তাহাকে উঠাইয়া বলিল, “কাসকাস, তোমাকে মধ্যস্থ হইতে হইবে। এই রাজপুত্র ও রাজকন্যাকে দেখিতেছ, উহাদের মধ্যে কে অধিক সুন্দর, তাহা তুমি পরীক্ষা করিয়া বল।”

কাসকাস বিশেষ মনোযোগের সহিত রাজকন্যা ও রাজপুত্রের সকল অঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, “আমি দেখিতেছি, এ সিদ্ধান্ত আমাকে দিয়া হইবে না। আমি দুজনকেই দেখিলাম, দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, বাহার প্রতি বধন দুই কিরাইতেছি, তাহাকেই অধিক সুন্দর বোধ হইতেছে। উভয়েই নিখুঁত সুন্দর। তাহার অধিক প্রশংসা করিব? যদি উভয়ের মধ্যেই কেহ অপর অশেখা অধিক সুন্দর হয়, তবে তাহা পরীক্ষার একটি উপায় আছে। উহাদের এক এক জনকে এক একবার জাগাইয়া পরীক্ষা করুন, কে অপরের সহিত আলাপ করিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করে, বাহার আগ্রহ অধিক হইবে, তাহারই সৌন্দর্য্য অধিক, এ কথা বীকার করিতে হইবে।”

কাসকাসের এই প্রস্তাব দানহাস ও মৈমুনী উভয়েই সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল। তখন মৈমুনী একটি ক্ষুদ্র মক্ষিকা-রূপ ধারণ করিয়া, রাজপুত্রের নাসিকার উপর উপবেশন করিল এবং এমন সজোরে দংশন করিল যে, কামারাগ জ্বালান সেই দংশনযন্ত্রণায় জাগরিত হইলেন। মক্ষিকাকে বিভাডিত করিতে গিয়া পাশে রাজকন্যার পাশে হাত পড়িল, এমনই বিস্ময়ভরে রাজপুত্র উঠিয়া বসিলেন। রাজকন্যাকে নিদ্রিত অবস্থায় তাহার পার্শ্বে শায়িত দেখিয়া তিনি যেমন বিস্মিত, তেমনিই মুগ্ধ হইলেন। পূর্ণচন্দ্রের আলোক-স্মির ছায় সমুচ্ছল রূপপ্রভা সেই তরুণীর দেহে উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। নবনীত-কোমল দেহের স্পর্শ কি মাদকতাপূর্ণ! নিদ্রাঘোরের তরুণীর পীবর বন্ধঃস্থল বীরে বীরে আলোকিত হইতেছিল। স্রৈয়ং বিভিন্ন গুণাবলীর অবকাশপথে মুক্তার ভ্রায় শুভ দস্তগন্ধের বিরদংশ দেখা যাইতেছিল। তরুণীর যৌবন-পুষ্পিত দেহলতা তরুণ যুবককে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। তিনি আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, “বাঃ—কি রূপ! এমন রূপ ত কখন দেখি নাই, এ যুবতী এখানে কোথা হইতে আসিল? আমার হৃদয়-মন যে মুগ্ধ হইতে হরণ করিল!” রাজপুত্র মোহাবিষ্ট হইয়া রাজকন্যার গুণে ও লগাটে চুম্বন-রোষা অভ্যস্ত করিলেন, আগ্রহভরে তাহাকে উঠাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল। দানহাস যাহা বিচারপ্রভাবে রাজকন্যাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার চেষ্টাভঙ্গ হইল না।

রাজপুত্র বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন, “প্রিয়তমে, প্রাণাধিকে! তুমি কি একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিবে না? একবার দেখ, কে তোমাকে উত্তিরার জন্য অহুস্রোধ করিতেছে। আমি চিরদিনের জন্য তোমার চরণের দাস হইয়া রহিব। আমাকে তোমার প্রণয়ের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছ কি?” যুবরাজ তরুণীর শিথিল দেহলতা বক্ষোদেশে নিলীড়িত করিবার জন্য—হৃদয়মনীর বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য উদ্ভত হইলেন। সঙ্গা রাজপুত্রের মনে হইল, হয় ত তাহাকে বিবাহে সম্মত করিবার জন্য তাহার পিতা তাহার অজ্ঞাতদারে এই স্তন্যদ্বীকে লব্যাগ্রান্তে স্থাপন করিয়াছেন এবং স্বয়ং অজ্ঞান্যে থাকিয়া তাহার মনোভাব পরীক্ষা করিতেছেন! হতরং তিনি সংযতভাবে বসিলেন, “বাবা এমন কন্যার সহিত



প্রেমিকের
অঙ্গুরী-
বিনিময়



আমার বিবাহ দিবেন জানিলে আমি কি কখনও তাঁহার আদেশের অবাধ্যতাচরণ করি? হায়, হায়! তাঁহার অবাধ্য হইয়া মনে কত কষ্ট পাইরাছি, মাতা-পিতার মনেও কত কষ্ট দিরাছি। বড়ই ক্লান্ত করিরাছি; কিন্তু কখনওকে জাগাইয়া কোন কথা জানিবারও ত সুবিধা পাইতেছি না। এ কি নিদ্ৰা! বাহা হউক, ইচ্ছার অনুগীতে একটী হীরা কান্ধুরী দেখিতেছি, আমি এটি খুলিয়া লইয়া নিজের অনুগীতে ধারণ করি। এই অনুগী আমার প্রিয়তমার নৃত্যচিহ্নরূপ চিরকাল আমার অনুগীতে ধারণ করিব।”

চীন রাজকন্ডার অনুগীতে যে অনুগী ছিল, তাহা তিনি খুলিয়া লইয়া নিজের অনুগীতে পরিধান করিলেন এবং নিজের অনুগীতে চীন-রাজকন্ডার অনুগীতে পরাইয়া দিলেন, তাহার পর মৈতুনীর বাহনদ্বারা তাঁহার নয়নে নিদ্ৰাঘোর বনাইয়া আসিল, তিনি তৎক্ষণাৎ রাজকন্ডার পার্শ্বদেশে চলিয়া পড়িলেন এবং অতি অল্পকালের মধ্যেই অথো নিদ্রার আচ্ছন্ন হইলেন।

রাজপুত্রের নিদ্ৰা গভীর হইলে দানুহাস একটি মক্ষিকার রূপ পরিগ্রহ করিয়া রাজকন্ডার গুণ্ডে প্রবেশ করিল, দংশন-বেদনার কাতর হইয়া রাজকন্ডা নয়ন উন্মীলন করিলেন, দেখিলেন,—তাঁহার পার্শ্বদেশে একটি পুরুষ শয়ন করিয়া আছে; দেখিয়া তাঁহার বিষয়ের লীমা রহিল না, তিনি উঠিয়া দেখিলেন, “কি হৃৎসর!” কি অশুভ রূপ! বিষম দুর্ভিক্ষমধ্যে আনন্দে পরিণত হইল। এমন ভরস-বরহ রূপবান্ যুবক তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। এই যুবকটিই কি তাঁহার ভাবী স্বামী?

রাজকন্ডা বলিলেন, “এই যুবককে কি আমার পিতা আমার সহিত বিবাহের জন্ত আনিয়াছেন? ইহাকেই কি বিবাহ করিবার জন্ত তিনি আমাকে এত অনুরোধ করিয়াছিলেন? ও—আমি কি নিজে! আগে যদি আমি ইহাকে দেখিতাম, তাহা হইলে একবারও বিবাহে অঙ্গভঙ্গ হইতাম না। ইহা আমার বিবাহের চিরদানী হইয়া রহিতাম। যে প্রিয়তম প্রাপ্তবয়স্ক! উঠ, কোন্ পুরুষ, কোন্ রমিক! প্রিয়তমা প্রেমসীমার সহিত এক শয্যা শয়ন করিয়া, প্রেম-সান্নিধ্যনে আপনাকে বঞ্চিত রাখে, বা আমার করিয়া নিদ্রিত থাকে?”

অবশ-চূষনে
প্রেমিকার
আশ্রয়



স্বপ্নী রাজকন্ডা কান্দারাজ জ্ঞানানের হাত ধরিয়া সখেগে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, রাজপুত্রের নিদ্ৰাভঙ্গ হইল না। তখন অবসরভরে স্বপ্নী কান্দারাজ জ্ঞানানের নয়নে, গুণ্ডে, বক্ষদেশে অল্প-চূষনে মস্ত্রিত করিয়া দিলেন। কন্দর্পের তীব্রবাণসমূহের অমোঘ আঘাতে ভঙ্গীর সমগ্র ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন ও জ্বলন্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। অধীরভাবে স্বপ্নী ভরস যুবককে জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনও মতেই রাজপুত্রের নিদ্ৰাভঙ্গ হইল না। স্বপ্নী পুনর্বার আকোশ করিয়া বলিলেন, “এ কি গভীর নিদ্ৰা! নিশ্চয়ই আমার কোন শত্রু, এই যুবকের প্রেমের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী, শত্রুতা করিয়া মারামর্মে ইহাকে অচেতন করিয়া রাখিয়াছে। হায়, আমি এখন কি করিব? কি করিলে ইহার নিদ্ৰাভঙ্গ হইবে?” স্বপ্নী রাজপুত্রের করতলের দিকে চাহিতেই তাঁহার অনুগীতে নিজের অনুগী দেখিতে পাইলেন, সবিষয়ে নিজের অনুগীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, একটি অপরিচিত অনুগী। রাজকন্ডা বলিলেন, তাঁহাদের বিবাহ হইয়াছে, বিবাহ না হইলে এভাবে অনুগীর-পরিবর্তন হইবে কেন? অনেক চেষ্টাও রাজকন্ডা যখন রাজপুত্রের নিদ্ৰাভঙ্গ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বলিলেন, “আমি তোমার নিদ্ৰা ভাঙাইতে পারিলাম না, কিন্তু তুমি যে হও, একদিন আমাদের সাক্ষাৎ হইবে।” এই বলিয়া রাজকন্ডা রাজপুত্রের পার্শ্ব শয়ন করিলেন, এমনই নিদ্ৰাভারে তাঁহার চক্ষুর আচ্ছন্ন হইল, তিনি গভীর নিদ্ৰার মগ্ন হইলেন।

তখন পরী দানহাসকে বলিল, “কি রে হতভাগা, দেখিলি? কে অধিক হুম্মর, তাহার কিছু প্রমাণ ইলি? তোর চক্ষু থাকে ত’ দেখিয়াছিল, কর্ণ থাকে ত’ শুনিয়াছিল, রাজকুমারী রাজপুত্র অপেক্ষা শত-
গুণে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছে, স্বতরাং বুঝিয়াছিল, রাজপুত্রই অধিক হুম্মর, এখন বা, রাজকুমারকে
মন লইয়া আসিয়াছিল, এখনই তাহার মহলে তাহার শয্যার পাশে আস, তুই ও কসকাল দুজন
হাকে ধরিয়া লইয়া যা।”

দানহাস ও কাসকাস পরীর আজ্ঞার চীন-রাজকুমারী বেদোয়াকে লইয়া আকাশে উঠিল এবং বৃহত্তমগো-
পুত্র হইয়া গেল। মৈয়ুনী তাহার বাগদান কুপের মধ্যে প্রবেশ করিল।

পরদিন প্রভাতে কাশায়াল জামানের নিম্নাভঙ্গ হইলে তিনি শয্যার উত্তর-পার্শ্ব নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন,
স্বরাভিহিত যে বিশ্ববিমোহিনী স্তম্ভরীক স্বপ্নকালের জন্ত শয্যাশ্রেণিতে নিম্নিতা দেখিয়াছিলেন, তিনি অল্প
ইয়াছেন। রাজপুত্র মনে মনে বলিলেন, “আমি যাহা স্মরণ করিয়াছি, তাহাই বটে, আমার কাঁধে
আমার বিবাহে রুচি জন্মাইবার জন্ত এই খেলা খেলিয়াছেন।” তত্বে তখনও নিশ্চিত ছিল, রাজপুত্র তাহাকে
আ উঠিয়া তাঁহার নিকটে আসিতে আদেশ করিলেন।

রাজপুত্র হস্ত-মুখ প্রকলনান্তে নমাজ ও কোরাণ পাঠ সমাপ্ত করিয়া তত্বেকে বলিলেন, “আমি যে
খা জিজ্ঞাসা করিব, তাহার সত্য উত্তর দিবি। মিথ্যা হইলে তোর মাথা কাটরা কেলিব। কাল রাতে
যে হুম্মরী আমার বিছানার শরন করিয়াছিলেন, তাহাকে এখানে কে আনিয়াছিল?”

তত্বে সবিস্ময়ে বলিল, “রাজপুত্র, আপনি কোন্ রমণীর কথা বলিতেছেন?” রাজপুত্র বলিলেন,
আমার শয্যার কাল রাতে যিনি শুইয়াছিলেন।” তত্বে বলিল, “রাজপুত্র, আমি আল্লার দিয়া করিয়া
লিতে পারি, আমি এ ঘটনার কিছুই জানি না। আমি ঘরে বসিয়া থাকি, ঘরেই শরন করি; আমি
নিলাম না, অথচ আপনার গৃহে স্ত্রীলোক আসিল, এ অতি অসম্ভব ক।”

“হারামজাদা, মিথ্যাবাদী” বলিয়া রাজপুত্র তাহার গণ্ডদেশে একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন। সে
চপেটাঘাতে ঘুরিতে ঘুরিতে পড়িয়া গেল, কিন্তু তাহাতেও নিজের পাইল না; রাজপুত্র তাহাকে স্তম্ভরী-
কুপের মধ্যে নামাইয়া কয়েকবার তাহাকে কুপের জলে ডুবাইলেন, তাহার পর বলিলেন, “তোকে
যেখানেই ডুবাইয়া মারিব, শীঘ্র বল, রাতে আমার ঘরে যে বুঝতী আসিয়াছিল, তাহাকে কে
পঠাইয়াছিল?”

প্রাণের ভয়ে তত্বে বলিল, “বলিতে আমি কুপের মধ্যে ডুলাইতেছি, আর জলে থাকি। থাইতেছি,
শুনে না উঠিলে কিছু বলিতে পারিব না।”

রাজপুত্র তাহাকে উপরে তুলিলেন, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া বলিলেন, “শীঘ্র বল, কে তাঁহাকে
পঠাইয়াছিল।” তত্বে বলিল, “আজ্ঞে, সকালে কুপের জলে ডুবিয়া বড় কষ্ট বোধ হইতেছে, কাপড়
তজিগা গিয়াছে, না বল করিলে কি করিয়া বলি?”

রাজপুত্র ক্রোধে ধর্মন করিয়া বলিলেন, “বদমাস! শীঘ্র কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া আমাকে শরন বল,
যে বলিলে তোকে একদম জাহায়েমে পাঠাইব।”

জাহায়েমে প্রেরিত হইবার ভয়ে তত্বে আর সে মন্দিরে দাঁড়াইল না, বরপরিবর্তনের জ্বলে সে একবারে
হালদের দিকে ধাবিত হইল। সে একেবারে হুলতানের পথপ্রান্তে আছড়াইয়া পড়িল, বলিল, “জাহাশনা,
দাশনার পুত্র জেপিয়াছেন, তিনি আমাকে জাহায়েমে পাঠাইতে চান, আমার অপরাধ—কাল রাতে কোন্



যুবকী আমিরা তাঁহার কাছে শয়ন করিয়াছিলেন, আমি কেন তাহা বলিতে পারি না ? জাঁহাপনা, আমি জানি, তাঁহার শয়নকক্ষে কাল রাত্রে একটি বশা পর্যন্ত প্রবেশ করে নাই। তিনি বলেন, তিনি যুবকীকে পাশে লইয়া শুইয়াছিলেন; কে সেই যুবকীকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহা আমি বলিতে পারি নাই বলিয়া আমার কোমরে দড়ী ধাখিয়া আট দশবার কুপে ডুবাইরাছেন। বহু কষ্টে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছি, বুঝিলা একেবারে উন্নতপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন।”

শয়নমন্দিরে
স্থাপনা
আধিক্যবোধ
রহস্য কি ?

রাজপুত্র পুত্রকে নির্দোষিত করিয়া নিরুত্তর হইয়াছিলেন, এখন আবার তাহার বুদ্ধিগুণের বিবরণ শুধু হইলেন, তাঁহার মনে অশ্রদ্ধা হইল। উজীরকে বলিলেন, “উজীর, ভৃত্য বাহা বলিতেছে, তাঁহার এক্ষণে বুদ্ধিতে পারিতেছি না, তুমি অবিলম্বে কামারাল জামানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ব্যাপার কি জানিয়া আইস।” উজীর তৎক্ষণাৎ রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া ভৃত্য-কথিত সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন, “ভৃত্য সত্য কথাই বলিয়াছে, কাল রাত্রে আমার শয্যাপার্শ্বে এক হৃদয়ীক শয়ন করিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম, আমি সেই যুবকীর পরিচয় চাহি, আর কে তাহাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছিল, তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি। আগনি অবশ্যই এ ব্যাপারের রহস্য অবগত আছেন।”

উজীরের মনে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, রাজপুত্রকে বলিলেন, “ইহা অত্যন্ত অবিদ্যাত কথা।”

রাজপুত্র গভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আমি আমার চক্ষুকে অবিদ্যাত করিতে পারি না, আমি জানিতে চাই, কে সেই রমণী ? আপনাকে অবশ্য এ উত্তর দিতে হইবে, নতুবা আপনাকে ছাড়িব না।”

উজীর কিঞ্চিৎ অপমান বোধ করিয়া বিষমলুপ্তিতে রাজপুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন, কি উত্তর করিবেন, তাহায়া পাইলেন না।

রাজপুত্র বলিলেন, “আমার নিকট অজ্ঞতার ভাণ করা অনর্থক। আমি নিরোধ নহি, সকলই বুদ্ধিতে পারিয়াছি, এ আপনাদের বড়লক্ষ্য মাত্র, আমাকে প্রলুব্ধ করিবার জন্ত এই হৃদয়ীকে আপনাদের শয়নমন্দিরে পাঠাইয়াছিলেন, সে যাহাতে কোন প্রকারে আমার সহিত কথা না কহে, একান্ত তাহাকে নিদ্রায় ভাগ করিয়া থাকিতে আদেশ করিয়াছিলেন, তাহার পর আমি নিদ্রিত হইলে তাহাকে আমার শয্যাপ্রান্ত হইতে অপসারিত করিয়াছেন।” উজীর বলিলেন, “আমি আমার দিবা করিয়া বলিতেছি, এ ঘটনা আমার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, আপনাদের পিতাও ইহা অবগত নহেন, আমার অহুমান হই, আপনি যখন কোন হৃদয়ীকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসার জন্ত আমার উপর পীড়াপীড়ি করিতেছেন, আপনাদের অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার সাধা আমার নাই।”

উজীরের
দাড়ি-দায়।

রাজপুত্র সজ্ঞেবে বলিলেন, “আপনি আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহার পর বিক্রম করিতে সাক্ষী হইতেছেন ! আমি যখন দেখিয়া আপনার নিকট প্রণাম বকিতেছি !” রাজপুত্র সহসা বৃদ্ধ উজীরের বেষ্টন লগা দাড়ি ধরিয়া সজ্ঞেবে টানিতে লাগিলেন, সে টান সহ্য করিতে না পারিয়া কতকগুলি দাড়ি উপড়াইয়া আসিল। উজীর বিনা প্রতিবাদে এ অপমান সহ্য করিলেন, মনে মনে বলিলেন, “রাজপুত্র সত্যই ক্ষেপিয়াছেন, ভৃত্যের যে দশা হইয়াছে, আমারও তাহাই হইল ; কিন্তু এ হুদাচারের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিব কি করিয়া ?” রাজপুত্র উজীরের দাড়ি ছাড়িয়া তাঁহার পৃষ্ঠে কিল বর্ষণ করিতে লাগিলেন, এক একটি কিল বজ্রাঘাতের ভাণ পৃষ্ঠে নিশ্চিত হইতে লাগিল, পিঠ আঘাত হইয়া উঠিল।

উজীর প্রহার অসহ্য জ্ঞান করিয়া বলিলেন, “রাজপুত্র, এ যুদ্ধের প্রাণবধ করিবেন না, তাহা হইলে কোন সংবাদই জানিতে পারিবেন না। আমি স্থলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জানিয়া, তাহা শব্দ আপনায় পৌঁছ করিতেছি, তিনি বোধ হয় এ সকল খ্যাণার জ্ঞানেন।”

রাজপুত্র উজীরকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি দ্রুতবেগে স্থলতানের নিকট প্রস্থান করিলেন। রাজপুত্র তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, “বাবাকে বলিবেন, কাল রাat্রে আমার শয্যাশ্রিতে যে যুবতীকে দেখিয়াছিলেন, তাহাকে আমি বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ রাজী আছি। তিনি কি বলেন, অবিলম্বে আমাকে জানাইবেন।”

উজীর স্থলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। অবশেষে বলিলেন, “ভৃত্য আপনাকে বাহা বলিয়াছে, তাহা সমস্তই সত্য, রাজপুত্র নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়াছেন, নতুবা বিনি কখনও আমার সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে সাহসী হন নাই, তিনি আমার দাড়িগুলো পড়-পড় করিয়া উপড়াইয়া দিলেন; কীলের চোটে হাড়গুলো বোধ হয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।”

স্থলতান উজীরের কথা শুনিয়া মহা চিন্তিত হইলেন। তিনি এই ঘটনার রহস্যভেদের জন্য উজীরকে সঙ্গে লইয়া পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন এক রাজপুত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে পাশে বসাইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু পুত্রের জ্ঞানের কোন বৈলক্ষ্য দেখিলেন না; অবশেষে স্থলতান তাঁহাকে তাঁহার নৈশকাহিনী বলিবার জন্য অহরোধ করিলেন। কানারাল জামান উজীরকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, পিতাকেও তাহাই জানাইলেন। অবশেষে বলিলেন, “যদি সেই অল্পশ্রম যুবতীর সহিত আমার বিবাহ দেন, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি ব্রীজাতির প্রতি বতই অবজ্ঞা প্রকাশ করি না কেন, সেই রমণীকে বিবাহ করিতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই।”

স্থলতান সা জামান পুত্রমুখে এই কথা শুনিয়া বজ্রহতের জার শুভিতভাবে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে বলিলেন, “বৎস, তুমি বাহা বলিতেছ, তাহা আমার নিকট বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আমি সে যুবতী সম্বন্ধে কোন কথা জানি না, আমি আমার রাজমুকুটের দিয়া করিয়া এ কথা বলিতেছি। আমার আদেশ গ্রহণ না করিয়া এ মনিরে কে প্রবেশ করিতে সাহসী হইবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না, এমন কি, এই প্রহরীও কোন সংবাদ অবগত নহে। আমার অহুমান হর, তুমি যত্ন দেখিগাছ।”

উজীর মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “হাঁ, হাঁ, আমারও ঐরূপ অহুমান, কিন্তু এই অহুমান কথা প্রকাশ করিতে গিয়া আমার অর্ধেক দাড়ির দকা নিকাশ হইয়াছে।”

রাজপুত্র বলিলেন, “স্বপ্ন বলিয়া না হয় বিশ্বাস করিতাম, কিন্তু যখন কি অসুখী-পরিবর্তন হয়? এই অসুখীটি দেখুন, বুঝিবেন, আমি স্বপ্ন দেখিয়াছি কি না, সেই যুবতীর হস্ত হইতে আমি এই অসুখী গ্রহণ করিয়াছি।”

স্থলতান পুত্রের হস্ত অসুখী নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন, রাত্রির কাণ্ড যখন অগ্নিকাণ্ড গুরুতর ব্যাপার! তিনি পুত্রকে সন্ধানন করিয়া বলিলেন, “বুঝিলাম, তুমি বাহা বলিতেছ, তাহা সমস্তই সত্য কথা। আমি এ কথা বিশ্বাস করিলাম, কিন্তু আমি সেই অন্তর্হিতা যুবতীর সন্ধান কিরূপে করিব? কে তাহাকে আনিয়াছিল, কোথায় তাহার গৃহ, কিছুই জানি না, তাহার আগমনের কারণও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না, তাহার অলৌকিক রূপে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া এ ভাবে অন্তর্হিত হইবার কারণও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, আমি যে কিরূপ তোমার প্রাণনা পূর্ণ করিব, তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।”

স্বপ্ন-নিবেদন
সূর্য

স্বপ্ন-সুন্দরী
প্রবেশ
সত্য কোথায়?
সূর্য

হুলভান পুত্রকে মুক্তিদান করিয়া তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। রাজপুত্র বিরহ-যজ্ঞার আকুল হইয়া শয্যাগ্রহণ করিলেন। অবশেষে রাজপুত্রের স্বাভাবিক মানসে উজীর হুলভানকে স্থান-পরিবর্তনের অনুরোধ করিলেন। রাজধানী হইতে দূরবর্তী একটি বীপে রাজপুত্রকে স্থানান্তরিত করা হইল, স্থির হইল, প্রতি সপ্তাহে উজীর হুইবার করিয়া সাক্ষাৎ করিবেন। বীপের সুন্দর দৃশ্যে হুইবার সমীপে এবং বন-বিহঙ্গের মধুর সঙ্গীতে যুবরাজের বিরহ-অবগার হৃদয়ের বেদনা কমিষ্ণু লাগিব হইবে।



এই বীপে একটি সুদৃঢ় ঘর্গ ছিল, সেই ঘর্গে যুবরাজ কামারাল জ্ঞানানের আবাসস্থান স্থির হইল।

এ দিকের ব্যাপার এইরূপ, এখন অল্প দিকের কথা বলিতেছি।

দান্ধাস ও কাসকাস দৈত্যায় চৌন-রাজকুমারীকে তাঁহার সাত মহল প্রাসাদের শয্যা-যথা-কালে শয়ন করাইয়া প্রস্থান করিল।

পরদিন প্রভাতে রাজকন্ডার নিদ্রাভঙ্গ হইল। পার্শ্বে চাহিয়া রাজকন্যা দেখিলেন, কেহই নাই। দানীগণকে ডাকিলেন, বুজা ধাত্রীও অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল। রাজকন্ডা ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাল রাত্রে আমার শয্যায় যে যুবক শয়ন করিয়াছিলেন, তিনি কোথায়? আমি তাঁকে বড় ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি।”

ধাত্রী বলিল, “রাজকন্ডা, তুমি

কি বলিতেছ, এই সাতমহল প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া রাত্রে তোমার ঘরে পুঙ্খ আশিয়া তোমার কাছে উইয়াছিল, একি কথা, ভাল করিয়া বুঝিয়া বল।”

রাজকন্যা বলিলেন, “সত্যই এক পরম রূপবান যুবক আমার পাশে নিদ্রিত ছিলেন, আমি তাঁহাকে এত করিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তিনি উঠিলেন না, শেষে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। কোথায় সেই যুবক?”

ধাত্রী বলিল, “মা, আমার সঙ্গে তোমার বিজ্ঞপ করা উচিত নয়। এখন উঠিয়া হাত-শুষ্ণ ধোও, বেলা হইয়াছে।”

রাজকন্যা বলিলেন, “না বুড়ী, আমি বিজ্ঞপ করিতেছি না। আমি সত্যই সে যুবককে দেখিতে চাই, তাঁহার বিরহে আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে।”

ধাত্রী বলিল, “ছি মা, কি আবেল-তাবেল বকিতেছ, তোমার মহলে অপর পুঙ্খ আশিয়াছে? বা নর, তাই বলিতেছ কেন?”

বেদো-
রান্না
প্রোম-
প্রোম-
সিকা

প্রেমময়ীর
বহু-বিকাশ



এবার রাজকন্যার মৈথ্যচ্যুতি হইল। তিনি ধাত্রীর চুলের সৃষ্টি ধরিয়া সুবেগে কাঁচ-চড় মারিতে লাগিলেন। বুড়ী মুখবাদান করিয়া কাদিতে লাগিল। রাজকন্যা প্রহার বন্ধ রাখিয়া বলিলেন, “শীত দল, সেই যুবক কোথায়, নতুবা এখনই তোর প্রাণবধ করিব।” বুড়ী বলিল, “বড় লাগিয়াছে, পাঁড়াও, একটু হাঁপ ছাড়িয়া নই, তাহার পর বলিতেছি।” রাজকন্যা বুড়ীকে ছাড়িবামাত্র সে দ্রুতবেগে রাজ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “রানী-মা ! তোমার কন্যার বুদ্ধিলোপ হইয়াছে, বেদোরা একেবারে ক্ষেপিয়া গিয়াছে, সত্বর তাহার মন্থে গিয়া দেখিয়া আইন।”

ধাত্রীর কথা শুনিয়া রাজ্য কন্যার মন্থে ছুটিলেন। তিনি কন্যার নিকট আসিয়া বলিলেন, “ছিঃ মা, বুড়ী ধাই, তাকে কি এভাবে মারিতে হয়, এ তোমার পক্ষে সম্ভব হয় নাই, আমি তোমার উপর বড় রাগ করিয়াছি।”

রাজকন্যা বলিলেন, “ধাইবুড়ী ভয়ানক মিথ্যা কথা বলে। আমি যে যুবকের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার কথা সে জানে না বলিতেছে, কাল রাত্রে আমি তাহার পাশে শয়ন করিয়াছিলাম, আর বাদী এই বরে থাকিয়া তাহার কথা জানে না ! আমি সেই যুবককে বিবাহ করিব, তাহাকে না পাইলে আমার দেহে প্রাণ থাকিবে না।”

রাজ্যী বলিলেন, “তুমি যে অসম্ভব কথা বলিতেছ মা ! তোমার কথা আমি কিছুই ব্রূহিতে পারিতেছি না।” রাজকুমারী মায়ের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বিশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, “মা, তুমি ও বাবা কিছুদিন ধরিয়া, আমি বিবাহে অসম্মত বলিয়া আমার উপর নিষ্যাতন আরম্ভ করিয়াছিলে, এখন আমি বিবাহে সম্মত আছি ; কিন্তু যাহাকে বিবাহ করিতে চাহিতেছি, সত্বর সেই যুবককে আনিয়া দাও, নতুবা আমি আত্মহত্যা করিব।”

রাজ্যী বলিলেন, “তোমার পাগলের মত কথা কে বিশ্বাস করিবে ? আমাদের অজ্ঞাতদারে এ পুরীতে পুরুষ প্রবেশ করিয়াছে, ইহা কোনক্রমে বিশ্বাস করা যায় না।” রাজকন্যা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তখন রানী রাজ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সকল কথা বলিলেন। রাজা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং কন্যার মন্থে উপস্থিত হইলেন। রাজকন্যা বলিলেন, “বাবা, আমি কোন কথা শুনিতে চাহি না, হয় সেই যুবককে আনিয়া দিন, না হয় আমাকে বিষ দিন, বিষ খাইয়া সকল যন্ত্রণার অবদান করি, সেই যুবক ভিন্ন আমার জীবনে স্রুথ নাই !”

রাজা বলিলেন, “তোমার অন্তরে অন্য পুরুষ আনিয়া তোমার শয্যার শরন করিয়াছে, এ কথা আমি কোনক্রমে বিশ্বাস করিতে পারি না। তুমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখিয়াছ। স্বপ্নের কথা ভুলিয়া যাও। অল্প রূপবান রাজপুত্রের সহিত আমি তোমার বিবাহের আয়োজন করিতেছি।”

রাজকন্যা বলিলেন, “বাবা, আপনি আমার সঙ্গে পরিচাস করিবেন না। সত্যই কাল রাত্রে একটু পরম রূপবান যুবকের সহিত আমি এক শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, আমার অন্তরীতে এখনও তাঁহার অঙ্গুরী রহিয়াছে দেখুন। বীহার এই অঙ্গুরী, তাঁহাকে আনিলে আমি সানন্দচিত্তে বিবাহ করিব, নতুবা প্রাণ বাহির হইলেও আমি অন্যের গলায় মাগা দিব না।” রাজা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, কিন্তু পাছে মনে বাধা পাইয়া রাজকন্যা আত্মহত্যা করিয়া যবেন, এই ভয়ে কোন কথা বলিলেন না। রাজকন্যাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিবার আদেশ দিলেন, ধারে প্রহরীর সংখ্যা বৃদ্ধি হইল। পরে রাজা আদেশ করিলেন, “যুদ্ধ ধাত্রী ভিন্ন আর কেহই রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবে না।”

বাহিত-যিলন
না হইলে
আত্মহত্যার পন



গ্রেমের মাগ-
পাশের উপর
শাসন-শৃঙ্খল



শ্রেম-
দায়ী
আরোপ
এখানে
শিরশ্ছেদ

অবশেষে রাজা ঘোষণা করিলেন, তাঁহার কন্যা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, যে কোন ব্যক্তি রাজকন্যার ব্যাধি দূর করিতে পারিবে, তাহারই হস্তে তিনি কন্যা সম্ভ্রপান করিবেন, ভবিষ্যতে তাহাকে নিরোপিত বান করিবেন, কিন্তু ব্যাধি আরোগ্য করিতে না পারিলে তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন।

এক আদীরপুত্র পোতবশতঃ রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্ভত হইল। রাজকন্যার ব্যাধি আরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু রাজকন্যার ব্যাধি দূর করা তাহার সাধো হইল না। আদীরপুত্রের শিরশ্ছেদন হইল। এইরূপে অনেকের শিরশ্ছেদন হইল, রাজাজ্ঞার সেই সকল ছিন্ন শির নগরের দেউড়ীতে ঝুলাইয়া রাখা হইল।

রাজকন্যার ধাত্রীর একটি সন্তান ছিল, তাঁহার নাম মার্জ্জাবান। তিনি রাজকন্যার ধর্ম-ভ্রাতা হইতেন। বাগ্যকাল হইতেই রাজকন্যার সহিত মার্জ্জাবানের অকৃত্রিম ভালবাসা হইয়াছিল, তাহা ধামিত্রীর প্রণয় নহে, ভ্রাতা-ভগিনীর ভালবাসা মাত্র। মার্জ্জাবান বহুবিন্যাস সুশীল হইয়া দেশ-পর্থাটনে বাহির হইয়াছিলেন। অনেক দেশ-পর্থাটনের পর বহুশ্রম লাভ করিয়া তিনি কয়েক বৎসর পরে চীনরাজ্যে প্রভাগমন করিলেন। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সারি সারি নরমুণ্ড ঝুলিতেছে, ইহাতে তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। প্রথমেই তিনি তাঁহার মাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর রাজকন্যা কেমন আছেন, তাহা জানিতে চাহিলেন। রাজকন্যার ধাত্রী—মার্জ্জাবানের জননী সকল কথা পুত্রের নিকট পেটের করিল। মার্জ্জাবান সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, “মা, রাজকন্যার সঙ্গে আমি একবার গোপনে সাক্ষাৎ করিতে চাই, রাজা যখন কাহাকেও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিবেন না, তখন প্রকণ্ডে সাক্ষাতের কোন সম্ভাবনা নাই।”—ধাত্রী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “আজ বাবা, তোমাকে এক কথার উত্তর দিতে পারিলাম না, বাহা করিব, কাল তোমাকে বলিব।”

পরদিন ধাত্রীপুত্র রমণীর বেশে সজ্জিত হইলেন এবং ধাত্রীর সঙ্গে রাজকুমারীর মহলদ্বারে উপস্থিত হইলেন। ধাত্রী গ্রহরীকে বলিল, “এটি আমার কন্যা, রাজকন্যার সঙ্গে একবার দেখা করে, ইহার বড় ইচ্ছা, আমার বিশেষ অরুরোধ, তুমি একবার দ্বার ছাড়িয়া দাও।” প্রহরা রাজ্যের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ধাত্রীর অরুরোধ অগ্রাহ্য করিতে পারিল না, দ্বার ছাড়িয়া দিল। মার্জ্জাবান রাজকন্যার সমুখে উপস্থিত হইলেন।

মার্জ্জাবান বিশেষ সঙ্গমে সহিত রাজকন্যাকে অভিবাদন করিলেন। অনেকদিন পরে মার্জ্জাবানকে দেখিয়া রাজকন্যার মনে প্রচুর আনন্দোদয় হইল। ধাত্রী পূর্বেই রাজকন্যাকে পুত্রের আগমন-কাহিনী বলিয়াছিল, নারীবেশে তাহাকে তাহার নিকট উপস্থিত করিবে, সে অস্বভাব হইয়াছিল। মার্জ্জাবান বলিলেন, “তুলিগান, তুমি কঠিন পীড়ার আক্রান্ত হইয়াছ, কেহই তোমাকে আরোগ্য করিতে পারিতেছে না, তোমার জন্য আমার বড় চিন্তা হইয়াছে। আমি চিকিৎসাশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছি, তোমার পীড়ার কি লক্ষণ, তাহা তোমার মুখে শুনিগে, আমি তোমাকে আরোগ্য করিবার চেষ্টা করিতে পারি।”

ধাত্রীপুত্রের কথা শুনিয়া রাজকন্যা বলিলেন, “ভাই, তুমিও মনে করিতেছ, আমি পাগল হইয়াছি? আমার কাছে সকল কথা শুনিগেই ব্যাপার কি, তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে।”

রাজকন্যা তখন মার্জ্জাবানের নিকট সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। এমন কি, অসুখী পথ্যত তাহাকে দেখাইলেন, তাহার পর বলিলেন, “কোন কথা গোপন না করিয়া আমি সমস্তই তোমাকে খুলিয়া বলিলাম, তুমি অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, ইহার মধ্যে একটা কোন রহস্য আছে, এই রহস্যভেদ হইতেছে না বলিয়াই সকলে মনে করিতেছে, আমি পাগল হইয়াছি।”

মার্ক্সবান অনেককণ চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তোমার কথা শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি বটে, কিন্তু তুমি বাহা বাহা বলিলে, তাহা সত্য হইলে আশ্চর্য্য বিবেচনা হয়, তোমার হত্যার হইবার কোন কারণ নাই, একদিন তোমার আশা পূর্ণ হইবেই, কিন্তু তুমি সৈধ্যধারণ কর। আমি যে সকল দেশে এখন পর্য্যন্ত বাই নাই, শীঘ্রই সেই সকল দেশক্রমশে বাত্মা করিব, আমার প্রত্যাগমনের পর তুমি দেখিবে, তোমার ছন্দরস্বের সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।” মার্ক্সবান রাজকন্ডার নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন।

প্রেমিক-সন্ধান
অভিধান



অতঃপর মার্ক্সবান পুনরায় বিশেষে যাত্রা করিলেন। নানা দেশ, দ্বীপ ও উপদ্বীপ পরিভ্রমণ করিয়া কোথাও তিনি রাজকন্যা। বেসোয়ার অপূর্ণ প্রেম-কাহিনী সখকে কাহারও মুখে কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। চারিমাশ পরে তিনি টরক নগরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, সেই দেশের রাজপুত্র পীড়িত এবং তাঁহার পীড়ার কাহিনী রাজকুমারী বেসোয়ার ইতিহাসের অন্তরূপ। এই সংবাদে মার্ক্সবান ব্যংগরোনাতি আনন্দিত হইলেন। মার্ক্সবান জাহাজে চড়িয়া সেই রাজ্যের রাজধানীতে যাত্রা করিলেন; কিন্তু হৃৎগাঢ়মে জাহাজ একটু পর্তুতে লাগিয়া চূর্ণ হইয়া গেল এবং কামারাল জামান যে দীপে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহারই সন্নিকটে তাহা জলমগ্ন হইল।

মার্ক্সবান ভাগরূপ সন্তরণ জানিতেন। তিনি সন্তরণ করিয়া দীপে উঠিলেন, স্থলতান সা জামানের দুর্গ হইতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইলেন; এবং দুর্গমধ্যে মহা সমারোহে গৃহীত হইলেন। উজ্জীর তখন সেই দুর্গে উপস্থিত ছিলেন, বহাদুরি-পরিবর্তনের পর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া মার্ক্সবান উজ্জীর-সম্মুখানে উপস্থিত হইলেন।

মার্ক্সবানের সহিত আলাপ করিয়া উজ্জীরের মনে বিশেষ আনন্দের হইল, মার্ক্সবান স্থলীল, স্বন্দর যুবক, তাহার উপর নানাশাস্ত্রে তাহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য জন্মিয়াছিল, বাকশক্তিও অহুপম ছিল। উজ্জীর বলিলেন, “মহাশয়, দেখিতেছি আপনি এক জন অসাধারণ ব্যক্তি। আমাদের রাজপুত্র কোন সঙ্কটজনক পীড়ার বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহার আরোগ্যের কোন উপায় করিতে পারেন কি? রাজপুত্রের পীড়ার রাজা হইতে অমাত্যবৃন্দ, এমন কি, প্রজামণ্ডলী পর্য্যন্ত কাহারও মনে স্রব্দ নাই।”

পীড়ার বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে উজ্জীর মার্ক্সবানকে রাজপুত্র কামারাল জামানের পীড়ার সকল কথা সবিস্তারে অবগত করিলেন। তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত হইতে দীপান্তরিত হওয়ার কারণ পর্য্যন্ত কোন কথা গোপন করিলেন না।

মার্ক্সবানের আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি স্পষ্ট বুকিতে পারিলেন, এই রাজপুত্রই চৌনরাজকন্ডার প্রথমতরঙ্গী একমাত্র কাণ্ডারী, তাঁহার যৌবনবসন্তের কোকিল। কিন্তু তিনি উজ্জীরের নিকট তৎক্ষণাৎ কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। তিনি বলিলেন, “স্বব্রাজকে দেখিলে বলিতে পারি, রোগ হৃৎগাঢ় কি আরোগ্যলাভের বোগ্য।” উজ্জীর বলিলেন, “আমার সঙ্গে আইন, আপনাকে রাজপুত্রের সহিত পরিচিত করিয়া দিতেছি।”

চিত্রচোবের
সন্ধান মিলিল।



মার্ক্সবান বখন রাজপুত্রকে তাঁহার শয়নকক্ষে দেখিলেন, তখন রাজপুত্র উত্থানশক্তিরহিত, মুখ মলিন, চক্ষু মূত্রিত। স্থলতান পীড়িত পুত্রের নিকটে বসিয়া চিন্তামগ্ন ছিলেন, মার্ক্সবান রাজপুত্রকে দেখিরাই বলিয়া উঠিলেন, “কি আশ্চর্য্য, এমন অকৃত সাদৃশ্য ত আর কখনও দেখি নাই।” রাজকন্ডার সহিত কামারাল জামানের সাদৃশ্যের কথাই তিনি বলিয়াছিলেন।

কবিতার মধ্যে
বিরহ-শাঙ্খ



রাজপুত্র চকু মুগ্ধিত করিয়া চিত্তা করিতেছিলেন, মার্জাবানের এই কথা শুনিয়া চকু পুলিলেন, মার্জাবান সেই অবসরে একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন; কবিতাটির মর্ম্ম এই যে, 'মিলনের রাত্রি শেষ হইল, নিশাশেষে চক্রবাক চক্রবাকী হুপারে বিরহ-শয্যা লুটাইতে লাগিল। হে চক্রবাক, অঙ্গ মুছিয়া শাশ্বনা অবলম্বন কর, তোমাদের ভবিষ্যৎ মিলনকে মধুময় করিবার জন্তই বিরহের এই ব্যবধান।'

স্বলতান কিবা উজীর এ কবিতার কোন অর্থ বুঝিলেন না, কিন্তু রাজপুত্র ইহা শুনিবামাত্র বুঝিলেন, আগন্তুক যুবক তাঁহার প্রিয়তমার সংবাদ অবগত আছেন। সহসা তাঁহার মুখ প্রসন্ন হইল, নিশ্চয় চকু প্রত্যাহিত হইয়া উঠিল। রাজপুত্র পিতাকে ইঙ্গিত করিলেন, 'উহাকে আমার কাছে বসিতে দিন।' স্বলতান উঠিয়া মার্জাবানকে সেখানে বসিতে দিলেন। পুত্রের মুখভাব দেখিয়া স্বলতানেরও মনে কিঞ্চিৎ আনন্দসঞ্চার হইয়াছিল। স্বলতান মার্জাবানকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, মার্জাবান কেবলমাত্র বলিলেন, 'আমি চীনদেশাধিপতির প্রজা।' স্বলতান বলিলেন, 'আপনি কোন্ বিষয় নিপুণ, জানি না, কিন্তু আপনাকে দেখিয়া আমার আশা হইতেছে, আপনি আমার পুত্রের বাধি আরোগ্য করিতে পারিবেন, উপযুক্ত পুরস্কার পাইবেন।' মার্জাবান যাহাতে রাজপুত্রের সহিত অকুণ্ঠিতভাবে আলাপ করিতে পারেন, এই অভিপ্রায়ে স্বলতান সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

মার্জাবান রাজপুত্রকে বলিলেন, "রাজকুমার, আপনি শান্ত হউন, আপনার মনের কষ্ট কি, তাহা আমি বুঝিয়াছি, আপনি যে সুলভীর বিরহে কাতর, সে কামিনী আমাদের দেশের রাজকন্যা বেদোরা সুলভী, আমি রাজকন্যাকে জানি, আপনার বিরহে তিনি আপনার অপেক্ষাও অধিক কাতর হইয়াছেন।" মার্জাবান রাজকুমারীর ইতিহাস বলিলেন। তাহার পর রাজপুত্রকে জানাইলেন, "আপনিই রাজকুমারীর বিরহবাধি আরোগ্য করিবার উপযুক্ত চিকিৎসক, আপনি চীনদেশে উপস্থিত হইয়া রাজকুমারীর চিকিৎসা করুন। তিনি আরোগ্যলাভ করিবেন, আপনিও পুরস্কার পাইবেন, আপনাকে আর এ অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না।"

প্রমথ্যাধি
উপশমে
নিশ-উৎসব



রাজপুত্র কামারাল জামানের দেহে বেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। তাঁহার যন্ত্রণা অর্ধেক পরিমাণে কমিয়া গেল, উষ্মগণ অনেক দূর হইল, তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্ৰোত্থান করিয়া পরিচ্ছন্ন পরিধান করিলেন। রাজা পুত্রের আরোগ্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া মার্জাবানকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রাজ্যের সর্ব্বত্র এ সংবাদ প্রেরিত হইল, রাজ্যে আনন্দোৎসব উপস্থিত হইল, বনিগণ কার্য্যমুক্তি লাভ করিল, দীন-দরিদ্র রাজভাণ্ডার হইতে অন্নবস্ত্র প্রাপ্ত হইল। চতুর্দিকে হাসি, গান, আমোদ-প্রমোদের ফোয়ারা ছুটিল।

কয়েকদিন উপযুক্ত পরিমাণে আহার করার ও সুনিদ্রা হওয়াতে রাজপুত্রের দৌর্ব্বল্য দূর হইয়া গেল। শেষে ছই বস্তুতে স্থির করিলেন যে, যদি রাজপুত্র চীনরাজ্যে যাইবার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে যাত্রার আয়োজনেই বহুকাল অভিবাহিত হইবে, সুতরাং চীনরাজকন্যাকে আরও দীর্ঘকাল বিরহধাতনা সহ্য করিতে হইবে; সুতরাং যুগয়ার ছলনায় রাজ্যত্যাগ করাই কর্তব্য।

রাজপুত্র পিতার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে, তিনি বলিলেন, "তুমি যুগয়ার বাণ, তাহাতে আগন্তিকি করি না, কিন্তু কোথাও এক রাত্রের বেশী বিলম্ব করিতে পারিবে না। তোমার শরীর এখন অসুস্থ, অধিক পরিশ্রম দেহের পক্ষে অনিষ্টকর হইতে পারে, তোমাকে দীর্ঘকাল না দেখিলেও আমি মনে বড় কষ্ট পাইব।" রাজপুত্র সন্তোষল হইতে দুইটি অকৃত্যঙ্কষ্ট অর্থ লইয়া একটি স্বর্ণ প্রহর করিলেন, অপরাতি মার্জাবানকে প্রদান করিলেন।

রাজপুত্র ও মার্জাবান যুগ্মর যাত্রা করিলেন এবং একটি প্রান্তরে আসিয়া সহিসদ্বয়কে দেখানে অপেক্ষা করিতে বলিয়া তাঁহারা অথ ছুটাইয়া দিলেন। সহিসদ্বয় ভাবিল, তাঁহারা যুগ্মর গমন করিলেন। রাত্রিকালে উভয় বন্ধুতে একটি সরাইয়ে আছাড়াপি করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। অতি প্রত্যুষে উভয়ে উঠিয়া অখারোহণ করিলেন এবং সহিসদ্বয়ের একটি অথ লইয়া গন্তব্যপথে ধাবিত হইলেন।

একটু বেলা হইলে তাঁহারা একটি অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, মার্জাবান অরণ্যের গভীরতরদেশে উপস্থিত হইয়া, সহিসের অশ্বটিকে বধ করিলেন এবং তাহার রক্ত রাজপুত্রের অতিরিক্ত একটি পরিচ্ছদে মাখাইয়া বৃক্ষমূলে কেলিয়া রাখিলেন। রাজপুত্রের নিকটে আসিয়া এ কথা প্রকাশ করিলেন, রাজপুত্র ইহার কারণ বুঝিতে না পারায় মার্জাবান বলিলেন, “তোমার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া সুলতান তোমার সন্ধান লোক পাঠাইবেন, তাহার পর তোমার পরিচ্ছদ রক্তাক্ত দেখিয়া মনে করিবেন, কোন হিংস্র জন্তুর আক্রমণে তোমার প্রাণ গিয়াছে; সুলতাং সেই সংবাদে তিনি তোমার অনুসন্ধান করিতে বিরত থাকিবেন। ইহাতে তোমার পিতার মনে উদ্যানক শোক উপস্থিত হইবে বটে, কিন্তু শেষে যখন তিনি তোমাকে লাভ করিবেন, তখন তাঁহার সকল শোক অন্তর্হিত হইয়া হৃদয়ে প্রকৃত আনন্দের সঞ্চার হইবে।” রাজপুত্র মার্জাবানের এই কৌশলে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র সঙ্গে করিয়া অনেক হীরা-রত্ন আনিয়াছিলেন, তাহা বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের দৈনিক ব্যয় নির্বাহ হইতে লাগিল। এই ভাবে বহুদিন পথপর্যটন করিয়া অবশেষে উভয়ে চীনরাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। মার্জাবান রাজপুত্রকে স্বগৃহে লইয়া না গিয়া, এক খী সাহেবের বাসা ত্রিক করিয়া দিলেন। রাজপুত্র রাজধানীতে তিন দিন বিশ্রাম করিলেন। ইতিমধ্যে মার্জাবান রাজপুত্রের জন্ত এক দৈবজ্ঞের বেশ প্রস্তুত করাইলেন। তাহার পর তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “রাজকন্তাকে বল, তিনি যেন চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাতের জন্ত প্রস্তুত থাকেন, এবার যে চিকিৎসক আনিয়াছি, সে রাজকন্তার ব্যাধি নিশ্চরই আরোগ্য করিবে।”

রাজপুত্র দৈবজ্ঞের বেশধারণ করিয়া রাজপ্রাসাদের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং রাজপ্রহরীরা তাঁহার কথা শুনিতে পায়, এ ভাবে বলিতে লাগিলেন, “আমি দৈবজ্ঞ, রাজকন্তা বেদোরা হুল্লরীর ব্যাধি কি, তাহা আমি জানি, আমি তাহা আরোগ্য করিব, যদি না পারি, শির দিব।”

এই কথা শুনিয়া রাজপুত্র কামার'ল জামানের চতুর্দিকে বহুলোকের সমাগম হইল, অনেক দিন পর্যন্ত রাজকন্তাকে আরোগ্য করিবার চেষ্টায় কেহ প্রাসাদ সন্নিকটে উপস্থিত হয় নাই, অনেক দিন পরে একটি লোককে এই ভাবে কথা কহিতে শুনিয়া তাহারা আর একটি নরমুং নগরদ্বারে স্থলিতে দেখিবার আশঙ্কায় কটকিত হইয়া উঠিল। সকলেই তাঁহাকে এই প্রকার গ্রন্থাহসিকের কার্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্ত অস্ত্ররোধ করিল।

রাজপুত্র কাহারও ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না; কেনই বা হইবেন? তখন সকলেই তাঁহার নির্দ্বিধতার নিশ্চয় করিতে করিতে গৃহে ফিরিল। এখন রূপবান্ ব্রহ্মপুত্র যে অঙ্গবলে প্রাণ হারাইবে, ইহা ভাবিয়া অনেকে গ্রন্থিত হইল। বাহা হউক, দৈবজ্ঞের স্পর্ধার কথা শুনিয়া উজীর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে চীনদেশের রাজার নিকট লইয়া চলিলেন।

প্রেমিকের
আত্ম-
সংগোপন-
নৈপুণ্য



দৈবজ্ঞের
হৃদয়ে
হৃদয়!



৩৪
স্বপ্নের
সন্ধ্যা

রাজা কামারাল জামানকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এই নবীন যুবক লোভের বশে অকালে প্রাণত্যাগ করিবে ভাবিয়া রাজার মনে দয়ার উজ্জ্বল হইল, পূর্বে কাহারও প্রতি তাঁহার মনে এ ভাবের উজ্জ্বল হয় নাই, কিন্তু তিনি রাজকন্তার চিকিৎসার নিরস্ত হইতে অস্বীকার করেন নাই; কিন্তু কামারাল জামানকে তিনি সে অস্বীকার করিলেন। অবশেষে কামারাল জামান বধন বলিলেন, “আমি নিশ্চয়ই রাজকন্তাকে আরোগ্য করিব, আপনি ক্ষান্ত তাগ করুন।” তখন রাজা বলিলেন, “তাহাই হউক, তোমার হস্তে আমি পূরন প্রস্তুতিতে আমার কন্তা সম্ভবান করিব, ভবিষ্যতে তোমাকে আমার সিংহাসনে বসাইব; কিন্তু অকৃতকার্য হইলে আমাকে প্রাণদণ্ড প্রদান করিতেই হইবে, আমি রাজা হইয়া নিয়মভঙ্গ করিতে পারিব না।”

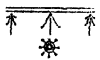
রাজপুত্র কামারাল জামান রাজার কথাতেই সন্মত হইলে, রাজা খোজা ভৃত্যগণের সঙ্গে তাঁহাকে রাজকন্তার মহলে প্রেরণ করিলেন; রাজপুত্র রাজকন্তার প্রাসাদদরিকটে আসিয়া দ্রুতপদে চলিতে লাগিলেন। ভৃত্যগণ বলিল, “আরে ও মশায়, অত তাড়াতাড়ি যাও যে, মরবার যে আর বিলম্ব হয় না, আরও অনেক দৈবজ্ঞ মরেছে, তোমার মত তাড়াতাড়ি মরতে কারও সাধ দেখিনি। বাছ রোগী দেখতে, ঘাঁড়ের মত গাইরের দিকে ছুটেছো যে!”

রাজপুত্র হাসিয়া বলিলেন, “যত শীঘ্র রাজজামাতা হইতে পারি, ততই সুবিধা কি না, তাই দোড়াইতেছি, তোমরাও আমার সঙ্গে আইস।”

যাহা হউক, খোজা প্রাসাদদ্বার মুক্ত করিয়া দিল। রাজকন্তার ভৃত্যগণকে রাজপুত্র বলিলেন, “আমি রাজকন্তাকে দেখিবামাত্র ত’ আরোগ্য করিতেই পারি, না দেখিবারে পারি; আমি তোমাদিগকে একবার বিজ্ঞা পরীক্ষা করাইয়া বাই, তখনই ভাবিয়াছি, আমি একটা বাছে দৈবজ্ঞ।” অনন্তর একটি কক্ষে উপস্থিত হইয়া দৈবজ্ঞ তাঁহার মূলি হুইতে দোয়াত, কলম, কাগজ বাহির করিলেন, তাহার পর গম্ভীরভাবে লিখিতে লাগিলেন—

প্রেরণপত্র

প্রণয়-নিদর্শন



চীনরাজকন্তার নিকট যুবরাজ কামারাল জামানের নিবেদন—

মাননীয় রাজকন্তা! যুবরাজ কামারাল জামান আপনার নিকট হইতে দূরে অবস্থান করিয়া যে কি মানসিক কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনাতীত, তাঁহার মনোহরণ করিয়া আপনি কোথায় অন্তর্ধান করিলেন কেহই জানে না। আপনার নিস্তারস্থানেই আপনি তাঁহার চিত্ত চুরি করিয়াছেন। আপনার ঐ পদ্যগাণ নেত্রের মধুর দৃষ্টি দেখিবার জন্য তিনি কত আগ্রহপ্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু কাগনিত্রা তাহা ঘটিতে দেয় নাই। রাজপুত্র যে অস্বীকার গ্রহণ করিয়া আপনার প্রতি প্রণয়প্রকাশ করিয়াছিলেন, এই পত্রে সেই অস্বীকার ফেরত পাঠাইতেছেন, তাঁহারি আপনি ফেরত পাঠাইলেই আপনার অস্বীকার প্রকাশিত হইবে। নতুবা আপনার অগ্রীতভাজন হইয়াছেন, মনে করিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন। তিনি আপনার উত্তরের জন্য অদূরে অবস্থান করিতেছেন।”

এই পত্রখানি ভাঁজ করিয়া এবং তাহার ভিতর অস্বীকার পুরিয়া রাজপুত্র তাহা এক জন ভৃত্যহস্তে অর্পণ করিলেন, বলিলেন, “ইহা রাজকন্তার হস্তে প্রদান কর। এই রোকা পাঠ করিবামাত্র যদি রাজকন্তা আরোগ্যলাভ না করেন, তবে তুমি আমাকে অতি অকর্মণ্য দৈবজ্ঞ বলিয়া মনে করিও।”

রাজকন্তার নিকট খোজা উপস্থিত হইয়া বলিল, “ঠাকুরাণি, কোথা হইতে একটা দৈবজ্ঞ আসিয়াছে, ভারি সাহস করিয়া বলিতেছে, আপনার বাঘি আরোগ্য করিবে। সে বলে, এই রোকা পড়িলেই আপনি সারিয়া উঠিবেন। আপনি সারিয়া না উঠিলে সে গর্দান দিবে বলিয়াছে, রোকা লউন।”



রাজকন্যা উপেক্ষায় পত্র গ্রহণ করিলেন, কিন্তু পত্র খুলিয়া অল্পরী দেখিয়াই আর পত্রপাঠের অবসর হইল না, তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাঁহার হস্ত-পদের শূন্য খুলিয়া ফেলিলেন, তাহার পর দ্রুতবেগে দ্বারদ্বিধানে অগ্রসর হইলেন। দ্বার খুলিয়াই দেখিলেন, দৈবজ্ঞ সেখানে দণ্ডায়মান হইয়া উভয়ের প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাজকন্যা দৈবজ্ঞকে যেমন দেখিলেন, অমনি আনন্দে উজ্জ্বলি করিয়া ভাবাবেশে বিবল হইয়া, দৈবজ্ঞের বক্ষে আপনার বক্ষ ভক্ত করিয়া, তাঁহার কণ্ঠে বক্তব্য রাখা করিলেন, উভয়ের বাহুগোশে উভয়ের কণ্ঠ মৃদুভাবে আবদ্ধ হইল। কেহ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, উভয়ের চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল পড়িতে লাগিল। উভয়ের চক্ষুর সম্মুখ হইতে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। কিয়ৎকাল পরে হৃদয় ধাক্কী তাঁহাদিগকে রাজকন্যার শয়নকক্ষে লইয়া চলিল; রাজকন্যা রাজপুত্রকে তাঁহার অল্পরী প্রত্যর্পণ করিলেন; উভয়ের মিলনানন্দ-মগ্নিলে বিরহ-বেদনা ধোঁত হইয়া গেল।

হৃদয় হৃৎকণে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহারাজ, অবধান করুন, এ পর্য্যন্ত যত দৈবজ্ঞ, চিকিৎসক, ভূতুড়ে আসিয়াছে, সব বেটী জুয়াড়ের, এবার যে দৈবজ্ঞ আসিয়াছেন, তিনি ষাঁট মাসের। এক রোকার জোরে রাজকন্যার সকল ব্যাধি সারাইয়া দিয়াছেন।” রাজা দ্রুতবেগে রাজকন্যার মহলে উপস্থিত হইলেন, কামারাল জামানকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া, পরে তাঁহার হস্তে রাজকন্যার হস্ত যোগ করিয়া বলিলেন, “আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখা করিলাম, তোমরা পরমহুখে আমি-জীর্ণরূপে বাস কর; কিন্তু আমার মনে হইতেছে, তুমি দৈবজ্ঞ নহ।”

রাজপুত্র হাসিয়া বলিলেন, “মহারাজ সত্যই অজ্ঞান করিয়াছেন, আমি দৈবজ্ঞ নহি বটে, কিন্তু দৈবজ্ঞ-বেশেই আমি মহাপরাক্রান্ত মহারাজার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। আমার নাম সুব্রজ কামারাল জামান, পিতার নাম সুলতান সা জামান, সুবিখ্যাত খালেদান রাজ্যের তিনি অধীশ্বর।”

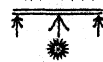
রাজপুত্র তাঁহার রাজ্যত্যাগ করিয়া চীনরাঙ্গে আপনমনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। রাজকন্যার সহিত তাঁহার প্রণয় বিরূপ হইল, তাহার ইতিহাস বতখানি জানিতেন, তাহাও বলিলেন। রাজা রাজপুত্রের কাহিনী শুনিয়া বিস্ময়গ্রস্ত হইলেন।

সেইদিনই রাজধানীতে মহাশব্দমোহে বিবাহোৎসব আরম্ভ হইল। মার্কানবানও রাজার নিকট উপস্থিত-রূপে পূরিত হইলেন।

সুব্রজ কামারাল জামান ও রাজকন্যা বেবোরার আকৃতির সৌগাণ্ড্য সকলকে বিমুগ্ধ করিয়াছিল। উভয়েই তরুণ, উভয়েই অপূর্ণ সৌন্দর্য্যের অধিকারী। যৌবন-বসন্ত উভয়ের শরীরে বিচিত্র স্রবমায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বিবাহবাসরে পরস্পর পরস্পরকে একান্তভাবে পাইয়া আনন্দে ও পুলকে রোমাঞ্চিত-ফলগ্ন হইলেন। কামারাল জামান কখনও সারীলগ্নের মধুর্য্য উপভোগ করিবার অবকাশ পান নাই। যাইশ বৎসর বয়সে বিশদভবরীয়া তরুণীর বোম্বক উপভোগ করিবার সুবিধা তিনি পূর্ণ-মাত্রায় গ্রহণ করিলেন। চীনাড়্যের রাজধানীর নিষ্ঠুর প্রাসাদ-কক্ষে মদনোৎসব আরম্ভ হইল। ব্যক্তিতাকে ব্যক্তাদেশে ধারণ করিয়া—সুব্রজ তাঁহার দীর্ঘ দিনের সুখা মিটাইতে লাগিলেন। রাজকন্যা বেবোরারও ব্যক্তিত্বের আলিঙ্গনপাশে আপনাকে নিরাসিত করিয়া দিলেন। দুইয়ের শীতলারে প্রেমের রাগিণী কনিত হইতে লাগিল।

রাজপুত্র কামারাল জামান ও রাজকন্যা বেবোরা সুখের মগ্নিলে ভাগিতে লাগিলেন, মহানন্দে উভয়ের দিবসযামিনী বেন সুহৃৎ অবলম্বন হইতে লাগিল। নব নারকের সহিত নব নব বিহারে রাজকন্যা নিজের জীবন শক্ত মনে করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের সুখের হাসি পৌঁচকের ডগার দিবাশিনি কালো মেঘের কোলে বিছাড়ের ভাষা খেলা করিতে লাগিল।

দরিত-মিলন



প্রমোদ-বেলা



আহাং-মিলনে
হৃৎস্পন্দ



এত সুখের মধ্যেও রাজপুত্র কামারাল জামান একদিন রাতে বড় দুঃখ দেখিলেন, স্বপ্নদর্শনে তিনি বড় বিচলিত ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা সা জামান মুক্তাশাখার পতিত, তিনি অশ্রু-পূর্ণচোনে বলিতেছেন, ‘বে পুত্রকে আমি পরম আমারে ও বয়ে পরিবর্তিত করিলাম, সেই পুত্রই আমার মুক্তার কারণ।’ রাজপুত্র নিজাভঙ্গে কাদিতে লাগিলেন, চক্ষু ছুটি জবাবুলের মত লাল হইয়া উঠিল। তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাসে রাজকন্ডার ঘুম ভাঙিয়া গেল। রাজকন্ডা উঠিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্বামী রোদন করিতেছেন, অশ্রুধারায় বক ভাসিয়া বাইতেছে। রাজকন্ডা মুগ্ধকি রেশমী রুমালে রাজপুত্রের চক্ষু মুছাইয়া বলিলেন, ‘প্রিয়-তম, কি হুঃখে রোদন করিতেছ, বল, তোমার কাতরতা দেখিয়া বে আমার বুক কাটিয়া গেল, তোমার অশ্রু আমার নিকট কঠোর আঘাত অপেক্ষাও কঠিন।’ রাজপুত্র রাজকন্ডাকে স্বপ্নের বিবরণ বলিলেন; ‘হায়—হায়, আমি এখন এখানে কত সুখভোগ করিতেছি, আর আমার বাবা হর ত এতক্ষণ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।’ রাজপুত্র তাঁহার জীব সহিত পরামর্শ করিয়া রাজার নিকট স্বদেশান্ত্রার প্রার্থনা জানাইলেন, কন্ডা তাঁহার পিতাকে বলিলেন, ‘পতি যেখানে, সতী সেখানে, আমাকেও আমার স্বামীর সহিত বাইবার আদেশ দান করুন।’ রাজাকে অগত্যা অহুমতি দান করিতে হইল; রাজা কেবল বলিলেন, ‘কিন্তু আমার অসুস্থরোধ, এক বৎসর পরে আবার ফিরিয়া আসিও, তোমার অর্ধশনে আমার মনে বড় কষ্ট পাইব। বৎসরকাল পরে এ কষ্ট নিবারণ করিও।’ রাজকন্ডা সন্মত হইলেন।

তখন চীনরাজ তাঁহার কন্ডাজামাতাকে বিদায়দানের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। অবশেষে যাত্রার দিন আসিল। রাজরানী অশ্রুধারায় কন্ডাজামাতাকে বিদায় দান করিলেন।

একমাসকাল পথপর্যটনের পর কামারাল জামান ও রাজকন্ডা বেদৌরা লোকজন সঙ্গে লইয়া একটি সুশ্রবণ প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; প্রবল রৌদ্র দেখিয়া তাঁহারা সেখানে শিবির সংস্থাপন করিলেন। কিরূপে শিবির সজ্জিত হইল, তাহা দেখিয়া রাজপুত্র শশিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন, রাজকন্ডা পথ শ্রান্তিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছেন। বেদৌরা স্বন্দরী একখানি স্থল রেশমী বস্ত্রে মোহাবৃত করিয়া নিজা বাইতেছিলেন। তাঁহার শীঘ্র বন্ধোদেশের আবরণবস্ত্র বায়ুলঞ্চালনে ঈষৎ অনাবৃত; কন্ডাকোরকতুল্য লোভনীর ও রমণীয় বন্ধোদেশের সৌন্দর্য্য তাঁহাকে আকৃষ্ট করিল। নিদ্রাগণা তরুণী পত্নীর সে শোভাহীনভাৱে দেখিয়া তিনি আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না। ধীরে ধীরে পত্নীর পাশে উপবিষ্ট হইয়া তিনি লুপ্ত দৃষ্টিতে রাজকন্ডাকে দেখিতে লাগিলেন। কটিদেশের স্বর্ণচিত্রিত বন্ধনীটি তিনি ধীরে ধীরে স্পর্শ করিলেন। সহসা দেখিলেন, কোমরবন্ধনীতে কি একটা সংলগ্ন রহিয়াছে। রাজপুত্র ব্যগ্রভাবে তাহা খুলিলেন, দেখিলেন, একখণ্ড পদক, তাহাতে কতকগুলি কি কথা লেখা রহিয়াছে, রাজপুত্র বিস্তর চেষ্টা করিয়াও তাহা পাঠ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, রাজকন্ডা যখন ইহা সংযত সঙ্গে রাখিয়াছেন, তখন এ পদক নিশ্চয়ই মূল্যবান। প্রকৃতপক্ষে এই কবচখানি মন্ত্রশিদ্ধ, যত দিন রাজকন্ডার নিকটে থাকিবে, তত দিন পরমসুখে দিন অতিবাহিত হইবে, এই জন্ত চীনরাজমহিষী ইহা পরমমুখে কন্ডাকে রাখিতে দিয়াছিলেন।

কবচখানিকে উত্তমরূপে পত্রীক্য করিবার জন্ত শিবিরের বাহিরে লইয়া আসিয়া রাজপুত্র বিশেষ মনোযোগ দিয়া কবচখানি দেখিতে লাগিলেন, এমন সময় হঠাৎ একটা পক্ষী কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া, রাজপুত্রের হাত হইতে কবচখানি ছেঁা মাগিয়া লইয়া গেল। রাজপুত্র পক্ষীর পচাতে ছুটিলেন, পক্ষী অনেক দূর উড়িয়া গেল। তাহার পর একটি মুক্তাশাখা বিন্দা বিস্তার করিতে লাগিল, তাহার ওষ্ঠে রাজপুত্র সেই কবচ দেখিতে পাইলেন।

রাজপুত্রকে অনুরে দেখিয়া সেই পক্ষী আবার উড়িল, রাজপুত্র পুনর্বার পক্ষীর অনুসরণ করিলেন। বহুদূরে গিয়া পক্ষী কবচখানি গ্রাস করিল, তাহার পর ক্ষতবেধে একদিকে ধাবিত হইল, রাজপুত্র প্রাণপণে তাহার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দ্রুতগতি লাগিলেন।

এইরূপে রাজপুত্র ক্রমে রাজকন্যা বেবোরার নিকট হইতে অধিক দূরে গিয়া পড়িতে লাগিলেন, রাত্রি আসিল। রাত্রিকালে পক্ষী এক উচ্চ বৃক্ষশিরে আশ্রয় লইল।

রাজপুত্র অনর্থক এত কষ্ট স্বীকার করিয়া বড়ই বিব্রত হইলেন। তিনি ক্ষতবেগে অনেক পাহাড়পর্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিলেন, কয়দিনে তাহা লঙ্ঘন করিয়া বাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন, রাজকন্যাকে যে কতদূরে ফেলিয়া আসিয়াছেন, পথ মনে নাই, কিরূপে আবার সেই স্থানে প্রত্যাবর্তন করিবেন, তাহারা তাহার বড় হুচিন্তা হইল। পথপ্রবেশে দেহ অবশ, সম্মুখে অন্ধকার রাত্রি, কেমন করিয়াই বা তিনি শূন্যহস্তে গৃহে ফিরিবেন, রাজকন্যা তাহার মহামূল্য কবচ হারাইয়াই বা কি ভাবিতেছেন, এ সকল কথা ভাবিয়া, আরও অবসর হইয়া পড়িলেন। অবশেষে ক্ষুধার—তৃষ্ণার—পরিশ্রমে অতিভূত হইয়া রাজপুত্র সেই বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইলেন।

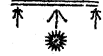
পরদিন প্রভাতে নিত্রাভঙ্গ হইলে রাজপুত্র দেখিলেন, পক্ষী বৃক্ষশাখা করিয়া চলিয়া বাইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার অনুসরণ করিলেন, এইরূপে দিবারাত্রি পক্ষীর অনুসরণে রাজপুত্রের বণ দিন কাটিয়া গেল। একাদশ দিবসে পক্ষী একটি সুবৃহৎ নগরে উড়িয়া আসিল, রাজপুত্রও তাহার অনুসরণে সেই নগরে প্রবেশ করিলেন, তাহার পর পক্ষী কোন্ দিকে গেল, রাজপুত্র তাহা দেখিতে পাইলেন না।

নিরাশহৃদয়ে রাজপুত্র নগর-প্রান্তে সমুদ্রতীরে আসিলেন এবং ঘুরিতে ঘুরিতে এক বাগানে প্রবেশ করিলেন। বাগানের মালী একটি বৃদ্ধ, রাজপুত্রকে দেখিতে



পাইবামাত্র সে ক্ষতবেগে বাগানের দ্বারদেশে আসিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিল; রাজপুত্র মালীর এ ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মালী বলিল, “এ পৌত্তলিকের বেশ, দেখিতেছি, আপনি মুসলমান। এখানে আইই একমাত্র মুসলমান। পৌত্তলিকগণ আপনাকে যদি দেখিতে পায়, তবে অবিলম্বে তাহার আপনার প্রাণবধ করিবে; আপনাকে যে তাহারা এতকণ দেখিতে পায় নাই, ইহাই আশ্চর্য্যের কথা। আল্লা যে আপনাকে এখানে আনিয়া ফেলিয়াছেন, ইহা আপনার বিশেষ শুভাহুতের কথা।”

• প্রেমিকের
পথ-ভাঙি



মালীর
আশ্রয়ে
রাজপুত্র



মালী রাজপুত্রকে বাগান হইতে তাহার বাড়ীতে লইয়া গেল। তাঁহাকে তাহার অবস্থা অল্পসারে আশ্বাস্য ব্রহ্ম প্রদান করিল, সে দেশে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

মালীকে সকল কথা বলিয়া রাজপুত্র স্বদেশে ফিরিবার পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মালী বলিল, সেখান হইতে এক বৎসরের পথ অতিক্রম করিলে তবে মুসলমানের রাজ্য পাওয়া যাইবে। পদত্রেজে অপেক্ষা সমুদ্রপথে সহজে তাঁহার পিতৃরাজ্যে তিনি উপস্থিত হইতে পারেন। প্রথমে কোন জাহাজে চড়িয়া তাঁহাকে এবনীষীপে বাইতে হইবে। সেখান হইতে কোন জাহাজে তাঁহাকে পিতৃরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের সুবিধা করিতে হইবে। মালী আরও বলিল, “যদি আপনি আর কয়েকদিন পূর্বে এখানে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে এই বৎসরে আপনি বাইতে পারিতেন; কিন্তু এক বৎসর এখান হইতে আর কোন জাহাজ বাইবে না, আপনি আমার গৃহে যদি এক বৎসর অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে আগামী বৎসর জাহাজে বাইতে পারিবেন।” রাজপুত্র মালীর উপদেশ সঙ্গত মনে করিয়া, তাহার গৃহেই বাস করিতে লাগিলেন, দিবসে বাগানে কাঁজ করেন, রাজ্যকালে মালীর জীর্ণ কুটারে শয়ন করিয়া, রাজকল্পার কথা চিন্তা করিতে করিতে অল্পখারার তাঁহার বন্ধুহুল ভাসিয়া যায়।

এখন রাজকল্পার কথা বলিব। রাজকল্পা শিবিরে শয়ন করিয়াছিলেন, রাজপুত্র যে পক্ষীর সন্ধানে নানা স্থানে ছুটিয়াছেন, তাহা তিনি জানিতেও পারিলেন না; হুতরাং নিজাতক্ষে তিনি তাঁহার স্বামীকে না দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, তাঁহার দাসীগণকে রাজপুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহ তাঁহার কথার উত্তর দিতে পারিল না। লক্ষ্য কটিকল্পার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, রক্ষাকবচখানিও নাই। রাজকল্পা ভাবিলেন, রাজপুত্র কবচপরাীকার জন্ত শিবিরের বাহিরে গিয়াছেন, শীঘ্রই তাহা লইয়া ফিরিয়া আসিবেন।

ক্রমে রাত্রি আসিল, রাজপুত্র ফিরিলেন না, ভয় ও বিষম উদ্ভয়ান্ডর বাড়িতে লাগিল। রাজকল্পা অধীরভাবে স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাত্রি যত অধিক হইল, ততই তিনি অধিক কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি এক সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

রাজপুত্র কামারাল জামান শিবির ত্যাগ করিয়াছেন, শিবিরস্থ কোন লোক এ কথা জানিত না। রাজকল্পা মনে করিলেন, সকলে যদি জানিতে পারে, তিনি একাকিনী রহিয়াছেন, তাহা হইলে তাঁহার ভৃত্যগণই হয় ত তাঁহার প্রতি কোন প্রকার অস্ত্রার আচরণ করিতে পারে; এই আশঙ্কায় তিনি তাঁহার স্বামীর পরিকল্প পরিধান করিয়া পুরুষ দাঁকিলেন। হৃদয়ে তাহাকে দেখিতে ঠিক তাঁহার স্বামীর মতই হইল। পরদিন প্রভাতে তাঁহার ভৃত্যবর্গকে শিবির তুলিয়া বাজার আরোজন করিতে বলিলেন। সকলে তাঁহার আদেশপালন করিল।

হৃদয়পথে ও অলপপথে কয়েকমাল পর্যটন করিয়া, পুরুষবেশী বেদোরা এবনীষীপে উপনীত হইলেন; এই বীপের রাজার নাম আরমানল। জাহাজ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইবামাত্র রাজকল্পার ভৃত্যবর্গ চক্ষুদিকে ঘোষণা করিল, এই জাহাজে রাজপুত্র কামারাল জামান এবনীষীপে আসিয়াছেন। এ সংবাদ যথাসময়ে রাজ-প্রাসাদেও প্রচারিত হইল।

রাজা আরমানল অমাত্যবৃন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, হৃদয়কান্তি নবীন রাজপুত্র জাহাজ হইতে তীরে নামিতেছেন। বাংলাদেশের রাজপুত্র ভাবিয়া রাজা তাঁহার বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন, এবং প্রাসাদে লইয়া চলিলেন। তিন দিন ধরিয়া রাজা আরমানল মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন।

তিন দিন পরে ছয়বেশিনী রাজকন্যা স্বদেশ-গমনের সংকল্প রাজার নিকট প্রকাশ করিলে, রাজা তাঁহাকে বলিলেন, “রাজপুত্র, আমার অনেক বয়স হইয়াছে, আর অধিক দিন আমার জীবনের আশা নাই, আমি পুত্রলাভে বঞ্চিত হইয়াছি; কিন্তু বিধাতা আমাকে একটি রূপবতী স্ত্রীবতী কন্যা দান করিয়াছেন, কন্যাটি বয়স, তুমি স্মৃতি যোগ্যপাঞ্জ, আমার ইচ্ছা, তোমার হস্তে আমার কন্যটিকে সম্ভ্রাদান করিয়া আমার উত্তরাধিকারে নিযুক্ত করি। এবশীষীপ আমার অবশ্তমানে তুমিই শাসন করিবে। পুত্র, আমার এ প্রার্থনা তুমি অগ্রাহ্য করিতে পারিবে না।”

রাজকন্যা স্বয়ং জীলোক হইয়া আর একটি জীলোককে কি করিয়া বিবাহ করিবেন, এই চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সত্য কথা খুলিয়া বলিবার উপায় নাই। এ প্রস্তাবে অসম্মত হইলে এই বিদেশে তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রু-হৃষ্ট হইতে পারে, তাহা কোনক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে, বিশেষতঃ তিনি তাঁহার স্বামীর রাজ্যে উপস্থিত হইলেই যে স্বামীর শাসক্য পাইবেন, তাহারও নিশ্চয়তা নাই; সুতরাং অনেক চিন্তায় পর বেদোয়া রাজা আরমানসের প্রস্তাবেই সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

তখন এক রাজকন্যার সহিত অত্র রাজকন্যার বিবাহের আয়োজন মহাসমারোহে চলিতে লাগিল। রাজকন্যা বেদোয়া তাঁহার অঙ্গুণ দাসীগণকে প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া তাহাদিগকে কাহারও নিকট কোন কথা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন, সুতরাং তিনি যে রাজপুত্র কামারাল জামান নহেন, কোন প্রকারে তাহা প্রকাশিত হইবার ভয় থাকিল না।

মহাসমারোহে বিবাহ হইল। নগরমধ্যে উৎসব চলিতে লাগিল। আলোক-মালায় রাজপুত্রী সমুজ্জল হইল। রাজপুত্রপত্নী বেদোয়া এবশীরাজকন্যা হারাভাল নিকুসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। উৎসব শেষ হইলে উভয়ে পরস্পরের কাছে বসিয়া প্রেমালোচন করিতে লাগিলেন। অনেককাল আলোচনের পর বেদোয়া উপাসনা আরম্ভ করিলেন, তাহাতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার এবশী-রাজকন্যা হারাভাল নিকুস হৃদয়ী নিমিত্ত হইয়া পড়িলেন। উপাসনা-শেষে বেদোয়া হারাভাল নিকুসের পার্শ্বদেশে শরন করিয়া তাঁহার শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন, তাঁহার স্বামীর বিরহে নয়নে অশ্রু বরিতে লাগিল। প্রভাতে হারাভাল নিকুসের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই তিনি গাত্রোথান করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন, এবং অমাত্য-গণের সহিত রাজকর্ম সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এই ভাবে প্রতিদিন অতিবাহিত হইতে লাগিল।

একদিন বৃদ্ধ রাজা আরমানন তাঁহার কন্যাকে দেখিতে আসিলেন; দেখিলেন, অবনতমুখী কন্যা অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। আরমানন কন্যার দুঃখে ব্যথিত হইয়া তাঁহার মনঃকষ্টের কারণ জানিতে চাহিলেন। রাজকন্যা কোন উত্তর করিলেন না বটে; কিন্তু রাজা বুঝিতে পারিলেন, জামাতা তাঁহার কন্যার প্রতি আত্মিক অহরহ প্রকাশ না করিতেই তাঁহার কন্যা এরূপ কাতর হইয়াছেন। রাজা বলিলেন, “হা, তোমার স্বামী পরম রূপবান, স্ত্রীবান, তিনি তোমার প্রতি বশ করিবেন না? অনেক দিন তিনি শিশুভাষ্যকে না দেখিয়া বোধ হয় দুঃখিত আছেন, বাহা হউক, তাঁহার মনস্ত্র বেদনা লাঘব হইলেই তিনি তোমাকে আদর করিবেন, তোমার প্রতি বধোচিত অহরহ প্রকাশ করিবেন, তুমি অধীরা হইও না।”

কোনই ফল হইল না। বেদোয়া জীব প্রতি পূর্বে বৈষ্ণব ব্যবহার করিতেছিলেন, প্রতিদিন সেইরূপই করিতে লাগিলেন, ছই একটি কথামাত্র বলিতেন, এমন কি, তাহাকে অঙ্গ স্পর্শ করিতে দিতেন না; ইহাতে রাজকন্যা হারাভাল নিকুসের অঙ্গ অলিয়া বাইত।



উচ্চ সিত

বাবেনে দান-
প্রেমের বন্ধন

হৃদয় পূর্ণ হোক, রূপবান্ স্বামী, অথক রাজকন্তা কোনও দিন নারীজন-কায়া, সঙ্গতি-উপভোগ প্রেম-
বোধের দ্বারা করিতে পারিলেন না। এ কথা বলিল। পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় অসুখী স্বামী একবারও
উচ্চৈঃস্বরে কখনো শব্দ করিয়া নিশীড়িত করেন নাই; অল্পস্বরেই কখনো কখনো কানাইরা
কেন্দ্রনিবেশ করেন নাই। কেমন করিয়া তাঁহার মত স্বামী তরুণীকে উপেক্ষা করিয়া স্বামী থাকিতে
পারেন, এখন রিপূর হৃদয়নীর প্রভাব কি এই তরুণ রাজপুত্রকে স্পর্শ করিতেই পারে না।

একদিন রাত্রিকালে রাজকন্তার সহিত দুই চারিট কথা বলিয়া বেদোরা উপাশন করিতে উঠিলেন, উপা-
শনান্তে তিনি অন্যান্য দিনের ন্যায় শয়ন করিতে গিয়াছেন, এমন সময় রাজকন্তা হারাভাল নিকট তাঁহার হাত
ধরিয়া তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। তাহার পর অল্পপূর্ণনয়নে বলিতে লাগিলেন, “প্রতিরাত্রেই তুমি আমার
সঙ্গে এইরূপ ব্যবহার কর, ইহাই কি স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যোগ্য ব্যবহার? বল, আমি কি কৃত্ত তোমার
বিশ্বপাভজন হইলাম? তোমার ন্যায় রূপবান্ শুণবান্ স্বামী লাভ করিয়াও আমি স্বামী হইতে পারিলাম
না। অন্য রমণী হইলে এতদিন তোমার এই উপেক্ষার উপযুক্ত প্রতিকূল প্রদান করিত। তোমার এই প্রকার
অসঙ্গ-অপ্রেমিকের ন্যায় ব্যবহারের কথা আমার পিতার কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছে, তিনি আজ পর্যন্ত
তোমাকে কোন কথা বলেন নাই; কিন্তু অতঃপর তোমার এরূপ ব্যবহার দেখিলে তিনি তোমাকে শাস্তি দান
করিবেন। যে তোমাকে ভালবাসে—যে তোমার অধীনা—যে তোমাকে প্রেমদান করিবার জন্য ব্যাকুল, তাহাকে
এ ভাবে কষ্ট দিয়া—তাঁহার সহিত এরূপ ছন্দহীন মত ব্যবহার করিয়া তোমার গৌরব বাড়িবে কি?”

বেদোরা কি উত্তর দিবেন, প্রথমে তাহা ভাবিয়াই পাইলেন না। তিনি স্থূললেন, তিনি প্রকৃত পরিচয়
না দিলে আর এই অভিমানিনী, কানাই রাজকন্তাকে নিরস্ত পারিবেন না। তিনি প্রকৃত পরিচয়
দিলে কি ফল হইবে, তাহাও তিনি স্থির করিতে অসমর্থ হইলেন। অনেক চিন্তার পর স্থির করিলেন,
রাজপুত্র কামরাজ জামান জীবিত থাকিলে নিশ্চয়ই এ দীপে পদার্পণ করিবেন, তাঁহার স্বদেশযাত্রার ইহাই
পথ; অতএব প্রকৃত কথা বলিয়া আপাততঃ ইহাকে শান্ত করিয়া রাখি, পরে রাজপুত্র ফিরিলে তাঁহার
সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা হয় করা যাইবে।

সুতরাং বেদোরা রাজকন্তার নিকটে বসিয়া অবনতবদনে বলিলেন, “হৃদয়, আমি আজ তোমাকে একটি
গুপ্তকথা বলিব; কিন্তু তুমি অগ্রে প্রতিজ্ঞা কর, এ কথা গোপন রাখিবে?” রাজকন্তা সন্মত হইলে, বেদোরা
তৎক্ষণাৎ বন্ধের বস্ত্র অপসারিত করিয়া হৃৎক দাড়িসবৎ অতি সুগঠিত কুচুগু অনাবৃত অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে
প্রকাশ করিলেন; কহিলেন, “তোমার ন্যায় এক জন রাজকন্তা তোমাকে প্রবঞ্চিত করিয়া যে অপরাধ করিয়াছে,
তাহা তুমি হয় ত ক্ষমা নাও করিতে পার, কিন্তু আমার সমস্ত কাহিনী শুনিলে তুমি আমাকে ক্ষমা না
করিয়া থাকিতে পারিবে না।” বেদোরা রাজকন্তার নিকট আত্মকাহিনী সন্নিবেশিত করিলেন, এবং
রাজপুত্র কামরাজ জামান সেই দীপে উপস্থিত হইলেই তাঁহার দুই সপত্নী তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন, এ
আশংসও প্রদান করিলেন। বেদোরা সাহস, প্রভূতঃপন্নমতি ও পুরুষোচিত রাজ্যপরিচালনশক্তির কথা
আলোচনা করিয়া, রাজকন্তা মুগ্ধ হইলেন, বলিলেন, “ভগিনি, আমার মনের সকল ব্যথা আজ দূর হইল,
আজ হইতে আমি তোমার সখী হইলাম, আমরা ভবিষ্যৎকালের জায় প্রাণনাথের প্রতীক্ষা করিয়া থাকি,
তিনি একদিন আসিয়া নিশ্চয়ই আমাদের কষ্ট দূর করিবেন।”

যখন এদনীতীপে এই সকল কাণ্ড চলিতেছিল, রাজপুত্র কামরাজ জামান তখনও সেই পৌত্তলিকের
দেখে দালীর সহায়তায় নিমুক্ত ছিলেন।

বক্ষাবস্ত্র
অপসারণে
বহুত প্রকাশ
ক

একদিন মালী রাজপুত্রের সঙ্গে জাহাজের গাছের সম্মুখ-ফুলে খিরাচ্ছে, রাজপুত্র একাকী বাগানে নিজের অবস্থার কথা ভিন্ধা করিতেছেন, এমন সময় দেখিলেন, একটি বৃক্ষশাখা হঠাৎ পক্ষী মহামুখ-স্বাক্ষর করিয়াছে। কামারাল জাহান বিষমস্বপ্ন দৃষ্টিতে পক্ষীরূপের বৃক্ষ দেখিতে লাগিলেন, কিরংকাল যুদ্ধের পর পক্ষীরূপের একটি নিহত হইয়া বৃক্ষশাখা হইতে ভুগুটিত হইল, অপরটি বৃক্ষপক্ষে আকাশপথে উড়িয়া গেল।

কিরংকাল পরে কোথা হইতে বৃক্ষশাখার আর দুইটি সেই জাতীয় পক্ষী সেই মৃত পক্ষীটির নিকট আসিয়া বসিয়া, কান্দনরূপে আর্জনা করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা একটি গছের ধনন করিয়া পক্ষীটির চকুপুটে ধরিয়া তাহার মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিল। তাহার পর পুনর্বার উড়িয়া গিয়া বিজয়ী পক্ষীটির ডান। ধরিয়া সেখানে লইয়া আসিল এবং ক্রমাগত চকুর আঘাতে তাহার প্রাণসংহার করিল। তাহার পর তাহার পাকাশয় বিদীর্ণ করিয়া নাতীত্ব-ভিগুণি টোটে লইয়া উড়িয়া গেল।

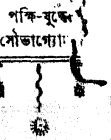
রাজপুত্র অতি বিষমস্বপ্ন দৃষ্টিতে এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন। পক্ষী উড়িয়া গেল দেখিয়া তিনি সেই বৃক্ষপুটে আসিলেন, দেখিলেন, একটি রক্তাক্ত পদার্থ অদূরে নিপতিত রহিয়াছে। রাজপুত্র ব্রহ্মিলেন, ইহা নিহত পক্ষীটির পাকাশয় পদার্থ, জিনিসটি হাতে তুলিয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে গিয়া দেখেন, আশ্চর্য্য! রাজকন্যা বেদোয়ার সেই ময়সিদ্ধি কবচ!

রাজপুত্র মহা আশ্চর্য্যের কবচখানি লইয়া নিজেদের উজ্জীবে রাখিলেন, একদিনের পর তাহার কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ হইল, তিনি রাত্রে নিশ্চিন্তমনে নিদ্রিত হইলেন, পদক প্রাপ্ত হইয়া তিনি ব্রহ্মাছিলেন, অতঃপর আর তাহাকে কষ্টভোগ করিতে হইবে না।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজপুত্র একটি শুক গাছ কাটিতে চলিলেন। এই গাছটি নিম্ন করিবার জন্য মালী তাহাকে অহরোধ করিয়া গিয়াছিল। গাছের মূলে কুঠার প্রবেশ করিতেই তন্ করিয়া শব্দ হইল, রাজপুত্র বিশেষ উৎসাহের সহিত সেই স্থানটি খুঁড়িয়া ফেলিলেন, দেখিলেন, একখানি হুহুং পিতলের চাদর, সেখানি তুলিলেই সোপানশ্রেণী দেখিতে পাওয়া গেল। রাজপুত্র সেই সোপানপথে গুহামধ্যে অবতরণ করিয়া দেখিলেন, এই গুহার স্বর্ণরেণু দ্বারা পরিপূর্ণ পক্ষাশি পিঙ্গল-নির্মিত কলস রক্ষিত। তিনি এই সম্পদরাশি সম্বলন করিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন। তাহার পর গুহামুখ বন্ধ করিয়া তিনি বৃক্ষটিকে খণ্ড খণ্ড করিলেন।

যথাসময়ে বাগানের মালী প্রত্যাগমন করিল, সে রাজপুত্রকে জানাইল, এতদীর্ঘপগামী জাহাজ সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়াছে, দুই এক দিনের মধ্যেই জাহাজ বন্দর ত্যাগ করিয়া সেই দ্বীপাভিমুখে যাত্রা করিবে। রাজপুত্র এই সংবাদে অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন, তিন দিনমধ্যে রাজপুত্র এতদীর্ঘযাত্রা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাহার পর তিনি মালীকে সেই স্বর্ণপূর্ণ কলস পক্ষাশি দেখাইয়া বলিলেন, "তুমি আমার বড় উপকার করিয়াছ, আর কি দিয়া তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? আমি এই কলসগুলি গাছ কাটিতে কাটিতে আবিষ্কার করিয়াছি, তুমি এগুলি গ্রহণ কর।" মালী বলিল, "বৎস, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, অদিক দিন বাঁচিব, সে আশা নাই, তোমাকে আমি পুত্রবৎ এই এক বৎসর পালন করিয়াছি, তুমি এখন স্বদেশ বাইতেছ, এগুলি লইয়া যাও। আল্লা তোমার স্বদেশগমন-সময়ে তোমাকে এগুলি দান করিয়াছেন, উহাতে আমার আবশ্যক নাই।"

রাজপুত্র বলিলেন, "তুমি যদি অন্ততঃ অর্ধেক ধনও গ্রহণ না কর, তাহা হইলে আমি কিছুই লইব না।" তাহার আগ্রহাভিনবে বাধ্য হইয়া মালী পচিশটি কলস গ্রহণ করিল, অবশিষ্ট পচিশটি কলস রাজপুত্র



এখন করিলেন। মালী মলিন, “কলসগুলিতে কি আছে, তাহা যদি জাহাজের লোক জানিতে পারে, তাহা হইলে ইহা অসম্ভব হইবার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। এবনীবীণে জলপাই নাই, এই কল আমার বাগানে কষ্টে আছে। তুমি কলসের মধ্যে প্রথমে স্বর্ণচূর্ণ রাখিয়া তাহার উপর জলপাই ভরিয়া কলস পূর্ণ কর, পিচি কলসী স্বর্ণচূর্ণ পক্ষাণি কলসীতে রাখিলেই ঠিক হইবে।”—রাজপুত্র কামারাল জানান এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন।

বর্তমান
দে আবার
দনে বাধা



একাকালে রাজপুত্র এই সকল কলস জাহাজে পাঠাইয়া দিলেন, তিনি বাগান ভাগ করিলেন, এমন সময় মালীর মৃত্যু হইল। লোকটি করেকদিন হইতে রোগে ভুগিতেছিল, তাহার বয়সও হইয়াছিল। রাজপুত্র জাহাজের মৃতদেহের সন্ধানতি না করিয়া জাহাজে গমন করা সন্মত বিবেচনা করিলেন না। তাহার মৃতদেহ বাগানের মধ্যে সমাহিত করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া গেল; কার্য্য সমাধা করিয়া সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া শুনিলেন, জাহাজ তাঁহার জন্ত বহুকণ অপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। রাজপুত্র হতবুদ্ধি হইয়া একাকী সমুদ্রতীরে ঠাঁড়িয়া রহিলেন, জাহাজে তাঁহার সন্ধান উঠিয়াছিল।

এই নুতন বিপৎপাতে কামারাল জানান অভ্যস্ত কাতর ও চিন্তিত হইলেন। আবার এক বৎসর পরে জাহাজ আসিলে, এই বিধর্ম্মিণিপূর্ণ দেশে তিনি এক বৎসরকাল কোথায় বাস করিবেন, তাঁহার একমাত্র হিতৈষী মালীও কালকবলে নিপতিত! অনেক চিন্তার পর রাজপুত্র পুনর্বার সেই বাগানে ফিরিয়া আর এক বৎসর অপেক্ষা করিবার সন্মত করিলেন; মালীকে তিনি যে পিচি কলস স্বর্ণচূর্ণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা তখনও সেই বাগানে ছিল, বাহাতে তাহা হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত হইতে না হয়, সেজন্ত বাগানে আসিয়া দেখুলি অতি গোপনীয় স্থানে লুকাইয়া রাখিলেন, তাহার পর পূর্ববৎ বিরহ-বেদনা সঙ্গী করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এ দিকে যে জাহাজে রাজপুত্র তাঁহার স্বর্ণচূর্ণ কলসগুলি তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাহা সুবাতাসে নির্বিঘ্নে এবনীবীণের বন্দরে আসিয়া লঙ্গর করিল। রাজকন্তা প্রাসাদদ্বারে বসিয়া প্রত্যেক জাহাজ প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেন, এই জাহাজখানি বন্দরে উপস্থিত হইলে তিনি জাহাজের পরিচয় লইবার জন্ত রাজকর্ম্মচারী প্রেরণ করিলেন। কর্ম্মচারী ছদ্মবেশিনী রাজকন্তা বেদোরার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, এ জাহাজ পৌত্তলিকের দ্বীপ হইতে আসিয়াছে, প্রতি বৎসরই এমন সময় আসে।

রহস্যের
ত সন্ধান



পৌত্তলিকের দ্বীপ হইতে জাহাজ আসিয়াছে শুনিয়া বেদোরা জাহাজের দ্রব্যসামগ্রী স্বয়ং পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে জাহাজের উপর আসিলেন। জাহাজের কাপ্তেনকে জাহাজ ও জাহাজের দ্রব্যসামগ্রী সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি এই জাহাজে সেই দ্বীপ হইতে আসিয়াছেন কি না, তাহারও সন্ধান লইলেন।

বেদোরা জলপাই বড় ভালবাসিতেন, তিনি দেখিলেন, জাহাজে অনেক জলপাই আছে, জলপাইগুলি উপযুক্ত মূল্যে তিনি কাপ্তেনের নিকট ক্রয় করিতে চাহিলেন। কাপ্তেন বলিলেন, “মহারাজ, এই জলপাই পৌত্তলিকগণের দ্বীপের এক জন সদাশ্রমের। সম্রাটর তাঁহার পণ্যদ্রব্য জাহাজে তুলিয়া দিয়া, জাহাজে আসিয়া পৌঁছিতে বিলম্ব করার আমরা তাঁহাকে না লইয়াই জাহাজ তুলিয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছি।” বেদোরা বলিলেন, “সেজন্ত এই সকল জলপাই বিক্রয়ে কোন বাধা হইতে পারে না, সম্রাটর আসিলে সে মূল্য লইবে।” বেদোরা জলপাইয়ের কলসগুলি প্রাসাদে তাঁহার কক্ষে লইয়া যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন।

রায়ে বেদোয়া রাজকন্ডা হারাতাল সিকুদের কন্ডে বাঁহবার সময় জলপাইপুণ কলসগুলি কন্ডের এক দিকে মুক্তি দেখিলেন, তিনি একটা কলস হাতে করেফট জলপাই তুলিয়া লইলেন, কলসের উত্তরের জলপাইগুলি কিছু শুক হইয়াছিল। তিতরের জলপাই ভাল আছে যনে করিয়া একটা কলস ঢালিয়া ফেলিলেন, তারার তিতর হইতে স্বর্ণচূর্ণ বাহির হইয়া পড়িল। তিনি ইহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া দাসীকে সকল কলস ঢালিতে বলিলেন, সকলগুলিতেই সমগরিমান স্বর্ণচূর্ণ দেখিতে পাওয়া গেল। একটা কলসের স্বর্ণচূর্ণের তিতর বেদোয়ার সেই সম্বন্ধিক কবচখানি সংরক্ষিত ছিল, তাহাও বাহির হইয়া পড়িল। রাজকন্ডা বেদোয়া তাহা হাতে লইয়াই মুক্তি হইয়া পড়িলেন। সকলে শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার মুক্তাকন্ডের চোটা করিতে লাগিল, লহসা তিনি এভাবে মুক্তি হইলেন কেন, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিল না।

অনেক শুভ্রাঙ্গার পর ছদ্মবেশিণী বেদোয়ার যুদ্ধভঙ্গ হইল। তিনি রাজকন্ডা হাঙ্গাতাল নিকূসের নিকটে আসিয়া তাঁহার কবচ দেখাইলেন, কবচের ইতিহাস পুঙ্খবহি তিনি বলিয়াছিলেন, হাঙ্গাতাল নিকূসকে বেদোয়া বলিলেন, “বখন কবচ পুনর্বার আমার হস্তে ফিরিয়া আসিয়াছে, তখন নিশ্চয়ই বিপদ কাটিয়া গিয়াছে, আমার শীজই রাজপুত্রকে দেখিতে পাইব,—“কামারাল জামান। কোথাগ ভূমি প্রিয়তম, তোমার বিষয়ে আমার দুই ভগিনী অধীর হইয়া দিবাশি নিদ্রা করিতেছি, তুমি শীজ আসিয়া আমাদের বিরহবেদনা দূর কর।” রাজকন্ডা হাঙ্গাতাল নিকূস বেদোয়ারকে সাধনা দান করিয়া বলিলেন, “ভগিনী, আশ্বেপ ভাগ কর, আমাদের দুঃখের নিশা। শীজই অবসান হইবে।” পরদিন প্রভাতে বেদোয়া জাহাজের কাপ্তেনকে তলব দিলেন। কাপ্তেন আসিলে বেদোয়া তাঁহাকে বলিলেন, “তুমি যে মহাজনকে ফেলিয়া আসিয়াছ বলিতেছ, সেই মহাজনের বিশেষ পরিচয় যদি অবগত থাক, তাহা জ্ঞাপন কর।”

কাপ্তেন বলিলেন, “মহারাজ, আমি সেই সদাগরের বিশেষ পরিচয় অবগত নহি, আমি এক জন মালীর কাছে শুনিয়াছি, সদাগর সেই মালীর সহিত এক বাগানে কাজ করে, মালীর কথাতাই আমি তাঁকে জাহাজে আনিতে সম্মত হই, মালীই তাহার কথা আমাকে বলে, আমি স্বচক্ষে সেই সদাগরকে দেখি নাই, তাহার জাহাজে পৌঁছিবার পূর্বে আমি তাহার মাল পাইয়াছিলাম।”

রাজকন্যা বলিলেন, "তুমি আজই জাহাজ খুলিয়া সেই দীপাভিমুখে যাত্রা কর। সেই সন্ধ্যায়কে লইয়া অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হইবে, সেই সন্ধ্যায় আমার নিকট নথী। যদি তুমি তাহাকে এখানে হাজির করিতে না পার, তাহা হইলে তোমার জাহাজ ও জাহাজের দ্রব্যসকল রাজসরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়া হইবে। তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইবে। তোমার জাহাজে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী আছে, তাহা আমার আদেশে রাজভাণ্ডারে রক্ষিত হইবে, সেই সন্ধ্যায়কে আমার নিকট উপস্থিত করিয়া তুমি তোমার জিনিস বুঝিয়া লইয়া যাইবে।"

কাপ্তেনকে অগত্যা এই আদেশ অনুসারে পৌত্তলিকের দ্বীপে যাত্রা করিতে হইল। সেই দিনই তিনি জাহাজ খুলিয়া দিলেন, জাহাজস্থ পণ্যত্রয়সমক্ৰ এম্বনীদ্বীপের রাষ্ট্রভাণ্ডার জমা রহিল।

এক দিন রাত্রিতে জাহাঙ্গ পৌলিকের দ্বীপের নিকট উপস্থিত হইল। কাপ্তেন জাহাঙ্গখান সমুদ্রতীর হইতে দূরে রাত্রিয়া একখানি নৌকারোহণে কুলে উঠিলেন, এবং কামারাল জামান যে বাগানে কাজ করিতেন, সেই বাগানে ছয়জন খালানী লইয়া উপস্থিত হইলেন।

রাজপুত্র তখনও নিখিত হন নাই, এই নিরীক্ষান হইতে কত দিনে উদ্ধার পাইবন, কত দিনে প্রিয়তমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে, চক্ষু মুদিরা তিনি এই সকল কথা চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বাগানের দরজায় কে করাঘাত করিল।

রাজপুত্র সবিস্ময়ে দ্বার খুলিয়া মিলেন, বিশ্বয়ের কারণ—তত রাজিতে কোন ব্যক্তি কখনও সেই বাগানে আসিত না। রাজপুত্র দ্বার উন্মোচিত করিবামাত্র ছদ্মজন খালাসী চক্ৰ নিমিষে তাঁহাকে ধরিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, তাঁহার দ্বার তাঁহাকে মুক্ত বহন করিয়া নৌকার গহইরা চলিল। অবশেষে তাঁহাকে জাহাজে উত্তোলন হইল। জাহাজে উঠিয়া রাজপুত্র কাপ্তেনকে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার প্রতি এই বিচিত্র দরবারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কাপ্তেন বলিলেন, “তুমি এবনীশীপের রাজার নিকট গুণী আছ, তাঁহার গুণ পরিচোধ কর না কেন?” “এবনীশীপের রাজার নিকট আমি গুণী? কি অসম্ভব কথা আপনি বলেন! আমি তাঁহাকে চিনি না, তাঁহার রাজ্যও কখন বাই নাই, তাঁহার সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই।”

প্রব্রাস্ত
বন্দী



সবিস্ময়ে রাজপুত্র এই কথা বলিলেন। কাপ্তেন বলিলেন, “তুমি সত্যবাদী। যাহা হউক, সত্য-মিথ্যার বিচার রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া করিও, আমি তোমাকে ধরিয়া গহইয়া বাইবার জন্ত আদেশ পাইয়াছি, তোমাকে ধরিয়া গহইয়া বাইতেছি। যত দিন দেখানে উপস্থিত না হও, তত দিন জাহাজে স্থির হইয়া থাক।”

জাহাজ পুনরায় নিকিষে এবনীশীপে উপস্থিত হইল। কাপ্তেন সেই রাজিতেই বেদোরার নিকট তাঁহার আগমনসংবাদ প্রেরণ করিলেন; বেদোরা যখনই শুনিলেন, মালীকে বাঁধিয়া আনা হইয়াছে, তখনই তিনি মালীকে রাজপ্রাসাদে উপস্থিত করিবার জন্ত আদেশ প্রদান করিলেন। কামারাল জামান মালীর পরিচ্ছদেই ছদ্মবেশিনী বেদোরার সম্মুখে নীত হইলেন। বেদোরা প্রিয়ভ্রমকে দেখিয়াই চিনিতে পারিলেন, রাজপুত্রের দরবারেই তিনি সন্মুখী-কুলসৌরভিণীর দ্বার বিপণিত হইল, নরেন অশ্রু সঞ্চিত হইল, দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া, এক জন কর্মচারীর প্রতি আদেশ করিলেন, “এই বন্দীকে গহইয়া তোমার রক্ষণার্থে রাখিবে এবং যাহাতে ইহার প্রতি কোনপ্রকার অযত্ন না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ নৃষ্টি রাখিবে।” বেদোরা রাজ্যের সকল কার্য করিতে, বৃদ্ধ রাজা তাঁহার হস্তে সকল ভার সমর্পণ করিয়া রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বেদোরা অবিলম্বে রাজকন্ডার নিকট উপস্থিত হইয়া, প্রাণাধিকার আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। শুনিয়া, এবনীরাজকন্ডা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন, বেদোরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন তাঁহার সহিত মিলনের উপায় কি?” বেদোরা বলিলেন, “ভগিনি, সে কথা কি আর আমি ভাবি নাই? তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে আশ্রিত-পাশে বদ্ধ করিবার জন্ত আমার প্রাণ বাহুল হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সকল নিকৃষ্ট চিন্তা করিয়া আমি তাহা করিতে পারি নাই। আমার স্বামী এ রাজ্যে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, অপরিচিত ব্যক্তি, তাঁহার পরিচানে এখনও মালীর সেই জীব পরিচ্ছদ রহিয়াছে, আমি এখন হঠাৎ স্বামী বলিয়া বা বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহাতে রাজমর্যাদার আঘাত লাগিতে পারে।”

বলম্বীর
চরণতলে
প্রণয়ী



পরদিন প্রভাতে বেদোরা এবনীশীপের রাজার পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া, রাজসভার উপস্থিত হইলেন এবং কামারাল জামানকে দান করাইয়া, আমীরের পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া, তাঁহাকে দরবারে আনিতে আদেশ করিলেন। কামারাল জামানের রূপ ও পরিচ্ছদ দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল।

তখন বেদোরা রাজ-অমাত্য ও সভাসদগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “মন্ত্রিগণ, আজ আমি ধীহাকে আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি, ইনি কামারাল জামান, ইনি আমার সহযোগিণী করিবার সম্পূর্ণ যোগ্যপাত্র। ইহার সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে, আমি আশা করি, আপনারা ইহার কার্য্য-নৈপুণ্য ও বুদ্ধি-কৌশলে যৎপরোনাস্তি প্রীতলাভ করিবেন।”

এই আদেশ শ্রবণে কামারাল জামানও অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করিলেন, তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। এবনীরাজ কিরূপে তাঁহার নাম অবগত হইলেন, তাহাও তাঁহার বোধগম্য হইল না। তিনি রাজচরণে নিপতিত

হইয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহার উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের
ক্ষমতা আমার নাই; আমার প্রতি আপনার নম্রা অসীম; আশা করি, আমি ইহার আযোগ্য হইব না।”

পুরুষবেশী বেদৌরাকে কামারাল জামান চিনিতে পারেন নাই। কিন্তু দিন দিন রাজার অহুগ্রহের
নিদর্শন পাইয়া কামারাল জামান অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এইরূপ অহেতুক অহুগ্রহের কারণ
খাতিয়ে পড়েন? এক দিন কামারাল জামান নিভৃত্তে রাজবেশী বেদৌরাকে সম্মুখি
বলিলেন, “মহারাজ! আমার প্রতি এরূপ অহুগ্রহ-প্রকাশের কোনও হেতু আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমি এত

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি।” বেদৌরা মুহু হাসিয়া বলিলেন, “আপনার অপূর্ণ রূপলাবণ্যে আমি মোহিত
হইয়াছি। এমন রূপ আমি আর কোনও পুরুষের দেহে দেখি নাই, এজন্য আমি রাজা হইলেও
আপনার প্রেমে আমার সমস্ত

দেহ ও মন আচ্ছন্ন ও অভিভূত
হইয়া পড়িয়াছে। আপনি যদি
আপনার দেহকে আমার কাছে
উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে
আপনাকে আরও অধিক ঐশ্বর্য্য
ও সম্মানের অধিকারী করিব।”

এই কথা শুনিয়া কামারাল
জামান অতিমাত্রায় বিস্মিত হই-
লেন। অবশ্য এই তরুণ নরপতি
তাঁহার অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ, তাঁহার
রূপ-লাবণ্যও অসাধারণ, কিন্তু
রাজার মনে এই প্রকার অবৈধ
স্বাধীন বীজ নিহিত আছে
দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন।
তাঁহার মনে একটা ঘৃণার
সঞ্চার হইল। তিনি রাজাকে
বলিলেন যে, “এবশ্যকার অবৈধ
কার্য্যে তাঁহার বিন্দুমাত্র স্বেচ্ছা
নাই। বিশেষতঃ বাঁহাঙ্গ প্রদান



ছদ্ম-
বেশিনী
প্রণয়ী
পত্নী

তরুণী স্বামী পত্নী বিতর্কিত, তাঁহার পক্ষে এই প্রকার অস্বাভাবিক অভিলাষ অনৈসর্গিক এবং স্বপ্নীয়।”

রাজবেশী বেদৌরা নানা বুদ্ধিজাল্যের অবতারণা করিয়া, কামারাল জামানকে প্রেম নিবেদন করিলেন।
অবশেষে রাজপুত্র তরুণ রাজার নির্দোষভিলাষে স্বীকৃত হইলেন। কামারাল জামান শরন-সন্ধির প্রবেশ
করিবামাত্র, বেদৌরা স্বয়ং কক্ষ করিয়া দিলেন। পরে মন্ত্রনিক কবচখানি বাহির করিয়া বেদৌরা বলিলেন, “এক
জন বৈদ্য আমাকে এই পদকখানি প্রদান করিয়াছেন, আপনি সর্ববিভাগ পারদর্শী, এই পদকের কি
শক্তি আমাকে বলুন।” কামারাল জামান পদক দেখিয়াই আনন্দে অভিভূত হইলেন, অতি কষ্টে আশ্বাসবরণ

করিয়া বলিলেন, “এই পদকের গুণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন?—এই পদক আমাকে চিরজীবী করি-
য়াছে, এই পদক আমার প্রিয়তমা বেদোয়ার ছিল, আমিই ইহা হারাই, সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই চিরপ্রেমময়
সুন্দরী-কন্যার, শেষ গুণবতী ভাৰ্য্যাকে পর্যন্ত হারাইয়াছি, দেশে দেশে তাঁহারই সন্ধানে কাঁদিয়া
বেড়াইতেছি। যদি তাঁহাকে শীঘ্র না পাই, আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমার ইতিহাস বড়ই অদ্ভুত,
তুলিলে আপনার জন্ম সমবেদনায় পূর্ণ হইবে।”

—ছদ্মবেশী বেদোয়া বলিলেন, “আপনি আপনার চুখের কাহিনী সমস্তান্তরে বলিতে পারেন, আমি
ইহার সহস্কে যে কথা অবগত আছি, তাহা আপনাকে এখনই বলিতেছি, আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন।”

বেদোয়া একটি গুপ্তকক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিচ্ছদ ও পাগড়ী পরিত্যাগ করিলেন, ছদ্মবেশ ত্যাগ
করিয়া তাঁহার নিজের বেশে সজ্জিত হইলেন।—যে বেশ কামারাল জামান তাঁহাকে শিবিরে ত্যাগ করিয়া
কবচের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছিলেন, ইহা সেই বেশ। রাজকন্তা বেদোয়া কামারাল জামানের সম্মুখে সেই
বেশে উপস্থিত হইলেন।

কাজিত
পনের চুখন
উচ্চাস
↑ ↓

কামারাল জামান তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রিয়তমা বেদোয়াকে চিনিতে পারিলেন, ক্রত উঠিয়া আলিঙ্গনপাশে
তাঁহাকে আবদ্ধ করিলেন। ক্ষণকাল পরস্পর আত্মবিস্মৃত হইলেন, তাহার পর চুখনের উচ্ছ্বসিত বক্তা প্রশমিত
হইলে বেদোয়া সুন্দরী মধুর হাসি হাসিয়া বলিলেন, “আর আমাকে রাজা দেখিতে পাইবে না, আমি এত দিন
তোমার ছদ্মবেশে তোমার প্রতিনিধিত্ব করিয়াছি, এখন তুমি আসিয়াছ, আমি আমার প্রকৃত রূপ গ্রহণ
করিলাম।”—রাজকন্তা বেদোয়া সকল কথা তাঁহার প্রিয়তম স্বামীর কর্ণগোচর করিলেন। কামারাল জামানও
পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর যে সকল যন্ত্রণাভোগ করিয়াছেন, তাহা বিস্তারিতরূপে
বেদোয়াকে বলিলেন।

দীর্ঘকাল বিশ্রামের পর স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে বন্ধে ধারণ করিয়া অপূর্ণ তৃপ্তি ও আনন্দ লাভ
করিলেন। সমগ্র রজনী তাঁহারা নিজাপ্ত নেত্রে প্রেমদেবতার ধ্যানে যাপন করিলেন।

পরদিন মহাসমারোহে দরবার বলিল। সে দরবারে রাজ্যের প্রধান লোক সকলেই উপস্থিত হইলেন। রাজকন্তা
বেদোয়া বৃদ্ধ রাজাকেও দরবারস্থলে উপস্থিত হইবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাজা দরবারে আসনগ্রহণ
করিলে, সকলে সন্নিহয়ে দেখিল, দরবারস্থলে অন্তঃপুর হইতে একটি রমণী—সম্পূর্ণ অপরিচিতা—এবং একটি পুরুষ
আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এই পুরুষট নূতন প্রধান সচিব, তাহাও সকলে বুঝিতে পারিল; কিন্তু এ সুন্দরী কে?
কেনই বা তিনি রাজসভার?—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই বেদোয়া সম্ভাষ হইয়া, সকলের বিস্ময় অপনোদনের জন্ত
তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাজকন্তা বেদোয়ার অসাধারণ বুদ্ধি ও সাহসের পরিচয় পাইয়া
সকলে ধস্তাধস্ত করিতে লাগিল।—বেদোয়া অবশেষে বৃদ্ধ রাজাকে তাঁহার কন্ডার সহিত কামারাল জামানের
বিবাহপ্রদানের জন্ত অনুরোধ করিলেন। এ বিবাহে যে রাজকন্ডার সম্মতি আছে—তাহাও তিনি রাজাকে
জানাইলেন। রাজা আনন্দে সম্মতি দান করিলেন। রাজা সাহসে রাজপুত্র কামারাল জামানকে রাজসিংহাসনে
বসাইয়া রাজ্যভার প্রদান করিলেন। রাজকন্ডার সহিত সেই দিনই তাঁহার বিবাহ-উৎসব সুসম্পন্ন হইল।

অতঃপর কামারাল জামান উত্তর পত্নী লাভ করিয়া বিশেষ সুখী হইলেন। বিশেষতঃ অনাজাতা ভবনী
সুন্দরী হায়াতাল নিকুসের আলিঙ্গনপাশে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়া, কামারাল জামান বিচিত্রব্রহ্ম অঙ্কতব
করিতে লাগিলেন। হায়াতাল নিকুসও কামারাল জামানের মত স্বামী পাইয়া, তাঁহার যৌবন-কামনা
চরিতার্থ করিতে লাগিলেন।

সুন্দরী
হায়াগোপন-
চাতুরী
↑ ↓

সপত্নীষর পরস্পরকে ভগিনীভাবে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। প্রেম-মিলনে তাঁহাদের মনস্তর ঘনীভূত না। কামারাল জামানও উভয়কে সমান সোহাগ ও আদর করিতেন। রাজীষর স্বামি-প্রেমের পরস্পরের প্রতি সর্বাধিক হওয়া দূরের কথা—বরং এক জনের স্বামি-সোহাগ সন্দর্শনে অপর যথেষ্ট প্রীতি উপভোগ করিতেন।

এক বৎসর পরে কামারাল জামানের ঔরসে ও ছই রাণীর গর্ভে দুইটি সন্তান পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কামারাল জামান পুত্রের জন্মে রাজ্যে মহোৎসবের আদেশ প্রদান করিলেন। বেদোয়ার গর্ভেও শিশুর জন্ম হইল, তাহার নাম হইল ‘আমজাদ’ অর্থাৎ পরম গৌরবান্বিত। রাজী হারাতাল নিকুশের গর্ভস্থ সন্তানের নাম রহিল ‘আসাদ’ অর্থাৎ পরম স্বর্ষী।

আমজাদ ও আসাদের জীবনী বলিবার জন্য দিনারজাদী তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভগিনীকে অহুরোধ করিলে, শাহারজাদী স্ত্রীতানের অমুখ্য লাভ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।—



রাজপুত্রের বড় যত্নে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। এক জন অতি উচ্চশিক্ষিত মোলবী তাহাদের শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। কামারাল জামান তাহাদিগকে যে যে বিজ্ঞার হুনিপুণ করিতে চাহিলেন, তাহাদিগকে সেই সকল বিজ্ঞা শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল।

উনবিংশ বৎসর বয়সে রাজপুত্রের একরূপ ঘোষণা লাভ করিলেন যে, রাজা তাহাদিগকে মন্ত্রিলভ্যার আস্থান করিরা মধ্যে মধ্যে রাজকাব্যে তাহাদের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। রাজপুত্রের পরস্পরের সহিত অবিচলিত প্রণয়, একত্র শয়ন, উপবেশন, আহার ও বিপ্রাণ। রাজীষর উভয়েই নিজের পুত্র অপেক্ষা সপত্নীপুত্রকে অধিক ভালবাসিতেন।

প্রথমে তাঁহার মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার পরস্পরের প্রতি যৎপরোনাস্তি অমুরক্ত। বলিয়া, পুত্রগণকেও এই প্রকার স্নেহ করিয়া থাকেন; কিন্তু কিছুদিন পরেই রাজীষর স্ব স্ব ছনয়ের প্রকৃত তাব বৃত্তিতে পারিলেন, দেখিলেন, সপত্নী-পুত্রের প্রতি যে স্নেহ, তাহা পুত্রস্নেহ নহে, তাহা স্নেহভীর প্রণয়ে পরিণত হইয়াছে। সে প্রণয়ের নেশা ত্যাগ করা উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব হইয়া উঠিল। তাঁহার আশ্বাসবরণ করিতে সমর্থ হইলেন না, প্রণয়ের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন। কিন্তু জননীষরের এইরূপ পাপপ্রবৃত্তি সন্দেহে সুবরাজ আমজাদ কিছা আসাদের মনে কোন প্রকার সন্দেহ স্থান পাইল না। তাঁহার নির্বিকার-ভাবে স্ব স্ব জননীর সপত্নীকে তাঁহার নিজের মাতার মতই দেখিতে লাগিলেন।

রাজা কিছুদিনের জন্য সুগমায় যাত্রা করিলেন; ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট অবসর মনে করিয়া রাজীষর, পুত্র লিপিগ্ন স্ব স্ব সপত্নীপুত্রের নিকট মনোভাব প্রকাশের সংকল্প স্থির করিলেন। কিন্তু পরস্পরের নিকট তাঁহার সোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

সুবরাজ আমজাদ এক দিন দরবারে বলিয়া বিচার করিতেছিলেন, দরবার-ভঙ্গে তিনি প্রাসাদে প্রত্যাপনকালে এক জন খোজা ভৃত্যের নিকট বিমাতার প্রেরিত প্রেমলিপি প্রাপ্ত হইলেন। পত্র পাঠ করিয়াই আমজাদ স্তম্ভিত হইলেন, তিনি গর্জন করিয়া খোজাকে বলিলেন, “রে পাশিষ্ট, এইরূপে তুই তোর প্রভুর কার্য্য সম্পন্ন করিস?” তাহার পর কোবহিত ভরবারির এক আশাতে খোজার মস্তক বিবাহিত করিয়া, ফেলিলেন।

রাজপুত্র
আম-
জাদ ও
আম-
জাদ
দেহ
কাঁচিয়া



প্রণয়ের নেশা



শিক্ষণ করিয়া ঘোড়া ধরিবার জন্ত ছুটিলেন। অল্প ক্রমে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল, এবং ঘন ঘন চীৎকার করিতে লাগিল।

বনমধ্যে বৃক্ষতলে একটি সিংহ নিদ্রিত ছিল, অশ্বের চীৎকারে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, এবং সে অশ্বের উপর নিশ্চিত হইবার জন্ত ধাবিত হইল; কিন্তু সমুখেই জিয়ন্নারকে দেখিতে পাইল, তখন সে অশ্বকে পরিত্যাগ করিয়া জিয়ন্নারকে আক্রমণের জন্ত ছুটিল। জিয়ন্নার তখন প্রাণ-রক্ষার জন্ত ব্যাকুল হইয়া, অশ্বের অহরণ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি সিংহের লক্ষ্যভেদে হইলেন না, সিংহ-ভয়ে কম্পমান হইয়া তিনি ভাবিলেন, নির্দোষকে এ ভাবে দগ্ধিত করিতে আশাতেই আশা আমাকে এ ভাবে নিপীড়িত করিতেছেন, আত্মরক্ষা করি, তাহারও উপায় নাই, তরবারিখানি পর্যন্ত ফেলিয়া আসিয়াছি।”

গাছের অত-
ত আক্রমণ

জিয়ন্নার রাজপুত্রবধূর নিকট হইতে অন্তর্হিত হইলে, রাজপুত্রেরা ভয়ানক পিপাসা বোধ করিলেন। আমজাদ বলিলেন, “ভাই, আমার বোধ হইতেছে, অতি নিকটেই কোন নিব্বা আছে, চল, আমার পিপাসা নিবৃত্ত করিয়া আসি।” আসাদ বলিলেন, “ভাই, আর অল্পক্ষণমাত্র আমাদের জীবন আছে, পিপাসার তড়ানার আর কাতর হইয়া কি ফল?” আমজাদ হস্তের বন্ধন মোচন করিয়া জলের সন্ধানে ধাবিত হইয়াছেন, এমন সময় দূরে জিয়ন্নারের আর্ন্তনাদ শুনিতে পাইলেন। তিনি বলিলেন, “ভাই আসাদ, জিয়ন্নার বনমধ্যে কোন প্রকার বিপদে পড়িয়াছে, তাহার উদ্ধার আমাদের প্রধান কর্তব্য, চল, অগ্রে তাহার প্রাণরক্ষা করিয়া আসি।”

সিংহ জিয়ন্নারকে ভূপাতিত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিবে, ঠিক সেই সময়ে, আমজাদ ও আসাদ তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তরবারির এক আঘাতে সিংহের মুণ্ড দেহচ্যুত করিলেন।

জিয়ন্নার সিংহ-কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া, আমজাদ ও আসাদের পদতলে নিশ্চিত হইলেন, এবং কাতরবাক্যে বলিলেন, “রাজপুত্র, এই উপকারের পর আমি কোন প্রকারে আপনাদের প্রাণহরণ করিতে পারিব না। আপনারা মনে করিবেন না যে, জিয়ন্নার প্রাণহত্যার প্রাণ হরণ করিবে, আমি এরূপ নরাধম নহি।”

আমজাদ ও আসাদ তাঁহাকে তাহার কর্তব্য-সম্পাদনের জন্ত বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু জিয়ন্নার সে কথা কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন, “আপনাদের নিকট আমার এক প্রার্থনা আছে, আপনারা আপনাদিগের পরিচ্ছদ আমার হস্তে প্রদান করিয়া অবিলম্বে এ স্থান হইতে প্রস্থান করুন, এ রাজ্যে আর কখনও প্রবেশ করিবেন না।”

গাছের
ভূপকার

অগত্যা রাজপুত্রবধূকে এই প্রস্তাবেই স্বীকৃত হইতে হইল। তাঁহারা তাঁহাদের বস্ত্রাদি জিয়ন্নারের হস্তে প্রদান করিয়া অরণ্যপথে রাজ্যান্তরে পলায়ন করিলেন; আবার রাজার কাছে ফিরিয়া আসিলেন।

এবনীরাজ্যের রাজার নিকট প্রত্যাপনময়ের সময় আবার জিয়ন্নার নিহত সিংহের রক্তে রাজকুমারবধূর পরিচ্ছদ রঞ্জিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন; রাজাকে তাহা দেখাইয়া বলিলেন, “মহারাজ, এই দেখুন, রাজপুত্রবধূর শিরচ্ছেদন করিয়া, তাহার নিলম্বন লইয়া আসিয়াছি। আপনারা পুত্রবধূ বুড়াকালে কিছুমাত্র বিলাপ বা অধীরতা প্রকাশ করেন নাই, কেবল বলিয়াছেন, তাঁহারা বিনা অপরাধে নিহত হইলেন, কিন্তু আপনি প্রকৃত কথা জানেন না বলিয়াই এরূপ হইয়াছে, এ জন্ত তাঁহারা আপনাকে কমা করিয়াছেন।”



THE END OF THE WORLD

101

রাজা পূজারের নৃত্য-কাহিনী প্রবণ করিয়া অভ্যস্ত বিবর হইলেন, কিন্তু কোন কথা না বলিয়াই তাঁহারের পরিচ্ছদ গ্রহণ করিলেন, পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিতে করিতে আনন্দের পরিচ্ছদের পকেটে রাজী হারাতাল নিহুসের প্রেম-পত্র দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া তিনি কোপে কোপে হকার মিয়া উঠিলেন। তাহার পর আশ্বাসের পরিচ্ছদ পরীক্ষা করিতে মিয়া রাজী বেদোয়ার প্রেম-লিপি বাহির হইয়া পড়িল;—দেখিয়া রাজা আর আশ্বাসের প্রেম করিতে পারিলেন না—সেই হানেই দুঃখিত হইয়া পড়িলেন।

দুঃখ-ভরে কানারান আরান একবারে পোক কোমে অধীর হইয়া পড়িলেন; তিনি কখন-ওরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, 'আশ্বাসের প্রেমের তাঁহার জ্বর বড় হইতে লাগিল। তাহার পর বলিলেন, 'স্বীকারিত প্রীতি জ্ঞানাবি আমার যে বুণা ছিল, তাহা দূরীভূত করিবার জন্যই আমা আনাকে এই শান্তি লাম করিলেন,—রে শিপাচিনীপন, আমি তোদের রক্তপাতে এ হস্ত কলঙ্কিত করিব না, তোরা আমার কোষের উপরুহ নহিস। যদি আমি আর কখনও তোদের মুখদর্শন করি, তবে আরা বেন আমাকে আহ্বানে পারি।'

রাজা রাগিয়াকে দুইট পৃথক্ কারাগারে বন্দি করিয়া রাখিলেন, জীবনে আর তাঁহারের মুখদর্শন করিলেন না।

এ দিকে রাজপুত্রের অরপায় তিতর মিয়া চলিতে লাগিলেন; কুখার বনফল ভোজন করেন, শিপাগার নির্বরেয় জল পান করেন, রাত্রিকালে আরণ্য জন্তর আক্রমণ হইতে আশ্রয়কার জন্ত বৃক্ষশাখা আরোহণ করিয়া অস্ত্রধার প্রবণ করেন। এই ভাবে এক মাসকাল চলিয়া তাঁহার একটি অতি-উচ্চ-পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন, দিকট কোথাও জনমানবের গৃহ নাই, ঘোর কলংকর্ণ পর্বত, অতি দুর্গম। অনেক চেষ্টায় তাঁহার একটি ক্ষুদ্র গিরিগণ আবিষ্কার করিলেন; সেই গণ মিয়া তাঁহার পাহাড়ে উঠিতে লাগিলেন। জনৈক পথ অধিক দুর্গম হইতে লাগিল, তাঁহার প্রত্যাপননের সঙ্কল্প করিলেন। অভ্যস্ত পরিশ্রান্ত হইয়া একস্থানে উপবেশন করিলেন। অবশেষে কিংকাল বিশ্রামের পর দেহে পুনরায় বল পাইলে আবার চলিতে লাগিলেন।

সমস্ত দিন চলিলেন, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার বিদ্যে অবদানের পূর্বে পর্বতের শৃঙ্গ আরোহণ করিতে পারিলেন না। রাত্রি হইল। রাজপুত্র আসাদই বেনী কাতর হইয়া পড়িলেন, তিনি আনন্দের বসিলেন, 'ভাই, আর ত' চলিতে পারি না, আমাকে এখানেই বৃষ্টি মরিতে হয়।'—আনন্দের বসিলেন, 'ভাই, বিপদে অধীর হইও না, তোমার বতকণ ইচ্ছা এখানেই বিশ্রাম করি, আবার দুঃখ হইয়া চলিতে আরম্ভ করিব, আমাদিগকে আর অধিক দূর উঠিতে হইবে না, আর অল্প পথই থাকি আছে, চেষ্টা-কিয়ণে আমরা পথ দেখিয়া চলিতে পারিব।'

প্রায় আশ বস্তা বিশ্রাম করিয়া, উভয় জাত পুনরায় উঠিলেন, কিছু দূরে একটি গাছ ছিল, নিকটে আসিয়া দেখিলেন, একটি দাড়িহস্তক, দুগল কলংকর্ণ বৃক্ষটি বেন ডাঙ্গিয়া পড়িতেছে, বৃক্ষের পদতলে একটি ক্ষুদ্র হ্রদকলজাবিনী নিহুসিত, মিরি-উপত্যকা হইতে উপত্যাকাত্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। আনন্দের আসাদ উভয়ে উদর পূর্ণ তরিত-রাগিধ-রস পান করিলেন, তাহার পর নির্বর-গলিলে শিপাগা নিবারণ করিলেন। তাঁহারের সেই বৃক্ষস্থলেই মিয়া আসিল। তত উচ্চ পর্বতে কোন হিংস্র জন্ত ছিল না, হস্তার নিয়ামে স্থানি কটিল।

পরদিন প্রত্যতে উভয়ে উঠিলেন। অল্প দূরে হইলে তাঁহার পর্বত-শিখরাভিমুখে বাত্মা করিলেন, প্রায়দেয়ে উপনীত হইয়া, প্রমশান্তির জন্ত দেখিলেন তিন দিন তাঁহার বিশ্রাম করিলেন, তাহার পর

রাজা
বন্দি



রাজপুত্রের
নিরুদ্দেশ-বাস।



তাহার অত্যাচার করিতে লাগিলেন। অবতরণ করিতে তাহাদের পূর্ববৎ পরিশ্রম হইল না। পাঁচ মিলে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইলেন। অবশেষে তাহার একটি সুবৃহৎ নগরের দক্ষিণে উপস্থিত হইলেন। আমদাদ আসাদকে বলিলেন, “ভাই, তুমি এ প্রান্তরে অপেক্ষা কর, আমি নগরে ঘুরিয়া দেখিয়া আসি, এ কোন রাজ্য, লোকগণ কিরূপ, আর কোন ভাল খাজনাবা পাওয়া যায় কি না, আমাদের দুজনেরই একত্র বাণিজ্য সম্ভব নয়; কারণ, যদি ইহা কোন শত্রু-রাজ্য হয়, তাহা হইলে উভয়েরই বিপদে পড়িব, দুজন অপেক্ষা একজন বিপন্ন হওয়া ভাল।” আসাদ বলিলেন, “একজনের এখানে থাকা ভাল বটে; কিন্তু যদি বিপদ হয়, তবে আপনাই হইবে কেন? আমার হউক, আপনি এখানে থাকুন, আমিই নগরে যাই।”

সড়কে
বালকুমার



আমদাদ প্রথমে তাহাতে সম্মত হইলেন না। কিন্তু আসাদের লীড়াপীড়িতে অবশেষে তাহার সন্মত হইতে হইল। তিনি এক বৃক্ষতলে বসিয়া রহিলেন। আসাদ কিছু টাকাকড়ি সঙ্গে লইয়া নগরভিত্তি মধ্যে যাত্রা করিলেন।

নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই তিনি পথের ধারে একটি বৃক্ষকে দেখিতে পাইলেন; বৃক্ষ দেখিয়া মনে প্রকা হই, তাহার হস্ত একগাছি বেত। আসাদ বুঝিলেন, এ লোক কখনও তাহাকে মিথ্যা কথা বলিবে না, তাই তিনি বৃক্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়, আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দিন, কোন পথে রাজ্যের বাইব?”

বৃক্ষ বলিলেন, “বৎস, তোমাকে বিদেশী লোক বোধ হইতেছে, নতুবা তুমি কখন আমার কাছে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে না।”—রাজপুত্র বলিলেন, “আপনি সত্যই অহুমান করিয়াছেন, আমি এখানে আর কখন আসি নাই।” বৃক্ষ বলিলেন, “রাজ্যের তোমার কি আবশ্যক?” রাজপুত্র বলিলেন, “হুই আস হইতে আমরা দেশশ্রমণ বাহির হইয়াছি। গতকলা এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আমার ভ্রাতা পঞ্চমমে পরিশ্রান্ত হইয়া পূর্ণতপ্রান্তে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, আমি খাজনাবাদি সংগ্রহের জন্য বাজারে চলিয়াছি।”

রাজপুত্র আসাদকে আশ্বাস-দান করিয়া বৃক্ষ তাহাকে তাহার সঙ্গে লইয়া চলিলেন, এবং নানাবিধ গল্প বলিতে লাগিলেন। বৃক্ষ বলিলেন, “তুমি হয় ত প্রথমে আমার সাক্ষাৎ পাইয়া আমাকেই বাজারের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে সৌভাগ্যের কথা বলিতে হইবে, কেন? তাহা তুমি আমার গৃহে উপস্থিত হইলেই জানিতে পারিবে।”

অগ্নি-উপাসকের

ভীষণ চক্রান্ত



বৃক্ষের গৃহে উপস্থিত হইয়া আসাদ দেখিলেন, চল্লিশ জন বৃক্ষ অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দিকে বসিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেছে। তিনি দেখিয়াই আতঙ্কিত হইয়া উঠিলেন, মনে করিলেন, “এই বৃক্ষকে বিধাৎ করিয়া বড়ই কুস্থানে আসিয়া পড়িয়াছি।”

আসাদ গৃহপ্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান হইলেন, চল্লিশ জন বৃক্ষকে সোধেন করিয়া গৃহস্থানী বলিল, “বন্ধুপণ, আজ আমাদের বড় আনন্দের দিন। তগবান্ কোথায়? সে এ দিকে আহুতক না।” এই কথা শুনিবামাত্র গৃহাভ্যন্তর হইতে একটি কৃষ্ণবর্ণ বিকট মূহুর্মুহি বাহির হইয়া আসিল। আসাদকে দেখিয়াই সে বুঝিতে পারিল, তাহার প্রভু কি জন্য তাহাকে আশ্বাস করিয়াছেন,—সে তৎক্ষণাৎ আসাদকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে ভূতলশায়ী করিল, এবং তাহার হস্তপদ বাধিয়া কেলিল। বৃক্ষ বলিল, “উহাকে নীচে লইয়া বাণ্ড, আমার দাসী কাবামাকে বলিবে, যেন প্রতাহ উহাকে লণ্ডভাঙা করে। ইহাকে বিদে একখানি ও রাখে একখানি রুটী খািতে দিবে। নীল সমুদ্র ও অগ্নিপর্বতে জাহাজ ছাড়িবার সময় পর্যন্ত এই আহায়েই এ বাঁচিয়া থাকিবে। তাহার পর আমাদের দেবতার পদে ইহাকে বলি দেওয়া বাইবে।”

আমাকে রাখিয়া, কুকর্ষণ দাস করেকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া তুগর্ভই একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে রাখিয়া আসিল; তাহার পর বৃদ্ধের দাসীর নিকট তাহার প্রভুর আজ্ঞা নিবেদন করিল।

দাসী আজ্ঞা শ্রবণমাত্র আমাদের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে এমন নির্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল যে, আমার কিছুকালের মধ্যেই অচেতন হইয়া পড়িলেন। তাঁহার দেহ হইতে রক্তপাত করাইয়া পিশাচী তাঁহার নিকট এক খণ্ড রুটী ও এক ষ্টী জল ফেলিয়া রাখিয়া গেল। সজ্জালাভমাত্র আমাদে কাতরভাবে বিলাপ ও অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তবে তাঁহার এই এক দাখনা রহিল যে, আমজাদকে এরূপ বিপদে পড়িতে হয় নাই।

আমজাদ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সেই পর্বতপ্রান্তে তাঁতার জন্ত অপেক্ষা করিলেন, রাত্রিও অনেক হইল, বসিলাম আসেন, এই চিন্তায় ধৈর্য্য ধরিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত বসিয়া রহিলেন। রাত্রিতেও বধন আমাদে ফিরিলেন না, তখন তাঁহার মনে দারুণ ভয় ও হুস্টিভা হইল; তিনি বুঝিলেন, আমাদে নিশ্চয়ই বিপদে পড়িয়াছেন। কোন প্রকারে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে তিনি আমাদের অহুসকানে নগরভিত্তিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু নগরে অতি অল্পসংখ্যক মুসলমানই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। এক জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে



স্বাভাবিক
নির্যাতন

পারিলেন, ইহা অধি-উপাসকগণের রাজ্য; মুসলমানের সংখ্যা এখানে অত্যল্প। এবনীরাজ্য সে স্থান হইতে কত দূর, জিজ্ঞাসা করায় তিনি জানিতে পারিলেন, সমুদ্রপথে সেখানে বাইতে চারি মাস লাগে। স্থলপথে এক বৎসর লাগিতে পারে।

অধি-উপাসকের
রাজ্য

আমজাদ সে স্থান হইতে চলিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এবনীরাজ্য হইতে তিনি ছয় সপ্তাহ মাত্র বাহির হইয়াছেন, তবে সে স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিতে এক বৎসর লাগিবে, ইহার অর্থ কি?—কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তবে কি কাহারও মায়াবলে তাঁহার এই দুর্দীর্ঘ পথ এত অল্পসময়ে অতিক্রম করিয়াছেন? এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে আমজাদ এক দরজীর দোকানের সমুখে উপস্থিত হইলেন। দরজীকে দেখিলামাত্র তিনি মুসলমান বলিয়া বুঝিতে পারিলেন।

↑
↓

১৯৫৫-৫৬

স্বপ্নায় আমজাদ তাঁহার বিপদের কথা দরজীর নিকট প্রকাশ করিলে দরজী বলিল, “যদি আমজাদ তাঁহাকে এই অসুবিধা উপস্থাপন করিলে তাহারও হাতে পড়িয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে পুনর্বার আশা ত্যাগ করুন। তাঁহাকে আর পাইবার চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই, এখন আপনি আশ্রয়স্থান উদ্ভাৱন করুন। আপনি ইচ্ছা করিলে আমার বাড়ীতেই থাকিতে পারেন, আমি আপনাকে এই অসুবিধা উপস্থাপন করিয়া রাখিয়া দিব। তাহা শুনিয়া আপনিও গীতগোবিন্দ হইতে পারিবেন।” আমজাদ তাঁহাকে না পাইয়া এক তীর্থে উপস্থিত করিবার সজ্জাবন্দী অতি অল্প দিনে, যৎপরোনাস্তি দূর হইলেন এবং অগত্যা দরজীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ প্রেরণের জ্ঞান করিলেন।

নাগারে
দী-মিলন

আমজাদ এক মাস দরজীর গৃহে বাস করিলেন, কিন্তু দরজীর সহচাড়া হইয়া, কোন দিন তিনি নগরে বাহির হইতেন না। এক মাস পরে একাকী তিনি দানার্ঘ্য দানাগারে গমন করিলেন, একটি পথ দিয়া ফিরিবার সময় পথের কোণায় একটি মস্তককেও দেখিতে পাইলেন না, কেবল এক স্থানে একটি প্রত্ন-বসনা যুবতীকে দর্শন করিলেন; তাঁহাকে দেখিবামাত্র স্বপ্নায় তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

স্বপ্নায় আমজাদের রূপ-যৌবন দেখিয়া বড় খুসী হইল। সে তাহার বোমটা তুলিয়া, আমজাদের সূত্রের উপর তুলনামূলক কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া সহাস্রমুখে তাঁহাকে সম্বোধন করিল। আমজাদ এত হৃৎকের উপর স্বপ্নাতীতে দেখিয়া মোহিত হইলেন। স্বপ্নায় জিজ্ঞাসা করিল, “কোথায় বাঙরা হবে?” আমজাদ বলিলেন, “যেখানে তোমার ইচ্ছা, আমার বাড়ীতেও হ’তে পারে, তোমার বাড়ীতেও হ’তে পারে।” স্বপ্নায় আবার হাসি ছড়াইয়া, কটাক্ষের হানিয়া বলিল, “মহাশয়, আমাদের মত সম্রাটকুলের কামিনীগণ কখন পরপুরুষকে ‘সুগৃহে লইয়া যায় না, তাহাতে বড় অপবাদ রটে, আপনার বাড়ীতে বস্তুনিষ্ঠ হইতে পারি, কেহ দোষ ধরিতে পারিবে না।”

আমজাদ দেখিলেন, বিষম সমস্যা! তিনি দরজীর গৃহে বাস করেন, সেখানে এ যুবতীকে লইয়া উপস্থিত হইলে দরজী কি মনে করিবে? হয় ত রাগ করিয়া বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দিবে। কিন্তু এমন স্বপ্নায় প্রলোভনও ত’ ছাড়িতে পারা যায় না। যা থাকে অগ্রসর হইবে, তাহা আমজাদ মৌনভাবে চলিতে লাগিলেন, স্বপ্নায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল।

অনেক পথ দূরিয়া অবশেষে উভয়ে একটি পথপ্রান্তবর্তী অট্টালিকাধারে উপস্থিত হইলেন। ঘরের দুই দিকে দুইখানি বেঞ্চি পাতা রহিয়াছে, একখানির উপর উপবেশন করিয়া আমজাদ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, অন্যখানির উপর স্বপ্নায় বসিল।

ঘাটিকা
আরও

স্বপ্নায় আমজাদকে জিজ্ঞাসা করিল, “এই তোমার বাড়ী না কি?” আমজাদ বলিলেন, “যদি বল, তবে তাই।” স্বপ্নায় আবার বলিল, “তুমি ঘর খুঁজিতেছা কেন? কাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছ?” আমজাদ বলিলেন, “চাষি আমার কাছে নাই, চাকরটা লইয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, কাজ শেষ করিয়া এখনও ফিরিতে পারে নাই। আমি তাহাকে কিছু ভাল খাদ্যদ্রব্যাদি আনিতে দিয়াছি, বোধ হয়, আরও কিছুকাল তাহার অপেক্ষার বসিয়া থাকিতে হইবে।”

রাজপুত্র আমজাদ মনে করিয়াছিলেন, স্বপ্নায় এই কথা শুনিয়া তাঁহার উপর বিরক্ত হইবে, তাহার পর তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য শিকারের চেষ্টায় চলিয়া যাইবে, কিন্তু স্বপ্নায় যে শিকার পাইয়াছিল, তাম্র হাতছাড়া করিবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। সে বলিল, “তোমার চাকরটা ত’ বড় বদ। এতক্ষণ মনিকবে কাটাইয়া দাও, সে ফিরিয়া আসিলে যদি তুমি তাহাকে শাস্তি না দাও, তবে আমি তাকার হাড় ভাঙিয়া দিব।” পুরুষের সঙ্গে এ ভাবে বসিয়া থাকা আমার শোভা পায় না।

আমজাদে কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। যুবতী ধীর ভাষিয়া গৃহে প্রবেশ করিতে পরামর্শ দিল। তিনি কি করিবেন জ্ঞাতিভেদে, এমন সময় যুবতী উঠিল এক বহুতে দ্বার ভাষিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া আমজাদকে আহ্বান করিল। আমজাদ ভরে কম্পাবিত হইলেন, অন্তর্যমানে যুবতীর আশ্রয়ে অবশ্য আশ্রয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

কক্ষগুলি সুপ্রশস্ত, সুশ্রীকৃত, সুশ্রীকৃত, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে তাঁহার তোকনককে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বহুবিধ গুণ্ডম্বা খরে খরে সজ্জিত, হৃদয় মদিরা ফাটিকপাত্রে সুরঞ্জিত। দেখিয়াই আমজাদ বুকিলেন, আর তাঁহার বক্ষা নাই, অবিলম্বেই কোন ভীষণ বিপদে পড়িতে হইবে।

রমণী কিন্তু আহাঃবিহারের উৎকৃষ্ট আয়োজন দেখিয়া অত্যন্ত প্রবৃত্ত হইল। সে বলিল, “কলেন কি মশার, হুয়ে এমন ভাবে জিনিসপত্র সাজান রহিয়াছে, আর আপনি চাকরের সন্ধানে বাহিরে বসিয়া গলাবন্ধ হইতেছিলেন! আমি কিন্তু বুঝিয়াছি, এ সকল আয়োজন আমার জন্য নয়, আর কোন ভাণ্ডারবতীর জন্য হইবে, আমি দৈবাৎ আসিয়া আপনাকে বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছি, তা যে আসে, সে আশ্রয় না, আমার ভাত্তে কোন হিংসা নাই। দয়া করিয়া এইটুকু করিবেন, যেন আমার পিপাসা অতৃপ্ত রাখিয়া দিয়া করিয়া দিবেন না।”

আমজাদের মন যদিও উৎকর্ষ ও আশঙ্কায় উবেশিত হইতেছিল, তথাপি তিনি যুবতীর কথা শুনিয়া হস্ত সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, “হৃদয়, ভয় করিও না, এ সব আয়োজন তোমারই জন্য।” আমজাদ শয্যা উপবেশন করিতে যান দেখিয়া হৃদয়ী বলিল, “কর কি প্রাণনাথ, এখন কি বিশ্রামের সময়? ঘানের পর আহাঃই ভাল লাগে, পরে বিশ্রাম, আগে উত্তর পূর্ণ করা যাক।”

যুবতী আহাঃের বলিল, রাজপুত্রকেও অগত্যা তাহার পাশে বসিতে হইল। উভয়ে বাইতে লাগিলেন, হৃদয়ী পেলাসের পর পেলাস মদ ঢালিয়া খাইতে লাগিল।

আমজাদের কিন্তু বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তিনি দোষলেন, আহাঃ প্রায় শেব হয়, তথাপি গৃহস্থানীর সাক্ষাৎ নাই। নিজেই তিনি সোভাগ্যবান বলিয়াই মনে করিলেন। ভাবিলেন, আর কিছুকাল যদি গৃহস্থানী না আসে, তাহা হইলেই তিনি নির্বিবাদের স্বস্থানে প্রস্থান করিতে পারিবেন। তিনি শীঘ্রই পলায়নের চেষ্টা করিতেছেন, যুবতী কিন্তু আর উঠে না, ক্রমাগত রাজসের মত গিলিতে লাগিল, হাসিয়া হাসিয়া আমজাদকে কত রসের কথা বলিতে লাগিল; শেষে সকল জিনিস আহাঃ করিয়া বধন তাঁহারই কল তলসে ব্যস্ত আছেন, সেই সময় গৃহস্থানী সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

গৃহস্থানী শুধু যে সে লোক নহেন, তিনি সে দেশের রাজার অধরক্ষক, নাম বাহার। এ বাড়ীতে তিনি পূর্ণকাল বাস করিতেন না, তাঁহার আর একটি বাড়ী ছিল, সেখানে তিনি থাকিতেন, দুই চারি জন বন্ধু লইয়া আসেন। কথিয়ার হুজু হইলে এই বাড়ীতেই আহাঃদির আয়োজন হইত, আজও হইয়াছিল। আহাঃদির আয়োজন করিয়া তিনি দ্বার বন্ধ করিয়া বন্ধগণের সন্ধানে গিয়াছিলেন এক তাঁহাদের আশ্রমের পূর্বের গৃহে প্রভাষন করিয়া এই দৃষ্ট দেখিতে পাইলেন। দ্বার ভর দেখিয়াই তিনি মনে করিয়াছিলেন, গৃহে তব্ব প্রবেশ করিয়াছে, গৃহের দ্বারে আসিয়া বাহা দেখিলেন, তাহাতে বিশ্বাসের সীমা রহিল না।

প্রেমের
প্রভাবনা

হৃদয়ীর
তোজন-বিলাস

বাহাদুরের প্রতি প্রেমেরই আমজাদের দৃষ্টি পতিত হইল, তিনি তখন মত্তপান করিতেছিলেন, বাহাদুরকে দেখিবামাত্র তাঁহার মুখ শুকাইয়া গেল, হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। বাহাদুর অদূরে দাঁড়াইয়া আমজাদকে তাঁহার নিকটে আনিবার অজ্ঞা হইত করিলেন। যুক্তী তখনও বাহাদুরকে দেখিতে পায় নাই, সে বলিল, “আপনার, এত আমোদ কেলিয়া কোথা যাও?” আমজাদ বলিলেন, “একটু অপেক্ষা কর সুন্দরি, এখনই আনিতেছি।” আমজাদ বাহাদুরের সহিত কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। যুক্তী বলিয়া গেল।

বাহাদুর দ্বিজ্ঞানী করিলেন, “তুমি কেন এই যুক্তীকে লইয়া এখানে আসিয়াছ? হারই বা কি অস্ত্র জালিয়াছ?”

আমজাদ বলিলেন, “মহাশয়, আমি আপনার নিকট গুরুতর অপরাধী বলিয়া বিবেচিত হইব সন্দেহ নাই, কিন্তু আপনি যদি ধৈর্যধারণ করিয়া আমার কথা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে বুঝিবেন, আমি সত্যই নির্দোষ।”

আমজাদ কোন কথা গোপন না করিয়া নিজের পরিচয় দান করিলেন, এই নগরে আগমনের উদ্দেশ্য ও ব্যক্ত করিলেন।

বাহাদুর বিদেশী লোককে বড় অজ্ঞগ্রহ করিতেন। তাঁহার গৃহে এক বিদেশী রাজপুত্র বিপন্ন অবস্থায় অতিথি হইয়া আসিয়াছেন দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ



মদিরা
চুম্বনে
বিপত্তি

বাহাদুরের
উদারতা



হইল। বাহাদুর কোভ ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “রাজপুত্র, আজ আপনার সহিত পরিচয় হওয়াতে আমি বড়ই স্বখী হইয়াছি। আমি আজ হইতে আপনার বন্ধু—বন্ধু কেন, আপনার ভৃত্যস্বরূপ হইলাম, আপনার বাহা আবশ্যক, অজ্ঞগ্রহ করিয়া আমাকে আবেশ করিবেন। আমি পরবাসিনকে আপনার আবেশ পালন করিব। আমি যে আপনার প্রতি শিষ্টব্যবহার কেন করিতছি, তাহার কারণ পরে জানিতে পারিবেন। আপনি বান, যে ভাবে আহাঙ্গাদি করিতেছিলেন, তাহা বন্ধন, কোন চিন্তা করিবেন না, রাতে এই বাড়ীতেই যুক্তীকে লইয়া আমোদপ্রমোদ করিবেন, কক্ষান্তরে উৎকৃষ্ট শয়ন আছে, তাহাতে উভয়ে শয়ন করিবেন। কাল সকাল-বেলা আপনি আপনার প্রেনাকাঙ্ক্ষী যুক্তীকে সন্মানের বিদায় দান করিবেন। কাল অমসিয়া আমি আপনার আরও কিছু মহৎকীর-নাথন করিব।”

আমজাদ ভোজনককে পুনঃ প্রবেশ করিবার বাহ্যিকের বন্ধন গৃহীতের সমাপ্ত হইলেন। বাহ্যিক উপস্থিতকৈ অসুস্থ্য করিলেন, বিশেষ কারণশব্দতঃ তিনি অভিযন্তাকারে সে দিন অসমর্থ, তাঁহাকে যেন মার্কিতা করা হয়। বাহ্যিকের এক ভূতের পরিকল্পনা প্রসিদ্ধ হইতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আমজাদ যুবতীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, “হুম্মারি, পানানদের মধ্যে হঠাৎ তোমার নিকট হইতে উঠিয়া শিখা রক্তক করিয়া ফেলিয়াছি, কিছু মনে করিও না। এ জন্ত আমাকে ক্ষমা কর। আমার চাকরটার ব্যবহার দেখিয়া আমি বড়ই বিরক্ত হইয়া গিয়াছি, সে এখনই আসিবে, তাহাকে আমায় রক্ষা শাস্তি প্রদান করিবা।” যুবতী বলিল, “এ জন্ত এত রাগ করিও না, চাকরটার অত্যাচারে নিরন্তর হুংস আছে, তাই সে এত সেরী করিতেছে। ও সবল কথা আর ভাবিও না, এখন আমায় ক্ষমা বাক।”

উভয়ে আনন্দ-গাগরে নিমগ্ন হইলেন। এখার আর আমজাদের কোন ভয় বা উদ্বেগ রহিল না। তিনি রাসের পর রাস খাদ উত্তর্য করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে বাহ্যিকের ভূতের বেশে সেই কক্ষে উপস্থিত হইলেন।

পূর্ণ হইতে আমজাদকে বাহ্যিকের শিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। ভূতবেশী বাহ্যিকের গৃহে প্রবেশমাগ্ন আমজাদ কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কাম্পিতকর্তে বলিলেন, “বদমাস, তোর মত চুট চাকর কাহার আছে, তাহা আমাকে বল। তুই এতক্ষণ কোথায় কি কাজে ব্যস্ত ছিলি, তার হিসাব দে।” বাহ্যিকের কৃতান্তলিপুটে বলিলেন, “হুম্মার, আপনি আজ আমাকে রাগ করুন। আমি আপনার কাজ করিয়াই কিরিয়া আসিতেছি, আপনি যে এত শীঘ্র কিরিয়াছেন, তাহা আমি পূর্বে জানিতে পারি নাই, জানিলে কখনই এত বিলম্ব করিতাম না।” আমজাদের কৃত্রিম ক্রোধ শাস্ত হইল না, তিনি ঘৃণিতলোচনে বলিলেন, “বদমাস, আজ আমি তোকে রীতিমত শিক্ষা দিব। বাহাতে আর কখন মিথ্যা কথা না বলি, তাহাই করিতেছি।” আমজাদ উঠিয়া একখানি বেত্র দ্বারা অতি দীর্ঘ, কিন্তু অত্যন্ত আড়ম্বরসহকারে তিন চারিবার প্রহার করিলেন, তাহার পর পুনর্বার আহারস্থানে আসিয়া বলিলেন। এই শাস্তিতে কিন্তু যুবতীর মন উঠিল না।

যুবতী উঠিয়া সেই বেত্র দ্বারা বাহ্যিককে এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করিল যে, যন্ত্রণার তাঁহার চকুতে জল আসিল। আমজাদ যুবতীর এই ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত ও বিচলিত হইলেন। তিনি যুবতীকে শাস্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু যুবতী তাঁহার কথার কর্ণশ্রুতি না করিয়া পুনঃপুনঃ প্রহার করিতে লাগিল; বলিল, “আমি পাখাকে উত্তম করিয়া শিখাইতেছি, এমন অপরাধ যেন আর কখন না করে।” অপরদিকে আমজাদ যুবতীর হস্ত হইতে বেত্র কাড়িয়া লইলেন। রমণী তখন দেখিল, বেত হাতছাড়া হইরাছে, তখন অগত্যা স্বস্থানে আসিয়া বলিল এবং ভূতাকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিল।

অনন্তর বাহ্যিকের অঙ্গপূর্ণনেজে আমজাদ ও হুম্মারীকে মদ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। আহারাধি শেষ হইলে বাহ্যিকের আহারস্থান পরিত্যক্ত করিয়া জিনিসপত্র বন্ধস্থানে তুলিয়া রাখিলেন। বহুবার তিনি যুবতীর দক্ষুণে বাইতে-লাগিলেন, ততবারই যুবতী তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইলে বাহ্যিকের উত্তরের শয়নের জন্ত পরিত্যক্ত শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন, তাহার পর তিনি ভিন্ন কক্ষে শয়ন করিলেন।

আমজাদ ও হুম্মারী আরও অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া গল্প করিলেন, তাহার পর তাঁহারা শয়ন করিতে যাইবার সময় তাঁহার পার্শ্ববর্তী কক্ষে বাহ্যিকের নন্দিকাম্বলি শুনিতে পাইলেন। যুবতী আমজাদকে বলিল, “যদি তুমি আমাকে ভালবাস, তবে আমার একটা অঙ্গরোধ শুনিতে হইবে।” আমজাদ বলিলেন, “কি বল?”—যুবতী বলিল, “একখানি খজা আনিয়া এই মুহূর্ত্তে তোমার ভূতের শিরশ্ছেদন কর।”

ভূতবেশের
বিভ্রম



রমণীর
বেত্রাঘাতের
দৃশ্য





আমজাদ মুজিবেন, অধিক পরিমাণে বন বাইরে খুবতীর মতক অপ্রকৃতির কইরা পড়িয়াছে। তিনি কইরা, দাক হুমরি, বেটার ঘুাইয়েছে—উহাকে বন করিয়া আর কি বললো হইবে? উহার অপর্যায়ের শুকতর শান্তি বিরাহি, ভূমিও যথেষ্ট বন বিরাহ।" খুবতী বলিল, "না, জা হইবে না। আমর কইরা, উহার প্রাণ বন করিতে হইবে। যদি তুমি না পার, আমি উহার প্রাণবধ করিয়েছি।"—রমণী আমজাদের উক্তরের আপেকা না করিয়া অপুর কক হইতে একখানি থকল লইয়া বাহাজুরের সারনরকক প্রেরণ করিল। আমজাদ কতপদে খুবতীর অম্মদরন করিয়া তাহার হস্ত হইতে থকল কাড়িয়া লইলেন এক বম্বাইরক বহুতে হস্তা করিতে প্রতিক্রান্ত হইয়া তাঁহার শরায়প্রান্তে উপস্থিত হইলেন, হুমরাই তাঁহার অঙ্গলার তবিল; কিন্তু আমজাদ বাহাজুরের অঙ্গে থকল স্পর্শ না করিয়া এক আঘাতে খুবতীরই শিরশ্ছেদন করিলেন, তাহার ছিন্ন মূর্ত্তা নিখিত বাহাজুরের ঘেঘের উপর নিশ্চিত হইল।

বাহাজুর তাহাতে অস্মিয়া উঠিলেন, রক্তাক্ত থকলহস্তে আমজাদকে সেই হস্তে বড়ায়মান দেখিয়া, এক স্রয়ার উপর রমণীর ছিন্ন মূর্ত্ত দেখিয়া বাহাজুর অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি আমজাদকে সকল কথা খুলিয়া বলিবার ক্ষমতা অহরোধ করিলেন। আমজাদ সকল কথা তাহাকে জানাইলেন। অবশেষে বলিলেন, "এই হুমরাইর হস্ত হইতে আপনার প্রাণরক্ষার জন্য আমি এই হৃদয় করিতে বাধ্য হইয়াছি।"

বাহাজুর অত্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে বলিলেন, "মহাশয়, আপনার জ্ঞান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কখন এমন জব্বর কর্ত্ত করিতে পারে না, তাহা জানি, আপনি আম আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, আপনি জীবনদাতা! কিন্তু রাষ্ট্র-প্রভাতের পূর্বেই এই পাপিষ্ঠার মৃতদেহ স্থানান্তরিত করিতে হইবে। আমিই তাহা করিব, আপনি এখানে সম্পূর্ণ অপরিচিত, সহসা কোন বিপদে পড়িতে পারেন। যদি আমি প্রভাত হইলেও না কিরি, তবে জানিবেন, প্রহরীরা আমাকে ধরিয়েছে। বাহাই হউক, আমি আমার এই গৃহ ও ব্রব্যসামগ্রী আপনার নামে লিখিয়া দিয়া বাইতেছি, আপনি অনায়াসে উহা উপভোগ করিবেন।"

দানপত্র



লিখিয়া তাহা আমজাদের হস্তে সমর্পণ করিয়া, বাহাজুর মৃতদেহ স্বক্কে লইয়া গৃহত্যাগ করিলেন। দেহটা বলির ভিতর পুরিয়া এক পথ হইতে অপর পথ দিয়া, তিনি সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর বাইতেই একজন নগরপ্রহরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। প্রহরী জিজ্ঞাসা করিল, "কাঁধে কি ও? নামাও, দেখি।" বাহাজুরের স্বক্কে বলি পরীক্ষা করিয়া সে দেখিল, একটি খুবতীর ছিন্ন দেহ। প্রহরী তখন নগরপালের নিকট বাহাজুরকে উপস্থিত করিল। নগরপাল তদন্তেই বাহাজুরের ছদ্মবেশ চিন্তিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি রাজার সম্মতি না জানিয়া সহসা তাঁহার প্রতি কোন দণ্ড প্রেরণ করিতে সাহসী হইলেন না, বাহাজুরকে নিজের বাড়ীতে লইয়া চলিলেন।

পরদিন প্রভাতে বাহাজুরকে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। বাহাজুরের জ্ঞান পদস্থ রাজকর্ত্তারী এমন গুরুতর অপর্যায় অপর্যায়ী তুলিয়া প্রথমে তিনি বাহাজুরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন, অবশেষে বলিলেন, "তুমি এই ভাবে আমার প্রজাসংঘের প্রাণবধ করিয়া তাহাদের সর্ব্ব্ব লুণ্ঠ কর! তাহার পর তাহাদের মৃতদেহ নদীজলে নিক্ষেপ কর। জ্ঞানীদের প্রতি তোমার মৃতদেহবনের আদেশ হইল।"

বাহাজুর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য একটি কথাও বলিলেন না। তিনি কারারুদ্ধের সহিত কাছাগারে উপস্থিত হইলেন। চারিদিকে সকলেই তুলিতে পাইল, সাহস খুন করিয়া বাহাজুরের কাঁধ হইতেছে।

বাহাজুরের সংবাদ শুনিয়া রাজপুত্র আমজাদ অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, "যদি কাহাকেও এই অপর্যায় দণ্ডভোগ করিতে হয়, তবে আমরই তাহা কর্ত্তব্য। আমার জন্য যে এক জন

নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণ বাইবে, তাহা কিছুতেই হইবে না।" তিনি অতপদে রাজপ্রাসাদান্তিমুখে দাখিল হইলেন, দেখিলেন, বাহাদুরকে বধ করিবার জন্ত দাতক বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়াছে, নগরের চারিদিক হইতে মগে মগে লোক আহ্বান দেখিতে আসিয়াছে।

আমজাদ কাম্বালাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই ব্যক্তি প্রকৃতই নিরপরাধ, অপরাধ বাহা কিছু, তাহা আমার, অতএব এই ব্যক্তিকে মুক্তিমান করিয়া আমার প্রাণদত্ত করুন। এই যুবতীর কিরণে মুহূর্ত্ত হইল, তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন।" আমজাদ সকল লোকের সাক্ষাতে তাঁহার পূর্বদিনের কাহিনী বর্ণনা করিলেন। কাজি সকল কথা শুনিয়া দণ্ড স্থগিত রাখিয়া, বাহাদুর ও আমজাদকে রাজার কাছে লইয়া চলিলেন।

রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া আমজাদ তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার ইতিহাস আত্মপুঙ্খক বলিলেন, অবশেষে বাহাদুরের সহিত তাঁহার আগাণ ও যুবতীর প্রাণনাশ কি জন্ত ও কিরণে হইল, তাহা অকপট প্রকাশ করিলেন।

সকল কথা শুনিয়া, রাজা যুবরাজ আমজাদকে বলিলেন, "রাজপুত্র, তোমার বিচিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি বৎপরোন্মত্তি প্রীত হইয়াছি, এই ঘটনাতে তোমার সহিত আমার আগাণেরও সুবিধা হইল। আমি কেবল তোমার জীবন রান করিলাম না, আমি বাহাদুরকেও মুক্তিমান করিয়া রাজকর্ণে নিযুক্ত রাখিলাম। তোমার পিতার নিকট তুমি যে অভ্যাস বাবাহার লাভ করিয়াছ, তাহাতে আমি বিশেষ হুঃখিত হইয়াছি, আমি তোমাকে আমার উজীর-পদে নিযুক্ত করিলাম; তোমার ভ্রাতা আগাণকে উদ্ধার করিবার জন্ত বাহা করা আবশ্যক, তাহা করিবার ক্ষমতা তোমাকে প্রদান করিলাম।"

উজীরের পদ গ্রহণ করিয়া আমজাদ আসাদের উদ্ধারের জন্ত নানা উপায় অবলম্বন করিলেন, নগরে নগরে পুরস্কার ঘোষিত হইল; কিন্তু আসাদের কোনই সংবাদ পাওয়া গেল না।

এদিকে আসাদের প্রতি অত্যাচার পূর্ববৎ এক ভাবেই চলিতে লাগিল। অগ্নি-উপাসকগণের উৎসব নিকট-বর্তী হইল, অগ্নিপর্কতে প্রেরণের জন্ত জাহাজ সম্বিষ্ট হইল, বাইরাম নামক একজন অগ্নি-উপাসক জাহাজ বোকাই করিবার ভার গ্রহণ করিল। বাইরাম আসাদকে একটু সিন্দুকে পুরিয়া সেই জাহাজে লইয়া চলিল।

আমজাদ লোকমুখে শুনিতে পাইলেন, এই অগ্নি-উপাসকগণ অগ্নিপর্কতে প্রতি বৎসর একজন মুসলমানকে বলি দেয়। আসাদ সম্ভবতঃ তাহাদের কবলে পতিত হইয়াছেন মনে করিয়া আমজাদ অগ্নিপর্কতগামী জাহাজ পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু ভ্রাতার সন্ধান করিতে পারিলেন না। জাহাজ ছাড়িয়া দেওয়া হইল।

জাহাজ সমুদ্রে পড়িলে বাইরাম আসাদকে সিন্দুকের ভিতর হইতে বাহির করিয়া, ডেকের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাখিল। তাহার ভয় হইল, আসাদকে বন্ধন করিয়া না রাখিলে পাছে তিনি সমুদ্রে পড়িয়া আত্মহত্যা করেন। আসাদকে কোথায় কি অভিপ্রায়ে লইয়া যাওয়া হইতেছে, তাহা তিনি পূর্ব হইতেই জ্ঞাত ছিলেন।

কয়েকদিন জাহাজ বেশ চলিল, তাহার পর একদিন ঝটিকা উঠিল। এমন প্রবল ঝটিকা যে, জাহাজকে আর এক দিকে উড়াইয়া লইয়া গেল। বাইরামের প্রতি মুহূর্ত্তে সন্বেহ হইতে লাগিল যে, অবিলম্বে কোন সিরিপুত্রে আহত হইয়া জাহাজ চূর্ণ হইয়া যাইবে। জাহাজস্থ সকল লোক মহাতীত হইল। ঝড় অধিকতর প্রবল হইলে আরোহিণী ঘুরে স্থলভাগ দেখিতে পাইল, কিন্তু অরক্ষণের মাধ্যমে তাহাদের বিবাদ উপস্থিত হইল। তাহার্য দেখিল, জাহাজ রাজী মার্জিন্নার রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মার্জিন্নানী মুসলমান ছিলেন, তিনি অগ্নি-উপাসকগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন; হুকুমার সকলেই বুঝিতে পারিল, তাঁর বিবাদ উপস্থিত।

তখন বাইরাম জাহাজের কর্তাচারী ও খালাসিগণকে লইয়া কর্তব্যসম্মুখে পরামর্শ করিতে বলিল। বাইরাম বলিল, "দেখ, আমাদের কোন পথ দেখি না। এই বন্ধরে জাহাজ লাগাইতেই হইবে, এখানকার রাজা

জাতি-সম্বন্ধে

সৌভাগ্যের

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

কি

হুন্দর-দাস
উপচৌকন
-প্রদান

আমাদের যে কিরণ শত্রু, তাহা তোমরা অবগত আছ। জাহাজ কূলে লাগিলেই তিনি আমাদের সর্ব্বকর্ম্ম করিয়া আমাদিগকে স্বাতন্ত্র্য-হস্তে সমর্পণ করিবেন; ততরাং তাঁহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে আমাদিগকে সমুদ্রজলে বাঁশ দিয়া গড়িতে হইবে, কিন্তু তাহাতেও বাঁচিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। তবে আশ্চর্য্যকর একটিমাত্র উপায় আছে, যদি আমরা বন্দরে উপস্থিত হইয়া দাসবাবসারী বগিরা পরিচর্য্য দিই এবং যে মুসলমানটী আমাদের জাহাজে আছে, তাহাকে দাসরূপে রাখির নিকট উপস্থিত করি, তাহাই হইলে তিনি আমাদের কথা বিচার করিতে পারেন। এমন কি, বড়-বুড়ি ধানিয়া গেলে, যদি তিনি আমাদিগকে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে দাসটিকে তাঁহার হস্তে সমর্পণও করিতে পারি।" সকলেই এই পরামর্শ সন্তোষ জ্ঞান করিয়া একবাক্যে ইহার সমর্থন করিল।

বাহিরাম তখন আসাদকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া তাঁহাকে উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত করিল। ইতিমধ্যে জাহাজ

বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজী মাজিরাহা তাঁহার সমুদ্রোপকূলস্থিত প্রাসাদ হইতে জাহাজখানিকে বন্দরে প্রবেশ করিতে দেখিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে তাঁহার সমুদ্রে উপস্থিত করিতে আদেশ করিলেন।

বাহিরাম আসাদকে তাঁহার সংকল্পিত বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাকে লইয়া রাজীর নিকট উপস্থিত হইল এবং রাজীর চরণ-বন্দনা করিয়া জানাইল, ঋটিকাবেগে তাহাদিগের জাহাজ এই বন্দরে আসিয়া পড়িয়াছে, সে স্বয়ং দাস-বাবসারী, যে সকল দাস তাহার জাহাজে বিক্রয়ার্থ ছিল, তাহাদিগকে বিভিন্ন বন্দরে বিক্রয় করিয়া আসিয়াছে, কেবল একটি দাস তাঁহার সঙ্গে আছে, লেখাপড়া জানে বলিয়া সে তাহাকে তাহার মুছরী করিয়া

রাখিয়াছে। "সেই দাস কোথায়?" রাজী এই কথা জিজ্ঞাসা করার বাহিরাম দাসকেই আসাদকে দেখাইয়া দিল।

হুন্দরী রাণী ঘন ঘন আসাদের হুন্দর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, তিনি দাস, এই কথা শুনিয়া রাজী প্রহসিতা হইলেন, আসাদকে ক্রয় করিতে কুণ্ডলকর হইয়া, তিনি আসাদের নাম ও ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিলেন। আসাদ অশ্রুপূর্ণনেত্র বলিল, "মহারানি, পূর্বে আমার যে নাম ছিল, তাহাই জামিতে চান; না এখন আমার যে নাম হইয়াছে, তাহাই বলিব?"



দাস-
বেশে
রাজপুত্র

হৃদয় যুগে হাসির বিজয়ী বিকাশ করিয়া, রাজী বলিলেন, “তোমার আবার হই নাম !” আসাদ বলিলেন, “হী, আমার হই নাম, পূর্বে নাম ছিল ‘আসাধ’ অর্থাৎ অত্যন্ত হৃদী, এখন নাম হইয়াছে মোটার, অর্থাৎ ‘উৎসাহীকৃত’।” রাজী আসাদের কথার সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “তিনিলাম, তুমি লেখাপড়া জান, এই কারণেই সুখী ছিলে, একটু লেখা দেখাও।” তখনই হোয়াত, কলম ও কাগজ লইয়া আসাদ লিখিতে বসিলেন।

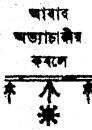
আসাদের হত্যাকার বেঁধিয়া ও রচনাভঙ্গিতে যুবতী রাজী মার্কিনানা বিমোহিত হইলেন, তিনি বাইরামকে বলিলেন, “হয় তুমি এই দাসকে বিক্রয় কর, না হয় উপহার দাও। যদি উপহার দাও, তাহা হইলে তুমি আমার নিকট অনেক উপকার পাইবে।” কিন্তু বাইরাম তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া রাজীকে এমন হই একটি কথা বলিল যে, রাজী যোবাধিতা হইয়া বলিলেন, “তুমি এখনই আমার রাজ্য ছাড়িয়া জাহাজ লইয়া দূর হও, বিলম্ব করিলে তোমার ব্রহ্মশাস্ত্রী সমস্ত লুপ্ত করিয়া, আমার কর্ণটারিগণ জাহাজে আগুন দাগাইয়া দিবে। এ তুমুটি তুমি পাইবে না।” রাজী বাইরামকে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিলেন; বাইরাম আসাদকে পরিত্যাগ করিয়া, সেই ঝটিকার মধ্যেই জাহাজ ছাড়িয়া দিবার উদ্দেশ্য করিতে লাগিল।

প্রাণদেবের একটি কক্ষে আত্মীয়স্বা আনিবার আদেশ দিয়া, হৃদয়ী-কুল-সৌরবিনী রাজী আসাদকে সঙ্গে লইয়া বলিলেন, তাঁহার সহিত একত্র আহার করিবার জন্ত অহরোধ করিলেন, কিন্তু আসাদ অসম্মত হইয়া বলিলেন, “এক জন দাসের পক্ষে রাজীর সহিত একত্র আহারের ধৃত্য শোভা পায় না।” রাজী বলিলেন, “তুমি পূর্বে দাস ছিলে, এখন আর দাস নহ। তুমি আমার নিকট তোমার জীবনকাহিনী বর্ণনা কর; আমার বোধ হইতেছে, তুমি সাধারণ লোক নহ, তোমার জীবনকাহিনী অতি অস্বভাব বলিয়া আমার মনে হইতেছে।” এই বলিয়া ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া সাগরে হাত ধরিয়া হৃদয়ী রাজী আসাদকে পার্শ্ব বসাইলেন।

আসাদ সবিত্তারে রাজীর নিকট আত্মকাহিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আসাদের প্রতি অমি-উপাসকগণ যে পাশবিক অত্যাচার করিয়াছে, তাহা শুনিয়া রাজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাদিগের বিরুদ্ধে অবিলম্বে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেন বলিয়া মত প্রকাশ করিলেন। আসাদ প্রকৃত্ত শুনিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ী রাজীর অহরোগ শতগুণে বর্ধিত হইল, তিনি প্রেমাবেগে আত্মহারা হইয়া আসাদকে কত প্রেম-সোহাগের কথা বলিলেন, ইতি-কটাকে প্রেম-নিবেদন করিলেন। আসাদ রাজীর সহিত অতি উৎকৃষ্ট খাণ্ডস্বা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলেন, হৃদয়ী মস্তে চিত্ত প্রকৃত্ত হইল, আসাদ আহারাদির পর উত্তানে গমন করিয়া একটি নিধরের ধারে উপবেশন করিলেন, তখন রাজী হইরাছে।

এদিকে জাহাজ ছাড়িবার সময় বাইরাম দেখিল, জাহাজে পানীর জল দূরাইয়া গিয়াছে, সে কয়েক পিণ্ড উৎকৃষ্ট পানীয় জল আনিবার জন্ত থালাসীপকে আদেশ করিল। বাইরাম রাজীর নিকট হইতে প্রাণাদ-প্রোক্ত উপবনের ভিতর দিয়া আসিবার সময় বেঁধিয়াছিল, সেই উপবনে একটি স্থপের জলের নিকর আছে। সেখান হইতেই জল আনিবার আদেশ প্রদান করিল।

আসাদ নিধরপ্রান্তে বিশ্রাম করিতে করিতে শিলাখণ্ডের উপর নিরিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। জাহাজের থালাসীরা জল লইতে আসিয়া, তাঁহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইল, এবং তাঁহাকে বাঁধিয়া নৌকার নইয়া গেল। নৌকা জাহাজের গারে আসিয়া ডিঙিলে, জাহাজ বাইরামকে সংবোধিল, “আমরা তোমার দাসকে বাঁধিয়া আনিয়াছি।”—বাইরাম তাঁহাকে ধরিয়া আবার তাঁহার হস্ত-পদে শিকল পরাইয়া বাঁধিয়া রাখিল। তাহার পর অধিশপকর্তৃত্বযুগে হৃদয়ী জাহাজ ধাবিত হইল।



সীমান্তবর্তী আসাদের আশ্রমে রাজী মাজিয়ারা অত্যন্ত উৎকর্ষিত হইলেন। তিনি আসাদের সীমান্তবর্তী অঞ্চলসমূহের সীমান্তবর্তী নিযুক্ত করিলেন, সহরের ভিতরও লোক পেল, কিন্তু আসাদের আশ্রমেই পেল না। রাজী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন।

সেই রাত্রিতেই রাজী মাজিয়ার আশ্রমের সাহায্যে উপবনে প্রবেশ করিলেন, এক নির্ভয়ের নিকট আশ্রয় দেখিলেন, সেখানে অনেক লোকের পদচিহ্ন রহিয়াছে। তখন তাঁহার অস্থান হইল, বাইরাই জল লইতে আসিয়া, এখানে আসাদকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বাধিয়া লইয়া গিয়াছে।

দ্রুত-উদ্ধারে
বাহাদুর
অভিযান

সেই রাত্রিতেই রাজী মাজিয়ারা অস্থমতি করিলেন, “দশখানি যুদ্ধজাহাজ অবিলম্বে সমুদ্রযাত্রায় জন্ত প্রেরিত রাখ, আমি কাল প্রভাতে সেই সকল জাহাজ লইয়া বিদেশযাত্রা করিব।”

পরদিন প্রভাতে রাজী জাহাজে আরোহণ করিলেন। বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া, দশখানি যুদ্ধজাহাজ বন্দর ত্যাগ করিল। রাজী কাপ্তেনকে আদেশ করিলেন, “কাল সন্ধ্যার পর যে জাহাজ আমাদের বন্দর ছাড়িয়া গিয়াছে, তাহারই অনুসরণ কর। যদি সেই জাহাজ ধরিতে পার, তবে জাহাজই সমস্ত জব্বা তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে, তোমরা জাহাজ লুণ্ঠ করিতে পারিবে; কিন্তু যদি সেই জাহাজ ধরিতে না পার, তবে তোমাদের প্রাণদণ্ড করিব।”

প্রাণপণবলে জাহাজ চালাইয়া, তৃতীয় দিন মাজিয়ারা জাহাজসমূহ বাইরামের জাহাজ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। বাইরাম অল্পকালের মধ্যেই বখিল, এই সকল জাহাজ রাজী মাজিয়ারার—সৈন্তে পরিপূর্ণ; সে আশ্চর্যকার কোন উপায় না দেখিয়া, আসাদকে নির্দয়রূপে প্রহার করিতে লাগিল। অবশেষে যখন দেখিল, উদ্ধারের আর আশা নাই, তখন রাজীর নিকট নিজের খনিদোষিতা প্রতিপন্ন করিবার জন্ত সে আসাদকে জাহাজ হইতে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপের সংকল্প করিল। তাহার পর আসাদের নিকট আসিয়া তাঁহার স্থূল সুক্ত করিল, এবং “হতভাগা! তুই আমাদের সকল বিপদের কারণ—দুঃ হ” বলিয়া তাঁহাকে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল।

সৈন্যকে
এখা



আসাদ সন্তরণ-বিভার হৃদয় ছিলেন, তিনি অতি সাবধানে সন্তরণ দিয়া কুলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি একটি পর্বতাকীর্ণ স্থলভাগে উপস্থিত হইলেন। প্রথমেই তিনি পরমেখরের উপাসনা করিলেন, তাহার পর বস্ত্রাধি ছাড়িয়া তাহা রোদ্রে শুকাইতে দিলেন। রোদ্রোভাগে তাঁহার শৈত্যও দূর হইল।

অনন্তর তিনি বস্ত্রাধি পরিধান করিয়া, পথের সন্ধান বাহির হইলেন, এক একটি পথ দেখিয়া, সেই পথেই চলিতে লাগিলেন। দশ দিন ধরিয়া তিনি চলিলেন, কিন্তু কোথাও জনপ্রাণি দেখিতে পাইলেন না। চারিদিকে কেবল অরণ্য। অরণ্যে দ্রুতই লুপ্ত হইল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরি-নদীতে পরিষ্কৃত জল। সেই ফল ও জলে পথশ্রান্ত রাজকুমারের ক্ষুধাতৃষ্ণার নিরুত্তি হইতে লাগিল।

অনেক দিন ধরিয়া পথভ্রমণ ও দেশপর্যটনের পর আসাদ এক নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরে প্রবেশ করিয়াই আসাদ বৃত্তিতে পারিলেন, ইহা অগ্নি-উপাসকগণের নগর—যেখানে তিনি বৃক্ষের গুহে আশ্রয় হইয়া মরণাধিক যন্ত্রণা পাইয়াছিলেন। আসাদ স্থির করিলেন, মুসলমান ভিন্ন আর কাহাকেও তিনি কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না। এ সকল নগর সম্বন্ধে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল।

তখন রাত্রি অধিক হইয়াছিল, সমস্ত নগর স্তম্ভ-মগ্ন। আসাদ কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সেখানে অনেক সমাধিমাটির ছিল, তাহার একটির ভিতর তিনি রাত্রিযাপন সংকল্পে প্রবেশ করিলেন।

এখন বাইরানের কথা কি বলি, সেই কথা বলি। বাইরান অতি অল্পবয়সে ময়োই শত্রুজাহাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া জাহাজের হস্তে আত্মত্যাগ করিল। রাজী কঠোরভাবে বিচার্যসা করিলেন, "আমি দেহাঙ্গকে রাখিয়াছিলাম, তাহাকে তুমি সোপানে ছুঁই করিয়া আনিয়াছিস, কোথার রাখিয়াছিস বল, নতুবা এই দণ্ডে তোর জাহাজ হুঁশ করিয়া কেদেব।" বাইরান ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "আমরা তাহাকে আদ্য দেখিও নাই, সঙ্গে করিয়াও আনি নাই; আপনি জাহাজের আগাসোড়া খুঁজিয়া দেখিতে পারেন।" জাহাজে আসাদকে দেখিতে না পাইয়া, রাজী ক্ষিপ্তবৎ হইলেন, প্রথমে তিনি বহুতে বাইরানকে বধ করিবার জন্ত উদ্ভত হইলেন; কিন্তু ক্ষণেক চিন্তার পর ক্রোধ সশয় করিলেন এবং জাহাজ ও তাহার জবাসামগ্নী নষ্টন করিয়া, একখানি নৌকাতে বাইরাণ ও তাহার খালসীগণকে তুলিয়া সমুদ্রবক্ষে ছাড়িয়া দিলেন। বাইরান বহু কষ্টে কুলে উঠিয়া চলিতে লাগিল, এবং অবশেষে আসাদ বে নবাব-মন্দিরে আসিয়া লইয়াছিলেন, সেই মন্দিরে উপস্থিত হইল।

বাইরান দেখিল, কে এক জন মানুষ নিজা ঘাইতেছে। মানুষের আগমন বুঝিতে পারিয়া আসাদ উঠিয়া বসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বাইরান চিনিতে পারিল, বলিল, "তুমি? তুমি ত আমাদের সর্বনাশের কারণ। এ বৎসর তোর প্রাণরক্ষা হইল বটে, কিন্তু আগামী বৎসর কোন প্রকারে তোর প্রাণরক্ষা হইবে না।"—বাইরান চক্ৰ নিম্নে আসাদকে ভূপাতিত করিয়া, তাঁহার মুখের মধ্যে একখান ক্রমাগত পুরিয়া, তাঁহার চাঁৎকারের পথ বন্ধ করিয়া ফেলিল, জাহাজের খালসীগণ আসাদকে দৃঢ়রূপে বাঁধিল। পরদিন প্রত্যুষে বাইরান আসাদকে সেই বৃদ্ধ অগ্নি-উপাসকের গৃহে আনিয়া, পূর্ববর্তী রূপেরে নিবেদন করিল। বৃদ্ধ সকল কথা শুনিয়া, কড়া বোস্তানার উপর আসাদের প্রতি অধিকতর অত্যাচার করিবার আদেশ প্রদান করিল।

আসাদ পুনর্বার পূর্ব-কারাগারে বন্দী হইয়া, নিজের অদৃষ্টকে শত বিচার প্রদান করিতে লাগিলেন। তিনি একাকী অন্ধকারময় ভূগর্ভে পড়িয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতেছেন, এমন সময় একখণ্ড রুটা ও এক পেয়ালা জল লইয়া, বোস্তানাকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিলেন। দেখিয়াই আসাদের হৃদয় ভরে বিকম্পিত হইয়া উঠিল, আবার এক বৎসর এই ভাবে অতিবাহিত করিতে হইবে, তাহার পর যত্ন।

কিন্তু বোস্তানা আসাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করিয়া না। আসাদের বিলাপ ও পরিতাপে তাহার কঠোর হৃদয় কোমল হইল। সে তাহার পিতার পূর্বরূপে ব্যবহারের জন্ত আসাদের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া জানাইল, সে আসাদের প্রতি অজ্ঞায়চরণ করিবে না, এবং তাঁহার মুক্তিপানের জন্ত বিশেষ চেষ্টা করিবে। এক জন মুগলমান দাসীর নিকট ধর্ষণোপদেশ লাভ করিয়া, তাহার হৃদয়ে আল্লাহ প্রতি বিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে, তাহার শৈতক ধর্মে আর বিশ্বাস নাই।

বোস্তানার কথা শুনিয়া আসাদের মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। তিনি বোস্তানাকে তাঁহার বিপদের কাহিনী বলিলেন, বোস্তানার মতি পরিবর্তনের জন্ত ঈশ্বরকে গুণবাদ দান করিলেন, অবশেষে বোস্তানাকে বলিলেন, "তুমি ত বলিতেছ, আমার প্রতি কোন প্রকার অজ্ঞায় ব্যবহার করিবে না; কিন্তু কাবামাকে কিরূপে নিরস্ত করিবে? বোস্তানা বলিল, "আমার দাসী কাবামাকে আমি নিরস্ত করিতে পারিব, তাহার উপর আমার সকল ক্ষমতাই আছে।"

অতঃপর কায়াপ্রকোষ্ঠে আসাদের কষ্ট অনেক কমিয়া গেল; শুধু রুটা ও জলের পরিবর্তে তিনি নানা-প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য ও স্নানের মত প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। বোস্তানা মধ্যে মধ্যে আসাদের সঙ্গে একজু বসিয়াও আহার করিত, প্রেমালোকে তাঁহাকে পরিচুট করিতে চেষ্টা করিত।





এই সময় একদিন বোতানা তাহার গৃহঘরে গীড়াইয়া আমজাদের ঘোরণা জনিত হইয়া। বোতানা জনিত প্রে জনিতে গিয়াছিল, যদি কেহ আসাদকে উজীরের নিকট উপস্থিত করিতে পারে, তাহা হইলে উজীরকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করা হইবে, কিন্তু যদি কেহ মন অভিপ্রায়ে লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে তাহারকে সপরিবারে বিনাশ করা হইবে।

বোতানা এই বোষণা প্রবণতায় আসাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আনন্দের সহিত বলিল, “রাজপুত্র, তোমার জন্মকষ্টের এতদিনে শেষ হইল, শীঘ্র আমার সঙ্গে এস।”—আসাদ রাজপথে উপস্থিত হইয়াই জনিলেন, উজীর সেই পথে বাহির হইয়াছেন; উজীরের সম্মুখবর্তী হইবামাত্র আমজাদ প্রবর্তন দ্বারা তাকে

চিনিতে পারিলেন। উজীর দ্বারা পরস্পরের আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইলেন। অবশেষে আমজাদ আসাদকে সঙ্গে লইয়া মহানন্দে রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। রাজা আসাদের পরিচয় পাইয়া, তাঁহাকে একটি উচ্চ রাজকর্মে নিযুক্ত করিলেন।

পরদিন রাজাজ্ঞার আসাদের অবরোধকারী বুদ্ধের গৃহ ভূমিসাৎ করা হইল, বুদ্ধ ও বাইরামকেও রাজসরবারে ধরিয়া আনা হইল। রাজা তাহাদের শিরশ্ছেদনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন, অপরাধিগণ নত-জাহ্ন হইয়া মার্জনা ভিক্ষা করিলে, তাহাদের প্রতি আদেশ হইল, যদি তাহারা অধি-উপাসনা পরিভোগ করিয়া আজ্ঞার তত্ত্বনা করে, তবে তাহাদের মার্জনা হইতে পারে। প্রাণভয়ে তাহারা সেই প্রস্তাবেই

সম্মত হইল। কাবামাও মুসলমানী হইল। বোতানা পূর্বেই পিতৃ-গৃহ ত্যাগ করিয়া আসাদের সহিত রাজপ্রাসাদে আসিয়াছিল; আসাদের অনুরোধে আমজাদ তাহাকে রাজীর মহলে স্থান দান করিয়াছিলেন।

অনন্তর বাইরাম মুসলমান-ধর্ম অবলম্বন করিলে, রাজপুত্র আমজাদ তাহার প্রতি নম্র হইয়া, তাহাকে একটি রাজকর্মে নিযুক্ত করিলেন। একদিন বাইরাম আমজাদ ও আসাদের জীবনভিত্তিক প্রবণ করিয়া বলিল, “আপনাদের পিতা কামারাল আমান নিশ্চয়ই এতদিনে তাহার ভ্রম বৃত্তিতে পারিয়াছেন, অগ্নিনারী স্বদেশে চন্দন, আমি আপনাদিগকে জাহাজে করিয়া, সেই রাজ্যে রাখিয়া আনিতেছি।”—এই প্রস্তাবে উত্তর দ্রুতই সম্মত হইলেন।



রাজা এই প্রস্তাব জমিদারদের সহিত মত প্রদান করিলেন; সেই দিনই জাহাজ নিকট কারিবার-আরোহণ প্রদান করা হইল। জাহাজে আরোহণ করিবার দিন প্রভাতে আমজাদ ও আসাদ রক্ষিত নিকট বিহার প্রেরণ করিলেন, এখন সময় রাজধানীতে হস্তান্তর উপস্থিত হইল। কেহ কাগিডেছে, কেহ পলাইতেছে, কেহ 'সর্বনাশ হইল' বলিয়া গাণে ঘুমে ঢড়াইতেছে,—কিন্তু কেহই ইহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিল না। অতঃপরে একজন রাজকর্মচারী রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া জ্ঞাপন করিল, "মহারাজ, সর্বনাশ হইয়াছে, বহুসংখ্যক সৈন্ত আসিয়া সহসা রাজধানী বেঁটন করিয়াছে। জাহাজ সৈন্ত, কি অভিশ্রমে জাহাঙ্গীরা এখানে উপস্থিত হইল, তাহা কেহই জানে না।"

আর জাহাজে আরোহণ করা হইল না। আমজাদ রাজার ব্যাকুলতা মর্শনে চিন্তিত হইয়া সৈন্তগণের পরিচয় লইবার জন্য নগরপ্রাচীরান্তিমুখে ধাবিত হইলেন। আমজাদ শুনিলেন, ইহার একজন রমণীর সৈন্ত, রমণী এক দেশের রাজ্ঞী। সহসা তিনি কেন পরের রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিলেন, আমজাদ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি রাজ্যের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজ্ঞী স্বর মাজ্জিরা। তিনি আমজাদকে বলিলেন, "তিনি শত্রুভাবে রাজ্য জয় করিতে আসেন নাই, শত্রুতাশয়নও তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের পরস্পর সম্বন্ধিত উভয় রাজ্যের মধ্যে বাচাতে মিত্রতা স্থাপিত হই, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। তিনি আসাদ নামক মুন্সর দাসের অহুসকানে আসিয়াছেন, বাইরাম নামক ছোট লোক তাকে তাঁহার রাজ্য হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছে।"—মাজ্জিরা আশ্বপরিচয় প্রদান করিলেন।

রাজ্ঞী মাজ্জিরার কথা শুনিয়া আমজাদ বিষয়সমাকুলচিত্তে বলিলেন, "মহীরনী রাজ্ঞী! আপনি আসাদ নামক যে মুন্সর দাসের কথা বলিলেন, সে আমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। আমি আমার প্রাণাধিক ভ্রাতাকে হারাইয়া বড় কষ্ট পাইয়াছি, আজ্ঞা দয়া করিয়া তাহাকে মিশাইয়া দিয়াছেন। আমার সঙ্গে আহুন, আপনার হস্তে আমি আসাদকে অর্পণ করিব; সেই সময়ে আসাদের সকল কথাই শুনিবেন। আমাদের রাজা আপনারকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইবেন। দয়া করিয়া আমার সহিত রাজপ্রাসাদে চলুন।"

অবশেষে আমজাদ রাজ্ঞী মাজ্জিরানাকে লইয়া উপস্থিত হইলেন। আসাদ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিয়া তাঁহার দ্বাখোণ্য সম্ভাষণ করিলেন। রাজ্ঞী আসাদকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন, তাঁহাকে তাঁহার সকল কথা একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন।

ইতিমধ্যে আর একজন সৈন্ত রাজধানীর নিকট উপস্থিত হইল, সংখ্যার মাজ্জিরার সৈন্তগণ অপেক্ষা অনেক অধিক; তাহার কে কোথা হইতে কি অভিপ্রায়ে আসিতেছে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া রাজা অত্যন্ত ভীত হইলেন। তিনি কাতরভাবে আমজাদকে বলিলেন, "আমজাদ, আমার যে অপরাধ সৈন্ত দেখিতেছি, আমাদের উপায় কি হইবে?"—আমজাদ অথৈ আরোহণ করিয়া, নব্যপিত সৈন্তদলে গমন করিলেন। একজন সৈন্তাধ্যক্ষ তাঁহাকে তাঁহাদের রাজার নিকট লইয়া গেল।

রাজা বলিলেন, "আবার লাম পাগর, আমি চান দেখের রাজা। আমি অনেক দিন পূর্বে আমার কস্তা ফেরোজার সহিত বাগেদাদনবীর রাজপুত্র কামারাল জামানের বিবাহ দিরাছিলাম। কামারাল জামান আমার কস্তাকে লইয়া তাঁহার পিতৃহত্যাকা চলিয়া গিয়াছেন; আমার কস্তা ও জামাতার সংবাদ বহুকাল পাই নাই; তাই তাঁহাদের সন্ধানে বাহির হইয়াছি। তোমাদের রাজা যদি আমাকে আমার কস্তা ও জামাতার কোন সংবাদ দান করিতে পারেন, তবে আমি তাঁহার নিকট টির-দানিত রহিব।"

সৈনিক-উদ্ধার
রাজ্য আক্রমণ
ক
ক
ক

সৈন্ত সৈন্তদের
অভিধান
ক
ক
ক

আমজাদ তাঁহার মাতামহের পবিত্রাঙ্গে নিপতিত হইয়া, তাঁহার প্রাণ ত্যজ করিলেন; তাহার পুত্র সিরিয়া তাঁহার কবচস্থান করিয়া নিজের পরিচয় প্রদান করিলেন। রাজা বৌদ্ধিজের পরিচয় পাইয়া তাঁহারক আশ্বিন করিলেন, তাঁহার চক্ষুস্থল হইতে আনন্দাশ্রু বিধ্বসিত হইতে আরম্ভ। অনন্তর রাজা আমজাদকে তাঁহার শিশু-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া, অল্প রাজার রাজ্যে এভাবে কালযাপন করিয়ার কারণ বিজ্ঞাপনা করিলেন, আমজাদ নিজের ও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আসাদের জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। রাজা যতিলেন, “রুশ, তোমরা যে চুংখকই সচ করিয়াছ, তাহার কবিনী স্মৃতিয়া আসাদ জ্বর বিধীর্ণ হইতেছে। তোমার ভ্রাতাকে আমার আশীর্ব্বাদ জানাইয়া বলিবে, আমি তোমাদের উক্ত ভ্রাতাকেই তোমাদের শিশুসমিধান লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত মিলন সংঘটন করিয়া দিব।”

আমজাদ তাঁহার রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিয়া, তাঁহারক নিবেদন করিলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ মহাসমারোহে চীন-রাজ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।



পুনর্বার দূরে অসংখ্য সৈন্ত আসিতেছে দেখা গেল। আবার রাজার মনে নুতন আশঙ্কার সঞ্চার হইল। আমজাদ আসাদের সহিত অথৈ আরোহণ করিয়া নব-সৈন্তদলের আগমনের কারণ জানিবার জন্য ধাবিত হইলেন। সৈন্তগণের নিকটে আসিয়া শুনিলেন, ইহা জুঁহাদের পিতা কামারাল জামানের সৈন্ত। কামারাল জামান পুত্রদ্বয়ের নির্দোষিতার প্রমাণ পাইয়া অত্যন্ত শোকাভিভূত হইয়াছিলেন, এবং অবশেষে আশীর জিহ্বাদ্বয়ের মুখেই তিনি সন্বাদ পাইয়াছিলেন, পুত্রদ্বয় এখনও জীবিত আছেন। রাজা সৈন্তে প্রিয় পুত্রদ্বয়ের সন্ধানে বাহির হইয়া বহুদেশ পর্যটনের পর এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

পিতা-পুত্র কতকাল পরে মিলন হইল। তিন জনেই একত্র অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। আমজাদ পিতাকে তাঁহার মাতামহের আগমনবার্তা নিবেদন করিলেন। কামারাল জামান পুত্র ও কয়েকজন রক্ষী লইয়া স্বতন্ত্রের চরণ বন্ধনা করিতে চলিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা চতুর্দল সৈন্তের সম্মুখে পড়িলেন, ইহারা পারস্তদেশের দিক হইতে আসিতেছিল।

কামারাল জামান তাঁহার পুত্রদ্বয়কে এ কাহার সৈন্ত, তাহা দেখিয়া আসিবার জন্য অস্থমতি করিলে, আমজাদ ও আসাদ সেই নবগত সৈন্তদলের সন্নিকটস্থ হইয়া শুনিতে পাইলেন, খালেদানবীণের রাজা সাহমান পুত্র কামারাল জামানের সন্ধান না পাইয়া বহুদিনেই তাঁহার অস্থমতান করিতে করিতে এই রাজ্যে উপস্থিত হইয়াছেন। আমজাদ ও আসাদ পিতামহের সন্বাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পিতা কামারাল জামানের নিকট পিতামহের আগমনবার্তা নিবেদন করিলেন।



কামারাল জামান পিতার আগমন-সন্বাদ অবগত হইবার পর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহার অবাধ্য হইয়া দেশত্যাগ করিয়া দীর্ঘকাল পিতার মনে কষ্ট দিয়াছেন মনে করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে তাঁহার মার্জনা ভিক্ষা করিলেন। আমজাদ ও আসাদ পিতামহের সহিত পরিচিত হইলেন। চারিদিকে মিলনের মাধুরীতে সকলের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইল।

বিভিন্ন দেশের তিন জন রাজা—চীনরাজ, খালেদানরাজ, এন্দোনরাজ কামারাল জামান ও রাজী মার্জিহানার তিন দিন রাজপ্রাসাদে অবস্থান করিয়া রাজার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। রাজ্যে মহা উৎসব আরম্ভ হইল। এই তিন দিনের মধ্যেই রাজী মার্জিহানার সহিত রাজপুত্র আসাদের মহাসমারোহে বিবাহ হইল। আমজাদ বোতানার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য তাহাকে বিবাহ করিয়া ফেলিলেন। তিন দিন

পরে রাজ্যশপথ স্বাক্ষর করিলেন। আমজনতের লইয়া রাজ্যী রাজ্যশপথ স্বাক্ষর করিলেন। কেবল আমজনতের লইয়া রাজ্যী রাজ্যশপথ স্বাক্ষর করিলেন। আমজনতের লইয়া রাজ্যী রাজ্যশপথ স্বাক্ষর করিলেন। আমজনতের লইয়া রাজ্যী রাজ্যশপথ স্বাক্ষর করিলেন।

রাজ্যশপথ স্বাক্ষর করিলেন। আমজনতের লইয়া রাজ্যী রাজ্যশপথ স্বাক্ষর করিলেন। আমজনতের লইয়া রাজ্যী রাজ্যশপথ স্বাক্ষর করিলেন। আমজনতের লইয়া রাজ্যী রাজ্যশপথ স্বাক্ষর করিলেন।



মহাপ্রতাপসম্পন্ন খালিফ হারুন-অল-রশিদের রাজত্বকালে এক জন অযৌন রাজা ছিলেন, এই রাজার নাম জিনেবি। জিনেবি সম্পর্কে খালিফের জ্ঞাতা হইতেন, একই বংশে জন্ম। জিনেবি এক জন উজীরের হস্তে রাজ্যশাসনের ভার প্রদান করা অব্যক্তিক মনে করিয়া, ছই জন উজীর নিযুক্ত করিলেন, এই উজীরদ্বয়ের এক জনের নাম থাকান, অস্তের নাম সাবয়।

থাকান দয়ালু, উদার, মিনয়ী, লোকের উপকারসাধন ও জায়াহুদাদিত রাজ্যশাসন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। দেশের লোক একবাক্যে তাঁহার প্রশংসা করিত।

সাবয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন চরিত্রের লোক ছিলেন। যৎপরোনাস্তি ক্রুপণ, ক্রুর, সর্বাংশে এবং উদ্ধত। কাহারও মুখে কোন দিন তাঁহার প্রশংসা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। থাকানের উদারতা, মহত্ব, ধর্মভাব তাঁহার কোনক্রমে সম্বন্ধ হইত না। থাকানের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই রাজার নিকট অভিযোগ করিতেন। কিন্তু রাজা সাবয়ের কথায় কর্ণপাত করিতেন না।

রাজা এক দিন থাকানকে তাঁহার জন্ত একটি হুম্মরী গুণবতী দাসী ক্রয় করিবার অমুখতি করিলেন।— ইহাতে থাকানের প্রতিদ্বন্দ্বী সাবয়ের মনে দারুণ হিংসার সঞ্চার হইল। তিনি রাজাকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আপনি যেহেতু দাসীর কথা বলিতেছেন, তাহা সংগ্রহ করা একান্ত দুরূহ হইবে। যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে আমার অল্পমান হয়, দশ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার কমে পাওয়া যাইবে না, বরং অধিক লাগিতে পারে।”—রাজা বলিলেন, “সাবয়, তুমি যদি দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রাকে খুব বেশী টাকা মনে করিতেছ? তোমার কাছে বেশী হইতে পারে, কিন্তু আমার নিকট ইহা নিতান্তই বঙ্গামান্য; অধিক অর্থ লাগিবে ভবিষ্য কালের হইও না।” রাজা থাকানকে হুম্মরী দাসীক্রয়ের জন্ত দশ-সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিতে কোষাধ্যক্ষকে আদেশ করিলেন।

থাকান দাস-বন্দারসমূহকে তাঁহার পছন্দসম্মত দাসী আনিবার জন্ত আদেশ করিলেন। দাসবান্ধারীরা হস্তশ্রমিক দাসী লইয়া প্রতিদিন থাকানের নিকট উপস্থিত হইতে লাগিল। দাসীসমূহ হুম্মরী হইলেও, তাহাদের একটিও থাকানের মনোনীত হইল না। সৌন্দর্য্যে ধৃত না থাকিলেও তাহাদিগকে তেমন গুণবতী বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না।

এক দিন সকালে থাকান রাজপ্রাসাদান্তিমুখে বাহ্য করিয়াছেন, পথে এক জন দাসবান্ধারী দাসানের দ্বিতীয় তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। দালাল তাঁহাকে জাহাইল, পূর্বদিন সন্ধ্যাকালে সেই গগনে এক জন পারসিক লোক আসিয়া পৌছিয়াছে, তাহার কাছে বিক্রয়ার্থ একটি দাসী আছে, দাসী রূপে-স্বভাব অস্বাভাবিক।

মোহে-
ফ্রীম ও
পারস্য-
রূপকর্মী



হুম্মরী বিহুদী
দাসী চাই



হাজির হাজিরকে দণ্ডিলেন, “আমি এখন রাজকাণ্ডে চণ্ডিমাছি, বাড়ী কিয়লো ভূমি আমার নিকট
সেই দণ্ডিত উপস্থিত করিবে, আমি তাহাকে দোষী ঘোষণা করিব।”

ধাকান গৃহে কিয়দা দেখিলেন, দালাল একটি ঘুতীকে লইয়া তাহার গৃহে উপস্থিত হইয়া, তাহার
প্রার্থনা করিতেছে। দণ্ডিত রূপ দেখিয়া ধাকান মুগ্ধ হইলেন। এই তরুণীর মধ্যে একটা বোঝনের অটুট
সৌন্দর্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছিল। তাহার লীল্যত কলোজ্ঞান নখনে পূর্ণধার্য বাগদামি, তাহার সমুদয়
কচির বক্ষোদেশে দণ্ডিত চিত্তকেও বিচলিত করিয়া তুলে। এই পায়তলাদেবী, তরুণীর অনবদ্য রূপ

পায়তলাদেবীর
রূপে চমক

ক উপ ক

ওধু অতুলনীয় নহে, ছন্দাশ্য। ধাকান তাহার নাম রাখিলেন—“রূপসী পায়তলাদেবী।”—তাহার গুণের
পরিচয় পাইয়াও ধাকান নিরতিশয় প্রীত হইলেন। এমন গুণবতী নারী আর কখনও তাহার দৃষ্টিপথে
নিপতিত হয় নাই। এই দাসীই রাজার মনোনিবেশ হইবে মনে করিয়া, ধাকান মনে মনে অত্যন্ত
সন্তুষ্ট হইয়া, সেই দালালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “পারদিক বণিক কত টাকা হইলে এই স্বন্দরীকে
বিক্রয় করিতে পারে?”

দালাল বলিল, “উজীর সাহেব, সেই বণিক এক কথার মানুষ। দশ হাজার মোহরের এক পয়সা কমে
সে এই দাসী-বিক্রয়ে রাজী হইবে না। সাধারণের জন্ত সে এ দাসী ক্রয় করে নাই, সে জানে, কোন
রাজা ইহাকে কিনিবেন, সেইজন্য ইহাকে অনেক অর্থব্যয়ে হুশিক্ত করিয়াছে, ইহার ভরণপোষণের জন্তও
অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। এই দাসী সমীত-বিদ্যা-নিপুণা, কবিতারচনাতে অল্পপমা বিভ্রায় নিরুপমা,
এমন দাসী সচরাচর বিক্রয় হয় না।”

উজীর ধাকান দেখিলেন, দালালের সহিত দরে বনিবে না; স্তবরাং তিনি দাসব্যবসায়ী সদাগরের সহিত
সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, দালালের মুখে শুনিলেন, সদাগর রাজবাড়ীতেই গিয়াছে; প্রাসাদে
উপস্থিত হইয়া সদাগরের সহিত ধাকানের সাক্ষাৎ হইল। উজীর রাজার জন্ত দাসী ক্রয় করিতে চান শুনিয়া
সদাগর বলিল, “আমি কিছু লাভ করিতে চাই না, যে দামে আমি দাসব্যবসায়িগণের নিকট এই দাসী ক্রয়
করিয়াছিলাম, এবং তাহার জন্ত যে টাকা ব্যয় হইয়াছে, তাহা সমস্ত দিয়া আপনি এই দাসী ক্রয়
করিতে পারেন।” ধাকান তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া ভ্রাতা অর্থ প্রদান করিয়া, রূপসী পায়তলাদেবীকে ক্রয়
করিলেন। সদাগর বলিল, “পঞ্চশ্রেণী ও মোস্তা-তাপে স্বন্দরী বড় কাতর হইয়াছে ও তাহার বর্ণ মলিন
হইয়া গিয়াছে, এ জন্ত আমার অনুরোধ, আপনি ইহাকে দশ পনের দিন আপনার গৃহে রাখিয়া, ইহার প্রতি
বিশেষ যত্ন করিবেন, তাহার পর ইহাকে রাজসদীপে পাঠাইবেন। দেখিবেন, দাসীর রূপ-লাবণ্য দশগুণ
বর্দ্ধিত হইয়াছে।”

সবতনে
রূপ-বিকাশ

ক উপ ক

সদাগরের পরামর্শ সন্তোষ জ্ঞান করিয়া, দাসীকে লইয়া ধাকান বাড়ী আসিলেন এবং তাহাকে তাহার
স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “রাজার আদেশক্রমে এই দাসী ক্রয় করিয়াছি, তুমি ইহার প্রতি বিশেষ
যত্ন করিবে, উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিবে, রীতিমত শুদ্ধতা দ্বারা ইহার পঞ্চদশ দূর করিবে এবং ইহাকে
তোমার সঙ্গে লইয়া আহাঙ্গানি করিবে, আর বেশিবে, যেন আমাদের গৃহে নোবেদীন ইহার প্রতি কোন প্রকার
অত্যাচার কি অত্যাচার ব্যবহার না করে। যদিও সে জ্ঞানবান, তথাপি এখন তাহার বোকাগাম, বোকাগাম
যোহে অন্ধ হইয়া হঠাৎ সে একটা দুর্কারী করিয়া বলিতে পারে।”—দাসীকে বলিলেন, “ওগো!
তুমি একটু সাবধানে থাকিও, তুমি রাজার জন্ত জীর্জী হইয়াছ, এ কথা যেন তোমার সর্বদা মনে থাকে।
তুমি আমার পুত্রের সমুদে বাহির হইও না।”

উজীর পতীকে এই পারতন্ত্র্যকারী প্রভি-পরিষদে বৃষ্টি কাথিত্য লগ্নে ফল্য করিবার আদেশ দিলেন।
হই জন পরিচারিকা এই উজীর পরিষদের নিমুক্ত হইল।

উজীরপুত্র নৌরেকদীর অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। ব্যক্তিগত বর্ষায়ত্নে তিনি নানাশ্রমের বেয়াল চরিতার্থ করিয়া বেড়াইতেন। তাহার কল্যাণের মত রূপ এবং শরীর-দক্ষিণতা রাজধানীর মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। নৌরেকদীর মুকুট ও দুগ্ধায়ক ছিলেন। তিনি বহুবর্ষের সহিত নিম্নত আবেদন-প্রদোষে কালাতিপাত করিতেন। সোনারগোর উপাসক মন্দির বহুসমায়ে নৌরেকদীর প্রতিষ্ঠাপাত করিয়াছিলেন।

একদিন পারতন্ত্র্যকারী আনিশ্-আল-জালিস্ প্রোধান সমাপনাতে আপনার কক্ষে বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় ভ্রমণ যুবা নৌরেকদীর মাতৃসন্তানকে আগমন করিলেন। পারতন্ত্র্যকারীর দ্বারদেশে ছই জন পরিচারিকা প্রহরার কার্যে নিযুক্ত ছিল। তাহাদের উপর আদেশ ছিল, এই যুবতীর সহিত কেহ সাক্ষাৎ করিতে যেন না পারে। নৌরেকদীরে প্রায়ে কিস্করীমূল প্রভুপুত্রকে জানাইল যে, তাহার জননী হামমে দান করিতে গিয়াছেন।

আনিশ্-আল-জালিস্ নৌরেকদীরের কর্তৃত্বর শুনিয়া বুঝিলেন, উজীর-পুত্র যয়: আদিয়াছেন। এই যুবকটিকে দেখিবার জন্ত তাহার কোতূহল জন্মিল। উজীর এই যুবকের সমুখে তাহাকে বাহির হইতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। নিবিড় বিষয়ে কোতূহল তীব্র হয়, ইহা মানব-মনোবৃত্তির একট রিশেষ ইঙ্গিত। তরুণী সুলারীরও কোতূহল অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইল। নারীর কোতূহল একবার উদ্দীপিত হইলে তাহা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত শান্ত হয় না। তরুণী আনিশ্-আল-জালিস্ দ্বরিতপরে আসন ত্যাগ করিয়া দ্বার-সমীপানে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ণ চুটি মেলিয়া যুবকের অনিন্দ্যস্বন্দর বদনকমলে নেত্রপাত করিলেন। যুবকের রমণী-মনোহর বিমল কাষ্ঠ তাহাকে মুহূর্তে অভিভূত করিল। তিনি চুটি সরিয়া লইতে পারিলেন না। নৌরেকদীরও এই অল্পমাত্রা তরুণীর সৌন্দর্য দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, তাহার পিতা এক অপূর্ণ সুলারী যুবতীকে কিনিয়া আনিয়াছেন; কিন্তু এতদিন পর্যন্ত তাহাকে দেখিবার অবকাশ পান নাই। আজ দৈববশে সেই সুলারীকে দর্শন করিবামাত্র তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার রূপপিপাসু মন এই তরী সুলারীর সৌন্দর্য উপভোগ করিবার জন্ত লাগিয়াই হইয়া উঠিল।

নৌরেকদীর দ্বার অভিমুখে দৃঢ়চরণে অগ্রসর হইলেন। তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কিস্করীমূল ভীত হইল এবং তাহার প্রবেশপথে বাধাধরুণ ধণ্ডায়মান হইল। নৌরেকদীর উভয়কে বলপূর্বক ঠেলিয়া দিয়া পারতন্ত্র্যকারীর কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দাসীরা তখন হইতে সরিয়া পাঁচাইয়া ঘটনার পরিণতি প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই নৌরেকদীর দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

সহ্যাত্মকে তিনি তরুণীর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "পিতা কি আপনাকে আমারই জন্ত সংগ্রহ করিয়াছেন?" যুবতী নৌরেকদীরের রূপধৌবন দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। মনে মনে তাহাকেই পতিষে বরণ করিবার জন্ত তাহার ভীত আতঙ্ক উদ্ভিত হইল। তিনি যুবককে বলিলেন, "হা প্রভু!"

নৌরেকদীর উৎকণ্ঠ মন্দির পান করিয়া আদিয়াছিলেন। মন্ততায় আমেজ তাহার বিচারবুদ্ধিকে হরণ করিয়াছিল। সমুখে অনায়াসে কুহুম; তাহার মদির গড়ে তিনি আশ্ববিবৃত হইলেন। তরুণীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া, তাহার নবনীত-বোমল কণপদব ধারণ করিয়া, নৌরেকদীর অশ্রুত্বয়ে নিজের প্রেম নিবেদন করিলেন এবং তাহাকে কীম্বদন্তীসূত্রে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সে প্রস্তাব উগ্ধেকিত হইল না। তখন নৌরেকদীর প্রসাদ আবেগে তরুণীকে ককোদেগে আকর্ষণ করিলেন। সন্তুষ্ট হইলে তাহার ললাট কপোল ও ওষ্ঠ অহরজ্বিত হইল।





যৌবনের স্বর্গ আশ্বস্রাণ করিল। নৌরোদীন হুবতীকে বন্দোবশে নিশীড়িত করিলেন। মদনোৎসবের বিজয়পতাকা উড়ান হইল। মদন-রাজার নির্দেশ লব্ধন করিবার স্বক্তি কাহারও রহিল না। দাসীসুগল বাহিরে দাঁড়িয়াছিল। তাহার। ব্যাপার অজ্ঞান করিয়া ক্রতপদে উজীর-পত্নীর কাছে লম্বা দিতে গেল।

উজীর-পত্নী স্বধন এই কথা শ্রবণ করিলেন, তখন তিনি দানাগারে ছিলেন, সেখান হইতে চিন্তাকুল-চিত্তে গৃহে প্রত্যাপন করিয়া, বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া, তিনি রূপসীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, নৌরোদীন চলিয়া গিয়াছেন।

উজীর-পত্নী রূপসীকে বলিলেন, “আমি নৌরোদীনকে তোমার কক্ষে আসিতে বাস্বেদ্য নিবেদন করিয়াছি, কিন্তু আমার নিবেদ্যনা না গুলিয়া, তৃত্যপনের প্রতি অত্যাচার করিয়া, সে তোমার কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল, আমার পুত্রের ব্যবহারে আমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছি।”

রূপসী জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেন মা, আপনার পুত্র আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া কি কিছু অত্যাচার কাজ করিয়াছেন?”

উজীর-পত্নী বলিলেন, “তুমি বল কি? উজীর রাজার জন্ত তোমাকে ক্রয় করিয়াছেন, আর আমার পুত্র তোমার উপর দোষ করিতেছে, এ কথা রাজার কাছে উঠিলে কি আর রক্ষা থাকিবে? আমাদের সকলেরই প্রাণ বাইবে।”

রূপসী বলিলেন, “কিন্তু নৌরোদীন আমাকে বলিয়াছেন, উজীর সাহেবের মন্ত-পরিবর্তন হইয়াছে, তিনি আমাকে আপনার পুত্রের হস্তেই সমর্পণ করিবেন। আমি রাজ্যস্বামী হইতে চাহি না; যদি আমি নৌরোদীনকে পাই, আমার জীবন সুরক্ষা মনে করিব।”

উজীর-পত্নী বলিলেন, “নৌরোদীনের মুখে ভ্রমি বাহা শুনিয়াছি, তাহা সত্য হইলে আমার স্নেহের লীমা থাকিত না, কিন্তু মা, তাহার কথা বিশ্বাস নাই, সে বড় মিথ্যাবাদী। তোমার মন ভুলাইবার জন্তই সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে। দেখিতেছি, তুমিও তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা হইয়া পড়িয়াছ। আমাদের চুক্তিপাশতই এরূপ হইয়াছে, রাজার কোণে পড়িয়া আমাদের সর্বনাশ হইবে।”—উজীরপত্নী মহা ভীত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দাসীগণও সঙ্গে সঙ্গে রোদন আরম্ভ করিল।

উজীর গৃহে কিরিয়া দেখিলেন, সকলেই কাতরবরে বিলাপ করিতেছে। তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, কিন্তু, বিলাপের কোন কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না। পত্নীকে এই প্রকার বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি পুত্রের ব্যবহার জানিতে পারিলেন। পুত্রের প্রতি তাঁহার ক্রোধ ও বিরোধের লীমা রহিল না। তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয়ের স্কার হইল। তিনি বন্ধে করাবাত করিয়া, দাড়ী ছিড়িয়া পুত্রের উদ্দেশে অনেক কটুবাণী বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, “রাজা এই অপমানের অবশ্য প্রতিশোধ লইবেন, আমার ও আমার পুত্রের স্বক্রে তাঁহার প্রতিশোধ শিপান। পরিতৃপ্ত হইবে।”

উজীর-পত্নী তখন স্বামীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, বলিলেন, “কি করিবে? যদি নৌরোদীন রূপসীকে না ছাড়ে, তবে না হয় মন লক্ষ্যে মোহর দণ্ড দিও।”—উজীর স্বক্রে করাবাত করিয়া বলিলেন, “গৃহিণি, তুমি বলিতেছ কি? মন লক্ষ্যে মোহর দণ্ড দিও? নৌরোদীন একটা কাত করিয়া বসিলে আমার মান-সম্মত লক্ষ্য থাকিবে না, মন লক্ষ্যে মোহর তাহার তুলনায় নিতান্তই অস্বিকৃৎকর সামগ্রী। তুমি আমার প্রতিজ্ঞা উজীর সাহসকে জান না, সে এই ঘটনার সন্ধান পাইলেই তিনকে ভাল করিয়া তুলিবে, বলিবে, থাকান উপস্থিত দাসীই ক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু তাহার

পুত্রকে রাজ্যের অধিকাংশ অর্থ উপস্থাপন করিয়া, রাজাকে দক্ষিণ করিয়া, তাহাকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে, অথচ এই দাসী-কন্যার জন্ত তাহাকে রাজকীয় বনভাগ্য হইতেই অর্থ প্রদান করা হইয়াছিল। এই কথা রাজার কর্ণপাতর হইবামাত্র তিনি আবার বিক্ষমপাতি বোধগ্ৰস্ত করিয়া, আমার পক্ষন লইবার আদেশ করিবেন। নৌরেন্দ্রীনের বাগ্নাও পূর্ণ হইবে না, মধ্য হইতে সকলের প্রাণ বাইবে।”

প্রতিহাসের



উজীর-পত্নী বলিলেন, “তুমি পাগল! তাই এত ভয় করিতেছ, আমাদের গৃহে কি হইতেছে না হইতেছে, তাহা অস্ত্রে কিরূপে জানিবে? এ ত’ আর সামান্য ক্রমের অন্তর্গত নহে। আর যদিই ঋগ্ভাঙ্গা এ কথা জানিতে পারেন, তাহা হইলে তুমি ত’ অনায়াসেই বলিতে পারিবে, তুমি প্রথমে ইহাকে রূপগুণসম্পন্ন ভাবিয়া ক্রয় করিয়াছিলে, পরে পত্নীকার জানিতে পারিয়াছ, এ দাসী রাজহস্তে প্রদানের যোগ্য নহে। রাজা তোমার কথা অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না। তুমি আমার কথা শোন, সেই দালালকে ডাকিয়া আনিয়া বল, এই দাসী যত উৎকৃষ্ট হইবে ভাবিয়াছিলে, এ তত উৎকৃষ্ট নহে; আর একটি অধিক হৃদয়ী দাসী সংগ্রহের জন্ত তাহাকে আদেশ কর।”

পত্নীর উপদেশ উজীর মহাশয়ের নিকট জ্ঞান হইল, তিনি তদনুসারে কাজ করিতেই কৃতসংকর হইলেন; কিন্তু এজন্ত পুত্রের প্রতি তাহার ক্রোধের উপশম হইল না।

নৌরেন্দ্রী সমস্ত দিনের মধ্যে আর বাড়ী আসিলেন না, পিতার ভয়ে নগর ত্যাগ করিয়া তিনি আর একটু দূরবর্তী নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং নগর-প্রান্তস্থ একটী অপরিচিত উপবনে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। অধিক রাগিতে যখন উজীর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন করিলেন, তখন নৌরেন্দ্রী ধীরে ধীরে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন; আবার পিতার বহির্গমনের পূর্বেই অতি প্রভুত্ব গৃহত্যাগ করিলেন। এক মাস ধরিয়া এইরূপ সতর্কতার সহিত তিনি পিতার দৃষ্ট অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। উজীর যে তাহার উপর কত বিরক্ত হইয়াছেন, দাসী-মুখে তিনি সে কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

এক মাস পরে উজীর-পত্নী পুত্রের অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্ত স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। পুত্রকে ক্ষমা করিবার জন্ত নানা যুক্তিতর্ক করিতে লাগিলেন, কিন্তু উজীরের ক্রোধ প্রশমিত হইল না, তিনি বলিলেন, “সে বাহা করিয়াছে, তাহার জন্ত আমি তাহাকে কোন না কোনরূপ দণ্ড দান করিবই।” — উজীর-পত্নী বলিলেন, “তবে এক কাজ কর। তোমার পুত্র প্রতিদিন গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করে, আবার তোমার শয্যাভাগের পূর্বেই গৃহত্যাগ করে, তোমার ভয়েই সে এরূপ করে। আজ তুমি কিছু অধিক রাগি পূর্ব্যন্ত জাগিয়া বসিয়া থাক। সে আসিলে তুমি তাহার প্রাণ-বধ করিবে বলিষ্ঠ ভয় প্রদর্শন করিও; আমি তাহার প্রাণ-রক্ষার জন্ত তোমাকে অনুরোধ করিব। তুমি তখন তাহাকে রূপসীকে বধারীতি বিবাহের আদেশ করিবে, বলিবে, ‘যদি বিবাহ করিতে প্রস্তুত থাক, তবেই তোমার প্রাণদান করিতে পারি।’ আমার বিশ্বাস, সে আনন্দের সহিত এই আদেশ পালন করিবে, কারণ, নৌরেন্দ্রী রূপসীর প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত, রূপসীও নৌরেন্দ্রীকে তাহার প্রাণদান সমর্পণ করিয়াছে, তাহার কথার ভাবে ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।”

প্রেমিক-পুত্রের



ধাক্কান পত্নীর এই প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, রাজিকালে দ্বারপ্রান্তে দৃষ্টান্তে রহিলেন। অধিক রাজিতে নৌরেন্দ্রী ধীরে ধীরে দ্বার অতিক্রম করিবামাত্র উজীর মহাবশে তাহার উপর নিপতিত হইয়া তাহাকে দৃষ্টান্ত করিলেন; তাহার পর ভীষণরূপে খণ্ডা উত্তোলন করিয়া, তাহার প্রাণ-বিনাশের উপক্রম করিলেন। নৌরেন্দ্রী নিশ্চলভাবে পৃষ্ঠদৃষ্টিতে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

হুম্মরী
বিলাস-সঙ্গিনী
হইবে না

গৃহিণী অবিশেষে আশিগরিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “কি কর, কি কর। হাজার অশরাখী হইলেও পুত্র, জাহার প্রাণবধ করিও না, আমার ঐ একটামাত্র সন্তান, উহার প্রাণ রক্ষা কর।”—বলিয়া উজীর-পত্নী একবার আনীর হস্তহিত তরবারি উভয় হস্তে দৃঢ়বলে ধরিলেন, সভয়ে বলিলেন, “কর কি, কর কি। পুত্রহত্যা করিও না। জাহার সর্বনাশ করিও না।”—উজীর বলিলেন, “গৃহিণী, ছাড়িয়া বণ্ড, আমি এখনই উহার প্রাণনাশ করিব, অব্যাহা পুত্র বধ করিলে কোন দ্বন্দ্ব নাই।” পত্নী বলিলেন, “তবে অগ্রে আমার প্রাণবধ কর, আমাকে না দারিদ্র্য পুত্রকে বহিরে পাবিবে না।” নোরেদীন বলিলেন, “কথা, আমাকে কখন কখন, খোঁচা আগনার নন্দন করিবেন।”



নিগ্রাহে
অনুগ্রাহ

উজীর নোরেদীনকে ভাণ করিলেন। অনন্তর তাঁহাকে বলিলেন, “নোরেদীন, তুমি আমার আদেশ অমাত্য করিয়া রূপসী দাসীর প্রতি অহুরাগ প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহাকে তোমার হস্তে প্রদান করিতে পারি, তোমাকে কখন করিতে পারি, যদি তাহাকে তুমি ধর্মপত্নীরূপে গ্রহণ কর। আমি তাহাকে তোমার বিলাস-সঙ্গিনী হইতে দিব না।”

নোরেদীন এতখানি অগ্র-গ্রহ আশা করেন নাই, তিনি পিতার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া তাঁহার আদেশ-পালনে সম্মত হইলেন। নোরেদীনের সহিত

বিবাহিতা হইবার আশায় রূপসী পারস্তবাসিনীর স্তব্ধের সীমা রহিল না। নোরেদীনও অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। উজীরের অপ্রসন্নতা বদ্ব হইল।

কয়েক দিন পরে, রাজা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই থাকান রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, রূপসী পারস্তবাসিনীর রাজভোগের অল্পপুঙ্ক্ততার কথা প্রকাশ করিলেন। রাজা থাকানের কথা বিবাস করিয়াই সন্তুষ্ট হইলেন, অধিক কিছু বলিলেন না। শায্য রূপসী সম্বন্ধে কোন কোন কথা শুনিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজসমীপে থাকানের আধিপত্যের কথা শ্রবণ করিয়া, তিনি কোন কথা বলিতে সাহস করেন নাই। নোরেদীন পারস্ত-হুম্মরী আনিস-আল-জালিসকে বিবাহ করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

এই অবস্থায় প্রায় একবৎসর অতিবাহিত হইল, থাকান অকস্মাৎ পীড়িত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে পীড়া সাংঘাতিক হইয়া উঠিল। শেষমুহুর্ত সমাপ্ত দেখিয়া তিনি তাঁহার শয্যাপ্রান্তে পুত্রকে আহ্বান করিয়া,

বলিলেন, “নোরদীন, আল্লা আমাকে যে ধনসম্পত্তি দান করিয়াছেন, আমি তাহার ব্যবহার কিছু করিয়াছি কি না, জানি না; কিন্তু তুমি দেখিতেছ, আমার বিশূল সম্পত্তিও মৃত্যুর গ্রাস হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না। তুমি রূপসী পারস্তবাসিনীকে চিরদিন বন্ধ করিবে বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, সে প্রতিজ্ঞা হইতে বিচলিত হইবে না, এই কথা জানিলেই আমি মুখে মরিতে পারিব।”

উজীরের মৃত্যু হইল। থাকানের মৃত্যুতে তাঁহার পরিজনবর্গের মধ্যে যে শোককরোণ উঠিল, রাবধানীতে তাহা ব্যাপ্ত হইল। শব্দেই উজীরের শুণের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর বহু শোক করিতে লাগিল, রাজা উপযুক্ত মন্ত্রী হারাইয়া অত্যন্ত আক্ষেপ করিতে বাসিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর নোরদীনের চরিত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তিনি কতকগুলি ইঙ্গিয়াসত চাটুকারবর্গে পরিবৃত হইয়া পিতৃ-পরিভ্যক্ত অর্থের অপব্যয় করিতে লাগিলেন। এতদিন আহায় ও আমোদ চলিতে লাগিল। অবশেষে বহুগুণের পরিতৃপ্ত-মাথনের জন্ত একদিন নোরদীন স্থির করিলেন, তাহাদের আমোদাগারে রূপসী পারস্তবাসিনীকে লইয়া বাইতে হইবে।

নোরদীন ক্রমাগত জলের স্রাব অর্থব্যয় করিতেছেন দেখিয়া, রূপসী একদিন তাঁহাকে সহপদে দান করিলেন। নোরদীন হাসিয়া বলিলেন, “হুম্মারি! ও সকল সাংসারিক কথা ছাড়িয়া দাও, কেবল আমোদ ও আনন্দের কথা বল। আমার বাপ আমাকে এমন কঠোর শাসনে রাখিয়াছিলেন যে, প্রাণ ভরিয়া এক দিনও আমোদ করিতে পারি নাই, এখন সিনকত মনের সাধে আমোদ করিব, কোন বাধা মানিব না।”—কেহ কোন সহপদে দান করিতে আসিলে নোরদীন তাঁহাকে মারিতে উঠিতেন।

বৃদ্ধ উজীর যে অগাধ সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, নোরদীন এক বৎসরের মধ্যেই তাহা প্রায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। তাহার পর একদিন তাঁহার প্রভুত্বকর্ণচাস্ত্রী আসিয়া তাঁহার নিকট বলিল, “আপনার ভাণ্ডার শূন্য, আর এক কর্দকও নাই।” নোরদীন তখন বহুবর্গের সহিত আমোদে মত্ত ছিলেন, কথাটা গ্রাহ্য করিলেন না; কিন্তু বহুগুণ ইহা অগ্রাহ্য করিল না, সে দিন আমোদে মত্ত যে সকল চাটুকার ও বহু অহুগুহিত ছিল, সধর্ষগুণের মুখেও তাহারা শুনিতে পাইল, নোরদীনের মধুচক্র মধুশূন্য হইয়াছে, মক্ষিকাগণ অস্ত্র ফুলে উড়িয়া গেল, আর তাহাদের কেহই নোরদীনের গৃহাভিমুখ হইল না। নোরদীনের গৃহে বিলাস-দীপ নির্দীপিত হইলে, একদিন তিনি বিষম্মনে রূপসী পারস্তবাসিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বৈধিক অবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। নোরদীনের অবস্থা দর্শনে রূপসী বড় দ্রুত হইলেন, কিন্তু একটু বিক্ষণের প্রাণোত্তপ্ত ও সত্বরণ করিতে পারিলেন না, বলিলেন, “তোমার বহুগুণ তোমার অসময়ের বহু, এইরূপ তোমার বিশ্বাস ছিল, এখন সেই অসময়ের বহুগুণের কাছে হাত পাতিয়া দেখ, যদি কিছু পাও, তাহাদের ত’ অনেক খাওয়াইয়াছ, তাহারা তোমাকে দুইদিন বাইতে দিতে পারিবে না।” নোরদীন একে একে বহুগুণের ধারে উপস্থিত হইলেন; কিন্তু কেহ সাড়াশব্দ দিল না। শূন্যহস্তে নোরদীনকে ফিরিয়া আসিতে হইল। তাঁহার জ্ঞানেন্দ্র উন্নীলিত হইল। কপট বহুগুণের ব্যবহারে তিনি নিরতিশয় মর্দপীড়া পাইলেন। তিনি বৎসরোন্মত্ত পরিতপ্ত হইলেন।

অবশেষে রূপসী নোরদীনকে তাঁহার গৃহসামগ্রী ও দাসীগণকে বিক্রয় করিয়া, অর্ধসংগ্রহের পরামর্শ দিলেন। দাসীগণের ভরণপোষণের ব্যয় হ্রাস হইল দেখিয়া, নোরদীন সর্বপ্রথমে তাহাখিনিকেই বিক্রয় করিলেন, সেই অর্থে কিছুদিন চলিল; কিন্তু অন্নকালের মধ্যেই পুনর্বার অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। তখন রূপসী বলিলেন, “আর ত চলিবার উপায় দেখি না, আমি তোমার দাসী নাত্র। তুমি দেখ হর জ্ঞান, তোমার

আমোদের
উজান বাহিল
↑ ↑ ↑

মহু অভাবে
মধুচক্র শুকাইল
↓ ↓ ↓

স্বদেশী দানী
দানী বিক্রয়
একটো



শিখর স্তম্ভ সত্তর দুয়ার আধাৰে ক্রয় করিয়াছিলেন, আমি বলিতেছি, তখন যে আদার মূল্য ছিল, এখন অর্ধ ছাড়া নাই, তথাপি অর্ধাৰে বিক্রয় করিলে, নিভান্ত কম অৰ্ধ পাইবে না। আদার পরাকৰ্ষণ এতদূর, আদাৰে বিক্রয় করিয়া কিছুকালের জন্য নিশ্চিন্ত হও, ভবিষ্যতে বাহা হয় হইবে।”

নৌরেন্দীন প্রথমে কোনমতেই এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন না, অবশেষে রূপসীকে নিৰ্ভর্যাক্তিয়ারে ও জীম্বাভ্রান্ধিকারের আর কোন উপায় না দেখিয়া, অগত্যা তাঁহাকে সেই প্রস্তাবেই সন্মত হইতে হইল। বাজারের যে অংশে দানী বিক্রয় হইত, নৌরেন্দীন রূপসীকে সেই স্থানে লইয়া গিয়া, একজন দালালকে বলিলেন, “হাজি হোসেন, আমার এই বাঁদী বিক্রয় করিব, এখন ইহার কত দর হইতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া ঠিক করিয়া দাও।” হাজি হোসেন রূপসীকে অবগুষ্ঠন অপসারণ করিয়া তাহার মুখ দেখিল, মহা বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “নৌরেন্দীন মিঞা, এই দানীকেই আপনার পিতা উজীর সাহেব দশ হাজার মোহর দিয়া ক্রয় করিয়াছিলেন না?”—নৌরেন্দীন ঠিক উত্তর দিলে, হাজি হোসেন বলিল, “ঠিক কত দাম হইবে, তাহা এখন বলিয়া উঠিতে পারিতেছি না, তবে আমি চেষ্টা করি, যত বেশী দরে বিক্রয় হয়।”

যেখানে সদাগরগণ দানদানী ক্রয়ের জন্য আজ্ঞা ফেলিয়া বাস করে, সেখানে উপস্থিত হইয়া, হাজি হোসেন বলিল, “ভাই সকল, বা গোল, তাহাই সুপারি নয়; বা লখা, তাহাই কলা নয়; বা লাল, তাই গোত নয়; ডিমমাছেই যে টাটকা, তাও নয়। তোমরা ত অনেক দানদানী বিক্রয় করিয়াছ, আমার হাতে একটি দানী বিক্রয়ের জন্য আছে, যদি দেখ ত’ বলিবে ‘হী, হুন্দরী বটে’—এমন রূপসী আর কখনও দেখ নাই, দেখিবে না। তোমরা একবার আমার সঙ্গে আসিয়া তাহার দর-দাম করিয়া দাও।”

সদাগরগণ দানীর রূপ দেখিয়া মোহিত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিল, “এ বাঁদীর দাম চারি হাজার স্বর্ণমুদ্রা হইতে পারে।”—তখন রূপসীকে সঙ্গে লইয়া বাজারের মধ্যস্থলে আসিয়া, হাজি হোসেন হাঁকিতে লাগিল, “চাই বাঁদী চাই, বড় সুন্দর যুবতী বাঁদী, দাম চারি হাজার মোহর, চলে এস, যে থাক খোদেয়।”

উজীর সাহেব সেই পথ দিয়া বাইতেছিলেন, তিনি এত অধিক মূল্যে দানী বিক্রয়ের কথা শুনিয়া দানী দেখিতে চাহিলেন। দানী ঘরের মধ্যে ছিল, হাজি হোসেন সন্ধ্যায় তাঁহাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া রূপসী-পারভবাসিনীর মুখ-শোভা নিরীক্ষণ করাইল। মজী চারি সহস্র মুদ্রাতেই দানীকে ক্রয় করিতে ইচ্ছা করিলেন, এবং ইজিতে প্রকাশ করিলেন, আর কেহ যেন অধিক মূল্য হাঁকিয়া তাঁহার মুখের গাশ কাড়িয়া না লয়। উজীরের উপর আর কেহ ডাকিতে সাহসী হইল না।

হাজি হোসেন নৌরেন্দীনের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “মিঞা, আপনার বাঁদী ত’ চারি হাজার মোহরেই হাত-ছাড়া হইয়া যায়। উজীর সাহেব চারি হাজার মোহরে কিনিতে চায়, আর কেহ দর বাড়াইয়া তাঁহার ফোড়ে পড়িতে ইচ্ছুক নহে। দাম কিন্তু বড়ই কম হইল, এ দামে এ বাঁদী ছাড়া উচিত নয়, তা আমি আপনাকে জানাইতেছি। তাহার উপর উজীর যে দাম বলিয়াছে, তাহাও আপনি পাইবেন বলিয়া বোধ হয় না, উজীরকে জিনিস দিয়া প্রায় কেহ দাম পায় না,—এ কি সে উজীর!—আপনার পিতা যে ধৰ্ম্মপথ হইতে একটুল নড়িতেন না।”

নৌরেন্দীন বলিল, “হাজি হোসেন, তুমি ঠিক কথা বলিয়াছ, আমি আমার বাঁদীকে শত্রুর নিকট বিক্রয় করিব না, আমার অর্থাভাব ঘটয়াছে বটে, কিন্তু অন্যাহারে প্রাপ্য দাম, সেও স্বীকার, তবু ইহাকে সাবয়ের হস্তে সমর্পণ করিব না। এখন কি করা যায়, সেই কথা বল।”

স্বাধীনতা

হাজি হোসেন বলিল, “উপায়ের ভাবনা কি ? কুমি কিসেই পারিবে, আমি দাসী বিক্রয় করিব না, এ বন্ধ অবস্থা, তাই ইহার উপায় রাখ করিয়া ইহাকে বিক্রয় করিতে আনিয়াছিলাম।” হাজি হোসেনের পরামর্শই সঙ্গত বিবেচনা করিয়া নোরেদীন দাসীর নিকটে আশ্বিনেন, এবং কৃত্রিম ক্রোধভরে তাহার কর্ণধ্বনি করিয়া হাত ধরিয়া উনিয়া গৃহে লইয়া চলিলেন ; বলিলেন, “তোমার ব্যবহারে আমি বিরক্ত হইয়া তোমাকে বিক্রয় করিতে আনিয়াছিলাম, যাহা হউক, আমি এখন আর বিক্রয় করিতেছি না। দরকার হইলে পরে বিক্রয় করিব।”

নোরেদীনের এই ব্যবহারে উজীর বড়ই বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “ওরে অপদার্থ মূর্খ, এই দাসী ভিন্ন যে তোমার ঘরে আর বিক্রয়ের কিছুই নাই, তাহা কি আমি জানি না ?” উজীর অশ্রু আরোহণ করিয়া রূপসী হাত ধরিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই ব্যাপারে নোরেদীনের দৈর্ঘ্যচাতি বাটল, আশ্রয়বরণের ক্ষমতা তাঁহার কোন দিনই ছিল না। তিনি এক লক্ষ উজীরের ঘোড়ার লাগাম চাপিয়া ধরিলেন, এবং তাঁহাকে অশ্রুপূর্ণ হইতে তুলশায়া করিয়া বলিলেন, “ওরে অহঙ্কারী বৃদ্ধ, আজ আমি এখনই পদাঘাতে মাসীর মধ্যে তোমার গোর দিতাম, কেবল বৃদ্ধা উজীর বলিয়াই তুমি বাঁচিয়া গেলি।”

সাময়কে নগরের কোন লোকই দেখিতে পারিত না, তাঁহার প্রতি এই ব্যবহার হওয়ায় দর্শকগণ সকলেই আন্তরিক সম্মতি হইল, কেহই তাঁহাকে তুলিল না, কিবা তাঁহার প্রতি এই ব্যবহারের সম্মতি কোন কথা বলিল না। সাবয় ক্রুদ্ধ হইয়া নোরেদীনকে ভয়প্রদর্শন করিবার জন্য নোরেদীন তাঁহার পূর্বে কয়েকটি মুষ্টিঘাত করিলেন, উজীরের মাথা ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল ; উজীরের দাগগণ সর্বনাশ হয় দেখিয়া, অসহ্য নোরেদীনকে আক্রমণ করিতে আসিল। সন্ধ্যাগ্রগণ বলিল, “আহা কর কি ! একজন উজীর, অল্পজন উজীরপুত্র, সিন্ধে সিন্ধে লড়াই, তোমরা কেন ইহার মধ্যে হস্তাঙ্গা বাধাও। মীমাংসা উহারাই করুন না। তোমরা নোরেদীনের প্রাণবধ করিয়া যে আপনাদের প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে, সে কথা মনেও করিও না।” উজীরকে উত্তররূপে প্রহার করিয়া, নোরেদীন রূপসী পায়ত্ত্বাসিনীকে লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

শেষিত ও কর্ণমে অভিযুক্ত হইয়া, উজীর সাবয় তৃত্যগণের সাহায্যে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি অত্যন্ত উজ্জ্বলভরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং এই অত্যাচারের স্থিতির আর্থনা করিলেন। রাজা বৃদ্ধ মন্ত্রী ক্রন্দনে ক্ষুব্ধ ও বিম্বিত হইয়া সকল কথা শুনিয়া বলিতে আদেশ করিলেন। উজীর সকল বিবরণ বর্ণন করিলেন, দুই চারিটি কথা বাড়াইয়াও বলিলেন। বৃত্ত উজীর যে সরকারের দশ হাজার মোহর দিয়া, দাসী ক্রয় করিয়া তাহা হইতে রাজাকে বঞ্চিত করিয়া পুত্রের ভোগে লাগাইয়াছেন, তাহাও বলিতে বিম্বত হইলেন না। সকল কথা বলিয়া তিনি অশ্রুপূর্ণ-মোচনে অবনত-মস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রাজা ভৎসনাপে কোতোয়ালকে আদেশ করিলেন, “চলিগ জন দৈন্ত পাঠাইয়া নোরেদীনের বাড়ী হরণ কর ; এবং তাহার বধাগ্রগণ সূচন করিয়া, তাহাকে ও তাহার স্ত্রীস্বরী বাদীকে বাঁধিয়া লইয়া এল।”

রাজা যখন এই আদেশ প্রদান করেন, তখন এক জন রাজভৃত্তা তাহা শুনিতে পায় ; এই ভৃত্তার নাম লাজার। লাজার উজীর থাকানের জীবিতাবস্থায় অনেক দিন তাঁহার দাগগণ করিয়াছিল, নোরেদীনকে সে আন্তরিক ভালবাসিত ; সুতরাং তাঁহাকে রাজরোধ হইতে রক্ষা করিবার জন্য কোতোয়ালের প্রাধাণ্যভাগের পূর্বেই নোরেদীনের গৃহাভিযুগে ধাবিত হইল, এবং রাজাজ্ঞা তাঁহার গোচর করিয়া বলিল, “আপনি এই যুদ্ধে বাসোয়া পরিত্যগ করুন, এখানে থাকিলে আপনার প্রাণরক্ষা হইবে না।”

উজীর-লাহন।



উজীরের প্রতিহিংসা





নৌরোদীন এই সংবাদ শ্রবণকালে রূপসী পারস্তবাসিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা বলিলেন, এবং অবিলম্বে পলায়ন করা আবশ্যিক, তাহাও জানাইলেন। তখন নৌরোদীন ও রূপসী গুপ্তপথ দিয়া ক্রতবেগে নগর অতিক্রম করিয়া, ইউফ্রেটিস নদীর মোহনার নিকট উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তাঁহাদের পৌর্বাগ্যক্রমে একখানি জাহাজ বোঙ্গাদ অভিমুখে যাত্রা করিতেছে। তাঁহারা উভয়ে সেই জাহাজে আরোহণ করিলেন। জাহাজে পাল তুলিয়া দিল; এবং অবিলম্বে তাহা বাসোর নগর ত্যাগ করিয়া বোঙ্গাদে অভিমুখে ধাবিত হইল।

এ দিকে নগরপাল সৈন্তে নৌরোদীনের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সদর দরজা বন্ধ। তিনি দ্বার ভাঙ্গিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন, সর্বত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলেন; কিন্তু নৌরোদীন কি রূপসী, কাহারও সন্ধান পাইলেন না। কেহই তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে পারিল না। নৌরোদীনের বাড়ী লুণ্ঠ করিয়া, সৈন্তগণ স্বস্থানে প্রস্থান করিল। কোতোয়াল রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “জাহাঙ্গীর, অপরাধী ভাগিয়াছে, ধান্দাও নাই।” রাজা বলিলেন, “যেখান হইতে পার, তাহাদিগকে ধরিয়া আন, আমি তাহাদিগকে চাই।”—উজীরকে বলিলেন, “তুমি বাড়ী বাও, তোমার অপমানকারীকে আমি যথোচিত দণ্ডনাম করিব।” কোতোয়াল নগরের সর্বত্র নৌরোদীনের অনুসন্ধান করিল; কিন্তু তাঁহাকে পাইল না।

নৌরোদীন ও রূপসী যথাসময়ে নিরাপদে বোঙ্গাদ নগরে উপস্থিত হইলেন। জাহাজ কূলে লাগিলে সকলেই স্ব স্ব গৃহে বা নিজ নিজ স্থানে গমন করিল। নৌরোদীন রূপসীকে লইয়া পথে পাড়াইয়া, কোথায় যাইবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। সম্মুখে অপরিচিত নগর তাহার অসীম ঐর্ষ্যা ও অনন্ত শোভা লইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

অবশেষে তাঁহারা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পথে চলিতে আরম্ভ করিলেন। চলিতে চলিতে তাঁহারা একটি বাগানের দেউড়ীর সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। দেউড়ী বন্ধ। দেউড়ীর সম্মুখে দুইখানি কাঠাসন ছিল, নৌরোদীন বলিলেন, “সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বড় পরিশ্রান্তও হইয়াছি, এখন আর কোথায় যাওয়া যায়?—আজ এইখানেই রাত্রিযাপন করি, কাগ প্রভাতে উঠিয়া বাসার সন্ধান করিব।” রূপসী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কাঠাসনে উপবেশন করিলেন, দুজনেই একখানি আলনে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে ধরাভল আচ্ছন্ন হইল। অদূরে একটি নিকরের করসর শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল, শীতল নৈশ-বায়ু তাঁহাদের রক্তিম হরণ করিল—পরিশ্রান্ত যুবক-যুবতী পথশ্রান্তিতে সেই কাঠাগনের উপরই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।

বাগানের থালিকের এই বাগান। বাগানের মধ্যে অতি সুবৃহৎ প্রাসাদ, তাহার আশপাশ বাতায়ন, বহুসংখ্যক আলোকধারে প্রাসাদটি সুসজ্জিত; কিন্তু থালিক উপবন-ভ্রমণে না আসিলে আর এই সকল আলোকধারে দীপ প্রজ্জ্বলিত করা হয় না। দীপশ্রেণী প্রজ্জ্বলিত হইলে বহুদূর হইতে তাহার আলোকরশ্মি অধিবাসিগণের নয়ন প্রকট করে।

একটু দূরের উপর এই উত্তান-রক্ষার ভাৱ ছিল। উত্তানরক্ষকের নাম সেখ ইব্রাহিম। সেখ ইব্রাহিমের উপর আদেশ ছিল, সে কোন লোককে, যত বড় লোকই হউক না, এই বাগানে প্রবেশ করিতে দিবে না। বাগানের বাহিরে গেটের সম্মুখে যে আগন ছিল, তাহাতেও কাহার উপবেশনের আদেশ ছিল না। যে ক্ষেত্র এই আদেশ অবহেলা করিত, তাহার প্রতি কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত।





নৌরোদান ও পাখি-কপালী

প্রেমিক প্রয়াণ .

৩০০

সেখ ইব্রাহিম কার্যাব্যাহারে নগরে গিয়াছিল, ফিরিবার সময় দেখিল, আসনে দুই জন মানুষ ঘুমাইতেছে। সেখ ইব্রাহিম মহা ক্রুদ্ধ হইয়া নিঃশব্দে দেউড়া-ঘায় উখুস্ত করিল, তাহার পর একখানি বেরহন্তে নিষ্প্রিত নোরেদ্বীনের নিকট আসিয়া তাঁহার পৃষ্ঠে আঘাতের জন্ত বের উদ্ভত করিল; কিন্তু তৎক্ষণাৎ হাত নামাইয়া ভাবিতে লাগিল, খালিকের আদেশ জ্ঞাতসারে কেহ লজ্জন করিতে সাহসী হইবে না, ইহারা নিশ্চয়ই বিদেশী লোক, প্রথমে ইহাদিগের নিস্রাতঙ্গ করিয়া জানি, কেন ইহারা রাজ্যদোষ লজ্জন করিয়াছে।

নোরেদ্বীন এবং রূপসী পারস্তবাসিনী, উভয়েই মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া ঘুমাইতেছিলেন। মুখের কাপড় তুলিয়াই সেখ ইব্রাহিম বিষয়ে পরিপূর্ণ হইল, বলিল, “ইয়া আল্লা! ইহারা যে স্ত্রী-পুরুষ দেখিতেছি, এমন রূপ ত’ কখনও দেখি নাই!”—ইব্রাহিমের সকল রাগ জল হইয়া গেল, সে ধীরে ধীরে নোরেদ্বীনের পদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে জাগাইল।

নোরেদ্বীন চক্ষু উন্মীলন করিয়া পথের আলোকে দেখিলেন, সম্মুখে এক বৃদ্ধ দণ্ডায়মান, শ্বেতবর্ণ দাড়ী ভূমিতল চূষন করিতেছে। নোরেদ্বীন উঠিয়া সন্নিবেয়ে বৃদ্ধের কর ধারণ করিয়া তাহা চূষন করিয়া বলিলেন, “মিঞা সাহেব, আমার প্রতি আপনার কি অহুমতি, প্রকাশ করুন, এ দাস অবিলম্বে তাহা পালন করিব।”—বৃদ্ধ জল হইয়া উত্তর করিল, “বৎস, তোমরা কে? কোথা হইতে আসিতেছ?”

নোরেদ্বীন বলিলেন, বহু দূরদেশ হইতে আসিয়াছি, এই আসনে বসিয়াই রাত্রি কাটাইব মনে করিয়াছি।” বৃদ্ধ মাথা নাড়িয়া বলিল, “বৎস, এখানে তোমরা বড় কষ্ট পাইবে। আমার সঙ্গে বাগানের ভিতর এসো, আমি তোমাদের অতি উত্তম আশ্রয় দান করিব।”—নোরেদ্বীন জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ বাগান কি আগবান?”—“হা বৎস, আমি এই গৈলুক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছি, বাগানের মধুর শোভায় তোমাদের প্রাণ পুলকিত হইবে, এখন এস।”—সহস্বে এই কথা বলিয়া ইব্রাহিম অগ্রসর হইল, নোরেদ্বীন ও রূপসী পারস্তবাসিনী তাহার অঙ্গসঙ্গ করিলেন।

নোরেদ্বীন বাগেরা নগরেও অনেক উৎকৃষ্ট উপবন দেখিয়াছিলেন; কিন্তু খালিকের এই উদ্ভান অতুলনীয়। উদ্ভান-শোভা দেখিয়া নোরেদ্বীন ও রূপসী উভয়েই অত্যন্ত বিস্মিত, পুলকিত ও মুগ্ধ হইলেন। অবশেষে



সেইসময় সেই ইব্রাহিমকে বলিলেন, "সেখ ইব্রাহিম, পৃথিবীতে তোমার এ উত্তানের তুলনা নাই, আমার চোখকে সন্তোষিত করুন।" তুমি আবাবিলের প্রতি আজ বড় অত্যাচার প্রকাশ করিলে, আবাবিলের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ উচিত; এই মোহর দুইটি লও, কিছু খাওনা লইয়া এস; আমরা সকলেই অত্যাচার-প্রবোধ করি।"

আবাবিল
প্রবেশ-দ্বার

মোহর দুইটি লইয়া সেখ ইব্রাহিম বাগারে চলিল, মনে মনে ভাবি ধূলী হইয়া বলিল, "ইহারা সোক ভাল, তাদের ইহানিকে তাক্কাইরা নিই নাই; হুই মোহর বাবারের জন্ত দিয়াছে, কিন্তু এক মোহরের সিকি হইলেই ত' অনেক খাবার মিলিবে। অবশিষ্ট আমারই লাভ।"—সেখ ইব্রাহিম লোকটি কিছু লোভী ও রূপণ ছিল।

ইতিমধ্যে নোরেদীন ও রূপসী উত্তানভবনটি প্রদক্ষিণ করিয়া, তাহার শোভা দেখিতে লাগিলেন, বহুই দেখিতে লাগিলেন, ততই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইলেন। অবশেষে মার্কেল-সোপানশ্রেণী দিয়া প্রাঙ্গণের উপরে উঠিয়া দেখিলেন, ষায় কহ্ন।—নামিয়া আসিতেই সোপানপ্রান্তে ইব্রাহিমের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল, ইব্রাহিম খাওনাখানি লইয়া আসিতেছিল। নোরেদীন ইব্রাহিমকে বলিলেন, "তাই, এ বাগান ত' তোমার বলিয়াছে, এ প্রাঙ্গণও কি তোমার?"—সেখ বলিল, "বাগানটি আমার আর প্রাঙ্গণটি অস্ত্রের হইবে, ইহা কি কখন হয়?—এ প্রাঙ্গণও আমার। আমরা আমার ভোগের জন্ত দিয়াছেন।" নোরেদীন বলিলেন, "তবে আমাদিগকে প্রাঙ্গণের ভিতরটা ভাল করিয়া দেখাও, আজ আমরা তোমার অতিথি, প্রাঙ্গণের মধ্যেই অতিথি-সংস্কার কর।"

সেখ ইব্রাহিম ভাবিল, "অতিথির এই অমুরোধ অগ্রাহ্য করা ভাল দেখাইবে না, যে এক বেলায় আহাবারির জন্ত হুই মোহর ব্যয় করিতে পারে, সে সামান্য অতিথি নহে। খালিক যদি আজ এখানে আসিতেন, তাহা হইলে সংবাদ পাইতাম; তিনি যখন আসিতেছেন না, তখন আর চিন্তা কি? ইহাবিলকে প্রাঙ্গণের ভিতরে লইয়া যাই।"

এই সকল ভাবিয়া সেখ ইব্রাহিম প্রাঙ্গণদ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। নোরেদীন ও রূপসী পায়ত্তবাসিনী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিত হইলেন। এমন হুসজ্জিত হুশোভিত কক্ষে তাঁহারা জীবনে কখন পদার্পণ করেন নাই। সেখ ইব্রাহিম অঙ্গদ্বারের মধ্যেই একটি পরম-রমণীয় কক্ষে আহাবারের আয়োজন করিয়া অতিথিব্যয়কে আচ্ছাদন করিল। তাহার পর তিন জনে একত্র বসিয়া মহানন্দে আহাবার করিতে লাগিলেন। আহাবার শেষ হইলে নোরেদীন হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া, একটি বাতায়ন দ্বারা চন্দ্রলোকিত উপবনের শোভা দেখিতে লাগিলেন এবং সে শোভা দেখাইবার জন্ত রূপসীকেও আচ্ছাদন করিলেন। সেখ ইব্রাহিম আহাবারির পর বাগানদ্বি বগ্গাছানে সজ্জিত করিয়া, বস্ত্রপরিবর্তন করিয়া নোরেদীনের নিকট আসিলে নোরেদীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "সেখ, পানীয় দ্রব্য কোন রকম আছে?"—ইব্রাহিম বলিল, "তোকা সন্ধ্যা আছে, কিন্তু আহাবারের পরে ত' সন্ধ্যা পান করার নিয়ম নাই।"—নোরেদীন বলিলেন, "আমরা কি সন্ধ্যা চাহিতেছি? কোন প্রকার মজা আছে কি না, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, এমন গুরু আহাবারের পর একটু মদ ভরি কি আরাম হয়? যদি থাকে, বোতলখানেক লইয়া আইস।"

আনক-মদিরা
কোথায়?

সেখ ইব্রাহিম কাছে হাত দিয়া বলিল, "তোবা! মদ কি আমি রাখি? আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, চারিদিক মজাধাম সন্ধান করিয়া পূণ্যসকল করিয়াছি, মদের শলে আর আমার সংগ্রহ নাই, চির-স্বীকৃতির মত উহা ত্যাগ করিয়াছি।"

নোরেদীন বলিলেন, "না মিজা, মদ না হইলেই আমাদের চলিতেছে না। তুমি কোন সন্ধ্যা হইতে আমাদের জন্ত এক বোতল মদ আনিয়া লাও, তবে যদি তুমি মদের সোকায়ে না যাও কি মদ স্পর্শ না

কর, তবে তাহারও একটা উপায় বন্দিয়া বিতেছি। তুমি এই দুই বোহর লত, বেউকীর ঘরে একটা পান্য বাধা আছে, তাহাকে নড়ে লইয়া বীণ, তাহার পর মনের বৌকানের কাছে কোন পোক দেখিতে পাইলে তাহার হাতে কিছু বিয়া তাহাকে দিয়া মদ ভিজিয়ে ও এই পাখার পিঠে বান্ধিয়া এখানে উপস্থিত হইবে, আমি তাহা বুনিয়া লইব, একশ করিলে তোমারও বর্ধনকা হইবে, আমাদেরও আনন্দ-প্রসাদ করা হইবে।”

আবার দুই বোহর! গোতে সেখ ইব্রাহিমের জিহবার লাগার নকার হইল। সে মোহর দুইটি হস্তগত করিয়া বলিল, “তোমরা আমার বিদেশী অভিয, তোমাদের অস্ত্র এতটুকু কষ্টবীর্যকার না করিলে আমার অর্থ হইবে, আর পাখার আবৃত্তক নাই, আমি নিজেই আনিয়া দিতেছি।”—সেখ ইব্রাহিম মনের সন্ধানে ধাবিত হইল।

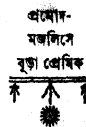
অন্যকালের মহোই সেখ মস্তহস্তে প্রত্যাখর্জন করিল, সে নানা প্রকার বর্ণনয় ও মৌসামর পানপাত্র বাহির করিয়া ফেলিল। নৌরেদীন ও রূপসী মস্তপানে প্রমুগ্নিত হইয়া উঠিলেন। তখন মহামনে পানবান্ধা আরম্ভ হইল। সেখ ইব্রাহিম দূরে দাঁড়াইয়া পয়স-পয়সকণ্ঠের সহিত রূপসী পায়স্তবাসিনীর মনোহর সঙ্গীত-সুধা পান করিতেছিল, কিন্তু অবশেষে আর সে ষেধাধারণ করিতে পারিল না, দ্বার-সরিকটে মাথা বাড়াইয়া বলিল, “বহুভাঙ্কা—জী, তোমাদের আমোদ দেখিয়া আমি বড় সুখী হইয়াছি।”

নৌরেদীন বলিলেন, “সেখজী, মদ্য করিয়া মদ আনিতে ত’ আমাদের সঙ্গে এ আমোদে যোগ না সেও কেন? তোমাকে ত’ আর জোর করিয়া মদ খাওয়াইব না, এল, আমাদের কাছে বিয়া একটু পানবান্ধা শোন, মাহুকের দাক্তী পাকিলে কি তাহার সব সখ চলিয়া যায়?”—“চলুক, আমোদ যেমন চলিতেছে চলুক, আমি খুব খুসী আছি” বলিয়া সেখ ইব্রাহিম কক্ষান্তরে অন্তর্হিত হইল।

রূপসী বুঝিলেন, সেখ অধিক দূর যায় নাই, ইব্রাহিমকে লইয়া তাহার একটু মজা করিতে ইচ্ছা হইল। তিনি নৌরেদীনকে বলিলেন, “সেখ নিকটেই আছে, দেখিতেছি, মনের প্রতি তাহার বড় ঝুগ। তুমি যদি এক কাজ কর ত’ বুড়াকে আমি মদ খাওয়াইতে পারি।” নৌরেদীন সহান্তে বলিলেন, “বল প্রেমসি, কি করিতে হইবে? আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি।” রূপসী বলিলেন, “উম্মাকে এখানে ডাকিয়া আমাদের কাছে বস। তাহার পর পানবান্ধা শুনিতে শুনিতে যখন সে মুগ্ধ হইবে, তখন এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া উম্মাকে খাইতে দাও, বোধ করি খাইবে না, যদি না খায়, তবে তুমি তাহা খাইবে, এবং যেন ভারি মাতাল হইয়াছ, আর বসিতে পারিতেছ না, এই ভাব দেখাইয়া শুইয়া ঘুমাইবার ভান করিবে। তাহার পর বা খা করার দরকার, আমি করিব।” রূপসীর মতলব নৌরেদীন সহজেই বুঝিতে পারিলেন, আমোদ কতখানি হইবে বুঝিতে পারিয়া, তিনি বড় আনন্দিত হইলেন। নৌরেদীন সেখ ইব্রাহিমকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “সেখজী, আমরা তোমার অভিয, তুমি প্রাণপণে অভিযিনসংকার করিতেছ, কিন্তু একটা বিষয়ে তোমার বড় ত্রুটি দেখিতেছি, আমাদের কাছে হ’লও বসিতেছ না কেন? আমাদের কাছে বসিলেও কি তোমার বর্ণ নষ্ট হইবে?”

সেখ ইব্রাহিম অরোহণ এড়াইতে পারিল না, পোকার একপ্রান্তে উপবেশন করিয়া সঙ্গীতানন্দে যোগদান করিল। নৌরেদীন বলিলেন, “আরে! অন্তরে বসিলে কেন? তুমি কি আমাদের পর? সন্ধ্যা এই হুন্দারটির কাছে আসিয়া বস।” সেখ আনন্দপূর্ণ অন্তরে এই আবেশ পালন করিল। নৌরেদীন রূপসীকে পান পরিবার ক্ত অরোহণ করিলে রূপসী মধুরবরে বৃদ্ধের মন-প্রাণ মোহিত করিবার ক্ত একটা প্রেমের পান রিলেন। বৃদ্ধের প্রাণে রসের তরঙ্গ বহিতে লাগিল।

গালতি শেষ হইলে নৌরেদীন এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া, সেখ ইব্রাহিমের দিকে তাহা প্রদান করিয়া দিলেন, “সেখজী, আমাদের একটু স্বাধা পান কর, আমরা তোমার অভিয।” সেখজী মাথা নাড়িয়া অব





হাত সরিয়া বসিয়া বলিল, “আমাকে ঐ কাজটিতে মাপ করিতে হইবে, বসিয়াছি ত’ বহুকাল মদ ছাড়িয়া মক্ষা সন্নিক্ত করিয়া আসিয়াছি, আর ও মলক কুর্কর করিব না।”—নোয়েদীন বলিলেন, “তুমি যখন আমাদের বাহ্য পান করিবে না, তখন আমিই তোমার বাহ্য পান করি, কি বল?”

নোয়েদীন মদ্যপান আরম্ভ করিলে রূপসী একটি সুগন্ধ আপেল ফলের অর্ধেকটা কাটিয়া তাহা সেখ ইব্রাহিমের হস্তে প্রদানোন্মত হইয়া বলিলেন, “সেখজী, ধর্ম্মনাশের ভয়ে ত’ তুমি মদ খাইলে না, এই ফলটুকু খাও, বড় উৎকৃষ্ট ফল।” সেখজী হৃন্দরীর দান প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। মস্তক নস্ত করিয়া, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া, সে ফল লইয়া খাইতে লাগিল। এদিকে নোয়েদীন ছই এক পাত্র মদ্য পান করিয়া চিং হইয়া শুইয়া পড়িলেন এবং নিদ্রাসুচক নাসিকা-গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রূপসী হাসিয়া হাসিয়া সেখকে কত মধুর কথা বলিতে লাগিলেন, শেষে নোয়েদীনকে দেখাইয়া বলিলেন, “সেখ দেখ, ইহার রকম দেখ, যখনই ইনি ছই এক পাত্র মদ পান, তখন ঘুমে অচেতন হইয়া পড়েন, আমাদের আমোদ-প্রমোদও শেষ হইয়া যায়। যাহাই হউক, উনি ওখানে ঘুমান, এস, তোমাতে আমাতে আমোদ করি।”

রূপসী একপাত্র মদ ঢালিয়া তাহা ইব্রাহিমের হস্তে প্রদান করিতে গেলেন। ইব্রাহিম মাথা নাড়িয়া বিস্তর নোষিক আপত্তি জানাইল; কিন্তু বুদ্ধ নোষিক যাহাই বলুক, মদের প্রতি তাহার বিলম্ব অস্বাভাবিক ছিল। অনেকের মতই সে গোপনে মদ্যপান করিয়া প্রকাশ্য নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিত।—রূপসীর আগ্রহ-পূর্ণ অহরোধ সে কোনমতে এড়াইতে পারিল না; তাহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিয়া এক চুমুকে তাহা নিঃশেষিত করিল।

দ্বিতীয় পাত্র প্রদানের সময় সেখ ইব্রাহিম কিঞ্চিৎ আপত্তি করিল, তাহার পর আর তাহার সন্মোচ বা আপত্তি রহিল না। সেখ কয়েক পাত্র পান করিলে, নোয়েদীন হাই তুলিয়া উঠিয়া বসিলেন, এবং হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, “সেখ ইব্রাহিম, আগ্নি তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়াছি। তুমি না বলিয়াছিলে, এখন তুমি মদ ছাড়িয়া ধার্মিক হইয়াছ, আর মদ স্পর্শও কর না?”

সেখ বড় অপ্রতিভ হইল, বলিল, “কি করি, হৃন্দরীর অহরোধ ত’ অগ্রাহ্য করা যায় না। তা যদি পাপ হয় ত’ ঐ হৃন্দরীরই হইবে, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি ত’ আর ইচ্ছা করিয়া মদ খাই নাই।” তাহা হউক, আর কোন আপত্তি রহিল না, তিন জনেই মহানন্দে মদ্য পান করিতে লাগিলেন।

টেবলের উপর একটিনাত্র বাতি জলিতেছিল, দেখিয়া রূপসী বলিলেন, “সেখজী, একটিনাত্র বাতি জালিয়া দিয়াছ, আলো তেমন খোলতাই হয় নাই। তোমার ঘরে দেখিতেছি, আলীট বাড়ি বুলিতেছে, আর একটু ভাল আলো কর না।”—সেখের মাথার ভিতর মদ উঠিয়া তখন চম্-চম্ করিতেছিল, সে বলিল, “হৃন্দরী, বড়ো মাছকে আর কেন কষ্ট দাও, তুমিই উঠিয়া বাড়ি জাল না, হৃন্দরী হাতে আলো বেকী খোলতাই হইবে। কিন্তু দেখিও, পাঁচ ছয়টার বেকী জালিও না।”—রূপসী উঠিয়া একে একে আলীট বাড়ি জালিয়া লিলেন। দিনের মত আলো হইল।—রূপসী আসিয়া বসিল সেখ তাহার সন্মোচ গল্প করিতে লাগিল। নোয়েদীন তাহার অজ্ঞাতসারে উঠিয়া গিয়া জানালাগুলি খুলিয়া দিলেন।

খানিক দূর অন্ধ-রাসিক তখনও নিদ্রিত হন নাই। তিনি টাইগ্রিস নদীর তীরস্থ একট প্রাসাদে বসিয়া অসভ্যপণের সহিত গল্প করিতেছিলেন, হঠাৎ তিনি উঠিয়া আসিয়া যে দিকে তাহার উপদান ছিল, সেই দিকের একটি জানালা খুলিয়া দিলেন, দেখিলেন, দূরবর্তী উদ্যান-ভবন আলোকমালায় সজ্জিত।—খানিক তৎপর্যন্ত উজ্জীরকে ডাকিয়া বলিলেন, “উজীর, তুমি কি ভাবে কাজকর্ম নির্বাহ কর, বৃষ্টিতে পারি না। আমি অল্পপবিত্র থাকি সবেও উদ্যান-ভবন এত আলো জলিতেছে কেন? আশা করি ত’ এরূপ আবেশ নাই।”



উজীর কি উত্তর দিবে, তাহা প্রথমে ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, “জাঁহাপনা, এই প্রাশাদরক্ষক সেখ ইব্রাহিম আজ চারি পাঁচ দিন হইল আমার নিকট বলে যে, যদি আমি অমুমতি দান করি, তাহা হইলে সে আপনার উদ্যানভবনে মোলাগণের একটি সভা বসায়। তাহাকে আমি বলিলাম, আমার বিশ্বাস, পরম খালিক খালিক মহোদয় ইহাতে যে আপত্তি করিবেন, এরূপ অস্থান হয় না, ভাল, তুমি তোমার ইচ্ছামুতাবে ওখানে মোলাগণকে সমবেত করিতে পার, আমি খালিকের অমুমতি লইয়া রাখিব। তাহার পর, জাঁহাপনা, নানা কর্ণে ব্যস্ত থাকায় আমি আপনার নিকট এ কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমার অপরাধ মার্জনা করুন। আমার অস্থান ইহাতেছে, সেখ ইব্রাহিম মোলাগণকে লইয়া সভা করিতেছে বলিয়াই আলোকমালা প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে।”

খালিক বলিলেন, “জায়কর, তুমি তিনটি গুরুতর অজ্ঞায় করিয়াছ; প্রথমতঃ, সেখ ইব্রাহিমের মত সামান্য একজন ভৃত্যকে এই প্রাশাদ ব্যবহার করিতে দিয়াছ। দ্বিতীয়তঃ, তুমি আমার অমুমতি গ্রহণ কর নাই; তৃতীয়তঃ, তাহার এরূপ করিবার কি অভিপ্রায়, তাহা তুমি অস্থান কর নাই।—ইহা উজীরের মত কাজ হয় নাই, আমি সেই বৃদ্ধ উদ্যানরক্ষকের কোন দোষ দেখি না, সকল দোষ তোমারই।”

উজীর দেখিলেন, খালিক তত অধিক ক্রুদ্ধ হন নাই, সুতরাং সকল দোষ নিজের ঘাড়ে লইয়া তিনি মার্জনা প্রার্থনা করিলেন। খালিক বলিলেন, “একেবারে মার্জনা ইহাতে পারে না, তবে তোমার অপরাধের লঘু শাস্তি দান করিব। শাস্তি আর কিছুই নয়, এই রাত্রে তোমাকে একটু কষ্ট করিতে হইবে। আমি ঐ উদ্যানভবনে উপস্থিত হইয়া মোলাগণের সভা দেখিতে চাই, তুমি ছদ্মবেশে প্রস্তুত হইয়া এম, মসজিদেও সঙ্গে লও, আমি শীঘ্রই ছদ্মবেশ ধারণ করিতেছি, অবিলম্বে আমাদিককে ওখানে যাইতে হইবে।”

অনন্তর ছদ্মবেশে তিন জনেই বাহির হইয়া পড়িলেন। উদ্যানভবনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দেখিলেন, দ্বার খোলা রহিয়াছে। এত রাত্রিতে দ্বার খোলা দেখিয়া খালিক বড় বিরক্ত হইলেন। উজীর বলিলেন, “তাড়াতাড়িতেই সেখ ইব্রাহিম দ্বার খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছে, বোধ হয়, আজ সে বড় ব্যস্ত, আমরা শীঘ্রই তাহার ব্যস্ততার কারণ বুঝিতে পারিব।”

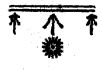
খালিক অতি দীর্ঘে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া, প্রাশাদ-কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, পরমরূপবান্ এক যুবক ও অলোক-সামান্তরূপবতী এক রমণীর সঙ্গে বসিয়া সেখ ইব্রাহিম মহানন্দে মত্ত পান করিতেছে। দেখিয়া খালিকের বিষয়ের সীমা রহিল না। সেখ ইব্রাহিম মত্তপানে বিম্বল হইয়া বলিল, “হুকুমি, পান না হইলে মদের আমোদ জন্মে না। তুমি ত’ অনেক পান করিয়াছ, এখন আমি একটু সঙ্গীতচর্চা করি, মনোযোগের সহিত শ্রবণ কর।”

সেখ ইব্রাহিম যে বৃদ্ধবয়সে মত্তচর্চায় মগ্ন, খালিক তাহা জানিতেন না, তাহার কাণে দেখিয়া খালিক অধিকতর বিম্বিত হইলেন। উজীরকে যুগ্মরে আস্থান করিয়া বলিলেন, “উজীর, দেখ, তোমার উদ্যানরক্ষক মোলাগণকে লইয়া কেমন গর্খালোচনা করিতেছে।” উজীর একটু দূরে অবস্থান করিতেছিলেন, খালিক বেরূপ স্বরে তাঁহাকে আস্থান করিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ ভয়ের সঞ্চার হইল। তিনি কম্পিতপদে দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া বাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার ভয় শতগুণে বদ্ধিত হইল। খালিক বলিলেন, “লোকজ্ঞানার স্পর্ধা দেখ একবার। আমার বাগানে আলিরা ইহারা আমোদপ্রমোদ করিতে সাহস করে। বাহা হউক, এই যুবক-যুবতীকে দেখিয়া আমার ক্রোধ দূর হইয়াছে, আমি এমন হুমকী নারী ও হুমকি পুরুষ কখন দেখি নাই। ইহারা কে, তাহা জানিতে আমার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, ইহারা কেনই বা এখানে আসিয়াছে, তাহাও জানা দরকার।”

ছদ্মবেশে



মজলিসেব
বসব



এ সন্ধান

প্রভাব



ইতিমধ্যে সেখ রূপটিকে জিজ্ঞাসা করিল, “হুম্মরি, তুমি কি বীণা বাজাইতে পার ?”—রূপসী হাসিয়া বলিলেন, “আনিয়া দেখ।”

উজীরকে সন্ধান করিয়া খালিক বলিলেন, “দেখ, ইব্রাহিম বীণা লইয়া হুম্মরীকে বাজাইতে দিতেছে, যদি হুম্মরী খুব ভাল বাজাইতে পারে, তবে আমি সন্ডে হইয়া বুৎবুৎতীকে ক্ষমা করিব, কিন্তু তোমার কীসি হইবে।”—উজীর বলিলেন, “আল্লা কল্লন, বাত যেন অতি খারাপ হয়।”—খালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহাতে তোমার লাভ ?”—উজীর করবোড়ে বলিলেন, “তাহা হইলে জাহাঙ্গীর আমদেশে ঐ হুম্মর-হুম্মরীর সঙ্গে একত্র মরিতে পারিব, খোদাবন্দ ঐ হুম্মর মুখ দেখিয়া মরিলে মরণেও বুঝি কষ্ট হইবে না।”



ব্যস্ত-কবলে



খালিক উজীরের রসিকতায় সন্ডে হইয়া যবনিকাঙ্কুরাল হইতে গীতবাত শুনিতে লাগিলেন।

কিয়ংকাল সঙ্গীত ও বাত শ্রবণ পরম পুলকিতচিত্তে খালিক গোপান-শ্রেণী দিয়া নিম্ন অবতরণ করিলেন, উজীরও উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাঁহার অনুদরণ করিলেন। খালিক উজীরকে বলিলেন, “উজীর, এমন উৎকণ্ঠ সঙ্গীত ও এমন মনোহর বাত আমি জীবনে শ্রবণ করি নাই, এমন কি, আমার কাশোয়াং ইসাক এই হুম্মরীর সহিত তুলনায় অতি নিকট গায়ক। আমার ইচ্ছা, এই হুম্মরীকে সমুখে বসাইয়া গীতবাত শুনিব, কিন্তু কি ভাবে ওখানে যাওয়া যায় ?”

উজীর বলিলেন, “জাহাঙ্গীর, আপনি যদি প্রকৃতভাবে উহাদের সমুখে বান, তাহা হইলে ইব্রাহিম আপনাকে চিনিবামাত্র ভয়ে প্রাণত্যাগ করিবে।” খালিক বলিলেন, “আমি বুকের মৃত্যুর কারণ হইতে ইচ্ছা করি না। আমার নাথায় একটা মতলব আসিয়াছে। ভূমি ও মঙ্গল এখানে অপেক্ষা কর, আমি আসিছি।”

খালিক বাগানের মধ্যে আসিয়া দেখিলেন, এক জন জেলে বাগানের দ্বার খোলা পাইয়া বাগানে প্রবেশ করিয়া, উদ্ভানত পুরুষগীতে গোপনে মাছ ধরিতেছে। খালিক ধীরে ধীরে তাহার নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। খালিকের ছদ্মবেশ দেখেও জেলে তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিল; জাল কেদারা সে তাঁহার পদতলে দুটাইয়া প্রাণ তিক্ত চাহিল। খালিক বলিলেন, “তোমার কোন ভয় নাই, ভূই ওঠ, দেখি কি মাছ পাইয়াছি।”

জেলে পাঁচ ছয়টি বড় মাছ পাইয়াছিল। খালিক সর্দাপেক্ষা বৃহৎ দুইটি মৎস্য লইয়া দড়ি দিয়া তাহাদের মূখ বাহিরেলেন, তাহার পর বলিলেন, “তোমার কাপড় আমাকে দে, আমার কাপড় তুই নে।”—জেলের সহিত পরিচ্ছদ বিনিময় করিয়া, খালিক তাহাকে বলিলেন, “তুই এখন বাড়ী চলিয়া যা, এখানে অপেক্ষা করিবার আবশ্যক নাই।”

জেলে মহা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। খালিক তখন জেলের বেশ ধারণ করিয়া দুইটি মৎস্য লইয়া উজীর ও মসজুর নিকট উপস্থিত হইলেন। উজীর তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া সর্দাপেক্ষে বলিলেন, “তোমার এখানে কি দরকার রে? চলিয়া যা এখান হইতে।”—খালিক এই কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। উজীর তখন খালিককে চিনিতে পারিলেন, লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “জাহাপনা, বান্দা আপনাকে চিনিতে পারে নাই, বেয়াদপি মাপ করিতে আজ্ঞা হয়। আপনি এই বেশে সেখ ইব্রাহিমের নিকট উপস্থিত হইলে, সে কোন প্রকারেই আপনাকে চিনিতে পারিবে না।” খালিক বলিলেন, “তবে তোমরা এখানে অপেক্ষা কর, আমি জেলেশিগিরি করিয়া আসি।”

সেখ ইব্রাহিমের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া খালিক বলিলেন, “সেখজি, আমি করিম জেলে, শুনিলাম, আপনি এখানে বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ করিতেছেন, আপনার ভাল মাছের দরকার হইতে পারে, তাই আমি দুইটি মাছ লইয়া আনিয়াছি, বড় ভাল মাছ, এইমাত্র নদীতে ধরিলাম।”

মাছের কথা শুনিয়া নৌরেকদীন ও রূপসী উভয়েই বড় পুলকিত হইলেন। রূপসী ইব্রাহিমকে বলিলেন, “সেখজি, জেলেকে ডাক, কি রকম মাছ দেখি।”—সেখজীর দিল তখন খুলিয়া গিয়াছিল, একে মনের নেশা, তাহার উপর হৃদয়ীর অমরোপ, তৎক্ষণাৎ জেলেকে ভিতরে আহ্বান করা হইল।

মৎস্ত দেখিয়া রূপসী বড় খুসী হইলেন; কিন্তু মত্তপানে সেখজীর তখন বড় তরল অবস্থা, উত্তীয়ার পর্যাঙ্ক সামর্থ্য নাই, সে বলিল, “জেলে ভাই, মাছ দুইটি কুটিয়া আমার পাকশালা হইতে পাক করিয়া আন, পাকের সরঞ্জাম সেখানে সকলই পাইবে।”

খালিক বিনা প্রতিবাদে মৎস্তহস্তে উজীরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “আমাকে ইহারা ভারি আদর করিয়াছে; কিন্তু মাছ কুটিয়া রাখিয়া দিবার জুকুম করিয়াছে।” উজীর বলিলেন, “আপনি সে জন্ত চিন্তা করিবেন না, আমি রাখিয়া দিতেছি, আমার অভ্যাস আছে।”—খালিক বলিলেন, “রন্ধনের অভ্যাস আমারও আছে, আমিই সব ঠিক করিয়া লইতেছি।”—খালিক উজীর ও খোজা সর্দারকে সঙ্গে লইয়া পাকশালায় প্রবেশ করিলেন।

মৎস্ত-রন্ধন হইলে খালিক তাহা পায়ে ঢালিয়া মজলিশে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহা রূপসীর সম্মুখে স্থাপন করিলেন। মৎস্তাহারে রূপসী ও নৌরেকদীন বড়ই পরিতুষ্ট হইলেন, তাঁহার মৎস্তের ও রন্ধন-নৈপুণ্যের তারিফ করিতে লাগিলেন। যতক্ষণ তাঁহারা আহার করিলেন, খালিক নিকটে দণ্ডায়মান রহিলেন।

নৌরেকদীন আহারাৎপানে খালিককে বলিলেন, “জেলে, তুমি যে মাছ ধরিয়াছ, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট মাছ কখনও ধাই নাই।”—নৌরেকদীন বুকের পকেট হইতে ত্রিশটি মোহর বাহির করিয়া জেলের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “কিছু বকশিদ্ লও। যদি আমার আর কিছু থাকিত, তাহাও তোমাকে দান করিতাম, যখন আমার অবস্থা ভাল ছিল, তখন তোমার সঙ্গে আমার পরিচর হইলে আমি তোমাকে বড় মাহুর করিয়া দিতাম।”



নোরেদীনকে প্রকাশ করিয়া নোরেদীনকে শ্রদ্ধা প্রদান করিলেন। খালিক বলিলেন, “সহাপ্ত, আপনি প্রকৃতই মহাত্মা ব্যক্তি, আপনি আমার প্রতি বরষা মজুদ প্রকাশ করিলেন, এমন অজুহাদ আমি কখনো কাহারও নিকট লাভ করি নাই, কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে—ওখানে একটি বীণ পড়িয়া আছে দেখিতেছি, বোধ হয়, এই ঠাকুরাণী গানবাজনা করিতে আনেন, আমার একই গানবাজনা শ্রবণের ইচ্ছা হইয়াছে।”

স্বপ্নবোধ

নোরেদীন রূপসীকে গান করিবার জন্ত অজুরোধ করিলেন। রূপসী জেলের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, তিনি বীণা বাজাইয়া হৃদয়ে গান আরম্ভ করিলেন। খালিক গান শুনিয়া তন্ময় হইয়া পড়িলেন, শতমুখে গায়িকার গান ও বাজের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

নোরেদীন প্রসন্নমনে বলিলেন, “জেল, দেখিতেছি, তুমি গানবাজনা বড় ভালবাস, এ বিষয়ে তোমার জ্ঞানও আছে, এই সুন্দরী গানে যখন তুমি এত সচ্ছন্দ হইয়াছ, তখন আমি এই সুন্দরীকে তোমায় দান করিলাম।”—নোরেদীন গৃহত্যাগের জন্ত উঠিলেন।

নোরেদীনের নিকট একশ ব্যবহার পাইবেন, রূপসী ইহা প্রত্যাশা করেন নাই। তিনি দীনমনে নোরেদীনের যথের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি কোথায় বাও, আগে আমার আরও দুইটি গান শ্রবণ কর।”—নোরেদীন বলিলেন, তখন রূপসী অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহার চুঃখময় জীবনের দুই একটি গান গাহিতে লাগিলেন, বীণার ভিতর দিয়া হৃদয়ভাঙ্গা বেদনা যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাহির হইতে লাগিল, তাঁহার অসহায় জীবনের কল্ল ভাবোচ্ছাস তাঁহার হৃদয়ের কণ্ঠস্থের সমীকৃত ধারণ করিল। রূপসী গান সমাপন করিয়া একখানি কম্বলে ঢোব ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন; আসন্ন বিরহ সম্ভাবনার তাঁহার প্রেমপূর্ণ নারীহৃদয় কাতর হইয়া উঠিল। কিন্তু রূপসীকে দান করিয়া নোরেদীনের মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভের স্ফার হইল না।

সকলোত সতরুণ
মর্গবেদনা

স্বপ্নবোধ

খালিক বিচলিত হইলেন। তিনি নোরেদীনকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, “মিঞাসাহেব, আপনার কথা শুনিয়া বোধ হইতেছে, এই সুন্দরী যুবতী আপনার ক্রীতদাসী, আর আপনি ইহার প্রভু।” নোরেদীন বলিলেন, “করিম, সত্যই অহমান করিয়াছ, কিন্তু এই সুন্দরী দাসীর জন্ত আমাকে যে সকল কষ্ট ও অজুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাহা যদি তুমি শ্রবণ কর, তাহা হইলে শতগুণ অধিক বিস্মিত হইবে,” খালিক বলিলেন, “তবে অজুহাদ করিয়া আপনার সেই কাহিনী বর্ণন করুন, শুনিতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে।”

তখন নোরেদীন তাঁহার জীবনের সকল কথা একে একে খালিকের গোচর করিলেন, কোন ঘটনার কথা বাদ দিলেন না। সকল কথা শুনিয়া খালিক বিজ্ঞাসা করিলেন, “এখন কোথায় যাইবে মনুষ্য করিয়াছ?” নোরেদীন বলিলেন, “কোথায় যাইব? আত্মা যেখানে লইয়া যান, সেইখানেই যাইব। পৃথিবীর সকল স্থানই আমার কাছে সমান।” খালিক বলিলেন, “আপনি যদি আমার কথা শোনেন, তবে আপনাকে আর কোথাও যাইতে হইবে না। আপনি বাসোয়ার ফিরিয়া যান। আমি আপনার মারকুৎ সেখানকার রাজার নামে একখানি পত্র প্রদান করিব। সেই পত্র বাসোয়ার রাজার হস্তে অর্পণ করিলেই তিনি তাহা পাঠ করিয়া আপনার প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আর কেহ আপনার উপর কোন অত্যাচার করিবে না।”

নোরেদীন বলিলেন, “করিম, তুমি যা যা বলিতেছ, তাহা বড়ই অজুত কথা। তুমি সামান্ত জেল, তুমি বাসোয়ার রাজাকে আমার জন্ত অজুরোধ করিবে, আর তিনি সেই অজুরোধ রক্ষা করিবেন, এ কিরূপ কথা?”

খালিক বলিলেন, “মিঞা নাহেঁব, ইহাতে আতর্ক্যের বিষয় কিছুই নাই, আপনাদের দেশের রাজা ও আমি বাল্যকালে এক মৌলবীর কাছে শিক্ষাভ্যাস করিয়াছিলাম, তাগাত্তে তিনি আজ রাজা, আমি জেলে, কিন্তু আমাদের পূর্ববন্ধন নষ্ট হয় নাই, আমি তাঁহাকে বন্দন বে অঙ্গরোধ করি, তিনি তাহাই রক্ষা করেন, আপনি আমার কথামত চলিয়া দেখিলেই সকল কথাই বুঝিতে পারিবেন।”

গৃহে কাগজ কলম সকলই ছিল। খালিক তাহা সংগ্রহ করিয়া বাসোরার রাজাকে নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিলেন,—পত্রের প্রথমেই লিখিতে হইল, “ককশাসাগর আমার নাম করিয়া এই পত্র লিখিত হইল”—খালিক বন্দন তাঁহার অধীনস্থ রাজপণের নিকট অবস্থ পাননীয় কোন আদেশ প্রদান করিতেন, তখন এইরূপ পাঠ লিখিতেন।

নিম্নে লিখিত হইল ;—

“মাবীর পুত্র হারুন অল-রসিদ
তাঁহার ভ্রাতা মহম্মদ জিনেকে এই
পত্র দ্বারা জানাইতেছেন যে, এই
পত্রবাহক, অর্থাৎ থাকান-উল্লাহের
পুত্র নৌরোদ্দীন এই পত্র তাঁহার
হস্তে প্রদান করিখামাত্র তিনি
তাঁহার রাজপরিচ্ছদে নৌরোদ্দীনকে
ভূষিত করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে
স্থাপন করিবেন, ইহাতে অন্তথা না
হয়। ইতি।”

খালিক পত্রখানি মুড়িয়া তাহাতে
মোহর করিলেন এবং নৌরো-
দ্দীনকে ইহার মধ্যবগত না করিয়াই
তাহা নৌরোদ্দীনের হস্তে প্রদান
করিয়া বলিলেন, “এই রাত্রিই
জাহাজ বাসোরায় যাত্রা করিবে,
আপনি আর বিলম্ব করিবেন না। আহাজের উপরেই ঘুমাইবেন।” নৌরোদ্দীন পত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ যাত্রা
করিলেন। রূপগী পারস্তবাসিনী প্রিয়তম কর্তৃক সেই মধ্যরাত্রিতে বিদেশে একাকী পরিত্যক্তা হইয়া
সোকার পাড়ী আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

নৌরোদ্দীন প্রাণাশ পরিত্যাগ করিলে দেখ ইব্রাহিম কঠোরচূড়িতে জেলের দিকে চাহিয়া বলিল, “আর
করিম, তুই ত’ হুইট মাহ আনিয়াছিলি, পাঁচগুণা পরদা বড় জোর তার দাম হইতে পারে। কিন্তু তাহার
পরিবর্তে তুই ত্রিশটা মোহর ও একটি পরম সুন্দরী দাসী পাইলি। মনে করিস্ না, এ সকলই তুই
একাকী ভোগ করিবি, আমাকে দাগীর অর্ধেক ভাগ দিতে হইবে, আর ত্রিশ মোহরের একটিও তুই
পাইবি না।”



সুন্দরী-
ভাগের
দাবী



আমর-বিরহের
আবেগ



उत्पत्ति का स्रोत

100

1	2
---	---

毒 々 々

ফকিরানী বলিল, "সকলই অতি ভুল, যেমন বাপান, তেমনই বাড়ী, সাধবন্দীও চূড়ান্ত; কিন্তু অসম্মান মনে হয়, ইহাতে একটি অভাব রহিয়া গিয়াছে। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তাই বলিতে হইতেন, নতুবা যিনিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি এই বাড়ীতে তিনটি জিনিসের অভাব দেখিতেছি।"

রাজকতা বিমিত হইয়া বলিলেন, "কল, মা, কল, কি কি তিনটি জিনিসের অভাব দেখিতেছেন, তিনবার কল আমার অভাব আগ্রহ হইয়াছে। সাধ্য হইলে, আমি সেই তিনটি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে ক্রটি করিব না।"

ফকিরানী বলিল, "প্রথম অভাব, ইহাতে বাকুশক্তিবিহীন পক্ষী নাই, ইহা এক অসাধারণ পক্ষী, নাম বুলবুল হেজার। এই পক্ষী থাকিলে, সকল জাতীয় পক্ষীই তাহার সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া, তাহার নিকটে উপস্থিত হয়। দ্বিতীয় অভাব, আপনার বাপানে সঙ্গীতকারী বৃক নাই, এই বৃকের প্রত্যেক পত্র এক একটি সুখ, প্রত্যেক পত্র হইতে স্নগদিত সঙ্গীতধ্বনি উৎপাদিত হয়, অতি মধুর সঙ্গীত, সম্পূর্ণরূপে হৃদয়বন্ধ। তৃতীয় অভাব, আপনার প্রাণাধে স্বর্ণবর্ণ জল নাই, এই জল এক বিষ্ণু কোন পাত্রে রাখিলেই অতি অমলময়ের মধ্যে পাত্র পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার পর সেই পাত্রে মধো একটি হৃদয় নির্বর হুটি হইয়া, অবিরত নির্বরধারা বহিতে থাকে, কখনও তাহা শেষ হয় না। এই তিনটি অল্পত দ্রব্য আপনার প্রাণাধ-সংলগ্ন উদ্ভূত থাকিলেই উদ্ভানের সকল ক্রটি দূর হয়।"

রাজকতা বলিলেন, "মা, আপনি এই কয়টি জিনিসের কথা জানাইয়া আমাকে অভ্যস্ত বাধিত করিলেন। পৃথিবীতে যে এরূপ বিচিত্র পদার্থ আছে, তাহা আমি জানিতাম না, কিন্তু তাহা কোথায় পাওয়া যায়, আমাকে দয়া করিয়া বলিয়া দিন।"

ফকিরানী বলিল, "মা, আপনি আমার প্রতি যে সৌজন্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আমি আপনাকে এই কয়টি অল্পত সামগ্রীর সন্ধান বলিয়া না দিলে, আমার অভ্যস্ত অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়। এই রাজ্যের মধ্যেই ঐ তিনটি দ্রব্য আছে, পাল্লভরাজ্যের সীমান্তে ভারতবর্ষ-সরিকটে ইহা দেখিতে পাওয়া যাইবে। আপনার প্রাণাধের নিকট গিয়া যে পথ সন্ধান করি। যদি কেহ বিশ দিন ধরিয়া ক্রমাগত এই পথে চলিতে থাকে, তাহা হইলে শেষ দিন সে বাহাকে দেখিতে পাইবে, সেই বাড়ি বাকুশক্তিসম্পন্ন পক্ষী, সঙ্গীতকারী বৃক ও স্বর্ণবর্ণজলের সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে।" ফকিরানী এই সকল কথা শেষ করিয়া, রাজকতার নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিদি তিনটি দিগ্ধে হস্তগত করা যাইবে, রাজকুমারী এ সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় প্রভবয় বৃষ্ণা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তাহার রাজকতাকে অভ্যস্ত বিমোহিত চিন্তাকুল দেখিতে গেলেন। এমন কি, তাহার যে আলিরাছেন, রাজকতা অন্তরনকতাবশতঃ তাহাও বৃত্তিতে পারিলেন না।

বামান প্রথমে কথা বলিলেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগিনি, তোমার কি হইয়াছে? তোমার সে গ্রন্থভার কোথায় গেল? তুমি কি অসুস্থ হইয়াছ? তোমাকে আজ চিন্তাকুল দেখিতেছি কেন? কেহ কি তোমার কোন অপমান করিয়াছে? তোমার কোন্ডের কারণ প্রকাশ কর, আমরা তাহা দূর করিতে পশ্চাৎপদ হইব না।"

রাজকতা অনেকক্ষণ পর্ধ্যত কোন উত্তর করিলেন না, এক হানেই হিরতাবে বলিয়া রহিলেন; তাহার পর অবনতবদন না তুলিয়া, দৃষ্টি না মিয়াইয়া, অভ্যস্ত কীটবরে বলিলেন, "না তাহা, আমার কোন্ডের কোন কারণ হুটে নাই, আমার কেহ অপমানও করে নাই।"

প্রাণাধে
বীর ৯০
বৈচিত্র্যের
অভাব



প্রিয় ভগিনী
মনোবন্ধন



বাসন বলিলেন, “না তপসি, তুমি আমার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিতেছ, নিশ্চয়ই কিছু প্রকৃত কথা বলিয়াছ, তোমার মুখ দেখিয়াই আমি তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বিশেষ কারণ ব্যতীত কখনও তোমাকে এমন বিশ্বাসিতা দেখিতাম না। এত দিন পরে তুমি কি আমাবিশ্বাসে পর হইতে পারিতেছ? বলিয়া দাও। নতুবা তোমার মনের কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব কেন?”

রাজকন্যা বলিলেন, “বাপার বিশেষ কিছুই নহে, তোমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিব না। তবিশ্বাসিন্দার, কিন্তু তোমরা যখন এত সীতাপিত্তি করিতেছ, তখন বলি পোনা। আমাদের পরলোকগত পিতা আমাদের জ্ঞাত যে গৃহ ও উদ্যান নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা হুজুর বটে; কিন্তু তিনিই সামগ্রী অত্যন্ত আছে, সেই তিনিই দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমাদের এই প্রাণাশ্রয় সকল বিষয়ে পৃথিবীর অন্তঃস্থক প্রাণস্বয়ংই পূরিত করিতে পারে। এক জন ককিরাণী আমাকে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন, যে হালে এই সকল সামগ্রী লাভ করিতে পারা যাইবে, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন, তিনিই তিনিই মধ্যে প্রথমটি বাক্যবিশ্বাসের পক্ষী, দ্বিতীয়টি সীতাপিত্তি বৃদ্ধ, তৃতীয় হুজুরের জল। আমি বুঝিতেছি, আমাদের গৃহ ও উদ্যানসমূহের পক্ষে এই তিনিই জিনিষ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়; হুজুর তাহা হস্তগত না হইলে আমি কোন্‌কালে হুজুর হইতে পারিতেছি না। তোমরা এই তিনিই তোমরা সীতাপিত্তি বাক্যবিশ্বাস করিতেছ কি না, আমি না, তবে আমি ইহা যেমন বুঝিয়াছি হোক, সংগ্রহ করিয়া চাই, যদি এ বিষয়ে তোমরা আমার সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি বড়ই উপকৃত হইব।”

রাজপুত্র বাসন বলিলেন, “তপসি, তোমার নিকট যে দ্রব্য প্রয়োজনীয় আমাদের নিকট তাহা অনাবশ্যক নহে, আমরা তাহার প্রতি উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারি না। তোমার কথা শুনিয়া, জিনিস কষ্ট সংগ্রহ করিবার জন্য আমিও বিশেষ আগ্রহবান হইয়াছি; ইহা হস্তগত করিবার জন্য আমি সাধাশুশ্রূষা চেষ্টা করিব। আমি আশা করি তাহাদের সম্মুখে যাত্রা করিব। কোন্‌ পথে যাইতে হইবে, তাহা আমাকে বলিয়া দাও; আমি আর এক দিনও বিলম্ব করিব না।”

রাজপুত্র পার্থিব বলিলেন, “দাদা, তোমার বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়া কর্তব্য নয়। তুমি আমাদের অভিভাবক, তুমি বাড়ীতেই থাক, আশা করি, আমাদের দেহময়ী তপসিনীও এ বিষয়ে অন্তমন প্রকাশ করিব না; এ বিষয়ে তোমারও অন্তঃকরণ উত্তীর্ণ নয়।”

বাসন বলিলেন, “পার্থিব, তোমার সংকল্প মহৎ, কিন্তু আমি তোমাদের সকলের বড়, কোন দায়িত্বপূর্ণ শুভকর কার্য সম্পাদনের চেষ্টা করা সর্বপ্রথমে আমারই কর্তব্য। আমি প্রথম হইলে তোমরা সেক্ষেপে চেষ্টা করিতে পার। আমি যাই, তুমি আমাদের প্রিয়তমা তপসিনীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এখানে অবস্থান কর।” বাসন তৎক্ষণাৎ বাজার আরোহণে ব্যস্ত হইলেন, সমস্ত দিন তাহাতেই অভিযোজিত হইল।

পরদিন প্রত্যন্ত রাজপুত্র স্বপ্নান ভ্রাজ্ঞা ও তপসিনীকে সঙ্গেহে আগিলন করিয়া, অথবা আরোহণ করিলেন। তিনি যখন বিহার প্রস্থ করিলেন, ঠিক সেই সময়ে রাজকন্যার মনে পড়িল, হয় ত পথে তাহার বাহার জীবন বিপন্ন হইতেও পারে। রাজকন্যা বলিলেন, “দাদা, পথে নানা প্রকার বিপন্ন আছে, তুমি যে বিপন্ন পড়িতে পার, আমার উদ্দেশ্যে সে কথা আমার মনে একেবারেই উদয় হইবে না, কে জানে, আমরা আরও তোমাকে কিরূপা পাইব কি না। তোমার আর শিলা কাজ নাই, অথ হইতে নাসো, এই সকল জন্মাপ্ত জিনিষ না হইলে আমাদের দিন চলিয়া যাইবে, কিন্তু যদি তুমি এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ করিতে গিয়া বিপন্ন পড়, তাহা হইলে আর আমাদের আকেশের সীমা থাকিবে না।”

বাক্যান্তশালা
পাখী,
সীতাপিত্তি
বৃদ্ধ, হুজুরের
জল



আমাদের
অভিভাবন



সাবয় পত্র পাঠ করিয়া রাজার অপেক্ষা অধিক ভীত ও বিস্মিত হইলেন। তিনি চাই তিনবার পত্রখানি পাঠ করিলেন, তাহার পর পত্রের উপরে ক্ষুদ্র অক্ষরে যে কয়টি কথা লেখা ছিল—(করুণাসাগর আমার নাম করিয়া এই পত্র লিখিত হইল)—সেই কথা কয়টি অন্তরে অনুভবাবে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেই টুকরাটুকু তিনি পাঠিয়া দেখিলেন।

সাবয় জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহারাজ, এখন কি কর্তব্য মনে করিতেছেন?”—রাজা বলিলেন, “খালিকের আদেশ পালন ভিন্ন আর কি কর্তব্য আছে? তিনি যাহা নিষিদ্ধাছেন, তদনুসারেই কাজ করিতে হইবে।”—সাবয় বলিলেন, “আমার তাহাতে কোন কথা বলিবার নাই, কিন্তু এ লেখা খালিকের হইলেও ইহাতে জরুরি চিহ্ন নাই। নৌরোদ্দীনের অভিযোগ শুনিয়াই সম্ভবতঃ খালিক তাহাকে এই পত্র দান করিয়াছেন, আপনাকে পদচ্যুত করা খালিকের ইচ্ছা নহে। আপনি এই আদেশে অবজ্ঞা প্রকাশ করিলে কোন ক্ষতি হইতে পারে না, এজন্য সমস্ত দায়িত্ব আমি গ্রহণ করিলাম।”

রাজা নৌরোদ্দীনকে সাবয়ের হস্তে সমর্পণ করিলেন। সাবয় তাঁহাকে গৃহে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাতে ভক্তজ্বিত করিলেন। তাহার পর গ্রাহারে নৌরোদ্দীন অজ্ঞান হইয়া পড়িলে তাঁহাকে তুণ্ডবৎ এক অন্ধকার গৃহে নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার আহার ও পানের জন্ত এক টুকুড়া রুটী ও খানিক জল সেই গৃহে রাখিত হইল।

সেই কারাকক্ষে সংজ্ঞালাভ করিয়া, নৌরোদ্দীন হতাশভাবে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, “জেলো! আমাকে কি প্রতারণাই করিয়াছে! আমি ত’ তাহার প্রতি কোন অন্তর্য ব্যবহার করি নাই, বরং তাহার বখেট উপকার করিয়াছি, সে এইরূপে প্রত্যাশ করিল? আমি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারি না যে, জেলের অভিমুখি মন ছিল, এজন্য হইবার কোন কারণ ত’ কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।”

নৌরোদ্দীন পরদিনও সেই কারাগ্রহণে বাস করিলেন। সাবয় নৌরোদ্দীনকে নিহত করিবার সংকল্প করিয়া, অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্ত একটা উপায় উদ্ভাবন করিলেন, পাছে খালিকের কোষভাঙ্গন হইতে হয়, এই ভয়ে বহুতে তাহাকে দণ্ডিত করিতে সাহস করিলেন না। তিনি পক্ষাশ্রয় জন ভৃত্যের মস্তকে কতকগুলি উপহারস্রাবা চাপাইয়া দিয়া, তাহা রাজসম্মিধানে লইয়া চলিলেন, এবং রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ, নতুন রাজা নৌরোদ্দীন সিংহাসন লাভ করিয়া আপনাকে এই উপহার পাঠাইয়াছেন।” রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নৌরোদ্দীনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন।

উজীর সাবয় কয়েকটি বলিল, “জাহাপনা, নৌরোদ্দীন আমাকে সাধারণের সম্মুখে যে ভাবে অপমানিত করিয়াছে, তাহা জানেন, আমার প্রার্থনা, তাহাকেও সাধারণের সম্মুখে প্রকাশভাবে হত্যা করা হউক এবং তাহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রত্যেক রাজপুত্রের বিধোষিত হউক।” রাজা এই প্রার্থনাই মনুর করিলেন। নগরের লোক ঘোষণা শুনিয়া নৌরোদ্দীনের পিতার গুণগ্রাম স্মরণ করিয়া, নৌরোদ্দীনের হত্যাগোর জন্ত পরিতাপ করিতে লাগিল।

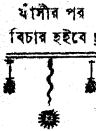
অন্তঃপুর উজীর নৌরোদ্দীনকে একটি বেতো ঘোড়ায় চড়াইয়া, নগরের পথ দিয়া বধ্যস্থানে লইয়া চলিলেন, প্রাণদণ্ড-সরিকটে তাঁহার বধ্যভূমি স্থির হইয়াছিল। রাজা স্বয়ং শত্রু-সংহার দেখিতে আসিলেন। চতুর্দিকে বহুসংখ্যক লোক এই শোচনীয় দৃশ্য দেখিবার জন্ত উপস্থিত হইয়াছিল। যাতককে হত্যার জন্ত প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলে যাতক নৌরোদ্দীনকে বলিল, “আমি রাজভৃত্য মাত্র, রাজদেশে পালন করিতেছি, আমার অপরাধ লইবেন না। মৃত্যুর জন্ত আপনি প্রস্তুত হন।”

কারাগৃহে
প্রেরিত বন্দী



শত্রু-সংহারের
সমাবেশ





খাসীর পূর্ব
বিচার হইবে!

নৌরোদীন শিলাসার কাতর হইয়া একটু জল চাহিলেন। সাবর বলিলেন, “খাতক, কাজ শেষ কর, ও জাহাঙ্গীরে পৌছিয়া জলপান করিবে।” উজীরের এই কথা উপস্থিত সকল লোক তাঁহার উপর মহাবিবক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু কেহ প্রকাশ্যভাবে কোন কথা বলিতে সাহস করিল না। এই সম্বন্ধে বুদ্ধিতে রাজা অখণ্ড হইতে দূরবর্তী প্রান্তরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “উজীর, বহু অর্থের পদখনি দেখিতেছি, এ কাহার অধারোহী?” উজীর বলিলেন, “বাহারই হউক, পরে জানা যাইবে; প্রথমে কান্দিতা হইয়া যাউক।”— রাজা বলিলেন, “তাহা কখন হইবে না, আগে দেখি, উহার কোথা হইতে আসিতেছে।” দেখিতে দেখিতে উজীরপ্রেরিত জাকর নিশান উড়াইয়া, অস্ত্রশ্রেণী সজ্জিত হইয়া অধারোহী পৈন্সদলের সহিত বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলেন।

খালিক নৌরোদীনকে পত্রসমেত বাসোরায় পাঠাইয়া পাঁচ ছয় দিন পর্যন্ত সনন্দ পাঠাইতে বিম্বত হইয়া ছিলেন, একদিন তিনি প্রাসাদান্তরে বিচরণ করিতে করিতে শুনিলেন, একটু প্রকোষ্ঠ হইতে বীণার সুরের সহিত অতি মধুর কণ্ঠধ্বনি উথিত হইতেছে। গান শুনিয়া তিনি এক জন বোজাকে গায়িকার পরিচয় জানিয়া আদিবার জন্ত পাঠাইলেন। বোজা আসিয়া পরিচয় দিলে তিনি জানিলে পারিলেন, প্রিয়তমের বিরহে রূপসী পারশুবাসিনী সঙ্গীতে বেদ করিতেছেন।



ককণ-মুচ্ছনার
সোভাগ্যোদয়

সহসা খালিকের পূর্বকথা স্মরণ হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ উজীর জাকরকে আছবান করিয়া বলিলেন, “তুমি অবিলম্বে বাসোরায় যাত্রা কর, নৌরোদীনের সনন্দ পাঠান হয় নাই, কথাটা আমি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তুমি স্বয়ং সনন্দ দিয়া আসিবে, আর যদি দেখ, সাবর শত্রুতাসাধনের জন্ত তাহার প্রাণবধ করিয়াছে, তাহা হইলে তাহার প্রাণদণ্ড করিবে, প্রীতথা রাজা ও উজীরকে এখানে ধরিয়া নইয়া আসিবে।”

জাকর রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নৌরোদীনকে তাঁহার সূত্রে উপস্থিত করাইলেন এবং তাঁহার পরিবর্তে সাবরের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন। খালিকের অহুমতির অপেক্ষায় সাবরের প্রাণদণ্ড সে সময়ে স্থগিত রহিল।

নৌরোদীন সাবরের নিকট কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা শুনিয়া খালিক ক্রুদ্ধভাবে আদেশ করিলেন, “নৌরোদীন, সাবরের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিবে।” নৌরোদীন বলিলেন, “না জাহাপনা, আমি আমার হস্ত এ ভাবে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না।” তখন খালিক নৌরোদীনকে বাসোরায় সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে বলিলেন, কিন্তু নৌরোদীন তাহাতেও সম্মত হইলেন না। খালিক নৌরোদীনের প্রার্থনামুগারে তাঁহাকে হৃদয় গণা করিয়া নিজের কাছে রাখিলেন, ধনদম্পত্তি, দাসদাসী, গৃহ কোন দ্রব্যেরই অভাব হইল না। রূপসী পারশুবাসিনীও নৌরোদীনের সহিত সম্মিলিত হইয়া, পরম সুখে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে লাগিলেন। বাসোরায় রাজাকে খালিক অত্যন্ত তিরস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কেবল উজীর সাবরের কোনক্রমে প্রাণ-রক্ষা হইল না। খাতক-হস্তে তাঁহার শির দেহচূত হইল।



খোঁরালাদের রাজা সন্নিধান দীর্ঘকাল মহাপরাক্রমে রাজ্যাশয়ন করিয়া, ক্রমে প্রৌঢ়ত্বের সীমান্তভাগে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি আপনাকে বড় হুঁচকা জ্ঞান করিতেন, তাঁহার কোন সন্তান ছিল না। তাঁহার শতাব্দিক রাজ্যের মধ্যে কেহই তাঁহাকে সন্তান উপহার দিতে সমর্থ হন নাই। পুত্রার্থে তিনি বিভিন্ন দেশ হইতে বহুবারে অনেক স্ত্রীস্বরী ক্রয় করিয়া আনিলেন; কিন্তু সকলেই বন্ধ্যা হইল।

এক দিন রাজা স্বাস্থ্যকর্ষে বাস্ত, এমন সময় এক জন খোজা সংবাদ দিল, দুস্থদেশ হইতে এক সদাগর এক রূপবতী দাসী লইয়া আসিয়াছে, রাজসাক্ষ্যে প্রার্থনা করে। রাজা দরবার-ভঙ্গে সাক্ষাতের অঙ্গুমতি দিলেন।

সভাভঙ্গে পাত্রমিত্রগণ সকলে স্বস্থানে প্রস্থান করিলে, রাজা সদাগরের সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। দাসীর প্রসঙ্গ উঠিলে রাজা বিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন দাসী, স্ত্রীস্বরী?”—সদাগর বলিলেন, “মহারাজ, স্বয়ং চক্ষু করণের বিবাদ উজ্জন করিতে পারেন। অল্প মতি করিলেই স্ত্রীস্বরীকে মহারাজের অঁচরণে উপস্থিত করিতে পারি।”

রাজ্যদেশে দাসী তাঁহার নিকট নীত হইল। দাসীর রূপ দেখিয়াই রাজা মুগ্ধ হইলেন। রাজা তৎক্ষণাৎ দাসীটিকে ক্রয় করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দাম জিজ্ঞাসা করায় সদাগর বলিল, “আমি ইহাকে হাজার মোহরে ক্রয় করিয়াছি, তিন বৎসর ধরিয়া ইহার প্রতিপালনে ও শিক্ষায় আমার আরও হাজার মোহর খরচ হইয়াছে; মহারাজের কাছে দরদাম করিতে ইচ্ছুক নহি, আমি দাসীটিকে মহারাজের চরণে উপহার দান করিতে ইচ্ছা করি।” রাজা বলিলেন, “বিদেশ হইতে যে সকল সদাগর বাবসার করিতে আসে, তাহাদিগের নিকট হইতে উপহার গ্রহণে আমার ইচ্ছা নাই। তুমি



দশ সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রা লইয়া তবুও দাসীটিকে আমার নিকট বিক্রয় কর।”—সদাগর মহাসন্তোষিত হইয়া লইয়া স্বদেশে চলিয়া গেল, স্ত্রীস্বরী রাজ্যভাগ্যের প্রেরিত হইল। রাণীর মত সে প্রতিপালিত হইতে লাগিল। দাসীগণ এই নবজাতা মহিষীকে স্নানোত্তর করিবার জন্য তিন দিন সময় প্রার্থনা করিল। তিন দিন পরে রাজা প্রেমব্যাহিত প্রণীড়িত হইয়া স্ত্রীস্বরীসম্মুখে যথানির্দিষ্ট প্রাসাদ-কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রাজা দেখিলেন, রাজা বাতায়নপথে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া, দরজার দিকে চাহিয়া আছেন। রাজাকে দেখিয়াও তিনি সোফা হইতে উঠিলেন না। অভ্যর্থনা করা ত’ দূরের কথা।

রাজা
কুমার
দাসের
ও রাজ-
কন্যা



আনন্দনা
সুন্দরী



রাজা মুক্ত প্রেমিকার এইরূপ ব্যবহারে বড় বিস্মিত হইলেন, এমন হৃদয়ী, কিন্তু লাগামারিক ব্যবহার সম্বন্ধে এতদূর অজ্ঞ! রাজা রাণীর নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কত আদর করিলেন, সোঁপা আগ্রহভরে হৃদয়ীর সৌন্দর্য-পুষ্টিত উত্তাদের শব্দ চুখনরখা মুক্তি করিয়া দিলেন,—আলিঙ্গনে রাণীর পেশবলীকর দেখকে শিষ্ট করিলেন। তথাপি রাজা নির্দোষ!

রাজার মনে তথাপি অসন্তোষের সঞ্চার হইল না, তিনি রূপসী-রাণীকে কোঁড়ে বকাইয়া অসংখ্য ভালবাসার কথা জানাইলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, যদি কোন জুখে কি কোঁড়ের কারণ থাকে, তাহা জানাইতে বলিলেন, কিন্তু হৃদয়ী নিরুত্তর!

নির্দোষ
প্রেমিকা



অন্তঃপর রাজা দামীগণকে আহ্বান করিতে বলিলেন, রাণীকে সমুখে লইয়া তিনি আহ্বার বলিলেন, কিন্তু যুবতী অবনতমুষ্টিতে আহ্বার করিতে লাগিলেন, একটুও কথা বলিলেন না।

অবশেষে রাজা ভাবিলেন, এ কি হোবা! এমন হৃদয় রূপ, এমন কমলীয় কাজ, এমন লাভদায়ক দেখ, সর্বদেহে যৌবন উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছে, অথচ যুবতী বাকশক্তিহীন! বিধাতা কখন কি এমন অজ্ঞায় বিচার করিতে পারেন? রাজা দামীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার রাণীকে কোন কথা বলিতে শুনিয়াছে কি না। তাহার বলিল, “জামরা এক দিনের মধ্যে তাঁহার একটুও কথা শুনি নাই, আমরা ইহার কোন কারণও অনুমান করিতে পারি নাই।”

রাজা দামীগণের মুখে এই কথা শুনিয়া অশ্রিত হইলেন, যদি কোন জুখে হৃদয়ী নির্দোষভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন তাহা, রাজা যুগ্মগীতের আরোহণ করিতে বলিলেন। রমণীগণ গান গাহিতে, নাচিতে, আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাণী এক ধারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাজা সারিমান দামীগণকে বিদায় করিয়া দিয়া, আলোকিত প্রমোদকক্ষে তরুণীর সহচর্য্যে একাই বাপন করিবার গুরু করিলেন। তিনি তরুণীকে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করিয়া প্রায়পূর্ব যুগ্মের বলিলেন, “হৃদয়ী! তোমার সৌন্দর্য্যে আমি বিমুগ্ধ হইয়াছি। আমার শত শত শয্যাঙ্গিনী আছে, মহিষী আছে, কিন্তু তথাপি আমি তোমাকে আমার প্রাণের মহিষীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিব। তুমি একবার আমার সহিত কথা বল।”

কিন্তু তরুণী তথাপি নীরব রহিলেন, তবে রাজার আলিঙ্গনপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লইলেন না। রাজার ব্যবহারে তিনি যে অঙ্গসর নহেন, তাঁহার ব্যবহারে তাহা পরিষ্কৃত হইয়া উঠিল। রাজা পুনঃ পুনঃ তরুণীকে সৌহার্দ্য করিয়া, তাঁহার মুখের কথা শুনিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন না।

উজ্জল দীপালোকে হৃদয়ীর ভুবন-ভুলান রূপ উজ্জলি উঠিতে লাগিল। রাজা আশ্চর্যবিত্ত হইয়া সেই রূপের সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তরুণীর রূপশ্রুতি দেখে যৌবনের জ্যোতীক দর্শনে রাজা প্রমোদবেশে তাঁহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া, অতুল সুখ অল্পভব করিলেন। তিনি বলিলেন, এই অপূর্ব সুস্মৃতি অজ্ঞাত—পুরুষের কলিত পূর্ণ পূর্ণ ইহার কোমার্গ্য হরণ করিতে পারে নাই। রাজা মহানন্দে তাঁহার সহিত নিশা-বাপন করিলেন। হৃদয়ীর পক্ষ হইতে কোন প্রকার প্রতিবাদের লক্ষণ প্রকাশ পাইল না।

যৌবনের
জ্যোতীক



মননোন্মত্তে এক বৎসর কাটা গেল, রাজা এক দিনও রাণীর মুখে কোন কথা শুনিতে পাইলেন না। কিন্তু সে ভক্ত রাণীর প্রতি তাঁহার প্রেমের হ্রাস হইল না, তিনি তাঁহার প্রতি প্রেম, অল্পগ্রহ ও বন্ধ প্রকাশে স্রষ্ট করিলেন না। প্রতিদিন তাঁহার প্রশ্রয়বোধ বর্ধিত হইতে লাগিল। কিন্তু রাণীর মুখে কথা স্রষ্ট না, এক দিনের ভক্তও তাঁহার মুখে হাসি দেখা গেল না। রাজা কত কথা বলিলেন, রাণী নতমুষ্টিতে শুনিতে, কোন কথা যে তিনি বলিতে পারিতেছেন, তাঁহার মুখ দেখিয়া এক্ষণে প্রকাশ হইত না।



অবশেষে রাণীর মৌর্য হইল। একদিন তিনি রাজাকে বিবর্তিত ও শূন্যকৃত করিয়া বলিলেন, "মহারাজ! আমার মৌর্যত্ব এত দিনে তুমি হইয়াছ, আপনাকে আমার অনেক কথা বলিবার আছে, কিন্তু কোথা হইতে যে কথা আরম্ভ করি, কোন কথা আগে বলিয়া কোন কথা পরের জন্ত রাখিয়া দিই, তাহা কিছুই ভাবিয়া পাইতেছি না। আপনি আমার প্রতি যে অলম্ব্য অমুগ্রহরূপী বর্ষণ করিয়াছেন, সে জন্ত সর্বপ্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করা আমার কর্তব্য। বাহা ইউক, আমি বিশেষ আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আপনার এই জলীম অমুগ্রহ বার্ষ হয় নাই, ইহার পরিবর্তে আমি আপনাকে একটি সম্ভান উপহার দান করিব, তদ্বারা করি, আমার পর্ভহ সম্ভান পুস্তকদ্বানই হইবে। যদি আমার পর্ভে সম্ভান জন্মগ্রহণ না করিত, তাহা হইলে আমার জীবনে মৌর্যত্বের অবকাশ হইত না; আমি আজীবন নির্দ্বাক থাকিতাম এবং আপনাকে কখন ভালবাসিতাম না; কিন্তু এখন আমি আপনাকে প্রাপ্ত ভরিয়া ভালবাসি, চিরদিন এমনই ভালবাসিব।" এই বলিয়া রাণী বৃদ্ধ রাজার আবক্ষোবিশিষ্ট ষেত শ্রুত চুষন করিলেন। রাজাও শুভসংবাদে আনন্দপূর্ণ হইয়া রাজীকে আলিঙ্গন দান করিলেন। রাজার হৃদয় অনির্বাক্তনীয় আনন্দরসে ভাসিতে লাগিল। রাজা সেই আনন্দ সর্বসমক্ষে জ্ঞাপন করিবার জন্ত দরিত্রগণের মধ্যে ও দেশের নানাবিধ সংকার্যে লক্ষ স্বর্ণ-মুদ্রা বিতরণের আদেশ প্রদান করিলেন।

এই আদেশ দান করিয়া রাজা মহিষীর কক্ষে প্রত্যাগমন করিলেন, রাণীকে বলিলেন, "প্রাণাধিক, আমার এখন একটি কোতুহল নিবারণ কর, এক বৎসরাধিক কাল তুমি আমাকে একটি কথাও বল নাই, একবারও ও বিধুমুখে হাসি দেখি নাই, অধিক কি, হৃদয়াবেগে আমি তোমাকে যত কথা বলিয়াছি, তাহার এক বর্ণও যে তোমার কণে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা পর্যন্ত তুমি আমাকে বৃত্তিত দাও নাই, এমন অদ্ভুত বাক্যসংঘম আমি কখন দেখি নাই, গল্পও কখন প্রবণ করি নাই, এই কঠোরতার অর্থ কি, তাহা জানিবার জন্ত আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি, আমার উৎসুকতা নিবারণ কর।"

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, শিতাবাত ও আশ্বীর-বজ্রের নিকট হইতে চিরদিনের জন্ত কোণাথ কোন অপরিচিত রাজ্যে অপরিচিত লোকের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি, স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি, অবশেষে মৃত্যু আর কখন দেখিতে পাইব না, এই সকল ভাবিয়া এবং দাসীজীবনের দুর্যোগের কথা শ্রবণ করিয়া আপনার আনন্দে আমি আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি নাই, আপনার প্রশংসা-নিবেদনে আমার তৃপ্তি হয় নাই, নানা প্রকার আত্মদ-প্রমোদেও আমার মন বসে নাই। আমি যখন মনে করিতাম, আমি রাজকন্তা হইয়াও অন্তের ক্রীতদাসী, দেখে রাজশোণিত প্রবাহিত হইলেও আমি অপরের খরিদা দাসী, কোন কার্যে স্বাধীনতা নাই, কোন বিষয়ের অধিকার নাই, তখন আমার প্রাণের মধ্যে হুহু করিয়া জ্বলিতে থাকিত, আপনার এই অমুগ্রহ, রাজপ্রশংসা আদর, আলিঙ্গন, চুষন সকলই বিষবৎ মনে হইত, তবে আমি আপনার খরিদা দাসী, কোয় বৎসরো-উপর আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, তাই আমি আপনার কোন কার্যের প্রতিবাদ রূপে তাঁহার স্বাধীনকে

রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন, "তবে কি তুমি রাজপুত্রী? রাজপুত্রী হইয়া তুমি দাসী-শিষ্যত্বের মহিষী হইয়া, পড়িলে? তোমার পিতা কোন রাজ্যের অধিপতি, তোমার ভাই-ভগিনী, জ্ঞাতীও ভ্রাতাকে বলিলেন।

নাম কি? কী এ সকল কথার উত্তর দিয়া আমার আশ্রয় দূর কর।" এতদ্বারা সন্তোষিত হইয়া

রাণী বলিলেন, "মহারাজ, আমার নাম শুভদেবী। আমি এই অভিপ্রায়ে প্রসবিত হইলাম।

কিন্তু। পিতা তাঁহার মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্য আমার ভ্রাতা নাগে হইলেন; তিনি ব্রহ্মিলেন, রাণী সত্যই বান। আমার ভ্রাতাও আর এক জন কন্যাতালী সমুদ্রাশ্রিত হইল।



অন্তঃপুরে রাজী কিছু খাতসামগ্রী আনিবার জন্ত দাসীগণকে আদেশ করিলেন। আবেশমাত্র দাসীরা প্রচুর খাতস্বরা লইয়া আসিল। কিন্তু রাজীর ভ্রাতা ও মাতা বলিলেন, “রাজার সহিত আলাপ-পরিচয়ের পূর্বে তাঁহার গৃহে আহার করা শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হইবে।” দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের গম্বুল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, নানারস, ও সুখবির হইতে অমিশিখা নির্গত হইতে লাগিল, চকুও অধর্ম হইয়া উঠিল। রাজা এই দৃশ্যে অত্যন্ত ভীত হইলেন। ইহার কোন কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

রাজী মাতা ও ভ্রাতা-ভগিনীগণের জন্ত বিহার লইয়া, রাজা যে কক্ষে ছিলেন, সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া রাজার ভয় ভুল হইয়া, মনে সাহসের সঞ্চার হইল। রাজী রাজাকে বলিলেন, “মহারাজ, আমি যে প্রকৃতই আপনার প্রতি অহরহ, তাহার বোধ হয় উপযুক্ত প্রমাণ পাইয়াছেন, কারণ, আমার ভ্রাতা ও জননী সহিত আমার যে কথা হইয়াছে, তাহা আপনি শুনিয়াছেন সন্দেহ নাই। আমার জননী ও ভ্রাতা আপনার সহিত পরিচিত হইবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। আপনি তাঁহাদের সহিত আলাপ করিয়া, আমাকে পরিতৃপ্ত করুন।”

পারস্তরাজ রাজীর অহরহে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেখানে রাজার প্রতি সকলই বিশেষ সম্মান-প্রদর্শন করিলেন। অনেকগুলি নানা বিষয়ে কথোপকথনের পর তাঁহারা একত্র আহায়ে মনঃসংযোগ করিলেন। আহায়ের পর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আলাপ চলিল। অবশেষে রাজা তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কক্ষে বিশ্রামার্থে প্রবেশ করাইয়া স্বয়ং শয়নদক্ষিণে প্রবেশ করিলেন।

যথাকালে রাজী গুলনার একটি পুস্তকখান প্রসব করিলেন, রাজ্যে আনন্দের স্রোত চলিতে লাগিল, বিহারাত্রি উৎসবের বিরাম রহিল না। রাজার মনে যে আনন্দের সঞ্চার হইল, তাহা বর্ণনাতীত। রাজপুত্রের নাম হইল বাসের।

রাজী সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হইলেন। এক দিন রাজা, রাজীর মাতা ও ভ্রাতা সমুদ্রপ্রান্তবর্তী একটি কক্ষে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এমন সময় এক জন ধাত্রী বাদ্যেরক কোড়ে লইয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। সমুদ্ররাজ সালে তৎক্ষণাৎ প্রাতোখান করিয়া বাদ্যেরক কোড়ে লইয়া তাহার মুখচুমন করিলেন এবং নানা প্রকারে তাহাকে আদর করিতে লাগিলেন। তাহার পর আদর করিতে করিতে তাহাকে কোড়ে লইয়া বাতায়নপথ দিয়া সমুদ্রবক্ষে লক্ষপ্রদান করিয়া মুহূর্তমধ্যে অদৃশ হইলেন।

পারস্তরাজ ইহা দেখিয়া মহা ভীত হইলেন। তিনি ভাবিলেন, পুত্রকে জীবিত অবস্থায় ফিরিয়া পাইবার আর আশা নাই। অঙ্গ-ধারায় তাঁহার বন্ধ-হুল ভাসিয়া গেল। রাজী গুলনার রাজাকে প্রবেশ-দানের জন্ত বলিলেন, “মহারাজ, আপনি ভয় ভ্যাগ করিয়া ধৈর্যধারণ করুন। আপনার পুত্র, আমারও পুত্র, আমি তাহাকে আপনার অপেক্ষা আর ভেঁহ করি না। কিন্তু আপনি দেখিতেছেন, আমার মনে কিছুমাত্র ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, ভয়ের কোন কারণও নাই। আপনি শীঘ্রই দেখিবেন, রাজকুমার তাহার মাতুলের কোড়ে চড়িয়া আপনার লমুখে উপস্থিত হইবে। আপনার পুত্র জন্মের হইবে ডাকিয়া আপনি ভয় করিবেন না, রাজপুত্র আপনার পুত্র হইলেও আমার গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং জল হুল উভয় হার্নেই তাহার জীবন-ধারণ সমান সম্ভবপর হইবে।” রাজীর কথা শুনিয়াও রাজার মনে বাধনার সঞ্চার হইল না।

কিয়ৎকাল পরে রাজা সালে সমুদ্রগর্ভ তেজ করিয়া উঠিলেন, এবং ভাগিন্দেবকে কোড়ে লইয়া রাজার কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া বেন হৃৎসবে প্রাণ পাইলেন। পুত্র মাতুলের কোড়ে স্নিগ্ধভাবে আছে দেখিয়া তিনি পুলকিত হইলেন। সালে ভগিনীপতিকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “মহারাজ,

বোধ হয়, আনার বাক্যেরে অত্যন্ত ভীত বইয়াছিলেন, ভীত হইবার কথা, কিন্তু আমার প্রভাব আপনি অবশ্য নন বলিয়াই ভীত হইয়াছিলেন। আমি রাজকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া সমুদ্রগর্ভে অবতরণ করিবার পূর্বে শিশুকে মন্ত্রপুত্র করিয়াছিলাম। আমাদের সকল শিশুকেই এই ভাবে মন্ত্রপুত্র করা হয়। এই উপায়ে আমাদের শিশুগণ জলস্থল সকল স্থানেই সমানভাবে গতিবিধি করিবার ক্রমতা পায়। রাজকুমার বাদের ভবিষ্যতে ইচ্ছা করিলেই সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিয়া, আমাদের সুবিশীর্ণ সমুদ্রতলবর্তী রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারিবে। জলময় হইয়া তাহার প্রাণ-বিয়োগের আর আশঙ্কা রহিল না।”

বাদেরকে ধাত্রী-ক্রোড়ে প্রদান করিয়া, সালে একটি ক্ষুদ্র বাস্তু খুলিলেন। এই বাস্তু তিনি তাঁহার সমুদ্রগর্ভস্থ প্রাসাদ হইতে আনয়ন করিয়াছিলেন। বাস্তুটি বহুমূল্য মণি-মাণিক্য-হীরক-রত্নে পরিপূর্ণ। সালে পারস্তরাজের হস্তে সেই বাস্তুটি প্রদান করিয়া বলিলেন, “আপনি আমার ভগিনীর প্রতি যে অত্যাচার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চিহ্নস্বরূপ এই সামান্য হীরক-রত্ন আপনাকে উপহার প্রদান করিতেছি, আশা করি, ইহা আপনার রাজত্যাগের স্থানলাভের অযোগ্য হইবে না।”

রাজা সেই মহামূল্য রত্নরাজি দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, এরূপ মহার্য্য রত্ন পৃথিবীতে চর্লভ। কিন্তু তিনি ইহা গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অবশেষে সালের বিশেষ অমুরোধে ও রাজার ইচ্ছিতে তিনি ত্হা গ্রহণ করিলেন, সালেকে বলিলেন, “আপনার বন্ধুতা ও সম্ভবত্বের চিহ্নস্বরূপ আমি ইহা সমস্তের দান করিবা।” অবশেষে সালে, তাঁহার মাতা ও ভগিনীগণ রাজারাজীর নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

রাজপুত্র বাদের দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার রূপগুণও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাঁহার মাতুল ও মাতামহী সমুদ্রগর্ভ হইতে অনেক সময়ই বাদেরকে দেখিতে আসিতেন। রাজপুত্র অতি অরকাণের মধ্যে নানা বিস্তার স্থাপিত হইয়া উঠিলেন এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়স্ককালে তিনি তাঁহার শিক্ষক অশেকা অধিক জ্ঞান উপার্জন করিলেন। তাঁহাকে যৌবন ও ধর্মজ্ঞানে সমলভ্য দেখিয়া বুদ্ধরাজা রাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে রাজ্যপদে অভিষিক্ত করিবার জন্য বিশেষ বাস্তু হইয়া উঠিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে রাজা পুত্রকে স্বকীয় সিংহাসনে সংস্থাপিত করিয়া, তাঁহার মন্তকে বহুতে রাজমুকুট প্রদান করিলেন এবং পুত্রের করচূষন করিয়া সিংহাসন-নিম্নে উজীর ও আমীরগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন।

সিংহাসনে বসিয়া অতিবিক্ত হইয়া বাদের তাঁহার জননী চরণ-বন্দনা করিবার জন্য তাঁহার মহলে প্রবেশ করিলেন। রাজা পুত্রের মন্তকে রাজমুকুট দর্শন করিয়া পরম-পুলকিতচিত্তে পুত্রের শিরচূষন করিয়া তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

বাদের প্রথম বৎসর অতি দক্ষতার সহিত পিতৃরাজ্য শাসন করিলেন। তাঁহার শাসনে প্রজাবর্গের সুখসুখি বৃদ্ধি হইল। পরবৎসর বুদ্ধরাজার অস্থতি লইয়া বাদের যুগয়ার বাজা করিলেন। যুগয়ারাজাই প্রকৃত উদ্বেগ নহে, রাজ্যের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করিয়া যে সকল কুপ্রথা বা অনিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহা রোধস্বরূপেই তাঁহার প্রকৃত উদ্বেগ ছিল।

বাদের রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর বুদ্ধ রাজা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন; ক্রমে পীড়া সঙ্কটাপন্ন হইল, অকস্মেৎ সেই রোগেই তাঁহার প্রাণ বর্হিত হইল। অন্তিমকালে রাজা তাঁহার আত্মীয় ও গুহ্যবাহ-বর্গের প্রত্যেককে এই জন্য পদে নিযুক্ত রাখিলেন যে, তাঁহার চিরদিন সমান বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহার পুত্রের সেবা করিবেন, এবং তাঁহার প্রতি অহরহুৎ থাকিবেন। রাজার বুদ্ধসংবাদ পাইয়া বাদেরের মাতুল মহারাজা সালে ও তাঁহার মাতামহী তাঁহার শোক সহ্যভূতি প্রকাশ করিবার জন্য পারস্ত-রাজধানীতে সদাগত হইলেন।

সমুদ্ররাজের
যৌতুক



পুত্রবির
রাজমুকুট



রাজা বারোজন কিছুদিন পর্যন্ত অত্যন্ত শোকাভূত ছিলেন। সালে নানা প্রকার সন্মানবাক্যে তাঁহার কষ্ট দূর করিয়া, তাঁহাকে পুনর্বার রাজকাৰ্য্যে নিৰ্ব্বিচিষ্ট করিলেন। তাহার পর তিনি স্বরাজ্যে প্রত্যাবৰ্ত্তন করিলেন।

কিন্তু ভাগিনেয়কে দেখিবার জন্য সালে মধ্যে মধ্যে পানতরাজধানীতে উপস্থিত হইতেন। সালে-প্রধান-সালরকালে আহাঁরহানে উপবেশন করিয়া, সালে ভগিনীর নিকট ভাগিনেয়ের রাজকুণ্ডলের কথা বলিতে বলিতে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আত্মপ্রশংসা শুনিয়া বাদেদের মুখ লজ্জায় রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি একটি উপধান লইয়া নিজার ভাণ করিয়া শয়ন করিয়া রহিলেন।



অবশেষে সালে বলিলেন, “ভগিনি, তোমার পুত্র রূপে-গুণে এমন অধিতীয় হইয়া উঠিয়াছে, তথাপি তাহার বিবাহের কোন চেষ্টা করিতেছ না, ইহা আমার নিকট বড় আশ্চর্য্যের বিষয় বোধ হয়। আমার বোধ হয়, বাদেদের বয়স অষ্টাদশ বৎসর হইয়াছে, এ বয়সে কোন রাজপুত্রেরই অবিবাহিত থাকা কর্তব্য নহে। তুমি নিশ্চেষ্ট আছ বাটে, কিন্তু আমি এ বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকিব না, আমি দেখি, কোন রাজ্যে বাদেদের উপযুক্ত বিবাহযোগ্য রাজপুত্রী পাওয়া যায় কি না।”

রাজমাতা গুলনার বলিলেন, “ভাই, তুমি যে প্রশংসা করিতেছ, এ বিষয়ে কোন কথা এ পর্যন্ত যে আমি চিন্তা করি নাই, তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। আমার পুত্র কোন দিন বিবাহের জন্য বিদ্যুৎপ্রদেহী হইয়া প্রকাশ করে নাই। কিন্তু তোমার মতেই আমার মত; আমার অজ্ঞরোধ, তুমি বাদেদের উপযুক্ত একটি পাত্রীর সন্ধান কর, যেন বাদেব তাহাকে ভালবাসিয়া সুখী হইতে পারে, যেন সে সকল বিষয়ে বাদেদের উপযুক্ত হয়।”

সালে বলিলেন, “আমি একটি মেয়েকে জানি, কিন্তু সে কে, তাহা তোমাকে বলিবার পূর্বে আমার জানা আবশ্যক, বাদেব সত্যই নিমিত্ত কি না।—আমি এ সাবধানতা অবলম্বন কেন করিতেছি, তাহার কারণও তোমাকে জানাইব।”—রাজমাতা বাদেদের সম্মুখে উঠিয়া আসিয়া তাঁহার চোখ-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ভ্রাতার পাশে গিয়া বলিলেন, রাজমাতা বলিলেন, “বাদেব সত্যই বুঝাইয়াছে, তুমি সকল কথা নির্ভয়ে বলিতে পার।”—কিন্তু বলা বাহুল্য, বাদেব তখন সত্যই নিমিত্ত হন নাই, নিজার ভাণ করিয়াছিলেন মাত্র; সুতরাং চক্ৰ সূচিত করিয়া তিনি স্বাক্ষরের মঞ্চল কথাই শুনিতে লাগিলেন।

সালে বলিতে লাগিলেন, “আমি তোমাকে এখন বাহা বলিব, তাহা আপাততঃ বাদেদের কর্ণপাণ্ডের না হওয়াই উচিত; কখন কখন রূপবর্ণনা শ্রবণেও প্রেমিকের মনে প্রণয়-সঞ্চার হয়, সুতরাং আমি এখন যে রূপীয় কথা তোমাকে বলিব, তাহার কথামাত্র শ্রবণ করিয়া বাদেদের রূপভ্রূতা বলবতী হইলে তাহা সমস্ত হইবে না। এই রাজকন্তার নাম গাহেরী, গাহেরী সামন্তরাজের হুঁহা, আমার আশঙ্কা হইতেছে, সেই রাজার মত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে।”

রাজমাতা বলিলেন, “তুমি বল কি? আজও রাজকন্তা গাহেরীর বিবাহ হয় নাই? আমি যখন তাহাকে দেখিয়াছিলাম, তখন তাহার বয়স আঠার মাস, তখনই তাহার রূপে চতুর্দিক আলোকিত হইত। রাজকন্তা আমার পুত্র অপেক্ষা কিছু অধিকবয়স্ক হইবে, বাহা হউক, তাহাতে কিছু বায় আসে না। এখন বোধ হয়, গাহেরীর রূপভ্রূতিতে তাহার পিতার প্রশংসা ভরিয়া উঠিয়াছে। এ বিবাহ বড়ই সুখের বিবাহ হইবে, কিন্তু তাহার পিতার অমত হইবে বলিতেছ কেন?”

সালে বলিলেন, “লোকটি বড় আশ্চর্য্যর। পুণ্ডরীক অস্ত্র সকল দেশের রাজাকে তিনি কীটপতঙ্গা মনে করেন। বাহা হউক, সেখানেই আমি প্রথমে জ্ঞানানের বিবাহের চেষ্টা দেখি, যদি চেষ্টা বিফল হয়,

তখন স্থানান্তরে চেষ্টা করা বাইবে। যখন সেখানে বিবাহ সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই, তখন এই রূপবতীর কথা বাদেদের কর্ণগোচর না করাই ভাল।”

কথা শেষ হইলে ভ্রাতা-ভগিনী যখন উঠিবেন, তখন তাঁহারা বাদেদেরকে উঠাইলেন। বাদেব উঠিয়া বসিলেন, যেন কতই ঘুমাইয়াছেন! কিন্তু মাতা ও মাতুলের একটি কথাও তাঁহার শ্রবণ-বৃত্তি হয় নাই। যুতীর রূপের কথা শুনিয়া তিনি এতই মোহিত হইলেন যে, সমস্ত রাত্রে একবার চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, মানসক্ষেত্রে গাহেরী-হৃদয়ীর রূপ-সুখা পান করিয়া তিনি বিহ্বল হইলেন।

অবশেষে সালে বদেপ প্রত্যাবর্তনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বাদেব গোপনে মাতুলের নিকট তাঁহার বিবাহ সম্বন্ধে ছুই একটি কথা বলিবার ইচ্ছা তাঁহার মাতুলকে সঙ্গে লইয়া, যুগয়াবাত্রার প্রস্তাব করিলেন। সালে প্রিয়তম ভাগিনেয়ের প্রস্তাবে অসম্মত হইতে পারিলেন না। মহা সমারোহে মাতুল ও ভাগিনেয় যুগয়াবাত্রা করিলেন।

বাদেব যুগয়া-ক্ষেত্রে মাতুলকে একাকী পাইলেন, কিন্তু সাহস করিয়া কথা পাড়িতে পারিলেন না। অবশেষে বাদেব যুগের সন্ধানে অশ্বারোহণ করিয়া একটি ক্ষুদ্র নির্যাসিত উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি বৃক্ষশাখায় অবস্থিয়া তরুচ্ছায়ায় শয়ন করিয়া বাদেব অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইতে লাগিল। দীর্ঘকাল নির্লীকভাবে তিনি সেই স্থানে অবস্থান করিলেন।

এ দিকে সালে ভাগিনেয়কে না দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তাকুল হইলেন। তিনি ভাগিনেয়ের স্বভাব পরীক্ষা করিতেছিলেন; দেখিতে ছিলেন, সেই হৃদয় যুগ আর সদা-হাতে প্রেরিত নহে, সর্ববাই চিন্তাকুল, উৎসাহের অভাব প্রত্যেক কর্ণে পরিব্যক্ত। হৃদয়টি সালে সঙ্গে করিলেন, তাঁহার ভাগিনেয়, গাহেরী রূপের কথা নিশ্চয়ই শ্রবণ করিয়াছেন। তিনি বাদেবের সন্ধানে অনেক অরণ্য ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে সেই নির্যাসিত উপস্থিত হইলেন, বৃক্ষশাখায় হইতে প্রবিলম্ব, বাদেব বসিতেছেন—

প্রিয়তমা হৃদয়, সামন্তলোককুমারি! তোমার রূপের কথা বাহা শুনিয়াছি, তাহা অতি বিচিত্র; কিন্তু বিচিহ্ন হইলেও আমার বিবাগ, তুমি আরও অধিক রূপবতী, মাতুলের ভাষায় তোমার বর্ণনা চলিতে পারে না, চন্দ্র অপেক্ষা হৃদয় যেমন শতগুণে—সহস্রগুণে—সাক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ, তুমিও সেইরূপ পৃথিবীর ব্যবতীর



সিন্ধ-
অজেন
মোহ

গ্রেমিকের
প্রথম-উচ্চাঙ্গ



রাজকুমারীরা অপেক্ষা লক্ষণে প্রেরিত। জানি না, কোথায় আমি তোমার সাফল্য পাইব। আমার এ ক্ষমতা তোমারই, এ ক্ষমতা আমি আর কাহাকেও দান করিব না।”

সালে আর অধিক কথা শুনিতে ইচ্ছা করিলেন না। তিনি বাদ্যের সমুদ্রে আসিয়া বলিলেন, “বাপজীবন, তোমার এই স্বগত আক্ষেপান্তি শুনিয়া আমার অহুমান হইতেছে, তুমি আমাদের সকল কথাই কাল শুনিয়াছ। তুমি বুঝিতেছিলে ভাবিয়া আমরা বিশেষ সাধনা হই নাই, এখন দেখিতেছি, সাধনা হওয়া বড়ই উচিত ছিল।”—বাদ্যের বলিলেন, “মামা, আমি সত্যই সকল কথা শুনিয়াছি, সুস্থিতেছি, আপনারা সাধনা হইলেই ভাল করিতেন। আমি আপনার কাছে আমার মনোভাব প্রকাশ করিবার জন্তই এই মুগয়াভিনয় করিয়াছি। আপনি দয়া করিয়া একবার আমাকে সেই রূপসীর মুখচন্দ্রমা দেখান। আমি তাহাকে পাওয়া দূরের কথা, না দেখিলে জীবনধারণের সমর্থ হইব না।”

মামার নিম্ন-
প্রণয়-দোতা



সালে ভাগিনেয়ের কথাই মর্শ্বাহত হইলেন, তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার, তাহা তিনি জানিতেন; সুতরাং তিনি ভাগিনেয়কে কোন আশ্বাস প্রদান করিতে পারিলেন না, কেবল তাঁহাকে ধৈর্য্যাবলম্বনের পরামর্শ প্রদান করিলেন। তিনি চেষ্টার ক্রটি করিবেন না, তাহাও জানাইলেন। কিন্তু বাদ্যের অধীরভাবে বলিলেন, “মামা, আপনি বড় নির্দয়, আমার প্রতি আপনার বিদ্মহ্যতা রোহ নাই, অথচ মেহের ভাগ বিলক্ষণ আছে। আমার প্রতি রোহ থাকিলে, বাহাতে আমার মৃত্যুর আশঙ্কা আছে, সেদিক কাজ করুন করিতেন না, অবিলম্বে আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতেন।”

সালে বলিলেন, “তোমার উপকারে আমার বিদ্মহ্যতা অনিচ্ছা নাই, তোমার যৌবনের অধীরতা ও প্রণয়ের উদ্ভটতাবশে তুমি আমার সঙ্গেই অস্তায় সন্নিহিত করিতেছ। তোমার মাতার সহিত পরামর্শ না করিয়া, আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া বাইতে পারি না, তোমার মাতা অহুমতি দান করিলে আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া বাইতে পারি। আমি তোমার জননীকে তোমার প্রার্থনা জানাইব, আমিও তাহাকে তোমার অহুমতি অল্পরোধ করিব।”

বাদ্যের বলিলেন, “না তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া বাইতে কখন আমাকে অহুমতি দিবেন না। আপনি এই উপলক্ষে আমার প্রতি অধিকতর নির্দয় ব্যবহারের সম্বন্ধ করিয়াছেন। আমার প্রতি আপনার প্রকৃত রোহ থাকিলে আপনি আমাকে আপনার সহিত আপনার রাজধানীতে লইয়া বাইতেন, এ ভাবে আশান্তি করিতেন না।”

মহাসিদ্ধ

অম্বরীয় প্রভাব



সালেকে অবশেষে ভাগিনেয়ের প্রস্তাবেই সন্তুষ্ট হইতে হইল। তিনি নিজের অমূল্য হইতে একটি মহাসিদ্ধ অম্বরীয় বাহির করিয়া, তাহা বাদ্যেরকে উপহার দান করিলেন;—বলিলেন, “তুমি অমূল্য হইতে এই অম্বরীয় ধারণ কর, সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে ত্যজ করিও না।”—সালে বাদ্যেরকে তাঁহার অহুমতীর অহুমতি করিলে উভয়ে ক্রতগতি সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিলেন।

মহাকালমধ্যে সালে তাঁহার ভাগিনেয়কে লইয়া, সমুদ্রগর্ভে প্রাণদেয় উপস্থিত হইলেন। বাদ্যের তাঁহার মাতামহীর চরণ-বন্দনা করিলেন। মাতামহী মহানন্দে দোহিত্রের সন্নিহিত করিলেন। রাজমাতা তাঁহার কস্তার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, বাদ্যের স্বাতন্ত্র্য ন জানাইয়া মাতুলের সহিত আসিয়াছে, সে কথা প্রকাশ করিলেন না, বলিলেন, “না ভালই আছে। তিনি আপনার প্রাণ দান করিয়াছেন।”—সালে তাঁহার জননীকে বাদ্যেরের আগমনের কারণ জানাইয়া কি করা কর্তব্য,—সেই পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন।

সালের জননী বাদেদের ক্ষমতায় গায়েবীর প্রতি প্রশংসাকার করিয়া বড় অস্ত্রায় হইয়াছে বলিয়া, অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন,—বলিলেন, “তুমি অত্যন্ত নির্দোষের ছায় কাজ করিয়াছ, তোমার এই অপরাধ আমার অযোগ্য। সামন্তদের রাজ্যের দখল কেমন, তাহা জান। কত রাজ্যের বিবাহপ্রস্তাব তিনি অস্বজ্ঞাতেরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তাঁহাও অবগত আছ। তুমিও কি এই তাবে অবমানিত হইতে চাও?”

সালে বলিলেন, “না, আমার অধিক অপরাধ নাই, আমি যখন ভগিনী গুলনারের কাছে গায়েবীর রূপের কথা বলিতেছিলাম, তখন বাদেদের নিদ্রার ভাণ করিয়া সকল কথাই শুনিয়াছেন। তিনি বাহাতে এ সকল কথা না শুনিতে পান, এইরূপই আমার ইচ্ছা ছিল। বাহা হইবার, তাহা হইয়া গিয়াছে, এখন দেখিতেছি, একটা উপায় না করিলে বিরহযন্ত্রণাতেই বাদেদের প্রাণ ধাইবে। আমি ইতার প্রতীকার করিতে চাই। আমি একছড়া মহামূল্য হীরকহার লইয়া, সামন্ত-পতিকে উপহার প্রদান করিয়া, আমার ভাগিনেয়ের জন্ত তাঁহার কস্তার পাণি প্রার্থনা করিব। আমার বিশ্বাস আছে, আমাকে তিনি ফিরাইবেন না। পারস্তপতি তাঁহার জামাতা হইবার অযোগ্য ব্যক্তি নহেন, তাহা তিনি বুঝিতে পারিবেন।”

সালের জননী তখন অগত্যা পুত্রের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, সামন্ত-পতিকে কিরূপ ভক্তিমান দেখাইতে হইবে, তৎসম্বন্ধেও উপদেশ দান করিতে বিম্বত হইলেন না।

সালে হীরকহার-হস্তে সামন্তপতির নিকট উপস্থিত হইয়া যথাযোগ্যরূপে তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন। সামন্তপতি হীরকহার গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “রাজন, যদি আমার নিকট তোমার কোন বিশেষ আবশ্যক না থাকিত, তাহা হইলে তুমি এরূপ মহামূল্য হীরক-হার দ্বারা আমার সম্বর্জন করিতে না, তোমার প্রার্থনা কি, অসম্বোধে আমাকে বলিতে পার।”

সালে করযোড়ে বলিলেন, “মহারাজ, আমি বাহা প্রার্থনা করিব, তাহা সম্পূর্ণরূপে আপনার সাধায়ত্ত, আমার প্রার্থনা অনিশ্চিতও নহে।”—অনেক ভূমিকা করিয়া সালে সামন্তপতির নিকট তাঁহার প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

সালের প্রস্তাব শুনিয়া সামন্তপতি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাহার পর তিনি যুগান্তের বলিলেন, “রাজা সালে, আমার বিশ্বাস ছিল, তোমার কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান আছে, কিন্তু আজ তুমি যে ভাবে কথা বলিলে, তাহাতে আমি বিশ্বাস, তোমার সম্বন্ধে আমি অস্ত্রায় ধারণা করিয়াছিলাম। বামন-হইয়া তুমি চাঁদ ধরিবার বাসনা করিয়াছ কেন? কে তোমাকে এরূপ দৃষ্টি প্রদান করিল?”

এই অপমানে সালের মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, অতি কষ্টে তিনি বৈধাধারণ করিলেন। তিনি ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিলেন, “আমি নিজের জন্ত মহারাজের কস্তার পাণি প্রার্থনা করি নাই, আমার ভাগিনেয় পারস্তপতির জন্যই আমি এই প্রার্থনা করিয়াছি। পারস্তপতি ভূমণ্ডলে বিশেষ ক্ষমতাম্পন্ন রাজা, তাঁহার হস্তে কস্তা সম্ভবান করিলে যে আপনার রাজগৌরবের লাভ হইবে না, এ কথা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। ইহাতে আপনার সম্মানহ্রাসের আশঙ্কা থাকিলে আমি কবচ এ প্রস্তাব আপনার নিকট উপস্থিত করিতাম না। আপনার কস্তা ও আমার ভাগিনেয় উভয়েই উভয়ের যোগ্য।”

ক্রোধে সামন্তপতির মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল, সালের কথা তাঁহার কর্ণে যেন অশিশলাকার ছায় প্রবেশ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে তাঁহার বাক্যকূট হইল, তিনি সরোষে বলিলেন, “রে কুক্কর, তুই আমার সম্মুখে এ ভাবে কথা কহিতে সাহসী হইতেছিস?—আমার কস্তার পবিত্র নাম তোর জ্ঞায় হীন ব্যক্তির মুখে শোভা পায় না। তুই কি মনে করিস তোর ভগিনী গুলনারের পুত্র—একটা মামুষ, আমার কস্তার যোগ্য

পরিধ-
প্রাণনার
হীরকহার
উপহার



প্রত্যাখ্যানের
লাগনা



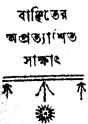
বর ? তাদের আবার কি কশগৌরব আছে ? তোর সেই ভাগিনের ত' ক্ষুদ্র নর, তাহার এত বড় স্পর্ধা, আমার কতকো বিবাহ করিতে চায় ? ওখানে কে আছিল, ইহাকে ধরিয়া এই দণ্ডে ইহার শিরচ্ছেদন কর !—
সামন্তগণতির নিকট যে সকল গ্রহরী দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা সালোকে ধরিবার জন্য অগ্রদর হইল, কিন্তু সালে বিজ্ঞাপিত হইতে রাজধানী হইতে পলায়ন করিয়া নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন। নগরদ্বারে তখন তাহার জননী-প্রেরিত এক সহস্র অস্ত্রধারী অতি সুশিক্ষিত সৈন্য উপস্থিত ছিল। সালের মাতা জানিতেন, দান্তিক সামন্তগণতি তাহার পুত্রের প্রতি সদৃশবাহার করিবেন না, পাছে তাহার প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার হয়, তাহা নিবারণসংকল্পে তিনি সামন্তরাজ্যের রাজধানী-সন্নিকটে এই সকল সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। সৈন্যগণ তাহাদের রাজাকে দেখিবামাত্র সিংহদান করিয়া উঠিল,—বলিল, “মহারাজ, আপনার আদেশপালনার্থ আমরা এখানে উপস্থিত আছি, আপনার প্রতি কোন অত্যাচার হইয়া থাকিলে বলুন, আমরা এখনই তাহার প্রতিশোধ লইব। আমরা আপনার আদেশের মাত্র প্রতীক্ষা করিতেছি।”

সালে নগরদ্বারে দ্বাররক্ষার কতকগুলি সৈন্য রাখিয়া, অস্ত্র সৈন্যগুলিকে লইয়া রাজপুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং সামন্তগণতিকে অতি সহজেই ধৃত করিলেন। রাজাকে এই স্থানে আবদ্ধ করিয়া, কতকগুলি সৈন্য লইয়া, তিনি গতি কক্ষে গাহেরীর অবস্থান করিতে লাগিলেন; কিন্তু গাহেরী শত্রু-হস্তে পতিত হইবার ভয়ে কয়েকজন মাত্র দাসী সঙ্গে লইয়া, তৎপূর্বেই স্থলাভিষিক্তে যাত্রা করিয়া, একটি মকরীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এদিকে সালে সামন্তগণতি কর্তৃক অপমানিত হইয়াছেন, এই সংবাদ লইয়া সালের কয়েকজন গ্রহরী তাহার জননীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন সালে-জননী পুত্রের জন্য বড় চিন্তিত হইলেন। বাদের সে সময় মাতামহীর নিকটেই ছিলেন, তিনি মাতুলের বিপদের সংবাদে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তিনি সকল দ্রুতগতির কারণ মনে করিয়া, আর সেখানে থাকিতে সাহসী হইলেন না। সমুদ্র-গর্ভ ভেদ করিয়া উঠিয়া স্বদেশযাত্রার ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু পারস্তের পথ তিনি জানিতেন না, তিনি একটি বীণে উপস্থিত হইলেন। এ সেই বীণ—যেখানে সামন্তগণতির কথা গাহেরী তাহার পরিচারিকাগণের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন।

বাদের একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় দূর তিনি মহুঘোর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। প্রথমে তাহার অহুমান হইয়াছিল, এখানে জনমানবের ব্যতি নাই, মহুঘোর স্বর শুনিয়া তাহার মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন এবং এক স্থানে উপস্থিত হইয়া, একটি বৃক্ষতলে এক অসামান্য রূপলাবণ্যবতী বৃষতীকে দেখিতে পাইলেন। তিনি বিম্বয়ভরে সেই বৃষতীর দিকে অঙ্গকাল দৃষ্ট করিয়াই বুঝিলেন, এই বৃক্ষতীই তাহার জন্মের আরাধ্যা দেবী রাজকুমারী গাহেরী, বিপন্ন হইয়া পিতার অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। বাদের ভৎসনাৎ সেই বৃক্ষতীর নিকট উপস্থিত হইয়া সম্মুখে তাহার অভিবাদন করিলেন এবং বলিলেন, “সুস্বস্তি, বৃষিতেছি, আপনি বিপন্ন অবস্থায় এখানে আসিয়া পড়িয়াছেন, আমি প্রাণপণে আপনার সাহায্য করিব। আপা করি, আপনাকে সাহায্যদানের লুপ্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।”

গাহেরী বিম্বয়ভরে বলিলেন, “মহাশয়, আপনি সত্যই অহুমান করিয়াছেন, বড় বিপদে পড়িয়াই আমি এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আমি সামন্ত-রাজ্যের অধীশ্বরের কন্যা। আমার নাম গাহেরী। আমি আমার শিশু-অন্তঃপুরে নিশ্চিন্তভাবে বাস করিতেছিলাম, এমন সময় সহসা বহিঃপ্রাসাদে ভয়ঙ্কর গোণবোপ



ভূমিতে পাইলাম। তৎক্ষণাৎ একজন ভৃত্য আমাকে সংবাদ দিল, রাজা সালে, কি কারণে সে বলিতে পারিল না, সহসা আমার পিতাকে সন্মুখে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়াছে। ভয়ে আমি সমুদ্রগর্ভ হইতে সলায়ন করিয়া এইখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছি।”

রাজকন্যার কথা শুনিয়া বাদেব হঠাৎ মাতামহীকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া অজ্ঞাত করিয়াছেন ভাবিয়া অশ্রুতপ্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মাতুল যে সামন্তলগতিক পন্থাজিত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিয়াছেন, এ সংবাদে তাঁহার মনে আনন্দের ও স্ফূর্তি হইল। তিনি বুঝিলেন, সামন্তলগতিক মুক্তিলাভের আশায় নিশ্চয়ই তাঁহার সহিত কন্যার বিবাহদানে অতঃপর সম্মত হইবেন।

অনন্তর বাদেব রাজকন্যাকে সোধেদন করিয়া বলিলেন, “রূপসি রাজকুমারি, আপনায় হৃদিতার সত্যই কারণ আছে, কিন্তু শীঘ্রই আপনার এ ভয় দূর হইবে, আপনি ভয় ত্যাগ করুন। আমার নাম বাদেব, আমি রাজা সাগের ভাগিনেয়, আমার মাতুল যে আপনার পিতাকে বন্দী করিয়াছেন, সে আপনার পিতার রাজ্যলোভে নহে; তিনি ইচ্ছা করেন, আপনার পিতা আপনাকে আমার হস্তে সম্ভ্রদান করিয়া আমাকে স্ত্রী ও গৌরবাহিত করেন। আমি পারস্তদেশের রাজা, আপনার রূপগুণের কথা শুনিয়া আপনাকে দেখিবার পূর্ব্বেই আমি আপনার প্রেমের ভিখারী হইয়াছি, এ ভিখারীকে প্রণয়ভিক্তা-দানে বঞ্চিত করিবেন না, তাহা হইলে আমি কোনমতে প্রাণধারণ করিতে পারিব না। আপনি আদেশ করিলে আমি আপনাকে লইয়া মাতুলের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, আপনার পিতা আমাদের বিবাহে অস্বস্তি দান করিবারমাত্র তাঁহার স্বাধীনতা ও রাজ্য লাভ করিবেন।”

রাজকন্যা গাহেরী বাদেবের দেহশোভা নিরাক্ষণ করিয়া প্রথমে তাঁহার পক্ষপাতী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাদেবের মুখে তাঁহার পরিচয় অবগত হইয়া এবং তিনিই তাঁহার সকল দুর্দশার কারণ অবগত হইয়া, রাজকন্যার মনে তাঁহার প্রতি নিদারুণ বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইল। রাজকন্যা বাদেবকে তাঁহার শত্রু মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকন্যা মনের ভাব গোপন করিয়া বাদেবকে বলিলেন, “রাজপুত্র, আপনি কি বিখ্যাত হুম্মারী গুণনরের পুত্র? আপনার সহিত পরিচয় হওয়াতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। আমার পিতা আপনার সহিত আমার বিবাহে সম্মতি দান না করিয়া অজ্ঞাত করিয়াছেন, তিনি শীঘ্রই তাঁহার ক্রম বুঝিতে পারিবেন।”—রাজকন্যা বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ বাদেবের হস্তধারণ করিলেন।

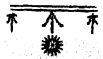
তার পর ধীরে ধীরে পারস্তরাজকে আপনার অভুলনীয় বন্ধোদশে টানিয়া লইলেন। বাদেব হুম্মারীর চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া সেই রজনীর বন্ধঃস্থলে মস্তক স্থাপন করিয়া, অপূর্ণ আনন্দরূপে অভিভূত হইতে লাগিলেন। গাহেরী আগ্রহের অভিনয় করিয়া বাদেবের নয়নে ও আননে চুখন-রোখা মুদ্রিত করিয়া দিলেন, প্রতিদানে বাদেবও স্ফূর্তিচুখনে তাঁহাকে অভিভূত করিলেন। পারস্তরাজ বখন চুখনবেশে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন, তখন গাহেরী পুনরায় মুখচুখনের অভিনয় করিয়া, বাদেবের মুখে নীলিন ত্যাগ করিয়া বর্ণিলেন, “যে দ্রাঘাটন! জোর এত বড় স্পর্ধা, তুই অবিলম্বে তোর মহাবাদেহ ছাড়িয়া সারসপক্ষীর বেহ প্রাপ্ত হ!”—দেখিতে দেখিতে বাদেব সারসে পরিণত হইলেন। তখন রাজকন্যা একজন সখীকে সোধেদন করিয়া বলিলেন, “ইহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া মরুখীপে ছাড়িয়া দিয়া আর।”—মরুখীপে প্রস্তর ও কঙ্কর ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ নাই; এমন কি, বিদ্যুৎ জল পাওয়াও দুষ্কর।

পরিচাষিয়া সারসপক্ষীকে কোলে ভুলিয়া লইল এক রাজকন্যাকে বলিল, “রাজকন্যা, আপনার কি দয়ামায়া নাই? এমন রাজপুত্র, এত রূপ, এত স্তম্ভ, ইহার প্রতি আপনি এমন কঠিন ব্যবহার করিলেন?

রাজপুত্রের
প্রেমভিক্তা



চুখনে
অভিসম্পাত



মরুভূমি
শ্রেণিক-
নির্কাসন

সেখানে ত এ একটু জল বা ছোট খাবার কিছুই পাইবে না। আপনার অসুস্থতা হইত আমি ইহাকে লইয়া এমন একটি স্থানে রাখিয়া আদি, যেখানে বেচারার অনাহারে মারা না পড়ে।" রাজকন্ডার আজ্ঞায় দাসী সারসটিকে কলজলপূর্ণ একটি স্কন্ধে বঁপে ছাড়িয়া দিয়া আসিল।

সালে রাজকন্ডাকে প্রাসাদের সর্বত্র ভ্রম তম করিয়া অসুস্থকালেও যখন তাঁহাকে পাইলেন না, তখন সামন্তলপতিকে বন্দী করিয়া রাখিয়া, তাঁহার রাজ্য-শাসনের বন্দোবস্ত করিলেন এবং মাতার নিকট প্রত্যাপন করিয়া ভাগিনেয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার মাতা বলিলেন, "তোমার নিকট হইতে লোক আসিবার পর হইতে আর তাহাকে দেখিতেছি না। তোমার বিপদের কথা শুনিয়া, ভয় পাইয়া বাদের বোধ এখান হইতে পলায়ন করিয়াছে।"

রাজা সালে মাতার মুখে এই কথা শুনিয়া, বড় হুঃখিত ও চিন্তিত হইলেন। গুলনারকে না বলিয়া বাদেরকে সঙ্গে লইয়া আসার জন্ত তিনি অত্যন্ত অসুস্থতা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সন্ধানে চতুর্দিকে লোক পাঠাইলেন, তাহার পর স্বরাজ্যশাসনের ভার মাতৃহন্তে সমর্পণ করিয়া, তিনি সামন্তল-রাজ্যশাসনের জন্ত যাত্রা করিলেন।

সালে সামন্তলে যাত্রা করিবার পর রাজা গুলনার পুত্রের সন্ধানে ভ্রাতার রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। বাদেরকে রাজ্যে অহুপস্থিত দেখিয়া তিনি অত্যন্ত উদ্ভয় হইয়াছিলেন এবং কোথাও তাঁহার সন্ধান না হওয়াতেই তিনি স্বয়ং ভ্রাতার কাছে তাঁহার সন্ধান জানিতে আদিয়াছিলেন।

গুলনারের মাতা, বাদের সম্বন্ধে বাহা কিছু জানিতেন, তাহা সমস্তই কন্ডাকে বলিলেন; অবশেষে শীঘ্রই বাদেরের সংবাদ পাওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দান করিলেন। রাজমাতা অতঃপর গুলনারকে তাঁহার রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবার জন্ত অহুরোধ করিলেন, কারণ, বাদের ও তাঁহার উভয়েরই অহুপস্থিতিতে রাজ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে পারে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইল।—গুলনার মাতার মুক্তির সারসতা বৃদ্ধিতে পারিয়া অনতিবিলম্বে পারশুরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং পূর্বে বাদেরের সন্ধানে যে সকল কর্মচারী দেশদেশান্তরে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে প্রত্যাবর্তনের আদেশ করিয়া, তিনি স্বয়ং রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন।

বাদের সারসদেহ ধারণ করিয়া সেই স্থানে একাকী বসিয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁর মনে একটুও সুখ রহিল না। তাঁহার স্বদেশ কোথায়, তাহাও তিনি জানিতে পারিলেন না। তিনি বৃষ্ণিলেন, তাঁহার ভানায় যে শক্তি আছে, তাহার বলে তিনি যে কোন দেশে উড়িয়া যাইতে পারেন, পারশ্বদেশেও উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নহে; কিন্তু তাহাতে কোন ফলপ্রাপ্তির আশা করিলেন না। কারণ, পারশুরাজ্য বলিয়া কেহই তাঁহাকে মনে করিবে না। এমন কি, তিনি যে মাহুয়, তাহাই অসুস্থমান করা অত্যন্ত পক্ষে অসম্ভব হইবে; সুতরাং তিনি সেই স্থানে বাস করাই কর্তব্য জ্ঞান করিলেন। মিথ্যে তিনি অজ্ঞাত পক্ষীর জ্ঞান আহারাদি করিতেন, বাস্তবতে বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া বিবরবদনে বসিয়া থাকিতেন।

কিছুদিন পরে এক ব্যাধ জাল লইয়া সেই স্থানে পক্ষী ধরিতে আসিল। সারসরূপী পারশুরাজ্যকে দেখিয়া তাহার মনে বড় লোভ হইল, এমন সুন্দর পক্ষী সে কখনও দেখে নাই। অনেক কৌশলে সে পক্ষীটিকে ধরিল এবং বাঁচার পুখিয়া নগরে লইয়া আসিল। পারশীটিকে দেখিয়া একজন লোক বলিল, "ওহে ব্যাধ, পক্ষীটিকে কত দামে বিক্রয় করিতে পার ?"—ব্যাধ জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি এ পারশীটি কিনিয়া কি করিবেন ?"—লোকটি বলিল, "আমি ইহার মাংস রান্নায়া খাইব।"—ব্যাধ বলিল,

যাহ-বিভায়
রশ্মি



“সোনার টাকা পাইলেও আমি এ পানী বিক্রয় করিব না, আমি বুদ্ধ হইয়াছি, এত কাল পানী খরিতেছি, কিন্তু এমন সুন্দর পানী আর কখনও দেখি নাই। আমি ইহাকে লইয়া আমাদের দেশের রাজাকে উপহার দান করিব। তিনি বুঝিবেন, এই পক্ষী কিরূপ মূল্যবান।”

অনন্তর ব্যাধ রাজপ্রাসাদের দরজাতে পিঞ্জর-হতে উপস্থিত হইল। রাজা প্রাসাদবাতায়ন হইতে ব্যাধহতে পিঞ্জরমধ্যবর্তী সুন্দর পক্ষীটিকে দেখিতে পাইলেন এবং একজন রাজকর্মচারীকে উহা ক্রয় করিবার জন্য পাঠাইলেন। ব্যাধ বলিল, “আমি ইহা কোন মূল্যেই বিক্রয় করিব না, রাজাকে উপহার দান করিব।” রাজা পক্ষী দেখিয়া এতই সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি ব্যাধকে দশটি স্বর্ণরুদ্রা পুরস্কার প্রদানের আদেশ করিলেন। ব্যাধ তাহাতেই মহাসন্তুষ্ট হইয়া গৃহে চলিয়া গেল। রাজা পক্ষীটিকে মূল্যবান স্বর্ণপিঞ্জরে রাখিয়া তাহার আনন্দ-নন্দন দেখিতে লাগিলেন।

পক্ষী কিন্তু পিঞ্জরস্থ আহার্য-দ্রব্য স্পর্শও করিল না, তখন রাজা নানাপ্রকার খাদ্য-দ্রব্য তাহার সম্মুখে স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, পক্ষী এই সকল দ্রব্যের মধ্যে কোন না কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে পারে।

অদূরস্থিত টেবলে রাজার জন্ম খাড়াগাত্রী সুশিক্ষিত ছিল, মুক্তিদ্রব্য করিয়া পক্ষী সেই টেবলে উড়িয়া বসিল, এবং রুট ও মিষ্টান্ন চকুপটে গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিল। রাজা এই দৃশ্য দেখিয়া, অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, ইহা দেখিবার জন্য মহিষীয় নিকট একজন দাসীকে পাঠাইলেন। মহিষী তৎক্ষণাৎ রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু



শোভা-
টানা



পক্ষীটিকে দেখিবারাত্র তিনি অবগত হইলেন। রাজা এই ব্যাপার দর্শনে অধিকতর আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া বলিলেন, “মহিষি, এই ককে অজ্ঞ পুরুষ নাই, তবে তোমার এরূপ ব্যবহারের অর্থ কি?”

মহিষী বলিলেন, “রাজন, এখানে অপরিচিত পুরুষ আছে বলিয়াই আমি অবগত হইয়াছি। আপনি যাহাকে পক্ষী মনে করিতেছেন, তিনি পক্ষী নহেন, পক্ষিরূপী মহাযা।”—“মহাযা! এমন অসম্ভব কথা ত কখন শুনি নাই। না, না, তুমি গরিবান করিতেছ।”—রাজা বলিলেন, “মহারাজের সহিত আমার পরিচয় করিবার সন্ধ নহে, আমার ভগিনী বা ভ্রাতৃবৎ হইলে বরং আপনি এ কথা একদিন ভাবিতে পারিতেন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, এই পক্ষী পায়তস্বাক্ষর করে, ইনি সন্ধ্যাপিণ্ডিত্য বোহিত ও রাজা সন্ধ্যার জাগ্রদেয়; ইহার মাতার নাম গুলনার। সন্ধ্যাপিণ্ডিত্য কথা রাজকুমারী গাহেরী ইহাকে পক্ষিমেহে রূপান্তরিত করিয়াছেন।”

রাজার
বাহু-চাতুর্ঘ্য



বাহনব্রহ্ম
প্রভাব

রাজ্যে কামিনী, রাজ্যে মন্যবিভার বংশনোন্নিতি পারদর্শিনী ; হস্তরাং তিনি মহাবীর কথায় বিবাস করিলেন। রাজ্যে উৎসব মহাবীরকে অনুবোধ করিলেন, “পারদর্শিতর পক্ষিবেহ দূর করিয়া তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত মূর্তি প্রদান কর।”

রাজ্যে পক্ষীর সহিত কক্ষান্তরে উপস্থিত হইয়া এক বটী জল মন্ত্রপূত করিলেন। মন্ত্রপূতিতে জল টপকণ করিয়া হুটিতে লাগিল। তখন রাজ্যে সেই জল পক্ষীর গাত্রে ঢাশিয়া বলিলেন, “যদি কাহারও মন্যবিভার ভোগ্য এই মূর্তি হইয়া থাকে, তবে তুমি অবিশেষে নিম্নমূর্তি গ্রহণ কর।”

রাজ্যের কথা শেব হইতে না হইতেই বাদেয় পক্ষিবেহ ত্যাগ করিয়া তাঁহার পরমহস্তর গুরুমূর্তি প্রাপ্ত হইলেন। রাজ্যে বাদেয়কে দেখিয়া বংশনোন্নিতি আনন্দিত হইলেন, বাদেয়ও রাজ্যের চরণ চূষন করিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রাজ্যের নিকট বাদেয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবার পূর্বেই রাজ্যে অন্তঃপুরে অন্ধকার করিয়াছিলেন, আহারের সময় রাণীর সহিত রাজ্যের সাক্ষাৎ হইলে রাজ্যে রাণীর মুখে সকল কথা শ্রবণ করিয়া, বাদেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন যে, গাহেরী আপনাকে সারসে রূপান্তরিত করিয়া ছিলেন?”—রাজ্যের বাদেয় সকল কথা বলিলে, রাজ্যে সামন্তপতিরই সম্পূর্ণ দোষ দেখিতে পাইলেন। অন্তঃপুরে তিনি বাদেয়কে বলিলেন, “এ সকল অশ্রীতিকর কথার আলোচনার আর আবশ্যক নাই, এখন যদি কোন প্রকারে আপনার কোন উপকার করিতে পারি, তাহা বলুন।”

বাদেয় স্বদেশে যাইবার জন্ত রাজ্যের নিকট একখানি জাহাজ চাহিলেন। রাজ্যে তৎক্ষণাৎ তাঁহার আশ্রয় পূর্ণ করিলেন, তাঁহাকে একখানি অত্যাধিক জাহাজ প্রদান করা হইল। বাদেয় সেই জাহাজে জাহাজযাত্রা করিলেন।

দশদিন যাত্রাস্থানে জাহাজ উত্তমরূপে চলিল। একাদশ দিবসে তখনক বটিকা উপস্থিত হওয়ায় যখন জাহাজের মাঝপাড়ি ভাঙিয়া চূরনার হইয়া গেল, তাহার পর জাহাজ একটী পাহাড়ের উপর গিয়া পড়িল;—জাহাজ তৎক্ষণাৎ শত খণ্ডে বিভক্ত হইল, নাবিকগণ সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন হইল। কেহ কেহ বা ছই এক খণ্ড কাঠ আশ্রয় করিয়া, তাহার উপর ভাসিতে লাগিল। রাজ্যে বাদেয়ও এক খণ্ড কাঠ আশ্রয় করিয়া, ভাসিতে ভাসিতে কুলের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, যখন যুক্তিকায় পদস্পর্শ হইল, তখন তিনি কাঠ ছাড়িয়া ইটিয়া কুলে উপনীত হইলেন; কিন্তু তিনি সন্নিহনে দেখিলেন, কোথা হইতে দলে দলে ঘোড়া, উট, গাধা, অশ্বতর, বাঁড়, বগদ, গাভী ও অজ্ঞাত জন্ত সমুদ্রতীরে আসিয়া দাঁড়াইল, কোনক্রমে তাঁহাকে ভীরে উঠিতে দিবে না। বহুকষ্টে তিনি তাহাদিগের ভিতর দিয়া একটা পথ করিয়া, পর্তুকের একটী দুয়ারোহে অংশে উঠিয়া বলিলেন। সেখানে আর কোন জন্ত তাঁহাকে বিরক্ত করিতে পারিল না, তিনি রোদ্রে বয়াদি শুক করিলেন।

অনন্তর পর্ত হইতে অবতরণ করিয়া, তিনি নগরপ্রবেশের চেষ্টা করিলে, সেই সকল জন্ত আবার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সেই ভাবে তাঁহাকে বাধা দান করিল। তাহারা বেরূপ ভাব দেখাইল, তাহাতে বাদেয়ের মনে হইল, নগরপ্রবেশে তাঁহাকে কোনপ্রকার বিপদে পড়িতে হইবে এবং এই অন্তর্ভুক্ত তাহারা এরূপ বাধা দান করিতেছে।

কিন্তু কোন বাধা না মানিয়া বাদেয় নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরের রাজপথগুলি সুবিশীর্ণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। কিন্তু কোথাও একটী জনপ্রাণীর সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎ হইল না। বাদেয় রাজপথ ধরিয়া

প্রেমিক
জানোয়ারের
ঘোষে

✽ 小 ✽

নগরদ্বারা অগ্রসর হইলেন, দেখিলেন, অনেক ঘুরে কতকগুলি দোকান খোলা রহিয়াছে। তখন তিনি বসিলেন, নিশ্চয়ই এ নগরে মহাব্যবস্থা চলিতে আছে। একটি দোকানে দেখিলেন, একজন বৃদ্ধ কতকগুলি বসিয়া রহিয়াছে। ক্রোড়ের সন্ধান সে বসিয়া ছিল।

বৃদ্ধ মাথা তুলিয়াই বাধের দিকে দেখিতে পাইল। সেই পৌরাক হুন্দর অপরিস্রুত বৃদ্ধকে সহসা সম্মুখে দেখিয়া বৃদ্ধ বৎসরোত্তর বিস্মিত হইল। বাধের পশ্চিম জিহ্বা করাতে বাধের তাহাকে সংক্ষেপে আশ্বাসিত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিল, “পথে কাহারও সহিত আপনাদের সাক্ষাৎ হয় নাই কি?” বাধের বলিলেন, “এ নগরে কেবল আপনাকেই একমাত্র মানুষ দেখিতেছি; এমন হুন্দর নগর তেনে এরূপ জনহীন, তাহা আমি কোনমতে বসিতে পারিতেছি না।” বৃদ্ধ বলিল, “শীঘ্র আমার দোকানের ভিতর আহুন, বাহিরে আর এক দণ্ডও দাঁড়াইবেন না, মহা বিপদে পড়িবেন। আপনি আমার দোকানের মধ্যে আসিলে আমি আপনাকে সকল কথা বলিব, আপনাকে এত সাবধান হইতে বলিতেছি কেন, তাহাও জানিতে পারিবেন।”

বাধের তৎক্ষণাৎ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ দেখিল, তিনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত এবং ক্ষুধাপীড়িত কাতর; কলমুল ও জলদানে বৃদ্ধ তাঁহার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করিল। আহা! শিব হইলে, বৃদ্ধ বলিল, “আপনি যে পথিমধ্যে বিপদে পড়েন নাই, নিরাপদে এত দূর আসিতে পারিয়াছেন, এজন্য আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করুন।” বাধের ভয় ও বিস্ময়ে কণ্ঠকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি এ কথা কেন বলিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি, আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।”

বৃদ্ধ বলিতে লাগিল, “এই নগরের নাম বাহননগর। এ নগরে রাজা নাই, রাণী আছেন, রাণী অবিভীয়া হুন্দরী এবং অসামান্য বাহুবল-নিপুণ। পৃথিবীতে এমন বাহুবলী আর বিদ্যমান নাই। এ দেশে যত হুন্দর মানুষ ছিল, রাণী সকলকেই বিবিধ পণ্ডিতে রূপান্তরিত করিয়াছেন। আপনি যে সকল পণ্ডিতে সমুদ্রকূলে উঠিবার সময় দেখিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই মানুষ, বাহুবলী-প্রভাও পণ্ড হইয়াছে। রাণীর চর নগরের চারিদিকে ঘুরিতেছে, যদি আপনার জ্ঞান কোন হুন্দর বৃদ্ধ দৈবাৎ এই নগরে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে সেই সকল দূত তাহাকে রাণীর নিকট লইয়া যায়, রাণী তাহাকে নানা প্রকারে আদরযত্ন করেন, বাধের জ্ঞান হুত্তীর্ণ প্রাপ্য, আহা! বাধের জ্ঞান অত্যন্ত প্রভাও পণ্ডিত প্রদান করেন, রাণী তাহার প্রশংসা হাবুদুব খাইতেছেন, এইরূপ ভাব প্রকাশ করেন, অনন্তর চল্লিশ দিন পরেই দ্রুতগতি ব্যক্তিকে কোন একটি পণ্ডপণ্ডিতে রূপান্তরিত হইতে হয়। আপনার বিপদের সম্ভাবনা বৃদ্ধাই পণ্ডর দল আপনাকে নগরে প্রবেশ করিতে দিতেছিল না, আপনাকে কি বিপদে পড়িতে হইবে, তাহা তাহারা প্রকাশ করিতে অসমর্থ।”

বাধের বৃদ্ধের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। এক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া তিনি যে অধিকতর বিপদে পড়িয়াছেন, তাহা লক্ষ্যই বসিতে পারিলেন। বাধের বৃদ্ধের নিকট তাঁহার জীবনের অতীত দ্রষ্টব্য ও সামন্ত-রাজকুমারীর প্রতি তাঁহার অস্বস্তি ও তাহার ফলের কথা প্রকাশ করিয়া বসিলেন।

বৃদ্ধ বলিল, “আমি আমাদের দেশের রাজার শক্তি দেখেও আপনাকে যে কথা বলিলাম, তাহা সম্পূর্ণ সত্য হইলেও আপনি এত অধিক ভীত হইবেন না। আমার প্রতি রাজার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, রাজ্যের সকলেই আমাকে ভালবাসে; হতরং আমার সহিত আপনার পরিচয় হওয়া আপনার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় হইয়াছে বলিতে হইবে। এখানে আপনার কোন ভয় নাই। আপনি যত দিন ইচ্ছা, এখানে থাকিতে পারেন; আমার এখানে যত দিন থাকিবেন, তত দিন যে আপনাকে কোন বিপদে পড়িতে হইবে না, তাহা আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি।”

বাহুবলী
প্রবেশ-শীলা



বৃদ্ধ ও বাধের
মুখ
আলাপ



বাদের বৃদ্ধকে তাঁহার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। গৃহে বসিয়া বাদের দুই একজন লোককে পথ দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলেন, লোকগুলি বাদেরকে দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতে লাগিল, কেহ কেহ বা বৃদ্ধকে বলিল, “এমন সুপুরুষ বৃদ্ধ দাস কোথায় পাইলে হে? তোমার ত ভাণ্ডা ভাল।”—কেহ কেহ বা এই ভাবিয়া বিস্মিত হইল যে, এমন রূপবান্ ব্রাহ্ম কিরূপে রাণীর কবলে না পড়িয়া এখানে আসিতে সমর্থ হইল? বৃদ্ধ সকলের বিস্ময় দূর করিবার জন্য বলিল, “এই বৃদ্ধ আমার ভৃত্য নহে, তোমরা ভুল অহুমান করিতেছ, আমার অর্থ নাই যে, দাস ক্রয় করি। এটি আমার ভ্রাতৃপুত্র, সংপ্রতি ইহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, সেই জন্য ইহাকে আমি আমার কাছে লইয়া আসিয়াছি।” নগরবাদিগণ বৃদ্ধের কথা শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেও কেহ কেহ বলিতে লাগিল, “রাণী এই বৃদ্ধের রূপের কথা জানিতে পারিলেই ইহাকে তোমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া যাইবে, তুমি কখনও ইহাকে রাখিতে পারিবে না। তার পর পণ্ড করিয়া ফেলিবে, তখন তাই, তোমার আক্ষেপের লীমা থাকিবে না। ভ্রাতৃপুত্রটিকে হারাইবে নিশ্চয়।”

বৃদ্ধ সেই সকল শুভাকাঙ্ক্ষীকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, “রাণী আমাকে বৈরুপ প্রদা করেন, তাহাতে তিনি আমার ভ্রাতৃপুত্রের উপর লোক করিবেন, এরূপ অহুমান হয় না। তিনি যদি ইহার কথা শুনিয়া ইহাকে চাহেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার সমস্ত টলাইতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস আছে।”

বাদের এক মাসকাল বৃদ্ধের গৃহে বাস করিলেন, বৃদ্ধ তাঁহার রূপগুণে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে পূজ্যং ব্বেহ করিতে লাগিল এবং প্রতিদিন তাহার সেহের বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একমাস পরে একদিন সেই দেবের যাত্রাকরী রাণী লানি মহাসনারোহে বৃদ্ধের দোকানের সমুখবর্তী পথ দিয়া অথারোহে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন, তাঁহার সঙ্গে এক মহতঃ অশ্বচর, সকলেই হুসজ্জিত, সকলেই সমস্ত। রাণীর অশ্বের চতুর্দিকে অশ্বখারিণী বিবিধভূষণভূষিতা সুবস্ত্রী দল; সকলেরই হস্তে রূপাণ। রাজ্যীর অশ্বচরবৃন্দ বৃদ্ধের দোকানের সমুখে আসিলে সকলেই সমস্তে বৃদ্ধকে প্রদীপাত করিল। বাদের এই সকল অশ্বচরকে দেখিয়া, দোকানের ভিতর প্রবেশ করিয়া, রাজ্যীর কবল হইতে আশ্চর্য্য করিবেন ভাবিয়া উগ্ৰিতেছেন দেখিয়া, বৃদ্ধ তাঁহাকে সেইখানেই বসিতে অহুরোধ করিল। রাণী অথারোহে দোকানের সমুখে আসিয়াই বাদেরকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহার অহুপম যৌবন ও কমলী কান্তি দেখিয়া রাজ্যী কামার্ভা হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বের রশ্মি সংঘত করিয়া, বৃদ্ধকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “আবদালা মিক্রা, এই বৃদ্ধের ভৃত্যটি কি তোমার? তুমি কি ইহাকে সংপ্রতি ক্রয় করিয়াছ?”

বৃদ্ধ ধরাডলে দাড়ী দূটাইয়া, রাণীকে সম্মান জ্ঞাপন করিয়া বলিল, “রাজ্যী, এটি আমার ভ্রাতৃপুত্র, অতি অল্পদিন পূর্বে আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে, ইহাকে আমি লইয়া আসিয়াছি, আমার সন্তানদিগে ত নাই। ভাবিয়াছি, যত দিন বাঁচিব, ইহাকেই আমার কাছে রাখিব, তাহার পর আমার সন্মান্য যে কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা ইহাকেই প্রদান করিয়া যাইব।”

রাজ্যী বলিলেন, “বাবা, তুমি তোমার ভ্রাতৃপুত্রটি আমাকে দান কর। আমি তোমার কাছে কখনও কিছু চাহি নাই, আশা করি, আমার প্রতি এই অহুগ্রহ প্রকাশে তুমি কাতর হইবে না। আমি আলোক ও অমির শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি ইহাকে এরূপ ক্ষমতাশালী ও ঐশ্বর্য্য দান করিব যে, পৃথিবীতে তত ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য আর কোন মানুষের নাই। যদি আমি পৃথিবীর সকল মহত্তেরও অপকার করি, তাহা হইলেও তুমি জানিও, আমার দ্বারা এই বৃদ্ধের কখনও কোন অপকার হইবে না। আমার বিশ্বাস আছে, তুমি আমার এই অহুরোধ রক্ষা করিবে। তোমার প্রতি আমার যে প্রদা ও আমার প্রতি তোমার যে ব্বেহ আছে, তাহার অহুরোধে তুমি আমার প্রার্থনা অগ্রাহ করিও না।”

আবদালা বলিল, “রাগিণী! পৃথিবীতে আমার আশীষ-স্বপ্ন আর কেহ নাই, কেবল আমার সহিত একটিমাত্র প্রাণুপুত্র। উহাকে ত্যাগ করিয়া আমি কিরূপে জীবনধারণ করিব? আপনি উহার যে সমান প্রদর্শন করিতে চাহিলেন, সে জন্ত আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন; কিন্তু আপনি দয়া করিয়া ইহা মেন। পরিত্যাগ করিয়া যান।”

রাজী বলিলেন, “আবদালা, তুমি আমাকে বিশেষ স্নেহ কর জানিয়াই তোমার নিকট এ প্রার্থনা করিয়াছিল। তুমি নির্দয়ের দত্ত আমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিও না। আমি পুনরীর আমার ধর্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি যে এই যুবকে আমি পরম স্নেহে রাখিব, অনন্ত সম্পদ দান করিব, তুমি আমার অহরোধ রক্ষা কর। তোমার কি জন্ত আশঙ্কা হইতেছে, তাহা আমি বুঝিয়াছি। তুমি ভাবিতেছ, আমার দ্বারা ইহার কোন অসুবিধা হইবে, অস্তের প্রতি আমি যেরূপ ব্যবহার করি, ইহার উপরও সেইরূপ ব্যবহার করিব। কিন্তু, আল্লা সে ভয় ত্যাগ কর। আমি তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়া কদাচ সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিব না। তুমি ভীতকে যুবকটিকে আমার হস্তে প্রদান কর, আর কোন আশঙ্কি করিও না।”

আবদালা অগত্যা রাগীর প্রস্তাবে সন্মত হইয়া বলিল, “রাগিণী, আপনি যখন প্রাসাদে ফিরিবেন, তথাক প্রবেশ গিয়া যাইবেন, আপনার অহরোধ আমি লঙ্ঘন করিতে পারিব না; আপনি ইহাকে পাইবেন।” রাগী বরীরা রাগী “কাল আমি ফিরিব, ফিরিবার সময় যেন ইহাকে পাই।”—রাগী অহুতরবর্ণের সহিত গন্তব্যপথে প্রস্থান করিলেন।

রাজী লাবি প্রস্থান করিলে, আবদালা বাদেবকে বলিলেন, “বৎস, তোমাকে লাভ করিবার জন্ত ঠাঁই অতি আগ্রহ লক্ষ্য করিলে? আমি যদি তোমাকে তাঁহার হস্তে প্রদান করিতে সন্মত না হইতাম, তাহা হইল। বাছকরী বাহুবীজ-প্রস্তাবে আবদারের উদ্যানক অনিষ্ট করিতেন, এমন কি, সে জন্ত আমাশিগকে চিরজীবীর অনন্ত দুঃখ-ভোগ করিতে হইত। তাহা অপেক্ষা তুমি তাঁহার নিকটে বাও, ইহা বাঞ্ছনীয়; রাজী আমি সুল। বিশেষ শ্রদ্ধা করেন, তিনি আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা লঙ্ঘন করিবেন বলিয়া বোধ হয় নাই। কিন্তু তোমাকে না দিলে, জুহু রাগীর হস্ত হইতে পরিত্রাণের কোন আশা নাই।”

আবদালা কণা ওনিয়া বাদেবের ভয় কিঞ্চিৎ দূর হইল, কিন্তু তিনি একেবারে স্থির হইতে পারিলেন না; হয় ত তিনি সামান্য কারণে বা অকারণে রাজীর অপ্রীতিভাজন হইয়া কোন বিপদে পড়িবেন ভাবেন বড়ই চিন্তিত হইলেন, তাঁহার চক্ষুপ্রান্ত হইতে অশ্রু স্রবিত্তে লাগিল।

আবদালা বাদেবকে সাধনাদান করিয়া বলিলেন, “পুত্র, স্থির হও, যদিও আমি জানি, এই বাছকরী কোন শপথই বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারা যায় না, তথাপি আমার নিকট তিনি যে প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইয়াছেন, সে মহা তাহা ভঙ্গ করিতে পারিবেন, তাহা বোধ হয় না। এই রাজী যে আমার প্রতি প্রভা বশতঃ আমাকে সন্মান করেন, তাহা বোধ হয় না। তিনি জানেন, সহজে তিনি আমার কোন অপকার করিতে পারিবেন না, তাই এত সন্মান! যদি তিনি তোমার প্রতি কোন প্রকার মন্দ ব্যবহার কি অত্যাচার করেন, তাহা হইলে আমি তাহা অবিলম্বে জানিতে পারিব, তোমাকে রক্ষা করিবার জন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, তুমি ভীত হইও না। বৎস, রাজীর কোন অস্ত্রই আমার বক্ষে আঘাত না করিয়া তোমার বক্ষ স্পর্শ করিবে না।”

পরদিন রাজী লাবি আবদালায় লোকদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সহজে বলিলেন। “আবদালা মিত্র, আমি কেবল তোমার প্রাণুপুত্রটিকে লাভ করিবার আশাতেই এত শীঘ্র ফিরিলাম। তিনি হইতেই তুমি আমার আগ্রহের পরিচয় পাইতেছ। আমি জানি, তুমি এক কথায় মাহু, আশা করি যুবক তোমার কথা উল্লেখাইবে না।”

মহিয়ার সঙ্গে
রূপ-মহিয়ার
চমক



শাখ-প্রসারিত
শাখ
*

আবদালা তুমি সর্প করিয়া রাজ্যকে অভিযান করিয়া বলিল, “মহীশূরী রাজি, আমি কাল আপনায় হতে
কর রাজ্যকে সমর্পণ করিতে যে আপত্তি করিয়াছিলাম, তাহার কারণ অবতাই আপনি বুঝিয়াছেন।
কিন্তু আপনি পরম স্ত্রীতে রাখিবেন, অন্যত্র ঐশ্বর্য নান করিবেন, ইহাতে আমার কি আপত্তি
হইতে পারে? বরং তাহা আমার পক্ষে বিশেষ সুখের বিষয়; তবে আমার যে ভয়, ভয়টি মিছাত
নহে। আপনায় আবদালাকে বিশ্বাসস্থাপন করিয়া আমি সেই ভয় পরিহার করিলাম, আমার
ভয় হইয়াছে, আপনি এই মুহুরের উপর আপনায় বাহুবল। প্রয়োগ করিবেন না।”

রাজি সহ্যে বলিলেন, “মিঞা, তব ভয় কয়। আমি তোমার নিকট অসীকার করিয়াছি; তাকে হইতে কখন
এক হইবে না। আমার ব্যবহারে তোমার কিবা তোমার ভ্রাতৃপুত্রের অসন্তোষের কোন কারণ থাকিবে না।
তোমাকে, আমাকে তুমি এখনও ঠিক চিনিয়া উঠিতে পার নাই; তুমি এখন পর্যন্ত কেবল আমার ছদ্মবেশই
কর। আসিতেছ, আমার চরিত্র কি, তাহা জানিতে পার নাই। যদি আমি বুঝিতে পারি, তোমার এই
পুল আমার প্রেমের অযোগ্য নহে, তাহা হইলে আমার প্রণয় তাহার অঙ্গীকার হইবে না।—বাদের
ভিত্তি ধরিয়া রাজীর সর্বত্র বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর মনে মনে
চাটো, “আশ্চর্য্য স্তম্ভরী বটে, কিন্তু কেবল স্তম্ভর হইলেই হয় না, স্তম্ভর-মনও সেই স্তম্ভে পবিত্র হওয়া চাই।”

স্তম্ভর আবদালা বাদেরের হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে রাজার হস্ত সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “রাজি, আমার
কণ আপনায় হস্তে সমর্পণ করিলাম, দেখিবেন, যেন ইহাকে কখন বিপদে পড়িতে না হয়। আর এক
কথা, মধ্যে মধ্যে ইহাকে আমার নিকট আসিতে দিবে। বৃদ্ধামন্ত্র, কত দিনই বা বিচি। এ অল্পগ্রহ
কত আমাকে বঞ্চিত করিবেন না।”

রাজী আবদালাকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি ধূলি পুরকার প্রদান করিতে উদ্যত হইলে আলি আবদালা প্রথমে
এ গ্রহ করিতে কোনক্রমে সঙ্গত হইলেন না; কিন্তু রাজীর বিশেষ আগ্রহে তাহা গ্রহণ করিতে হইল।
রাজী অর্থে আরোহণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মিঞা সাহেব, তোমাকে আর এক কথা জিজ্ঞাসা
করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তোমার ভ্রাতৃপুত্রের নাম?”—আবদালা বলিলেন, “উহার নাম সেমস (হৃদ্য)।”

কিন্তু সেমসজিত অর্থে আরোহণ করিয়া, রাজী তাঁহাকে লইয়া প্রাদোষমুখে ধাবিত হইলেন।
সমুদ্রের অধিবাসিন্য রাজীর সঙ্গে বাদেরকে অধারোহণ বাইতে দেখিয়া বাদেরের জেপে মুগ্ধ হইল এবং
তাহার রাজ্যকে অভিযান প্রদান করিতে লাগিল। তাহার পরস্পর বলিতে লাগিল, “এই দেখ, রাজ্যসী
তাহার কামপিসলা পরিভূক্তির পর বাহুবল দ্বারা পণ্ড করিয়া রাখিবার জন্ত, কোথা হইতে একটি পরম
কীর যুবককে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। পিশাচীর যদি দয়া-ময়া কিছু থাকে! ইহার অত্যাচার
হইতে কি পৃথিবী নিস্তার পাইবে না?” আর এক জন বলিল, “হতভাগ্য যুবক, যদি তুমি মনে করিয়া থাক,
তাহার স্ত্রী দীর্ঘস্থায়ী হইবে, তাহা হইলে তুমি বড়ই প্রবঞ্চিত হইয়াছ। তুমি এখন আপনাকে বড়

স্বামী মনে করিতেছ, কিন্তু ইহার পর তোমার হৃদয়ে শিয়াল-কুকুর কাঁদিবে।” বাদের এই সকল কথা শুনিয়া
লন, আবদালা রাজী সঙ্কে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার এক বর্ণিত অতিরিক্ত নহে। তিনি
স্বয়ং আমার উপর নির্ভর করিয়া রাজীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন।

বাহুবলী রাজী রাজপ্রাসাদের সমুখে আসিয়া অবস্থিতি করিলেন, এবং বাদেরকে সঙ্গে লইয়া
তুমি বাদে প্রবেশ করিলেন। বাদের রাজীর অন্তঃপুরের সাজসজ্জা ও বিচিত্র শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন;
সেই

প্রেম-
বিশাসিনী
বাহুবলী
শোভাযাত্রা



প্রেমসমরী
প্রতিজ্ঞা



নহেন, তাহা বাহাতে রাজী না হুইতে পারেন, তন্নিবন্ধে বিশেষ সাধনান হইলেন। অনন্তর তিনি রাজীর সহিত নানাবিধরক কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন, ইতিমধ্যে খাভজ্যাবানি তাঁহাদের সম্মুখে আনীত হইল।

একপাশে উভয়ে আহার করিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে রাজী বাঘেরের বাহা পান করিলেন। সেই সন্ধ্যা অতি উৎকৃষ্ট রস; বাঘের হুইলেন, পারত্যাগিণির মন্তভাভারে এমন সন্ত কখন আশান্বিত হই নাই। রাজী মন্ত পান করিয়া এক পাশে বাঘেরকে দান করিলেন, বাঘের সন্মুখের সহিত তাহা গ্রহণ করিয়া রাজীর বাহা পান করিলেন। এই ভাবে পানাহার সম্পন্ন হইলে দশ জন হুন্দরী হুভী সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিবিধ বাঘমুখাদি সহকারে পীতবাত আদৃত করিল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত মন্ত ও পীতবাতের শ্রোত চলিল। বাঘেরের মস্তক উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি রাজীর হুন্দর হুন্দর দিকে অনিমেষবৃত্তিতে চাহিয়া রহিলেন। রাজী যে বাহুহরী, তাহা বিস্মত হইয়া তিনি কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, আল্লা বিয়লে বসিয়া এই অল্পপনা রূপসী রাণিকে হুটি করিয়াছেন; এমন রূপ চরাচরে হুত। এমন রূপবতীকে লাভ করিয়া তিনি আপনাকে সৌভাগ্যবান জ্ঞান করিতে লাগিলেন। রাজী যখন হুইলেন, বাঘের তাঁহাতে অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছেন, তখন তিনি দাপীপথকে বিদায় দান করিয়া বাঘেরকে লইয়া শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। তরুণ-ময়র বাঘের ইতিপূর্বে কখনই নারীর সহিত মননিত হন নাই। অনবত-হুন্দরী রাণী তাঁহাকে সোমনের বিচিত্র রগাখান করাইলেন। বাঘের মোহমুগ্ধ হইয়া সমগ্র রজনী মনোযোগে বাপন করিলেন।

পরদিন প্রভাতে বাঘের সানাগারে প্রবেশ করিলেন, দান শেষ হইলে দাপীপথ তাঁহাকে একটি অতি উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রদান করিল, তাহা পরিধান করিয়া বাঘেরের সৌন্দর্য শতগুণ বর্ধিত হইল। রাজীও সে দিন একটি সুমুজল ও বহু মূল্যবান পরিচ্ছদে সজ্জিত হইলেন। সানান্তে বাঘের রাজীর সহিত পানভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহার পর নানাপ্রকার প্রেমমালাগ ও আমোদপ্রমোদে দিন কাটিয়া গেল।

রাজী বাহাগিরের রূপযৌবন মর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহা কাশিগণনা প্রশমিত করিবার জন্ত প্রাসাদে লইয়া আসিলেন, তাহাদের সহিত চলিষ দিন পর্যন্ত প্রণয় স্থায়িত্বলাভ করিত, তাহার পর রাণী ইচ্ছানত তাহাগিরকে পশু করিয়া রাখিতেন। প্রেমালম্বে চলিষ দিন অকিবাহিত হইল। চলিষ দিনের রাত্রিতে বাঘের ও রাজী একত্রে শয়ন করিলেন, বাঘের কিছু কাল পরে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। বাঘের নিদ্রিত হইয়াছেন দেখিয়া রাজী ধীরে ধীরে উঠিলেন। তিনি অতি সাবধানতার সহিত শয্যাভাগ করিলেও সহসা বাঘেরের নিদ্রাভঙ্গ হইল; কিন্তু রাজী উঠিয়া কোথায় যান ও কি করেন, তাহা দেখিবার জন্ত বাঘের নিদ্রার তান করিয়া শয্যা নিশ্চিত রহিলেন। কিছুকাল পরে ধীরে ধীরে শয্যাভাগ করিয়া অভের অলক্ষ্যে প্রবেশ-উভানে প্রবেশ করিয়া বাঘের দেখিলেন, সেই উন্মাদে নানাভাভায় বিহগ বৃক্ষাশায় বসিয়া আছে। জ্যোৎস্নালোক-প্রাধিত উভানের এক অনাবৃত স্থানে তিনি একটি প্রিয়দর্শন পক্ষীকে দেখিতে পাইলেন। অল্পকাল পরে একটি মণীকুল বায়ল সেই পক্ষীর উপর আপতিত হইল। বায়লটি কিয়ৎকাল পক্ষীর সহিত বিহার করিয়া উড়িয়া গেল। পরমুহুর্তে তিনি দেখিলেন, পক্ষী রূপান্তরিত হইয়া রাজী লাবির বেশ ধারণ করিল।

এই বাপার মর্শনে বাঘেরের মন জীর্ণা জলিয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ শয্যা আসিয়া শয়ন করিলেন, ক্রোধে ও জীর্ণার আলায় তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে রাজী শয্যাশিথানে আসিয়া বাঘেরকে আহার করিতে লাগিলেন। বাঘেরের অজ্ঞানান ইহাতে বিগুণ প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি রাজীর সোহাগে বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তখন চতুয়া রাজী হুইলেন যে, তাঁহার কীর্ষ এই হুক লক্ষ্য করিয়াছে। কিন্তু রাজী নিজের মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না।



রপসী

শিশুচিন্তা



প্রহরিন প্রভাতে বাঁদের বলিলেন, “রাজি, আমি অনেকদিন আমার পিতৃবাকে দেখি নাই। আপনার অল্পমতি হইলে আমি তাঁহার সহিত একবার দেখা করিয়া আসি।” রাজী প্রথমতঃ সাহায্য আশীর্বাদ করিয়া বাঁদেরকে বাইরে প্রেরণ করিলেন। বাঁদের অব্যাহতভাবে আবদারের নিকট গমন করিলেন। আবদার তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ ক্রীত হইয়া ক্রন্দনাদি জিজ্ঞাসা করিল। বাঁদের গত রজনীর কথা বন্ধুকে জ্ঞাত করিলেন। আবদার বলিল, “এই রাজী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী। সে যুক্তিতে পারিয়াছে, ভূমি, তাহার কীৰ্ত্তি জানিতে পারিয়াছ। এই কৃষ্ণকর্ণ পক্ষী তাহারই এক জন অঙ্গুর। উহাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত। কিন্তু রাজীর এক কিস্করীয় সহিত তাহার প্রেম বটায়, রাণী পক্ষীটাকে পানী করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহার প্রেম সে এত বিফল যে, কামড়কা চরিতার্থ করিবার জন্য রাজী মধ্যে মধ্যে পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া থাকে। তোমার প্রশ্নে সে পক্ষী হইয়াছে, এইবার সে তোমার কক্ষ-

সাধনের জন্য চেষ্টা করিবে। কিন্তু ভূমি ভয় করিও না। আমিও বাহুবলী জানি। আমি তোমাকে সকল বিষয় হইতে রক্ষা করিব। ভূমি আজ শ্রদ্ধা পানী উহার কীৰ্ত্তি-কলাপ লক্ষ্য করিবে। তার পর কাল আসিয়া আমাকে সকল কথা বলিবে।”

বাঁদের প্রাশ্নে কিরিয়া গেলেন। রাজী জানি তাঁহাকে নানারূপে সাহায্য করিলেন। রাজিতে তাঁহাকে হুঁশপানে বিফল করিয়া জানিয়া গেলেন যে, বাঁদের পক্ষীরূপে পক্ষীরূপে কৃষ্ণকর্ণ বাঁদের সহিত তাঁহার বিহার-কার্য্য দেখিয়াছেন। তাহার পর উভয়ে শয়ন করিলেন।

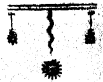


বাদ-
কল্পনা

উদ্ভাস



রাজিতে বাঁদের অহতব করিলেন, রাজী শব্দাত্যগ করিয়াছেন। বাঁদের নিজের জান করিয়া পক্ষী রাখিলেন। শব্দাত্যগ করিয়া রাজী একটি সিন্দুক খুলিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে একটি কৃষ্ণ বাহুর বাহির করিলেন। সেই বাহুর পীতবর্ণ চক্ষু পরিপূর্ণ ছিল। সেই চক্ষু কিঞ্চিৎ পরিমাণে লইয়া রাজী তাহা তাঁহার কক্ষে ছড়াইয়া দিলেন। বাঁদের দেখিলেন, দেখিতে দেখিতে কক্ষে জলের বোত চলিতে লাগিল। তবে বাঁদেরের আশ্চর্য্যগোচন হইয়া উঠিল, তিনি জানিলেন, যদি রাজী জানিতে পারেন, তিনি নিশ্চয় মরেন, নিজের জান করিতেছেন, তবেই তা' সর্বনাশ।



এই প্রমোদকন্দর প্রবাহিনীর জল ভুলিয়া রাজী একটি পাতে ঢালিলেন। পাতে কিছু ময়না ছিল, সেই ময়না এই জলে ভিজাইয়া ও উত্তমরূপে ঠালিয়া তিনি কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করিলেন। তারপর পর বিভিন্ন বাজ হইতে আর কয়েক প্রকার চূর্ণ বাহির করিয়া তিনি তদ্বারা একখানি রুটী প্রস্তুত করিলেন এবং সেই রুটীখানি একখানি কটাতে রাখিলেন, তাহার পর অগ্নি জালিয়া রুটী ভাজিয়া পাত্রগুলি যথাযথানে সজ্জিষ্ট করিলেন। অনন্তর রাজী কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবামাত্র সেই জনস্রোত অদৃশ হইয়া গেল। রুটীগুলি একটি কক্ষে রাখিয়া আসিয়া রাজী পুনর্বার বাঘেরের পার্শ্বে শয়ন করিলেন। তিনি একবার লক্ষ্য হও করিলেন না যে, বাঘের নিদ্রার ভান করিয়া শয্যা পড়িয়া থাকিয়া সকলই দেখিয়াছেন।

পরদিন প্রভাতে শয্যাভাগ করিয়া বাঘের রাজীর নিকট পুনরায় পিতৃব্যের সহিত দেখা করিয়া আশিষ্য অল্পকতি চাহিলেন। বলিলেন যে, আবদালা অতি অবশ্য আজ সকালে তাঁহাকে বাইতে বলিয়াছেন। রাজীর সহিত তিনিই তাঁহার মিলন ঘটাইয়া দিয়াছেন, তাই তিনি আজ পরমরূপে বিনোদন করিতে পারিতেছেন। এখন যদি পিতৃব্যের আদেশ পালন না করেন, তাহা হইলে যোগ অকৃতজ্ঞ হইতে হইবে। রাজী গাধা তাঁহার গমনে বাধা দিলেন না। বাঘের আবদালার নিকট আসিয়া সকল ঘটনার কথা বিবৃত করিলেন।

আবদালা বলিল, “আমি জানি, শিশুটি তাহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবে না, কিন্তু আমি এমন কৌশল জানি, তাহাতে তোমার অনিষ্ট করিতে গিয়া তাহারই অনিষ্ট হইবে। সে চল্লিশ দিনের বেশী কাহারও প্রতি অঙ্গগ্রহ প্রকাশ করে না, তাহার কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই পুরাতন ছাড়িয়া নতন প্রশরীর সন্ধানে ধাবিত হয়; পুরাতন প্রশরীকে পতনক্রীতে পরিণত করিয়া রাখে। চল্লিশ দিন চলিয়া গিয়াছে, এখন তোমাকেও সে কোন প্রকার কালোয়ার করিয়া রাখিবে, তাহার চেষ্টা করিতেছে।”

অনন্তর আবদালা বাঘেরের হাতে ছুইখানি রুটী প্রদান করিয়া বলিল, “তুমি শোপনে রুটী ছুইখানি লইয়া যাও, আজ রাগি তোমাকে রুটী খাইতে দিলে, তাহা কৌশলে লুকাইয়া ফেলিয়া এই রুটীখানি খাইবে। তুমি রুটী খাইলেই রাগি তোমাকে কোন পণ্ডতে রূপান্তরিত করিবার চেষ্টা করিবে, কিন্তু তাহার চেষ্টা সকল হইবে না, তখন সে তোমাকে আশ্রয় করিয়া বলিবে, তুমি ভয় পাও কি না, তাই দেখিবার জন্ম সে সেরূপ করিয়াছিল, তাহার মন উদ্বেগ ছিল না। তখন তুমি তাহাকে অস্ত্র রুটী খাইতে দিবে, তোমাকে সজ্ঞ করিবার জন্ম সে তাহা খাইবে। যখনই খাইবে, তৎক্ষণাৎ তুমি একটু জল তাহার গায়ে ছড়াইয়া দিয়া, তুমি তাহাকে তোমার ইচ্ছামত প্রাণীতে পরিবর্তিত করিতে পারিবে। তাহার পর বাধা করিতে হইবে, তাহা আমি পরে বলিয়া দিব। তুমি সাবধানে আমার উপদেশ অল্পদূরে কাজ করিলে আর কোনরূপ আশঙ্কার কারণ থাকিবে না।”

বাঘের আনন্দিতমনে বৃদ্ধের নিকট বিষয়গ্রহণ করিয়া রাজীর প্রাঙ্গণে ফিরিলেন। প্রাঙ্গণ-সলয় প্রমোদ-উত্তানে রাগির সহিত তাঁহার দেখা হইল। রাজী বলিলেন, “প্রিয়তম প্রাণেশ্বর, আমি তোমার বিরুদ্ধে হুটকট করিতেছি, আমার প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম, নির্দয় হইয়া কি এত বিলম্ব করিতে হয়? তুমি বড় নীচ, তুমি আর কিছু অধিক বিলম্ব করিলে আমি নিজেই তোমার সন্ধানে ছুটিতাম।”

বাঘের বলিলেন, “প্রিয়তম রাজি, আমার প্রতি তোমার যে এত প্রেম, তাহার অনেক পরিচর পাইয়াছি; কিন্তু কাকা সাহেব আমাকে বড় ভালবাসেন, তাই কথাবার্তার একটু রাত্রি হইয়া গেল, তুমি এ অপরাধ কমা কর। আমি তোমাকে দেখিবার জন্ম ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছি।”

রাজী বলিলেন, “প্রিয়তম বাঘের, অনেককাল তোমার কিছু জল খাওয়া হয় নাই, এই রুটীখানি খাইয়া, তুমি একটু কৃপাশ্রী কর, তোমার সুখখানি যে একেবারে ভুকাইয়া গিয়াছে।” রাজী বাঘেরকে একখানি



কটী প্রদান করিলেন। বাদ্যের প্রবেশ-উঠানের একটি নিষ্যের ধারে আসিয়া বসিলেন, এবং মুহূর্তকালো
রাজ্যবাসি গোপন করিয়া, আবদাঙ্গার প্রদত্ত রুটী বাহির করিয়া বলিলেন, “কাণ্ড আমাকে কটী বাইতে
দিয়েছিলেন, কিন্তু আমি তোমাকে বৈষ্ণব ভালবাসি, তাহাতে একখানি খাইয়া, তোমার জন্ত আর একখানি
না আনিয়া পারি নাই, তুমি এখানি খাও।”

বাদ্যকর
অভিসম্পাত

রাজী বলিলেন, “আমি পরে খাইব, প্রিয়জন, তুমি আগে খাও।”—আবদাঙ্গা বাদ্যকে যে কটী খাইতে
দিয়েছিলেন, তিনি তাহারই অপরখানি লইয়া খাইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে রাজী নিকটস্থ নিষ্যের জল
এক গণ্ডু লইয়া তাহা বাদ্যের গায়ে ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন, “যে হতভাগা, তুই নষ্টকৃত্তি ভোগ করিয়া,
এই নষ্টে একটা কাণ্ডা খোঁড়া যেতো খোঁড়া হই!”

কিন্তু একথাতে কোন কাজই হইল না। রাজী কিয়ৎকাল বিমূর্তভাবে মগ্নমান হইলেন;—যেখিনেদ,
বাদ্যের বেগন ছিলেন, তাহাই আছেন, তিনি জয়ে কাঁপিতেছেন। রাজী আশ্ব-সংবরণ করিয়া বলিলেন,
“প্রিয়জন! ভয় পাইয়াছ? ভয় নাই, তোমার কৃতি করা আমার ইচ্ছা ছিল না, কেবল তোমাকে ভয়
দেখাইয়া, আমোদ করিতেছিলাম। তুমি স্থির হও।”

বাদ্যের বলিলেন, “হাঁ, স্থির হইয়াছি। আপনি বিক্রম করিতেছিলেন, তাহা বুঝিয়াছি, আমি আপনার
কটী খাইলাম, এখন আপনি আমার প্রদত্ত রুটী খাইলেই আমি পরম সুখী হইব।”—বাদ্যেরকে
সুখী করিবার জন্ত মায়াবিনী রুটী, কিয়দংশ উদরস্থ করিলেন, রুটী খাইয়াই তাহার উদরের মধ্যে ভয়ানক
প্রবাহ উপস্থিত হইল। বাদ্যের আর বিলম্ব না করিয়া এক গণ্ডু জল লইয়া তাহা রাজীর দেহে নিক্ষেপ
করিয়া বলিলেন, “যে পিশাচিনি, তুই অবিলম্বে তোমার রমনীমূর্ত্তি ভোগ করিয়া একটি অধিনীদেহ ধারণ কর।”

রাজী লাবি অধিনীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, বাদ্যেরের পদতলে লুপ্তিত হইয়া অশ্রুবিষর্জন করিতে লাগিলেন।
বাদ্যেরের হৃদয়ে কল্পশাসক হইলেও তাহাকে আর পূর্বমূর্ত্তি প্রদান করা তাহার মাথা ছিল না। তিনি
এক জন সহিসকে ডাকিয়া জীন ও লাগাম লাগাইবার জন্ত ঘোটকীটি প্রদান করিলেন, কিন্তু কোন জীন
তাহার পিঠে বলিল না। তিনি সেই অবস্থায় ঘোটকী লইয়া আবদাঙ্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। আবদা
বাদ্যেরের কৃতকাৰ্য্যতার পরম শ্রীত হইয়া বলিলেন, “আমি এই জীন দিতেছি, ইহা ইহার পৃষ্ঠে দিয়া,
ইহাতে চড়িয়া তুমি পারন্ত দেশে যাত্রা কর। কিন্তু একটি কথা কখন বিস্মৃত হইবে না, কদাচ এই জীন
ঘোটকীর পিঠে হইতে নামাইবে না; তাহা হইলে বিপদ ঘটবে।” বাদ্যের স্বরাঙ্কো যাত্রা করিলেন।

অধিনীরপে
ক্রমোদ্গনি

তিন দিন যাত্রার পর বাদ্যের একটি পুরহৎ নগরে উপস্থিত হইলেন। নগর-প্রান্তে একটি বৃদ্ধের সহিত
তাহার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, বিদেশী লোক দেখিতেছি, কোথা হইতে
আসিতেছেন?” বাদ্যের তাহার কথার উত্তর দিতে বাইবেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধা তাহার নিকটে
আসিয়া তাহার ঘোটকীটির দিকে চাহিয়া প্রবলবেগে অশ্রুভাগ করিতে লাগিল। বাদ্যের তাহার শোকের
কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বৃদ্ধা বলিল, “মহাশয়, আমার পুত্রের একটি ঘোটকী ছিল, সেট দেখিতে আপনার
এই ঘোটকীটির মত। সেট মরিয়া বাওয়ার আমার পুত্র আহার-নিজ্ঞা ভোগ করিয়াছে। আমার পুত্রের
প্রাণরক্ষার্থ এট আমাকে বিক্রয় করুন, আপনি যে মূল্য চাহিবেন, আমি তাহাই দিব।” বাদ্যের বলিলেন,
“তোমার কথা শুনিয়া আমি হুঃখিত হইলাম, কিন্তু তোমার অহরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে অসাধ্য;
আমি কোনক্রমেই এ ঘোটকীট বিক্রয় করিতে পারি না, এ জন্ত যদি তোমার পুত্রের জীবনরক্ষা না হয়,
তাহা হইলে আমার হুঃখিত হওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই।” কিন্তু বৃদ্ধা তাহার কথার কর্ণপাত না করিয়া

বোটকীট ক্রম করিবার জন্ত অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল, দেখিয়া বাসের ভাবিলেন, অসম্ভব দাম বলিয়া উহাকে নিবৃত্ত করা খাউক। তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন, “আমি যে দাম চাহিব, তুমি তাহাই দিতে প্রস্তুত আছ বলিলে, যদি আমাকে এই দণ্ডে আমার অধিনীর দাম হাজার মোহর দিতে পার, তাহা হইলে আমি ইহা তোমার নিকট বিক্রয় করিতে পারি।” বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ মোহরের একটি তোড়া কাগড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া বাসেরের হস্তে নম্রপণ করিতে উত্থত হইয়া বলিল, “এই মোহর লউন, যদি কিছু কম পড়ে, নিকটেই আমার বাড়ী, বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া তাহা গ্রহণ করিতেছি।” এক জন দরিদ্রা বৃদ্ধা যে এত টাকা দিয়া একটি অর্থ ক্রয় করিতে পারে, তাহা বাসেরের বিবশ হর নাই, হতহাঃ তিনি সেই মোহরের তোড়া দেখিয়া অভ্যস্ত বিস্মিত ও কিংকর্তব্যাজসমিস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বাছা, সত্যই আমি এ বোটকীট বিক্রয় করিব না। তোমার সহিত পরিহাস করিয়া আমি ইহার দাম ইকিয়াছিলাম, ডাকিয়াছিলাম, তুমি এত দাম দিতে পারিবে না। বাছা হউক, দেখিতেছি, তোমার অবস্থা ভাল, তোমার ভাল বোড়া কিনিবার শক্তি আছে, অস্ত্র তাহা কিনিয়া লইও, সত্যই আমি এ বোটকীট বিক্রয় করিব না।” যে বৃদ্ধটি প্রথমে বাসেরকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার বাসস্থানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, সে দেখানে পাড়াইয়া এই কথোপকথন শ্রবণ করিতেছিল, সে এক্ষণ পরে কথা বলিল। সে বলিল, “দ্বাশয়, দেখিতেছি আপনি যিদেখী লোক, আপনি এখানকার নিয়ম জানেন না, এখানে মিথ্যাকথা বলিলে প্রাণদণ্ড হয়, আপনি যখন বোড়া বিক্রয় করিতে চাহিয়াছেন, তখন ইহা আপনাকে বিক্রয় করিতেই হইবে, অন্তথা আপনাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে, সে দণ্ড প্রাণদণ্ড।”

বাহুকরের
প্রভাব চূর্ণ

বাসের উপায়ান্তর না দেখিয়া বৃদ্ধার নিকট বোটকীট বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ অধিনীর লাগান চাপিয়া ধরিল, এবং তাহার পিঠ হইতে জীনট টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, তাহার পর নিকটবর্তী জলাশয় হইতে এক গণ্ড জল তুলিয়া তাহা সেই অঞ্চলদেহে নিক্ষেপ করিয়া বলিল, “না, তুমি এই আকার পরিভাগ করিয়া তোমার নিজের আকার ধারণ কর।”—বৃহৎকথ্যে মায়াবিনী রাজ্ঞী লাবি তাঁহার পূৰ্ণমুখিতে দণ্ডায়মান হইলেন! এই দৃশ্যে বাসের মুচ্ছিত হইয়া পড়িতে পড়িতে বৃদ্ধটি তাঁহাকে ধরিয়া কেলিল।

যে বৃদ্ধা বোটকীট ক্রয় করিয়াছিল, সে মায়াবিনী রাগীর মাতা, এবং সেই তাহার কন্ডাকে বাহুবিক্রয় পারদর্শিনী করিয়া মায়ানগরে রাজ্ঞীগণে স্থাপিত করিয়াছিল। অধিনীবেশধারিণী কন্ডাকে দেখিবামাত্র সে চিনিতে পারিয়াছিল; এবং বোটকীট ক্রম করিবার জন্ত সেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিল।

অনন্তর বৃদ্ধা একটি বংশীধ্বনি করিবামাত্র একটা অতি কদাকার প্রকাণ্ড মৈত্ৰ্য সেই স্থানে উপস্থিত হইল, এবং বৃদ্ধার আদেশে সে বাসেরকে বন্ধে লইয়া মায়ানগরে উড়িয়া চলিল।

প্রাণাদে উপস্থিত হইয়া রাগী বাসেরকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “অকৃতজ্ঞ নরাদম, আমি তোমার যে ঈশকায় করিয়াছি, এইরূপে কি জেয়, জেজা তাহার প্রত্যাশকায় করিতে শিখিয়াছে? বাছা হউক, আমি তোমার উপবৃত্ত পুরস্কার প্রদান করিতেছি।”—রাজ্ঞী এক গণ্ড জল লইয়া তাহা বাসেরের মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “তোমার এই বেহ পরিভাগ করিয়া কুণ্ঠিত পেটকের বেহ ধারণ কর।” বাসের দেখিতে ধ্বিতে পেটকদেহ প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাজ্ঞী এক জন দাসীকে আদেশ করিলেন, “ইহাকে একটা খাঁচার বাবদ্ধ করিয়া উপবনে এক বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখ, অনাহারে ইহার প্রাণবধ করিবি।”

শিশাচিনী
প্রতিহিংসা

দাসী রাজীবর আশে অহুসারে সেই পেচকটিকে উপবনে লইয়া পেল কটে, কিন্তু তাহাকে পানীয় ও আহারা
ক্রমে বঞ্চিত করিল না। এই স্ত্রীলোকটি আবদারার প্রেমাকাজক্ষী ছিল, সে আবদারার নিকট উপস্থিত
হইয়া সকল কথা তাহার গোচর করিল।

আবদারার দেখিল, অন্তঃপুর রাজীবর ক্রোধ হইতে বন্ধা পাওয়া সহজ হইবে না, বাদরের উজারেরও কোন
আশা নাই। সে তৎক্ষণাৎ শীঘ্র দেওয়া মাত্র এক বিরাটদেহ দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল, এই দৈত্যের
চরিত্রানি পাখা। আবদারার বলিল, “বজ্র, তুমি পারস্তরাজ বাদরের প্রাণরক্ষার উপায় করিতে পারিবে ভাবিয়াই
তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, তুমি এই দণ্ডে এই যুবতীকে পুটে লইয়া পারস্ত রাজধানীতে উপস্থিত হও,
বাদরের মাতা রাজী গুলনারকে তাঁহার পুত্রের বিবাহের কথা জানান আবশ্যক, এই দাসী তাহা জানাইবে।”

দৈত্য-অভিধান



দৈত্য দাসীকে বন্ধে লইয়া আকাশপথে পারস্ত-রাজ প্রাসাদের স্তম্ভশিরে সংস্থাপন করিল। দাসী সেখান
হইতে নামিয়া প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং যেখানে গুলনার ও তাঁহার মাতা রাজী কন্ঠাট উপবেশন
করিয়া পুত্রের নিকৃৎসংবাদ লইয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া আশ্চর্যচিত্র জ্ঞান করিল।

পুত্রের সংবাদে পারস্তরাজমাতা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া দাসীর সম্বন্ধনা করিলেন, তাহার পর তাঁহার
হাঠকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “ভাই, তোমার ভাগিনেয়—আমার পুত্র নানানগরে রাণী লাবির হস্তে বন্দী
হইয়াছে, তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে, এক্ষেত্রে অবিলম্বে প্রস্তুত হও।”

ভগিনীর নিকট এই সংবাদ পাইবামাত্র বাদরের মাতুল সালে তাঁহার সহযোগী অসংখ্য দৈত্য ও
অজ্ঞাত সৈন্তগণকে তাঁহার সহায়তার জন্য আহ্বান করিলেন, এবং তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া রাজী
কন্ঠাট, রাজী গুলনার ও অজ্ঞাত রাজপুরমহিলাগণ শত্রুজয়ে নায়াপুরীর দিকে ধাবিত হইলেন।
বাহুবলী লাবি, তাঁহার মাতা এবং অজ্ঞাত অগ্নি-উপাসকগণকে মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হইতে হইল।
শেচক যে পিঞ্জরে আবদ্ধ ছিল, তাহা বোর যুদ্ধের সময়েই রাজী গুলনারের হস্তগত হইয়াছিল।

বাহুবলী



রাজীবাসনে রাজী পিঞ্জরধার মুক্ত করিয়া পেচককে বাহিরে আনিলেন এবং তাহার দেখে অন্ন জল নিক্ষেপ
করিয়া বলিলেন, “প্রিয় পুত্র, তুমি এই কুংকিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার স্বাভাবিক মূর্ত্তি গ্রহণ কর।”

পুত্র দীর্ঘকাল পরে মাতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। উভয়ের নয়ন হইতে অশ্রুধারা বিগলিত
হইতে লাগিল। অজ্ঞাত আত্মীয়গণও এই আনন্দসম্মিলনে যোগদান করিলেন।

আনন্দাবেশে কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে রাজী গুলনার অবদারাকে আহ্বান করিলেন। আবদারার তাঁহার
নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “তুমি আমার পুত্রের যে উপকার
করিয়াছ, তাহার প্রত্যাশকার করিতে ইচ্ছা করি, তোমার প্রার্থনা কি, তাহা বল।”

আবদারার প্রণয়াকাজক্ষী দাসীকে বিবাহ করিতে চাহিল এবং চিরজীবন পারস্তরাজসভায় প্রতিপালিত
হয়, এরূপ ইচ্ছা জানাইল। গুলনার তৎক্ষণাৎ দাসীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “তোমাদের
চিরজীবনের প্রতিপালনভার আমরা গ্রহণ করিলাম।” বাদেরও এই প্রতিজ্ঞায় যোগদান করিলেন।

বাদের তাঁহার জননীকে বলিলেন, “একটি বিবাহের আয়োজন করিলে, আর একটি বিবাহের
কিরূপ আয়োজন করিতেছ?” গুলনার বুঝিলেন, পুত্র তাঁহার নিজের বিবাহের কথাই বলিতেছেন,
হুতরাং তিনি সমুদ্রচর ভ্রাতৃগণকে আদেশ করিলেন, “তোমরা পৃথিবীর চতুর্দিকে ধাবিত হও, যেখানে
সর্বাঙ্গজন্যের সর্বগুণভূষিতা কল্পা দেখিতে পাইবে, তাহার সন্ধান আমাকে জানাইবে।” বাদের বলিলেন,
“এই কষ্টবীর্যের কোন আবশ্যক নাই, সামন্তের রাজকুমারী পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্ত্রী, আমি তাহাকে

দোখাছি, তাঁহার সহিত বিবাহ হইলেই আমি সুখী হইব। রাজকন্তা গাহেরী অপেক্ষা অধিক রূপবতী রাজকুমারী জলে স্থলে অন্তরীক্ষে কোথাও নাই। তিনি একবার আমার অপমান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাহা পিতৃভক্তি ও বংশের সন্মানরক্ষার্থ। সামন্তলপতি এখন আমার মাতুলের বশীভূত হইয়াছেন, এখন তিনি সন্তবৃত্ত: আমাকে কন্তাহীন করিতে আগন্তি করিবেন না।”

বাদের মাতুল সালে সামন্তলপতিকে সেখানে উপস্থিত করিলেন। বাদের তাঁহার পদতলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, “মহারাজ, আমি পারত্যাগিনী বাদের, আপনার কন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া নিজের সন্ধান ও গৌরব বর্দ্ধিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; আশা করি, আপনি আমাকে নিরাশ করিবেন না।” সামন্তলপতি এহার বাদেরের প্রার্থনা অগ্রাহ করিতে পারিলেন না, তাঁহার পরপ্রাপ্ত হইতে

বাদেরকে তুলিয়া বলিলেন, “বৎস, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম, রাজকুমারী গাহেরীকে তোমারই হস্তে সমর্পণ করিব, তাহাকে এখানে আনিবার জ্ঞাত এখনি লোক পাঠাইতেছি।”

যে দ্বীপে গাহেরীর সহিত বাদেরের দাক্ষাং হইয়াছিল, সেইখানেই গাহেরীর পিতৃভৃত্যরূপে তাঁহার দাক্ষাং পাইল। পিতৃ-আজ্ঞা অনুসারে রাজকন্তা অবিনাশে মায়ানগরে উপস্থিত হইলেন, সামন্তলরাজ বলিলেন, “মা, ইনিই পারতরাজ বাদের, তোমাকে আমি ইহার হস্তে সমর্পণ করিলাম। ইনি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও ঐশ্বর্য্যাসম্পন্ন নরপতি, ইনি পৃথিবীর অজ্ঞাত রাজকন্তাগণকে ত্যাগ করিয়া



মিলন-
স্বপ্ন
সকল

তোমার পাণিগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করার আমি সন্মানিত হইয়াছি।” গাহেরী বিনা প্রতিবাদে পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিলেন। সেই মায়ানগরেই মহাদমারোহে বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইল, রাজধানীতে মহোৎসব আরম্ভ হইল। গাহেরীকে পরীক্ষণে পাইয়া বাদের পরমানন্দলাভ করিলেন। পুষ্করাসরে গাহেরী স্বামীর আলিঙ্গনলাপে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রেম নিবেদন করিলেন। বাহুবলী রাণী যে সকল দ্রব্যকে পশুপক্ষীতে পরিণত করিয়াছিল, তাহারা সকলেই সেই পিশাচীর মুতায় পর যত পূর্ব্বদেহ পুন: প্রাপ্ত হইল। বিবাহ শেষ হইলে বাদের, গুলনার, কর্ণাটী, সালে এবং সামন্তলরাজ সকলেই স্ব স্ব দ্বারোহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।



নিখাতনের
প্রশ্ন-সোহাগ

প্রশ্নোত্তর

১৩৬

প্রশ্নোত্তর

১৩৬



শাহাজাদী সুলতানকে বলিলেন, “জাহাপনা, পূর্বকালে দামাস্কাস নগরে একজন প্রভুত-ধনশালী সদাগর বাস করিতেন, এই সদাগরের নাম আবু। আবুর একটি পুত্র ও একটি কন্যা;—পুত্রটির নাম ছিল গানেম, কিন্তু পরে তাহার নাম প্রণয়ের দাস হইয়াছিল। গানেম হুশিক্ষিত, রূপবান ও সুধিবেচক ছিলেন। আবুর কন্যার নাম ফিৎনা অর্থাৎ হৃদয়মোহিনী; তাহার অপূর্ণ সৌন্দর্য্য দর্শনে সকলেই মোহিত হইত বলিয়া তাহার এই নাম হইয়াছিল।

বহু সম্পত্তি রাখিয়া আবু প্রাণত্যাগ করিলেন। তাহার গুদামে একশত বাঙিল উৎকৃষ্ট রেশম ছিল, প্রত্যেক বাঙিলে লেখা ছিল, “বোন্দাদের জন্ত।”

এই সময়ে সিরিয়া রাজ্যের রাজধানী দামাস্কাস নগরে সলিমানের পুত্র মহম্মদ জিনেবি রাজত্ব করিতেন। তিনি বোন্দাদাধিপতি হারুণ-অল-রসিদের আশ্রয় ছিলেন, হারুণ-অল-রসিদের নিকটেই মহম্মদ জিনেবি এই রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন।

গানেম পিতার মৃত্যুর পর পৈতৃক বিষয়সম্পত্তি সম্বন্ধে মাতার সহিত আলাপ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, শুধামে যে এক শত বাঙিল রেশম রহিয়াছে, তাহার প্রত্যেক বাঙিলের উপর ‘বোন্দাদের জন্ত’ এ কথা লিখিত আছে, ইহার অর্থ কি?”

মাতা অশ্রুস্রব্ধনে পুত্রের দিকে চাহিয়া বাশ্বগদগদকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, “বৎস, তোমার পিতা কোথাও বাসিকা করিতে হইবার পূর্বে পণ্যক্রয় উপর, যে স্থানে যাইবেন, তাহার নাম লিখিয়া রাখিতেন। তিনি এই সকল দ্রব্য লইয়া বোন্দাদ বাজা করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু বোন্দাদে বাজা করিবার পূর্বেই মৃত্যু—” শোকাতুরা রমণী আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। অশ্রুশাশিতে তাহার গণ্ডেশ প্রাণিত হইয়া গেল।

মাতার শোক দেখিয়া গানেম অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন, কিছুক্ষণ কোন কথা বলিতে পারিলেন না, অবশেষে বলিলেন, “মা, বাবা যখন বোন্দাদ গমনে কৃতসংকল্প হইয়া সেখানে যাইতে পারেন নাই, তখন এই সকল পণ্যক্রয় লইয়া বোন্দাদ নগরে গমন করা আমার কর্তব্য। অধিক দিন জ্বলিলঙলি গুদামে পড়িয়া থাকিলে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে, আমি শীঘ্রই বাণিজ্যযাত্রা করিবার জন্ত অধীর হইয়াছি।”

পুত্রের আগ্রহের কথা শুনিয়া মাতা ভীত হইলেন। জীবনের একমাত্র অবলম্বন পুত্রকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইল না, তিনি পুত্রকে সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলিবার জন্ত অমুয়োধ করিলেন; তাহাকে বিদেশযাত্রা করিতে নিষেধ করিলেন।

কিন্তু পুত্র মাতার আজ্ঞাপালনে অসম্মত হইলেন; মাতার কাতরতা, অশ্রু তাহাকে বিচলিত করিতে পারিল না। তিনি বাজারে উপস্থিত হইয়া কতিপয় ভৃত্য ও এক শত উক্টু ক্রয় করিলেন এবং পাঁচ ছয় জন সদাগরের সহিত পণ্যক্রয়সম্বন্ধ লইয়া বোন্দাদ বাজা করিলেন।

অনেক সদাগর একত্র যাত্রা করিয়াছিল, পথে বেহুইন নদীর তীরে থাকিলেও তাহারা এতগুলি সদাগরকে একত্র আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না; সুতরাং সদাগরগণ নিঃশঙ্কে বোন্দাদ নগরে উপস্থিত হইয়া এক জন শ্রেষ্ঠের গৃহে বাসা লইল। গানেম সে স্থানে বাস করা কষ্টকর বিবেচনা করিয়া নিকটে একটি সুসজ্জিত অট্টালিকা ভাড়া লইলেন; অট্টালিকাটি এক উপবনের মধ্যে; উপবন কুম্বকানন, নির্ঝরী ও শ্রাবল বৃক্ষলতায় সুশোভিত।

প্রণয়-দাসের
বাণিজ্য-যাত্রা

১৩৬

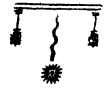


কয়েক দিন বিশ্রামের পর এক দিন গানেম অক্ষয়বেশে সজ্জিত হইয়া স্থানীয় বাজারে উপস্থিত হইলেন।
এক জন ভূতা কয়েকজাতীয় রেশমের নমুনা লইয়া তাঁহার অঙ্গুগমন করিল।

গানেম এই বাজারে সুবিধামত মূল্যে প্রায় প্রত্যহই তাঁহার পণ্যক্রয় বিক্রয় করিতে লাগিলেন, লাভও যথেষ্ট হইল। শুধামে আর এক বাণিজ্য রেশমমাত্র অবশিষ্ট আছে, তাহা শুদাম হইতে বাসায় আনিয়া রাখিলেন, এবং বাজারে চলিলেন। বাজারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকল দোকানই বন্ধ। গানেমের মনে এই দৃশ্যে বড় বিষয়ের স্ফূর্তি হইল। গানেম ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, এক জন প্রধান সদাগরের মৃত্যু হওয়ায় দোকানদারেরা দোকান বন্ধ করিয়া মৃতের সংকারে ব্যস্তা করিয়াছে। মৃতের প্রতি সম্মান প্রকাশার্থ তাহার দেশীয় প্রথা অনুগারে দোকান বন্ধ রাখিয়াছে।

গানেমও তাঁহার পণ্যক্রয় ভূতোর হস্তে গৃহে পাঠাইয়া নগর-বাহিরে অবস্থিত সমাধিক্ষেত্রান্তিমুখে ব্যস্তা করিলেন। সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, মৃতের আশ্রয় কল্যাণ-কামনায় মুগ্ধমানগণ চক্রাকারে বসিয়া আশ্রয় উপাসনা করিতেছেন। তিনিও সেই উপাসনায় যোগদান করিলেন, সমাধিস্থার্থ শেষ করিতে রাত্রি হইল।

শব-সম্বন্ধন।



গানেম ক্রমে অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি শুনিলেন, শববাহী ও শবদহচরণ গর সে রাত্রি নগরে প্রত্যগমন করিবেন না, মৃতের সম্মানার্থ সে রাত্রি সেখানে থানায় আয়োজন হইবে। গানেম ভীত হইলেন। ভাবিলেন, “আমি এখানে অপরিচিত ব্যক্তি, বাসায় যথেষ্ট টাকা কড়ি আছে, ভূতাগণ তাহা লইয়া দেশান্তরে পলায়ন করিলে আমারই সর্বনাশ হইবে। এ অবস্থায় এখানে অধিকক্ষণ থাকা কর্তব্য নয়।” তিনি কয়েক গ্রাম আহার করিয়া সেখান হইতে বানার দিকে ব্যস্তা করিলেন।

রাত্রে তিনি পথিব্রান্ত হইলেন। অনেক রাত্রিতে ঘুরিতে ঘুরিতে নগরদ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলেন, দেউড়ী বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দেউড়ী না খুলিলে আর ভিতরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই, অগত্যা স্থানান্তরে রাহিবাসন করিতে হইবে।

তিনি অগত্যা একটি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, এই সমাধিমন্দিরের অদূরে একটি খেজুরগাছ ছিল। খেজুরগাছের নিকটে আসিয়া তিনি দেখিলেন, মন্দিরদ্বার মুক্ত রহিয়াছে। তিনি সেই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া শয়ন করিলেন; কিন্তু নানা চিন্তাস্তায় নিদ্রাকর্ষণ হইল না। অবশেষে তিনি উঠিলেন, কয়েক মুহূর্ত ইতস্ততঃ পলচারণা করিয়া অবশেষে রুদ্ধদ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। মুক্ত দ্বারপথে দেখিলেন, কিছু দূরে একটা আলোক—যেন একটা উজ্জল মশাল ধক-ধক করিয়া জলিতেছে। আলোক-শিখা ক্রমে তাঁহার নিকটবর্তী হইতেছে বলিয়া তাঁহার অনুমান হইল। ভয়ে তিনি সমাধিমন্দির পরিভ্রমণ করিয়া খেজুর-গাছের উপর আশ্রয় লইলেন।

বহুতময়
সিন্দুক

তিনি গাছের উপর বসিয়া দেখিলেন, মশালধারিণী কোন সম্পন্ন ব্যক্তির ভূতা; তাহার একটি সিন্দুক লইয়া আসিয়াছিল, সিন্দুকট তাহার খেজুরগাছের অদূরে নামাইল। ভূতাত্ত্বের এক জন বলিল, “ভাই, বড় পরিভ্রান্ত হওয়া গিয়াছে। এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর হইবে। এস আমরা বন্দী হই বিশ্রাম করিয়া লই। তার পর মাটা খুঁড়িয়া সিন্দুকটিকে সমাহিত করা যাইবে। ততক্ষণ য য জীবনকাহিনী আলেচনা করা বাউক। কে কোন অবস্থায় পড়িয়া খোজা হইয়াছি, তাহা জানিয়া রাখা ভাল।” এই প্রস্তাবে সকলেই রাজি হইল এবং প্রথম বক্তা বসাইত তাহার নিজের জীবনকাহিনী বলিতে লাগিল।



খোজা

হাফাই-

তের

আফ-

কাহিনী

ক



তাই, আমার বখান পাঁচ বৎসর বয়স, সেই সময় দাসবাবসারীরা আমাকে স্বদেশ হইতে আনিয়া এই দেশে এক জন রাজপুত্রের নিকট বিক্রয় করে। আমার মনিবের তিন বৎসর-বয়স্কা একটি কস্তা ছিল। আমি সেই বালিকটির সহিত খেলা করিতাম। কস্তার বখান দ্বাদশবর্ষ বয়স, আমি তখন চৌদ্দ বৎসরের কিশোর। মনিব ও মনিবপত্নী রেহপ্রভু আমার নিকট হইতে ক্রমবর্ধমানা বালিকা কস্তাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখেন নাই। এক দিন আমি খেলা করিবার অভিপ্রায়ে প্রভুকস্তার সন্ধান গিয়া দেখিলাম, বান-অবসানে বহুমুখা পরিচ্ছদে ভূষিতা হইয়া সে একাকিনী এক কক্ষে বসিয়া আছে। তাহার দৌলদেহ আমার কিশোর চিত্ত মুগ্ধ হইল। প্রভুকস্তাও আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিত। তাহার দেহে তখন যৌবনের আগমন-চিহ্ন দেখা দিয়াছে। উভয়ে একত্রে বসিয়া ক্রীড়া করিতে করিতে আশ্ব-বিস্তৃত হইয়া পড়িলাম। কিশোরী আমার সঙ্গে চলিয়া পড়িল, আমিও তখন প্রথম যৌবনের উত্তেজনায় অধীর। বয়সের তুলনায় আমি দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং ইন্ডিয়াজয়ে আমি সমর্থ হইলাম না।

কিন্তু পরকণ্ঠে আমার অসুখ্যতা জ্ঞানিল। আমি ছুটিয়া পলায়ন করিলাম। প্রভুপত্নী কস্তাকে দেখিয়া সমস্ত বৃথিতে পারিলেন; কিন্তু ঘটনার কথা মনিবের নিকট প্রকাশ করিলেন না। তাড়াতাড়ি কস্তার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করিয়া একটি সুন্দর যুবকের সহিত তাহার বিবাহ দিলেন। পরে এক দিন মনিব মহাশয় আমাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া আমাকে খোজা করিয়া আনিলেন। তার পর যে কস্তাকে এক দিন আমার অশ্রুশায়িনী করিয়াছিলাম, তাহারই ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইহাই আমার জীবনকাহিনী। অনেকদিন পরে সেই কস্তার মুকুতা হইলে, আমি অজ্ঞাত বিক্রীত হইলাম।

*** **

খোজা

কাফু-

হের

জীবন-

রহস্য

ক



তাই সব, আট বৎসর বয়সে আমি ক্রীতদাসের কাজ আরম্ভ করি। সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর আমি একটিমাত্র মিথাকথা বলিতে অভ্যাস করি। দাসব্যবসারীরা সে কথা জানিয়াই আমাকে বিক্রয় করিত। আমার মনিবও জানিয়া শুনিয়া আমায় ক্রয় করিতেন। কিন্তু বাৎসরিক একটি মিথ্যা কথার জন্ত মনিব বাধা হইয়া বাজারে গিয়া আমাকে নূতন ক্রেতায় কাছে বিক্রয় করিতে হইত। যাহা হউক, আমার নূতন মনিব আমার ক্রটির কথা জানিয়াই সন্তানদের আমায় ক্রয় করিলেন। তিনি আমায় নূতন বসন-ভূষণে সাজাইয়া দিলেন। দ্বাদশ মাস আমি ভালভাবেই কাজ করিলাম। বৎসর পূর্ণ হইতে তখন একটি দিন বাকী, এমন সময় আমার প্রভু নগরের বাহিরে কয়েকজন বন্ধুসহ এক পুষ্পোজ্জ্বল আনন্দোৎসব করিবার জন্ত গমন করিলেন, আমিও তাঁহার সহযাত্রী হইলাম। আমাদের সঙ্গে আহার্য ও বহুপ্রকার পেয় ছিল। উদ্ভানে উপস্থিত হইবার কিছুকাল পরে কোন একটা প্রয়োজনীয় দ্রব্য মনিবপত্নীর নিকট হইতে আনিবার জন্ত তিনি আমাকে নগরে পাঠাইয়া দিলেন।

বাড়ীর সমিহিত হইয়া আমি ক্রন্দন করিতে লাগিলাম এবং কেশোপাটন করিতে আরম্ভ করিলাম। আমার সেই অবস্থা দেখিয়া, পাড়াপ্রতিবেশীরা ব্যস্তভাবে আমার কাছে আসিল, আমার মনিবপত্নী ও তাঁহার সন্তানগণও ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাদের প্রস্নে আমি বলিলাম, “প্রভু বন্ধুগণ সহ একটা পুরাতন ঘরের নীচে বসিয়া আনন্দ-প্রমোদ করিতেছিলেন, এমন সময় পুরাতন ঘর ভাঙ্গিয়া তাঁহারা সমাধিস্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের মৃত্যু দেখিয়া আমি তাড়াতাড়ি সংবাদ দিতে আসিয়াছি।” এই কথা শুনিবামাত্র চারিদিকে

ক্রমের দ্বারা উঠিল। মনিবপত্নী শোক অধীর হইয়া গৃহের তৈজস-পত্র চারিদিকে ছড়াইয়া কেঁদিতে লাগিলেন। তিনি আমাকেও এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। আমি মহা উৎসাহভরে বাসনপত্র ভাঙিয়া, বস্ত্রাদি ছিন্ন করিয়া গভীর শোক প্রকাশ করিতে লাগিলাম। গৃহের কোন দ্রব্য অক্ষত রহিল না।

তখন মনিবপত্নী বলিলেন, “কাহ্নুর, তুমি অগ্রে অগ্রে গিয়া আনাদিগকে সেই স্থান দেখাইয়া দাও। আমরা তাঁহার মৃতদেহ বহন করিয়া আনাইবার ব্যবস্থা করিব।” আমি পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলাম।

পথের লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “ব্যাপার কি?” আমি অন্নান-বদনে সকল কথা বলিলাম। তাহার বলিল, “ভয়ঙ্কর পদস্থ এবং সম্মানভাজন ছিলেন। দেশের শাসনকর্ত্তাকে এ সংবাদ জানান দরকার।” এই বলিয়া তাঁহার সহরের কর্ত্তার কাছে চলিয়া গেলেন। সহর ভাঙিয়া নর-নারী মনিবপত্নীর সঙ্গে আসিতে লাগিল। আমি দোড়াইয়া তাহাদের অগ্রে উজ্জানে প্রবেশ করিলাম। আমাকে তদবস্থায় আসিতে দেখিয়া মনিব উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি হইয়াছে, কাহ্নুর?” আমি বলিলাম, “হঃখের কথা আর বলিবেন না হুজুর! ঘর চাপা পড়িয়া গিন্নীমা ও ছেলেনেয়েরা মারা গিয়াছে। হায়! আমি কেন বাঁচিয়া রহিলাম! হা খোদা!” প্রভু বলিলেন, “কি সর্বনাশ! তার পর? তোমার গিন্নীমা বাঁচিয়া নাই?” আমি কাদিতে কাদিতে বলিলাম, “না হুজুর, সকলেই মারা গিয়াছেন, এক জনও বাঁচিয়া নাই। এমন কি, গরু, ভেড়া সবই বাড়ী-চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে।”

আমার কথা শুনিবামাত্র মনিবের নয়নে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, তাঁহার চৈতন্যলোপের উপক্রম হইল। অবশেষে গভীর শোক অভিভূত হইয়া তিনি স্বীয় মস্তকের কেশোৎপাটন করিতে লাগিলেন। তাঁহার বহু সদাগরগণও তাঁহার চঃখ-বশ্ত দর্শনে শোকাভিভূত হইলেন। অবশেষে সকলে উজ্জানের বাহিরে আসিলেন। দূরে তখন বহু নর-নারীর পদোচ্ছিন্ন ধূলিজাল আকাশপথে উখিত হইতেছিল। দেশের শাসকের সহিত বহুসংখ্যক পদস্থ নগরবাসী এবং আমার মনিবপত্নী প্রভৃতিও আসিতেছিলেন। তাঁহার কাছে আসিবামাত্র উভয় পক্ষই বিম্বিত হইলেন। আমার কীর্তির কথা প্রকাশ পাইল। মনিব ক্রোধাক্ত হইয়া আমাকে প্রহারে উত্তত হইলেন। তখন আমি বলিলাম, “হুজুর! আপনি জানিয়া গিয়া আমাকে কিনিয়াছেন। বৎসরে আমি একটি মিথ্যা কথা বলি। হুতরাং আপনি আমাকে শাস্তি দিতে পারেন না। বিশেষতঃ আমি এখনও পুরা একটি মিথ্যা কথা বলি নাই—মাত্র আধা মিথ্যা বলিয়াছি।” মনিব বিম্বয়ে কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, “আধা মিথ্যা কথাতেই বহন এই ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে, তখন পুরা মিথ্যা কথায় কি সর্বনাশ ঘটবে, তাহা বলা যায় না। তোমাকে আমি আর রাখিব না। আজ হইতে তুমি মুক্ত স্বাধীন।” আমি বলিলাম, “হুজুর, আপনি আমাকে মুক্তি দিলেও, আমি উহা এখন গহিতে পারি না। একটি মিথ্যা কথার মাত্র অর্ধেক বলিয়াছি, আর অর্ধেক বাকী আছে। উহা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকে আপনার কাছে থাকিতে হইবে। বিশেষতঃ জীবিকাক্রমের উপযোগী আমি কোন শিক্ষা পাই নাই। সুতরাং আপনি এখন আমাকে তাড়াইয়া দিতে পারেন না।”

মনিব ইহাতে নির্বাক হইলেন। তখন আমরা বাড়ী ফিরিয়া গেলাম। বাড়ীর অস্থায়ী দেখিয়া মনিব আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না। তিনি আমাকে প্রহার করিতে করিতে বলিলেন, “ওরে পাখণ্ড, হুজুর! এই যদি তোমার আধা মিথ্যা কথা হয়, তবে পুরা মিথ্যা কথা বলিয়া তুমি একটা নগরকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবি।” মনিব তার পর শাসনকর্ত্তার কাছে গমন করিলেন। তিনি কি পরামর্শ দিলেন, জানি না। পরে আমাকে একটি মিঠাই খাইতে দেওয়া হইল। উহা খাইবার পর আমার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইল। পরে বহন

মিথ্যা কথা
বাহাদুরী



অর্ধেক মিথ্যা
সর্বনাশ



সমাধিগর্ভে
শ্রমসমী



আমার জ্ঞান হইল, দেখিলাম, আমি নগ্নসকশের অতর্কিত হইয়া পড়িয়াছি। আমার অঙ্গের অন্তস্থান ঐশ্বর্য বিরাট বীথিয়া দেখা হইয়াছে। এই ঘটনার কিছুকাল পরে মনিব আমাকে অত্যন্ত বিরক্ত করেন। ক্রমে আমি নানাবিধ দুঃখ এই দেশে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আর আমার মিথ্যা বলিবার শৃঙ্খল নাই।

দ্বিতীয় বোম্বার গরু শেব হইলে, তৃতীয় ব্যক্তিকে তাহার গরু বলিবার ক্রম অরোধ করা হইল। সে ব্যক্তি বলিল, “তাই, আমার গরু সময়ান্তরে বলিব। এখন রাজি প্রায় শেব হইয়া আসিল, আমাদের কাজ শেষ করিয়া এ স্থান ত্যাগ করিতে না পারিলে লোক-জানাঙ্গানি হইবে।” তাহার কথা সত্য মনে করিয়া সকলে পাক্কাবান করিল। তাহার গরু ভূগর্ভ খনন করিয়া তাহার মধ্যে সিন্দুকটি নামাইয়া তাহা মুক্তিকা-রাশি দ্বারা ঢাকিল; অনন্তর তাহার স্থানে প্রস্থান করিল।

ভূতাদিগের যে ছই চারিটি কথা গানেমের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তাহা হইতেই তিনি অনুমান করিতে-

ছিলেন, এই সিন্দুক কাহারও কোন গুপ্ত ধন আছে; কোন বিশেষ কারণে তিনি ইহা এ ভাবে স্থানান্তরে ভূগর্ভ করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি এ বিষয়ের

সত্য সংবাদ অবগত হইবার জন্য খেজুরগাছ হইতে অবতরণ করিলেন, এবং মাটা খুঁড়িয়া সিন্দুক বাহির করিলেন;—দেখিলেন, প্রকাণ্ড একটা তালা দিয়া সিন্দুক বন্ধ। এই নতুন বাধা দেখিয়া তাঁহার মনে কোন্ডের স্ফূর্তি হইল, অধিক রাজি ছিল ন, তিনি কয়েক খণ্ড প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া তাহার আধাতে সিন্দুকের তালা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সিন্দুক খুলিয়াই গানেমের চক্ষুস্থির! দেখিলেন, তাহার মধ্যে ধনসম্পদ



শাশ্বতান্ত্রে
শালিক-
সোহা-
গিনী



পরিবর্তে একটি পরমা কুমারী যুবতীর দেহ রহিয়াছে। তাহার বর্ণ ও মুখের ভাব দেখিয়া তিনি বুঝিলেন, যুবতীর প্রাণ তখনও বহির্গত হয় নাই, তখনও অন্ন অন্ন নিঃশ্বাস বহিতেছে। যুবতীর সংজ্ঞা নাই। যুবতীর পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি বহুমূল্যবান দেখিয়া অতি সম্ভ্রান্তগৃহের ললনা বলিয়াই গানেমের অনুমান হইল। গানেম তাঁহার প্রাণরক্ষায় কৃতসংকল্প হইলেন। করুণা ও সহায়কৃত্তিতে তাঁহার জন্ম আর হইয়া উঠিল। তিনি যুবতীকে কোড়ে লইয়া মাটিতে নামাইলেন। শীতল বাতাসে শীত হইয়া তাঁহার জ্ঞানের স্ফূর্তি হইল। তাঁহার মুখের ভিতর হইতে কতকগুলি জলীয় দ্রব্য বহির্গত হইয়া পড়িল। যুবতী চক্ষু অর্ধ-উন্মীলিত করিয়া গানেমের দিকে না চাহিয়াই ডাকিলেন, “জহবর কাপেন (উজ্জ্বলসুহৃদ), সাগরম মজ্জিয়ান (প্রবাপগাথা), কাশাবদ



সকর (ইহু), নোরোরিহার (মিখায়েল), লগ্নরাতস সহি (শুকতার) হুকেহেতু আনান (করু আনন্দ), জোনান সকেল কোথায় ?—এগুলি যুবতীর দাবী, যুবতী কল্যাণত জাহাঙ্গিরের নাম বয়স। ডাকিয়াও কোন মড়া খাইসেন না। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া, তিনি চক্ষু খেলিয়া চাহিলেন,—কেছিল, যথাযথিক্রে মুক্তিকাশযায় নিশ্চিত রহিয়াছেন। তবে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন, কশিকত্বকে বলিলেন, “কি আশ্চর্য, আমি এখানে ? শেষ বিচারের দিন আসিয়াছে নাকি ? কাল রাত্রে আমি কোথায় ছিলাম, আর এখন কোথায় কি অবস্থায় আছি।”

গানেশ যুবতীকে আর সন্ধ্যের মধ্যে কেলিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি যুবতীকে সকল কথা বলিলেন; কেন তিনি সমাধিক্ষেত্রে রাতে আসিয়াছিলেন, কি দেখিয়াছিলেন, সমাধিগর্ভ হইতে কিরূপে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা অতি বীরে বীরে সন্ধ্যের যুবতীর গোচর করিলেন; অবশেষে বলিলেন, “আমি ভাগ্যে এখানে উপস্থিত ছিলাম, তাই আপনি বাঁচিলেন, কিন্তু এ ভাবে এখানে থাকা আপনার পক্ষে নিরাপত্তা নহে। আমার সাহায্য আপনার পক্ষে এখনও আবশ্যক হইবে, এক সে সাহায্যদানে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।”

গানেশকে দেখিবারাত্র যুবতী অবগুষ্ঠনবতী হইয়া, গানেশের সমাধিচরণের জন্ত তাঁহাকে অসংখ্য বস্ত্রদান প্রদান করিলেন। তাহার পর গানেশ তাঁহাকে যে সিন্দূকের মধ্যে পাইয়াছিলেন, সেই সিন্দুকেই পুরিয়া একটি অশ্বতর ভাড়া করিয়া তাহার পৃষ্ঠে সিন্দুক চাপাইয়া তাঁহার গৃহে লইয়া যাইবার জন্ত যুবতী গানেশকে অনুরোধ করিলেন। হুম্মরী আরও বলিলেন, “আমার যে পরিচ্ছদ, ইহার প্রতি বসি সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা না থাকিত, তাহা হইলে আমি আপনার সঙ্গে ইচ্ছাই বাইতে পারিতাম। অগ্রে আপনার গৃহে বাই, তাহার পর আপনার আমায় কাছিনী প্রদান করাইব। সকল কথা শুনিয়া আপনি ব্রূতিতে পারিবেন, কোন পাণিষ্ঠাকে আপনি মৃত্যুকবল হইতে রক্ষা করেন নাই।”

গানেশ যুবতীর পরামর্শানুসারে সিন্দুকটা গর্ভ হইতে তুলিয়া তাহার মধ্যে তাঁহাকে পুরিলেন; তাহার পর তাহার মধ্যে বাতাস প্রবেশ করিতে পারে, একপ উপায় করিয়া সিন্দুক বদ্ধ করিলেন এবং একটি অশ্বতর ভাড়া করিয়া আনিয়া তাহার পৃষ্ঠে সিন্দুক স্থাপন করিয়া যুবতীকে নিজের গৃহে লইয়া চলিলেন।

যুবতী গানেশের গৃহে আসিয়া সোফার উপর উপবেশন করিলেন, গৃহের শোভা শতগুণে বর্ধিত হইল। কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর যুবতী অবগুষ্ঠন উন্মোচন করিলেন। প্রকাণ্ড মিখায়েলকে, স্বকীয় গৃহকক্ষে এই অসামান্য হুম্মরী যুবতীকে একাকিনী উপবিষ্ট দেখিয়া গানেশ কামজরে অজ্ঞানীভূত হইয়া পড়িলেন।

হুম্মরী গানেশের মনের ভাব অজ্ঞতব করিতে পারিলেন, কিন্তু তিনি ভীতা হইলেন না, কারণ, গানেশ তাঁহার প্রতি বিশেষ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন। নিকটস্থ একটি সম্রাট হইতে গানেশের আদেশে ভূতগণ প্রচুর উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য লইয়া আসিল; কলের দোকান হইতে কল, মেষের দোকান হইতে অতি উৎকৃষ্ট মদিরা যুবতীর জন্ত আনীত হইল।

গানেশ স্বয়ং কলমুদ্রা দি একখানি ডিসে লইয়া অতি সম্মানভরে সন্ধ্যার সহিত যুবতীর হস্তে প্রদান করিলেন,—বলিলেন, “অগ্রে কিঞ্চিৎ জলযোগ করুন, আহাের আয়োজন পরে করিতেছি।” হুম্মরী তাঁহাকে জানাইলেন, তিনি তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া আহাের না করিলে যুবতী কিছুই স্পর্শ করিবেন না। গানেশ হুম্মরীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আহাের্য ও স্নানপানে উভয়ের চিত্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল। গানেশ এই তরুণী হুম্মরীর রূপের মোহে উদ্ভূত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তরুণীও গানেশের বলীপূর্ণ সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। উভয়ের চিত্ত উভয়ের প্রতি আকৃষ্ট হইলেও হুম্মরী গানেশের আগিলনে আপনাকে নিকপ্ত হইতে গিলেন না। তিনি বসিয়া মিলেন যে, তাঁহার সৌন্দর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার স্বপ্ন বিমুগ্ধ হইলেও, গানেশ তাঁহার দেখে

সমাধি-মন্ডা

হইতে

গ্রেমিকা উদ্ভাস



গ্রেম-

সিবেশনের ঘট



উজ্জল-স্বপ্ন-রহস্য
এক-দিনে
ব্যাখ্যা



অধিকারী হইতে পারেন না। সে স্বপ্নানী পান-ভোজনে অভিহারিত হইল। পরদিন পানম স্বপ্নানীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার দ্বারা কিম্বা আশ্রিত। একই গৃহে উভয়ে দিবস ও রজনী কাশন করিতে পরস্পর পরস্পরের জেমে গভীরতরভাবে আত্ম হইতে লাগিলেন। পানমে তরুণীকে অক্ষাশ্রিতী করিবার ক্ষমতা পূনঃ পূনঃ চেষ্টা করিলে স্বপ্নানী সুস্থ হামিরা তাঁহাকে নিরস্ত করিলেন। এইরূপে সাময়িককাল অভিহারিত হইল। অবশেষে উজ্জল-স্বপ্ন-রহস্য-মদে আত্মহারী হইয়া এক দিন পানমে রজনীকে আনাইলেন যে, তিনি বিধিমেত স্বপ্নানীর পাশিগ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আপনায় করিয়া লইতে চাহেন। স্বপ্নানী মধুরহাসি হাসিলেন, পানমকে আশ্রিতপাশে বন্ধ করিয়া চূষনও করিলেন, বলিলেন, “প্রাথমিক, তোমাকে লাভ করিবার ক্ষমতা আমি ব্যাকুল, কিন্তু তাহা হইবার নহে। আজ আমি তোমাকে আমার জীবনকথা বিবৃত করিব, তার পর তুমি তোমার কর্তব্য পালন করিও।” এই বলিয়া স্বপ্নানী তাঁহার কটবাসের বন্ধনী মুক্ত করিয়া পানমের হস্তে অর্পণ করিলেন। পানমে চূর্ণভারনিমিত্ত অক্ষরগুলি পাঠ করিয়া দেখিলেন, লেখা আছে—“আমি তোমায়, তুমি আমার, হে পরমেশ্বরের মাতুল-বংশধর।”—বলা আবশ্যক যে, এই কথা খালিক হারুণ-অল-রসিদ সন্দেহই প্রযুক্ত হইয়াছিল; কারণ, তিনি মহম্মদের মাতুল আকসের বংশধর ছিলেন।

ভয়ে পানমের মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি বলিলেন, “ঠাকুরাণি, আমি আপনায় প্রাণরক্ষা করিলাম বটে, কিন্তু দেখিতেছি, আপনায় কাপড়ের পাড় হইতেই আমার প্রাণ বাইবে। আমি কোন কথায়ই অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এতক্ষণে বুঝিলাম, পৃথিবীতে আমি সর্গাপেক্ষা অধিক দুর্ভাগ্য ব্যক্তি। আমার দুঃখতা ক্ষমা করুন। আপনাকে যে মুহুর্তে দেখিয়াছি, সেই মুহুর্তেই আমি আপনায় প্রণয়ের দাগ হইয়াছি, পীরিতের কঁস গলায় পরিয়াছি। ভবিষ্যৎহিলাম, আমার আশা পূর্ণ হইবে, কিন্তু আমার আশার মন্তকে বজ্রাঘাত হইল! আমি নিরাশ্রয় হইতে কত দিন প্রাণধারণ করিতে পারিব, তাহা বলিতে পারি না। তবে এ কথা নিশ্চয় জানিবেন যে, যত দিন বাচিব, আপনায় রূপ ধ্যান করিয়াই জীবন কাটািব। এখন আপনায় কাহিনী কি, অল্পগ্রহ করিয়া বলিয়া আমার কোঁহুল নিবারণ করুন।”

স্বপ্নানী বলিলেন, “আমায় নাম কুং-আল-কুলুব, জন্মকালে আমি এই নাম পাইয়াছিলাম। আপনি বোধ হয়, আমার নাম শুনিয়াই বুঝিয়াছেন, খালিক হারুণ-অল-রসিদের প্রেমদী নারীগণের মধ্যে আমি এক জন। কারণ, আমার নাম নিত্যন্ত অজ্ঞাত নহে।

“বালাকালেই আমি রাজপ্রাসাদে আনীত হইয়া যথার্থীতি শিক্ষিত হইয়াছিলাম। সৌন্দর্য্য ছিল, তাহার পর নানাবিধায় বিভূষিতা হইয়া আমি সহজেই প্রথম যৌবনে খালিকের অল্পগ্রহভাজন হইতে সমর্থ হইলাম। তিনি আমার ক্ষমতা বহন নহিলে নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন, বাদী ও বিশ জন খোজা আমার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইল। আমি এত অর্থসম্পত্তি লাভ করিলাম যে, পৃথিবীতে আমি আপনাকে সর্গাপেক্ষা অধিক ঐশ্বর্য্যশালিনী বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। জোবেদী আমার সপত্নী, খালিকের প্রিয়তমা মহিষী আমার স্বপ্ন ও ঐশ্বর্য্যের হিংসা করিতে লাগিলেন। যদিও খালিক তাঁহার প্রধান মহিষীকে আমার অপেক্ষা কোন দিন অল্প সোহাগ করেন নাই, বরং প্রাণপণে তাঁহার মনরক্ষা করিতেন, তথাপি জোবেদী আমার সর্গনাশনাথনে ক্ষতসংকলন হইলেন।

“আমি এ কাল পর্য্যন্ত অতি সাবধানে আত্মরক্ষা করিয়াই আসিতেছিলাম, কিন্তু শেষবার আর আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলাম না। আপনি আমাকে রক্ষা না করিলে সেই দিনই আমাকে ইহলোক হইতে প্রস্থান করিতে হইত। প্রধান মহিষী আমায় সর্গনাশনের অস্ত্র কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে একটি বাদীকে হস্তগত করিলেন, এবং তাহার হস্ত দিয়া আমার সুরক্ষতে মাদক প্রয়োগ করিলেন; সেই

অল্পপমা-
স্বপ্ন-রহস্য
জীবন-রহস্য



মাণিকপ্রভাবে সেই স্নানিতেই অচেতন হইয়া পড়ি। তাহার পর কি ঘটয়াছে, তাহা আপনি আমার অপেক্ষা ভালই জানেন। সমাধি-স্থল হইতে উদ্ধার করিয়া আপনি আমার জীবনদান করিয়াছেন; আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের রোগ্য তাঁহা আমার জ্ঞান নাই।

“জোবেদী তাঁহার এই শৈশবটিক উন্মত্তপথের অন্ধ পূর্ক হইতেই অবসর অবশ্য করিতেছিলেন। খালিক সস্তুতে বিদ্রোহবন্দনের জন্ত রাজধানী পরিত্যাগ করিলে জোবেদীর সুযোগ উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি প্রকাশভাবে আমার প্রাণবিনাশে সাহায্য হইলেন না। এখন তিনি কিরূপে খালিককে ফুলাইয়া রাখিবেন, তাহা জানি না, কিন্তু আপনি দেখিবেন, কৈশি প্রকারে বেন আমার বাসস্থানের সন্ধান কেহ না পায়; যদি পায়, তাহা হইলে আনাদের প্রাণের বিন্দুমাত্র আশা থাকিবে না। জোবেদী যদি জানিতে পারেন, আপনি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনার প্রতিও তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কোন ছলে আপনার প্রাণনাশ করাইবেন।”

জীবনদানে
প্রাণ-বিনিময়



হুমরী নীরব হইলে গানেম বলিতে লাগিলেন, “ঠাকুরানি, আপনি এখানে নিরাপদে থাকিবেন, কেহ আপনার সংবাদ পাইবে না। আমার ভ্রাতৃগণকে আমি বিশ্বাস করি না সত্য এবং তাহারা বহুত্ব-কথা জানিতেই তাহা প্রকাশ করিয়া দিবে, তাহাও আমি জানি; কিন্তু তাহারা বাহাতে আপনার সহকে কোন কথা জানিতে না পারে, সে বিধে আমার বিশেষ দৃষ্টি থাকিবে। আপনার প্রতি বাহাতে বিন্দুমাত্র অসদ্বান প্রকাশ করা না হয়, আমি তাহারও উপায় করিব। কিন্তু বাহাই আমি করি, আমি কখনই আপনাকে ভুলিতে পারিব না। আপনার প্রতি আমার যে অল্পরোগ জন্মিয়াছে, তাহা কোনক্রমেই দূর হইবে না। আমি জানি, প্রভুর দ্রব্যে ভ্রাতার অধিকার নাই, কিন্তু আমার মন কোনক্রমে বৃদ্ধিতে চাহে না। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে, খালিকের সহিত আপনার পরিচয়ের পূর্বে যদি আপনার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইত, তাহা হইলেও আমি আপনাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিয়া ফেলিতাম। আমার প্রেমপ্রবৃত্তিকে আমি সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছি না। বাহা হউক, আমি আশা করি, খালিক অল্পগ্রহ করিয়া আপনাকে গ্রহণ করিয়া বিধেবিধি মহিবা জোবেদীর বিধেবাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবেন। যখন আপনি পূর্বদোষাগ লাভ করিবেন, খালিকের অন্তঃপুরে গৌরব ও ঐশ্বর্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবেন, তখন অল্পগ্রহ করিয়া এই গরীব-হতভাগা প্রেমপীড়িত অমৃতপু গানেমকে মধ্যে মধ্যে স্মরণ করিবেন। খালিক অপেক্ষা আমি অর্থ ও ক্ষমতার হীন হইতে পারি, কিন্তু হৃদয়ে হীন নহি; আপনার প্রতি আমার অল্পরোগ—প্রেম, খালিকের প্রণয়—সোহাগ অপেক্ষা অল্প নহে। আমি মৃত্যুর পূর্বে আপনাকে ভুলিতে পারিব না, যত্বকালেও আমি আপনার মোহিনী মুষ্টি কল্পনা-নেত্রে সন্মর্শন করিয়া হাসিতে হাসিতে এ দেহ ত্যাগ করিব। আপনি আমার চিরজীবনের সর্বস্ব।”

বুবতী কুৎ-আল-কুণুব অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তিনিও গানেমের আক্ষেপ ও তাঁহার ক্ষমতায় পরিণমে বিচলিত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি অতি সাবধানে ক্ষমতায় ভাব গোপন করিলেন;—বলিলেন, “দেখিতেছি, আপনার সঙ্গে কথা কহিয়া, কেবল আপনার মনঃকষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছি; অতএব এ সকল কথাই আর আবৃত্ত করি না। আমি আপনার নিকট আমার জীবনের জন্ত কৃতজ্ঞ, আমার জীবনদাতাকে আমি কখনও ধন্যবাদ দান করিতে বিস্মৃত হইব না।”

অতঃপর ঘরে আশান্ত হইল। গানেম ঘর খুলিয়া দেখিলেন, ঘরপ্রান্তে এক জন তৃত্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৃত্য বলিল, “আহার প্রস্তুত।” তৎক্ষণাৎ হুমরী রক্ত উৎকৃষ্ট আহার্যপ্রদা জানীত হইল।

আহার শেষ হইলে গানেম বুবতীকে বলিলেন, “ঠাকুরানি, এখন আপনি বিশ্রাম করুন। পরে আপনি আমাকে বেস্ত্রণ আদেশ করিবেন, আমি তাহাই পরম-কষ্ট-চিত্তে সম্পাদন করিব।”

প্রথম-ভ্রমের
মানস-বন্ধন



শ্রেয়-স্বপ্নে
শ্রেয়-স্বপ্নে

বীণার
বাক্সে
প্রথম-
উচ্ছ্বাস

স্বন্দরী অভ্যন্তর মন্ত হইয়া গানকে লক্ষ্যে বসিলেন, “সঙ্গার সাংকে, দেখিতেছি, আপনি কোন কাজ বাকী রাখিবেন না। আপনি আমাকে অভ্যন্তর বাহিত করিয়া কেগেছেন। আমি আশা করি, আপনার প্রতি সম্যক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পূর্বে আমাকে কালপ্রাপ্ত পতিত হইতে হইবে না। আমার শীঘ্রই আমাকে আপনার উপকারসাধনের কতটা দান করিবেন, আমার এ বিবাহ আছে।”

কথা কহিবার সুযোগ পাইয়া, গানের আর একবার তরুণীর নিকট নিজের প্রথম জ্ঞান করিলেন;—
বসিলেন, “আপনি যদি আমার প্রেমের প্রতি বিদ্রোহ প্রদর্শন না করেন, তাহা হইলেই আমি আমার সৌন্দর্য বস্ত্র দলে করিব। আপনি আমার প্রতি যে লক্ষ্য প্রকাশ করিতেছেন, আমি তাহার যোগ্য নহি, আপনি আমাকে আর এ ভাবে লক্ষ্য করিবেন না। আমাকে আপনি আপনার দাস জ্ঞান করিবেন, আমি আর কিছুই নহি,—কিছু হইতেও চাহি না।”

কুং-আল-কুন্স বসিলেন, “না না, যিনি আমার প্রাণদান করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে কখন অবজ্ঞা করিতে পারিব না। যদি আমি কখনও আপনার উপকারের কথা বিস্তৃত হই, তাহা হইলে আমার মত কৃতজ্ঞ আর কেহই নাই। আপনার প্রতি আমি কখনও অভ্যন্তর প্রকাশ করিতে পারিব না। ইহার অধিক আর কিছু আমার বলিবার নাই, কেন নাই, তাহাও আপনি বুঝিয়া থাকিবেন।”

স্বন্দরীর কথার গানের মনোহর মহানন্দের সঙ্গার হইল, তাঁহার সকল চোখ দূর হইল। রাত্রিকালে গানের একটি আলো আনিবার লজ্জা, যে গৃহ ত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ

করিলেন, নৈশ-ভোজনের কৃত্ত বসামাত্র আহার্য ও পানের লজ্জা আনিবারও প্রয়োজন ছিল।

উভয়ে একত্র বসিয়া ফলমূল আহার করিতে লাগিলেন, মত্ত ও চলিল, অতি উৎকৃষ্ট মত্ত; উভয়ে পেয়ালায় পর পেয়ালা ভরিয়া, পরম আনন্দে মত্তপানে রত হইলেন। মত্তপানে প্রাণ খুলিয়া গেল, তখন গান আরম্ভ হইল। প্রথমে গানের কয়েকটি প্রেমের গান গাহিলেন, তাঁহার স্বপ্নের কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, আশা সকলই সেই গানে তাঁহার কল্প-কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তরুণীও সুরাপানে প্রেমিতা হইয়া, তাঁহার কোমল-কণ্ঠের সুস্বর-সঙ্গীতে গানের চিত্ত প্রেম করিলেন। গানের ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার প্রতি প্রেম ও সহানুভূতির বাস্য প্রত্যেক সঙ্গীত উচ্ছ্বসিত। রাত্রি অধিক হইলে, গানের ভিন্ন শব্দায় শরন করিতে উত্তম হইলেন।

তখন কুং-আল-কুলুব বলিলেন, “আগনি আর অস্ত্র শয্যা গ্রহণ করিতেছেন কেন ? একই শয্যা উভয়ের স্থান হইবে।” গানেম বলিলেন, “কুলুবি, আমার কথা কখন। না জানিয়া আমি প্রভুর সম্পত্তিতে অভিল্লাব কারয়াছিলাম। কিন্তু এখন জানিয়া শুনিয়া তাহা পারিব না।” কুলুবি হাসিয়া বলিলেন, “প্রাণাধিক, আমি তোমাকে সকল কথা বলিয়া বলিয়াছি। আমার প্রতি তোমার ব্যবহার অতুলনীয়—ভয়জনোচিত। এখন আমি লগতের সফল যুদ্ধ। তুমিই আমার প্রশংসা করিয়াছ। এ জীবন—এ দেশ এখন তোমারই। তুমি আমাকে লইয়া বাহা ইচ্ছা করিতে পার। আমি তোমার কাছে আশ্রয়দর্শন করিলাম।” কিন্তু গানেম আপনাকে সংবরণ করিলেন। যৌবনযশস্বী তাঁহাকে প্রস্তুত—উত্তেজিত করিতেছিল—করুণ ভ্রাতৃত্ব নিষেধে পান করিবার জন্য তাঁহার অন্তর ঢকন হইয়া উঠিয়াছিল সভ্য, তথাপি অগ্নি মনে তিনি চিত্ত জয় করিলেন। তাঁহার মনে হইল, খালিকের বিনিঃপ্রসন্নী, তাঁহার প্রতি দোষ করিলে তিনি ধর্মে পতিত হইবেন। এমনই ভাবে রাত্রির পর রাত্রি, লোভ ও সত্যের সংঘর্ষ চলিতে লাগিল।

আলগোছে
শ্রেয়-শীলা



গানেমের গৃহে কুং-আল-কুলুব যখন স্বচ্ছন্দে কালক্ষেপণ করিতেছিলেন, সে সময়ে খালিক-মহিষী জোবেদী নিত্য নিশ্চিন্ত অবস্থায় কালগাপন করিতে পারেন নাই। তিনি কুং-আল-কুলুবের অচেতনপ্রায় দেহ সিন্দূকে পুড়িয়া, ভ্রাতৃত্বের হস্তে প্রদান করিয়া ইহাদিগকে বিদায় করিয়া, মহা হুচিন্তায় কালগাপন করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবারও চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারিলেন না, শয্যা কণ্টক-পূর্ণ বলিয়া অজ্ঞত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র চিন্তা হৃদয় অবিকার করিল। তিনি শয্যা পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন, “খালিক তাঁহার সকল মহিষী অপেক্ষা এই তরুণীর প্রতি সমধিক অনুরক্ত, তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াই কুং-আল-কুলুবের সন্ধান করিবেন। তাহাকে দেখিতে না পাইয়া কি বলিবেন ? আমি তাঁহার প্রশ্নের কি উত্তর দিব ?” অনেকগুলি কৌশলের কথা তাঁহার মনে হইল, কিন্তু একটি কৌশলকেও তিনি গ্রহণ-বোধ্য বিবেচনা করিলেন না, কোন কৌশলের উপরই তিনি নির্ভর করিতে পারিলেন না। প্রভাতে জোবেদী তাঁহার বৃদ্ধা ধাত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ধাত্রী আসিলে, তিনি তাকে বলিলেন, “ধাই-মা, আমার যখনই কোন আবশ্যক হইরাছে, তখনই তুমি আমাকে সংসারামর্শ দিয়াছ, তোমার পরামর্শ কখন বিফল হয় নাই। আমি যে কাজটা করিয়া বিসরাছি, তাহা এখন কি ভাবে খালিকের কর্ণগোচর করা যায়, তাহা বল।”

ধাত্রী বলিল, “মা, বাহা করিয়া ফেলিয়াছ, তাহার সংশোধনের আর উপায় নাই ; এখন খালিককে কি বলিয়া ভুলাইবে, তাহারই উপায় স্থির করা আবশ্যক। তুমি একটি কার্ঠ-নির্মিত মহম্মদ-মুহম্মদ সমারোহে প্রাঙ্গণের একপ্রান্তে সমাহিত কর, তোমার দাসীগণকেও শোক-প্রকাশের বেশ পরিধান করাও, রাজ-প্রাঙ্গণের সকলেই তোমার আজ্ঞাকারী, সকলকেই শোক-সাজ গ্রহণ করিতে আদেশ কর। তাহার পর খালিক আসিলে, তাঁহাকে কুং-আল-কুলুবের আকস্মিক মৃত্যুর কথা বলিবে। তোমার কথা শুনিয়া খালিক তাহা বহু সংবাদে অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না।”—জোবেদী ধাত্রীর উপদেশ শ্রবণে পরম আনন্দিত হইয়া, তাহাকে একটি বহুলমূল্য হীরকাস্ত্রীয় উপহার দান করিলেন। এই পরামর্শই অতি উৎকৃষ্ট এবং সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তদনুসারে কার্য করিবার ভার জোবেদী ধাত্রীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। ধাত্রী কার্ঠ-মুষ্টি নির্ধাণে লোক লাগাইল।

মুষ্টি নির্ধিত হইলে, তাহা কুং-আল-কুলুবের কক্ষ লইয়া বাজা হইল, তাহার পর উৎকৃষ্ট বজ্রাঘাতে সমাধার করিয়া, একটি শবাধারে রক্ষিত হইল। জোবেদীর আদেশে বোজা সর্দার মসকর সেই শবাধার জোবেদীর নির্দিষ্ট স্থানে সমাহিত করিয়া আসিল। জোবেদী অশ্রুবর্ষণে বক তালাইলেন, দাসদাসীগণ

সপত্নী-সংহবের
সাবধানতা



উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া রাধাপুরী প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। মহিষীর আদেশে সেই দিনই সমাধিস্থল একটি উৎকৃষ্ট মন্দির-নিৰ্মাণ আরম্ভ হইল। সমাধিস্থানের সমাপ্ত হইলে দ্বাৰ্জ-প্রাঙ্গণস্থ সৰ্ব্বমোট পৌর-পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, জোবেদীর আদেশে সেই সমাধিস্থলে উপাসনা করিতে উপস্থিত হইল। সৰ্ব্বমোট দ্বাৰ্জ-প্রাঙ্গণই উপাসনার ঘোড়ান করিলেন। নগরের সর্বত্র এই সংবাদ বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

কিন্তু মাস পরে পরিকল্পনা করিয়া খালিক মসজিদ রাধাবলীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। কুৎ-আল-কুলুবের মহিষ পরিচিত হইবার জন্য তিনি অধীর হইয়াছিলেন, প্রাঙ্গণে প্রত্যাপন করিয়াই তরুণী বেগনের মহলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু রাগদানী ও কর্ণচারিকের ক্রক পরিচ্ছদ সন্ধান করিয়াই উবেগ ও আশঙ্কার তাঁহার প্রকৃত মুখ মলিন হইয়া গেল। তিনি মহিষী জোবেদীর মুখে প্রিয়তমার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণমাত্রে মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন। অনেক বয়ে তাঁহার মুক্তাভঙ্গ হইলে, তিনি কুৎ-আল-কুলুবের সমাধিভূমি দর্শনের ইচ্ছা করিলেন। জোবেদী খালিককে কুৎ-আল-কুলুবের সমাধিস্থলে গিয়া বাইতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু খালিক মহিষীকে কষ্টদানে অসম্মত হইয়া খোজা সর্দার মদুরকে গিয়া প্রিয়তমার সমাধি দর্শনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ-পরিবর্তনেরও অবসর হইল না।

জোবেদী তাঁহার সপত্নীর সমাধির উপর এরূপ প্রাসাদোপম মন্দির নির্মাণ করিয়াছেন, তাহা সুসজ্জিত করিয়াছেন, দেখিয়া খালিকের বিষয়ের সীমা রহিল না। খালিক জোবেদীর মহত্ব ও উদারভাৱ ততখানি বিস্ময়স্থাপন করিতে পারিলেন না। খালিকের মনে বড়ই সন্দেহ হইল; তিনি ভাবিলেন, কুৎ-আল-কুলুবের হয় ত মৃত্যু হয় নাই, জোবেদী তাঁহাকে প্রাসাদ হইতে কোথাও বিতাড়িত করিয়া এই প্রকার ক্রিমি শোকের পরিচর দান করিয়াছেন। জোবেদী যে তাঁহার প্রাণসংহার করিতে পারেন, এ কথা খালিকের একবারও মনে হইল না; কারণ, তিনি জোবেদীকে সেরূপ পিশাচী বলিয়া কোন দিন মনে করিতে পারেন নাই।

খালিকের আদেশে সমাধিভূমি বিদীর্ণ করিয়া শবধার উত্তোলন করা হইল। শবধার উন্মোচিত হইলে কুৎ-আল-কুলুবের বস্ত্রাদি দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি জন্মিল, সত্যই তাঁহার প্রাণাধিকার মৃত্যু হইয়াছে। ধর্মে আঘাত লাগিলে, বিবেচনা করিয়া তিনি মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া তাহা পরীক্ষা করিতে পারিলেন না। তিনি অশ্রুপূর্ণগোচনে শবধার পুনরীকর সমাহিত করিবার আদেশ করিলেন। অনন্তর খালিকের আদেশে সেই সমাধিস্থানের একমাস ধরিয়া কোরাণ-পাঠ চলিতে লাগিল। প্রত্যতে ও সন্ধ্যাকালে খালিক অমাত্যবৃন্দে পরিবৃত হইয়া প্রিয়তমার সমাধি দর্শনে আগিতেন, কোরাণ প্রবণ করিতেন, অশ্রুধারায় মুক্তিকা সিক্ত করিতেন, এই ভাবে একমাস অতীত হইল।

একমাস পরে উপাসনা ও কোরাণ-পাঠ সমাপ্ত হইল; সকলেই স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এক দিন খালিক স্বীয় কক্ষে নিম্নিত আছেন। এক জন বাদী তাঁহার পদপ্রান্তে ও এক জন তাঁহার মস্তকপ্রান্তে উপবেশন করিয়া যতিকাৰ্য্য করিতেছে, পাছে খালিকের নিজার ব্যাঘাত হয়, এই ভয়ে উভয়েই সম্পূর্ণ নীরব। যে সুবহী খালিকের মস্তকপ্রান্তে উপবিষ্টা ছিল, তাহার নাম নোরোমিহা। খালিককে প্রসাদ নিজায় অভ্যুত দেখিয়া সে খালিকের পদপ্রান্তবর্তিনী দাসীকে অতি মৃদুস্বরে আশ্বাস করিয়া বলিল, “নাগমাত্‌ সহি, একটি বড় সংবাদ আছে। খালিক যখন জাগিবে, তখন আমি তাঁহাকে সে সংবাদ প্রদান করিব, তিনি শুনিয়া নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন। কুৎ-আল-কুলুবে মরেন নাই, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থদেহে জীবিত আছেন।” নাগমাত্‌ সহি বলিল, “হা আলা। তা কি আর হইবে? সেই সুন্দরী সরল সর্বজনপুজিতা রূপসীকে কি আমরা আর দেখিতে পাইব?” দাসী এই সংবাদে এতই অভিভূত হইয়াছিল যে, সে কথা-করাট উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিল, তাহাতে খালিকের নিজায় ব্যাঘাত করিল।

খালিক তাহা জানিতে চাহিলেন। আপনাতনু সহি বলিল, “জীহাদনা, আমার কল্পর মাক করিতে আদেশ হউক। হুৎ-আল-কুলুব জীবিতা থাকেন, এই সংবাদ পাইয়া, আমি বিকর পোশন করিতে পারি নাই; আনন্দের বেশ প্রকাশ্যেতে না পারিয়া আমি উত্তরায় কথ-কথিয়া আপনায় নিম্নোক্ত করিয়া ফেলিয়াছি; কিন্তু ইহা আমার লক্ষ্যই আশীর্বাদ হইয়াছে।” খালিক বলিলেন, “বইনী, তুমি এ সংবাদ কোথায় পাইনি? হুৎ-আল-কুলুব যদি জীবিতা থাকেন, তাহা হইলে তিনি এখন কোথায়?”—নৌরহিমহার কন্যাকে বলিল, “জীহাদনা, আজ যুদ্ধাকালে আমি সহিবী কোকবীর মহলে সংবাদ পাইয়া যে, সহরে গানেম নামক বণিকের ভবনে তিনি আছেন। বইনী আজই এই সংবাদ পাইয়াছেন। সেখানে হুৎ-আল-কুলুব হুৎ অবস্থাতেই আছেন।” এই বলিয়া বইনী খালিক-প্রগ্রনীর বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হইয়াছিল, তাহার আমূল বিবরণ প্রদান করিল।

হুৎ-আল-কুলুব ক্রিষ্ণ বস্ত্রের প্রাণাৎ হইতে নিরাসিত হইয়াছেন এবং ক্রিষ্ণে তাঁহার জীবনয়কা হইয়াছে, তাহা আম-পূর্বক খালিকের গোচর হইবামাত্র তিনি কোভে, কোথে ও থিরাগে জগিয়া উঠিলেন এবং গর্জন করিয়া বলিলেন, “কি, শিপিটা এই দীর্ঘকাল এক যুবক সদাগরের গৃহে বাস করিতেছে—কে জানে, তাহার স্বভাব পবিত্র আছে কি না? আমি আজ ত্রিশ দিন বোগাদে প্রত্যাগমন করিয়াছি, এত দিনের মধ্যে জীবিতা থাকিয়া ও সে তাহার কোন কথা আমাকে অবগত করা আবশ্যক মনে করে নাই। অকৃতজ্ঞ রমণী! আমি তাহার বিরহশোকে উত্তরপ্রায় হইয়া নিরাশি অশ্রুবর্ণ করিতেছি, আর সে হুৎ সদাগরের আলয়ে বাস করিতেছে! আমি পাশীয়দীর এই অপরাধের লজ্জা ভরসাও বিধান করিব; আর সেই দান্তিক, দ্রুগদী সদাগরকে সেবিব, যে আমার প্রগ্রনীরকে এত দিন এ ভাবে তাহার গৃহে লুকায়িত রাখিয়াছে। কখনই তাহাকে জীবিত থাকিতে হইবে না।” খালিক সরাসরে এই কয়েকটি কথা বলিয়া সরাসরে কথ হইতে নিষ্কাশ হইলেন।

খালিক দ্বারপ্রান্তে উজীর জাফরকে তাঁহার প্রতীক্ষার দণ্ডায়মান করিয়া বলিলেন, “জাফর, এই দণ্ডে চারি শত প্রহরী লইয়া নগরের মধ্যে বাও; সন্ধান করিয়া বেখ, দানাকসের আবু সফাথের পুত্র গানেম সদাগর কোথায় থাকে। তাহার গৃহের সন্ধান পাইলে তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, কিন্তু তৎপূর্ব গানেমকে আমার নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। হুৎ-আল-কুলুব তাহার গৃহে তাহার সহিত চারিখাস ধরিয়া বাস করিতেছে, তাহাকেও আমার নিকট লইয়া আসিবে। আমি উভয়ের প্রতি কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিব, প্রজাপণ দেখিয়া শিক্ষাপাণ্ড করিব।”

উজীর হানৌ দোকানদারগণের নিকট গানেমের গৃহের সন্ধান জানিয়া লইলেন, এবং হইলেন সেই গৃহভিত্তিতে ধাবিত হইলেন। সৈন্তগণ অনতিবিলম্বে গানেমের গৃহের চতুর্দিক পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। গানেমের পণ্যগণের সকল উপায় তাহারায় বন্ধ করিল।

হুৎ-আল-কুলুব ও গানেম তখন আহাৰ খেদ করিয়া উঠিয়াছেন মাত্র। রাজপথে বহু অবের পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া, হুন্সরী বাতায়নপথে রাজপথের দিকে দৃষ্টপাত করিলেন। উজীরকে বহুসংখ্যক সৈন্য সহিত সেই গৃহের দিকে সনাগত হইতে দেখিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার ও গানেমের বিরুদ্ধে কোন প্রকার বন্ধন হইয়াছে। তিনি বুঝিলেন, খালিক তাঁহার সংবাদ পাইয়াছেন, তিনি নিম্নের বিপদের আশঙ্কায় উত্তীর্ণ হইলেন না, কিন্তু গানেমকে ক্রিষ্ণে রক্ষা করিবেন, তাহারই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বুঝিলেন, গানেম অপরাধী না হইলেও তাঁহার নবীন রক্ত ও অনিন্দ্যমুগ্ধ স্ত্রীর অন্তই তাঁহাকে খালিকের কোপানলে দগ্ধ হইতে হইবে; যিনি তাঁহার জীবনয়কা করিয়াছেন, তাঁহাকে আশ্রয়তে সক্ষম হইতে হইবে; কিন্তু আর চিন্তার সময় নাই। স্ববতী গানেমকে বলিলেন, “গানেম, আমাদের আর জীবনের আশা নাই, খালিকের অশ্রুচরণ

প্রগ্রনীর-চাৰা
খালিকের
আক্রোশ



প্রগ্রনীর
বন্দ্য
অভিধান



কৃতাবেশে
দ্রবিক চন্দ্রট

আমাদিগকে বলিতে আসিতেছে। এখন উদ্ধারের উপায় দেখ। যদি আমার প্রতি তোমার বিশ্বাসত্রুণ
যেৎ থাকে, তবে আমি বাঁধা বলি, অবিলম্বে তাহা কর। এক জন ভৃত্যের বেশে সজ্জিত হও, হাতে গুপ্ত
কালি রাখ, তাহার পর সাধারণ প্রচুনি দিয়া গৃহদ্বারে অগ্গেকা কর, অহরিশণ তোমাকে দ্রুত মনে করিয়া
অন্যায়সেই ছাড়িয়া দিবে। যদি তোমাকে কেহ মিথ্যাসা করে, গৃহস্থানী কোথায়, তুমি বলিও গৃহস্থানী—”

গানেশ নিম্নের স্তম্ভ অধিক চিন্তিত হইলেন না, হৃদয়ী তরুণীকে ক্রিয়ণে বাঁচাইলেন, এই চিন্তাই তাঁহার
মনে বলবতী হইল। কুং-আল-কুলুব বলিলেন, “আমার স্তম্ভ তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না।
আমি তোমার গৃহ ও গৃহস্থানী রক্ষার উপায় করিব, তাহার পর খালিকের কোণে প্রসমিত হইলে
তোমার সঙ্গে মিলিতা হইব, তুমি আর অশকাল বিলম্ব করিও না। এখন খালিকের হস্তে পড়িলে
তোমার জীবন-রক্ষা হইবে না।”



উজীর-
শ্রেষ্ঠের
সঙ্গী
নতাস

গানেশ কুং-আল-কুলুবের
আগ্রহে আর কোন কথা বলিতে
পারিলেন না। তিনি ভৃত্যের
বেশে সজ্জিত হইয়া, হাতে গুপ্ত
কালি রাখিয়া, সাধারণ প্রচুনি দিয়া
দারলগিকটে বলিয়া রহিলেন।
উজীর গৃহপ্রবেশ করিয়াই
তাঁহাকে সর্বপ্রথমে দেখিতে
পাইলেন। এই ব্যক্তিই যে গৃহ-
স্থানী, সে বিষয়ে তাঁহার এক-
বার সন্দেহও হইল না, তিনি
তাঁহার মিকে দৃষ্ণাতমাত্র না
করিয়া গৃহস্থানী প্রবেশ করি-
লেন, অত্যন্ত সতর্কতায় উজীরের
অনুগমন করিল, শ্রোতামের
মিকে কেহই ফিরিয়া চাহিল না।

গানেশ সেই অবসরে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া অতি সাবধানে বোম্বাদি নগর ত্যাগ করিলেন।

উজীর কুং-আল-কুলুবের কক্ষ উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, হৃদয়ী গৃহ আলোকিত করিয়া একখানি
সোফায় উপবিষ্ট আছেন। গৃহ নানাবিধ জব্যে সজ্জিত, সুগাম্য সামগ্রীই অধিক।

উজীর গৃহ-প্রবেশ করিবামাত্র হৃদয়ী তাঁহার চরণতলে নিপতিত হইয়া বলিলেন, “উজীরশ্রেষ্ঠ, আমি
খালিক-প্রদত্ত শান্তি নতশিরে বহন করিতে প্রস্তুত আছি। আবেশ প্রকাশ করুন।”

উজীর কুং-আল-কুলুবকে উঠাইয়া বসাই তাঁহার চরণতলে নত হইয়া বলিলেন, “ঠাকুরাণি, আমি
আপনার প্রতি কোন আশে দান করি, এত সাধ্য আমার নাই; সে সাধ্য কেবল এক জনের আছে।
খালিক আপনার প্রতি কোন প্রকার অসদ্ব্যবহার করিবার আশে করেন নাই, কেবল আপনারকে সঙ্গে
লইয়া আসাদে উপস্থিত হইতে বলিয়াছেন। এই পক্ষে যে দানস্বরূপ বল করে, তাহাকেও খালিক-সঙ্গী

উপস্থিত করিবার আদেশ পাইয়াছি।”—কুং-আল্-কুলুব্ বলিলেন, “তবে অবিলম্বে আমাকে খালিকের নিকটে লইয়া চলুন। আপনি যে নগরায়ের কথা বলিতেছেন, তাঁহার নিকট আমি প্রাপ্তবান পাইয়াছি। আমার সেই জীবনরক্ষক নগরায়ের এখনো উপস্থিত নাই, প্রায় একমাস পূর্বে তিনি দামাঙ্গ নগরে প্রস্থান করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রত্যঙ্গপদনকাল পর্যন্ত তাঁহার প্রবাসস্থলী আমার জিম্মায় রাখিয়া গিয়াছেন। আমার অনুরোধে, আপনি এই নগর প্রবাসস্থলী আমাকে লইয়া গিয়া, উপযুক্ত হোপাকিতে রাখ করুন। আমি তাঁহার নিকট অস্বীকার করিয়াছি, তাঁহার কোন প্রত্য নষ্ট হইবে না।”

উদীর বলিলেন, “আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে এ বাস ক্রটি করিবে না।” অনন্তর উদীর মদকর হস্তে সেই গৃহের সমস্ত দ্রব্যের স্বত্বাব্যবস্ফুর্ত তার অর্পণ করিলেন, প্রত্যাদি প্রাসাদে প্রেরিত হইল।

খালিকের আদেশ অনুসারে সেই অট্টালিকা ভাঙিতে আরম্ভ করা হইল, অতি অল্পময়ের মধ্যেই বিস্তীর্ণ অট্টালিকা ইটকত্মে পরিণত হইল। পানেনকে কোথাও না পাইয়া রাজকর্ণচারিণ খালিকের নিকট সে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। জাকির বলিলেন, “আপনার আদেশে গৃহ ধ্বংস করা হইয়াছে, কুং-আল্-কুলুব্ বিধি আপনার আদেশের ক্রম দ্বারা প্রাপ্ত অপেক্ষা করিতেছেন; তন্নিলাস, নগরায় যুবক একমাস পূর্বে দামাঙ্গ নগরে প্রস্থান করিয়াছে।”

পানেনকে পাওয়া যায় নাই তন্নিলা, খালিকের মনে মহা ক্রোধের সঞ্চার হইল। তিনি মদকরকে ডাকিয়া বলিলেন, “অন্ততঃ শিশাটী কুং-আল্-কুলুবকে অন্ধকার-পূর্ণ নির্জন কায়াগারে বন্দী করিয়া রাখ। আমি পাণিষ্ঠার মুখাবর্ধন করিব না, তাহার সহিত কথাও কহিব না।” মদকর খালিকের সকল আদেশ নতশিরে পাশন করিত, এ আদেশও নতশিরে পাশন করিল; কিন্তু তাহার মনে ইহা পাশন করিতে অত্যন্ত কষ্ট ও স্বেচ্ছার উদয় হইল।

অনন্তর সিরিয়ার অধীশ্বরকে হারুণ-অল-রসিদ নিয়োগিত পত্রখানি দিখিলেন।

“সিরিয়ার অধীশ্বর মহম্মদ জিনেবীর প্রতি খালিক হারুণ-অল-রসিদের আদেশ—

প্রিয় ভ্রাতা, এই পত্র দ্বারা তোমাকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দামাঙ্গনিবাসী আবুর পুত্র গানেন নামে এক জন নগরায় আমার এক স্ত্রীর দাসীকে ফুলগাইয়া, প্রাসাদের বাহিরে লইয়া গিয়া, এখন স্বদেশে পলায়ন করিয়াছে। অতএব তুমি পত্রপাঠমাত্র গানেনের অনুসন্ধান করিয়া তাহাকে বৃত্ত করিব, এবং প্রহরি-বোঁট করিয়া, আমার নিকট পাঠাইয়া দিবে। কেবল তাহাতেই চণ্ডিবে না, তাহার গৃহস্থায় সমস্ত করিয়া, তাহার বাহা কিছু সম্পত্তি আছে, তাহা সমস্ত নগরপ্রাপ্তে নিক্ষেপ করিবে।

হারুণ-অল-রসিদ।”

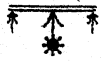
এক জন অপরোহীতার দায়ক খালিক এই পত্র দামাঙ্গ নগরে প্রেরণ করিলেন। তিনি কয়েকটি বার্তাবহ, কপোতও সেই সঙ্গে পাঠাইলেন, কপোতমুখে তাঁহার আদেশপালনের সংবাদ তাহাকে জ্ঞাপনের ক্রম উপদেশ দান করা হইল।

খালিকের দূত সিংহরাত্রি ধরিয়া চলিতে লাগিল। দামাঙ্গ নগরে উপস্থিত হইয়া দূত অবিলম্বে মহম্মদ জিনেবীর নিকট খালিকের পত্র প্রদান করিল। মহম্মদ জিনেবী পত্র লইয়াই সন্ধানপ্রকাশার্থ তাহা চূষন করিলেন। তাহার পর পত্রখানি পাঠ করিয়া বহু সৈন্ত ও কর্মচারিবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া গানেনের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

দেব-
প্রতিমাবীর
উপর
জাতকোণ।



প্রোথিক
প্রোথার
কপোত-দূত



খালিক-
একেপে
মটালিকা-চূর্ণ

গানেশের হাতের ধরে ছিলেন, তিনি কইলিন পুত্রের সংখ্যক না পাইয়া, পুত্রের ইচ্ছামত পতিত হইয়াছিল, হিংস্র করিয়া, বিবাহিত অশ্রুপাত করিয়া কাগধাশ্রম করিতেছিলেন। পুত্রের মৃত্যুর পানেমের অশ্রুপাত করা হইল, কিন্তু তাঁহাকে পাওয়া গেল না। দামদাসীগণ বলিতে লাগিল, “পানেমের মৃত্যু হইয়াছে।” রাজা স্বয়ং গানেমের জননীকে তাঁহার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। মাতা বলিলেন, “অনেক দিন তাহার মৃত্যু হইয়াছে। আমি এমনই অভাগিনী যে, তাহার দেহ সমাহিত করিবারও সুবিধা পাইলাম না।—হা পুত্র! তুমি কোথায়?”—খোকে বৃদ্ধার বাৎসরিক বন্ধ হইল।

জিনেবীর ছন্দ অত্যন্ত কোমল ছিল, তিনি প্রৌঢ়ার শোকে কাতর হইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, গানেম একাকী অপরাধী, সেজন্য তাহার মাতা ও ভগিনীগণকে কি জন্ত শাস্তি দিব? রাজা গানেমের মাতা ও ভগিনীকে অস্ত্র বাড়ীতে পাঠাইয়া, গানেমের বাড়ী চূর্ণ করিবার আদেশ দান করিলেন। দেখিতে দেখিতে হুম্বর হুম্বজিত গৃহ চূর্ণ হইয়া গেল। গানেমের মাতা ও ভগিনী ইহার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া ভয়ে তন্ত্রিত হইয়া রহিলেন। গৃহ ধ্বংস হইলে রাজা গানেমের মাতা ও ভগিনীকে প্রাসাদে লইয়া আসিলেন। খালিকের আদেশ প্রতিপালিত হইল। নগরবাসিগণের মনে মহা আতঙ্কের সঞ্চার হইল।

গানেমের বেদনাতুরা মাতা ও ভগিনী নগরদে প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। দামদাস-রাজমহিষী তাঁহাদের হৃৎখণ্ডে বোম্বিয়া অশ্রু সংরক্ষণ করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের শুশ্রূষার জন্য তিনি দামদাসীগণকে নিযুক্ত করিলেন, উৎকৃষ্ট আহারাদিও প্রদান করিলেন। গানেমের মাতা খালিকের এই নিষ্ঠুর আদেশের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু দাসীগণ তাহা বলিতে পারিল না, তাহার সে কথা জানিত না।

যাহা হউক, দাসীরা অবিলম্বে এ সংবাদ জানিয়া আসিয়া গানেমের মাতাকে বলিল, “আপনার পুত্র প্রাণভাগ্য করিয়াছে তাহিয়া আপনি হৃৎখণ্ড করিতেছেন, কিন্তু তিনি প্রাণভাগ করেন নাই, করিলে আপনা-দিগকে এত বিপদে পড়িতে হইত না। তিনি খালিকের একটি হুম্বরী বাদীকে মুললাইয়া খাহির করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি বোম্বাদ হইতে পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, তাই ক্রুদ্ধ খালিকের আদেশে আপনার সর্ব্ব নষ্ট করা হইয়াছে। খালিকের আদেশ লঙ্ঘন করিবার সাধা আমাদের রাজার নাই; খালিকের আদেশ তিনি পালন করিয়াছেন।”

গানেমের জননী বলিলেন, “আমার পুত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। তাহাকে রীতিমত শিক্ষাদানও করিয়াছি, তাহার ধর্ম্মজ্ঞানও আছে, আমি আমার পুত্রের নির্দোষিতার জন্য দায়ী থাকিলাম। আমার সম্পত্তি গিয়াছে, তাহাতে হৃৎখণ্ড নাই, আমার অপমান করাতেও আমি কষ্টবোধ করিতেছি না, কিন্তু বিনা দোষে আমার কন্ডার এত লাঞ্ছনা হইল, ইহা আমার অসহ্য।”

কিন্তু মাতার কণ্ঠাশ্রুপাত করিয়া বলিলেন, “মা, আমার জন্য হৃৎখণ্ড করিও না, তোমার মুখের দিকে চাহিয়া আমি সবল কষ্ট সহ্য করিব।”—মাতা ও কন্যা নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

খালিক বার্তাবহ কণোতের মারফতে তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালনের সংবাদ পাইলেন। গানেমের মাতা ও ভগিনী গৃহহীন হইয়াছেন শুনিয়াও তাঁহার ক্রোধ নিবৃত্ত হইল না, তিনি আদেশ করিলেন, “তাহাদিগকে অবিলম্বে দামদাস নগর হইতে নির্বাসিত কর।” সিরিয়ারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহার কণ্ঠাশ্রুপাতকে আদেশ করিলেন, “গানেমের মাতা ও ভগিনীকে রাজধানী হইতে নির্বাসিত করিয়া তিন দিনের পথে রাখিয়া এস।” তাহারা রাজ্যের আদেশে গানেমের মাতা ও ভগিনীকে নগরবাহিরে লইয়া গিয়া, তাঁহাদিগকে গোপনে কিছু টাকা ও খাদ্যদ্রব্য প্রদান করিয়া তিন দিনের পথে রাখিয়া আসিল।

প্রেমিকের
মাতা ভগ্নী
নির্বাসন

গানেমের মাতা ও ভগিনী এই অবস্থায় এক প্রাণে উপহৃত হইলেন। গ্রামবাসিগণ তাঁহাদের চুৎ ও কষ্টে কিস্তি হইল। সকলে মনোবোধ দিয়া তাঁহাদের বিপদের কাহিনী শ্রবণ করিল, সম্বন্ধভূতিতে বিগলিত হইল, কোন পরম্পর-কাতর ব্যক্তি তাঁহাদের আশ্রয় প্রদান করিলেন। গ্রামবাসিগণকে ধন্যবাদ দান করিয়া পরদিন প্রভাতে গানেমের মাতা ও ভগিনী আলোপা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কোন দিন মঙ্গলদেবের বারান্দায়, কোন দিন বৃক্ষচ্ছায়ায় নিশা বাপন করিয়া তাঁহারা ভিক্ষা করিতে করিতে অগ্রবর হইতে লাগিলেন।

নির্ভাসিতা
স্বপ্নবীর
আলেখ



অবশেষে তাঁহারা আলোপা নগরে উপহৃত হইলেন। কিন্তু সে নগরে থাকিতে অনিচ্ছা হওয়ার তাঁহারা নগর ত্যাগ করিয়া, ইউক্রেটস নদীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং উক্ত নদী পার হইয়া তাঁহারা মেগোপটেমিয়ায় প্রবেশ করিলেন। ক্রমে তাঁহারা মোগল নগরে উপনীত হইলেন; মোগল হইতে তাঁহারা বোন্দার যাত্রা করিলেন। গানেমের সহিত সাক্ষাৎ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা তাবিয়াছিলেন, গানেম জীবিত থাকিলে তাঁহার সহিত বোন্দার নগরেই সাক্ষাৎ হইবে।

গানেমের জননী ও ভগিনীর কথা ছাড়িয়া এখন কুৎ-আল-কুলুবের কথা বলিতেছি।

বলিয়াছি, খালিকের আদেশে সুলতানী অন্ধকারপূর্ণ নির্জন কারাগারে আবদ্ধ হইলেন। প্রাণাদেয় মধ্যেই এই কারাগার। খালিকের প্রেমসীগণ কোন কারণে খালিকের অসন্তোষভাজন হইলে এই কারাগারেই আবদ্ধ হইতেন। এখানে একাকী নির্জনে কুৎ-আল-কুলুব অনেক পরিমাণে শক্তিলভ করিলেন। নিজের জ্ঞাত তাঁহার কোন চিন্তা ছিল না, কিন্তু গানেমের দুর্দশার কথা চিন্তা করিয়া তিনি অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন।

এক দিন রাত্রিকালে খালিক একাকী প্রাণাদেয় বিভিন্ন অংশে বিচরণ করিতেছেন, ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সেই অন্ধকারপূর্ণ কারাগারের নিকট উপহৃত হইলেন। তিনি কুৎ-আল-কুলুবের আক্ষেপোক্তি সম্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন। তিনি তখন গানেমের কথা শ্রবণ করিয়া বলিতেছেন,—“গানেম! গানেম! তুমি এখন কোথায়? হায়! আমিই তোমার সর্বনাশের কারণ। আমাকে মরিতে না দিয়া তুমি কেন আমার প্রাণরক্ষা করিলে? তুমি আমার প্রতি যে মহৎ ব্যবহার করিয়াছ, তাহার কি এই প্রতিদান লাভ করিলে? যে খালিক তোমার উপকার করিয়া প্রচ্যুপকারদান করিবেন, তিনিই তোমার সর্বনাশ করিলেন। শক্তিমান খালিক! তুমি যখন পরলোকে আমার সম্মুখে দাঁড়াইবে, তখন গানেমের প্রতি এই ব্যবহারের জন্ত তুমি তাঁহার নিকট কি অব্যবহিবে? তোমার এই পার্থিব ক্ষমতা, সম্পদ-গৌরব তোমার এই অবিচারের দণ্ড হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। সর্বশক্তিমান স্বয়ং বিচারকরূপে তোমার কার্যের দণ্ড ও পুরস্কার দান করিবেন। যেবদূতপন সাক্ষ্য দান করিবেন।”

খালিক-
প্রমোদিনী
বিলাপ



খালিক কথা শুনি শুনিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কুৎ-আল-কুলুব বাহা বলিলেন, তাহা সত্য হইলে গানেম যে নিরপরাধ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ বিষয়ের মধ্যে কতটুকু সত্য আছে, তাহার সম্ভান করিয়াই জ্ঞাত তাঁহার-মনে বৎসরোনাতি আগ্রহ জন্মিল, এমন কি, সৎসা গানেমের ও তাঁহার পরিবারবর্গের প্রতি কুপিত হইয়া বিবেচন অঙ্গলক্ষ্যের পূর্বে তাঁহাদের উপর কঠোর দণ্ডদানের আদেশ করিয়া, তিনি কিঞ্চিৎ কুপিত ও অদ্রুতপ্ত হইলেন। খালিক তৎক্ষণাৎ বকীর কক্ষে প্রত্যাগমন করিয়া, কুৎ-আল-কুলুবকে কারাগার হইতে বাহিরে আনিবার জন্ত সসকলকে আদেশ করিলেন।

মলকর কুৎ-আল-কুলুবকে সঙ্গে লইয়া খালিকের কক্ষে উপহৃত হইলে, সুলতানী খালিকের পদতলে নিশ্চিত হইলেন; অশ্রুধারার তাঁহার মুখশূল ভাঙিতে লাগিল। খালিক তাঁহাকে না উঠাইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,

“কুং-আল-কুলুব, তুমি আমার কবিতার ও উৎসাহের কথা কি বলিতেছিলে? আমি আমার কবিতা কাহার দ্বারাও বলিয়াছি? বলল কথা বলিয়া বল।” কুং-আল, আমি জানি, আমি জানি, আমি জানি।

কুং-আল-কুলুব, কবিতার, খালিক তাঁহার কথা শুনিতে পাইয়াছেন, হতভাগ্য গানের হত খালিকের কাছে দুই কথা বলিবার এই উৎকণ্ঠা অবশ্য ছাড়িতে পারিলেন না; বলিলেন, “জাহাঙ্গীর, আমি আমার আশেপাশে আমার প্রতি অলম্বনজনক কোন কথা বলিয়া থাকি, তবে আমার অপরাধ ধর্ম্মনা কখন। দামাধরের আশু সবাগরের হতভাগ্য পুত্র গানের আমার জীবন রক্ষা করিয়া, তাঁহার গৃহে স্থানদান করিয়া-ছিলেন। আমি স্বীকার করিতেছি, আমাকে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়াছিল, কিন্তু সে ক্ষণ তিনি এক যুগেরে ক্ষণও আমার সহিত অন্তর ব্যবহার করেন নাই, বরং আমি কে, তাহা জানিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, ‘প্রভুর স্বেচ্ছা ভৃত্যের লোভ করা উচিত নহে।’ কিন্তু তাঁহার এই ব্যবহারের পরিণতি কাঁহাণনা তাঁহার প্রতি কিরূপ ব্যবহারের আদেশ করিয়াছেন, তাহা আপনার অবদিত নহে। আমার বিচারে হয় ত আপনাকে অপরাধী হইতে হইবে।”

সুন্দরীর কথা শুনিয়া খালিক বিমুগ্ধ হইয়া প্রকাশ করিলেন না; বলিলেন, “গানেন যে তোমাকে অপবিত্র করে নাই, এ কথা কি আমি বিশ্বাস করিতে পারি?” কুং-আল-কুলুব বলিলেন, “অন্যায়সেই গায়ের। আমি সকল কথা বলিতেছি, একটাও মিথ্যা কথা বলিব না। কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমি আপে একটা কথা বলিতে পারি।” খালিক বলিলেন, “বল, কোন কথা গোপন না করিলে আমি তোমাকে ক্ষমা করিব।”

কুং-আল-কুলুব বলিলেন, “গানেন আশু প্রাণ বিপন্ন করিয়া যে ভাবে আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তিনি যে ভাবে আমার আদরবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রতি আমার যৎপরোনাস্তি শ্রদ্ধার উত্তর হইয়াছিল। সেই শ্রদ্ধা হইতে অহুসারের উত্তর হইয়াছিল, এ কথাও অস্বীকার করিতে পারি না। আপনার প্রেম বিলাস-লীলার নামান্তর মাত্র, কিন্তু গানেমের হৃদয় সরল, কোমলতাপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে ভাবই থাকুক, তিনি কোন দিনও কর্তব্যব্রতী হন নাই; তিনি সর্বদাই মনে রাখিয়াছিলেন, বাহা প্রভুর স্বেচ্ছা, তাহাতে ভৃত্যের অধিকার নাই।”

অন্ত কোন ব্যক্তি হইলে হয় ত তিনি কুং-আল-কুলুবের অন্তের প্রতি এই প্রণয়লক্ষণ প্রকাশে বিরক্ত বা ক্রুদ্ধ হইতেন, কিন্তু খালিক সুন্দরীর কথায় কোণ প্রকাশ করিলেন না। তিনি তরুণীর হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং তাঁহাকে পাশে বসাইয়া তাঁহার বিপদের ও বিপদ হইতে অতুতপূর্ণ উপায়ে উদ্ধারের কাহিনী আগাগোড়া শুনিলেন। কুং-আল-কুলুব কোন কথা গোপন করিলেন না; ছোবেদীকে প্রভাবিত করিবার জন্যই যে তিনি গানেমের গৃহে লুকাইয়া ছিলেন, তাহা বলিলেন, তাঁহার উপদেশেই যে গানেন ভৃত্যের খেণে পলায়ন করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

খালিক বলিলেন, “তোমার সকল কথা বিশ্বাস করিলাম।”

কুং-আল-কুলুব বলিলেন, “জাহাঙ্গীর, আমি ত আপনার নিকট—আপনার নিকট কেন, প্রাণদানের সন্দের নিকটেই মৃত ছিলাম, কেবল গানেমের নিকটেই আমি জীবিত ছিলাম। আপনি যে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, সে সংবাদ আমি পাই নাই।” খালিক বলিলেন, “আমি আমার ভ্রম বুঝিতে পারিয়াছি। আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই বুকের আমি বত অপকার করিয়াছি, তাহার তুলনায় অনেক অধিক উপকার করিব। আমার সাধ্যানুসারে কোন ক্রটি করিব না। তুমি তাহার প্রতি যে অশ্রুপ্রবাহ প্রকাশ করিতে বলিবে, আমি তাহাই করিব; তুমি আমাকে কি করিতে বল?”

প্রবিরনীর
মনোরমের
প্রাণ



কুং-আল-কুলুব্ বিলেন, "আপনার আবেশের জন্য আমার আত্মিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনি আপনার রাজস্বকে সোপান করিব, কিন্তু আমি, আমিই পূর্ণ পালনকে কমা করা হইল। তিনি যাহাতে নিজের আত্মার নিকট উপস্থিত হইতে পারেন, তাহার আবেশ করুন।" খালিক বলিলেন, "কেবল তাহাই নয়, আমার সমস্ত বস্তুই রাখিয়া তোমার প্রতি শ্রদ্ধা পূর্বক ব্যবহার করিয়াছে, তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছে, সে জন্ত তাহাকে যথেষ্ট পূজিত করিব; আমার আবেশে তাহার পরিবারবর্গের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিব এবং অবশেষে তাহার জন্মের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্ত তোমাকে তাহার হস্তে সম্ভ্রম দিব।"

কুং-আল-কুলুব্ এই কথা শুনিয়া আনন্দাশ্রু ফির্জনে লাগিলেন, তাহার পর খালিকের আবেশে তাঁহার নিজের মহলে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার স্রবাসামগ্রী যে ভাবে ছিল, সকলই সেই ভাবে রহিয়াছে, গানেমের জিনিসপত্রও বলকর কর্তৃক সেই মহলে রক্ষিত হইয়াছে। কোন স্রব নষ্ট হয় নাই, দেখিয়া হৃদয়ী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; আশা ও আনন্দে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

খালিকের আবেশে রাজ্যের চতুর্দিকে গানেমের মার্জনা-সংবাদ ঘোষণা করা হইল; কিন্তু গানেমের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না, কুং-আল-কুলুব্ মনে করিলেন, এত হৃৎ-কষ্ট সহ্য করিয়া গানেম নিশ্চয়ই ক্রীত নাই। মনে নিদারুণ ছিটিকার উদয় হইল; কিন্তু প্রণয়ী সকল তাগ করিতে পারে, আশা তাগ করিতে পারে না। হৃদয়ী অবশেষে স্বয়ং গানেমকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্ত খালিকের অহুমতি চাহিলেন, খালিক প্রসন্নমনে অহুমতি দান করিলেন।

কুং-আল-কুলুব্ এক দিন প্রভাতে বহুমুখ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি লইয়া একটি অশ্বতরে আরোহণ করিয়া, দুই জন দাসীর সহিত নগরে বহির্গত হইলেন।

তিনি কয়েকটি মসজিদে ঘুরিয়া দীন-দরিদ্র ও অন্ধ আত্মরূপকে সেই অর্থ দান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। সমস্ত দিনে তিনি সেই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়া ফেলিলেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে প্রত্যগমন করিলেন।

পরদিন তিনি সহস্র স্বর্ণমুদ্রার আর একটি তোড়া লইয়া সদাগরদিগের পল্লীতে উপস্থিত হইলেন, সেই পল্লীর প্রধান সদাগরকে সেই স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলি দান করিয়া বলিলেন, "জানিয়াছি, আপনি বড় দয়ালু ও ধার্মিক ব্যক্তি, সকলেই আপনার প্রশংসা করে। আমার এই হাজার মোহর আপনি দরিদ্রদিগের মধ্যে বিতরণ করুন। দরিদ্রদিগের অভাবের কথা আপনি যত জানেন, এরূপ আর কাহারও জানিবার সম্ভাবনা নাই।"

সদাগর বলিলেন, "আমি আপনার আবেশ পালন করিব, কিন্তু আপনি যদি আমার গৃহে পদাশ্রয় করেন, তাহা হইলে সেখানে ছাউনীর ন্যায় দেখিতে পাইবেন, তাহাদের অবস্থা বড়ই শোচনীয়, তাহারা প্রকৃতই দয়ার পাত্র। আপনি দয়াবন্তী বুদ্ধিই আপনাকে এ অল্পরোধ করিতেছে। এই জীলোক ছাউনীর কাল রাজধানীতে আসিয়াছে, তাহাদিগের অবস্থা দর্শনে হৃদয়িত হইয়া আমি তাহাদিগকে আমার গৃহে আশ্রয় দিয়াছি। তাহাদের মূখ দেখিয়া সম্রাটবংশীয় জীলোক বলিয়া বোধ হয়। আমার স্ত্রী তাহাদিগের প্রতি বিশেষ মত করিতেছেন, দাসীগণও তাহাদের শুশ্রূষার রত আছে। আমি তাহাদিগের পরিচয় এখন পর্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই, তাহারা একই স্থান হইলেই সকল কথা জানিতে পারিব।"

কুং-আল-কুলুব্ এই রমণীয়ের সংবাদ শুনিয়া, তাহাদিগকে দেখিবার জন্ত উৎসাহিত হইলেন, সদাগরের সহিত তিনি তাঁহার বাড়ী আসিতেই সদাগরপত্নী তাঁহার রূপ ও বেশভূষা দেখিয়া তাঁহাকে খালিকের অন্তঃপুরবাসিনী বলিয়া বুঝিতে পারিল, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি সম্মানপ্রদর্শনের জন্ত সদাগরপত্নী

প্রাথমিক
পুস্তকের
প্রতিচ্ছবি



প্রাথমিক
পুস্তকের
প্রতিচ্ছবি



কুং-আল-কুলুবের পদতলে নিপতিত হইয়া, তাঁহার চরণ-চুম্বন করিল। তরুণী তাহাকে হাত ধরিয়া তুলিয়া বলিলেন, “তোমার গৃহে যে দুইটি অপরিচিতা বিদেশিনী আশ্রয় লইয়াছে, তাহাদের সঙ্গে আমি একবার আলোচন করিতে চাই।” সধাগরপত্নী হুসাইনীর ঘরের ককে তাঁহাকে লইয়া গেল। কুং-আল-কুলুব্ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক স্ত্রীলোকটির নিকট উপস্থিত হইয়া সেহার্শবরে বলিলেন, “ওগো বাছা, আমি তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে আসিয়াছি। পনের উপকার করিবার আমার কিঞ্চিৎ সামর্থ্য আছে, আশা করি, আমি তোমার ও তোমার সঙ্গিনী যুবতীটির কিছু না কিছু উপকার করিতে পারি।” প্রোচা বলিলেন, “ঠাকুরাণি, আমাদের প্রতি আপনায় অল্পগ্রহ দেখিয়া আমি বৃত্তিতে পারিতেছি, আল্লা আমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করেন নাই, আমরা বড়ই নির্ভরতন ও কষ্ট সহ্য করিয়াছি।” প্রোচা আর কোন কথা বলিতে পারিল না, অবিরলধারে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার সেই কাতর ক্রন্দন দেখিয়া সধাগর-পত্নী ও কুং-আল-কুলুব্ উভয়েরই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।

এই প্রোচা আবুর বিধবা পত্নী—গানেমের জননী, এবং তাহার পার্শ্ববর্তিনী যুবতী গানেমের ভগিনী। কুং-আল-কুলুব্ বেশমী রম্যালে চক্ষু-মার্জন করিয়া, গানেমের জননীকে বলিলেন, “তুমি তোমার হৃৎ-কণ্ঠের ইতিহাস বলিলে বড় সুখী হইব, আমার সাধ্যানুসারে তোমার উপকার করিব।”

হুসাইনী দাসীর
জন্ত সর্জনশ



গানেমের মাতা বলিলেন, “ঠাকুরাণি, কুং-আল-কুলুব্ নামক খালিকের একটি হুসাইনী দাসী আমাদের সকল সর্জনশের মূল।” তরুণী প্রথমে এই কথা শুনিয়া ভীত ও বিস্মিত হইলেন, কিন্তু কণকালমধ্যে সংঘতভাব ধারণ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। প্রোচা বলিলেন, “আমি দামাভস্বরের সদাগর আবুর বিধবা পত্নী, আমার পুত্রের নাম গানেম, কিছুদিন পূর্বে গানেম বাণিজ্যোপলক্ষে বোম্বাদে আসিয়াছিল, সেখানে তাহার বিরুদ্ধে এক অভিযোগ হয় যে, সেই খালিকের একটি হুসাইনী দাসীকে ফুসলাইয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, এই দাসীর নাম কুং-আল-কুলুব্। খালিক তাহার প্রাণসংহারের আদেশ প্রদান করেন, কিন্তু তাহার সন্ধান না পাইয়া তিনি দামাভস্বরপতিকৈ আমাদের সর্জনশ করিবার আদেশ দিলেন। তাহার পর আমরা সিরিয়াদেশে হইতে চিরকালের জন্ত নির্বাসিত হইয়াছি। যাহা হউক, আমাদের যতই হৃৎকণ্ঠ হউক, এখন যদি জানিতে পারি, গানেম জীবিত আছে, যদি তাহাকে একবার দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের এ সকল কষ্ট আর বষ্ট বলিয়া মনে হইবে না। আলি জানি, আমার পুত্র কখন খালিকের হুসাইনী দাসীকে ফুসলাইয়া বাহির করে নাই, এমন ছুচস্মিত সে নহে। আমি ও আমার কস্তার ভ্রাতা আমার পুত্রও নির্দোষ। হৃদয়তরুণই আমাদিগকে এ সকল যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছে।” কুং-আল-কুলুব্ বলিলেন, “তুমি সত্যই বলিয়াছ, তোমার পুত্র প্রকৃত নির্দোষ। তুমি আমার কথা বিশ্বাস করিতে পার; কারণ, তুমি যে রমণীর কথা বলিতেছ, আমিই সেই। হৃভাগ্যক্রমে আমি তোমার পুত্রের সর্জনশের কারণ হইয়াছি বটে, কিন্তু তোমার পুত্র আমাকে গৃহের বাহির করে নাই। যদি তোমার পুত্র প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তবে সেজন্য আমিই একমাত্র অপরাধিনী। কিন্তু আমার একটি ক্ষমতা আছে, তোমাদের যে অপকার ও ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি খালিককে গানেমের নির্দোষিতার কথা বলিয়াছি, খালিক তাহা বিশ্বাস করিয়াছেন, আর তিনি গানেমের শত্রু নহেন, গানেমকে তিনি ক্ষমা করিয়াছেন, গানেমের প্রতি তিনি যোগ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করিবেন, এজন্য চতুর্দিকে গানেমের অঙ্গুলিচলন চলিতেছে; এমন কি, আমার সহিত গানেমের বিবাহপ্রদানেও তিনি সম্মত আছেন। সুতরাং তুমি আমাকে এখন হইতেই তোমার পুত্র-বধু বলিয়া মনে করিতে পার।” কুং-আল-কুলুব্ সাগ্রহে গানেমের মাতা ও ভগিনীর সহিত আলিঙ্গন করিলেন। গানেমের মাতা ও ভগিনীর শোকার্ত আনন্দাশ্রুতে পরিণত হইল।

মিলন-আশার
উল্লাস



অতঃপর হৃদয়ী বলিতে লাগিলেন, “গানেদের সর্ব্ব বিষয়ে বগিয়া আপনি মনে করিবেন না, বালিকের অশ্রুগ্রাহে আবার তাঁহার সর্ব্ব্ব হইবে। বিশেষতঃ বোম্বাদে গানেদের যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহার বিস্ময়াত্রণও নষ্ট হয় নাই, সমস্তই আমি মথুরে আমার অন্ধারে রাখিয়াছি। আমি জানি, গানেদের অদর্শনে আপনার হৃদয় বিবীর্ণ হইয়া বাইতেছে, আপনি কোন প্রকারে মনকে শান্ত করিতে পারিতেছেন না, কিন্তু আপনি যৈষা ধারণ করুন। আমরা গানেমকে খুঁজিয়া বাহির করিব। যখন আপনারদের দেখা পাইয়াছি, তখন তাঁহারও সাক্ষাৎ পাইব, এ ভরসা যথেষ্ট করিতে পারি। হয় ত আজই আপনার হৃৎ-বস্ত্রাচার অবগান হইবে, তাহার পর আপনি দামাঙ্কসে যেরূপ হৃৎ-নোভাগ্য ভোগ করিয়া আসিয়াছেন, হয় ত কাল হইতেই তাহা আপনারা লাভ করিতে পারিবেন।”

প্রেমিকের
প্রাণ-সংশয়



কুং-আল-কুলুবের কথা শেব হইতে না হইতে সদাগর গৃহে উপস্থিত হইয়া বলিল, “ঠাকুরাণি, আজ একটি বড় ক্ষয়বিদারক দৃষ্ট দেখিলাম; দেখিলাম, একটি অশ্বতরে চড়িয়া একটি পীড়িত যুবক আসিতেছে। যুবক এত পীড়িত ও এত দুর্ব্বল যে, তাহাকে অশ্বতরের দেহের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছে। বাজারের লোক তাহাকে অশ্বতর হইতে নামাইয়া হাসপাতালে লইয়া গিয়াছিল, রোগীর যুথানি আমার অপরিচিত বোধ হইল না। হাসপাতালে যেরূপ যন্ত্রের অভাব, তাহাতে সে সেখানে বাঁচিবে না বলিয়া আমার আশঙ্কা হওয়ায়, আমি তাহাকে আমার ভৃত্যগণের দ্বারা হাসপাতাল হইতে বাড়ীতে আনিয়াছি এবং একটি ভিন্ন কক্ষে রাখিয়াছি।”

কুং-আল-কুলুব তৎক্ষণাৎ সেই যুবককে দেখিবার জন্য উঠিলেন এবং সদাগরের সহিত পীড়িতের কক্ষে চলিলেন।

হৃদয়ী দেখিলেন, যুবক শয্যা শয়ন করিয়া আছে। চক্ষু নিম্নলিখিত, মুখ বিবর্ণ, অশ্রুগ্রাহে যুথানি ভাসিয়া বাইতেছে। সে মুখ দেখিয়া তরুণী ভাবিলেন, হয় ত ইহা গানেদের মুখ; আবার সন্দেহ হইল, সেই হৃদয় যুবক কি এ ভাবে পীড়িত হইয়া পরের গৃহে যুত্ৰাশা আশ্রয় করিয়াছে? কিছুই বৃত্তিতে না পারিয়া তিনি কণ্ঠস্থকণ্ঠে ডাকিলেন, “গানেম, তুমি কি গানেম?” গানেম কোন উত্তর করিলেন না। হৃদয়ী পুনর্বার বলিলেন, “অভাগিনী কুং-আল-কুলুবের জন্তই এত কষ্ট!” এবার গানেম চক্ষু মেলিলেন; কষ্টে বলিলেন, “ঠাকুরাণি, এত দিনে আপনার দেখা পাইলাম, কিন্তু—” গানেম আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না; অশ্রুপূর্ণ-নেত্র সত্ৰকণ্ঠিতে হৃদয়ীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কুং আল-কুলুবও তাঁহার প্রতি বক্র-দৃষ্টি। গানেম ধীরে ধীরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, তাঁহার যেন মোহ উপস্থিত হইল।

বিবহ-বেদনাকর
যুত্ৰা-শয্যা



সদাগর গানেদের অনিষ্ট আশঙ্কায় তরুণীকে সে কক্ষ ত্যাগ করিবার জন্য অহরোধ করিলেন। কুং-আল-কুলুব কক্ষত্যাগ করিলে, গানেম চক্ষু খুলিয়া চাহিলেন; দেখিলেন, হৃদয়ী সে কক্ষে নাই। তখন তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, “হৃদয়ী, তুমি কোথায়? আমি যথেষ্ট তোমাকে দেখিলাম, না, সত্যই তুমি দয়া করিয়া এই অস্ত্রমতলে আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছ?” সদাগর বলিলেন, “মহাশয়, আপনি আর বিলাপ করিবেন না, আপনি স্বপ্ন দেখেন নাই, সত্যই সে রমণী এখানে আছেন, তিনি এখনই আসিবেন। আপনার হৃৎ-বস্ত্র রক্ষণী অবগান হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বালিক যে গানেদের অতীত অপরাধমুহু মার্জনা করিয়া পুত্রবৃত্ত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, আমার বোধ হইতেছে, আপনিই সেই গানেম। আপনি পীড় হইল, ইহাই প্রার্থনা, ক্রমে সকল কথাই আপনি জানিতে পারিবেন, আমি সাধাভ্যাসে উপকার করিব।”

কুৎসিত-কুলুং সেখানে অধিক বিলাস না করিয়া মহানন্দভরে প্রাণায়ে প্রভাতবর্জন করিলেন এবং খালিকের সকল কথা অবগত করিলেন। খালিক গানেমকে ও তাহার মাতা এবং ভগিনীকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি তরুণীকে বলিলেন, “স্বন্দরি! তুমি যে ইহাদের খুঁজিয়া বহির করিয়াছ, ইহাতে আমি বড় আনন্দিত হইয়াছি। আমি তোমার নিকটে যে প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ আছি, তাহা পালন করিব। তুমি গানেমকে বিবাহ করিতে পাইবে, আজ ইহাতেই আমি তোমার দাসীকে মোচন করিলাম, আজ ইহাতেই তুমি স্বাধীন। তুমি গানেমের নিকটে ফিরিয়া যাও, তাহার মাতা এবং ভগিনী স্নহ হইয়া ইতিথে তাহাদিগকে আমার নিকটে উপস্থিত করিবে।”

পরদিন অতি প্রত্যবে কুৎসিত-কুলুং সদাগর-গৃহে বাত্ৰা করিলেন। তিনি গানেমের মাতা এবং

ভগিনীকে খালিকের কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহাদের মনের ভর দূর হইয়া গেল, আবার মুখে হাসি দেখা দিল।

অনন্তর তরুণী একাকী গানেমের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, গানেমকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, “গানেম, দেখ, তোমার কুৎসিত-কুলুং আবার আমি-
য়াছে, আর তোমাকে ফেলিয়া যাইবে না। যাহাকে তুমি চির-
দিনের জন্য হারাইয়াছ তাহা-
ছিলে, তাহাকে আবার পাইলে।”

গানেম বিগলিত অশ্রুধারে প্রিয়তমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “আমি তাহা বিয়াছিলাম, আপনি খালিকের প্রাণায়ে আছেন,

আমার বোধ হয়, আপনি তাহার সন্দেহ দূর করিয়া পুনর্বার তাঁহার অঙ্গগ্রহণাতে সমর্থ হইয়াছেন। গানেম, গানেম, তুমি চির-স্বাধীন। কুৎসিত-কুলুং বলিলেন, “গানেম, অশ্রু হুঁজিয়া ফেল, খালিক তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিয়াছেন, তোমার বৃত্ত কতি করিয়াছেন, তাহা সমস্তই পূরণ করিবেন বলিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে, তোমার সহিত আমার বিবাহ দিতেও স্বীকার করিয়াছেন।” শেষ সংবাদটি শ্রবণ করিয়া গানেমের মনে আনন্দ ও উৎসাহ যেন বাধমুক্ত গিরিনদীর ভাষা উচ্ছসিত হইয়া উঠিল। তিনি আবেগভরে বলিলেন, “প্রিয়তমে! তুমি বাহা বলিতেছ, তাহা কি সত্য? আব্রু গুজ গানেমকে খালিক সত্যই কি এতখানি অঙ্গগ্রহ করিবেন?”
স্বন্দরী বলিলেন, “হাঁ, আমি বাহা বলিতেছি, তাহা সকলই সত্য, তোমার পরিজনবর্গের প্রতি তিনি বর্ষেট করুণা প্রদর্শন করিবেন, আমাকে তাহা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন। তোমার মাতা ও ভগিনী অসহ দণ্ড ভোগ করিয়াছেন, এখন তাহারা অনন্ত স্নহ ভোগ করিবেন।” গানেমের মাতা ও ভগিনী

স্বত্ব-
শস্যায়
প্রেমিক-
মিলন



প্রেমিক-
প্রবেশ



এতি খালিকের আদেশে যে প্রকার উৎসাহিত করা হইয়াছিল, কুৎ-আল-কুলুব তাহা গানেমের গোচর করিলেন। গানেম জননী ও ভগিনীর দুর্দশায় কণা স্তন্যের কাতরভাবে অশ্রুধারা করিতে লাগিলেন, এক তাঁহার গৃহহীন ও সর্বস্বহীন হইয়া কোন্ অজ্ঞাত দেশের পথে পথে ভ্রমণ করিতেছেন ভাবিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইলেন। কিন্তু কুৎ-আল-কুলুব অবিলম্বেই তাঁহার স্তুতিভা দূর করিলেন; বলিলেন, “গানেম, তুমি আশা ভাগ কর, তাঁহার এই বোদ্ধাদ নগরেই উপস্থিত আছেন, এমন কি, তাঁহারই সহিত এই গৃহেই স্তোত্রীয় সাক্ষাৎ হইবে।” সুন্দরী গানেমের জননী ও ভগিনীকে আহ্বান করিলেন, জননী ও সন্তানে, ভ্রাতা ও ভগিনীকে দীর্ঘকাল পরে মিলন হইল, সকলের নেত্রেই অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল, কুৎ-আল-কুলুব ও সদাগর এবং তাঁহার পত্নীও অশ্রুধারা করিতে পারিলেন না। আশা যে সকলকে একস্থানে আনিয়া মিলাইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া সকলেই তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করিতে লাগিলেন।



অনেকক্ষণ পরে অশ্রু মুছিয়া, গানেম তাঁহার পলায়নকাহিনী বিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, পথিমধ্যে এক গ্রামে তিনি পীড়িত হইয়া কয়েকজন কৃষকের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কৃষকরা তাঁহাকে একটি অখতরে বাদিয়া বোদ্ধাদে প্রেরণ করিয়াছিল, নগরবাসিগণ তাঁহাকে হাসপাতালে পাঠাইলে সদাগর তাঁহাকে গৃহে আনিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

অনন্তর তরুণী তাঁহার কাহিনী বর্ণনা করিয়া উপদংশারে গানেমের জননী প্রভৃতিকে বলিলেন, “আমাই আমাদের সকলকে একত্র সম্মিলিত করিলেন, একত্র আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করি। দুঃখের অবগান হইয়াছে, শীঘ্রই সুখের সুখ দেখিতে পাইব। গানেম সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেই খালিকের নিকট আপনাদিগের সকলকেই উপস্থিত হইতে হইবে, আপনারা এখানে আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করুন।”

কুৎ-আল-কুলুব সেই দিনই প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া, হাজার মোহরপূর্ণ একটি তোড়া লইয়া পুনর্বার সেই সদাগর-গৃহে উপস্থিত হইলেন, মোহরের তোড়াটা সদাগরের হস্তে প্রদান করিয়া ফিরা ও তাঁহার জননীর জন্ত অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইবার জন্ত অনুরোধ করিলেন। সদাগর তিন দিনের মধ্যে অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইলেন। ইতিমধ্যে গানেম সুস্থ হইয়া উঠিলে নব পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেন। খালিক তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্ত প্রস্তুত আছেন, এই সংবাদ লইয়া উজীরশ্রেষ্ঠ জাফর সদাগরের গৃহে উপস্থিত হইলেন।

গানেম উজীরের সহিত একটি সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণ করিয়া, রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন। গানেমের মাতা ও ভগিনী ভিন্ন পথ দিয়া অস্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

গানেম খালিকের সিংহাসন-দরীপে আনীত হইলে খালিকের পদতলে পুষ্ট হইয়া গড়িলেন, তাঁহার পর তাঁহার চরণ-বন্দন। করিয়া, উঠিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করিলেন। কবিতাটি খালিকের শুণ্ণবর্ণনায় পূর্ণ। সভাপদপূর্ণ সেই কবিতাটি স্তন্যের একবাচ্যে তাহার প্রশংসা করিলেন।

গানেম নীরব হইলে খালিক তাঁহাকে তাঁহার নিকটস্থ হইতে আদেশ করিয়া বলিলেন, “আমি তোমাকে দেখিয়া সুখী হইলাম, তুমি আমার বাদীকে কোথায় পাইয়াছ, কিরূপেই বা তাহার জীবন রক্ষা করিয়াছ, তাহা বল।” গানেম সকল কথা বলিলেন। তাঁহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া খালিক তাঁহাকে একটি পরিচ্ছদ উপহার প্রদান করিলেন, তাঁহার পর বলিলেন, “গানেম, আমার ইচ্ছা, তুমি আমার দরবারে থাক।”—গানেম বলিলেন, “জাহাপনা, এ দাসের তাহা অপেক্ষা উচ্চাভিলাষ কিছুই নাই, আপনার অন্তঃকরণে উপস্থিতি আমার

জ্যেষ্ঠাধার
প্রাণ-
অতিশয়
সম্বন্ধন।

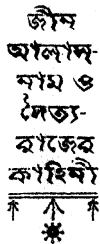




জীবন ও সৌভাগ্য নির্ভর করিতেছে।" গানেশের উত্তরে খালিক যৎপরোনাস্তি স্ত্রীভিলাষ করিলেন, এবং সেই দিন হইতেই তাঁহাকে বৃত্তিদানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর খালিক সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া গানেশ ও জাকম্মকে সঙ্গে লইয়া অস্ত্রপুরাতিমুখে গমন করিলেন।

অস্ত্রপুরে উপস্থিত হইয়া কুং-আল-কুলুথকে গানেশের মাতা ও ভগিনীর সঙ্গে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার আদেশ পালিত হইল। গানেশের মাতা ও ভগিনী খালিকের পদতলে নিপতিত হইয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। খালিক তাঁহাদিগকে উত্তীর্ণে আদেশ করিলে, তাঁহার উত্তীর্ণা দাঁড়াইলেন। গানেশের ভগিনী কিংনার রূপ দেখিয়া খালিক অত্যন্ত বিমুগ্ধ হইলেন। তিনি বলিলেন, "রূপসি, তোমার প্রতি আমি বড় অত্যাচারণ করিয়াছি, এখন সেই অত্যাচারের প্রতিবিধানস্বরূপ আমি তোমাকে বিবাহ করিব মনে করিতেছি। তুমি আমার প্রধান মহিষী হইয়া রহিবে, তাহাতে জোবেদার প্রতি তাঁহার জঁঘার লজ্জা যথেষ্ট দণ্ডবিধান করা হইবে। কেবল ইহাই নহে, কুং-আল-কুলুথ, আমি তোমাকে গানেশের হস্তে সমর্পণ করিলাম, আর গানেশের অনুমতি এখনও কিছু রূপদোষন আছে, উজীর জাকম্মের সহিত অনায়াসেই তাঁহার নিকা হইতে পারে। কণ্ঠচ্যায়গণ এখনই কাজী ও কয়েকজন সাক্ষী উপস্থিত করুন। চুক্তিপত্রে এখনই স্বাক্ষর দ্বারা বিবাহ শেষ করিতে হইবে।" গানেশ মহানন্দে প্রস্তাব করিলেন, খালিক যদি তাঁহার ভগিনীকে উপহারীভাবে রাখেন, তাহা হইলেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট লম্বান প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু খালিক তাঁহাকে বিবাহ করিতেই সম্মত হইলেন।

শাহারজাদী গানেশের এই প্রেমকাহিনী বর্ণনা করিলে মুলতান শাহরিয়ার ইহা শুনিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। শাহারজাদী বলিলেন, "জাঁহাপনা, এই কাহিনী এখন আপনার স্ত্রীত্বের হইয়াছে, তখন রাজপুত্র জীন আগাসনাম ও দৈত্যরাজের কাহিনী প্রবণ করিলে আপনি নিচর্যই মুগ্ধ হইবেন।" মুলতান শাহরিয়ার তাহা শ্রবণ আগ্রহ জানাইলে শাহারজাদী স্বল্পর মুখে মধুর হাসির বিছাৎ বিকাশ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।



পূর্বকালে বাসোরায় একজন মুলতান বাণ করিতেন। তাঁহার অগণিত ধনস্বর ছিল, প্রজাপুত্র ও তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি-প্রভা করিত; কিন্তু পুত্রের অভাবে তিনি বড় মনঃকষ্ট পাইতেছিলেন। অবশেষে রাজ্যের বত সাধু ও কবিরামি মিলিত হইয়া আচার্য নিকট রাজার পুত্রের জন্ম প্রার্থনা করায় আবার তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। কিছুদিন পরে বৃদ্ধ রাজার একটি পুত্রসন্তান জন্মিত হইল, এই পুত্রটির নাম হইল, জীন আগাসনাম।

পুত্রের জন্মের পর মুলতান দৈবজ্ঞগণকে আহ্বান করিয়া, পুত্রের জাতপত্র প্রস্তুতের আদেশ করিলেন। তাহার রাশি, নক্ষত্র, দিন, ফলাফল গণনা করিয়া বলিল, "রাজপুত্র কষ্টম্ভ ও মাহী হইবেন, কিন্তু তাঁহাকে অনেক বিপদে পড়িতে হইবে; সুমার দীর্ঘজীবীও হইবেন।" মুলতান এ সংবাদে বলিলেন, "সাংসারিক জ্ঞানভাণ্ডের জন্ম বিপদের আবৃত্তক, বিপদে পড়িয়া তাহা হইতে বাহারা উদ্ধার লাভ করিতে পারে, তাহারাই বীরপুত্র। পুত্র বিপদে পড়িবে, এ সংবাদে আমি বিশ্বাস্য চিন্তিত নহি।"

শ্রুতিশব্দগণের হস্তে রাজপুত্রের শিক্ষাভায় সমর্পিত হইল। রাজপুত্রকে আদর্শ রাজা করিয়া ভোগাই মুলতানের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইবার পূর্বেই কঠিন রোগে তিনি কালকবলিত

হইলেন। রাজা মৃত্যুকালে পুত্রকে তাঁহার শয্যাশ্রান্তে আস্থান করিয়া উপদেশ প্রদান করিলেন,—
“দরুনা প্রজাবর্গের হিতসাধন করিয়া তাহাদিগের শ্রদ্ধাভাজন হইবে, যথেষ্ট তাহাদের তত্ত্বি আকর্ষণ করিবে, চাটুকারগণের চাটুকার্যে কখন কণ্ঠশত করিবে না, পুরস্কার কিংবা দণ্ড বাহাই দান কর, কোন কার্য ভাড়াভাড়ি করিবে না।”

স্বলতানের মৃত্যুর পর রাজপুত্র জীন এক সপ্তাহ শোকবাস পরিধান করিলেন, অষ্টম দিনে তিনি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নানাবিধ আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইলেন, রাজকাৰ্য্যে তাঁহার কিছুমাত্র মনোযোগ রহিল না, অঙ্গচরিত্র চাটুকারগণে পরিবৃত্ত হইয়া, তিনি পিতৃধন দ্রুই হস্তে নষ্ট করিতে লাগিলেন।

তাঁহার জননী—পরলোকগত স্বলতানের মহিষী অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও কর্তব্যপরায়ণা রমণী ছিলেন, প্রজাগণ রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিতেছিল, কিন্তু রাজমাতার বুদ্ধি-কৌশলে তাহারা বিদ্রোহী হইতে পারিল না। স্বলতান-মহিষী

পুত্রকে অনেক হিতোপদেশ দান করিলেন। অবশেষে যখন পুত্র ধনভাণ্ডার নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন, চাটুকারগণের নীচতার পরিচয় পাইলেন, তখন তাঁহার চৈতন্যদায়ক হইল। মাতার উপদেশ তখন তিনি হিতোপদেশ বলিয়া বুদ্ধিতে পারিলেন। তিনি নিরীক্ণ ও অকর্ণা চাটুকারগণকে তাঁহার সিংহাসনজ্যোত্স্ব হইতে বিতাড়িত করিয়া, স্রবোগ্য বহুদর্পী মন্ত্রী ও অমাত্যগণের হস্তে পুনর্বার রাজ্যাশপনের ভার অর্পণ করিলেন।

কিন্তু জীনের বিষয়ভাব দূর হইল না, তিনি বে অগাধ অর্গ নষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা পাইবার আর উপায় ছিল না, শূন্যকোষ কিরণে পূর্ণ করিবেন, দিবায়াত্রি এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিন রাজিযোগে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন একটি বৃদ্ধ মহিমা-সম্বলন-দেহে তাঁহার সমুখে আসিয়া প্রসন্নহাস্তে বলিতেছেন, “বৎস, দুঃখ দূর করিবার লক্ষ স্রবের আবশ্যক। দুঃখান্তে যদি সুখী হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে উত্তীরা ভূমি মিশর দেশে যাত্রা কর, কারয়ো নগরে উপস্থিত হইলে ভোমার দুঃখ-নিশা অন্তর্নিহিত হইবে।”

জীন নিদ্রাভঙ্গে মাতাকে বস্ত্রবিবরণ বলিলেন, রাজমাতা হাসিয়া বলিলেন, “বৎস, জ্ঞান কর, স্বপ্নের মোহে বুদ্ধ হইয়া ভূমি এখন কারয়ো-যাত্রার লক্ষ ব্যস্ত হইয়া উঠিবে না।” স্বলতান বলিলেন, “কেন না,



পিতৃবিরোধে
প্রমোদ-প্রবাহ

নিশা-
শেষে
আশান্ত
স্রব



বসুমাত্রই কি অর্থহীন প্রাণ?—বিকৃত মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র? কত স্বপ্ন ত' সত্য হয় তুমিরাছি।
আমারি সত্য না হইবারই বা কারণ কি? হয়ত ইহা সত্যই হইবে। যে বুদ্ধি আমাকে স্বপ্ন
দিয়াছেন, তিনি যে অসাধারণ ব্যক্তি, তাহাতে আমার বিশ্বাসই সন্দেহ নাই; তিনি কেবল বুদ্ধি নহেন,
তাহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে দেহের জ্যোতি প্রাতিভাসিত হইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি
আমাদের পয়ন বন্ধ, আমার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, আমাকে অর্থশক্তির উপায় বলিয়া দিতেছেন। আমি
নিশ্চয়ই কায়রো নগরে যাত্রা করিব, মা, তুমি কোন বাধা দিও না।" মাতা তাঁহাকে বিদেশযাত্রা
হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য বখালাখা চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা কলবতী হইল না।
জীন মিশর যাত্রা করিলেন।

বিস্তর পথকষ্ট সহ্য করিয়া, বখালালে জীন নগরপ্রান্তে কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন। একটি মন্-
জেরের ঘাসঘেঁষে নামিয়া তিনি বিশ্রাম করিতে বসিলেন, এবং ক্রান্তিভরে অনতিবিলম্বেই নিদ্রিত হইয়া
পড়িলেন। নিদ্রাঘোরে পূর্বকথিত বৃদ্ধ আবাস তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, "বৎস, তোমার
ব্যবহারে আমি বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই, তোমার চূততা ও সাহসের পরিচয়
লইবার জন্যই আমি তোমাকে কায়রো নগরে আসিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। এ নগরে তোমার থাকিবার
আবশ্যক নাই, অগাধ ধনরত্ন বাসোয়ার রাজপ্রাসাদেই গুপ্তভাবে আছে, এত ধন আর কাহারও নাই, তুমি
বাসোয়ার প্রত্যাবর্তন কর, তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।"

এই স্বপ্নে জীন সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, তিনি জাগিয়া হতাশভাবে বলিতে লাগিলেন, "এত কষ্ট,
পথপ্রশ্রম, অনিদ্রা, আশা সকলই বিফল হইল, এই বৃদ্ধ নিশ্চয়ই প্রবঞ্চক, প্রবঞ্চনা করিয়া আমাকে এখানে
আনিয়া ফেলিয়াছে, ইহাকেই আমি মহম্মদ মনে করিতেছিলাম। কি ভ্রম! এখন বাড়ী ফিরিয়া মাকে
আমি কি বলিয়া যুথ দেখাইব? বাহা হউক, বাসোরাতেই ফিরিয়া যাই, এখানে থাকিয়া ত' কোনই ফল
নাই। সকল লোককে যে আমার স্বপ্ন-বিবরণ বলি নাই, ইহাই পয়ন লাভ, বলিলে লোকে আমাকে পাগল
মনে করিয়া উপহাস করিত।"

জীন বাসোয়ার প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাহার মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন বাছা, আশা পূর্ণ হইয়াছে?"
জীন নতমুখে কাতরভাবে তাহার দ্বিতীয়-স্বপ্ন-বিবরণ মাতার গোচর করিলেন। এতখানি কষ্ট ও যত্না
সহ করিয়া পূজকে নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে তুমিরা, মাতা দুঃখিত হইলেন, পুত্রের প্রতি
একটিও কষ্টকরব্যাক্য প্রয়োগ করিলেন না, সম্মুখে বলিলেন, "বাছা, দুঃখ করিও না, যদি আল্লা তোমার
অদৃষ্টে ধন-রত্ন লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার অজীতি সিদ্ধ হইবে। তুমি সাধুভাবে জীবন-
যাত্রা নির্বাহ কর, অসার আমোদ-প্রমোদ ও নৃত্যগীত ছাড়িয়া দাও, স্নায় মোহিনী-মায়ায় আর মুগ্ধ হইও
না। এই সকল অসার আমোদ-প্রমোদেই তোমার সর্বনাশ হইয়াছে, তাহা ত' বুঝিতে পারিয়াছ!
এ সকল তাগ করিয়া প্রজাপালনে মনঃসংযোগ কর, প্রজাপুঞ্জ বাহাতে স্তবী হয়, তাহাই কর, রাজত্ব
পালন কর, তুমি স্তবী হইবে, সম্ভেদ নাই।"

মাতার উপদেশ অনুসারে চলিয়া স্তবী হইবার জন্য জীনের আগ্রহ হইল; সেই দিন রাত্রিতে জীন
তৃতীয়বার সেই বৃক্ষকে স্বপ্নে দেখিলেন; বৃদ্ধ বলিলেন, "সাহসী জীন, এত দিনে তোমার সৌভাগ্যলাভের
সময় আসিল। উঠ, একখানি থালা লইয়া তোমার পিতার মরণোত্তর তলপেচ ধনন কর, তোমার
অজীতি সিদ্ধ হইবে।"

আশা-মরীচিক।



জীন মাতাকে এই স্বরবিবরণও বলিলেন। মাতা বলিলেন, “বাহা, এ বৃদ্ধটি দেখিতেছি সহজ লোক নহে, তোমাকে পাগল না করিয়া ছাড়িবে না, কোথাও টাকা মিলিল না, এখন ঘর খুঁজিলেই টাকা পাওয়া যাইবে। হবার তুমি বাহার কথা বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়াছ, তৃতীয়বারও তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু আমি আর ও পাগলামীতে বিশ্বাস করি না।”

জীন বলিলেন, “মা, আমিও বিশ্বাস করি না, তবে কি জান, যন্ত্রটা দেখা গেল, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি না? যদি কলিয়া যায়, এ ত আর কারোতে দৌড়াইতে হইবে না। ঘরের মধ্যে অহুসন্ধান, তাহা আর এখন কঠিন কাজ কি?”

এই কথা বলিয়া জীন মাতার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, একখানি খস্তা লইয়া, শিতার মন্ত্রণানুসারে প্রবেশ করিলেন, এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া মেজে খুঁড়িতে লাগিলেন। সমস্ত স্থান খুঁড়িয়া ফেলা হইল, কিন্তু কোথাও একটি তাম্র-মুদ্রাও পাওয়া গেল না। জীন হতাশ হইয়া বলিলেন, “দেখিতেছি, মার কাছে এবার খুব পাইব না।” কিন্তু জীন হতাশ হইলেন না, বিগুণ উৎসাহে মাটা কাটিতে লাগিলেন। সহসা ঠং করিয়া একটা শব্দ হইল; যন্ত্রা রাখিয়া আতঙ্কিতভাবে বিশেষ মনোযোগ সহকারে জীন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, একখানি একাণ্ড মার্শল পাথর। বহু কষ্টে পাথরখানি সরাইয়া ফেলিলেন;—দেখিলেন, কতকগুলি শিঁড়ি নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। শিঁড়ির সম্মুখে একটি দ্বার, দ্বারটি তালা দিয়া বন্ধ করা।

তালা ভাঙিয়া, একটি বাতি হাতে লইয়া, জীন সেই ভূগর্ভস্থ গৃহে প্রবেশ করিলেন;—দেখিলেন, সেই ভূগর্ভস্থ গৃহ ফটক-নির্মিত। তিনি আনন্দসহকারে দেখিলেন, এক দিকে কতকগুলি ময়ের পিণে সজ্জিত রহিয়াছে। বহুদিনের পুরাতন উৎকৃষ্ট মস্ত্র এত অধিক পরিমাণে দেখিয়া তাঁহার মনে বড় আনন্দ হইল। আর এক দিকে কতকগুলি কলসে বহুসংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা দেখিয়া তিনি আনন্দাতিশয়ো আত্মহারা হইলেন। জীন এক মুঠা মোহর একটা কলস হইতে তুলিয়া লইয়া, তাঁহার মাতাকে দেখাইতে চলিলেন।

রাজমাতা তাঁহার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইলেন, মোহর দেখিয়া পুত্রের কথার তাঁহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। তিনি বলিলেন, “বৎস, তোমার পিতা কবে যে এই সকল সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহা আমি কিছুই অবগত নহি। বাহা হউক, এবার আর এ সকল অর্থ অপব্যয় করিও না।” জীন বলিলেন, “না মা, বারে বারেই কি মাফ ঠকে?”

বাহা হউক, কি পরিমাণ ধনস্বর সেই শুণ্ড কক্ষে সঞ্চিত আছে, তাহা দেখিবার জন্ত জননী পুত্রের সহিত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সজ্জিত যন্ত্রের পরিমাণ দেখিয়া তিনিও আনন্দে এবং বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন। তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কক্ষের চারিদিক পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন;—দেখিলেন, এক কোণে একটি ক্ষুদ্র কোঠা রহিয়াছে, কোঠাটি খুলিয়াই তিনি একটি স্বর্ণ-নির্মিত চাবি দেখিতে পাইলেন, চাবিটি হাতে লইয়া রাজী বলিলেন, “বৎস, এখন এই চাবি পাওয়া গেল, তখন নিশ্চয়ই আরও কোথাও ধনস্বর লুকাইয়া আছে, ভাল করিয়া অহুসন্ধান কর।”

গৃহের প্রত্যেক অংশ ভর ভর করিয়া অহুসন্ধান করিতেই তাঁহারা একটি বাতায়নের পাশে একটা ছোট ছিদ্র দেখিতে পাইলেন, ছিদ্রপথে চাবিটি প্রবেশ করাইয়া অল্প চেষ্টাতেই তাঁহারা একটি শুণ্ড দ্বার উন্মোচন করিলেন। সেই দ্বারপথে মাতা ও পুত্র আর একটি সুন্দর কক্ষে উপস্থিত হইলেন। কক্ষে পদাধিপত্য তাঁহাদের চক্ষু রগলিয়া গেল, দেখিলেন, সেই গৃহে নয়টি স্বর্ণ-নির্মিত বেদী সজ্জিত রহিয়াছে। আটটি বেদীর উপর আটটি হীরক-নির্মিত পুতলিকা, এক একটি পুতলিকার অঙ্গজ্যোতিতে গৃহ উদ্ভাসিত।

শুণ্ড-ধনাগারে
স্বর্ণমুদ্রা-বাণি



হীরক-পুতুলের
দিব্য-জ্যোতি



জীন পবিত্র হয়ে বসিলেন, “হা, আরা! এক দেখিতেছি! এত বহুমুলা সামগ্রী বাবা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?” জীন একে একে সেই পুস্তলিকাগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, যতই দেখিলেন, ততই বিম্বিত হইলেন। অবশেষে নবম বোয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, তাহার উপর হীরক-নির্মিত স্তম্ভের পরিবর্তে একখানি পাত্র একখণ্ড সাতিনের উপর সরেকিত রাখিয়াছে। পাত্র দেখিয়া তাঁহার বিষয় সম্বন্ধে বর্ধিত হইল। তিনি পাত্রখানি গুলিয়া পাঠ করিলেন। তাহাতে লিখিত আছে—“পুত্র, আমি বহু পরিশ্রমে ও চেষ্টাধ্বরে এই কয়েকর আটটি পুস্তলিকা সংগ্রহ করিয়াছি, পুস্তলিকাগুলি যে বহুমুলা ও বহু ধরে মুগ্ধিত, তাহা দেখিয়াই মুগ্ধিত পারিবে, কিন্তু ইহাদের অপেক্ষাও অধিক মূল্যবান এবং অধিক মূল্যের পুস্তলিকা আছে, সেই পুস্তলিকাটি এতদূর অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক মূল্যবান। যদি তুমি সেই পুস্তলিকা হস্তগত করিবার ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে কাররোনগরে যাত্রা করিতে হইবে। সেখানে আমার একটি দাস আছে; তাহার নাম “মবারক”, মবারককে খুঁজিয়া বাহির করিতে তোমার কোন কষ্ট হইবে না। যে কোন লোকের সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইবে, সেই তোমাকে মবারকের কথা বলিতে পারিবে। মবারকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে, তোমার পরিচয় পাইবার জন্য তোমাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইবে, সেখানে এই প্রকার মুষ্টি দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহা লাভ করিতে হইবে, তাহা তোমাকে মবারকই বলিয়া দিবে।”

স্বর্ণ-
বেদিতে
হীরক-
প্রতিমা



জীন মাতার সম্মতিগ্রহণ করিয়া কাররোনগরে যাত্রা করিলেন; তাহার মাতা তাঁহার অনুপস্থিতকালে রাজকর্ম পরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন।

কাররোনগরে উপস্থিত হইয়া জীন মবারকের অহুসন্ধান করিলেন। তিনি জানিতে পারিলেন, মবারকট কাররোনগরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক ধনবান। বিদেশী লোকের লব্ধ তাহার গৃহস্থায় সর্বদা উল্লুখ থাকে। জীন মবারকের ঘরে উপস্থিত হইয়া প্রহরীকে বলিলেন,—“আমি একজন অপরিচিত বিদেশী লোক, তোমার প্রভু মবারকের স্মরণ শুনিয়া তাঁহার অভিব্যক্তি হইতে আসিয়াছি।” প্রহরী মবারকের কাছে জানিয়া আসিয়া জীনকে সঙ্গে লইয়া গেল।

মহারাজ জীনের পরিত্যক্ত জিজ্ঞাসা করিলে, জীন বলিলেন, “আমি বাসোরা-রাজপুত্র—জীন আলাস-নাম।” মহারাজ বলিলেন, “তিনি পূর্বে আমার প্রভু ছিলেন, অনেক দিন আমি তাঁহার দাসত্ব করিয়াছি, তাঁহার কোন পুত্র ছিল, এরূপ আমার জানা নাই।” জীন বলিলেন, “আপনি কত দিন কাজ ছাড়িয়া বাসোরা হইতে এখানে আনিয়াছেন?” মহারাজ বলিলেন, “আজ বাইশ বৎসর।” জীন বলিলেন, “আমার বয়স বিশ বৎসরের অধিক হয় নাই; হুতরাং আমার জন্মের পূর্বেই আপনি আমার পিতার চাকরী পরিত্যাগ করিয়া আনিয়াছেন, সেই জন্যই আমার সবচেঁহে আপনি কোন কথা অবগত নহেন।”—মহারাজ বলিলেন, “আপনি যে তাঁহার পুত্র, তাহার কোন প্রমাণ দিতে পারেন?” জীন বলিলেন, “পারি, তাঁহার একটি গুপ্ত ধনাগার সম্ভ্রান্তি আমি আবিষ্কার করিয়াছি, তাহার মধ্যে বহুধন্যাক্ষ স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ কলস পাইয়াছি, এতদ্বির স্বর্ণবেলীতে আটটি হীরকনির্মিত পুতলিকা পাইয়াছি, নবম-বেলীর উপর পুতলিকা নাই, সাদিনে সংরক্ষিত একখানি পত্র পাইয়াছি,—পিতার পত্র, সেই পত্রে নবম মূর্তি কোথায় পাওয়া যাইবে, তাহার লক্ষ্য আপনার কাছে আনিবার উপদেশ আছে।”

আত্ম-পরিচয়ের
নিদর্শন
↑
↓
↑

এই কথা শুনিয়া মহারাজ জীনের পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া বলিলেন, “জ্ঞানকে ধন্যবাদ! তিনিই আপনাকে এইখানে আনিয়াছেন। আমি এখন বিশ্বাস করিলাম যে, আপনি বাসোরাধিপতির পুত্র। কোথায় সে মূর্তি পাওয়া যাইবে, তাহা আমি জানি। আমি আপনাকে সেই স্থানে লইয়া যাইব, তবে আপনি দীর্ঘপথপাশ্চাতে বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, দিন কয়েক বিশ্রাম করুন, তাহার পর দেখানে যাওয়া যাইবে। আজ আমি কার্যরোবাসী সম্রাট ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই ভোজনপায়ে উপস্থিত আছেন, আপনি আসিয়া যোগদান করুন।” জীন সম্মতি হইয়া মহারাজের সহিত ভোজনপায়ে প্রবেশ করিলেন। জীন আসনে উপবেশন করিলে মহারাজ তাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলেন, দেখিয়া কার্যরোবাসীর লক্ষপতিগণের বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, “এই অপরিচিত লোকটি কে?—তারক ইহার পদসেবা করিতেছেন কেন?”

মহারাজ নিমন্ত্রিত ভ্রাতৃলোকগণের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “মহাশয়গণ, আমার ব্যবহারে আপনারা বিষয়প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু আমার কথা শুনিলেই আপনারদের বিশ্বাস তিরোহিত হইবে। আমি মহারাজ, বাসোরার অধীশ্বরের ক্রীতদাস ছিলাম, তিনি আমাকে ক্রয় করিয়াছিলেন, আমাকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার পূর্বেই—তাঁহার মৃত্যু হয়; হুতরাং আমি এখনও দাস। আমার জীবন ও অর্ধগম্বদ সমস্তই আমার প্রভুপুত্রের সামগ্রী, এই সুবক আমার সেই মৃত প্রভুর একমাত্র পুত্র। ইনিই এই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী।”

আদর্শ
প্রভু-ভক্তি
↑
↓
↑

জীন মহারাজের কথা শুনিয়া বলিলেন, “মহারাজ, আমি এই সকল ভ্রাতৃলোকের সম্মুখে তোমাকে আমার দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিলাম, তোমায় বিষয়সম্পত্তিতে আমার যে কিছু অধিকার আছে, তাহা আমি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিলাম। আমাকে তোমার লক্ষ্য আর কি করিতে হইবে, বল?” মহারাজ পুনর্বার জীনের পদসেবা চুকন করিয়া তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, এবং স্বাধীনতা লাভ করিয়া তিনি বিশেষ আনন্দান্বিতব করিলেন।

পরদিন জীন মহারাজকে বলিলেন, “আমায় যথেষ্ট বিশ্রামগ্রহণ করা হইয়াছে, এখন নির্দিষ্ট কার্যে যাত্রা করা যাউক।”—মহারাজ পথের বিপদের কথা জানাইলেন; কিন্তু কোন বিপাক্ষরই জীন কাতর হইলেন না, তখন জীনকে লইয়া মৃত্যুরাজ তাঁহার পদসেবা স্থানে যাত্রা করিলেন। অনেক দিন ধরিয়া

তাহাদিগকে চলিতে হইল। অবশেষে একটি নির্জন বৃক্ষচ্ছায়াসমাজের প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া মবারক ও জীন
অব্র হইতে অবতরণ করিলেন। মবারক ভৃত্যগণকে বলিলেন, “আমাদের জিনিষপত্র লইয়া তোরা এখানে
অপেক্ষা কর, আমরা শীঘ্র কিরিয়া আসিব।”—অনন্তর তিনি জীনকে সোধান করিয়া বলিলেন, “আম্রন
মহাশয়, আমাদিগকে এখন সেই জন্মাবস্থানে বাইতে হইবে। আপনি সাহস অবলম্বন করুন।”

চলিতে চলিতে উভয়ে একটি হ্রদের ধারে উপস্থিত হইলেন। মবারক তীরে উপবেশন করিয়া
রাজাকে বলিলেন, “এখন আমাদিগকে এই হ্রদ পার হইতে হইবে।” জীন বলিলেন, “পার হইবার
উপায় ত কিছু দেখিতেছি না, কিরূপে পার হইবে?” মবারক বলিলেন, “দৈত্যরাজের একখানি
মায়াতরঙ্গী এখনই আপনাকে লইবার জন্ত আসিবে। কিন্তু আপনাকে আমি যে উপদেশ প্রদান করিব,

তদমুদারে না চলিলে আপনার সর্ক-
নাশ হইবে। আপনি নৌকায় উঠিয়া
নিরীক্ষা বসিয়া রহিবেন, একটি-
মাত্র কথাও বলিবেন না; যদি
আপনি ভয়ে কি বিষয়ে বা অজ্ঞ যে
কোন কারণেই হউক একটি কথাও
উচ্চারণ করেন, তাহা হইলে নৌকা
জলে ডুবিয়া বাইবে।”—জীন বলি-
লেন, “আমি একদম চুপ করিয়া
বসিয়া থাকিব, তুমি কোন চিন্তা
করও না। তুমি আমাকে যেক্রপ
পরামর্শ দিবে, আমি তদমুদারেই
কাজ করিব।”

এই সকল কথা চলিতেছে, এমন
সময় কোন অদ্ভুত কুল হইতে একখানি



মায়াতরঙ্গী আসিয়া ধীরে ধীরে তীরস্থ হইল। নীলবর্ণের নৌকায় লাল চন্দনকাঠের মাশুল। একটি অদ্ভুত
প্রাণী নৌকাখানি চালাইতেছে—সে একাই দাঁড়ী, মাঝি সব—কিন্তু সেই মায়াতরঙ্গীর কর্ণধার মাহুদ নহে।
বায়ুদেহে হস্তিমুণ্ড যুড়িলে বেগুন দেখায়, কর্ণধারের মুষ্টি তরুণ। সেই অদ্ভুত জোনায়ার ভেঁড়ে ধরিয়া
মবারক ও জীনকে নৌকার উপর তুলিল, এবং চকুর নিমিষে তাহাদিগকে হ্রদের অপর প্রান্তে লইয়া গেল।
তাহাদিগকে তীরে নামাইয়া দিতেই নৌকা ও নৌকার কর্ণধার অদ্ভুত হইয়া গেল।

মবারক তীরে উঠিয়া বলিলেন, “এখন আমরা কথা কহিতে পারি। এই বীশের অধিবাসী দৈত্যাদিগণিত স্বয়ং।”
উভয়ে বিমরপূর্ণ দৃষ্টিতে সে বেশের অদ্ভুত বৃক্ষলতা, বিচিত্র বিহঙ্গম-দল, অদৃষ্টপূর্ব অতি সুদৃষ্ট পুষ্পশ্রেণী দেখিতে
লাগিলেন, এমন দৃষ্ট তাহারা আর কোথাও দেখেন নাই। সেই সুমধুর, সুন্দর দৃষ্ট তাহাদের পঞ্চম অঙ্গগত
হইল, সুমিষ্ট গন্ধ বহিয়া যে বায়ু হিম্মোলিত হইতেছিল, তাহা তাহাদিগের ঘেহে সবজীবনের লগ্নার করিল।

উভয়ে অদূরে দেখিলেন, একটি মরকত-প্রাণাল, তাহার চকুদিকে গড়, গড়ের তীরে বৃক্ষশ্রেণী প্রাণালটিকে
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। গড় পার হইয়া প্রাণালে বাইবার জন্ত যে পাঁচটি রহিয়াছে, তাহা মন্তের

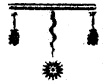
আমরা
তরঙ্গীর
অদ্ভুত
কাহিনী

দৈত্যপতির
রম্য-প্রাসাদে

একখানি শব্দনির্দিষ্ট। দেউতীট উজ্জল-বর্ণনির্দিষ্ট। সীকোর নিকট একদল দৈত্য গ্রহরী কার্য করিতেছে, এই গ্রহরীগুলি বেদন দীর্বাকার, তেমনই ভীষণদর্শন। তাহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পৌহদগু হস্তে লইয়া দুর্গম্বার রক্ষা করিতেছে।

মবারক বলিলেন, “আর অগ্রসর হইলে দৈত্যহস্তে গ্রাস হইবে। বাহাতে ইহারা এখানে আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, সে জন্ত আমাদের কিছু তুচ্ছ-তাকের আশ্রয় লওয়া দরকার।” হুইখণ্ড পীতবর্ণ কিতা বাহির করিয়া মবারক তাহা নিজের কটিদেশে লুকাইলেন; আর হুই খণ্ড সেই জাবে জীনের দেহে লুকাইয়া দিলেন। তাহার পর একখানি বিতীর্ণ গালিচা প্রসারিত করিয়া, তাহার উপর নানাবিধ ফুলবান্ প্রস্তরাদি, মৃগনাভি, ধূপ প্রভৃতি রাখিয়া, মবারক জীনের বলিলেন, “আমি দৈত্যরাজকে এখানে উপস্থিত করিব, আমার আশা আছে, তিনি বিশেষ বিরক্তভাবে প্রকাশ করিয়া এখানে আসিবেন না। কিন্তু ভয়ের বশেষ্টে কারণও আছে। যদি তিনি আমাদিগের এই রীপে উপস্থিত হওয়া অপ্রীতিকর মনে করিয়া থাকেন, তবে তিনি অতি ভয়ঙ্কর মূর্তিতে আমাদের সম্মুখে আসিবেন। যদি তিনি ইহা সঙ্গত জ্ঞান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অতি রূপবান্ মহাশয়ের মূর্তিতে দর্শন দিবেন। তিনি এখানে উপস্থিত হইলে আপনি আসনের উপর দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার অভ্যর্থনা করিবেন, কিন্তু কদাচ আসন ত্যাগ করিবেন না। আসন ত্যাগ করিলে আপনার মৃত্যু অনিবার্য। আপনি দৈত্যরাজকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিবেন, ‘হে দৈত্যরাজ, আপনার ভৃত্য আমার পিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে বেল্লগ্ন অহুগ্ৰহ করিতেন, আমার প্রীতিও সেই প্রকার অহুগ্ৰহ করুন।’ দৈত্যরাজ যদি দ্বিজাগ্না করেন, ‘আপনি কি অহুগ্ৰহের প্রার্থনা করেন’ তাহা হইলে আপনি নবম মূর্তি চাহিবেন।”

দৈত্যরাজের
আবির্ভাব



মবারক জীনের এই উপদেশ দান করিয়া, একজালিক অহুঠান আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহাদের সম্মুখে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎসুরগ আরম্ভ হইল, অন্ধকারে ধীপ আচ্ছন্ন হইল।

জীন ভয়ানক ভীত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু মবারক তাঁহার ভয় দূর করিয়া বলিলেন, “আপনি নিশ্চিন্ত হউন, এ সকল কুলক্ষণ নহে।” দৈত্যরাজ একটি পর-রূপবান্ হুবা পুরুষের মূর্তি ধারণ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

দৈত্যরাজ সহস্বে বলিলেন, “বৎস, আমি তোমার পিতাকে ভালবাসিতাম, তিনি বতবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, তববারই আমি তাঁহাকে এক একটি হীরকময়ী মূর্তি দান করিয়াছি। তোমার প্রতিও আমার মেহ অল্প নহে; তোমার পিতার মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে আমি তাঁহাকে মাটিনের উপর একখানি পত্র লিখিয়া রাখিতে অহুরোধ করিয়াছিলাম। সেই পত্র পাঠ করিয়া তুমি এখানে আসিয়াছ। আমি তোমার পিতার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমি তোমাকেও অহুগ্ৰহ করিব, এবং তোমার হস্তে নবম-মূর্তি প্রদান করিব। আমিই বৃদ্ধের মূর্তিতে তোমাকে বশ দিয়াছিলাম। তোমার গুণ্ডধনের সন্ধান আমিই তোমাকে বলিয়া দিয়াছি। তুমি এখানে কেন আসিয়াছ, তাহা আমি জানি, তুমি বাহা দইতে আসিয়াছ, তাহা পাইবে, কিন্তু ইহা পাইবার পূর্বে তোমাকে একটি অলীকায় আবদ্ধ হইতে হইবে, তুমি লপণ করিয়া বল, আমাকে একটি পঞ্চদশবর্ষীয়। হুম্বরী নববৃত্তী আনিয়া দিবে, কিন্তু এই বৃত্তী সম্পূর্ণ প্রণবিকারশূন্য হইবে, পরপুরুষের সন্তবে কখন আসে নাই, কোন পুরুষের রূপ চিত্তপটে অঙ্কিত হয় নাই, এমন বৃত্তীকে আনিতে হইবে, বৃত্তী অসাদারণ হুম্বরী হইবে, এবং তাহাকে এখানে আনিবার সময় তোমার মন তাহার প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইবে না, তুমি নিতেপ্রিয় অবস্থায় তাহাকে এখানে আনিব কর্ণবে।”

হুম্বরী-
উপচৌকেনে
অহুগ্ৰহ-
আধাস



সত্য-পরীকার
আলৌকিক
আয়না।



জীন তৎক্ষণাৎ এই কঠিন প্রতিজ্ঞার আবদ্ধ হইলেন, তাহার পর দৈত্যরাজকে বলিলেন, “কিন্তু মহাপুত্র, আমি কিরূপে যুবতীর মনের ভাব পরীক্ষা করিব? আমি যাহাকে মনোনীত করিব, সে যদি পরপুরুষের অঙ্গুরঙ্গি হয়, যদি সে গোপনে কখন তাহার দেহ ও সৌন্দর্য্য অপরকে দান করিয়া থাকে, তাহা জানিবার উপায় কি?” দৈত্যরাজ বলিলেন, “আমি তোমাকে একখানি আয়নী দিতেছি, তাহার চরিত্র পরিবর্তন হইবে, এই আয়নাকে তাহার প্রতিবিম্ব অত্যন্ত অপরিকার দেখাইবে। কেবল পবিত্রচারিত্র প্রণয়জানবিরহিতা যুবতীর মুখমণ্ডলই এই মুহুর্তে অতি পরিষ্কৃত ও উজ্জলরূপে দেখা যাইবে। যদি তুমি এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণবধ করিব। তোমাকে অল্পগ্রহ করি বলিয়া ক্ষমা করিব না।” জীন এই প্রস্তাবে সন্মত হইলেন। দৈত্যরাজ জীনের হস্তে একখানি আয়নী প্রদান করিলেন। অনন্তর জীন ও মবারক দৈত্যরাজের নিকট বিদায় লইয়া হ্রদের তীরে উপস্থিত হইলেন; তাঁহাদিগকে পরপারে লইয়া যাইবার জন্ত ময়াতরঙ্গী পুনর্বার তাঁহাদিগের নিকটে আসিল। তাঁহারা তরঙ্গিতে উত্তীর্ণা চক্ষুর নিম্নে হ্রদ পার হইলেন।

জীন আলাসলাম করেকদিন মবারকের গৃহে অবস্থান করিয়া পঞ্চাশতি দূর করিলেন। তাহার পর জীন মবারককে বলিলেন, “এখন ত’ আমাদের বোণাদে প্রত্যাগমন করা উচিত, একটী স্নানরীকে সংগ্রহের জন্ত এখন হইতেই চেষ্টা করিতে হইবে।” মবারক বলিলেন, “আমরা কারো নগরে এমন যুবতী মিলাইতে পারিব না, ইহার জন্ত আবার বোণাদে যাইতে হইবে?”

জীন বলিলেন, “কিরূপে এই যুবতী সংগ্রহ করা যাইবে?” মবারক বলিলেন, “আমি একটি বৃদ্ধকে জানি, সে এ সকল বিষয়ে বড় হুনিপূর্ণ, তাহার হস্তে ভার দিলেই সে সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিবে।”

বৃদ্ধা মবারকের আদেশে প্রতিদিনই নব যুবতীদলকে লইয়া জীনের নিকট উপস্থিত করিতে লাগিল। তাহাদের অনেকেই পরমা স্নানরী, কিন্তু দর্পণে তাহাদিগের মুখ দেখিবার দর্পণ অপরিস্রব হইয়া উঠিতে লাগিল, রাজশ্রাদ্ধস্থ বহুসংখ্যক যুবতীরও পরীক্ষা হইল, কিন্তু সত্যের পরীক্ষায় কেহই উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। জীনের আশা পূর্ণ হইল না। তখন অগত্যা তিনি মবারককে সঙ্গে লইয়া বোণাদে যাত্রা করিলেন।

বোণাদে উপস্থিত হইয়া জীন ও মবারক একখানি অতি সুবৃহৎ প্রাঙ্গণ তুল্য ষ্ট্রাটিকা তৈরি করিলেন। এখানে তাঁহারা অতি সমারোহের সহিত কানধাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দানশীলতায় বহুলোক তাঁহাদিগের বাধা হইল, বহুলোককে তাঁহারা অর্থদান করিতে লাগিলেন।

নগরের এই অংশে একজন ইমাম বাস করিতেন, তাঁহার নাম বোবেকির মিউজিন। লোকটি বড় অহঙ্কারী ও হিংস্রপ্রকৃতি ছিলেন; দরিদ্র ছিলেন বলিয়া তিনি ধনিগণকে ঘৃণা করিতেন, জীন আলাসলামের দয়া, দানশক্তি ও অর্থ-প্রাচুর্যের সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি তাঁহার হিংসা করিতে লাগিলেন। এক দিন মসজিদে তিনি নামাজ করিতে গিয়া অজ্ঞাত মুলমানগণকে বলিলেন, “এই যে লোকটা অজ্ঞ প্রার্থনা করিতেছে, তুমি দেখি, সে বড় চোর, তাহার নিজের দেশে চৌধুরিত্তি বারা বহু অর্থব্যয় করিয়া এখানে আমাদের আজ্ঞাদে সেই অর্থব্যয় করিতেছে; খালিকের নিকট তাহার কথা উপস্থাপন করা উচিত; নতুবা পরে খালিকের নিকট আমাদেরকেই দণ্ডভোগ করিতে হইবে।”—বোবেকির মিউজিন বাহা বলিলেন, অজ্ঞাত লোক তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল। তাহারা বলিল, “এমন দুষ্ট লোকের কথা খালিককে জানান আবশ্যক বটে।”—ইমাম বাব্বী ফিরিয়া সকল সংবাদ খালিকের নিকট গোচর করিবার জন্ত দরখাস্ত লিখিতে বলিল।



সে দিন মবারক ও সেই মসজিদে উপাসনার সময় উপস্থিত ছিলেন, তিনি ইমামের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া ছিলেন। মবারক পাঁচশত স্বর্ণ-মুদ্রা একখানি রুমালে বাঁধিয়া এবং স্নেহবানি উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র লইয়া, ইমামের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইমাম তাঁহাকে দেখিয়া রুত্বের বলিলেন, “তুমি কি চাও?” মবারক বলিলেন, “আমি আপনার প্রতিবাদী ও তৃত্য। হুলতান জীনের নিকট হইতে আমি আপনার বহুবিধ স্নেহের কথা অবগত হইয়াছি; তিনি আপনার সহিত পরিচিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং আমাকে সিরা কিং উপহার পাঠাইয়াছেন, অল্পগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন।” ইমাম এই কথা শুনিয়া ভারী খুশী হইলেন, মবারকের হস্ত হইতে উপহার গ্রহণ করিয়া বলিলেন, “হুলতান সাহেবকে আমার সেলাম দিবেন, এতদিন পর্যন্ত আমি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইতে পারি নাই, এজন্য বড় লজ্জিত আছি। আমি আগামী কল্যাই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব।”

মুখবন্ধের ঠগ

প্রয়োগ



পরদিন উপাসনার পর বোবেকির মসজিদে সমাগত ব্যক্তিগণকে বলিলেন, “কাল আমি যে অপরিচিত বড় লোকটিকে চোর মনে করিয়াছিলাম, তিনি প্রকৃতই বড় ভদ্রলোক। তিনি কেবল হুলতান নহেন, অনেক সঙ্গুণের আকর। তাঁহার ভ্রাতৃ সংলোকের বিরুদ্ধে হুট লোকেরা নানা অপবাদ রটাইয়াছিল, বস্তুতঃ সেই মিথ্যা অপবাদের উপর নির্ভর করিয়া, তাঁহার ভ্রাতৃ লোকের লব্ধে খালিফের নিকট মন্যকথা বলিলে বড়ই অর্থহীন হইবে, পরে আমাদিগকে দণ্ডিতও হইতে হইবে।”

লোকগণ ইমামের কথা শুনিয়া বলিলেন, “হাঁ, ইচ্ছাই কর্তব্য বটে, এমন সংলোকের বিরুদ্ধে কোন কথা খালিফের গোচর করা সঙ্গত হইবে না।” বোবেকির উপাসনা অন্তে গুহে প্রত্যাপন করিয়া, জীনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। কথায় কথায় বোবেকির জীনের দ্বিজ্ঞান করিলেন, “আপনি কি দীর্ঘকাল বোন্দাদ নগরে বাস করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন?” জীন বলিলেন, “আমি একটি হুলদী সুবতীর সন্ধান আছি, তাহাকে সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমি এই নগর পরিত্যাগ করিব।” বোবেকির বলিলেন, “কিরূপ সুবতীর সন্ধান আছেন? লক্ষ লক্ষ সুবতী এ নগরে আছে, তাঁকা ফেলিলে হুলদী সংগ্রহে কি কষ্ট?” জীন বলিলেন, “আমি যে সুবতীর সন্ধান করিতেছি, সে কিছু অন্যায় প্রকৃতির হুলদী। বয়স পনের বৎসর হওয়া চাই, চরিত্র অতি নির্মল হইবে; কেবল তাহাই নহে, তাহার কিছুমাত্র প্রণয়ের অভিজ্ঞতা থাকিবে না, ভালবাসা কি সামগ্রী, তাহা সে জানিবে না, অথচ পঞ্চদশবর্ষীয়া অল্পমাত্র হুলদী হওয়া আবশ্যক।” ইমাম বলিলেন, “আপনি অতি ছদ্মশ্রী বিবয়ের সন্ধান কিরিতেছেন, কৃতকাণ্ড হইবেন কি না, বলিতে পারি না; কিন্তু আমি একটি সুবতীকে জানি। তাহার পিতা পূর্বে উজীর ছিলেন, এখন রাজকাণ্ড হইতে অবসর লইয়াছেন, কড়াটিকে পালন করাই এখন তাঁহার প্রধান কাজ হইয়াছে, সপায়ের আর কোন বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য নাই। সেই বুদ্ধের সঙ্গে আমি এ সন্ধে কথা বলিতে পারি—আপনার ভ্রাতৃ জামাতা পাইলে তিনি বিশেষ স্নেহী হইবেন, সন্দেহ নাই।” জীন বলিলেন, “আমি সেই সুবতীকে পরীক্ষা না করিয়া অবশ্যই তাহাকে বিবাহ করিব না। সুবতীর সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে আমি আপনার কথাই বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু তাহার সাধুতা-সম্বন্ধে আমি বয়স পরীক্ষা করিয়া লইব।” বোবেকির বলিলেন, “আপনি কি প্রমাণ চান?” জীন বলিলেন, “আমি তাহার মুখ দেখিব, তাহা হইলেই আমি বুঝিতে পারিব, সুবতী প্রকৃত ধর্ম্মশীল কি না, অল্প প্রমাণের আবশ্যক নাই।” ইমাম হাসিয়া বলিলেন, “তাহা হইলে আপনি মুখচেনা-বিভার বিশেষ পারদর্শী বলিয়া বোধ হইতেছে। বাহা হউক, আমি সেই সুবতীর পিতাকে আপনার অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিব, সুবতীর ভ্রাতৃ কন্ডার মুখ আপনাকে দেখাইতে, বোধ করি, তাঁহার আগতি হইবে না।”

সুন্দরী

চরিত্র বাচাই



কুমারসোকেব
মধুর্যা

হাসনে কীটক শইরা উজীরের গৃহে বাত্রা করিলেন। উজীর ইমানের দূখে জীনের কণ ও সম্পত্তির পরিচয় করিয়া, তাঁহার হাতে কড়া সম্প্রদান করিতে উৎসুক হইলেন। উজীরকতা তাঁহার সমুখে আনীতা হইলেন, জীনের সমুখে আসিয়া বুঝতী অবতর্জন শুরু করিয়া পাড়ালেন। জীন বিষয়পূর্ণচিত্তে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করিলেন। রাশপুত্র এমন অপূর্ণ সৌন্দর্য্য কখনও দেখেন নাই। ভরুণীর বীর্য্যবত নয়নে কুমারসোকেব মধুর্যা উজ্জ্বলিত হইয়া উঠিতেছিল। প্রথম-বোঝনের জোয়ার তবীর দেহতটে অপূর্ণ আবেগে প্রতিফলিত হইতেছিল। বুঝক রূপকোষিতে মোহাঝি হইলেন। তাহার পর তাঁহার রূপদর্শনের আগ্রহ মিটিলে তিনি দৈত্যপ্রদত্ত দর্পণ তাঁহার সমুখে ধরিলেন। রূপসীর রূপশোভা

দর্পণে শতভাবে প্রতিফলিত হইল।
দর্পণ মলিন হইল না।

জীন এই বুঝতীকে মহাসমারোহে বিবাহ করিলেন। বিবাহ শেষ হইলে মবারক বলিলেন, “আর আমাদের বোম্বাদ নগরে থাকিবার কেন আবশ্যক দেখি না, এখনই কায়রো বাত্রা করিতে হইবে, দৈত্যরাজের নিকট আপনি যে প্রতিকার আবেদ, তাহা অবিলম্বে পূর্ণ করুন, ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবদার।”

জীন বলিলেন, “সে কথা আমার মনে আছে, চল, কায়রো অভিমুখে বাত্রা করি, কিন্তু তোমাকে একটা কথা বলি, দৈত্যরাজের ক্ষত্র আমাকে সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতে হইতেছে না, এই হুমকীকে অবিলম্বে বাসোয়ার

নইয়া গিয়া আমার সিংহাসনে বসাইতে ইচ্ছা হইতেছে, এমন হুমকী আমি আর দেখি নাই।”

মবারক বলিলেন, “প্রভু, ও বাসনা পরিত্যাগ করুন, মনে প্রণয়ের সঞ্চার হইয়া থাকিলে তাহা দমন করুন, বতই কর্ত্তন হউক, আপনায় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে হইবে।”

জীন বলিলেন, “মবারক, তবে জুদি এই বুঝতীকে আমার সমুখে আর কখন আসিতে দিও না, সে রূপ যেন আর দেখিতে না হয়, আমি তাহাকে বতচুকু দেখিয়াছি, তাহাতেই আমার চিত্ত বিচলিত হইবার উপক্রম হইয়াছে, অতঃপর তাহাকে দেখিলে আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিব না।”

মবারক ও জীন বুঝতীকে লইয়া কায়রো নগরে উপস্থিত হইলেন, এবং তথা হইতে দৈত্যরাজের দীপাভিমুখে বাত্রা করিলেন। বুঝতী বিবাহের পর আর জীনকে দেখিতে পায় নাই, সে মবারককে জিজ্ঞাসা করিল, “আমরা আমার বামীর রাজ্যে কখন উপস্থিত হইব? পশকি হুদাইবে না?” মবারক বলিলেন, “উজীরকতা, এখন আপনায় নিকট আমি প্রকৃত রহস্ত ভেদ করিতেছি। আপনাকে

সৌন্দ-
র্য্যের
উদ্দেশ্য-
পনা



بسم الله الرحمن الرحيم

সুন্দরী
উপহারের
বর্ণাধেনা।

ଶୁକ୍ରବାର
 ପ୍ରେମ-ପ୍ରତିମା


[୩୨୯]



তোমার এই কথায় যে সকল পুণ্ডলিকা আছে, এটি সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" মৈত্রেয়্যাজ্ঞ অতঃপর জীমকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুবন্ধু, আমি জানি, তুমি কি কষ্টে তোমার দুর্লভ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ; তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি, কিন্তু আমাকে এ কথাও স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যেরূপ অবিকৃত-রূপে তোমাকে এই প্রোক্তাশালন করিতে বলিয়াছিলাম, তাহাতে তুমি সন্মত হও নাই। আমি মনুষ্য-জন্মের দুর্লভতার কথা জানি, তুমি বহুটুকু সাধুতা ও সংযম প্রদর্শন করিয়াছ, মনুষ্যমাধ্য তাহাও দুর্লভ। এই সুবতী তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, আমি ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে স্নেহ করিবে, চিরজীবন ইহার প্রতি অহরন্তর রক্ষিবে। আমি ইহার জীবনের সাধুতা ও পবিত্রতার জন্ত দায়ী রহিলাম।" মৈত্রেয়্যাজ্ঞ এই কথা বলিয়া বিবাহ গ্রহণ করিলেন, জীমের আনন্দের সীমা রহিল না, তিনি সেই দিনই সুবতীকে মহিষী-পদে অভিষিক্ত করিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এই দম্পতি পরমসুখে বাসোন্ময় রাজ্য করিলেন।

শাহারজাদী এই গল্প শেব করিয়া, স্থলতানের নিকট আর একটি গল্প বলিবার জন্ত অহুমতি প্রার্থনা করিলেন। স্থলতান শাহারিজাদার তাঁহাকে অহুমতি দান করিলে, তিনি খোদাদাদ ও তাহার স্নাতগণের এবং দরিয়াবাসের রাজকন্ডার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু রাত্রি প্রভাত হওয়ায় অগত্যা সে দিন তাহা বন্ধ রাখিতে হইল, পরদিন তিনি সেই কাহিনী পুনরাবৃত্ত করিলেন।



খোদাদাদ ও
দরিয়া-
বাসের
রাজ-
কন্ডা

পূর্বকালে দিয়ারবকর নামে এক রাজ্য ছিল, সে রাজ্যের রাজা নানা গুণে বিভূষিত ছিলেন। প্রজাগণ তাঁহাকে পিতার ভায় তক্তি করিত, তিনি তাছাদিগকে পুত্রের ভায় স্নেহ করিতেন; রাজ্যে কাহারও কোন অভাব ছিল না, কিন্তু রাজার এক গুরুতর অভাব ছিল। রাজা মহাশয় তাঁহার অন্তঃপুরে শত শত সুন্দরী সুবতীকে পত্নীভাবে রাখিলেও তাঁহাদের কাহারও গর্ভে তাঁহার পুত্র জন্মিল না। পুত্রোন্মাদে নরপতি বড়ই বিষম্ব হইয়া রহিলেন; নিদারুণ মনোঃক্লমে তাঁহার দিনপাত হইতে লাগিল। তিনি দিয়ারাজি আদ্যার নিকট সন্তানের জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, এক জন দেবদূত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "বৎস, এত দিনে তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে, তুমি বাহা চাহিতেছ, তাহাই পাইবে। তুমি নিদ্রাভঙ্গের পরই নমাজ আরম্ভ করিবে, তাহার পর তোমার প্রাদেশ-নরিকটবর্তী বাগানে প্রবেশ করিয়া, মালাীকে আহ্বান করিবে, তাহাকে একটি সুশুক দাড়িধর দিতে বলিবে, সেই দাড়িধরের কয়েকটি দানা ভক্ষণ করিলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে।"

রাজা নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র স্বপ্ন স্মরণ করিয়া, উপাসনা করিতে বসিলেন। উপাসনান্তে তিনি বাগানে উপস্থিত হইয়া মালাীর নিকট দাড়িধর সংগ্রহ করিয়া, তাহার পকাশটি দানা গণিয়া ভক্ষণ করিলেন। রাজার পকাশটি বিবাহিতা স্ত্রী ছিল, এই দাড়িধরী ভক্ষণের পর, তাঁহার উপপকাশটি দ্রষ্ট্রী গর্ভবতী হইলেন, কেবল একটি রাগির গর্ভ হইল না। এই রাগিটির নাম কিরোজ। রাজা এই রাগির উপর বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আজ্ঞা রাজপুত্রের জননী হইবার যোগ্যতা এই পিশাচীকে দান করেন নাই,

ইহাকে জীবিত রাখিয়া কোন্‌ই লাভ নাই। আমি ইহার প্রাণবধ করিব।" রাজা এই সকল কর্তব্য পরিত্যক্ত করিলেন, এমন সময় উজীর বাধা দান করিলেন। তিনি রাজাকে প্রবেশ দান করিয়া বলিলেন, "সকল ক্রীতদাসের মেহের অবস্থা একরূপ নহে, এই রূপেও কালে গর্ভবতী হইয়া রাণপুত্রের জননী হইতে পারেন, অতএব আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন।" রাজা অনেক চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে আমি তোমার অহরোধে উহার জীবনদান করিলাম, কিন্তু উহাকে আর আমি আমার প্রাণদানে বাস করিতে দিব না। উহার উপর আমার কৃপা জন্মিয়া গিয়াছে।" উজীর বলিলেন, "তবে উহাকে আপনি রাজভ্রাতা নামেরে নিকট পাঠাইয়া দিন।" রাজা এই পরামর্শ সন্তোষে ক্রিয়া করিয়া কিরোজা বেগমকে নামেরে নিকট পাঠাইলেন। তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন, "এই রমণীকে বধোচিত বস্ত্রের সহিত রক্ষা করিবে, যদি তাহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে অবিবাহে আত্মকে জানাইবে।"

বেগম-
নির্ভাসন



কিরোজা বেগম নামেরে রাজধানীতে উপস্থিত হইবার অল্পকালমধ্যেই তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইল, অতএবে কিরোজা একটি পরম সুন্দর, সুলক্ষণযুক্ত পুত্র যথাকালে প্রসব করিলেন। নামের অবিবাহে নিয়মবদ্ধ রাজ্যের অধীশ্বরকে সে সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজা নামেরকে তত্ত্বেরে লিখিলেন, "প্রিয় ভ্রাতঃ, আমার রাজ্যীগণ সকলেই এক এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন, সুতরাং রাণপুত্রীতে একেবারে অনেকগুলি শিশুর আবির্ভাব হইয়াছে। আমার অহরোধে তুমি বয়ঃ এই শিশুর প্রতিপালনভার গ্রহণ করিবে। আমি তাহার খোদাদাদ নাম রাখিলাম। যখন তাহাকে আবৃত্তক হইবে, তখন আমি তোমাকে লিখিব।"

নামের তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের শিক্ষার জন্ত বিশেষ উপায় অবলম্বন করিলেন। ধর্মবিজ্ঞা ও অস্ত্রবিজ্ঞার অল্পকালের মধ্যেই খোদাদাদ বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন; অষ্টাদশ বৎসর বয়সেই তাঁহার গুণের খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। একদিন খোদাদাদ তাঁহার জননীকে বলিলেন, "মা, আমার আর এখানে বাস করিতে ভাল লাগে না। আমি গৌরব উপার্জন করিতে চাই, তুমি অহমত কর; পৃথিবীর কর্ণক্ষেত্রে যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে পড়িয়া আমি অবিভবের কীর্তি উপার্জন করি। শুনিয়াছি, আমার পিতার অনেক শত্রু অহরহ তাঁহার রাজ্যের শাস্তি নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগের হৃদয়ের জন্ত কি আমার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারেন না? আমি এখানে আলস্তে দিন কাটাইব, আর আমার ভ্রাতৃত্বা শতদিকে শত কীর্তি উপার্জন করিবে, ইহা আমি সহ্য করিতে পারি না।" কিরোজা বেগম বলিলেন, "বৎস, তুমি খ্যাতি ও বণ উপার্জন কর, যুদ্ধে তোমার পিতার শত্রু ধ্বংস কর, ইহা আমারও ইচ্ছা; কিন্তু তিনি তোমার সাহায্য না চাহিলে তুমি কিরূপে তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাইবে? তুমি আরও কিছু দিন অপেক্ষা কর।" খোদাদাদ বলিলেন, "আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছি, আর অধিক দিন অপেক্ষা করিতে পারি না। আমি ছদ্মবেশে আমার পিতার প্রাসাদে উপস্থিত হইব, ছদ্মনামে তাঁহার কার্য গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সন্তোষ করিব, তাহার পর অন্যতম সৌর্য উপার্জন করিয়া, তাঁহার নিকট আত্মপরিচয় দান করিব।" খোদাদাদের মাতা এই প্রস্তাবে সন্তোষিত হইলেন, কিন্তু পাছে নামেররাজ এই প্রস্তাবে প্রতিবাদ করেন, এই ভয়ে খোদাদাদ যুগ্মসাবিত্রী উপলক্ষ্য করিয়া পিতৃব্যর রাজ্যে ভ্রাতা করিলেন, এবং পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

বীরপুত্রের
শত্রুঘ্ন প্রস্তাব



ছদ্মজীবনে অথচ আত্মরক্ষা করিয়া, খোদাদাদ তাঁহার পিতৃ-সরিধানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "জ্ঞাতিপন্য, আমি কায়রো নগরস্থ এক জন আমীরের সন্তান, আমি দেশদ্রমণে বহির্গত হইয়াছি, আপনার রাজ্যে উপস্থিত

হইয়া উল্লিখিত, আপনায় কয়েকজন শত্রু আপনায় রাজ্যে বড় অশান্তি উপস্থিত করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে বন্যের জন্ত আপনায় সৈন্তভার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।" দিল্লার বকরগড়ি খোদাদাদের অল্পের স্বপ্ন ও সুখিষ্ট বাক্যে প্রীত হইয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাকে সৈন্তবিভাগের একটা উচ্চপদে নিযুক্ত করিলেন।

খোদাদাদা অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্য ও প্রজা সকলেরই প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। রাজ্যের প্রধান অমাত্য-গণ তাঁহার বহুস্বলভের জন্ত আগ্রহবান হইলেন, তাঁহার তুলনায় রাজ্যের অস্তান্ত সম্ভানরা সর্বসাধারণের দৃষ্টিতে নিতান্ত তুচ্ছ প্রতিভাত হইতে লাগিল।

জাতকর্ম

চক্রাঙ্ক



একজন রাজার অস্তান্ত পুত্র খোদাদাদের উপর বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিল, হিংসার তাহাদের দেহ জলিয়া বাইতে লাগিল। খোদাদাদের প্রতি রাজার অহুসার ও ঘেহ-দর্শনে তাহারা ক্রোধিত হইয়া খোদাদাদের সর্বনাশসাধনের চেষ্টা করিতে লাগিল। অবশেষে যখন রাজা খোদাদাদের হস্তে তাঁহার পুত্রপুত্রের রক্ষাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিলেন, তখন আর তাহারা কোনমতে ধৈর্য ধারণ করিতে পারিল না। কেহ পরামর্শ দিল, "উহাকে অরণ্যে লইয়া গিয়া উহার প্রাণবধ করা যাউক।" কেহ বলিল, "তাহাতে রাজ্য অত্যন্ত ক্ষুদ্র হইবে, এরূপ করিবার আবশ্যক নাই, রাজা ইহার হস্তে আমাদের রক্ষণভার সমর্পণ করিয়াছেন, আমরা এক দিনের জন্ত ইহার নিকটে শিকারযাত্রার অহুমতি গ্রহণ করি, অহুমতি প্রদান করিলেই আমরা কিছুদিনের জন্ত ভিন্নরাজার রাজ্যে অস্ত্রধীন করিব, তাহা হইলেই রাজ্য বিলুপ্ত হইয়া উহার প্রাণবশজ্ঞা করিবেন, অন্ততঃ আমাদেরকে এভাবে ছাড়িয়া দেওয়াতে উহাকে রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিতে হইবে।"

সকলে এই বড়বড়ই অতি উৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিল। রাজপুত্রগণ খোদাদাদের নিকট উপস্থিত হইয়া এক দিনের বিদায় প্রার্থনা করিল। "সকলে একবাক্যে বলিল, "আমরা আজই শিকার করিয়া ফিরিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।" খোদাদাদা এ অরুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাদিগকে এক দিনের জন্ত যুগ্মযাত্রার অহুমতি প্রদান করিলেন।

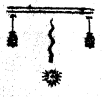
দুই দিন তিন দিন চলিয়া গেল, রাজপুত্রগণের সকান পাওয়া গেল না। রাজা খোদাদাদাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজপুত্রগণ কোথায়? আজ কয়েকদিন হইতে তাহাদিগকে দেখিতেছি না কেন?" খোদাদাদা বলিলেন, "জাহাপনা, আজ তিন দিন হইল, তাহারা যুগ্মযাত্রা করিয়াছেন। এক দিনের অধিক বিলম্ব হইবে না বলিয়া তাহারা গিয়াছেন, কিন্তু এ তিন দিনের মধ্যে আর তাহাদের সাক্ষাৎ নাই।" রাজা পুত্রগণের জন্ত বড়ই চিন্তিত হইলেন, কিন্তু চতুর্থ দিনেও রাজপুত্রগণ রাজধানীতে প্রত্যাপন করিল না দেখিয়া, রাজা আর ক্রোধ গোপন করিতে পারিলেন না, খোদাদাদাকে আহ্বান করিয়া ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন, "আমার পুত্রগণের রক্ষাভার তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছি, তুমি তাহাদিগকে কেন ছাড়িয়া দিলে? কেন তাহাদের সহিত গমন করিলে না? তুমি অবিলম্বে তাহাদিগকে খুঁজিয়া লইয়া আইস, যদি না পার, তবে তোমার প্রাণবশজ্ঞা আমের হইবে।"

রাজার কথা শুনিয়া খোদাদাদা অত্যন্ত ভীত হইলেন, তিনি রাজপুত্রগণের সকান অব্যাহত হইতে হইলেন, প্রাণে প্রাণে তাহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাদিগকে পাওয়া গেল না। খোদাদাদা কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন; কোথায় তাহাদিগকে পাইবেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

অনেক দেশে রাজপুত্রপুত্রের অঙ্গলক্ষ্যন করিয়া, অবশেষে খোদাবাদ্ বহু দূরে এক প্রান্তরমধ্যে আসিয়া পড়িলেন। এই প্রান্তরের মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ বর্ণিতপ্রস্তরের একটি প্রাঙ্গণ দেখিতে পাইলেন। এই প্রাঙ্গণ-বাড়ায়নে বসিয়া আলুপারিতকৃত্তনা একটি সুন্দরী সোবন করিতেছিলেন। তাহার পরিচ্ছদ ছিন্ন, সুন্দর সুখ বিবাহের মেঘে আচ্ছন্ন। খোদাবাদ্কে দেখিয়া ভরুণী সেই প্রাঙ্গণদিশির হইতে বলিলেন, “আপনি কে, অবিলম্বে এ স্থান হইতে পলায়ন করুন। আপনি কি জানেন না, এই ভবন একটি ভীষণদর্শন কৃষ্ণবর্ণ নিগো রাক্ষসের? এ পথে যে আসে, তাহাকেই বহিরা সেই রাক্ষসটা রক্ত শোষণ করে।”

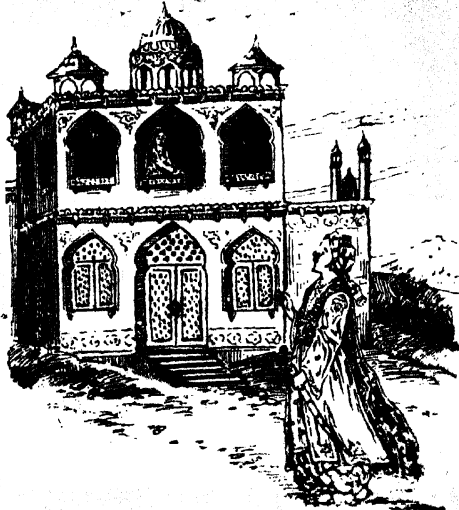
সুন্দরী

আর্তনাদ



খোদাবাদ্ বলিলেন, “সুন্দরী, আপনি কে, সেই পরিচর দিন, আমার পরিচর জানিবার জন্য বা আমাকে সতর্ক করিবার জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি বঞ্চে সাবধানে আছি, বতক্ষণ আমার হাতে এই

খজা আছে, ততক্ষণ আমার কোন ভয় নাই।” সুন্দরী বলিলেন, “পরিচর-সম্বন্ধে আপনি এইমাত্র জানিবেন যে, আমি কারোবাগী কোন সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যা, কারোপালকে বোণদাদে বাইতেছিলাম, এই প্রাঙ্গণের নিকটবর্তী হইলে সেই নিগো রাক্ষস আমার অঙ্গচরবর্ণের প্রাণবধ করিয়া, তাহাদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে, এবং আমাকে এখানে বন্দি করিয়া রাখিয়াছে। দুরাচার আমার প্রাণবধ করে নাই বটে, কিন্তু তাহা অপেক্ষা গুরুতর ভয়ে আমার প্রাণ সর্বদা অস্থির হইয়া রহিয়াছে। সে আমাকে তাহার শয্যাসন্ধিনী হইবার আদেশ করিয়াছে, আমার প্রণয়গাভের জন্য সে বড়ই ব্যস্ত। আমি এ পর্য্যন্ত



সুন্দরী
প্রান্তরে
অঙ্গুর-
প্রাঙ্গণ

কোনমতে তাহার প্রস্তাবে সন্মত হই নাই, কিন্তু পাকও আমাকে বলিয়াছে, আজ যদি আমি তাহার আদেশ পালন না করি, তাহা হইলে সে বলপূর্ব্বক আমার সতীত্ব হরণ করিবে। আমার অদুর্ভে বাহা হয় হইবে, আপনি প্রাণ লইয়া পলায়ন করুন, রাক্ষস এখন এখানে নাই, তাই আপনি এখনও জীবিত আছেন। সে কয়েকজন পথিককে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া, তাহাদিগকে ঘরবার জন্য বাধিত হইয়াছে, এখনই কিরিয়া আসিয়া আপনাকে দেখিতে পাইলেই আপনার প্রাণসংহার করিবে। আপনি দৌড়িয়াও তাহার আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিবেন না।”

সুন্দরী কণা শেব হইতে না হইতেই রাক্ষসটা বড়ের বেগে তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার আকার যেমন সুবৃহৎ, প্রকৃতি সেইরূপ অতি ভয়ঙ্কর। একটি বৃহৎ তাতারদেশীয় অথবা আরোহণ করিয়া সে প্রাঙ্গণদিকট উপস্থিত হইল। তাহার হস্তের খজাখানি এক্ষণ বিপুল যে, তাহা কোন মনুষ্যের

পকে হাতে করিয়া তোলা করিল। তাহার বিয়াই বেহ দেখিয়া খোদাদাদের মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। খোদাদাদা রাক্ষসকে দেখিয়াই তাহার হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আশ্রয় নিকট প্রার্থনা করিলেন, তদনন্তর তাহার তরবারি নিক্ষেপিত করিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। খোদাদাদাকে আশ্রয়কার দণ্ডায়মান দেখিয়া, রাক্ষসটা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল এবং তাহাকে আশ্রয়দর্পণের আদেশ করিল; কিন্তু খোদাদাদা তাহার কথাই কর্ণপাত করিলেন না। রাক্ষস ক্রতবেগে তাহাকে আক্রমণের জন্য খোঁড়া ছুটাইয়া দিল, অথ খোদাদাদের নিকটে আসিবামাত্র খোদাদাদা অসির প্রচণ্ড আঘাতে রাক্ষসের একটি পা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস যন্ত্রণায় ক্রোধে এমন উদ্ভয় পূর্ণন করিয়া উঠিল যে, সেই চোঁকাকের চতুর্দিক কাঁপিতে লাগিল। সে খোদাদাদাকে বধ করিবার জন্য তুলিয়া তাহার দিকে ধাবিত হইল; কিন্তু খোদাদাদা চক্ষুর নিমেষে সরিয়া দাঁড়াইয়া তরবারির আর এক আঘাতে রাক্ষসটার দক্ষিণ হস্ত ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষস আর খোঁড়ার উপর বসিয়া থাকিতে পারিল না, নীচে পড়িয়া গেল। তখন খোদাদাদা তাহার তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে রাক্ষসের হৃৎকেন্দ্র দমন করিলেন। সুবর্তী প্রাণায়বাতায়নে উপবেশন করিয়া, এই যুদ্ধ দেখিতেছিলেন, রাক্ষসের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত আশ্বাসিত হইয়া বসিলেন, “স্ববক, সুসিলাম, আগনি কোন দেশের রাজপুত্র হইবেন, সামান্য লোকের এত সাহস ও শক্তি হয় না। ঐ রাক্ষসটার পরিচ্ছদের মধ্যে এই চূর্ণের চাবী আছে, তাহা লইয়া আমাকে এই কারাগার হইতে উদ্ধার করুন।” — খোদাদাদা রাক্ষসের পরিচ্ছদ অঙ্গদান করিয়া একগোছা চাবী পাইলেন।

একটি চাবী দিয়া দরবার খুলিয়া খোদাদাদা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন, এবং সুবর্তীকে কারাগার হইতে বাহির করিলেন। সুবর্তী শতমুখে খোদাদাদের বীরত্বের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাহাকে অগণ্য ধন্যবাদ দান করিলেন। খোদাদাদা বলিলেন, “খোদা আপনাকে রক্ষা করিয়াছেন, তিনিই ধন্যবাদের পাত্র।”

সুবর্তী বলিলেন, “আমাকে উদ্ধার করিলেন, কিন্তু স্বতন্ত্র কারাগারে আরও কতকগুলি যুবক আবদ্ধ আছে। রাক্ষস তাহাদিগের এক একটিকে বাহির করিয়া, এক এক দিন আহাির করে, আপনি তাহাদেরও প্রাণদান করুন।”

খোদাদাদা সুবর্তীর সহিত প্রাঙ্গণের অন্তর্গত উপস্থিত হইলেন, বহু লোকের কাতর আর্তনাদ তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। বহু ক্লান্ত হইতে বহু পানীয় আর্তবর গৃহীতর উপর তরলারিত হইয়া উঠিতেছে। খোদাদাদা একটি কক্ষস্থানে উপস্থিত হইয়া চাবীর সাহায্যে দ্বার মুক্ত করিলেন। কক্ষটি অন্ধকারময়, সেই কক্ষের ভিতর গোপনপ্রাণী একটি ভূগর্ভস্থ গুহা পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সেই গুহার মধ্যে বহুসংখ্যক অন্ধকার ছিল। খোদাদাদা দ্বার উন্মুক্ত করিবারান্তর রাক্ষস বন্দিশ্রমের প্রাণবধের জন্য আসিয়াছে তাহা, তাহারা অধিকতর ব্যাকুলতার সহিত স্মরণ করিতে লাগিল। খোদাদাদা গুহাগর্ভে অবতরণ না করিয়াই তাহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়া বলিলেন, “তোমাদের কোন ভয় নাই, হঠাৎকার রাক্ষসকে আমি বধ করিয়াছি, তোমাদের উদ্ধার করিতে আসিয়াছি, শীঘ্রই তোমরা মুক্তিলাভ করিয়া, আশ্রয়পরিজনবর্গের নিকট প্রার্থনাদান করিতে পারিবে।” সেই অন্ধকারময় ভূগর্ভ হইতে মুক্তিলাভ করিবার তাহাদের কোনই আশা ছিল না, খোদাদাদের কথা শুনিয়া বন্দিশ্রমের হৃদয় আশা ও আশ্রয়—কৌতুক ও বিস্ময়ে আন্দোলিত হইতে লাগিল। খোদাদাদা অনতিবিলম্বে তাহাদিগকে মুক্তি দান করিলেন।

কারাগার ব্যক্তিগণ মুক্তিলাভ করিয়া, খোদাদাদের পদপ্রান্তে নিপতিত হইল ও প্রাণরক্ষার জন্য তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার পর তাহারা গুহাগর্ভ হইতে আলোকময়িত ধর্মপুণ্যে

নবখাগক
রাক্ষসের
সহিত যুদ্ধ



বন্দিশ্রম
উদ্ধার



পদার্পণ করিলে খোদাদাদ দেখিলেন, তাঁহার উনপঞ্চাশ জাতাই তাহাদের মধ্যে বসিয়াছে। রাজপুত্রগণকে দেখিয়া খোদাদাদের মনে বৎপরান্নাতি আনন্দের সঞ্চার হইল। তিনি তাহাদের প্রত্যেককে আনন্ডেরে আশিষন দান করিলেন।

অনন্তর খোদাদাদ রাজসের প্রাসাদের বিভিন্ন কক্ষ সন্দর্শন করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, অসংখ্য বহুমূল্য দ্রব্য প্রসাদ পরিপূর্ণ। খোদাদাদ বসিবার কক্ষ প্রাসাদই নব্বয় অসংখ্য প্রসাদ করিলেন। আজ্ঞাবলে যথেষ্ট পরিমাণে ঘোটক ও উষ্ট্র ছিল, তাহাদিগেরই পুটে মোটাই দিয়া বসিগণ নানাবিধ দ্রব্য লইয়া সানকচিত্তে স্বদেশে যাত্রা করিল।

বসিগণ প্রস্থান করিলে, খোদাদাদ যুবতীকে লিজ্জা করিলেন, “আপনি এখন কোথায় বাইতে চান? আপনি যেখানে বাইতে চাহিবেন, আমি সেইখানেই আপনাকে রাখিয়া আসিতে প্রস্তুত আছি।” রাজপুত্রগণও যুবতীর সাহায্যার্থে সম্মত হইলেন।

যুবতী বলিলেন, “আমার দেশ এখান হইতে বহুদূরে। আমার সঙ্গে তত দূর গিয়া আপনারা কষ্ট সহ করেন, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।” অনন্তর তিনি খোদাদাদকে সযোজন করিয়া বলিলেন, “আমি বলিয়াছি, আমি কার্যেরোগের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কস্তা, এ কথার আপনি আমার প্রকৃত পরিচয় কিছুই পান নাই, কিন্তু আপনি আজ আমার যে উপকার করিলেন, তাহাতে আপনাকে আমার পরিচয় প্রদান না করিলে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞের ভ্রাতৃ কাজ হইবে। আপনার নিকট আমি কোন কথা লুকাইব না। আমি এক রাজার কস্তা। এক জন দম্ভ্য আমার পিতাকে সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া, তাঁহার প্রাণসংহার করে, তাঁহার সিংহাসনও হরণ করে; আমি আশ্চর্যকার উপায় না দেখিয়া পলায়ন করিলাম।”

খোদাদাদ রাজকস্তার প্রকৃত পরিচয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া, তাঁহাকে অস্বিল ইতিহাস বলিতে অহরোহ করিলেন। রাজকস্তা বলিতে লাগিলেন, “দরিদ্রাবাস নামে একটি দ্রুতবৎ রীণ আছে। সেই রীণের অধীশ্বর যেমন ধনবান, সেইরূপ ধার্মিক; সত্যেরে তাঁহার কোনই অভাব ছিল না; কিন্তু তিনি পুত্রবর হইতে বঞ্চিত ছিলেন। রাজা খোদাদার নিকট বহু প্রার্থনা করিলেন, অবশেষে রাজার পূর্ণাঙ্গণ প্রকাশ পাইল; কিন্তু এই গর্ভে পুত্র হইল না, একটি কস্তা-সন্তান জন্মিত হইল।

“আমি সেই দ্রুতগিণী রাজকস্তা। আমার জন্ম পিতার মনে আনন্দের সঞ্চার না হইয়া চাপাই হইল। তিনি আমার দানে উপেক্ষা প্রকাশ করিলেন না, আমাকে ধার্মীতি শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বাহাতে আমি তাঁহার সিংহাসন অধিকার করিয়া, রাজ্যশাসনেও প্রজ্ঞাপাশনে সমর্থ হই, আমি বালাকাল হইতে তদুপস্থক শিক্ষালাভ করিতে লাগিলাম।

“এক দিন আমার পিতা শিকারে বহির্গত হইয়া, একটি বন্য গর্ভত দেখিতে পাইলেন, তাহাকে বহির্গত কর্তা তাঁহার পক্ষান্তে অথ পরিচালন করিলেন, তাঁহার বসিগণ তাঁহার অহরণ করিতে পারিলেন না। রাজা পতীর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন, অবশেষে লক্ষ্যকালে গর্ভত তাঁহার দৃষ্টিপথে অন্তরালে কোথায় অকৃত হইল, তাহা তিনি অহুতব করিতে পারিলেন না। বৃকচূড়ার রাজি অভিযাচিত করিবার অভিপ্রায়ে তিনি বৃক দারোহণ করিলেন, বৃকশাখার ভিতর দিয়া অহুতবিত একটি আলোক তাঁহার দৃষ্টিপথে নিশ্চিত হইল, রাজা সেই আলোক দেখিয়া বুকিলেন, নিকটেই কোন আশ্রয়-গ্রাম আছে। সেই গ্রামে কাহারও গৃহে ত্রিদির জন্ত আশ্রয়লাভের আশায় তিনি বৃক হইতে অবতরণ করিয়া, সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া ত্রা করিলেন।

রাক্ষস-বসিনী
রাজকস্তার
আশ্রয়কানী



দিশেহারা
রাজার
অহরণ



“সেই আলোকের নিকটে আসিরা তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তাহার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তিনি দেখিলেন, একটা কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার রাক্ষস একটা প্রকাণ্ড বাঁড় অগ্নিকুণ্ডে দগ্ধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে, রাক্ষসটার নিকটে একটা মদের জালা। আমার পিতা অধুরক্ষী কুটারের দিকে দৃষ্টিপাতমাত্র দেখিতে পাইলেন, একটি পরমসুন্দরী যুবতী হতাশভাবে নতদৃষ্টিতে বসিয়া আছে, তাহার দুই হাত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ। যুবতীর পদতলে দুই তিন বৎসর-বয়স একটি শিশু। শিশুটো তাহার বিপদ বৃদ্ধিতে পারিয়া অবিশ্রান্ত জ্ঞপন করিতেছে, এবং তাহার জ্ঞপনশব্দে নৈশাকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

“এই দৃশ্য দেখিয়া পিতা বড়ই বাধিত হইলেন। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, রাক্ষসটাকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিহত করিবেন, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, রাক্ষসটা যেক্ষণে বলবান,



সুন্দরী
সংহারো-
চ্যত
রাক্ষস



তাহাতে তাহার সহিত সমুখমুখ করা অসম্ভব, হতভাগ্য তিনি রাক্ষসের অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার প্রাণ-সংহারের সংকল্প স্থির করিলেন। রাক্ষসটা ইতিমধ্যে আধখানা বাঁড় ও এক জালা মদ উদরস্থ করিয়া, সুন্দরীর দিকে কিরিল এবং তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিল, ‘ওগো মধুরহাসিনী! রাজকন্ত্রে, যদি ভূমি ভাল চাও ত আমাকে ভজনা কর, আমাকে ভজনা না করিলে তোমার প্রাণরক্ষা হইবে না। যদি আমাকে ভালবাসিতে পার, তাহা হইলেই পরমসুখে তোমার কাটিবে।’ রাজকন্তা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, ‘ওরে হতভাগা! রাক্ষস, তুই কি মনে করিয়াছিস, আমি প্রাণের ভয়ে তোর হস্তে আমার

অবলানিষি সত্যস্বরূপ প্রকাশ করিব? তুই আমার উপর বড়ই অত্যাচার করিস—চিরদিনই আমি তোকে খণা করিব।’—‘যেটো যে হারামজাদি, তবে দেখ, কিরূপে তোর শাস্তি দিই।’—বলিয়া রাক্ষসটা সেই যুবতীর কেশরাশি বামহস্তে সজোরে আকর্ষণ করিয়া, তাহার শিরশ্ছেদনের জন্ত দক্ষিণ হস্তে খড়্গা উঠাল। রাজা দেখিলেন, দুহর্ভদ্রা যুবতীর প্রাণ নষ্ট হয়, তিনি অগ্নরে মগায়ামান ছিলেন, রাক্ষসের বক্ষস্থল লক্ষ্য করিয়া, একটি হুতীক তীর নিক্ষেপ করিলেন; দেখিতে দেখিতে রাক্ষস গতজীবন হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।

“আমার পিতা তখন কুটারে প্রবেশ করিয়া, যুবতীর হস্তের বন্ধন মোচন করিলেন। যুবতীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে যুবতী বলিলেন, ‘মহাশয়, সমুদ্রতীরে কতকগুলি সারাগানিজনাদি মনুষ্য আছে, তাহাদের

রাক্ষস-সংহার



রাজার সহিত আমার বিবাহ হয়, যে রাকসটাকে আপনি এইমাত্র নিহত করিলেন, এ তাঁহার এক জন কর্মচারী ছিল। হস্তভাণা আমার রূপ দেখিয়া কামান্দলে বিবাহরাজি দৃষ্ট হইতেছিল। এক দিন কোন নির্জন স্থানে সে আমাকে আমার পুত্রের সহিত দেখিতে পাইয়া, আমাদের চুরি করিয়া লইয়া পলায়ন করিল, আমার স্বামীর রাজ্য ছাড়িয়া বহুব্রবর্তী অরুণো এই কুটীরের মধ্যে আমাকে লইয়া আসিল।

‘এখানে আসিয়া সে প্রতিদ্বন্দ্বিতাই আমাকে তাহার কামপ্রভৃতি চরিতার্থ করিবার জন্য অনুরোধ করিত, কিন্তু আমি কোন দিন তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করি নাই, অধিক কি, তাহার সেই কুংসিত প্রস্তাব শুনিয়া আমি তাকে অতি কর্কশভাবে তিরস্কার করিতাম, কিন্তু সে কোন দিন আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করে নাই, আজ বোধ হয়, সে কাম ও ক্রোধে অধীর হইয়াই আমার প্রাণসংহারে উক্ত হইয়াছিল। আমি ক্রুণিতাম, তাহার স্তায় হস্তচাক্ষুরের হস্ত হইতে আমার পরিত্রাণ নাই, কিন্তু আমি জীবন অপেক্ষা আমার সত্যবিশ্বাসের ভয় অধিক করিতাম।

‘মহাশয়, ইহাই আমার জীবনের ইতিহাস। আশা করি, আমার স্তায় উপায়হীন অনাথকে আপনি রক্ষা করিয়া অতি মহতের স্তায় কার্য্য করিয়াছেন।’ আমার পিতা বলিলেন, ‘আপনার উপকার করিতে পারিয়া আমি ধন্ত হইলাম। আপনার চক্ষুর কাহিনী শুনিয়া আমার সহানুভূতির উদ্রেক হইয়াছে, কিন্তু অতঃপর আর আপনাকে চক্ষুর জীবন বহন করিতে হইবে না। রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র আপনাকে লইয়া আমি দরিদ্র্যবাদ সহরে যাত্রা করিব। আমি সেখানকার রাজা। আপনি যদি ইচ্ছা করেন, তবে আমার প্রাসাদেই আপনার স্বামীর আশ্রয়কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন।’

‘স্বতী আমার পিতার প্রস্তাবেই সম্মত হইল। অরণ্যের বাহিরে আসিতেই আমার পিতার অশ্রুচরুবর্গের সহিত পিতার সাক্ষাৎ হইল। অশ্রুচরুবর্গ পিতাকে অরণ্যের ভিতর হইতে একটি স্বতীকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতে দেখিয়া মহা বিস্মিত হইয়া পড়িল। পিতা কর্মচারিগণকে রুমশীর পরিচয় প্রদান করিলেন এবং তাঁহার আদেশে একজন কর্মচারী স্বতীর ও অন্য একজন তাঁহার শিশু পুত্রের ভার গ্রহণ করিয়া, রাকসদ্বারী অভিমুখে ধাবিত হইল।

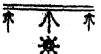
‘দারাসানের রাজাকে পিতা প্রাসাদের একটি কক্ষ প্রদান করিলেন। তিনি সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। আমার পিতা তাঁহার পুত্রের শিক্ষারও ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। প্রথমতঃ কয়েক দিন স্বতী তাঁহার স্বামীর সংবাদ জানিবার জন্য বড় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পরে আমার পিতার ক্রোধাত আদরবশে তাঁহার সেই উৎকণ্ঠা বিদূষিত হইল। অবশেষে তিনি আর তাঁহার স্বামীর নিকট বাইবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিতেন না।

‘কয়েক বৎসর এই ভাবে বাসনের পর, এই রুমশীর পুত্র বৌবনগণে পরাশর করিল। তাহার রূপ ও গুণ দেখিয়া আমার পিতা তাহার পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, তিনি আমাকে সেই কুৎসে হস্তে সমর্পণ করিয়া, তাঁহার উত্তরাধিকারিণিবে অভিষিক্ত করেন। যুবক অতি অজ্ঞানতার মধ্যে পিতার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিল, রাজ্যের সকলে তাকে রাকপুত্রের স্তায় খাতিস ও কল্যাণ করিতে লাগিল। অবশেষে রুমশীর নারীর পুত্রের জ্বর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এক দিন সে আমাকে বলিয়া বলিল, ‘রাকসজা, তোমার যুব পিতা আমার হস্তে তোমাকে সম্ভ্রদান করিতে এত বিলম্ব করিতেছেন কেন?’ আমি আদ্য অধিক বিলম্ব করিতে পারি না।’

স্বতী-
উদ্ধারের
ধস্তবান



যাক-
শ্রেমিকের
উদ্ভতা



শিত্তাহার
বিবাহ-প্রস্তাব

“আমি এই প্রস্তাব দিচ্ছি যে, আমার পিতা, আমার পিতা তাহার উপর বিরক্ত হইলেন, কিন্তু তিনি বিবাহ প্রস্তাব না করিয়া তাহাকে জাহাজে, তাহার লহিত আশার বিবাহের জন্য তিনি প্রত্ন হন নাই, তাহার বিবাহের অন্তরঙ্গ উপস্থিতি আছে। এই উত্তরে প্রত্ন দুই বৎসর বিরক্ত হইয়া শিত্তাহার বিরক্ত হইয়া বসিল এবং সমস্ত উপস্থিতি, সকল উত্তরতা বিবৃত হইয়া, চরিত্রের আশ্রয় বৃত্তি পিতার প্রাণসংহার করিয়া, তাহার বিবাহের অধিকার করিয়া বসিল, তাহার পর আমাকে বিবাহ করিতে প্রবৃত্ত করিল। আমি নি, আমি তাহাকে বিবাহ না করিলে সে আমার প্রাণসংহার করিবে, তাহাও জাহাজে। আমি প্রত্ন কষ্টে লড়াইয়ের কল হইতে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলাম। এখন সন্ধ্যায় আমার পিতার প্রাণসংহারে ব্যস্ত ছিল, সেই সময় বৃদ্ধ উজীর আমাকে তাহার একটি বস্তুর গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন। তাহার পর একখানা জাহাজ সেই ধাপে উপস্থিত হইলে আমি সেই জাহাজে আরোহণ করিয়া, শিত্তাহার পরিত্যাগ করিলাম। শিত্তাহার উজীর ও একজন দাসী আমার সঙ্গে চলিল।

“উজীরের ইচ্ছা ছিল, তিনি নিকটবর্তী কোন রাজার দ্বারা উপস্থিত হইয়া, তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করিয়া আমার পিতার রাজ্য উদ্ধার করেন, কিন্তু খোদার ইচ্ছা অন্তরঙ্গ, তাহা কয়েক দিনের মধ্যেই আমার বৃদ্ধিতে পারিলাম। কয়েক দিনের মধ্যেই আমাদের জাহাজ রটকাবেগে বিক্ষত হইয়া একটি পর্বতের উপর মহা বেগে নিপতিত হইল, জাহাজ শত খণ্ডে চূর্ণ হইয়া গেল, উজীর ও আমার পরিত্যক্ত। সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জ হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। আমি হতচেতন হইয়া পড়িলাম; প্রত্যেকেই ভাবিয়া চলিলাম কি ভয়ঙ্কর খণ্ডের উপরই আশ্রয় লইলাম, তাহা আমার স্মরণ নাই; কিন্তু আল্লা আমাকে নতুন বিপদে কেলিবার জন্য আমার প্রাণ রক্ষা করিলেন, আমি জলমগ্ন হইলাম না। জানসংকার হইলে দেখিলাম, আমি সমুদ্রতীরে পড়িয়া আছি।

“দুর্ভাগ্যের তাড়নাতেই আমরা আমার প্রতি অভিযাচন প্রদান করি, তাহার উপর পক্ষপাতের আরোপ করি। আমি জাননাড় করিয়াই, তিনি কেন আমার এমন অসহায় অবস্থায় প্রাণরক্ষা করিলেন, বলিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে লাগিলাম, আমার উজীর ও দাসীকে আমার অপেক্ষা লক্ষণে দোভাগ্যশালী বলিয়া মনে হইল। আমি উপর্যুক্ত না দেখিয়া, সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হইয়া প্রাণত্যাগের উদ্ভব করিতেছি, এমন সময় আমার পক্ষপাতের বহুলোকের ও অনেক অশ্রের চাঁৎকার শ্রবণ করিলাম। আমি পক্ষপাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, বহুলোকের অশ্রুরোহী গৈর। সেই অশ্রু অশ্রুরোহী গৈরের মধ্যে একটি বৃদ্ধজাত বলাবান্ধব বৃদ্ধ অশ্রুরোহীকে দেখিবার তাহামিগের পরিত্যক্ত বলিয়া বৃদ্ধিতে পারিলাম। যুবকটি যেমন রূপবান, তেমনি গুণবানও বলিয়া বোধ হইল। তিনি কয়েকজন অশ্রুরকে আমার পরিচয় জানিবার জন্য আমার নিকট প্রেরণ করিলেন, আমি কোন উত্তর দান করিতে পারিলাম না, কেবল অশ্রুধারা ধরাডল সিক্ত করিতে লাগিলাম। যুবক বলিলেন, ‘আমি জাহাজ ভাঙিয়াই এখানে এমন অসহায় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছি। কর্তৃত্বগ্ৰস্ত প্রেরণের উপর প্রাণ জিজ্ঞাসা করিয়া, আমাকে বিরক্ত করিয়া তুলিল, কিন্তু তাহারা একটাও উত্তর পাইল না। তাহারা জানাইল, ‘আমি আমার পরিচয় প্রদান করিলে রাজা মহাশয় আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারেন।’

“কর্তৃত্বগ্ৰস্ত আমার নিকট কোন কথা বিবৃত হইতে পারিলেন না দেখিয়া, রাজা স্বয়ং আমার সমুখে উপস্থিত হইলেন, কর্তৃত্বগ্ৰস্ত আমাকে বিরক্ত করিতে নিষেধ করিয়া, তিনি মধুরবাক্যে স্বয়ং বলিলেন, ‘ব্রহ্মা, আমি আপনাকে অরোহণ করিতেছি, আপনি বিলাপ ত্যাগ করুন। আল্লা আপনার উপর

রূপবান বীরের

আবাস



নির্দিষ্ট হইয়াছেন তাহারা আপনি এ ভাবে আশ্রয়িত করিবেন না, আপনি বৈধব্য করুন। এ ভাষনের
 হৃৎ-হৃৎ নিত্য পরিবর্তনশীল; এই আছে, এই নাই। আপনি হৃৎবে পড়িয়া জীবন বিতরণপূর্ণ
 জান করিতেছেন; কিন্তু রাজা আপনাকে একমুহুরে পরাই দ্বীপ করিতে পারেন। আপনি যদি
 অগ্রহণ করিয়া, আমার প্রাণে বাস করিতে সম্মত হন, তাহা হইলে আমি যাহা জানিলে আপনাকে
 আমার পূর্বে প্রকাশ প্রদান করিতে পারি। আপনি আমার প্রাণে আমার জননী নিকট
 বাস করিবেন, তিনি অতি দয়ালবী হইবে, আপনাকে হৃৎ, কোণ্ড, বোনা ইয় করিবার জন্ত তিনি
 প্রাণপথে চেষ্টা করিবেন।’

সুন্দরী-
 পরিণয়ের
 দৌত্য



“আমি রাজাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া, তাঁহার প্রভাবে সম্মত হইলাম। তাঁহার আতিথেয় যে আমি
 নিত্যই অযোগ্য নহি, তাহা জ্ঞানের জন্ত আমি তাঁহাকে আমার পরিচয় বলিলাম। আমার দুঃখী ও
 বিপদের কথা শুনিয়া, রাজা ও তাঁহার কর্মচারিগণ বিশেষ হৃৎ প্রকাশ করিলেন। আমার প্রতি সহানুভূতি-
 ভরে সকলেরই হৃৎ বিপ্লবিত হইল। রাজা আমাকে প্রাণে আনিয়া, তাঁহার জননী হস্তে সমর্পণ
 করিলে, রাজ-মাতা আমার শোচনীয় কাহিনী শ্রবণ করিয়া, কত বে হৃৎ করিতে লাগিলেন, তাহার
 সীমা নাই। কিছুদিনের মধ্যেই রাজা আমার প্রেমে বিভোর হইয়া উঠিলেন, তিনি আমাকে তাঁহার
 শিংহাসনভাগিনী করিবার জন্ত প্রবল আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি সর্বদা বিপজ্জালে বিদ্ধিত
 থাকার প্রেমের প্রতাপ হইতে অব্যাহত ছিলাম, কিন্তু রাজা আমার প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করিয়াছিলেন,
 আমি তাঁহার নিকট ব্রহ্ম কৃতজ্ঞ ছিলাম, তাহার জন্ত আমি তাঁহার অহরহে সন্মত করিতে
 পারিতাম, তাঁহাকে স্তবী করিবার জন্ত আমি তাঁহাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলাম। মহাদেবগোহে
 আমাদের বিবাহ হইয়া গেল।

“বিবাহের উৎসব চলিতেছে, এমন সময় একদিন রাত্রিতে আমাদের রাজ্যের সর্কটবর্তী এক
 রাজ্যের রাজা সন্দেশে আমাদের রাজধানীতে নিশ্চিত হইল। এই রাজ্যের পরিচয় জানিলাম,
 তিনি জাজিবার রাজ্যের রাজা। তিনি রাজধানী আক্রমণ করিয়া আমার স্বামীর প্রজাগণকে নিহত
 করিলেন। আমরাও তাহার অঙ্গ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিতাম না, কিন্তু দৌত্য বশতঃ আমরা
 প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সম্মত হইলাম। সমুদ্রকূলে ক্রান্তবশে উপস্থিত হইয়া, আমরা একখানি
 জেল-ডিকীতে আশ্রয় করিলাম। সেই ডিকীতে আশ্রয় করিয়া আমরা দুই দিন অনন্ত সমুদ্রে
 ভাসিয়া চলিলাম; কোথায় চলিলাম, কোন্ দিকে চলিলাম, তাহা কিছুই জানিলাম না। তৃতীয়
 দিনে আমরা সমুদ্রের মধ্যে কিছু দূরে একখানি জাহাজ দেখিতে পাইলাম; তাহািলাম, হয় ত ইহা
 কোন সাগরী জাহাজ হইবে, এই জাহাজে উঠিয়া উদ্ধার লাভ করিতে পারিব ভাবিয়া, আমাদের মনে
 বৎসরোন্মত্তি আনন্দের সঞ্চার হইল। কিন্তু জাহাজখানি আমাদের নৌকার নিকটবর্তী হইলে আমাদের
 আনন্দ বিবাদের পরিণত হইল; দেখিলাম, জাহাজের উপর দল বড়ো জন শস্ত্র ধারণা রহিয়াছে;
 তাহারা আমাদের দেখিতে পাইবারাত্র আমাদের নৌকা আক্রমণ করিল, এবং আমাকে ও আমার
 স্বামীকে বন্দন করিয়া জাহাজের উপর লইয়া গেল। সেখানে দুইচার দণ্ডাগণ বলপ্রয়োগে আমার
 অবশতন মোচন করিল, আমার রূপ দেখিয়া তাহারা বৎসরোন্মত্তি বিম্বিত হইল। দণ্ডাগণের প্রত্যেকেই
 আমাকে লাভ করিবার জন্ত চকল হইয়া উঠিল, ক্রমে তাহাদের চকলতা বিবাদের পরিণত হইল,
 অতঃক বশিত করিয়া আমাকে হস্তগত করিবার আশায় তাহারা উদ্ভেষ্ট ভায় হৃৎ করিতে লাগিল।

জলময়-কবলে
 সুন্দরী





“জাহাজের উপর ক্রমে এক একটি করিয়া বহুসংখ্যক মৃতদেহ পুঞ্জীভূত হইল, কিন্তু দল্লভদের বিবাদ মিটিল না। অবশেষে একজন ভিন্ন সকলেই বাহ্যবুদ্ধি প্রাণত্যাগ করিল। যে ব্যক্তি অবশিষ্ট রহিল, সে আমাকে সন্ধান করিয়া বলিল, ‘স্বক্শ্মি, তুমি এখন আমার, আমি তোমাকে কারো নগরে লইয়া বাইব। সেখানে আমার একটি বহু বাস করেন, তাঁহাকে একটি হুন্দারী দাসী প্রদানের জন্ত অনেক দিন হইতে প্রতিক্ষিত আছি, আমি তোমাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব। কিন্তু তোমার সঙ্গের এই লোকটিকে? তোমার সহিত ইহার সম্বন্ধ কি?’—আমি সেই দল্লভকে বলিলাম, ‘মহাশয়, ইনি আমার স্বামী’,—দল্লভ বলিল, ‘তাঁহা হইলে আমি দয়া করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দিব। তোমার স্বামী যে তোমাকে অস্ত্রের দাসীভূতি করিতে দেখিবে, ইহা তাহার সহ্য হইবে না। বাহাতে তাহাকে তাঁহা না দেখিতে হয়, আমি তাহার উপায় করিতেছি।’ নরশিখাট দল্লভ এই কথা বলিয়া আমার স্বামীকে জাহাজের উপর হইতে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিল।

“আমি ক্ষোভে, হৃঃখে ও ভয়ে আত্মনাদ করিয়া উঠিলাম। দুর্য্যচাের যদি আমাকে বাধা প্রদান না করিত, তাঁহা হইলে আমিও আমার স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে জলে পড়িতাম, কিন্তু পাখও আমাকে জাহাজের মাষ্টলের সহিত দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া রাখিল।

“কয়েকদিন পরে সেই দল্লভ জাহাজ একটি বন্দরে উপস্থিত হইল। আমার ভীরে অবতরণ করিলাম, দল্লভ আমাকে নগরমধ্যে লইয়া গেল, সেখানে সে উষ্ট্র, শিবির, বস্ত্রাবাস, দাসদাসী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া, কাঁয়েলো অভিমুখে যাত্রা করিল। আমাকেও সঙ্গে লইয়া চলিল।

“আমরা এই রক্ষা-প্রাসাদের নিকটবর্তী পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিলাম, ইতিমধ্যে ঐ রক্ষাবর্গ রাক্ষসতা তাঁহার প্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া, আমাদের নিকটে উপস্থিত হইল। সে তাঁহার বক্তা আদেশানিত করিয়া দল্লভকে আত্মসমর্পণের আদেশ করিল। দল্লভ স্বয়ং সাইদের অভাব ছিল না, সে ও তাঁহার অল্পচরবর্গ রাক্ষসটাকে আক্রমণ করিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই অল্পচরবর্গের সহিত দল্লভ রাক্ষসের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। দল্লভ মৃতদেহ ও আমার সজীব দেহ বহন করিয়া রাক্ষস তাঁহার প্রাসাদে প্রবেশ করিল। প্রথমে সে দল্লভ দেহ ভক্ষণ করিয়া, তাহার ক্ষুধা-শান্তি করিল, তাহার পর আমাকে বলিল, ‘স্বক্শ্মি, তোমাকে আর আমি বিনাশ করিতে চাহি না; দেখিতেছি, তুমি রূপগাংগাবতী। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমার শব্দাসিন্দরী হও, তোমার কোন অভাব থাকিবে না, খুব সুখী হইবে। কাল পর্যন্ত আমি তোমাকে চিত্তা করিবার সময় দিলাম। যদি তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত না হও, তাঁহা হইলে আমি তোমার প্রাণবধ করিব।’—রাক্ষস আমাকে একটি কক্ষে লইয়া গিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিল। পরদিন সে বক্তৃকণ্ঠি পক্ষিকের সন্ধান পাইয়া, তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্ত ধাবিত হইল, তাহার পরই আপনায় সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ—রাক্ষস কিরিয়া আলিলে যুদ্ধে তাহাকে আপনি নিহত করিয়া, আমার উদ্ধারদান করিলেন।”

বোদাদাদ সকল কথা শুনিয়া সুবৃত্তিকে বলিলেন, “আপনার হৃঃখময়ী কাহিনী শ্রবণ করিয়া, আমি বড় বাধিত হইলাম, এই রাজপুত্রপণ তাঁহাদের পিতার প্রাসাদে আপনাকে আশ্রয়দান করিতে চাহিতেছেন, এ প্রস্তাব আমি সন্তোষে বোধ করিতেছি। এই রাজা অস্ত্রের ধর্মপরাধ ও পরোপকারী, তাঁহার আশ্রয়ে আপনায় কোন বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। যদি আমাকে বিবাহ করিতে আগন্তি না থাকে, তাঁহা হইলে আমি পরমানন্দে আপনায় পাণিগ্রহণ করিব। এখনই আমাদের বিবাহ হইবে, রাজপুত্রপণ

এই বিবাহের দাম্পত্য হইবেন।" রাজপুত্রগণ খোদাদাদের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে দেখানাই খোদাদাদের সহিত যুবতীর বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পরে সকলেই আহায়ে বসিলেন, সকলেই উদর পূর্ণ করিয়া নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য আহাৰ করিলেন। রাক্ষসের ভাত্তরে মদের অভাব ছিল না, যে বত পায়িল, মদ খাইল। তাহার পর অবশিষ্ট খাদ্যদ্রব্য খুঁজিয়া লইয়া ও প্রাদাহক সমস্ত দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া, রাজপুত্রগণ তাঁহাদের পিতার রাজ্যাভিযুখে বাত্মা করিলেন। কয়েক দিন পঞ্চমণ্ডলের পর রাজধানী হইতে এক দিনের পথ থাকিতে তাঁহারা শিবির সংস্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। সঙ্গে যে মদ অবশিষ্ট ছিল, এখানে তাঁহারা তাহা নিঃশেষ করিয়া ফেলিলেন। সকলের পানাহার শেষ হইলে খোদাদাদ রাজপুত্রগণকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, "রাজপুত্রগণ, আমি আজ তোমাদিগের নিকট নিজ পরিচয় প্রদান করিব, আমি আর আত্মগোপন করা আবশ্যক বিবেচনা করি না। আমিও তোমাদের ত্রায় রাজপুত্র, তোমাদেরই বৈদ্যদেয় জাত। আমি আমার পিতৃব্য নামের রাজের রাজ্যে প্রতিপালিত হইয়াছি, আমার মাতার নাম ফিরোজা বেগম।"

অনন্তর খোদাদাদ দরিয়াবাদের রাজপুত্রীকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার নিকট পূর্বে আমার জন্মরহস্য ভেদ করি নাই, এক্ষণে তুমি আমাকে সাক্ষ্য কর। হয় ত তুমি আমাকে তোমার বংশসংগাধার উপযুক্ত স্বামী বলিয়া বিবেচনা করিতে পার নাই।" রাজপুত্রী বলিলেন, "না না, তুমি এক্ষণে কথা মনে করিও না, তোমাকে পাইয়া আমি কত সুখী হইয়াছি, তাহা জানাই জানেন; এখন জানিলাম, তুমি রাজপুত্র। আমার মনে আর কোন আক্ষেপ নাই। তুমি যে কোন দেশের রাজপুত্র, তাহা তোমার সাহস দেখিয়া আমি পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলাম।"

খোদাদাদের প্রতি দরিয়াবাদ-রাজতনয়ার প্রেম, আদর ও যত্ন দেখিয়া অত্যন্ত রাজপুত্রগণের কৈরী সকার হইল। রাত্রে খোদাদাদ বিশ্রামার্থ শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলে রাজপুত্রগণ একত্র মিলিত হইয়া, তাঁহার বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারা খোদাদাদের নিকট কতদূর কৃতজ্ঞ, তাহা বিস্মৃত হইয়া খোদাদাদের প্রাণবধের চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, "ইহার প্রাণবধ না করিলে আর আমাদের মঙ্গল নাই। রাজা যে দিন শুনিবেন, খোদাদাদ তাঁহারই এক জন মহাবীর গর্ভজাত সন্তান, খোদাদাদ বাছবলে রাক্ষসের প্রাণসংহার করিয়া আমাদেরকে উদ্ধার করিয়াছে, সেই দিনই পিতা আদরে ও যত্নে খোদাদাদকে মাথায় তুলিবেন, এবং তাহাকেই সিংহাসন দান করিবেন। এখনই খোদাদাদের ক্ষমতা রাজসংঘে অসীম; সকলেই তাহার পক্ষ। অতঃপর সকলে যদি জানিতে পারে, যে আমাদেরই এক জন জাত, তাহা হইলে আমাদের আর কি আশা বর্তমান থাকিবে?" এই প্রকার তর্কবিতর্ক করিয়া হঠাৎই নিম্নিত খোদাদাদকে আক্রমণ করিয়া, তাঁহার দেহের উপর অসংখ্য অস্ত্রাঘাত করিল, এবং তাঁহার ইহলীলা-সাক্ষ হইয়াছে বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে ও তাঁহার নবপরিণীতা পত্নীকে পশ্চিমাগণ করিয়া, পিতৃস্বাধীন্যে অভিযুগে ধাবিত হইল।

পুত্রগণকে নিরাপদে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে দেখিয়া, রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি তাহাদিগের বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কেহই প্রকৃত কথা প্রকাশ করিল না। রাক্ষস বা খোদাদাদ-সম্বন্ধে রাজাকে তাহার একটা কথাও জানাইল না। তাহারা বলিল, বিভিন্ন দেশ দর্শনে ব্যস্ত থাকায় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিতে তাহাদের বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।



এ দিকে খোদাদাদ খুতব্ব তাঁহার শিবিরে নিপতিত রহিলেন, রক্তস্রোতে তাঁহার সর্গাঙ্গ ভাগিতে লাগিল। খোদাদাদের পরী স্বামীর অবস্থা দেখিয়া করুণায় বিলাপ করিতে লাগিলেন; যজ্ঞসাহীন স্বামীর দেহ ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, সেই নির্জন প্রদেশে কত কাঁদিলেন, তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি খোদাদাদের কৃতর জাতগণের উপর অভিসম্পাত করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তখনও খোদাদাদের প্রাণবিয়োগ হয় নাই। যুবতী খোদাদাদের নিষাদ-প্রস্থানে তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ অদূরবর্তী নগরান্তিমুখে ধাবিত হইলেন। নগরে উপস্থিত হইয়া তিনি একজন চিকিৎসকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে অল্প চেষ্টাতেই চিকিৎসক মিলিল। চিকিৎসকের সহিত তিনি শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন, কিন্তু শিবির শূন্য! খোদাদাদের রক্তাক্ত দেহ কোথাও পাওয়া গেল না।



খোদাদাদকে তিনি যে ভাবে দেখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে তখন তাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না; হুতরাং যুবতী মনে করিলেন, নিশ্চয়ই কোন হিংস্র জন্তুতে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। রাজকতা আবার কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার সে বিলাপে পাষাণও বিদীর্ণ হয়। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে খোদাদাদের পঙ্কজ হৃদয়ে বিগলিত হইল,

তিনি তাঁহাকে সেই নির্জনস্থানে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন, তাঁহাকে ন্যস্ত লইয়া নগরে গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহাকে আশ্রয়দানে প্রতিক্রমিত হইলেন।

খোদাদাদের পঙ্কজ হৃদয়ে অসত্য এই প্রস্তাবে সন্মত হইতে হইল। চিকিৎসক তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া আসিলেন, তাঁহার প্রতি আশ্রয়-বয়ের কোন ক্রটি হইল না। চিকিৎসক তাঁহাকে নানাবিধরূপে সাযনা প্রদান করিলেন, কিন্তু সাযনার কোন ফল হইল না, বরং রমণীর শোকাবেগ তাহাতে বর্ধিত হইয়া উঠিল। অবশেষে চিকিৎসক এক দিল বলিলেন, “আপনার হৃদয়ের কারণ কি, তাহা আমাকে খুলিয়া বলুন, সকল কথা শুনিলে হয় ত আমি আগমনের কোন উপকার করিতে পারিব। কেবল বিলাপ ও আক্ষেপে কোন ফলপ্রাপ্তির আশা নাই।”

খোদাদাদের জী চিকিৎসকের নিকট তাঁহার বিপদের কথা আত্মপূর্ণিক বিবৃত করিলেন। চিকিৎসক বলিলেন, “তাহা হইলে আপনি অনর্থক এ ভাবে শোক করিবেন না, বাহাদুর! আপনার স্বামীর প্রতি এই প্রকার শৈশাচিক অভ্যাসের করিয়াছে, তাহাদিগকে ইহার প্রতিকূল প্রদানের চেষ্টা করুন। আমি আপনার

আহত
স্রমি
ক্রোড়ে
সাধবা

প্রতিহিংসার
পরামর্শ

সঙ্গে খোদাদাদের পিতার রাজধানীতে উপস্থিত হইতে পারি। আমার বিশ্বাস, তিনি সুবিচার করিবেন।” খোদাদাদের পত্নী চিকিৎসকের এই প্রস্তাব সঙ্গত জ্ঞান করিয়া, চিকিৎসকের সহিত রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

একটি সন্ধ্যায় উপস্থিত হইয়া, খোদাদাদের পত্নী ও চিকিৎসক রাজ্যের নতুন সংবাদ কি, তাহা জানিবার জন্য কয়েক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলিল, “রাজ্যের মধ্যে বড় গোপালগোপ উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের রাজ্যের একটি পুত্র ছিলেন, তিনি নিরুদ্দেশ হইয়াছেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। এই রাজপুত্র ছদ্মবেশে রাজ্যের চাকুরী করিতেন, তিনি রাজ্যের বিরুদ্ধে বেগমের পুত্র। এই রাজপুত্রের জন্য সকলেই বড় হুঃখিত, তাঁহার অনেক গুণ ছিল; রাজ্যের বিভিন্ন মহিষীর গর্ভজাত আরও উপলব্ধি পুত্র রহিয়াছে, তাহারা কেহই গুণে বীরকে খোদাদাদের তুল্য নহে। রাজা পুত্রশোকে বড়ই কাতর হইয়াছেন। সকলেরই অল্পমান, খোদাদাদ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, নতুবা তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইত।”



চিকিৎসক সকল কথা শুনিয়া, খোদাদাদের পত্নীকে বিরোজা বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিবার পরামর্শ দান করিলেন। কিন্তু পাছে অজ্ঞাত রাজপুত্র তাঁহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাঁহাকে কোন বিপদে ফেলেন, এই ভয়ে চিকিৎসক তাঁহাকে সেই সন্ধ্যায় কয়েক দিন গোপনে বাস করিবার জন্য অহরোধ করিয়া, স্বয়ং রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সকল ঘটনা জানিয়া আসিবার ইচ্ছা করিলেন।

প্রাসাদসমীপে উপস্থিত হইয়া চিকিৎসক দেখিলেন, এক জন সম্ভ্রান্ত রমণী একটি অশ্রুতরে আরোহণ করিয়া পথ দিয়া যাইতেছেন। অশ্রুতরটি সুসজ্জিত, রমণীর সঙ্গে বহুসংখ্যক কাকিাদাস। রমণীকে দেখিয়া পথিপ্রান্তস্থ লোকেরা অবনত-মস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিতেছে। চিকিৎসকও সেই রমণীকে অভিবাদন করিলেন; তাহার পর তাঁহার নিকটবর্তী এক জন ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হনি কি বেগম?” ফকির বলিল, “হা ভাই, হনি এক জন বেগম, খোদাদাদের জ্ঞানী বলিয়া লোকে ইহার প্রতি অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করে, খোদাদাদের রূপ-গুণের কথা অবশ্যই তোমার অজ্ঞাত নহে।”



চিকিৎসক আর কোন কথা না বলিয়া বিরোজা বেগমের অঙ্গসংগ করিলেন। বিরোজা একটি মসজিদে উপস্থিত হইয়া, উপাসনায় যোগদান করিলেন এবং পুত্রকে ফিরিয়া গাইবার আশায় দরিদ্র ও ভিক্ষুকদিগকে ভিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। অনেক লোক তাঁহার চারিদিকে জমিল। সেই জনমণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চিকিৎসকও বিরোজা বেগমের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন; বেগম যে উপাসনা করিলেন, তাঁহার সকল কথাই তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি এক জন রক্ষীকে নিম্নস্বরে বলিলেন, “ভাই, বেগম সাহেবকে একটা অতি আবশ্যকীয় ও গোপনীয় কথা বলিতে চাই, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার কোন উপায় আছে কি?” রক্ষী বলিল, “যদি আপনি খোদাদাদ সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চান, তাহা হইলে আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, বেগম সাহেবের সঙ্গে আপনার কথা চলিতে পারে, কিন্তু যদি অন্য কোন বিষয়ে আপনি কথা বলিতে চান, তাহা হইলে আপনি তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারিবেন না; অন্য কথা শুনিবার বা বলিবার তাঁহার এখন অবসর নাই, পুত্রশোকে তিনি যৎপরোনাস্তি কাতর হইয়াছেন।” চিকিৎসক বলিলেন, “আমি তাঁহার পুত্র সম্বন্ধে কোন আবশ্যক কথা বলিতে চাই, আমার অন্য কোন কথা নাই।” অল্পচর বলিল, “তাহা হইলে আপনি আমার সঙ্গে প্রাসাদে আসুন, শীঘ্রই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।”

চিকিৎসকমুখে
বড়মুখ প্রকাশ



কিরোজা বেগম প্রাসাদে উপস্থিত হইলে অল্পস্বল্প মনিয়ে তাঁহাকে জানাইল, “এক জন অপরিচিত লোক তাঁহাকে রাজপুত্র খোদাদাদ সখকে কোন কথা বলিতে আসিয়াছেন।” বেগম এই সংবাদ শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে বলিলেন, “তাঁহাকে শীঘ্র আমার নিকট হাজির কর।” বেগম দুই জন মাত্র দাসীর সহিত চিকিৎসকের সহিত নাকাত করিলেন। চিকিৎসক খোদাদাদ ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ সখকে যে কিছু কথা দরিয়া-বাদ রাজকর্তার মুখে শুনিয়াছিলেন, তাহা খোদাদাদের জননীকে বলিলেন। রাজপুত্রগণ বড়মুখ করিয়া তাঁহার পুত্রের দেহে অনন্থা অত্যাচার করিয়া, তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল শুনিয়া বেগম হৃদয়ে দুঃখিতা হইয়া পড়িলেন। দাসীমুখ তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদনের চেষ্টা করিল, বিস্তর চেষ্টার পর তিনি সজ্ঞাগত করিলে চিকিৎসক তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন। কিরোজা বেগম বলিলেন, “আপনি অবিলম্বে দরিয়াবাদ রাজকর্তার নিকট প্রত্যাগমন করিয়া তাঁহাকে বলুন, রাজা শীঘ্রই তাঁহাকে পুত্রবৎরূপে গ্রহণ করিবেন, আর আপনি আমার পুত্রের সংবাদ আনিয়া আমার যে উপকার করিলেন, এ জন্য শীঘ্রই আপনি উপযুক্ত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবেন।”

চিকিৎসক সন্তুষ্ট-মনে সরাসরি প্রত্যাগমন করিলেন। বেগম সোফায় পড়িয়া পুত্রের দুর্ভাগ্যের কথা চিন্তা করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, দাসীগণ তাঁহার অঙ্গর সহিত অশ্রু মিশাইতে লাগিল।

বেগম এই ভাবে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন, এমন সময় রাজা বেগমের কক্ষে প্রবেশ করিয়া, ব্যগ্রভাবে তাঁহার বিলাপের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, খোদাদাদের কোন বিপদের সংবাদ বেগমের কর্ণগোচর হইয়াছে কি না, তাহাও জানিতে চাহিলেন। বেগম অশ্রুপূর্ণমোচনে কাতরভাবে বলিলেন, “জাহাঙ্গীর, আমি কোন আশা নাই, সকলই শেষ হইয়াছে, আমি আমার পুত্রের শেষকীর্ত্তি করিতে পারিলাম না, আমার লক্ষ্যেই তাঁহার মৃতদেহ গ্রাস করিয়াছে।” চিকিৎসক কিরোজা বেগমকে খোদাদাদ সখকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, বেগম রাজার নিকট সেই সকল কথা বর্ণনা করিলেন, খোদাদাদের ভ্রাতৃগণ কৃত্রিমের দ্বারা কিরূপে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার প্রাণসংহার করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

দরবার সম্বাস
আদেশ



রাজা সকল কথা শুনিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, তিনি গর্জন করিয়া বলিলেন, “বেগম, তুমি নিশ্চয় জানিও, যে নরপিশাচগণ তোমার নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত করিয়াছে এবং আমাকে আমার উপযুক্ত পুত্র-র হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তাহাদিগকে উপযুক্ত দণ্ড দান করিব।” রাজা আর কোন কথা না বলিয়া ক্রোধভরে দরবারে উপস্থিত হইলেন, সেখানে উজীর ও বিবিহ অমাত্যদিগকে কক্ষচারিগণ তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা রাজার উগ্রমুখ দেখিয়া, তাঁহার ক্রোধের কারণ বুঝিতে পারিলেন না, সকলেই ভয়ে কম্পান-কলেবরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, উজীরকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, “হোসেন, তোরাকে আমি এখন যে আদেশ করিব, তাহা অবিলম্বে পালন করিতে হইবে। তুমি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাজপুত্রগণকে বন্দন করিয়া, তাহাদিগকে অন্ধকারপূর্ণ কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখ, নরহত্যাচারিগণকে যে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়, তাহাদিগকেও সেই কারাগারে আবদ্ধ করবে। কোন কারণে আমার আদেশ লঙ্ঘন করবে না।” এই ভীষণ আদেশে রাজকক্ষচারিগণ সকলেই ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন, কেহই এই অস্বাভাবিক আদেশের কারণ নির্ণয় করিতে পারিলেন না। সকলেই নতমস্তকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। রাজা দরবার ত্ত্ব করিয়া উজীরের প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষা রাজসভাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকণ পরে উজীর প্রত্যাগমন করিলে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমার আদেশ পালন করিয়াছ ?” উজীর বলিলেন, “হাঁ জাহাপনা, রাজপুত্রগণকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া আনিতেছি।” রাজা বলিলেন, “আমার আশ্রয় একটি আদেশ আছে, আমার সঙ্গে এস।” রাজা দরবার ভাগ করিয়া বিরোজা বেগমের মহলে প্রবেশ করিলেন, উজীর রাজার অহুসরণ করিলেন। খোদাদাদের পত্নী দরিয়াবাদ রাজকন্যার কোথায় সন্ধান পাওয়া যাইবে, রাজা বেগমের নিকট জাহিয়া লইয়া উজীরকে বলিলেন, “তুমি সেই দরয়ে যাও, সেখানে যে রাজকুমারী বাস করেন, তাঁহাকে সমস্তই প্রাণদে লইয়া এসো।”

উজীর দরিয়াবাদ রাজকন্যার জন্ত একটি সুসজ্জিত অশ্বতর লইয়া সরাই অভিমুখে যাত্রা করিলেন, দরয়ে উপস্থিত হইয়া, উজীর বিশেষ সন্ধানের সহিত রাজকন্যাকে রাজার আদেশ জ্ঞাপন করিলেন। রাজকন্যা সরয়ে আর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া, উজীর কর্তৃক আনীত অশ্বতরে আরোহণ করিয়া, রাজপ্রাসাদে যাত্রা করিলেন, চিকিৎসকও একটি সুবৃহৎ তাতারীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া রাজকন্যার অহুসরণ করিলেন। অবিলম্বে রাজধানীতে সকলেই জানিতে পারিল, এত সমারোহে যিনি প্রাসাদান্তিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, তিনি খোদাদাদের স্ত্রী, সকলে সম্মানের সহিত তাঁহার অভিধান করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাজপথ জনপূর্ণ হইল। সকলেই খোদাদাদের জন্ত হা-হুতাশ করিতে লাগিল।

দরিয়াবাদ রাজকন্যা প্রাসাদ-সমীপে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রাজা প্রাসাদদ্বারে তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন, রাজা পুত্রবধূর হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে বিরোজা বেগমের অভয়গুরে লইয়া চলিলেন। খোদাদাদের শিভা-মাতাকে দেখিয়া রাজকন্যার শোকাবেগ শতগুণে বর্ধিত হইয়া উঠিল। তিন জনের অক্লান্তি প্রবলবেগে নির্গত হইয়া পরস্পরকে দাবিত করিতে লাগিল। অবশেষে দরিয়াবাদ রাজকন্যা তাঁহার দ্বারীর দ্বার, দ্বার ও তাঁহার প্রতি দ্রত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়া, রাজার নিকট হুবিচার প্রার্থনা করিলেন। রাজা পুত্রবধূকে শাসনা দান করিলেন, বলিলেন, “বৎসে, তুমি নিষ্ঠুর জাতিও, আমি এই নরাদমণ্যকে কখনও ক্ষমা করিব না, প্রাণদণ্ড করিব, তবে খোদাদাদ যে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহার উপযুক্ত প্রাণদণ্ড সাংগ্রহ করিতে হইবে। সত্যই তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে তাহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণার্থ কিছু অহুতানের আয়োজন করাও আবশ্যক।” রাজা উজীরকে একটি উৎকৃষ্ট সমাধিমন্দির নির্মাণের আদেশ দান করিয়া, দরিয়াবাদ রাজকন্যার জন্ত প্রাসাদের একটি উৎকৃষ্ট মহল নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই সমাধিমন্দির নির্মিত হইল, সমাধিমধ্যে খোদাদাদের একটি স্তম্ভি সংস্থাপিত হইল। রাজা আন্তোষ্ঠিক্রিয়া দিনও স্থির করিলেন।

আন্তোষ্ঠিক্রিয়া বধাবিধানে শেষ হইলে রাজা আদেশ করিলেন, অষ্টাহ পরে রাজপুত্রগণের প্রাণদণ্ড হইবে, কিন্তু মহা রাজার প্রতিবেদী কয়েক জন রাজা একত্র সম্মিলিত হইয়া, তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কিছুদিনের জন্ত স্থগিত হইল। এই সংবাদে প্রজাপণের মনে ভয়ের নীমা রহিল না, তাহার একব্যাকে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, “আজ যদি খোদাদাদ জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে কেহই এ রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না।” রাজা তাঁহার সৈন্তগণকে সজ্জিত করিয়া, শত্রুগণের আগমন প্রতীক্ষা না করিয়াই তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্ত রাজধানী হইতে বহির্গত হইলেন।



এ বিকে শক্রসৈন্তগণ একটি প্রাণন্ত প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ সম্মিলিত হইল, রাজা সৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, অনেককাল পর্যন্ত উভয়পক্ষে তুণ্ড যুদ্ধ হইল, অর-পরাক্রম কিছুই স্থির হইল না, অবশেষে রাজার সৈন্তগণ শত্রুহতে পরাজিত হইল। রাজা শত্রুহতে শীঘ্রই বন্দী হইবেন, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিল।

কিন্তু সহসা যুদ্ধক্ষেত্রে একদল অসামান্য সৈন্ত প্রবেশ করিল। তাহারা কোন্ পক্ষের সৈন্ত, প্রথমে তাহা রাজা কিংবা তাঁহার শত্রুগণ কেহই স্থির করিতে পারিল না। শীঘ্রই সকলের সন্দেহ দূর হইল, অসামান্য-গণ প্রচণ্ডভাৱে রাজার শত্রু-সৈন্তগণের উপর নিপতিত হইল এবং অবিলম্বে তাহাদিগকে বধ করিল, কেহই পলায়ন করিয়া আশ্রয়স্থান গমন করিল না।

সংগ্রামে
বীরের
আবির্ভাব



এই সকল সৈন্ত কাহার এবং কোথা হইতে সহসা সংগ্রামক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া পরাক্রম-বৃদ্ধিতে রাজাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিল, রাজা তাহা বুঝিতে না পারিয়া এই সকল সৈন্তের সেনাপতির সহিত সাক্ষাতের জন্ত আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সেনাপতি অবিলম্বে রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া সজ-চর্য বন্দনা করিয়া, মাথা ভূমিতেই রাজা সম্মুখে দেখিলেন, সেই নবগত সৈন্তদলের সেনাপতি আর কে নহে, তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র খোদাবাব। রাজা পুত্রকে দেখিয়া আনন্দে বিষয়ে অশ্রু-মোচন করিতে লাগিলেন। পুত্রকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া, কিয়ৎকাল নির্ঝাঁকুভাবে অবস্থান করিলেন, তাহার পর খোদাবাব বলিলেন, “বাবা, আপনি মনে করিয়াছিলেন, আমি ইহলোকে পরিত্যাগ করিয়াছি, স্তব্ধরূপে আমি সহসা আপনার সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া আপনি বিস্মিত হইয়াছেন। আল্লা আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। তাই আজ শত্রুগণের কবল হইতে আপনাকে উদ্ধার ও তাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হইলাম।” রাজা বলেন, “আমি বাহ্যিক বৃত্ত জানি করিয়া এত দিন শোক-দুঃখে আচ্ছন্ন ও স্তব্ধ হইয়াছিলাম, এত দিনে কি হাতে কিরিয়া পাইলাম?” লোকের আনন্দ ও বিষয়সমাকুলদৃষ্টিতে পিতাপুত্রের মিলন সন্দর্শন করিতে লাগিল।

মিলন-উৎসবের
আনন্দ-প্রবাহ



রাজা খোদাবাবকে বলিলেন, “বৎস, তোমার ভ্রাতৃগণকে তুমি রাজ্যের কবল হইতে উদ্ধার করায় তাহারা তোমার প্রতি যে ভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, তাহা আমি অংগত হইয়াছি। তাহাদের কৃতজ্ঞতার শক্তি, কাল তাহারা পাইবে। তুমি এখন প্রাসাদে চল, তোমার মাতা বহুদিন তোমার অপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে। তুমি প্রাণত্যাগ করিয়াছ ভাবিয়া জীবন্মূর্তের স্রাব অবস্থান করিতেছেন। তুমি আজ এই যুদ্ধ করিয়াছ শুনিলে তাঁহার মনে কতই আনন্দের সঙ্গ হইবে।” খোদাবাব বলিলেন, “আপনি আমার কথা কাহার কাছে শুনিবেন, জানিতে ইচ্ছা করি, আমার কোন ভ্রাতা কি অহুত-পুত্র-চিহ্নে একথা বীকার করিয়াছে?” রাজা বলিলেন, “না, তোমার ভ্রাতৃগণ আমার নিকট তোমার দ্বন্দ্বের কোন কথা প্রকাশ করে নাই, দরিয়াবাব রাজকুমারীর নিকট আমি সকল কথা শুনিয়াছি, তিনি সম্ভ্রান্তি আমার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া তোমার প্রতি অত্যাচারের জন্ত আমার নিকট হৃদয়চারণ করিয়াছেন।” খোদাবাব এই সংবাদে ব্যংগবোধিত আনন্দিত হইলেন। তিনি রাজাকে বলিলেন, “জাহাঙ্গীর চলুন, প্রাসাদে গিয়া অগ্রে জননীর চরণবন্দনা করি, আমি তাঁহার অশ্রুচোচনের জন্ত একান্ত অধীর হইয়া পড়িয়াছি, দরিয়াবাব রাজকন্যাকেও অবিলম্বে মাগ্নানাদান করা আবশ্যক, তিনি আমার অপেক্ষা বড়ই কাতর হইয়াছেন সন্দেহ নাই।”

রাজা প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া সৈন্তগণকে বিদায় করিলেন। প্রজাবর্গ আনন্দ-কোলাহলে খোদাবাবের স্নান করিতে লাগিল, রণজয়ের জন্ত এবং খোদাবাবের প্রত্যাগমনের সংবাদে আনন্দিত হইয়া সকলে খোদাবাব নিকট তাঁহার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করিতে লাগিল।

কিছুপে খোদাদাদের প্রাণরক্ষা হইল, তাহাই জানিবার জন্য অতঃপর সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। খোদাদাদ তাঁহাদিগকে বলিলেন, “তিনি যে ভাষিতে আবার-ব্রণায় অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়া ছিলেন, সেই ভাষার নিকট দিয়া এক জন কৃষক একটি অশ্বতরে আরোহণ করিয়া, কার্যোপলক্ষে অজ্ঞত ঘাইতেছিল। সে কৌতূহলবশে সেই শিবিরে প্রবেশ করিয়া, আমাকে একাকী রক্তাক্ত-দেহে শযায় নিশ্চিন্ত দেখিতে পায় এবং আমাকে তাহার অশ্বতরে তুলিয়া গৃহে লইয়া যায়। সেখানে কৃষকের চিকিৎসা ও গুপ্তবাগ্ধে আমি অল্পকালের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠি। দেহে ব্যথিত বল লাভ করিয়া আমি আমার কীবনদাতা সেই কৃষককে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম, আমার নিকট যে সকল মূল্যবান হীরকরত্নাদি ছিল, তাহা তাহাকে পুরস্কার দান করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাতে যাত্রা করিলাম; কিন্তু কিয়দূর আসিয়াই শুনিলাম, আমার পিতাকে প্রতিবেশী রাজগণ মৈত্র্যে আক্রমণ করিয়াছে। এই সংবাদে আমি আশ্চর্যচিত্র প্রদান করিয়া, রাজ্যের নানা স্থান হইতে বহুসংখ্যক সৈন্ত সংগ্রহ করিলাম, আমার আস্থানমাগ্রে সকলে সম্মত হইয়া আমার পতাকাসূত্রে সমবেত হইল। আমি তাহাদিগকে শত্রুগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত করিলাম। অবিলম্বেই শত্রুসৈন্ত ধ্বংস হইয়া গেল।”

রাজা খোদাদাদের মুখে সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, “প্রজাগণ, অমাত্যমণ্ডলী, কল্পণাময় আমার অল্পগ্রহেই খোদাদাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছে, তোমরা সকলে তাঁহাকে একজন ধন্যবাদ দাও, আজ খোদাদাদের শত্রুগণের প্রাণদণ্ড হইবে।” খোদাদাদ এই কথা শুনিয়া করযোড়ে পিতাকে বলিলেন, “বাবা, আমার ভ্রাতৃগণ যতই দ্রুত ও কৃত্রিম হউক, আপনি মনে রাখিবেন, তাহারা আপনারই সম্ভান, তাহাদের দেহে আপনার শোভিতই প্রবাহিত হইতেছে। আমার প্রতি তাহারা যে অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহা ক্ষমা করিলাম, আমার প্রার্থনা, আপনিও তাহাদিগের অপরাধ মার্জনা করুন।” খোদাদাদের মুখে এই মহত্বের কথা শুনিয়া—তাহার এই প্রকার কমানীশক্তির পরিচয় পাইয়া রাজা আনন্দে অশ্রুবর্ণন করিতে লাগিলেন, রাজা খোদাদাদের গুণের পুরস্কাররূপে রাজহুট্ট তাঁহার নিকটে স্থাপন করিয়া, তাঁহাকে রাজসিংহাসন সমর্পণ করিলেন। আনন্দে প্রজাবর্গ জয়জয়ি করিতে লাগিল।

অতঃপর রাজা শৃংখলাবদ্ধ রাজকুমারগণকে দরবারে উপস্থিত করিবার আদেশ করিলেন। খোদাদাদ যথেষ্ট তাহাদিগকে শৃংখলবদ্ধ করিয়া, সাদরে আলিঙ্গন দান করিলেন। প্রজাগণ খোদাদাদের মহত্ব ও উদারতা দর্শন করিয়া, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। চিকিৎসক বহু পুরস্কার লাভ করিলেন।



মন্ত্রণা-
হত
রাজ-
পুত্রের
জীবন
দান



পরিচয়-বিহীন
রাজপুত্র-শিবে
বিজয়-হুট্ট



এই কাহিনী শেষ করিয়া শাহারজাদী, সুলতানকে বলিলেন, "জাহাঙ্গীরা, খালিক হাকিম-অল-রসিদের ইচ্ছা অনুযায়ী বন্ধন বন্ধ করিয়াছি, তাঁহা প্রবণ করিয়া আপনি বেরূপ আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা হইলেই নিম্নোক্ত-কাহিনী প্রবণ করিয়া, আপনি তাহা অপেক্ষাও অধিক আনন্দ লাভ করিবেন। অতঃপর হইলে আমি সেই কাহিনী বলিতে পারি।" শাহারজাদীর অল্পম সৌন্দর্য্য-দীপ্ত বদনে নরেন বোধসের অমল চুম্বনরোখা মুগ্ধিত করিয়া, সুলতান প্রসন্ন অন্তরে অল্পমতি নান করিলেন, কিন্তু তখন আর স্মৃতি ছিল না বলিয়া, শাহারজাদী সে দিন নিবৃত্ত হইলেন। পরদিন শেখরাজিতে মিনারজাদী তাঁহার নিম্নোক্ত করিলে, শাহারজাদী প্রমোদ-প্রকুরমুখে 'নিম্নোক্তের নিম্নোক্ত' গল্পটী আরম্ভ করিলেন।



আবু হোসেন



খালিক হাকিম-অল-রসিদের রাজত্বকালে বোম্বাদ নগরে এক জন ধনবান সদাগর বাস করিতেন, এই সদাগরের একটি পুত্র ছিল, পুত্রটির নাম আবু হোসেন, 'বয়স প্রায় ত্রিশ বৎসর। আবুর পিতা আবুকে অতি সাবধানে প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছিলেন, কখন তাহাকে বিলাসিতা শিখিবার অবসর প্রদান করেন নাই। যত দিন বৃদ্ধ বাচিয়া ছিলেন, আবুকে সর্বদা চক্ষুর উপর রাখিতেন। অবশেষে বিপুল অর্থ রাখিয়া, আবুর পিতা পরলোক-বাস্তা করিলেন। সংসারে আবু ও তাহার বিধবা জননী ভিন্ন অন্য কেহ ছিল না, আবুই পিতৃবিয়োগের পর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী হইল। আবু পৈতৃক সম্পত্তি পাইয়া হই হাতে টাকা উড়াইতে লাগিল, দেশের বহু অপদার্থ কুটরিত্র লোকের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হইল, আমোদ-প্রমোদ ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন কাজ রহিয়া না। আবু বিবেচনা করিল, যদি সকল অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে কষ্ট পাইতে হইবে, এজন্য সে তাহার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ তাহার গৃহের নিম্নে স্তম্ভিকার মধ্যে প্রোথিত করিয়া, অবশিষ্টাংশ ঘায়া বন্ধুবর্গের সহিত বিলাসলালন। চরিতার্থ করিতে লাগিল। সমবয়স্ক বন্ধুবর্গের সহিত দিব্যাত্রি অবিশ্রান্তভাবে নৃত্য-গীত, আমোদ-উৎসব, পান-আহার চর্চা লাগিল। হুন্দরী নর্তকীগণ হুন্দ্র নৃত্যে ও গায়িকাগণ হুন্দ্র গানে তাহাদিগের দর্শন ও ব্রহ্মশাস্ত্র পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল।

এই ভাবে নৃত্য-গীত, আমোদ-আজাদ এক বৎসরকাল চলিল, এক বৎসর শেষ হইতেই আবু হোসেনের অর্থ শেষ হইয়া আসিল। যে অর্দ্ধাংশ আবু বায়ের জন্ত রাখিয়াছিল, তাহারও কপর্দকমাত্র অবশিষ্ট রহিল না। আবুর বন্ধুগণ দেখিল, নধুচক্রের মধু ফুয়াইয়াছে, স্তম্ভরায় তাহারা আবুর সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিল। আবুর সহিত আর তাহারা লাক্ষ্য করিতেও সম্মত হইল না, এমন কি, আবু তাহাদের কাহারও সহিত কথা কহিবার চেষ্টা করিলেও সে জরুরী কাজের ছলনা করিয়া অন্তরে প্রস্থান করিতে লাগিল। বন্ধুগণের এই প্রকার ছদ্মহীনতায় সরলহৃদয় আবুর অন্তরে বড় আঘাত লাগিল; তাহাদিগকে ঘোরতর অকৃতজ্ঞ বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং সেই সকল নরপুত্রের স্ত্রীত্যাগের জন্ত এত সম্পত্তি নষ্ট করিয়াছে মনে করিয়া, তাহার মনে অগ্নিশোভার উদয় হইল। অর্থ-শোকে—ইয়ারগণের কৃতঘ্নতা দ্রবণে গুহ্মে আবু স্ত্রিয়মাণ করিয়া পড়িল, মৃৎ ও কাইয়া গেল, মাথা বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল, শেষে এক দিন সে মনের নিদারুণ বেদনা সহ করিতে না পারিয়া, তাহার বৃদ্ধা জননীর ককে প্রবেশ করিল এবং তাহার মাতার নিকট বিষয়-গভীরমুখে বসিয়া পড়িল।

হুন্দরী
কোয়ারার
অর্থরানি
নিশেবিত



পুত্রের অবস্থা দেখিয়া জননী জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাবা, আজ তোর কি হইয়াছে? যুথ এত মদিন
ন? সর্বত্র বৃষ্টি উড়াইয়া দিয়াছ? আমি ত’ পূর্বেই বলিয়াছিলাম, একশ নবাবী করিলে ছুদিনেই সব
হইয়া বাইবে, তখন এ হাজার কথা বড় কই লাগিত। বাহা ইউক, ভবিষ্যতের জন্ত যে অর্ধেক অর্থ
গণণে পুত্রী রাখিয়াছ, সে অতি উত্তম কাজ করিয়াছ। এখন সেই অর্থ দ্বারা সপোরগাতা নির্মাণ কর,
সার আমোদপ্রমোদে অনর্থক অর্থ নষ্ট করিও না। তোমার বন্ধুবর্গকে ত’ চিনিয়াছ, আমোদপ্রমোদে কত
লুপ্ত, তাহা ত’ জানিয়াছ, এখন বাহুবের মত হইয়া গৃহকর্ম কর।” আবু কাসিমের কীমিতে বলিল, “মা,
দারিদ্র্য-ব্রতী কেনন ভয়ানক, আমি তাহা এত দিনে বুঝিতে পারিয়াছি। হুবা অন্তঃসমন করিলে জগৎ
অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, দারিদ্র্য উপস্থিত হইলেও জীবন অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠে। আমি দিবারাজ
আমার হৃৎকের কথা চিন্তা করিতেছি। মাহুব দরিদ্র হইলে কি বন্ধুগণ পর্বত তাহার গহিত বাক্যালাপের
অবদর পায় না? বাহা ইউক, আমার চৈতন্যোদয় হইয়াছে, আমার আমোদের নেশা কাটিয়া গিয়াছে,
আমার মোহনিদ্রা ভাঙিয়াছে, আমি আর চাটিকারের ফাঁদে পাইব না। কিন্তু মা, আমি এখনই আমার
দক্ষিত অর্থে হাত দিতেছি না, আমি এত দিন ধরিয়া যে সকল বন্ধুকে ‘কুণ্ঠিত দিবার অজল অর্থ’ বার
করিয়াছি, তাহারা কি ভাবে আমার নিকট রুতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহার একবার পরিচয় লইতে হইবে।
তাহাদের স্বয়ং পরিচয় লইব মাত্র, তাহাদের নিকট কোন উপকারের প্রত্যাশা করি না।”

“আবুর জননী বলিলেন, “বৎস, তুমি যে মংলব করিয়াছ, তাহাতে আমি বাধা দান করিব না, তবে
আমি এ কথা তোমাকে পূর্বেই বলিয়া রাখিতেছি, তোমার আশা পূর্ণ হইবে না। পৃথিবীতে নিমকহারামের
সংখ্যা অনেক, তাহাদের মনের ভাব পরীক্ষা করিতে যাওয়া নিতান্তই বৃথা। তোমার নিজের যে অর্থ দক্ষিত
আছে, তাহা ত্রিশ অজ্র কাহারও অর্থের প্রত্যাশা করিও না। তুমি ও তোমার মত অবিবেচক নবাবেরা হঠাৎ
বাহাদিগকে বন্ধ বলিয়া মনে করে, তাহারা যে কিরূপ বন্ধ, তাহা তোমার বৃথিব্য সামর্থ্য নাই, কিন্তু
এখন বোধ করি বুঝিতে পারিবে।” আবু বলিল, “মা, আমি তোমার কথা বুঝিয়াছি, তথাপি স্বয়ং
একবার বন্ধুগণকে পরীক্ষা করিয়া দেখি।”

আবু হোসেন বন্ধুগণের গৃহে গৃহে গমন করিয়া, তাহাদিগকে-নিজের হৃৎকের ও হ্রসবহ্বার কথা জানাইল;
বলিল, “ভাই, বাহা ছিল, তাহা ত’ আমোদপ্রমোদেই উড়াইয়া দিয়াছি, আমরা সকলেই তাহা সমানভাবে
ভোগ করিয়াছি, এখন মহলা এই প্রকার অর্থকষ্ট উপস্থিত, যদি আমার এ হ্রসবহ্বার তোমরা কিছু টাকা ধন
দাও, তাহা হইলে অনাহারে আমার শ্রম বিহীন হইবে। তোমরা আমার প্রাণের বন্ধু, আমার এ
হঃসময়ে আমার মুখের দিকে না চাহিলে আর আমি কাহার নিকট সাহায্যলাভের আশা করিব? আমার
দি ভাই কখন স্থলময় আসে, তখন আমি তোমাদের উপকারের কথা ভুলিব না।”

আবু হোসেনের হৃৎকে কোন বন্ধুরই স্বয়ং বিগলিত হইল না। কেহই তাহাকে কপটকমাত্র গাফা দান
করিল না, এমন কি, কেহ বলিল, “তুই কে? কেন এখানে আসিয়াছিস? আমার সঙ্গে আমার
আলাপ কবে হইল? আমি তোকে চিনি না, এখান হইতে দূর হ?” লজ্জায়, স্বপ্নায় কপটবন্ধুগণের
গৃহ হইতে আবু নিজের গৃহে ফিরিয়া আসিল; যাতাকে বলিল, “মা, তুমি বাহা বলিয়াছ, তাহাই ঠিক,
সকল বেটাই বাদীর বাচ্চা, নিমকহারাম, হারামজাদা, বন্ধুদের বেগা কেহই নহে। যথেষ্ট হইয়াছে,
আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই সকল কপট বন্ধুর আর কখন সুখও দেখিব না, আমার
যথেষ্ট শিক্ষা হইয়াছে।”

ইহার জমানে
বাহু খাল

বন্ধুর মুখের
খসিল!

এক দিনের
বন্ধু-সংবাদ।

আবু হাশিমের নিকট যে প্রেক্ষিকা করিল, তাহা হইতে বিচলিত হইল না। এই প্রেক্ষিকা হির রাশিবার
কর আবু সংকার করিল, বোম্বাইয়ের কোন লোকের সঙ্গে আবু সে আমোদ-প্রমোদ করিবে না। অন্যতর
কর হইতে আবু তাহার সুকিত অর্থ উত্তোলন করিল। সেই অর্থ দ্বারা সে অতি সাধবানে সন্ধ্যাভাষা নিকা
করিতে লাগিল। সে রিতীয়বার প্রেক্ষিকা করিল, সে প্রত্যহ এক জন জিন্দেগীর লোককে সঙ্গে লইয়া আহাশ ও
আমোদ-প্রমোদ করিবে, প্রত্যহ তাহাকে বিদায় করিয়া দিবে, আবু তাহাকে দ্বিতীয়বার আশ্বাস করিবে না।
আবু প্রত্যহ দুই জনের উপস্থিত থাকার আয়োজন করিয়া, বোম্বাই নগরের একটি সাঁকোর কাছে
কোন বিশেষ অতিথির দর্শনাকাজ্জার বসিয়া থাকিত, কোন অপরিচিত বৈদেশিককে দেখিতে পাইলেই
তাহাকে লম্বাঘরের সহিত গৃহে লইয়া গিয়া, আতিথা-সংকার করিত, প্রত্যহ তাহাকে বিদায় করিয়া দিত।



গোলাচ-
খানার
বাদশাহ

অতিথির সহিত তাহার অর্ধরাত্রি
পর্যন্ত নানা বিষয়ে কথাবার্তা
চলিত। এইরূপে যে ব্যক্তি তাহার
আতিথা-স্বীকার করিত, তাহা-
কেই আবুর সন্মুখভাগ মুখ হইতে
হইত, কিন্তু দ্বিতীয়বার আবু
তাহার আবুর দ্বারস্থ হইবার
সম্ভাবনা থাকিত না।

আবু হোসেন কোন দিনও
এই নিয়ম হইতে বিচলিত হইত
না; যদি আবুর পরিচিত কোন
অতিথি তাহার সহিত আগাগ
করিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত,
আবু তাহাকে চিনিয়াও চিনিত
না। এই ভাবে সে বহু দিন
অতিবাহিত করিল।

এক দিন আবু হোসেন সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে এক জন অপরিচিত বৈদেশীর সন্ধানে সেই সাঁকোর ধারে
বসিয়া আছে, এমন সময় বোম্বাইয়ের খালিক হারুন-অল-রশিদ ছদ্মবেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আবু
হোসেন তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। সে দিন হারুন-অল-রশিদ মোসলের এক জন সদাগরের ছদ্মবেশ ধারণ
করিয়াছিলেন; সঙ্গে এক জনরাত্ৰী জুতা ছিল।

খালিক হারুন-অল-রশিদের গভীরদৃষ্টি দেখিয়া তাঁহাকে মোসলের সদাগর বলিয়াই আবু হোসেনের বিশ্বাস
জন্মিল। আবু হোসেন উঠিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বসিল, “মহাশয়ের নজল হউক, আমি আজ
আপনাকে আমার গৃহে আতিথা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছি, দয়া করিয়া আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।
আমার গৃহে অনায়াসেই আপনি রাত্রি দ্বন্দ্বে করিতে পারিবেন।” আবু তাহার আতিথা-সংকারের নিয়মের
কথাও সংক্ষেপে ছদ্মবেশী খালিকের গোচর করিল। খালিক আবু হোসেনের এই অদ্ভুত বাবহাষের কারণ
জানিবার জন্য উৎসুক হইলেন, তিনি আবু হোসেনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া, তাহার সঙ্গে তাহার গৃহে চলিলেন।

আবু জানিত না যে, খালিককে নিমন্ত্রণ করিয়াছে; সুতরাং সে তাঁহার সহিত স কক্ষ ব্যক্তির দ্বারা
ব্যাংহায় করিতে লাগিল। একটি মুক্য় কক্ষে খালিককে বসাইয়া সে আহারাদির আয়োজন করিল।
আবুর নাতা রফনবিহার্য্য ত্রুনিপুণা ছিল, সে নানা প্রকার স্বাস্থ্যজনক নবাগত অতিথির সমুখে স্থাপিত
করিল। নানা প্রকার মাংসের ব্যঞ্জন টেবিলে বিদ্যায় করিতে লাগিল, সংখ্যায় অত্যন্ত অধিক না
হইলেও তাহা যে উৎকৃষ্ট, এ কথা খালিক বেশ বুঝিতে পারিলেন।

খালিক ও আবু মুখাম্মিহ বসিয়া একান্তমনে আহার করিতে লাগিলেন; কথামাফা, এমন কি, পান
পর্ষ্যন্ত বন্ধ রহিল, স্থানীয় প্রথা অনুসারেই এরূপ করা হইল। আহার শেষ হইলে খালিকের তৃতীয় কল
লইয়া আসিলে খালিক তদ্বারা হস্ত-মুখ প্রক্ষালন করিয়া, আবুর জননী কর্তৃক আনীত নানাজাতীয় সুস্বাদু
ফল খাইতে লাগিলেন। অবশেষে রাত্রি বেশী হইলে আবু তাহার জননীকে খালিকের
তৃত্যের আহারাদির আয়োজন করিতে বলিয়া, খালিককে লইয়া আলোকিত কক্ষে মস্তপান করিতে বলিল।

মস্ত উৎকৃষ্ট ছিল, উভয়ে পানানন্দে মত্ত হইলেন। আবু মস্তপানে বিভোর হইয়া ছদ্মবেশী খালিকের
নানা প্রকার স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। খালিক তাহার আলাপে বড় আনন্দ লাভ করিলেন। খালিক প্রসঙ্গক্রমে
আবুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু বলিল, "মহাশয়, আমার নাম আবু হোসেন, আমার পিতা
সদাগর ছিলেন। তিনি মরিবার সময় অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছিলেন; পুত্র বেশী না হইলেও
তাহাতে আমার সমস্ত জীবন বেশ সুখস্বচ্ছন্দে চলিতে পারিত। আমার প্রতি আমার পিতা বড় সতর্ক
দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, আমার বিশাল-লালসা তাঁহার সতর্কতার জন্ত কোন দিন পরিভূত হইতে পার
নাই। আমি তাঁহার স্মৃতির পর অর্থরাশি হাতে পাইয়া বিলাসপ্রস্রোতে ভাসিতে লাগিলাম, কিন্তু পাছে
সকল নষ্ট করিয়া পথের ভিখারী হইতে হয়, এই ভয়ে আমি অর্ধেক অর্থ মাটিতে পুতিয়া রাখিয়া, অবশিষ্ট
অর্ধেক দ্বারা আমোদপ্রমোদ করিতে লাগিলাম। আমার সমবয়স্ক বোন্দাকের প্রায় অর্ধেক লোক
আমার বন্ধু হইল। আমোদ-প্রমোদ দিবানিশি পূর্ণমাত্রায় চলিতে লাগিল, অবশেষে এক বৎসর বাইতে না
ঘাইতেই আমার সেই অর্ধেক অর্থ নিঃশেষিত হইয়া গেল। আমি তখন আমার সেই কপটবন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে
ঘুরিতে লাগিলাম, কাতরভাবে তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিলাম, কেহ আমার কাতরতায় করুণাত করিল
না, এমন কি, কেহ কেহ আমাকে চিনিতেই পারিল না। আমার মনে বড় দুঃখের উদ্বেগ হইল, সেই সকল
বন্ধুর সংস্রব পরিত্যাগ করিলাম, অবশিষ্ট অর্থ লইয়া, নুতন করিয়া সংসারযাত্রা আরম্ভ করিলাম; প্রতিজ্ঞা
করিলাম, বোন্দাদের কোন লোকের সঙ্গে আর বন্ধুত্ব স্থাপন করিব না, প্রত্যাহ এক জন বিদেশী অতিথিকে
নিমন্ত্রণ করিয়া আতিথ্য-সংকার করিব, তাঁহার সহিত আমোদ-প্রমোদ করিব, পরদিন প্রত্যহে তাঁহাকে
বিদায় করিয়া দিব, তাঁহার সহিত আর কোন বন্ধুত্ব রাখিব না। এই হিলাবেই আমি আমোদ চালাইয়া
আসিচ্ছি, দোভাগ্যবশতঃ আজ আমি আপনায় দ্বায় হুদসিক অতিথি লাভ করিয়া ধন্ত হইয়াছি।"

খালিক আবু হোসেনের কথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আবুকে বলিলেন, "তুমি যে ভাবে
জীবনযাত্রা এখন নির্বাহ করিতেছ, ইহা প্রকৃতই প্রশংসনীয়। তুমি সংসারের প্রলোভনপূর্ণ পিচ্ছল পথে
পড়িয়া আবার উঠিতে সমর্থ হইয়াছ, এবং তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিয়াছ, ইহা দেখিয়া সভ্যই আমি
বড় আনন্দিত হইয়াছি। আমি দেখিতেছি, পৃথিবীর মধ্যে তুমি সকলের অপেক্ষা সুখী লোক। প্রত্যাহই
তুমি নুতন নুতন লোকের সহিত নানা বিধে আলাপ করিতে পার, অথচ কাহারও সহিত স্বার্থবন্ধনে আবদ্ধ
হও না, সুখী তুমি, এল, মস্তপান করা যাক।"



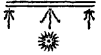
অতিথোর
পূর্বস্বয়



মস্তপান করিতে করিতে স্নানি অধিক হইল। খালিফ বলিলেন, “পথশ্রম হইয়াছে, এখন কিঞ্চিৎ বিশ্রামেরই আবশ্যক, পানাহার ত’ বড় অল্প হইল না, আর আমার জন্ত তোমার ব্যাঘাতের আবশ্যক দেখি না। কন্যা প্রভাতে তোমার নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই আমি সম্ভবতঃ তোমার গৃহ পরিভ্রমণ করিব। তুমি আমার আহারিক কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর। আমার প্রতি তুমি যেরূপ অকৃত্রিম আদর-যত্ন প্রকাশ করিয়াছ, তাহা সকলের নিকট সর্বদা আশা করা যায় না। আমি যে ক্রিপণে তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহা তাবিয়াই পাইতেছি না। আমি অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি নহি, তাহা তোমাকে দেখাইব। তোমার অন্তরে যদি কোন প্রার্থনা, কোন কামনা বা কোন আশা থাকে, তাহা আমাকে বলিতে পার, আমি যদিও এক জন সদাগর মাত্র দেখিতেছি, তথাপি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবার আমার সামর্থ্য আছে; আমি নিজেই পারি, আর বহুগণের দ্বারাই পারি, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিব।”

আবু হোসেন বলিল, “মহাশয়, আপনি যে অত্যন্ত মহাত্ম্যব ব্যক্তি, তাহা আপনার কথার ভাবেই বুঝিয়াছি, আপনার সমুদয়তায় আমি মুগ্ধ হইয়াছি, পৃথিবীতে আপনার হায় সমুদয় ব্যক্তি বড়ই বিরল। আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছি, আমার কোন অভাব, কোন কামনা, কোন প্রার্থনা নাই, আমার বর্তমান অবস্থায় আমি প্রস্তুত হুখী। আপনি যে অল্পগ্রহ পূর্বক আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞ করিয়াছেন, ইহাতেই আমি ধন্য হইয়াছি, আর কোন অল্পগ্রহ প্রার্থনা করি না। তবে একটি কথা আপনাকে বলিবার আছে। একটি কারণে আমার মানসিক শান্তি কিছু আহত হইয়াছে। আমাদের এই পল্লীতে যে মসজিদ আছে, তাহার ইমাম লোকটি বড় পাজী; এমন কপট ও প্রবঞ্চক ব্যক্তি পৃথিবীতে বোধ করি দ্বিতীয় নাই। সে তাহার গৃহে আমার চারি জন প্রতিবেশীকে ডাকিয়া আমার বিরুদ্ধে নানা প্রকার নিন্দা-কুৎসা রটনা করে, আমাকে বলিষ্ঠ রাধিয়া তাহার খেয়াল অহুগারে আমাকে শাসন করিতে চায়। আমি ইহাদিগকে একেবারেই দেখিতে পারি না। কোরাণ ভিন্ন অল্প বিষয় লইয়া যে ইহারা আলোচনা করিবে, ইহা আমার অগ্ৰহ মনে হয়।”

এক দিনের
বাসমাতী
আশা



খালিফ সহাস্যে বলিলেন, “তাহা হইলে তুমি এই দুর্লভগুণকে শাসন করিতে চাহ?” আবু হোসেন বলিল, “হাঁ, আমার ইচ্ছা হয়, যদি এক দিনের জন্তও আমি খালিফ হইতে পারি, তাহা হইলে—” খালিফ পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাহা হইলে কি কর? হাত দিয়া কি উহাদের মাথা কাটিয়া লও?” আবু হাসিয়া বলিল, “না, তত দূর পীড়ন করি না, বাহাতে তাহারা শাসিত হয়, তাহাই করি। আমার প্রতিবেশী বুড়ো ছারিটার পায়ে এক শত বেত্রাবাত করি, আর বুড়ো ইমামটাকে চারি শত বা বেত্র বসাই, একবার উহাদিগকে শিখাইয়া দিই, পরের কথা লইয়া কালবাপন করায় কেমন মজা!”

খালিফ আবু হোসেনের কথা শুনিয়া মনে মনে বড় আনন্দ অহুভব করিলেন। তিনি আবুকে বলিলেন, “তোমার এরূপ ইচ্ছা হইয়াছে শুনিয়া আমি বড় সন্তুষ্ট হইলাম; চেষ্টের দমনের জন্তই তোমার এরূপ আগ্রহ, তাহা আমি বুঝিয়াছি; তোমার আশা পূর্ণ হইলে আমি আনন্দিত হইতাম। বাহা হউক, আমার বিধান, তোমার আশা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব নহে। আমার বোধ হয়, খালিফ তোমার মনোভাব অবগত হইলে তোমার হস্তে তিনি এক দিনের জন্তও তাহার সমস্ত ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন। যদিও আমি এখানে অপরিচিত ব্যক্তি এবং এক জন সদাগর মাত্র, তথাপি আমি তোমার অভীষ্টসিদ্ধির চেষ্টায় কৃতকার্য হইতে পারি, এ বিধান আমার আছে।”

আবু হোসেন বলিল, “আপনি আমার মত নির্দোষের কথা শুনিয়া নিশ্চয়ই পরিহাস করিতেছেন। আমার এই পাগলামির কথা শুনিলে নিশ্চয়ই খালিক হাসিয়া আতুল হইবেন, তবে খালিক ইমামদিগের চরিত্রের কথা আনিতে পারিলে তাহারিগকে যে দণ্ডদান করিবেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।”

খালিক বলিলেন, “আমি সত্যই তোমার কথা শুনিয়া হাসি নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তোমার কথা শুনিয়া খালিক কখনও পরিহাস করিবেন না। এ সকল কথা এখন থাক্, রাজি অনেক হইয়াছে, এখন বিশ্রামের আবশ্যক।”

আবু হোসেন বলিলেন, “বিশ্রামের পূর্বে বোতলের এ মাগটুকু নিঃশেষ করা যাক্। আপনার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, যদি আমার নিদ্রাভঙ্গের পূর্বে আপনি বাহির হইয়া যান, তবে অল্পগ্রহ পূর্বক দরজাটা বন্ধ করিয়া বাইবেন।” খালিক এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

• আবু হোসেন কথা বলিতেছে, এই অবসরে খালিক গেলাসে মদ ঢালিয়া, তাহার মধ্যে এক পুরিয়া চূর্ণ নিক্ষেপ করিলেন, এত ক্ষিপ্ৰহস্তে এই কার্য করিলেন যে, আবু তাহা দেখিতেও পাইল না। খালিক গেলাসটি আবু হোসেনের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, “ভাই, আজ রাত্রে তুমি পরম ঘরে অতিথি-সংস্কার করিলে, অতিথি তোমার নিকট বিদায়গ্রহণের পূর্বে তোমাকে সহস্রে এক পাত্র মত্ত প্রদান করিতেছে, তুমি ইহা পান করিয়া আমাকে সুখী কর।” আবু হোসেন মহা আনন্দিতচিত্তে গেলাসটি খালিকের হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া চৌ-চৌ শব্দে তাহা গলাধঃকরণ করিল।



দেখিতে দেখিতে আবু হোসেনের চক্ষু ঘুরিয়া আসিল, সে এক একবার এমন ঢলিয়া পড়িতে লাগিল যে, তাহার মাথা হাঁটুর উপর ঠেকিতে লাগিল। খালিক তাহার সেই অবস্থা দেখিয়া হাস্তসম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে আবু হোসেন অচেতন অবস্থায় শয্যাভাগে-লুটাইয়া পড়িল।

খালিকের ভৃত্য দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল, খালিকের ইচ্ছিতে সে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতেই খালিক বলিলেন, “এই লোকটাকে কাঁধে তুলিয়া নে, আর কোন্ বাড়ী হইতে ইহাকে লইয়া চলি, তাহা ঠিক করিয়া রাখি।” আবার ইহাকে রাখিয়া বাইতে হইবে।”



ভৃত্য আবু হোসেনকে ঘাড়ের লইয়া খালিকের অন্তঃসরণ করিল। খালিক প্রাসাদে তাঁহার শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া কৰ্মচারিগণকে বলিলেন, “ইহার পরিচ্ছদ ধুইয়া লইয়া, আমার শয়নের পরিচ্ছদ ইহাকে পরাইয়া, আমার শয্যা শয়ন করাইয়া রাখ, কেন এক্রপ করিতে বলিতেছি, তাহা পরে আনিতে পারিবে।”

কৰ্মচারিগণ অবিলম্বে খালিকের আদেশ পালন করিল। শুড়ার গুণে আবু একেবারেই অচেতন! আবুকে খালিকের স্তম্ভিত, বহুমূল্য-বস্ত্র-মণ্ডিত, স্তম্ভ শয্যা শয়ন করাইলে, খালিক কৰ্মচারিগণকে এবং দাসদাসী সকলকে বলিলেন, “আমার ইচ্ছা, প্রভাতো আমার শয্যাভাগ্যকালে, দাসীগণ যে ভাবে নিত্য নিয়মিতরূপে আমার অভিনন্দন করে, ইহাকেও কাল সকালে সেই ভাবে অভিনন্দন করিতে হইবে। কোন অহুতানের ত্রুটি হইবে না। এই ব্যক্তি বাহাকে যে আদেশ করিবে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ আমার আদেশের স্তায় পালন করিতে হইবে; অসম্মত আদেশ হইলেও বিনা প্রতিবাদে তাহা পালন করিবে। ইহাকে সম্বোধনের সময়, তোমরা আমাকে যেরূপে সম্বোধন কর, সেইরূপেই সম্বোধন করিবে। এক কথায় তোমরা মনে রাখিবে, এই ব্যক্তি কল্যাণ আমার প্রতিনিধিত্ব করিবে। ইহার মনে যেন একবার সন্দেহও না হয় যে, তাহার সহিত কেহ বিক্রম করিতেছে।”

খালিফের আদেশ শুনিয়া দকলেই বুঝিলেন, খালিফ আমোদ করিবার জন্তই এরূপ বলিতেছেন, স্তত্রাং দকলেই মহা আনন্দিতচিত্তে তাঁহার আদেশ-প্রতিপালনে সম্মত হইলেন।

অনন্তর খালিফ জাফরকে আঙ্গান করিয়া বলিলেন, “বে লোকটিকে আমার শয্যায় নিদ্রিত দেখিতেছ, কাল প্রভাতে ইহাকে আমার পরিচ্ছদে সজ্জত ও আমার সিংহাসনে আকৃত দেখিয়া তোমরা কোনরূপ বিষয় প্রকাশ করিবে না। আমাকে তোমরা যেরূপ সম্মান প্রদর্শন কর, যে তাহাে সযোজন কর, ইহাকেও সেই ভাবে সম্মান দেখাইবে, সেই ভাবে সযোজন করিবে, ইহার সকল আদেশ নতশিরে পালন করিবে। এ ব্যক্তি বাহাকে বাহা দান করিতে চাহিবে, তাহাই দান করিতে দিবে, আমার আর্থিক ক্ষতির জন্ত তোমরা চিন্তিত হইবে না। আমার আমীর-ওসরাহ ও অন্তান্ত অমাত্যগণকে এ বিষয়ে যথোচিত উপদেশ প্রদান করিবে। তুমি এখন বাইতে পার, আমার আদেশ যেন ঠিকভাবে প্রতিপালিত হয়।”

খালিফ অত্যুপায় বিশ্রামার্থ ভিন্ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। খালিফ মসকরকে আদেশ করিলেন, প্রত্যুষে আবু হোসেনের নিজাভঙ্গের পূর্বেই যেন তাঁহার নিজাভঙ্গ করা হয়।

পরদিন প্রভাতে মসকর খালিফের নিজাভঙ্গ করিলে, খালিফ গাত্ৰোত্থান করিয়া, গবাক্সসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া, আবু উঠিয়া কি করে, তাহা দেখিতে লাগিলেন। তিনি এরূপ প্রচ্ছন্নভাবে রহিলেন, আবু উঠিয়া তাঁহাকে যে দেখিতে পাইবে, তাহার সম্ভাবনা রহিল না। কর্মচারী ও দাসীগণ আবু হোসেনের শয্যাগোষ্ঠে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং তাহাদিগের বখানির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনের জন্ত প্রস্তুত হইল।

প্রাত্যহিক উপাসনার সময় হইলে, এক্ষণে কর্মচারী আবুর উপধান-সরিকটে আসিয়া নাগরজ্ঞের নিকট তিনিগারসিক্ত একখণ্ড স্পঞ্জ ধরিল।

আবু হোসেনের নাসিকায় তিনিগারের গন্ধ প্রবেশ করিবামাত্র তাহার নিজাভঙ্গ হইল, কিন্তু সে চক্ষু না খুলিয়াই হাই তুলিতে লাগিল; তাহার পর মুখ হইতে কতকগুলি শ্লেমা বাহির করিয়া তাহা দূরে নিক্ষেপ করিল। পাছে বহুমূল্য গালিচার উপর পড়িয়া গালিচা নষ্ট হইয়া যায়, এই ভয়ে এক জন ভৃত্য স্বপ্নাভ প্রগারিত করিয়া তাড়াতাড়ি তাহার সেই শ্লেমা গ্রহণ করিল।

কিয়ৎকাল পরে আবু বাগিসে মাথা রাখিয়াই চক্ষুদ্বয় দ্বিগুণ উন্মুক্ত করিল। প্রাসাদকক্ষে নবীন সূর্য্যো য়ে আলো আগিয়া পড়িয়াছিল, তাহাতে আবু হোসেন দেখিতে পাইল, সে তাহার শয়নকক্ষে শয়ন করিয়া নাই, একটি অতি সুপ্রশস্ত কক্ষে বহুমূল্য সুসজ্জিত শয্যায় সে শয়ন করিয়া আছে। নানা প্রকার দ্রব্য কক্ষটি ভূষিত। তাহার শয্যার চতুর্দিকে পরমা হুম্মরী সুবতীর্ণপ বাত-বত-হস্তে গীত-বাত করিবার জন্ত অবস্থান করিতেছে, এবং সমুজ্জল পরিচ্ছদ-শোভিত রূক্ষবর্ণ খোজাগণ তাহার আদেশপালনের জন্ত নতশিরে প্রতীক্ষা করিতেছে। আবু শয্যার দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিতে লাগিল, জীবনে সে কখন এমন হীরাশুভ্রাখচিত বিচিত্র শয্যা সন্দর্শন করে নাই। বিস্ময়ভূষিত অদূরে চাহিয়া দেখিল, একটি অতি হুম্মর ও মূল্যবান রাঙ্গ-পরিচ্ছদ ও খালিফের শিরধারণ প্রভাত-সূর্য্য-কিরণে স্বকলঙ্ক করিতেছে।

এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া, আবু হোসেন হতবুদ্ধি হইয়া শয়ন করিয়া রহিল। তাহার মনে হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত স্বপ্ন ত কখন দেখে নাই, এ কি রকম হইল? আবু মনে মনে বলিল, ‘আমি কি খালিফ?—না, কখনই আমি খালিফ নহি; এ স্বপ্ন, আমি আমার অতিথির সঙ্গে যে আলাপ করিয়া-ছিলাম, তাহারই ফলে এরূপ স্বপ্ন দেখিলাম।’ আবু হোসেন নয়ন মুদিত করিয়া আর একবার নিজায় চোঁটা করিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময়ে এক জন খোজা আসিয়া বলিল, “জাহাপনা, আর নিজা না গেলেই ভাল হয়, প্রভাতের নমাজের সময় হইয়াছে,—স্বর্ধ্যোদয়ের আর বিলম্ব নাই।”

আবু হোসেন এই কথা শুনিয়া, আবার মনে মনে ভাবিল, “আমি জাগরিত না নিদ্রিত ?” চক্ষু মুদিত করিয়াই সে ভাবিতে লাগিল, “উ’হু, আমি নিশ্চয়ই নিজা যাইতেছি, এ বিষয়ে বিদ্যুদ্ভাষ সন্দেহ নাই।”

খোজা ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া আবার বলিল, “জাহাপনা, উঠিতে আজ্ঞা হউক, নমাজের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। স্বর্ধ্য উঠিতে বিলম্ব নাই, জাহাপনা, প্রত্যাহ এই সময়ে উঠিয়া নমাজ করেন বলিয়াই বিরক্ত করিতে সাহসী হইয়াছি।”

আবু হোসেন দুই বাজ উঠে উঠিয়া আর একবার আলস্ত ভাগ করিল, তাহার পর বলিল, “না, আমি ঘুমাইয়া নাই, সত্যই জাগিয়াছি। ঘুমাইয়া লোকের কথা কখন শুনিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু আমি ত শুনিতে পাইতেছি, নিশ্চয়ই জাগিয়াছি।” আবু হোসেন চক্ষু মেলিল। স্বর্ধ্যালোক তখন অধিকতর পরিষ্কৃত হইয়াছে দেখিয়া সে শয্যার উপর অত্যন্ত প্রকুরচিতে উঠিয়া বলিল। খালি গবাক্ষপথে তাহার প্রসরতা নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া উঠিল।

আবু হোসেন উপবেশন করিবামাত্র ব্রহ্মরী গায়িকাগণ অতি সুকোমলকণ্ঠে বাস্তবতাদির মৃদুশব্দে সজীত ও বাজ আরম্ভ করিল। গীতাব্যন্তে আবুর মন যৎপরোনাস্তি প্রকুর হইয়া উঠিল। আনন্দে সে আশ্চর্য হইল। কিন্তু ইহা স্বপ্ন কি সত্য, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া, মাথা নীচু করিয়া, উভয় করতলে চক্ষু আবৃত করিয়া বলিতে লাগিল, “আমি কোথায় আসিয়াছি ? কোন্ কোন্ রাজ্য, স্বর্ণ কি ? আমি বাটিয়া আসছি, না মরিয় গিয়াছি, না মরিয়ছি কি স্বর্ণে আসিয়াছি ? স্বর্ণ না হইলে এ সকল ছরী কোথা হইতে আসিল ? স্বপ্ন কি জাগরণ, তাহা ত কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।” চক্ষুর উপর হইতে আবু হোসেন হাত দ্রুতানি খুলিয়া লইয়া, আগ্রহপূর্বকদৃষ্টিতে বাতায়নপথে পূর্বাংশে চাহিয়া দেখিল, তরুণ স্বর্ধ্য আকাশের অনেক উর্দ্ধ হইতে হিরণ্য কিরণরাশি বিকীর্ণ করিতেছে।

অবিলম্বে খোজা সর্দার মসরুর আবু হোসেনের নিকটে আসিল; অবনতমস্তকে তাহাকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে ও গম্ভীরভাবে বলিল, “জাহাপনা, আপনার শয্যাত্যাগে কখনও এরূপ বিলম্ব হইতে দেখি নাই। প্রভাতের নমাজের সময় কখন ত আপনি শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন না। আপনার কি কোন প্রকার অসুখ হইয়াছে ? এখন দরবারের সময় উপস্থিত, দরবারস্থলে বিচারপ্রার্থনীয় ও আপনাকে সম্মান করিয়া পূজাসঙ্কয়ের আশায় সকলেই দরবারগৃহে আপনার অপেক্ষা করিতেছেন। সেনাপতিগণ, রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাগণ এবং আপনার উজীর ও ওমরাহবর্গ আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছেন।”

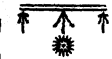
এবার আবু হোসেনের স্পষ্ট বিবরণ হইল, সে স্বপ্ন দেখিতেছে না ! কিন্তু এ কি ইল্লাজাল ? এমন হইল কেন ? আবু মসরুরের মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিল, “তুমি কাহাকে সন্ধান করিয়া এ সকল কথা বলিতেছ ? তুমি কাহাকে খালি বলিতেছ ? আমি তোমাকে চিনি না। তুমি নিশ্চয়ই অজ্ঞ লোক ভাবিয়া আমাকে এরূপ সন্ধান করিতেছ।”

অজ্ঞ হইলে মসরুরের পক্ষে হস্তগতকরণ করা কঠিন হইত, কিন্তু খালিকের আদেশ পালন করিতেই হইবে, সুতরাং সে বহুশ্রমে গম্ভীর রক্ষা করিয়া বলিল, “সে কি জাহাপনা, আপনি কি এত দিন পরে এ দাসকে এই ভাবে পরীক্ষা করিতে চান ? আপনি সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি মহাপরাক্রান্ত খালিক, সে বিষয়ে

শয়ন বদি মদুর
এমন, হোক সে
কেবল কল্পনা



এ কি
ইল্লাজাল ?



জাগরণের
আখি



সন্দেহ করিব, আমি কি এতই পাগল ? বোধ হয়, মহামতি খালিক বাহাদুর রাতে কোন টংব্র দেখিয়া-
ছেন, কিহা আমার প্রতি বিরক্ত হইয়াই আমাকে এ ভাবে কথা বলিতেছেন, ইহা আমার পক্ষে বড়ই
হৃৎস্পর্শের কথা ।”

আবু হোসেন মদকরের কথা শুনিয়া পাগলের মত হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ; তাহার পর হানিতে হানিতে
বালিসের উপর গড়াইয়া পড়িল । খালিক গবাক্ষপথ হইতে এ দৃষ্ট দেখিয়া হাতসংবরণ করিতে পারিলেন না ।

অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়া আবু হোসেন শয্যার উপর উঠিয়া বসিল, তাহার পর একটি ক্ষুদ্রাকার খোজাকে
জিজ্ঞাসা করিল, “ওরে খোজা, দেখিতেছি, তুই ত’ ছেলেমানুষ আর ভালমানুষ, সত্য করিয়া বল দেখি,
আমি কে ?” ক্ষুদ্রাকার খোজাটি অভ্যস্ত বিনয়ের সহিত বলিল, “প্রভু, আপনি খালিক, পৃথিবীর

অধীশ্বর, মহাপ্রভাপ-সম্পন্ন
খালিক ।” আবু বলিল,
“চোপরাও মিথ্যাবাদী বদ-
মান্দ, তুই যেমন কালো,
তেমনি মিথ্যাক ।”

একটি সুন্দরী দাসীকে
অদূরে দণ্ডায়মান দেখিয়া, আবু
হোসেন তাহাকে ডাকিয়া
বলিল, “ওগো সুন্দরী, শোন
দেখি, তুমি আমার এই
আঙ্গুলটা কামড়াও ত, বেশ
জোরের কামড়াইবে, আমি
ঘুমাইতেছি কি জাগিয়া আছি,
একবার পরীক্ষা করিয়া
দেখি ।” আবু হোসেন দক্ষিণ
হাতখানি সুন্দরীর দিকে
প্রদারিত করিয়া দিল ।

সুন্দরী দাসী জানিত,
খালিক গবাক্ষ-অন্ত রাতে



সুন্দরীর
অঙ্গুলি
দংশন

দাঁড়াইয়া সকলই দেখিতেছেন, সে নিজের বাহাদুরী দেখাইবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল
না, ধীরে ধীরে আবু হোসেনের নিকটে আসিয়া অবনতমস্তকে অভিবাদন করিয়া, তাহার একটি অঙ্গুলি
লইয়া দংশন করিল ।

আবু হোসেন বেদনা পাইয়া সহসা হাত টানিয়া লইয়া বলিল, “আহা, লাগে যে ! তবে নিশ্চয়ই আমি
ঘুমাই নাই, নিশ্চয়ই জাগিয়া আছি, তাহা হইলে এ কি ব্যাপার ? এক রাত্রির মধ্যে আমি খালিক হইয়া
পড়িলাম ! পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য কাণ্ড ত’ কখন ঘটে নাই !” তাহার পর সে সুন্দরী দাসীর মুখের দিকে
চাহিয়া বলিল, “আমার দিব্য, সত্য করিয়া বল, আমি সত্যই খালিক কি না ?” দাসী বলিল, “সত্যই

লিখেছি, আপনি আমাদের দয়ানন্দ খালিক, আমরা আপনাদের আজীবন বাসদারী, আপনাদের সহায় এ বিষয়ে সন্মত হইল কেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমরা বড়ই বিস্মিত হইয়াছি।" আবু হোসেন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা, আমি কে, তাহা আমার জানা আছে।"

আবু হোসেন উজীরের ইচ্ছা করিতেছে বুঝিয়া খোজা সর্দার মসরুর তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া হাত দিয়া তাহাকে উঠাইল। আবু হোসেন শব্দাত্যাগ করিবামাত্র বাসদারী, অমাত্য প্রভৃতি সকলেই সমস্তবে স্তম্ভিত হইয়া তাহাকে অভিযান করিল।

নকল খালিক
সিংহাসনে

আবু হোসেন হতাশভাবে বলিল, "হা আল্লা, এ কি ভেদী, কাল রাত্রে ছিলাম আবু হোসেন, আর আজ সকালে হইলাম খালিক-হারুণ-অল-রসিদ। আমি এ পরিবর্তনের মর্ম ত' কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।"

কর্মচারিগণ আবু হোসেনকে খালিকের পসিচ্ছদে মণ্ডিত করিল, তাহার পর পথের দুই ধারে সারি হইয়া দাঁড়াইল। মসরুর আগে আগে চলিতে লাগিল, আবু হোসেন তাহার অন্তরঙ্গ করিল, মসরুর আবু হোসেনকে সিংহাসন পর্যন্ত সঙ্গে লইয়া গিয়া তাহাকে সিংহাসনে স্থাপন করিল।

আবু হোসেনকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া সভার সকল ব্যক্তি অশ্রুধারা করিয়া উঠিল। আবু হোসেন একবার দক্ষিণে, একবার বামে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, মৈনিক-কর্মচারিগণ সমস্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

ইতিমধ্যে খালিক গুরুত্বপূর্ণ গবাক পত্রিত্যাগ করিয়া, সিংহাসনের সন্নিকটবর্তী একটি গবাকপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন এবং আবু হোসেনের অবস্থা দেখিতে লাগিলেন; দেখিলেন, আবু হোসেন মহা ভীতভাবে সিংহাসনে বসিয়া আছে।

অতঃপর উজীর আবু হোসেনের চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া, তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহার হস্ত উত্তীর্ণ করিয়া দিলেন, "জাহাপনা, আল্লা আপনাকে এ জীবনে পরম সুখে রাখুন, পরলোকে যেন আপনি অবলীলাক্রমে বেহেস্তে উপস্থিত হইতে পারেন, আপনাদের শত্রুগণ নষ্ট হউক।"

এতক্ষণে আবু হোসেন একটু সুস্থ হইল, উজীরের প্রার্থনা শুনিয়া সে যে খালিক নহে, সে লোক আর তাহার মনে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিল না; সুতরাং কেমন করিয়া একরাশিমেখে এই পরিবর্তন হইল, সে সম্বন্ধে আর আলোচনা না করিয়া তাহার ক্ষমতা-প্রদর্শনে অভিলাষী হইল; উজীরের দিকে গভীরভাবে চাহিয়া বলিল, "উজীর, তোমার কোন বস্তু খালিক হইয়া বাসদারীর দায়িত্ব লিতে পার।"

হঠাৎ বাসদারীর
চাল

প্রধান উজীর বলিলেন, "জাহাপনা, আমীর, উজীর ও অমাত্য কর্মচারিগণ আপনাদের আদেশের ইচ্ছা করিতেছেন, আপনাদের অনুমতি হইলে তাহার আপনার সন্নিকটবর্তী হইয়া আপনার আদেশ গ্রহণ করিতে পারেন।" আবু হোসেনের আদেশে কর্মচারিগণ তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। সকলেই আবু হোসেনকে খালিকের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিল।

অনন্তর উজীর সিংহাসনপ্রান্তে দণ্ডায়মান হইয়া, কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় মামলা-মকদ্দমার কথা উত্থাপন করিলেন। খালিক দেখিলেন, আবু হোসেন যে বিচার করিতেছে, তাহা অসঙ্গত হইতেছে না; আবু হোসেন কোন বিষয়ে বিভ্রান্ত হইতেছে না। খালিকের মনে বড়ই আশ্রয় জন্মিতে লাগিল।

উজীর কাক শেষ করিয়া যথাস্থানে যাইবেন, এমন সময় আবু হোসেন তাহাকে বলিল, "উজীর, ঈদাও, আমি সহর-কোতোয়ালের উপর একটি বিশেষ আদেশ করিব, তাহাকে তলব দাও।"

সহর-কোতোয়াল নিকটেই অবস্থান করিতেছিল, আবু হোসেন তাহার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতেছেন দেখিয়া সে বুঝিয়াছিল, নকল খালিক তাহাকে কোন কথা বলিবে। আবু হোসেনের কথা শুনিবামাত্র সহর-কোতোয়াল সিংহাসন-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, ভূমিতে মস্তক স্পর্শ করিয়া আবু হোসেনের প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করিল, তাহার পর সে উঠিলে আবু হোসেন বলিল, “কোতোয়াল, তুমি এখনই এই সহরের অমুক রাস্তার অমুক মসজিদে যাও, সেই মসজিদে তুমি এক জন ইমাম ও পাঁচ-দাড়ী-ওয়ালা চারি জন বৃদ্ধকে দেখিতে পাইবে। তাহাদের সকলকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া আসিবে, বৃদ্ধ চারি জনের প্রত্যেককে

ইমাম-খাতিব
আদেশ



এক শত ও ইমামকে চারি শত বেত্রাঘাত করিবে। তাহার পর তাহাদের পাঁচ জনকে ছিন্নবস্ত্র পরাইয়া, গাধায় চড়াইয়া নগরভ্রমণ করাইবে; সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা করিতে থাকিবে, ‘বাহার্য্য অস্ত্রের নিশ্চা করিয়া বেড়ায় ও প্রতিবেশিগণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়—তাহাদের ক্ষতি করে, খালিক তাহাদিগকে এই ভাবে দণ্ডিত করেন।’ আমি আরও আদেশ করিতেছি, তাহারা যে পল্লীতে বাস করে, সেই পল্লী হইতে তাহারা অত্র পল্লীতে নির্বাসিত হইবে, এবং পুনরায় কখনও তাহাদের পূর্ব-বাসস্থানে প্রত্যাগমন করিতে পারিবে না। আমার এই আদেশ পালন করিয়া অবিলম্বে আমাকে সংবাদ দিবে।” কোতোয়াল নিজের মস্তক স্পর্শ করিয়া জানাইল, এই আদেশ যথাযথরূপে পালন করিবে, অতথা নিজের শির দিবে। অনন্তর কোতোয়াল পুনরায় সিংহাসন-দরিকটে নিপতিত হইয়া সম্মান-জ্ঞাপন করিয়া আদেশপালনার্থ প্রস্থান করিল।

খালিক আবু হোসেনের এই আদেশ শুনিয়া মনে মনে বড়ই অস্বস্তি হইলেন; আবু হোসেন এতদূর গয়ে যে নিকটকে খালিক বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে, উহা বুঝিয়া তিনি বড়ই আমোদ বোধ করিলেন।

অল্পক্ষণ পরে কোতোয়াল কার্য সম্পাদন করিয়া রাজদরবারে ফিরিয়া আসিয়া আবু হোসেনকে জানাইল, তাহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে; কয়েক জন দাসীর নামের এক কর্দ্দও নকল খালিকের হস্তে প্রদান করিল। সেই কর্দ্দ আবু হোসেন পরিচিত ব্যক্তিগণের নাম দেখিয়া ভারী খুসী হইয়া বলিল, “কেমন মজা! আমার সঙ্গে বদমাইসি! সামান্য লোক হইয়া খালিকের সঙ্গে গোস্তা কী? বেশ হইয়াছে। এত দিনে ছুটির রমন হইবে!”

অনন্তর আবু হোসেন উজীরকে বলিল, “খাতাঙ্গীকে তলব দাও, তাহাকে বল, এখনই সে হাজার মোহরের এক তোড়া লইয়া এই সহরের আবু হোসেন নামক এক ব্যক্তির মাতাকে দিয়া আনুক, যে কোন লোক আবু হোসেনের বাড়ী দেখাইয়া দিতে পারিবে। লোকটা প্রসিদ্ধ লোক বটে, শীঘ্র তাহাকে ঘাইতে আদেশ কর।”

নকল খালিকের
বচার-বৈচিত্র্য



উজীর অবিলম্বে এই আদেশ পালন করিলেন। এক জন ভূতা হাজার মোহর-পূর্ণ একটি তোড়া লইয়া আবু হোসেনের গৃহমুখে যাত্রা করিল। সে যখন আবু হোসেনের মাতার নিকট উপস্থিত হইল, তখন আবার পা পুস্ত্রের জন্ত শোক করিতেছিল, ভূতা তাহার হস্তে মোহরের তোড়া সমর্পণ করিয়া বলিল, “খালিক এই হাজার মোহর আপনার নিকট উপহার পাঠাইয়াছেন।”—আবু হোসেনের মাতা এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং তাহার স্ত্রীর অস্বাস্থ্যজনক রোগের প্রতি খালিকের সহসা এক্ষণ দয়ার কোন কারণ আবিষ্কার করিতে পারিলেন না।

এই সকল কার্য শেষ হইলে, আবু হোসেন দরবার ভঙ্গ করিল, কর্দ্দচারিগণ সকলেই তাহার প্রতি গভীর সম্মান জ্ঞাপন করিয়া, স্ব স্ব বাসস্থানে প্রস্থান করিলেন। কেবল উজীর ও রক্ষিণ আবু হোসেনের নিকটে রহিল।

দরবার শেষ হইলে আবু হোসেনকে লইয়া ভূতাগণ অস্ত্রপুরে প্রবেশ করিল, এবং রাজিতে সে যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিল, সেই কক্ষে লইয়া গেল। উজীর খালিকের নিকট উপস্থিত হইয়া আবু হোসেনের বিচার-কাহিনী বর্ণন করিলেন, খালিক সকল কথা শুনিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আবু হোসেন খানিগের শয্যা বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলে, হুম্মরী দাসীগণ তাহার চিত্তবিনোদনার্থ গীত-
গায়ত্রী আরম্ভ করিল। আবু হোসেন আনন্দে ভাসিতে লাগিল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, যদি ইহা
সুই হয়, তবে ইহা বড়ই লক্ষ্য স্বপ্ন বলিতে হইবে; কিন্তু আমার বোধ হয়, ইহা স্বপ্ন নয়, আমি তা সত্য
বোধে বুঝিতে পারিতেছি, সকলই দেখিতে পাইতেছি, শুনিতেছি। স্বপ্নই হোক আর সত্যই হোক, আমার
জ্ঞাতেই ইহা হইয়াছে। আমি যে সত্যই খালিফ, তাহাতেও তা' সন্দেহের কোন কারণ দেখিতেছি না।
সামান্য চারিদিকে এত ঐশ্বর্য, আমোদ-প্রমোদ, আমার প্রত্যেক আঙ্গুল প্রতিপালিত হইয়াছে, তাহাও
লক্ষ্যলাম, আমি খালিফ না হইলে কি এমন হইত?

আবু হোসেন আহাের বসিল, অতি সুসজ্জিত গৃহে নানাবিধ রসনাত্তিকর আহাের্য সুসজ্জিত ছিল, গৃহসজ্জা
দখিয়াই আবু হোসেনের চক্ষু স্থির। এত ঐশ্বর্য, এমন বিভব সে কখনও দেখে নাই, সাত জন হুম্মরী যুবতী
সকলে তাহাকে চামর ঢুলাইতে লাগিল, তাহাদিগকে দেখিয়া, আবু হোসেনের মনে মহা স্তুতি হইল। গৃহে
দারও অনেক হুম্মরী ছিল, তাহাদিগের মধ্যে ছয় জনকে বাছিয়া লইয়া, আবু হোসেন আহাের করিতে বসিল।

আহাের শেষ হইলে, এক জন হুম্মরী খোজাকে বসিল, “খালিফ বাহাদুর এখন কামরার মধ্যে পাদচারণ
করবেন, জল আন।” স্ববর্ণপাত্র এক জন জল লইয়া আসিল, দ্বিতীয় ব্যক্তি সোণার পাত্রে সাবান লইয়া
দািল, তৃতীয় তৃত্য তোয়ালে আিল, এবং সকলেই নতজাহতাবে অবস্থান করিতে লাগিল। সুপ্রক্ষালন
শেষ হইলে তৃত্যগণ আবু হোসেনকে লইয়া আর একটি বিস্তীর্ণ কক্ষে প্রবেশ করিল।

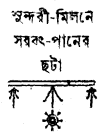
এই কক্ষটির শোভা ও সজ্জা আরও অনির্বচনীয়। আবু হোসেন এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র গীতবাণ
দারম্ভ হইল। শত শত প্রকার কল সুবর্ণাধারে মন্দিরাকৃতিভাবে সজ্জিত হইয়া, আবু হোসেনের রসনার
স্নিগ্ধপ্রতিবন্ধনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল; হুগোচনা, সুগঠিতজননা, হস্তন্তনী, সাত জন যুবতী বোঁদভারে
দারুল হইয়া আবু হোসেনের গাত্রের চামর-বীজনের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

আবু হোসেনের বিষয় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। আবু টেম্বেলের উপর বসিয়া পড়িয়া হুম্মরীগণকে এক
কক্ষ দেখিতে লাগিল, কিন্তু কে অধিক হুম্মরী, কে অল্প হুম্মরী, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না।
সাত জনকেই তাহার পাশে বসিয়া ফলভক্ষণে অহুমতি করিল।

আবু হোসেন যুবতীগণের নাম জিজ্ঞাসা করিল; দেখিল, পূর্বে আহােরের সময় যে যুবতীগণের সহিত
দাহার আলাপ হইয়াছিল, ইহারা তাহারা নহে। নামগুলি কোমল, হুম্মর, কবিকপূর্ণ। আবু ফলাহার
স্মৃতিতে করিতে তাহাদিগের সহিত কত রসিকতা করিল, তাহার সংখ্যা নাই। আবু হোসেনের প্রাণে স্বপ্নের
ছবি উঠিতে লাগিল। খালিফ গোপনে থাকিয়া তাহার কাণ্ড সকলই দেখিতেছিলেন, আবু হোসেনের
দৃশ্য দেখিয়া তাহার হস্তসংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

ফলাহার শেষ হইলে গম্ভীর আবু হোসেনকে সঙ্গে লইয়া তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করিল। এই কক্ষে নানা প্রকার
মিষ্ট দ্রব্যবস্তুর আয়োজন ছিল। আবু হোসেন এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র মধুরসের সঙ্গীত আরম্ভ হইল। এ
কক্ষে আর সাত জন হুম্মরী তাহার অভ্যর্থনার জন্য দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা পূর্ববর্তিত হুম্মরীগণ অপেক্ষাও
অধিক রূপবতী। আবু হোসেন তাহাদিগের সঙ্গে বসিয়া দ্রব্যপানে মনোনিবেশ করিল। ইহাদের নামও অতি
সংকার, আবু হোসেন ইহাদিগের সহিত প্রেমমালাপে প্রবৃত্ত হইল। খালিফ সকলই শুনিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যা সমাগত হইল। বহুসংখ্যক দীপালোকে প্রদীপ্ত চতুর্থ কক্ষে আবু হোসেন নীত হইল। বিভিন্ন
পূর্ণের আলো, আলোকধারগুলিও অতি বিচিত্র। আবু হোসেন এই দীপালোকিত প্রমোদকক্ষে আর সাত



স্বপ্ন-মন্ডল
প্রমোদ-শ্রোত



জন অভিনব স্বন্দরীকে দেখিতে পাইল। এই কক্ষে মণ্ডপানের ও তাহার উপযুক্ত চাটের আয়োজন ছিল। আবু হোসেন বোণাদানের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে দিবাভাগে মণ্ডপান করিতে পারে নাই, মদের তৃষ্ণা বিলক্ষণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, বহু প্রকারের সুপের মন্ত এই কক্ষে সজ্জিত দেখিয়া, আবু হোসেনে আশ্চর্য হইয়া উঠিল। মদ যেমন উৎকৃষ্ট, মণ্ডপানের পাত্রগুলিও তাহার অমূল্য। আবু বুর্বিল, সে যদি খালি না হইয়া সতাই আবু হোসেন হইত, তাহা হইলে তাহার সমস্ত সম্পত্তি একটি মণ্ডপাত্রক্রমেই নিঃশেষিত হইত।

আবু হোসেন এই কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় সঙ্গীত ও বাস্ত আরম্ভ হইয়াছিল, আবু নবদুবতী গণের রূপযোনে মুগ্ধ হইয়া, তাহাঙ্গিরের পরিচয় লইবার জন্ত বাস্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু বাস্তনাতে আলাপের সুবিধা হয় না দেখিয়া সে সজোরে কব্জাখানি প্রদান করিল, আর তৎক্ষণাৎ সকল বাস্তধ্বনি বন্ধ হইয়া, গৃহে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল।

আবু হোসেন সন্নিবর্তিত একটি রূপবতী যুবতীর হস্ত ধারণ করিয়া, তাহাকে ক্রোড়ের নিকট বসাইল, পরে তাহার হস্তে একখানি উৎকৃষ্ট পিষ্টক দান করিয়া, চক্ষু ছুটি দিয়া তাহার রূপসুখ পান করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, “সুন্দরি, তোমার নাম কি?”—সুন্দরী বলিল, “জাহাপনা, আমার বড় সৌভাগ্য যে, আজ এই অবসরীয় নাম জিজ্ঞাসা করিলেন; আমার নাম—মুক্তামালা।” আবু হোসেন ভারী খুসী হইয়া বলিল, “হা, হা, মুক্তামালাই বটে, ইহা অপেক্ষা আর তোমার উৎকৃষ্ট নাম হইতে পারিত না। তোমার দাঁতগুলি দেখিয়া সতাই মুক্তামালা বলিয়া মনে হয়। মুক্তামালা, এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া তোমার ঐ হৃদয় হাতে আমাকে দাও; পান করিয়া কৃতার্থ হই।” মুক্তামালা মদ ঢালিয়া দিলে আবু হোসেন তাহা পান করিয়া কৃতার্থ হইল, পরে সে আর এক পেয়ালা ঢালিয়া মুক্তামালাকে পান করিতে বলিল। মুক্তামালা সেই মদ পান করিবার পূর্বে করুণ-স্বরে এমন একটি স্মৃতি গান করিল যে, আবু হোসেন একবারে মুগ্ধ হইয়া গেল।

গানের সঙ্গে
স্বপ্নের পেয়ালা



আবু হোসেন এক পাত্র মণ্ডপান করিয়া, প্রমুগ্ধ হইয়া আর একটি রূপসীকে কাছে বসাইল এবং তাহাকে কাছে বসাইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, “আমার নাম শুকতার।”—আবু হোসেন বলিল, “শুকতার, সতাই তোমার চক্ষুছটি শুকতার অপেক্ষাও অধিক জলজল করিতেছে। এক পেয়ালা ভরিয়া মদ আন।” শুকতার। অবিলম্বে আদেশ পালন করিল, তাহাকেও মদ বাওয়াইয়া আবু হোসেনে বিশদ আনন্দ-লাভ করিল। ক্রমে সকল স্বন্দরীগণকেই সে এইরূপে অমুগ্ধরীত করিল। আবু হোসেন উদর পূর্ণ করিয়া মণ্ডপান করিলে ও সকল স্বন্দরীকে মণ্ডপান করান শেষ হইলে, মুক্তামালা এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া তাহাতে এক প্রকার চূর্ণ মিশ্রিত করিল এবং সেই পাত্রটি আবু হোসেনের হস্তে প্রদান করিয়া বলিল, “জাহাপনা, আপনি এই মণ্ডপাত্রটিও নিঃশেষ করুন, আপনার স্বাস্থ্যেরক্ষার জন্তই আমি ইহা ঢালিয়াছি; কিন্তু তৎপূর্বে আপনাকে একটি গান শুনিতে হইবে। এই গানটি আমি আপনাকে শুনাইবার জন্ম আজ সকলে রচনা করিয়াছি, এখন পর্য্যন্ত ইহা আর কাহাকেও শুনাই নাই।” আবু হোসেন যুবতীর প্রার্থনা-পূরণে সম্মত হইল, এবং মদের পাত্রটি গ্রহণ করিয়া স্বন্দরীর সঙ্গীত উপভোগে নিব্বলিত হইল।

কি হৃদয় গান! কি মনোহর স্বর! কি অপূর্ণ রচনাভঙ্গী! আবু হোসেন হান-কান বিস্তৃত হইয়া সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিল, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সে মনমুগ্ধ ভূজঙ্গের স্রাব্য একচিত্রে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিল; প্রাণ খুলিয়া গায়িকাকে প্রশংসা করিবার পূর্বেই সে মণ্ডপাত্রটি গুণ্ডপ্রান্তে তুলিয়া তরল গরল-টুকু নিঃশেষে গলাধঃকরণ করিল, তাহার পর যুবতীকে ধন্যবাদ দিতে বাইয়া আর কথা বাহির হইল না; চক্ষু মুদ্রিয়া আসিল, মাথা টেবলের উপর লুটাইয়া পড়িল, হাত হইতে মাস পড়িয়া বাহ্য দেখিয়া একটি স্বন্দরী তাড়াতাড়ি মাসটি টানিয়া লইল। আবু হোসেন সেই স্থানেই পড়িয়া গভীরনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

খালিক নিকটবর্তী একটি কক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ আবু হোসেনের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার পরিচ্ছদ খুলিয়া লইয়া, আবুর নিজের পরিচ্ছদ তাহাকে পরাইবার আদেশ করিলেন। তাহার পর যে ভৃত্যটি আবু হোসেনকে খালিকের আদেশে তাহার গৃহ হইতে পূর্বরাজিতে লইয়া আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, “ইহাকে লইয়া গিয়া ইহার শয্যা শয়ন করাইয়া দিয়া আয়। ফিরিয়া আসিবার সময় আর খুলিয়া রাখিয়া আসিবি—কোন প্রকার দণ্ড ঘেন না হয়।”

প্রাসাদের স্তম্ভরূপে ভূতা, আবু হোসেনের ঘুমন্ত দেহ ঘাড়ে লইয়া, তাহার গৃহে উপস্থিত হইল, এবং খালিকের আদেশানুসারে তাহাকে তাহার শয্যা শয়ন করাইয়া প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া, সে সংবাদ তাঁহার গোচর করিল। খালিক তখন সকলকে আবু হোসেনের প্রতি এই বিচিত্র ব্যবহারের কারণ বলিয়া তাহাদের কোতূহল প্রশ-
সিত করিলেন।

আবু হোসেন তাহার শয়ন-
কক্ষে সোফার উপর পড়িয়া পর-
দিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাইল।
যখন নিদ্রা ভাঙ্গিল, তখন সে
তাহার নিজগৃহে শায়িত দেখিয়া
অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে চীৎকার
করিয়া ডাকিল, “মুক্তামালা!”
কোন উত্তর পাইল না;—পুনর্বার
ডাকিল, “শুকতারা!” কেহই
উত্তর দিল না। চক্রেবন্ধা, মণি-
মঞ্জরী, কত যুবতীকে ডাকিল,
তাহার গুণ্ঠা নাহি, কিন্তু কাহারও
নিকট হইতে উত্তর মিলিল না।
আবু হোসেন ডাকিয়া ডাকিয়া
গলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, কিন্তু
কাহারও সাড়া পাইল না।



অবশেষে আবু হোসেনের উচ্চস্বর তাহার মাতার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি অন্ধপুর হইতে তাড়াতাড়ি
পুত্রের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, “আবু, বাবা, তোমার কি হইয়াছে, তুমি এমন করিতেছ কেন?” মায়ের
কথা শুনিয়া আবু শয্যা হইতে মাথা তুলিল, মাতার মুখের উপর অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কর্ণশব্দে বলিল,
“মাসি, তুমি কাহাকে বাবা বলিয়া সম্বোধন করিতেছি?” আবু হোসেনের জননী বলিলেন, “তোমাকে বাবা,
তুমি ভিন্ন আর কাহাকে আমি এ ভাবে সম্বোধন করিব? হা, আবু হোসেন, তুমি এরকম কথা কেন বলিতেছ?
তুমি কি আমার পুত্র নও? তুমি এই এক দিনের মধ্যেই তোমার মাতার কথা বিস্মৃত হইলে?”—আবু কহিল,
“আমি তোমার পুত্র? নিরোধ বৃদ্ধী, কি কথা বলিতেছি, তা ভাবিয়া দেখিতেছি? মিথ্যাবাদী
কে, আবু হোসেন? দেখিয়া চিনিতে পারিতেছি না? আমি খালিক—বোগদাদের খালিক হাকিম-অল-রশিদ!”





এ কি
সমতানের
তৈরী ?

আবুর মাতা ভীত হইয়া বলিলেন, “চুপ কর বাছা, চুপ কর। কি বলিতেছে, তাহা ভাবিয়া দেখ, ও রকম কথা বলিলে লোকে যে তোমাকে পাগল বলিবে।” আবু হোসেন বলিল, “বুড়ী, তুই পাগল হইয়া আমাকে পাগল বলিতেছিস্! আমার জ্ঞানবুদ্ধি বিলক্ষণ টনটনে আছে, অর্ক-পৃথিবীর গোক জানে, আমি বোন্দাদের খালিক, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক পরাক্রান্ত নরপতি।” বুড়ী অশ্রু-মোচন করিয়া বলিলেন, “হায় হায়, কেন এমন সর্বনাশ হইল? বাছার মাথা একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে।! আল্লা, বাছাকে আমার সমতানের হাত হইতে রক্ষা কর। বাছা আমার ছেঁড়া কাঁধায় শুইয়া লাথ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছে; এমন সর্বনাশ আমার কে করিল? বাবা আবু হোসেন, আমি যে তোমার মা! এই তোমার ঘরঘার, চিরদিন তুমি এখানে বাস করিতেছ, আজ হঠাৎ তোমার এমন বিধম ভুল হইল কেন বাবা?”

আবু হোসেন মাথায় হাত দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিল, তাহার পর মাথা তুলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করিয়া বলিল, “হাঁ, তুমি বা বলিতেছ, তাই সত্য বোধ হয় বটে, এতক্ষণ আমার বোধ হইতেছে, আমি আবু হোসেন, তুমি আবু হোসেনের মা, আর এই বাড়ী আবু হোসেনের বাড়ী।” আবু হোসেন পাগলের মত একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল; অবশেষে বলিল, “হাঁ, আমি নিশ্চয়ই আবু হোসেন, ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এমন অদ্ভুত খেয়াল কেনন করিয়া আমার মাথায় প্রবেশ করিল?” আবুর মাতা বলিলেন, “বাছা আবু হোসেন, বোধ করি, তুমি কোন রকম স্বপ্ন দেখিয়া এমন বে-একজিয়ার হইয়া পড়িয়াছ।” আবু হোসেন কঠোরদৃষ্টিতে জননীর দিকে চাহিল, কর্কশস্বরে বলিল, “বুড়ী, মায়াবিনী, তুই দূর হ, তুই আমার না নহিস্। আমি বলিতেছি, আমি খালিক, মহাপ্রভাৎ সম্পন্ন বোণাদাধিপতি। আমাকে এ কথা বিবাস করাইবার সাধ্য তোমার নাই।” আবু হোসেনের মাতা বলিলেন, “বাছা, তুমি এ সকল কথা আর সুখে আনিও না, কোথা হইতে এ কথা খালিকের কাণে গিয়া উঠিবে, আর তিনি খট্ করিয়া তোমার মাথাটা কাটিয়া লইয়া বাইবার আদেশ দিবেন। এ সকল কথা ছাড়িয়া অস্ত্র কথার আলোচনা কর। তুমি বুদ্ধি শোন নাই, দরগার ইমাম ও চার খালিকের আদেশে আচ্ছা রকম শান্তি পাইয়াছে, গাধায় চড়াইয়া তাহাদিগকে নগরে নগরে দ্রুত হইয়া আনা হইয়াছে, ঘোষণা হইয়াছে, বাহারা এই রকম পরের কথা লইয়া থাকে, তাহাদের এইরূপ শাস্তি হয়। পাড়া হইতে খালিক যে তাহাদিগকে দূর করিয়া দিয়াছেন।”

মায়াবিনী
দূর হ’



এক ভাবিয়া আবু হোসেনের মা এই কথা বলিলেন, কিন্তু তাহার বিপরীত ফল হইল। আবু যে সত্যই খালিক, আবু হোসেনের তব্বিখে আর বিদুমাত্র সন্দেহ রহিল না। ইমামের শাস্তির কথা শুনিবামাত্র আবু হোসেন বলিল, “না, আমি তোমার ছেলে আবু হোসেন নই, তুমি আবু হোসেনের মা হইতে পার, কিন্তু আমার কেহ নয়। আমি খালিক, স্বপ্ন খালিক, তুমি যে দাঁকি দিয়া খালিকের মা হইয়া বসিবে, তাহা কিছুতেই হইবে না, খালিক যে কোন ভিখারীগকে মা বলিয়া ভক্তি করিতে পারেন না। আমি যে খালিক, তাহা তোমার কথাতেই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। কাল আমার আদেশেই দ্বিষ্ট ইমাম ও চার জন রক্ত-সেইরূপ দণ্ড ভোগ করিয়াছে। আমি যে খালিক, সে বিষয়ে আর সন্দেহ করিও না, আমি যে স্বপ্ন দেখিতেছি, সে কথা মনে ভাবিও না; স্বপ্নে কখন বাহুখ খালিক গাঞ্জিয়া তাহার শত্রুকে এ ভাবে দণ্ডিত করিতে পারে না। কাল কেতোয়াল আমাকে সংবাদ দিয়াছে, আমার আদেশ প্রতীপালিত হইয়াছে। সুতরাং আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, আমি আবু হোসেন, খালিক নহি। তবে কে যে আমাকে এখানে আনিল, তাহাই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। -তাহার দেখা পাইলে একবার বুঝিতাম।”

আবু হোসেনের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন, আবুর মস্তক একেবারেই বিকৃত হইয়াছে, জ্ঞানদীপ আর প্রজলিত হইবে কি না সন্দেহ। তিনি কাতরভাবে বলিলেন, “বৎস, আমরা তোমার মঙ্গল করুন। তুমি যে সকল প্রলাপ বকিতেছ, তাহা হইতে ক্ষান্ত হও, তোমার এ রকম পাপাঙ্গানি শুনিয়া লোকে কি বলিবে, কিছু কি ভাবিতেছ? তোমার এই সকল প্রলাপ লোকের কাণে নিশ্চয়ই প্রবেশ করিবে, তাহা বুঝিয়াছ কি?”

আবু হোসেন মাতার কথায় অধিক চাটয়া উঠিল; বলিল, “হাঁ, হাঁ, লোকে জনিবে, শুনিয়া বলিবে, এক মাগী নিরক্ষণ খালিককে তাহার পুত্র বলিয়া সোধেদন করিতে সিয়াছিল, খালিক যে তাহার গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহার মনে এই বিশ্বাস জন্মাইতে চেষ্টা করিয়াছিল।”

বৃদ্ধা বলিলেন, “বাবা আবু, তোমাকে কি কিছুতেই বুঝাইতে পারিব না যে, তুমি খালিক নহ, তুমি আবু হোসেন, আমার পুত্র, তোমার এ মন কিসে দূর হইবে?”

আবু হোসেন আরও বেশী রাগ করিয়া বলিল, “চোপ্ রও বুড়ী, ফের যদি আমাকে বকাবি ত’ তোকে এমন শাস্তি দিব যে, চিরদিন মনে থাকিবে। আমি বলিতেছি, আমি খালিক, মহাপরাক্রান্ত বোধদাদাধিপতি, আমার কথা তুই বিশ্বাস করিতে আলবৎ বাধ্য।” বৃদ্ধা পুত্রের বুদ্ধিবিকৃতি দেখিয়া গালে মুখে চড়াইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল।

লাটির চোটে
স্বীকার-প্রত্যয়
*

আবু হোসেন এই দৃশ্য দেখিয়া ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। সজ্ঞাথে একগাছি লাঠি আনিয়া তাহার মাতার মস্তকের উপর উত্তত করিয়া বলিল, “মায়াবিনি স্বাক্ষসি, আমি আবু হোসেন নহি, তোর পুত্র নহি, আমি খালিক, এ কথা স্বীকার করিবি কি না বল? স্বীকার না করিলে এই বেতের এক আঘাতে তোর মাথা ভাঙ্গিয়া দিব।” আবু হোসেনের মাতা পুত্রের কথায় কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, “আমি একশবার বলিব, তুমি আমার পুত্র আবু হোসেন, তুমি অকারনে নিজেকে হারুণ-অল-রসিদ বলিয়া মনে করিতেছ। তিনি আমাদের রাজা, কাল তিনি তাহার উজীর জাফরকে দিয়া আমাকে এক হাজার মোহরের এক তোড়া পাঠাইয়া খোদার নিকট তাহার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিয়াছেন। তুমি আমায় নিরোধের মত নিজেই দেখি খালিক বলিয়া মনে করিতেছ।”

এবার আবু হোসেন বুলিল, সে যে খালিক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই ত’ আবু হোসেনের মাতাকে মোহর পাঠাইয়া দিয়াছে। আবু হোসেন ক্রোধে অন্ধ হইয়া মাতাকে নির্দয়রূপে বেজাঘাত করিতে লাগিল। আবু হোসেনের মাতা পুত্রহন্তে বেজাঘাত লাভ করিয়া যন্ত্রণায়, কোভে, দুখে আর্তনাদ করিতে লাগিল। আবু হোসেন তাহার আর্তনাদে লক্ষ্য না করিয়া বলিতে লাগিল, “দরভানী বুড়ী, তুই কিছুতে বিশ্বাস করিবি না যে, সে মোহরের তোড়া আমিই পাঠাইয়াছিলাম! সে কথা বিশ্বাস না করিয়া আমাকে পাপল মনে করিতেছিল? যতক্ষণ তুই আমার কথা বিশ্বাস না করিবি, ততক্ষণ আমি প্রহারে ক্ষান্ত হইব না।” আবু হোসেন পুনর্বার সজ্ঞারে প্রহার আরম্ভ করিল। আবুর মাতার চীৎকারে প্রতিবাসিগণ ব্যাপার কি দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিল। তাহারা দেখিল, আবু হোসেন পাগলের ভায়ে তাহার মাতাকে নির্দয়রূপে প্রহার করিতেছে। তাহারা আবু হোসেনের হাত হইতে লাঠি কাড়িয়া লইল;—বলিল, “আবু হোসেন, ছি, ছি! তুমি কি একেবারে পাপল হইয়া গিয়াছ? তুমি স্নেহময়ী মাতাকে এ ভাবে প্রহার করিতেছ, তোমার লজ্জা হইতেছে না?”

আমি খালিক,
তাতে সন্দেহ!
*

পাগলা-গারদে



আবু হোসেন উন্নতের স্নায়ু প্রতিবেশিগণের দিকে চাহিয়া বলিল, “কাহাকে তোমরা আবু হোসেন বলিতেছ? আমাকে তোমরা আবু হোসেন মনে করিতেছ, এ তোমানের কি বিষয় জ্ঞান!”—এক জন প্রতিবাসী বলিল, “আবু হোসেন, তোমার হঠাৎ এমন মত্তত্ব হইল কেন? তোমার এই জননী তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছে, তোমাকে প্রতিপালন করিয়াছে, আর আজ তুমি তোমার সেই মাতাকে মাতা বলিয়া স্বীকার করিতে চাও না?” আবু হোসেন বলিল, “কে তোমরা আমাকে এমন ভাবে কথা বলিতে সাহস কর? আমি তোমানের চিনি না। এই সয়তানী মাগীকেও চিনি না। আমি স্বয়ং খালিক, আবু হোসেন নহি। ফের যদি তোমরা আমাকে আবু হোসেন বলিবে, তাহা হইলে আমি তোমাদিগকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিব।”

প্রতিবেশিগণ আবু হোসেনের কথায় বুকিল, তাহার বুদ্ধিব্রণ হইয়াছে, আবু হোসেন ঘোর উন্মত্ত হইয়াছে। তাহারা আবু হোসেনকে মাটিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জুবদ্ধ করিল, তাহার পর তাহারা পাগলা-গারদের অধ্যক্ষকে আবু হোসেনের উন্মত্ততার সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

পাগলা-গারদের অধ্যক্ষ শূন্য ও কণ্টকপূর্ণ বেত্র লইয়া আবু হোসেনের গৃহে উপস্থিত হইল। আবু হোসেনের পৃষ্ঠে কয়েক বা বেত্র পড়িতেই তাহার পাগলামি থামিয়া গেল, পুনর্বার বেত্রাবাতের ভয়ে সে আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। তখন তাহারা তাহার হস্তপদ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাহাকে পাগলা-গারদে লইয়া গেল।

রাজপথে প্রবেশ করিযামাত্র, এক দল লোক আসিয়া আবু হোসেনের চারিদিকে সমবেত হইল; কেহ তাহার পিঠে কীল মারিল, কেহ তাহার গালে চড় মারিল, কেহ কেহ বা কুসিত ভাষায় তাহাকে লাগি দিতে লাগিল। আবু হোসেন ভাবিল, “দেশের লোক পাগল হইয়াছে, দেখিতেছি; আমার ত’ জ্ঞানের বৈলক্ষ্য হয় নাই, তথাপি ইহারা আমাকে পাগল মনে করিতেছে, কি করিব, আল্লাহ মনে বাধা আছে, তাহাই হইবে। আমাকে সকলই সহ্য করিতে হইবে।”

বাদসাহী নেশা

টুটিল!



পাগলা-গারদে আবু হোসেনকে লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। শৃঙ্খলে পুরিবার পূর্বে এক জন প্রহরী তাহার পাগলামি দূর করিবার জন্য তাহার স্বন্ধে ও পৃষ্ঠে পক্ষাণ বা বেত মারিল, এবং বলিতে লাগিল, “বল তুই খালিক কি না? বল তোমার পাগলামি সারিয়াছে কি না?” আবু হোসেন ক্রোধিত ক্রোধিত বলিল, “বোহাই তোমানের, আর মারিও না, আমি পাগল নহি, তোমরাই সকলে মিলিয়া আমাকে পাগল বানাইয়াছ।”

আবু হোসেন যে কয় দিন পাগলা-গারদে বন্দী ছিল, সে কয় দিন প্রত্যহ তাহার মাতা তাহাকে দেখিতে যাইত, পুঞ্জের চুড়ঙ্গ দেখিয়া, পুঞ্জবৎসলা জননী কাতরভাবে অশ্রুত্যাগ করিত। আবুর মা পুঞ্জকে অনেক কথা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু আবু হোসেন যে খালিক নহে, তাহা কোনমতে স্বীকার করিল না।

অবশেষে আবু হোসেন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, “যদি আমি খালিকই হইব, তবে আমার এত চুড়ঙ্গ কেন? কেনই বা আমি নিদ্রাভঞ্জে আমার গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম, আর খালিকের সে জমকালো পরিচ্ছদই বা কোথায় গেল? সেই খোজার দল, সেই সকল সুলতানী, আমীর-ওমরাহ, বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তাগণ, উজীর জাফর সকলে আমাকে সহসা পরিচ্যাগ করিল কেন? আমি ত’ আমার চুড়ঙ্গার কোন প্রতীকার করিতে পারিতেছি না; অন্যায়ের পাগলের মত বেত খাইলাম, কেহ ত’ আমাকে রক্ষা করিল না। খালিকের পিঠে কেহ কি এ ভাবে বেত মারিতে সাহস করিত? সুলতান, বুঝিতেছি,

এ শ্রমমাত্র, স্বপ্ন ভাবিয়া ইহা অবস্থান করাই আমার কর্তব্য। কিন্তু ইমাম ও চারি জন বৃদ্ধ আমার আদেশে শান্তি পাইয়াছে, ইহা সকলেই জানে। আবু হোসেনের মাতাকে আমি যে হাজার মোহর পাঠাইয়াছিলাম, তাহারও সে প্রাপ্তিবীকার করিয়াছে, আমার প্রত্যেক আদেশ পালিত হইয়াছে, ইহাই বা আমি স্বপ্ন বলিয়া কিরূপে বিশ্বাস করি? স্বপ্নে কখনও এ সকল কাজ হইতে পারে না। আল্লাই জানেন, এ কি রহস্য!”

সেই মোসামফর
বাড়ির



অবশেষে আবু হোসেন তাহার মাতাকে দেখিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে বলিল, “মা, আমার ঘুম ভাঙিয়াছে, আমি স্বপ্ন দেখিয়া, তোমার প্রতি বড় পরিতোষ করিয়াছি, তোমার পুত্রকে মার্জনা কর। এমন অসম্ভব স্বপ্ন কেহ কখন দেখে না, ঠিক ইহা সত্যের মত, তাই ত’ আমার এমন মতিভ্রম ঘটিয়াছিল। বাহা হউক, আমি নিজেকে খালি মনে করিয়া যে সকল কাণ্ড করিয়াছি, তাহাতে বড়ই অশ্রুতপ্ত হইয়াছি, আমি আর কখনও এমন কর্ম করিব না।”

আবু হোসেনের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া, অশ্রুত্যাগ করিয়া বলিল, “বাছা, তোমার কথা শুনিয়া আমি মুগ্ধদেহে যেন জীবন পাইলাম, তোমার যে সুবুদ্ধি হইয়াছে, ইহা আমার ও তোমার পরম সৌভাগ্যের কথা। আমি ক্রমাগত ভাবিয়া, তোমার এই প্রকার ভ্রমের কারণ ঠিক করিয়াছি। সে দিন তুমি যে অপরিচিত অতিথির সেবা করিয়াছিলে, সে তোমার অজ্ঞানোদ্যোগেও সকালে উঠিয়া বাইবার সময় তোমার দরজা বন্ধ করিয়া যায় নাই, সেই দরজা দিয়া কোন ভৃত্য তোমার ঘরে ঢুকিয়া, তোমাকে এই রকম বিপদে ফেলিয়াছিল। বৎস! আল্লাকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে এমন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।”

আবু মাথা নাড়িয়া বলিল, “মা, তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, সেই সদাগরের দোষেই আমাকে এই বিপদে পড়িতে হইয়াছে। তাহাকে আমি পুনঃ পুনঃ অজ্ঞানোদ্যোগ করিয়াছিলাম, তাহার গৃহভাগের সময় যদি আমি নিদ্রিত থাকি, তবে যেন সে দরজা বন্ধ করিয়া যায়, কিন্তু সে আমার অজ্ঞানোদ্যোগ রক্ষা করে নাই। মোসলের লোকেরা বোধ হয় জানে না যে, রাত্রি বোন্দাদে কি রকম ভূতের ভয়। বাহা হউক, আমি এখন সারিয়া উঠিয়াছি, আমাকে এ কারাগার হইতে উদ্ধার করিয়া বাড়ী লইয়া যাও, আমি এখানে থাকিলে আর বেশী দিন বাঁচিব না।”

বাসানাই-স্বপ্ন
অবসানে



আবু হোসেনের মাতা পুত্রের কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইল; কারাধ্যক্ষের নিকট সকল কথা বলিয়া, পুত্রের কারামুক্তির প্রার্থনা করিল; কারাধ্যক্ষ আবু হোসেনকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, তাহার উদ্ভ্রান্ততা সারিয়া গিয়াছে, তখন তাহাকে মুক্তিদান করিলেন। আবু হোসেন মাতার সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কারাগারে আবু হোসেনের দেহ বড় ক্ষীণ হইয়াছিল, কিছুদিন মাতার গুস্ত্রায়া তাহার দেহ সুস্থ হইল। তখন সে সায়াংকালে বন্ধুসমাগম অভাবে বড়ই কষ্ট বোধ করিতে লাগিল; সুতরাং পূর্ববৎ অতিথির সন্ধানে সে সেই সাকোর কাছে বসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আবু হোসেন শোষাক পরিয়া, মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া, লাঠি হাতে সাকোর ধারে বসিয়া আছে, এমন সময় মোসলের সেই সদাগরকে পথ-প্রান্তে দেখিতে পাইল। পূর্বে তাঁহার সঙ্গে যে ভূতাত ছিল, সেই ভূত সেই দিনও তাঁহার সঙ্গে আসিতেছিল। আবু হোসেন ছদ্মনেত্রী খালিককে দেখিয়াই ভয়ে ধর্মান্তকলেবর হইয়া উঠিল, মনে মনে বলিল, “এ বেটা সেই দিনের সেই ভেলুকীওয়ালারই বাটে, আমার অতিথি হইয়া আমার কি দুর্দশাটাই করিয়া গিয়াছে।” আবু হোসেন তাহার সঙ্গে কথা কহিবার ভয়ে যত্ন করিয়াই নদীর দিকে চাহিল।

কিছু খালিক আবু হোসেনকে দেখিয়া, আরও কিছু আহমেদের প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলেন না; আবু হোসেন গৃহে নিরিয়্য, কি ভাবে নির্ধাতন ভোগ করিয়াছে, তাহাও তিনি সবিস্তারে শুনিয়া ছিলেন, আবু হোসেনকে পুরস্কৃত করিবারও ইচ্ছা ছিল; কারণ, তিনি ব্রিয়্যছিলেন, তাঁহার বিচিত্র ব্যবহারেই আবু হোসেন এত কষ্ট সহ্য করিয়াছে। তিনি আবু হোসেনের নিকটে পুনের উপর আনিয়া বসিলেন। তিনি বুঝিলেন, আবু তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাঁহাকে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া বসিয়াছে। খালিক আবু হোসেনের মুখের নিকট মুখ আনিয়া সহাস্র-বদনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে ও, ভাই আবু হোসেন! সেলাম, এম, তোমাকে আলিঙ্গন করি।”

আবার
ছদ্মবেশে
খালিক



আবু হোসেন খালিকের মুখের দিকেও চাহিল না, যে ভাবে বসিয়া ছিল, সেই ভাবেই বসিয়া বলিল, “হাও, হাও, আর আলিঙ্গনে কাজ নাই, আমি তোমার মুখ দর্শন করিব না, তুমি যেখানে বাইতেছ, হাও।”—খালিক কৃত্রিম বিষম প্রকাশ করিয়া বলিলেন, “তুমি কি আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? তোমার অতিথি হইয়া পরম স্নেহে এক রাত্রি তোমার গৃহে অতিবাহিত করিয়াছি, তুমি কত আদর-বন্দ করিয়াছ, সে ত আজ এক মাসও পূর্ণ হয় নাই, এত অল্পসময়ের মধ্যেই তুমি সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছ?” আবু হোসেন বলিল, “হাঁ, আমি সকল কথা ভুলিয়া গিয়াছি, আমি তোমাকে কোন দিন দেখি নাই, চিনিও না, তোমাকে বাড়ীতেও লইয়া যাই নাই, তুমি এখন নিজের কাজে যাও।”

খালিক আবু হোসেনের কর্কশ উত্তরে বিমুগ্ধাভাৱে চাহিয়া বিরক্ত হইলেন না। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “ভাই আবু হোসেন, আল্লার দিবা, মিথ্যাকথা বলিও না। তুমি কখনও এত নীচ আমাকে ভুলিয়া যাইতে পার না, নিশ্চয়ই কোন কারণে তুমি আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া এ কথা বলিতেছ। আমি তোমার কোন বিশেষ উপকার করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলাম, তাহাও কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ?” আবু হোসেন বিরক্তিতে বলিল, “তোমার কতটুকু উপকার করিবার ক্ষমতা আছে, তাহা আমি জানি না, জানিতেও চাহি না। তবে তোমার একটা ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছি বটে, তুমি সাহসকে পাগল করিতে পার; আমাকেও পাগল করিয়াছিলে, অনেক কষ্টে আমার মাথা ঠাণ্ডা হইয়াছে, আর ভাই, আমার ঘাড়ে চাপিয়া আমার মাথা খারাপ করিয়া দিও না, তোমার বক্তব্য আমার আবশ্যক নাই, তুমি নিজের কাজে যাও।”

বন্ধুর মধুর
আবাস



খালিক জোর করিয়া আবু হোসেনকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া বলিলেন, “ভাই আবু হোসেন, আমি কিছুতেই তোমাকে আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে দিব না। এত দিন-পরে আবার যখন তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে, তখন আবার তোমাকে অতিথিসংকার করিতে হইবে। আবার আমি তোমার সঙ্গে পূর্ববৎ মহানন্দে মগ্ধপান করিব।” আবু হোসেন বলিল, “আর নয়, যে লোকের সঙ্গে এক রাত্রি আহমেদ করিয়া পরে প্রাণ লইয়া টানাটানি আরম্ভ হয়, সে লোকের সঙ্গে আমি আর দ্বিতীয়বার আহমেদ করি না; নেড়া একবারের বেশী ছবার বেলতলায় যায় না। তুমি আমার যথেষ্ট অপকার করিয়াছ, আর অধিক অনিষ্ট সহ্য করিবার শক্তি আমার নাই।”

আবু হোসেনকে দ্বিতীয়বার আলিঙ্গন করিয়া বিনম্রবচনে খালিক বলিলেন, “আবু হোসেন, তুমি যে আমার সঙ্গে এরূপ কঠোর ব্যবহার করিবে, তাহা আমি মনেও করি নাই। তুমি কঠিন কথা বলিয়া আমার মনে কষ্ট দিও না, তোমার বন্ধু আমি অমূল্য পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করি। আমি কোন দিন তোমার অমঙ্গল ইচ্ছা করি নাই। আমি তোমার পরম হিতাকাঙ্ক্ষী, তাপাি তুমি বলিতেছ, আমার দোষেই

তোমাকে নিদারুণ বরণা ভোগ করিতে হইয়াছে, আমি এ কথার অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। যদিও সত্যই আমার কোন ব্যবহারে তোমাকে ক্ষতিবীর্য করিতে হইয়া থাকে, তবে তাহা আমার কাছে খুলিয়া বল, আমি প্রাণপণে তোমার ক্ষতিপূরণ করিব। আমার বিশ্বাস, তোমার জ্ঞাত উপকারী বন্ধুর আমি জ্ঞাতদারে কোন অপকার করি নাই।” খালিকের বিনীত বচনে আবু হোসেনের মন অনেক নরম হইল; আবু হোসেন বলিল, “তবে শোন, তুমি আমার সকল কষ্ট ও ব্যর্থতার কারণ কি না; আমার কথা আগাপোড়া মন দিয়া শুনিতেই তুমি বুঝিতে পারিবে, আমি তোমায় উপর দ্বাণ করিয়া কিছুমাত্র অস্ত্র করি নাই।”

খালিক আবু হোসেনের পাশে বসিয়া তাহার বিপদ ও কষ্টের কথা শুনিতে লাগিলেন। আবু হোসেন সকল কথা আত্মপুষ্কিক বর্ণনা করিল, তাহাকে পাগুলা-গায়দে ঘরিয়া লইয়া বাঙারীর কথাও গোপন করিল না, সে খালিকের করুণা উদ্দেশ্যের জন্য তাহার কাহিনী এমন ভাবে বর্ণনা করিল যে, খালিকের মনে করুণার সঞ্চার না হইয়া হাত্তরসেরই আবির্ভাব হইল। খালিক তাহার সকল কথা শুনিয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

খালিককে এই ভাবে হাসিতে দেখিয়া আবু হোসেনের মনে হঠাৎ ক্রোধের সঞ্চার হইল, জুটুটি করিয়া বলিল, “আমার মুখের কথা শুনিয়া আমার মুখের উপরই তুমি হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলে, এটা কি বড় বিজ্ঞের কথা হইল? তুমি আচ্ছা বেল্লিক তো! আমি যে কি না সহ্য করিতেছি, তাহার যদি প্রমাণ লইতে, তাহা হইলে তুমি কখন এভাবে হাত্তরসিকতা করিতে পারিতে না, হুগে তোমারও অশ্রুপাত হইত। দেখ দেখি, আমার এই সকল আঘাতচিহ্ন তোমার উপহাসের উপজন্ম কি না?” কাব্যধাক আবু হোসেনকে কণ্ঠকমর বেষ্ট দ্বারা এমন নির্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছিল যে, তাহার অঙ্গের ক্ষতচিহ্ন তখনও লুপ্ত হয় নাই, হোসেন গাত্রবস্ত্র অপসারিত করিয়া তাহা খালিককে দেখাইল।

খালিক আবু হোসেনের ক্ষত দেখিয়া সত্যই বড় ব্যথিত হইলেন, তিনি হাসি বন্ধ করিয়া, আত্মকে আগ্নেয় করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, “ভাই আবু, তুমি উঠ, ক্ষোভ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে চল, আজ আমি আবার তোমার অতিথি হইয়া পানাহারে যোগ দান করিব, কাল আমার ইচ্ছা তোমার মদ্যলহ হইবে।”

আবু হোসেন যদিও পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে কোন অতিথিকে একবারের অধিক হইবার তাহার গৃহে স্থান প্রদান করিবে না, তথাপি খালিকের কথাবার্তা ও ব্যবহারে সে এমন মুগ্ধ হইয়াছিল যে, খালিকের অহরোধ উপেক্ষা করিতে পারিল না, মোসলের সেই এক দিনের পরিচিত সদাগরের উপরোধ সে কোন রকমে প্রত্যাখ্যেত পারিল না। সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া বলিল, “আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম, কিন্তু তোমাকে আমার নিকট একটি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইবে; প্রতিজ্ঞা এই যে, তুমি সকালে যখন আমার ঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, তখন দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া যাইবে। পূর্বে একবার তুমি দরজা বন্ধ না করাতোই আমাকে ভূতে পাইয়াছিল, এবার ভূতের হাতে পড়িলে আমার একখানা হাড়ও আঁত খাকিবে না। ঐ বস্তুটিতে আমার বড় ভয়, তুমি বিদেশী লোক, জান না, বোশাদদের অগ্নিতে গলিতে ভূত বেড়ায়, আর হবিধা পাইলেই লোকের ঘরে ঢুকিয়া রক্তে ভর করে।” খালিক আবু হোসেনের নিকট সীতমত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন, তাহার পর বলিলেন, “তুমি আমার কথা অবিশ্বাস করিও না, আমি সত্যই তোমার ভবিষ্যৎ সুখ ও উন্নতি কামনা করি, আমার এই কামনা বাহ্যিক কি আন্তরিক, শীঘ্রই তুমি তাহার পরিচয় পাইবে।”



আবু হোসেন বলিল, “আমি তাহার পরিচয় চাহি না। আল্লাহ অহুগ্রহে আমি বেশ সন্তুষ্ট হইব। তুমি আর আমাকে কোন অহুগ্রহ করিও না। তুমি একবার আমার দ্বার খুলিয়া রাখিয়া যে বিপদে ফেলিয়াছিলে, তাহার পরিচয় পাইয়াছি, বাহাতে পুনরবার সেক্ষণ বিপদে না পড়ি, অহুগ্রহ করিয়া তাহাই করিও, আর কিছু করিতে হইবে না।” খালিক হাসিয়া বলিলেন, “আচ্ছা, তাহাই হইবে, এবার আমি নিশ্চয়ই তোমার দ্বার বন্ধ করিয়া দিব।” আবু হোসেন ভুনিয়া গুণী হইল।

কথা কহিতে কহিতে আবু হোসেন ও খালিক আবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন, খালিকের ভৃত্যও তাঁহাদের অহুগমন করিল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছিল, আবু হোসেন খালিককে সোফায় বসিতে অহুরোধ করিয়া তাহার মাতাকে ঘরে আনো দিতে অহুরোধ করিল। আবু হোসেনের মাতা আনো দিয়া উভয়ের আহাৰাদির আয়োজন করিয়া দিলেন। আহাৰ শেষ হইলে মাতা আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া পুত্র ও পুত্রের অভিধির অস্ত্র নানাপ্রকার ফল, মদ এবং নগ্নপানের পাত্র আনিয়া দিলেন। তাহার তিনি গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। আবু হোসেন ও খালিক উভয়ে মতপান করিতে করিতে নান বিষয়ে গল্পে লিপ্ত হইলেন। আবু হোসেন মস্তপানে উৎফুল্ল হইলে, খালিক কথাপ্রসঙ্গে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবু হোসেন, তুমি ত বড় রমিক লোক, কত কথিয়া বল দেখি তাই, কখনও তুমি পীরিতে পড়িয়াছ কি না?”

শিরাত চাহি না,
মদেই আমোদ



আবু হোসেন বলিল, “ভাই, পীরিতের কথা আর মুখে আনিও না, আমি ও জিনিষটাকে বড়ই ঘৃণা করি, পীরিতই বল আর বিবাহই বল, কেবল দাসত্ব ছাড়া আর কিছুই নহে, এ রকম দাসত্ব করিতে কোন কখন রাজী নই। বস্তুবাক্য লইয়া এমনই আমোদ করিতেই আমার সকল অপেক্ষা অধিক ভাল লাগে, এমন আমোদ আর কিছুতেই নাই। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আমি সে দিন যে আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম, সেই স্বপ্নে এক হুন্দরীকে দেখিয়াছিলাম। ভাই, চমৎকার হুন্দরী, যেমন সে গায়, তেমনই বাজায়; আমাকে সে এমন খুশী করিয়াছিল যে, আমি সত্যই আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। সেই হুন্দরীকে যদি বিবাহ করিতে পারি, তবে তাহার সঙ্গে পীরিত করিতে রাজী আছি, তাহার সঙ্গে পীরিত করিয়া স্বপ্ন আছে বলিয়া আমার বোধ হয়; কিন্তু খালিকের অঙ্কুশের ভিতর, ভাই, এমন হুন্দরী যে কোথাও আছে, তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। উজীর কিংবা অস্ত্র বড়লোকেরাও অগাধ অর্থ ব্যয় করিয়া এমন হুন্দরী দুই একটি ঘরে আনিতে পারে সন্দেহ নাই, আমার তত অর্থ নাই, সুতরাং বোতল লইয়াই আমাকে খুশী থাকিতে হইবে; ইহাতে খরচ কম, সুখের সীমা নাই।” আবু হোসেন আবার এক পেয়ালা মদ ঢালিয়া নিজে পান করিয়া আর এক পেয়ালা খালিকের হস্তে দিল; বলিল, “আমরা যেন চিরদিন এই আমোদেই মত্ত থাকিতে পারি।” পাত্র শুষ্ক করিয়া খালিক আবু হোসেনকে বলিলেন, “ভাই, তোমার মত হুন্দরীক হুন্দর যুবাপুত্র যে পীরিতের মায়া ভাগ করিয়া কেবল মদেই বিভোর হইয়া থাকিবে, ইহা বড়ই আপশোষের কথা।” আবু হোসেন বলিল, “না দাদা, ইহাতে আপশোষ কিছুই নাই, বেশ আছি, ক্রীলোককে ভালবাসা এক স্বকমারী, তাহাদের রূপে একটু মিষ্টত্ব থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাতে হাজার রকম যক্ষণা ভোগ করিতে হয়। ও সকল কাজে কথা ছাড়িয়া দাও।”—খালিক বলিলেন, “ছাড়িয়া দিলে চলিবে কেন? ঐ ত’ হইল আসল কথা, মদ ও মেয়েমানুষ ভিন্ন কি মানুষের স্বপ্ন পূর্ণ হয়? আমি তোমার মনের মত একটি হুন্দরী যোগাড় করিয়া দিব।” তাহার পর তিনি এক পাত্র মদে পুরস্কৃত সেই গুঁড়ো কিঞ্চিৎ পরিমাণে সুকোশলে নিশাওয়া, আবু হোসেনের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন, “ভাই, তোমার হস্ত আমি যে রূপসী যেয়েমাহট্টা সংগ্রহ করিব, তাহার স্বাস্থ্য পান কর। আমার কথার উপর তুমি নির্ভর কর, নিশ্চয়ই স্বপ্নী হইবে।”

সুখ ও হুন্দরী
ব্যতীত
যৌবন অতুল



আবু হোসেন সহস্রান্তে পাত্রটি গ্রহণ করিল, মাথা নাড়িয়া বলিল, “তোমার কথাই থাক, আমি তোমার মত শুভাকাঙ্ক্ষী অভিযির স্থান রাখিবার জন্য ইহা পান করিতেছি।”

আবু হোসেন সেই পাত্রস্থ মত্তটুকু উদরস্থ করিবামাত্র নিদ্রাঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, খালিক তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভৃত্যকে বলিলেন, “উহাকে স্বদে লইয়া চল।” ভৃত্য নিদ্রাভিত্ত আবু হোসেনকে স্বদে লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইলে, খালিক তাহার দরজায় শিকল আটকাইয়া দিলেন। আবু হোসেনকে এবার আর পূর্ববৎ তাহার গৃহে পাঠাইতে তাঁহার সংকল্প ছিল না।

খালিকের আদেশে ভৃত্য, আবু হোসেনকে প্রাণাদের চতুর্থ কামরায় লইয়া গেল, সেইখানেই আবু হুন্দরী-হস্তে মত্তপান করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। ভৃত্য আবু হোসেনকে একখানি সোকার উপর শায়িত করিল, পূর্বদিন নিদ্রিত হইবার সময় তাহার দেহে খালিকের যে পরিচ্ছদ ছিল, যাহা তাহাকে তাহার গৃহে লইয়া যাইবার পূর্বে খুলিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই পরিচ্ছদ পুনরায় তাহাকে পরিধান করান হইল। অনন্তর আবু হোসেন যে একল হুন্দরীকে লইয়া সেই কক্ষে আমোদ-প্রমোদ করিয়াছিল, সেই একল হুন্দরীকে সেই কক্ষে হাঙ্গির থাকিবার আদেশ করিয়া, খালিক নিজ কক্ষে শয়ন করিতে চলিলেন, মসরুরকে বলিলেন, নিদ্রিত সময়ে যেন তাঁহাকে জাগাইয়া দেওয়া হয়।

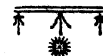
পরদিন প্রত্যবে মসরুর খালিকের নিদ্রাভঙ্গ করিল। খালিক তৎক্ষণাৎ পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিয়া স্বাভাবিকরূপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখনও আবু হোসেন নিদ্রামগ্ন ছিল।

হুন্দরীশ খালিকের আদেশে বাস্তবদ্বারা লইয়া তাহাকে বিরিয়া দাঁড়াইল, কন্দচারিগণ ও খোজার সম্মুখে তাহার নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্য করিতে লাগিল। অবশেষে পূর্বের ভায় ভিনিগারের আজ্ঞা দ্বারা আবু হোসেনের নিদ্রাভঙ্গ করা হইল। নিদ্রাভঙ্গমাত্র সাত জন হুন্দরী যুবতী একত্রে বীণায় সুর দিল; তাহাদের মৃদু কণ্ঠস্বরের লহরী প্রভাতের সূর্য্যতল বাস্তুর স্পন্দিত করিতে লাগিল। এই হুন্দর গীতবাত্ত শ্রবণ করিয়া আবু হোসেন চক্ উন্মীলিত করিল, দেখিল, সেই হুন্দরীবৃন্দ, সেই কন্দচারিগণ, সেই খোজার বণ—একদিন নিদ্রিত হইবার পূর্বে যেমন দেখিয়াছিল, আজ নিদ্রাভঙ্গে তাহাদিগকে ঠিক সেই ভাবেই দেখিতে পাইল। প্রথম স্বপ্নদর্শনকালে সে যে কক্ষে আপনাকে স্থাপিত দেখিতে পাইয়াছিল, আজও সেই কক্ষে আপনাকে সংস্থাপিত দেখিল।



ভৃত্য
স্বদে
নিদ্রিত
ভালান

আবার সেই
বাদসাহী স্বপ্ন-
প্রবেশিকা



আবু হোসেন চাহিয়া দেখিল, সকলেই নতশিরে তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাকে আগরিত দেখিয়া স্তম্ভরূপে গীতবাত্ত বন্ধ করিয়া দিল। আবু হোসেন স্বয়ং নিজের অশ্রুশী দংশন করিয়া আবেগভরে বলিতে লাগিল, “হায়, হায়, আবার সেই সর্বনাশের স্বপ্ন! এক মাস আগে আমাকে ভূতে পাইয়াছিল, আজ আবার সেই ভূতে পাইল! আবার কি সেইরূপ পাগলা-গারদে আবদ্ধ হইয়া সেই প্রকার বৈরাগ্যাত সহ্য করিব? এবার লোহার পিঞ্জরায় আবদ্ধ হইলে একেবারেই মরিয়া যাইব! হা আল্লা, তুমি আমার নদীবে এ কি দ্বন্দ্ব লিখিয়াছ? কাল সন্ধ্যার সময় আমি যে অতিথিকে গৃহে স্থান দিয়াছিলাম, বুঝিলাম, এ সকল তাহা হইবে নষ্টাম! সে লোকটা দেখিতেছি প্রকাণ্ড বাহুবল, যৌর মিথ্যাদানী, বিষম প্রবঞ্চক; আমার কাছে দিয়া করিয়া তদন্তগারে কাজ করিল না। দেখিতেছি, সে চলিয়া যাইবার সময় আমার দ্বার বন্ধ না করিয়া যাওয়াতে আমাকে ভূতে পাইয়াছে, আবার আমি খালি হইয়াছি, তাহাই স্বপ্ন দেখিলাম! আল্লা, তুমি আমাকে রক্ষা কর।” আবু হোসেন আড়ষ্টভাবে পড়িয়া চক্ষু মুদিত করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। খালি তাহার সকল কথা শুনিতে পাইয়া বিশেষ আশ্রয় অশ্রুভব করিলেন।

গীতগণের
শ-উল্লাস



কিয়ৎকাল পরে আবু হোসেন চক্ষু খুলিল, একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, “আজ বুঝিতেছি, এ সকলই সত্যতানী কাণ্ড। আল্লা, আল্লা, তুমি আমাকে রক্ষা কর।”—তাহার পর চক্ষু মুদিত করিয়া বলিল, “এখন আমার কর্তব্য কি, তাহা বুঝিয়াছি; আমি চোখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিব, এই গ্রহর পর্যন্ত পড়িয়া থাকিতে হয়, তাহাও স্বীকার, সত্যতান আমাকে না ছাড়িলে আর আমি উঠিতেছি না।”

গোপসের
গাহাণ-
বিহাস



কিন্তু তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না। স্তম্ভরী রঞ্জিনী দেলখোশ তাহার শয্যাপ্রান্তে আসিয়া বসিল, সে মুহূর্তে মধুরস্বরে বলিল, “জাহাপনা, প্রবলপ্রভাব থাকিল, আপনি আর নিদ্রা যাইবেন না, রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠুন।” আবু হোসেন সরোষে বলিল, “দূর হ সত্যতানী, আমি জাহাপনা নই, খালি নই, তবে আমাকে কেন এ ভাবে সম্বোধন করিতেছিস?”

স্তম্ভরী নড়িল না, বিরক্তিপ্রকাশও করিল না, অধিকতর মোহাগন্তরে বলিল, “আপনি ভুল বলিতেছেন কেন জাহাপনা? আপনিই ত খালি, ছনিয়ার মালিক, মুসলমান-রাজ্যের অধিতীয় অধিপতি। আপনি চক্ষু খুলুন, স্বপ্ন দেখিয়া থাকিলে অবিলম্বেই তাহার প্রভাব-দূর হইবে। আপনি ত আপনার গোলাদেহী শয়ন করিয়া আছেন, দেখুন, আপনার কিব্বর-কিব্বরী আমরা আপনার আদেশপালনের জন্ত চারিদিকে অবস্থান করিতেছি। আপনি কাল রাতে এই কক্ষ আমোদ করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, আমরা আর আপনার নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহসী হই নাই, সকলেই আপনার নিদ্রাভঙ্গের দ্রুত প্রতীক্ষা করিতেছি।”

আবু হোসেন দেলখোশের কথা বিশ্বাস করিবে কি না, বুঝিতে না পারিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিল; দেখিল, পূর্বরাত্রে যেমন স্তম্ভরীপণ তাহার আদেশপালনার প্রতীক্ষা করিতেছিল, তাহারা ঠিক সেইভাবে অপেক্ষা করিতেছে। তাহাকে বসিতে দেখিয়া স্তম্ভরীপণ তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইয়া বসিল, “খালি, পরগণ্ডের সেনাপতি, উঠুন, বেলা অধিক হইয়াছে।”

আবু হোসেন চোখ মুছিতে মুছিতে বলিল, “তোমরা বেজায় নাছোড়বান্দা দেখিতেছি, আমাকে কি আবার পাগল না করিয়া ছাড়িবে না? আমি বিলক্ষণ জানি, আমি খালি নই, আমি আবু হোসেন, তোমরা আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করিও না। তোমাদের যে চেষ্টা আর সকল হইবে না।”

সুন্দরী দেলখোস্ বলিল, “আপনি কোন্ আবু হোসেনের কথা বলিতেছেন? তাহাকে আমরা চিনি না, তাহাকে চিনিতেও চাহি না। আমরা চিরদিন দেখিয়া আসিতেছি, আপনিই খালিফ, আপনার দাসী হইয়া আমরা আপনাকে চিনিব না? এতগুলি লোক, সকলেই কি ভুল করিবে?—তাহা কখনই সম্ভবপর নহে, আপনি খালিফ নহেন, সে কথা বলিলে আমরা গুনিব কেন?”

আবু হোসেন কোন উত্তর না দিয়া, উর্দ্ধদিকে চাহিয়া ভীতভাবে বলিল, “আম্না, আমার উপর দয়া কর, আমি বিষম সঙ্কটে পড়িয়াছি, সত্যের মত এমন স্বপ্ন আমি কখন দেখি নাই। তোমার হস্তেই আমি আত্মসমর্পণ করিলাম। সয়তান আমাকে একেবারে পাইয়া বসিয়াছে।” খালিফ আবু হোসেনের আক্ষেপ শুনিয়া মনে মনে এতই আশোদ বোধ করিলেন যে, তিনি অন্তিমকণ্ঠে হান্ত স্বেবরণ করিলেন।

আবু হোসেন চিৎ হইয়া পুনরায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদিত করিল, শয্যাভাগের কোন লক্ষণই প্রকাশ করিল না। তখন সুন্দরী দেলখোস্ বলিল, “মহিমাদিত খালিফ, বেলা ক্রমে অধিক হইতেছে, আপনাকে এক কথা আমি পুনঃ পুনঃ জানাইয়াছি, আপনার রাজকাণ্ডের সময় হইয়াছে, তাহা বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। এ অবস্থায় আপনি না উঠিলে আপনার যে হুকুম আছে, আমরা তদনুসারেই কাজ করিতে বাধ্য, বেয়াদবী মার্জনা করিবেন।” দেলখোস্ তাহার স্ত্রীগোল, স্ত্রকোমল মুণালভূজে আবু হোসেনের এক হাত ধরিয়া তাহার সঙ্গিনী সুন্দরীগণকে তাহার দৃষ্টান্তের অমূল্যরূপ করিতে অমূল্যরূপ করিল। তখন সখীগণ সকলে আসিয়া ভূজপাশের সুদৃঢ়বন্ধনে আবু হোসেনকে তাহার শয্যা হইতে টানিয়া তুলিল; তাহার পর তাহাকে একখানি আসনে বসাইবার জন্ত তুলিয়া লইয়া চলিল; সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে করতাল ও অস্ত্রাঙ্ক বাজ্ঞবজ্রাদি বাজিতে লাগিল; চতুর্দিকে বিষম ধুমমচ শব্দ উঠিল।

আবু হোসেনের বিষয়ের সীমা রহিল না; সে মনে মনে বলিল, “নতাই কি আমি খালিফ? আমি কিছুই ত’ বুঝিতে পারিতেছি না।” মুকুটমালা ও শব্দতারা যুবতীদয় অদূরে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিতেছিল, আবু হোসেন তাহাদিগকে চিনিতে পারিয়া তাহাদিগকে নিকটে আসিবার জন্ত ইঙ্গিত করিল। আবু হোসেনের ইঙ্গিতে তাহারা তাহার নিকট আসিলে, আবু হোসেন বলিল, “এখা বলিও না, সত্য করিয়া বল, আমি কে?”

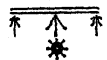
শুকতারা সুন্দরী বলিল, “আপনি খালিফ, সমস্ত পৃথিবীর অধিতীয় অধিপতি মহাপ্রতাপশালী খালিফ। আপনি অজ লোক, এ সম্ভেদ আপনার মনে কেন স্থান পাইতেছে, তাহা আমরা কোনমতে বুঝিতে পারিতেছি না। আপনার এত আশ্চর্যবৃত্তির কারণ কি? আপনি কাল সমস্ত দিন কি কি কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন, ভাবিয়া দেখুন না। আপনি রাজদরবারে বসিয়া রাজকাণ্ড করিয়াছেন, ঙ্গল ইমাম ও তাহার চারি জন বন্ধকে শাস্তিদান করিয়াছেন, আবু হোসেন নামক এক জন লোকের মাতাকে হাজার বোহর পুরস্কার দান করিয়াছেন, বিভিন্ন কক্ষে বসিয়া আহারাদি করিয়াছেন, আমাদের সঙ্গীত শুনিয়াছেন, অবশেষে এই কক্ষে বসিয়া আমাদের সঙ্গে মত্তপান করিতে করিতে—গান শুনিতে শুনিতে আপনি নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আপনার নিদ্রাভঙ্কের বিলম্ব দেখিয়া আমরা সকলেও রাজকর্মচারিণী আপনাদের নিকট সমবেত হইয়াছি, আপনি কখন এত অধিক বেলা পর্যন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া থাকেন না। আজ আপনার কোন অসুখ করিয়াছে ভাবিয়া আমরা বড় চিন্তিত হইয়াছি। এখন উঠিয়া নেমাজ করিতে চলুন, আর অধিক বাস্তবায় প্রয়োজন নাই, সকল সম্ভেদ আপনার মন হইতে দূর করুন।”

আবু হোসেন মাথা নাড়িয়া বলিল, “সব মিথ্যা কথা দেখিতেছি, তোমরা সকলেই পাখল হইয়াছ, তোমরা এমন সুন্দরী, তথাপি পাগল হইলে? আল্লাহ এই কি বিচার? তোমাদের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর কতদিন চলিয়া গিয়াছে, তাহা তোমরা কি বুঝিতে পারিতেছ না? আমি আমার মাকে মনের ভুলে

মুণাল-
ভূজবন্ধনে
স্বপ্ন-ভাগরণ



রঙ্গিণী-
সোহাগে
স্বপ্নভাষি



প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছি, আমি খালি, এ কথা কেহই বিশ্বাস না করিয়া, আমি পাগল হইয়াছি ভাবিয়া, তাহারা আমাকে পাগুলাগারদে লোহার খাঁচায় বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল; প্রত্যহ তাহারা আমাকে পঞ্চাশ বা বেত মারিয়াছে, এ সকল কথা আমি স্বপ্ন বলিয়া কেমন করিয়া উড়াইয়া দিব? আমার শরীরের সেই সকল ক্ষতচিহ্ন এখনও যে অদৃশ্য হয় নাই। বুঝিতেছি, তোমরা আমাকে লইয়া ক্রমাগত মজাই করিতেছ।”

মিকের কর্ণে
চক্ষু কামড়



আবু হোসেন তাহার পৃষ্ঠের বস্ত্র অপসারিত করিয়া স্তন্যরোগণকে ক্ষতচিহ্ন দেখাইল; বলিল, “আমি কি স্বপ্নাবস্থায় এ সকল চাবুক খাইয়াছি, আমি স্বপ্নাবস্থাতেই কারাগারে লৌহশিকরে আবদ্ধ ছিলাম? তাহাই যদি হয়, তবে এ স্বপ্ন বড়ই অদ্ভুত বলিতে হইবে, এমন স্বপ্নদর্শন বোধ করি, পৃথিবীতে কখন আর কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। আল্লা, তুমিই আমার সম্বন্ধে দূর কর, সত্য কি, তাহা আমাকে জানাইয়া দাও।”



জিনী-
ন সঙ্গে
নৃত্য-
ইচ্ছা

আবু হোসেন নিকটবর্তী এক জন কর্মচারীকে আক্কেল করিয়া বলিল, “ওহে বাপু, তুমি আমার কাণ্ডটা একবার কামড়াইয়া দাও ত’ ব্যথা লাগে কি না দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, আমি জাগিয়া আছি কি ঘুমাইতেছি।” কর্মচারী আবু হোসেনের কর্ণে এমন নিদারুণ দংশন করিল যে, যন্ত্রণায় সে চীৎকার করিয়া উঠিল।

আবু হোসেনকে যন্ত্রণায় চীৎকার করিতে দেখিয়া স্তন্যরোগণ সমতালে বাস্তবধনি সহকারে নৃত্যগীত আরম্ভ করিল। আবু হোসেন একে-বারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল, সে

উন্নতের ভ্রায় যুবতীগণের সঙ্গে নাচিতে লাগিল, খাগিদের যে অত্যাৎকষ্ট পরিচ্ছদে ভূতাগণ তাহাকে ভূষিত করিয়াছিল, তাহা সে ছিড়িয়া ফেলিল, তাহার পর তাহার পাগুড়ী ফেলিয়া দিয়া, দুই জন যুবতীর হাত ধরিয়া এমন বেতালো নাচিতে লাগিল যে, সকলেই তাহার কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়মগ্ন হইল। খালিক আর হাতসংবরণে সমর্থ হইলেন না, তিনি হাসিতে হাসিতে গুলস্থান হইতে বাহির হইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আবু হোসেন, তুমি কি আমাকে হাসাইয়া মারিয়া ফেলিবে? এ কি কাণ্ড আরম্ভ করিয়াছ?”

খালিককে দেখিবামাত্র সকলের নৃত্যগীত ও বাস্তবধনি বন্ধ হইয়া গেল। সকলে সম্মুখে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। আবু হোসেনও নৃত্য বন্ধ করিয়া খালিকের দিকে ফিরিয়া চাহিয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে সে তাঁহাকে মোসলের সেই সশাণের বলিয়া চিনিতে পারিল; ক্রুদ্ধবশে বলিল, “হী, এতক্ষণে বুঝিলাম, আমি

ধ্বংস দেখিতেছি না, আমি সত্যই আবু হোসেন, আর তুমি মোদলের সদাগর, আমার অতিথি। তুমি বাছুর, বাছুরিষ্ঠাবলে তুমি আমাকে কি কষ্টই না দিয়াছ, আমি মাকে ধরিয়া নির্দয়রূপে প্রহার করিয়াছি, প্রতিদিন পঞ্চাশ বা বেত খাইয়াছি, প্রায় তিন সপ্তাহকাল কারাগারে লৌহশিঞ্জরে আবদ্ধ ছিলাম। আবার তুমি আমাকে বাছুরিষ্ঠাবলে এই রকম অবস্থায় ফেলিয়া নাচাইয়া লইয়া বেড়াইতেছ, এখন হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া ভাল মাগুয়ের মত পাত বাহির করিয়া বলিতেছ, ‘আমাকে হাসাইয়া মারিলে।’ আমার এ সকল চুর্দ্দশার জন্ত দায়ী কে? তুমিই ত’ আমার সর্বনাশ করিয়াছ, বিধবাস্যাতক! প্রবঞ্চক!”

বাছুর না
খালিক?



আবু হোসেনের এ তিরস্কার শুনিয়া দাসদাসী ও কর্মচারিগণ ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু খালিক বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। তিনি সহান্তে বলিলেন, “আবু হোসেন, তুমি অনর্থক আমার উপর রাগ করিতেছ, তোমার মঙ্গলের জন্তই আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি। তুমি যে সকল যন্ত্রণা সহ করিয়াছ, তাহার উপযুক্ত পুরস্কার এবার তুমি লাভ করিবে।”

অনন্তর খালিক আর একটি মূল্যবান নূতন পরিচ্ছদ আনিয়া আবু হোসেনকে সজ্জিত করিবার জন্ত ভূত্যাগণকে আদেশ করিলেন। আবু হোসেন কর্মচারিগণের ভাব দেখিয়া সহজেই বুঝিতে পারিল যে, বাহার সঙ্গে কথা চলিতেছে, তিনি মোদলের সদাগর নহেন, স্বয়ং জুনিয়ার বাদশা, পরগণ্বরের সেনাপতি মহাপরাক্রান্ত খালিক। আবু হোসেন ভয়ে খালিকের পদতলে পড়িয়া তাহার অসংযতবাক্য ও তাহার প্রতি তাহার অমার্জ্জনীয় ব্যবহারের জন্ত তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

খালিক তাহাকে উঠাইয়া সম্মুখে আলিঙ্গন প্রদান করিয়া বলিলেন, “ভাই আবু হোসেন, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি কোনই অপরাধ কর নাই, আমার কাছে তোমার কি প্রার্থনা আছে বল, বাহা চাহিবে, তাহাই পাইবে।”

আবু হোসেন বলিল, “জাহাপনা, আপনি কিরূপে আমাকে পাগল করিয়া তুলিলেন, তাহাই জানিবার জন্ত আমার অত্যন্ত আগ্রহ জন্মিয়াছে, আমি দেই কথাই আগে জানিতে চাই, আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

খালিক আন্তোপান্ত সকল কথা আবু হোসেনকে বলিলেন, চূর্ণমিশ্রিত মস্তপানে তাহাকে নিম্বিত করিয়া, পরে তাহার এক দিনের জন্ত খালিক হওয়ার সাধ পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহাও বলিলেন। সকল কথা শেষ করিয়া খালিক বলিলেন, “আবু হোসেন, তুমি বুঝিতেছ, তোমার কোন অপকার করা আমার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তুমি যে এত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ করিয়াছ, সে জন্ত আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি। আমি তোমাকে কিরূপে পুরস্কৃত করিব, এখন তাহাই বল, তুমি যে প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই পূর্ণ করিব।”

আবু হোসেন বলিল, “জাহাপনা, আমি আপনার কথা শুনিয়াই সকল যন্ত্রণার কথা বিস্তৃত হইলাম। আমার প্রভু ও রাজার বাহা ইচ্ছা হইয়াছিল, তদনুসারেই কাজ হইয়াছে, সে জন্ত আমার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নাই। আমি খোদাবন্দের নিকট কোনই স্বার্থলোভের কামনা করি না; কেবল আমার প্রার্থনা, আমি যেন আপনার নিকট যখন ইচ্ছা আসিতে পারি, প্রাসাদে যেন আমার অব্যাহত স্থান হয়।”

আবু হোসেনের নির্লোভের পরিচয় পাইয়া খালিক তাহার প্রতি অধিকতর সন্তুষ্ট হইলেন; বলিলেন, “আমি তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলাম। আজ হইতে প্রাসাদে তোমার অব্যাহত স্থান হইল, কেহই তোমার কোন স্থানে গমনে বাধা দিবে না। আমি যখন যেখানে থাকি, তুমি যখনই আমার নিকট উপস্থিত

নির্লোভ
শ্রেমিকের
পুরস্কার



হইতে পারিবে।” আবু হোসেনকে তিনি প্রাসাদের একটি প্রশস্ত কক্ষে বাস করিবার অমুমতি দান করিলেন, এবং তাহাকে তাহার পার্শ্বচরের পদ প্রদান করিলেন। এতদ্বিত্ত কোষাধ্যক্ষের প্রতি আদেশ করিলেন, যেন অবিলম্বে তাহার বাস তহবিল হইতে আবু হোসেনকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনন্তর খালিক রাজদরবারে প্রস্থান করিলেন।

আবু হোসেনের কাহিনী অবিলম্বে বোন্দাদের সমস্ত প্রসারিত হইল। সকলের মুখেই তাহার কথা, দূরদূরান্তরেরও অনেক লোক তাহার এই অদ্ভুত কথা শুনিতে পাইল।

আবু হোসেন অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহার সন্তুষ্টি, প্রচুরতা, রসিকতা প্রভৃতি দ্বারা খালিক ও খালিকসম্বন্ধী জোবেদীর প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিল, শেষে এমন হইল যে, খালিক তাহাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারিতেন না। আবু হোসেন মাতাকে খালিকের অমুগ্রহের কথা জানাইয়া বাড়ী ছাড়িয়া প্রাসাদে আসিয়াই বাস করিতে বলিল। *

জোবেদী দেখিতেন, আবু হোসেন বখনই তাহার কক্ষে প্রবেশ করে, তখনই তাহার একটি স্নানরী বাদীর দিকে আড়নয়নে চাহিয়া থাকে। এই বাদীর নাম নোজাতুল আগরাত, নোজাতুল আবু হোসেনকে দেখিয়া প্রচুর হইয়া উঠে। কয়েক দিন ইহা লক্ষ্য করিয়া জোবেদী খালিককে বলিলেন, “জাঁহাপনা, আমার বোধ হয়, আবু হোসেন ও নোজাতুল উভয়ে উভয়ের প্রতি অমুগ্রহ; আমার বিবেচনায় ইহাদের বিবাহ হইলে ইহারা বিশেষ সুখী হইতে পারে।” খালিক বলিলেন, “তুমি ঠিক কথাই বলিয়াছ, আবু হোসেনের বিবাহ দিতে আমি সম্মত ছিলাম, নানা কাজে কথটা ভুলিয়া গিয়াছি। উভয়ের মত হইলে বিবাহের আয়োজন কর।”

উভয়েই সানন্দে বিবাহে সম্মতি প্রকাশ করিল, সুতরাং মহা সমারোহে প্রাসাদেই বিবাহ হইয়া গেল। আহাৰ ও আমোদপ্রমোদ কয়েক দিন অবিশ্রান্তভাবে চলিতে লাগিল।

আবু হোসেন ও নোজাতুল আগরাতের স্বথের সীমা রহিল না, উভয়েই দিবানিশি একত্র বাস করিতে লাগিল। খালিক ও জোবেদী তাহাদের বিবাহে যে প্রচুর যৌতুক দান করিয়াছিলেন, আহারীয় দ্রব্য ও মজ্জা তাহা তাহারা দুই হাতে উড়াইতে লাগিল। কখন পান, কখন পান, কখন নুতা, কখন আহাৰ, এই ভাবে প্রমোদ স্রোতে ভাসিয়া দিবারাত্রি অতিবাহিত হইতে লাগিল। অবশেষে তাহাদের হাতে যে কিছু অর্থ ছিল, তাহা নিঃশেষিত হইয়া গেল। উভয়েই অর্থচিন্তায় কাতর হইয়া পড়িল।

আবু হোসেন বলিল, “আমি ত খালিকের কাছে কিছু চাহিতে পারিব না। তিনি আমাদের বিবাহে এত টাকা যৌতুক দিলেন, এক বৎসর যাইতে না যাইতে সমস্ত খরচ হইয়া গেল, আবার আমি কোন্ মুখে গিয়া তাহার কাছে হাত পাতিব?”

নোজাতুল আগরাত বলিল, “আমিও আমার মনিব জোবেদী বেগমের কাছে কিছু চাহিতে পারিব না, তিনি আমাকে অনেক টাকা দিয়াছেন, তুমিই ত নবাবী করিয়া সকলই এক বৎসরের মধ্যে ফুকিয়া দিলে, এখন আমি কি বলিয়া তাঁহার নিকট আবার অর্থ চাহিব? তাহা আমি কোনমতে পারিব না।”

আবু হোসেন বলিল, “তবে সংসার কি রকম করিয়া চলিবে? আমার যে কিছু শৈতুক অর্থ ছিল, তাহা মায়ের হাতে দিয়াছি, তাহার কিছুই আমি চাহি না বলিয়া তখন ছাড়িয়া দিয়াছি, এখন যে আবার মায়ের কাছে টাকা চাহিব, তাহা ত পারিব না।”

নোজাতুল বলিল, “তবে সংসার অচল হোক। আমি সংসারের ভাবনা ভাবিয়া মরিতে পারিব না।”

আড়নয়নে
চকি হাসিতে
প্রাণ-বিনিময়



প্রমোদ-
ফকানের
মহিমা পদ



আবু হোসেন বলিল, “তবে এক কাজ করা যাক, এম না, আমরা হুজনেই মরি। আমার মাথায় এক ফন্দী আগিয়াছে, মরিগেই আমরা কিছু কিছু অর্থোপার্জন করিতে পারিব, তাহাতে আমাদের কিছুদিন বেশ সুখে কাটিবে।”

নোজাতুল বলিল, “আমি মরিতে রাজী নই, তোমার জীবনে যদি বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে, তুমি মরিতে পার। আমার সুখভোগের আকাঙ্ক্ষা, জীবনের সকল-সাধ, আশা পরিত্যক্ত হয় নাই, আমি মরিব না। তোমার ফন্দী অহুণারে তুমিই কাজ কর।”

আবু হোসেন বলিল, “আরে, যেয়েমাহুকের দোষই ঐ, আমার সকল কথা না শুনিয়াই তুমি বাকিয়া বলিলে, আমি কি আর সত্যই তোমাকে মরিতে বলিতেছি! মৃত্যুর ভান করিতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা মনিবের কাছে কিছু আদায় করিতে পারিব।”

নোজাতুল বলিল, “নকল মৃত্যু! তাতে বরং রাজী আছি, কিছু আদায় হোক না হোক, আমোদটা যদি ভাল রকম গড়ায়, তাহাতেই আমি খুশী হইব। আমি আমোদ বড় ভালবাসি। এখন কি করিতে হইবে বল ত’ মসিকচূড়ামণি!”

আবু হোসেন বলিল, “আমি মিছামিছি মরিয়া পড়িয়া থাকিব, তুমি মস্তার দিকে আমার পা করিয়া আমার আপাদমস্তক ঢাকিয়া, কাদিতে কাদিতে জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আমার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিবে; শুনিয়া তিনি আমার সমাধির ব্যয় ও কফিনের ব্যয় দিবেন। এই হইল এক দফা আদায়। তাহার পর তুমিও মিছামিছি মরিবে, আমি তোমাকে ঢাকিয়া খালিকের নিকট উপস্থিত হইব, কাদিতে কাদিতে তোমার মৃত্যু-সংবাদ তাঁহার গোচর করিলে তিনি তোমার সমাধির ব্যয় ও কফিনের জন্ত মূল্যবান বস্তু দিবেন। এই রকমে দুই কিত্তিতে আমরা যে অর্থাদি পাইব, সেই অর্থাদিতে আমাদের হুজনের কিছুদিন চলিবে, কি বল, কেমন ফন্দী?”

নোজাতুল বলিল, “উত্তম ফন্দী বটে, কিন্তু পরে যখন সকল কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে?”

“তখন একটা উপায় দেখা যাইবে, আপাততঃ অর্ধকষ্ট হইতে উদ্ধারলাভ করা যাক। আমিই প্রথমে মরি, কি বল?”

আবু হোসেন অতঃপর গালিচায় উপর চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। নোজাতুল তাহার পদযন্ত্র মস্তার দিকে ক্রিয়ায়, একখানি বস্ত্রে তাহার আপাদমস্তক ঢাকিয়া, মুখ ও বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে চুল ছিড়িতে ছিড়িতে জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইল। অশ্রুধারায় তাহার বুক ভাসিতে লাগিল, ক্রন্দন-ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রান্তধ্বনিত হইতে লাগিল।

জোবেদী এবং অত্যাগত সঙ্গিনীরা নোজাতুলের এই প্রকার শোকোচ্ছাদ দর্শনে অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া উঠিলেন। সকলেই তাহাকে বেতন করিয়া দাঁড়াইল।

নোজাতুলের শোকোচ্ছাদ স্বয়ং প্রশমিত হইলে, জোবেদী বলিলেন, “নোজাতুল, কি হইয়াছে? তুমি এমন ভাবে কাদিতেছ কেন?”

নোজাতুল বাশকন্ধকণ্ঠে আবু হোসেনের মৃত্যুসংবাদ খালিক-মহিবীর গোচর করিল। জোবেদী আবু হোসেনকে বড়ই ভালবাসিতেন, তাহার আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন, তাহার নয়নেও অশ্রু সঞ্চিত হইল। অবশেষে তিনি তাহার দাসীকে শান্ত হইবার জন্ত উপদেশ দান করিয়া, আবু হোসেনের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় জন্ত এক শত মোহর ও এক খণ্ড মূল্যবান বস্ত্র প্রদান করিলেন।



নোজাতুল আওরাৎ অর্থ ও বস্ত্র লইয়া প্রফুল্লমনে আবু হোসেনের নিকট ফিরিয়া আসিল। মধ্যপথেই তাহার চোখের জল ও হাহাকার মিলাইয়া গেল; বয়স্ক আবু হোসেনকে সে আহ্বান করিয়া বলিল, “ওঠো গো, কার্যোদ্ধার করিয়া আসিয়াছি, এই দেখ, এক শত মোহর ও কাপড়, এখন তুমি খালিকের কাছে গিয়া আমার মৃত্যুসংবাদ দিয়া কি আদায় করিতে পার দেখি। তোমার বুদ্ধি কেনন তীক্ষ্ণ, তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।”

আবু হোসেন বলিল, “আমার বুদ্ধির এখনও বৃদ্ধি পরিচয় পাও নাই? এ ফন্দী শিখাইল কে! স্রীলোকের দোষই ঐ, নিজের বুদ্ধিই বেশী দেখে, কিছুতে হারিতে চায় না। বা হোক, আমি কি করিয়া

আসি দেখ। এখন তুমি মরিয়া পড়িয়া থাক।”



নোজাতুল মস্তার দিকে পা রাখিয়া গালিচার উপর চিৎ হইয়া শয়ন করিল। আবু হোসেন তাহাকে একখানি বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া খালিকের নিকট তাহার মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিতে চলিল। আবু হোসেনের চক্ষু দিয়া হঠাৎ অশ্রুধারা বিগলিত হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল ভাগাইতে লাগিল, মাথার পাগড়ীটা খুলিয়া পড়িবার মত হইল, বুক চাপ্‌ড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আবু হোসেন একবারে খালিকের দরবারস্থলে উপস্থিত হইল।

খালিক তখন উজ্জীর জাফর ও কয়েক জন বিশ্বস্ত অমাত্যকে সঙ্গে লইয়া খাসকামরায় কোন

গুরুতর বিষয়ের মন্তব্য করিতেছিলেন। সেখানে আর কোন লোকের বাইবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু খালিকের আদেশে আবু হোসেনের সর্বত্র অবিরত পতি। দ্বারবান দ্বার ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। আবু হোসেনের চিরগ্রন্থ স্বথ অশ্রুধারায় প্রাবিত দেখিয়া ও তাহার অর্ন্তনাদ শুনিয়া খালিক তাহার গুণ্ডপদাৰ্শ রাখিয়া তাহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আবু হোসেন কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, “জাহাপনা, সর্বনাশ হইয়াছে, আপনি এত সাধ করিয়া বাহাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এক বৎসর বাইতে না বাইতেই—হা আল্লা, তুমি আমার কি সর্বনাশই করিলে!” বাপ্‌জারে আবু হোসেনের কৃত্ত বন্ধ হইল, আর কোন কথা বাহির হইল না।

অবশেষে
আদায়

প্রিয়তমার
শোকের
অশ্রুধারা



খালিফ বুলিলেন, নোজাতুল আওরাং ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে। তিনি দ্রুপিত হইয়া কহিলেন, “নোজাতুল আওরাং অতি উত্তম বাদী ছিল, জোবেদী তাহাকে বড়ই ভালবাসিতেন। তোমাকে স্থধী করিবার জন্তই তিনি তাহাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আল্লা তাঁহার সামগ্রী ফিরাইয়া লইলেন, আমরা ঙ্খ করিয়া কি করিব? এত শীঘ্র যে নোজাতুল মরিবে, তাহা কোন দিনও ভাবি নাই।” নোজাতুলের গুণবাঞ্ছি স্মরণ করিয়া খালিফের নয়ন-প্রান্তে অশ্রু সঞ্চিত হইল, দেখিয়া তাঁহার অমাত্যগণও অশ্রুতাগ করিলেন।

অনন্তর খালিফ রুমালে অশ্রুমোচন করিয়া বলিলেন, “আবু হোসেন, বাহা হইবার, তাহা ত’ হইয়া গিয়াছে, এখন তোমার প্রিয়তমার অজ্ঞোষ্টিক্রিয়ার আয়োজন কর।” কোষাধ্যক্ষকে বলিলেন, “আবু হোসেনকে এক শত মোহর ও একখানা উৎকৃষ্ট কাপড় দাও।” কোষাধ্যক্ষ খালিফের আদেশ অবিলম্বে পালন করিলেন।

আবু হোসেন কার্যোদ্ধার করিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার গৃহে প্রত্যাগমন করিল; বলিল, “প্রিয়তমে নোজাতুল, তোমার মৃত্যুশয্যা ত্যাগ করিয়া উঠ, দেখ, কেবল তুমিই যে স্ত্রীলোককে ঠকাইয়া অর্থোপার্জন করিতে পার, তাহা নহে, আমি পুরুষকে ঠকাইয়াও টাকা আদায় করিতে পারি।” নোজাতুল আওরাং এক লক্ষে গালিচা ত্যাগ করিয়া আবু হোসেনের হস্ত হইতে টাকার তোড়া গ্রহণ করিয়া বলিল, “বাঁচিলাম, দুই শত মোহর,—এখন কিছুদিন সংসার চলিবে।”

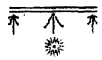
এ দিকে খালিফ রাজকর্মা সমাপ্ত করিবার পূর্বেই জোবেদীর কক্ষে বাইবার জন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রিয়তমা পরিচারিকার মৃত্যুসংবাদে মহিষী ক্রিষ্ণ শোকবিম্বলা হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা কল্পনা করিয়া কোন কাজে আর তাঁহার মন বলিল না, তিনি অমাত্যগণকে বিদায় দিয়া, মসকরকে সঙ্গে লইয়া জোবেদীর কক্ষান্তিমুখে যাত্রা করিলেন।

খালিফ দেখিলেন, জোবেদী সজলনয়নে বীথ কক্ষে বসিয়া আছেন। তিনি বুলিলেন, প্রিয়দাসীর মৃত্যুতে পরিতপ্ত হইয়াই মহিষী একুণ বিষাদিনী হইয়াছেন, মহিষীকে সান্ত্বনাদানের জন্ত খালিফ বলিলেন, “মহিষি, শোক ত্যাগ কর, আল্লা তোমার বাদী নোজাতুল আওরাং গ্রহণ করিয়াছেন, দেহধারণ করিলেই মৃত্যু আছে। যতই আক্ষেপ কর, তাহাকে আর ফিরিয়া পাইবে না। নোজাতুলের অনেক মহৎগুণ ছিল, এমন বিধত ও প্রভুভক্ত বাদী আর মিলিবে কি না সন্দেহ, তথাপি বাহা হইয়াছে, তাহা ত’ ফিরিবে না, প্রসন্ন হও।”

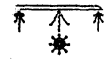
খালিফের কথা শুনিয়া জোবেদী মহা বিস্মিত হইলেন; বিশ্বয়াতিশয্যে তাঁহার কোষ দ্রু হইল; তিনি বলিলেন, “জাহাপনা, আপনি এ কি কথা বলিতেছেন? আমার বাদী মরিয়াছে, এ কথা আপনাকে কে বলিল? আমি আপনার অধুতর ও প্রিয়বস্ত্র আবু হোসেনের মৃত্যুসংবাদে দ্রুপিত হইয়াছি। আমার বাদী সম্পূর্ণ ব্রহ্ম আছে। আপনার এমন বিধ্বতি ঘটিল কেন, বুঝিতে পারিতেছি না।”

খালিফ বলিলেন, “মহিষি, তুমি কি ব্রহ্ম দেখিতেছ? আবু হোসেন স্বহৃদেবেশে এখনই আমার দরবারে গিয়া তাহার জীয় ব্রহ্মসংবাদ জানাইয়া আনিয়াছে। আহা! বেচারার রোদনে পাথরও বিলীণ হইয়া যায়। প্রিয়সহচরী প্রাণত্যাগে তুমি মনে বড় বেদনা পাইয়াছ ভাবিয়াই ত’ আমি এত শীঘ্র দরবারে আসিয়া তোমাকে সান্ত্বনা দান করিতে আনিয়াছি। তুমি আবু হোসেনের জন্ত কিছুমাত্রও কাতর হইও না, সে বেশ স্বস্থ আছে, তবে তোমার দাসীর মৃত্যু হইয়াছে, হৃৎকের বিষয় বটে, কিন্তু ইহা আল্লার বিধান ভাবিয়া মন সংযত কর। আমি তোমার দাসীর মৃত্যুদেহের সংস্কারের জন্ত এক শত মোহর ও একখানা বস্ত্র প্রদান করিয়াছি। আহা, আবু হোসেন পত্নীবিয়োগে বড়ই কাতর হইয়াছে।”

দ্রুপিত-
বিয়োগের
আলস্য



মৃত্যু অভিনয়ের
প্রাঙ্গণিকা



মৃত্যু-সম্মেহের
বাঁধা



জোবেদী বলিলেন, “জাঁহাপনা, যদিও আপনি রহস্ত করিতে বড় ভালবাসেন, তথাপি এক জনের মৃত্যু লইয়া রহস্ত করা আপনার হায় সম্রাটের পক্ষে শোভা পায় না। আপনি জানেন, আবু হোসেনের মৃত্যু হইয়াছে, আমার দানী সম্পূর্ণ স্বস্থ আছে, তথাপি আপনি কোতুকের বশবর্তী হইয়া আমাকে বিপরীত সংবাদ দিতেছেন, আমার নিকট আমার দানী আসিয়া কাদিতে কাদিতে চুল ছিঁড়িয়া বৃকে ও মুখে করাঘাত করিতে করিতে তাহার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ জ্ঞাপন করিল, আমি তাহার স্বামীর মৃতদেহের সংকায়ের জন্ত এক শত মোহর ও একখানি বস্ত্র প্রদান করিলাম।”

খালিক বলিলেন, “কি বিপদ! নোজাতুল আওরাং মরিয়াছে, এ কথাটা যে কিছুতেই তোমাকে বুঝাইতে পারিলাম না!”

জোবেদী বলিলেন, “আমার বিপদ আরও অধিক, আপনার ভৃত্য—আপনার পদম সেহতাজন বরস্ত আবু হোসেন মরিয়া, আর আপনি তাহা সম্পূর্ণ অবিবাস করিতেছেন?”

বিবাদের কোন মীমাংসা হইল না, ক্রমে উভয়েই ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। খালিক ক্রোধে অগ্নিবৎ হইলেন, তাঁহার চক্ষু দুটি জলিতে লাগিল, জোবেদী ক্রুদ্ধ ফণিনীর হায় গর্জন করিতে লাগিলেন। ভৃত্য মসকর নিকটে দাঁড়াইয়া কম্পিত-দেহে প্রমাদ গণিল।

খালিক মসকরকে বলিলেন, “এখনই আবু হোসেনের ঘরে গিয়া দেখিয়া আয়, কে মরিয়াছে, আবু হোসেন, না নোজাতুল আওরাং?”

হার-জিতের
বাক্স!



মসকর তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিল। খালিক জেবেদীকে বলিলেন, “তুমি এখনই দেখিবে, আমার কথা সত্য, নোজাতুলই প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যদি এ কথা সত্য না হয়, তাহা হইলে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি তোমার কাছে আমার প্রমোদোদ্ভান হারিব।” জোবেদী বলিলেন, “আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি নোজাতুল প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমি আপনার কাছে আমার তসবির মহল হারিব।” উভয়ে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে মসকরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

আবু হোসেন ও নোজাতুল আওরাং উভয়ে স্বীয় কক্ষে বসিয়া ক্রিষ্ণে খালিকের নিকট জবাব দিবে, সেই কথা চিন্তা করিতেছিল, এমন সময়ে তাহারা দেখিতে পাইল, মসকর তাহাদের কক্ষান্তিমুখে অগ্রসর হইতেছে। দেখিয়াই আবু হোসেন তাহার দ্রীক বলিল, “গালিচার উপর শুইয়া পড়, শুইয়া পড়, আমি তোমাকে কাপড় চাপা দিই। ঐ দেখ, খালিকের সর্দার খোজা সন্ধান জানিতে আসিতেছে, তুমি মরিয়াছ কি না।”

নোজাতুল আওরাং সটান গালিচার উপর শয়ন করিল, আবু হোসেন বস্ত্র ধার্য্য তাহার বেহ আচ্ছাদন করিয়া কাদিতে বসিল, তাহার পর মসকর সেই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র আবু হোসেন উঠিয়া সম্মানভরে তাহার করচূষন করিয়া, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “ভাই, আমার দরবশ্য দেখ, তুমি আমার দ্রীকে বড়ই প্রজ্ঞা করিতে, কিন্তু তাহার ইহলীলার অবদান হইয়াছে, নোজাতুল আওরাং আর জীবিত নাই।”

মসকর এই দৃশ্য দেখিয়া বিশেষ কাতর হইল, সে মৃতদেহের আচ্ছাদনবস্ত্রের এক প্রান্ত তুলিয়া একবার নোজাতুল আওরাংয়ের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া বিলাপ করিয়া বলিল, “আম্মা বিসমোম্মা, তিনি যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। আহা!—প্রিয়ভগিনী বড়ই স্নেহীলা ছিলেন,

অন্নবয়সেই তাঁহার মৃত্যু হইল। সম্রাজ্ঞী জোবেদীর বিশ্বাস, তুমিই পরলোকগমন করিয়াছ, খালিক তাঁহাকে কিছুতেই বিশ্বাস করাইতে পারিলেন না যে, তোমার জীৱনই মৃত্যু হইয়াছে, তোমার নহে। কাহার মৃত্যু-সংবাদ শুনা, তাহা জানিবার জন্ত খালিক আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। কিন্তু আমি সত্যকথা বলিলেও যে জোবেদী বেগমের বিশ্বাস হইবে, তাহা বোধ হয় না; জ্ঞানীকেৱা যে বোঁক ধরে, তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চায় না।”

আবু হোসেন বলিল, “সত্য-মিথ্যা তুমি নিজেই দেখিয়া থাকিতেছ, তদনুসারে তুমি খালিককে সকল সংবাদ জানাইবে। আজ আমার যে ক্ষতি হইয়াছে, জীবনে তাহা পূরণ হইবে না।” নবাব বলিল, “আমি তোমার দুঃখ ও বিপদে আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি, খালিককে গিয়া আমি ঠিক কথাই বলিব। তুমি ভাই আর অনর্থক দুঃখ করিও না। কিন্তু তোমার কাছে আমার এক অনুরোধ আছে, আমি খালিকের নিকট হইতে তোমার কাছে প্রত্যাগমনের পূর্বে তুমি তোমার প্রিয়তমার দেহ সমাহিত করিও না, তোমার পত্নীর অষ্টোষ্টিক্রিয়া আমার উপস্থিত থাকিবার ইচ্ছা আছে। আমি তাঁহার আশ্রয় মন্ডলের জন্ত গোরস্থানে উপাসনা করিব।”

মদরুর আবু হোসেনের কক্ষ হইতে প্রস্থান করিলে আবু হোসেন নোজাতুলকে বলিল, “গ্রেয়সি, শীঘ্র উঠ, আবার একবার নৃতন করিয়া মরিতে হইতেছে, নতুবা খালিক বা খালিকমহিষীর বিশ্বাস জন্মান কঠিন, মদরুর আশিরা তোমাকে মৃত দেখিয়া গেল, সাম্রাজ্ঞী জোবেদী এ কথা কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না, তুমি নিশ্চয়ই যে মরিয়াছ, পরীক্ষা করিবার জন্ত আর কাহাকেও পাঠাইবেন।” নোজাতুল উঠিয়া বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া বাতায়নপথে চাহিয়া রহিল, আর কেহ তাহাদের কক্ষের দিকে আসে কি না, তাহাই দেখিবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে মদরুর জোবেদীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। খালিকের জয় হইবে ভাবিয়া সে পরম পুলকিত-চিত্তে হাসিতে হাসিতে করতালি দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। খালিক অধীরভাবে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, মদরুরকে দেখিবারাত্র তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “কাহার মৃত্যু হইয়াছে, শীঘ্র বল।” কিন্তু জোবেদী ক্রোধে অন্ধ হইয়া বলিলেন, “রে দুর্ভাগ্য দাস, এ হত্য-পরিহাসের সময় নয়, তুই অবিলম্বে সকল কথা খুলিয়া বল, কে মরিয়াছে, স্বামী না স্ত্রী?”

“জাঁহাপনা”—খালিকের দিকে চাহিয়া মদরুর করযোড়ে বলিল, “আমি দেখিলাম, নোজাতুল আওরাজ প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, আবু হোসেন পত্নীবিয়োগে অত্যন্ত কাতরভাবে অশ্রুত্যাগ করিতেছে।”

মদরুরকে আর অধিক কথা বলিবার অবসর না দিয়াই খালিক সহস্রান্তে বলিলেন, “খোস খবর, জোবেদী, তুমি হারিয়াছ, তোমার তদবিরের মহল আমার হইল। মদরুর, তুমি আবু হোসেনের কক্ষে গিয়া কি কি দেখিলে, তাহা বল।”

মদরুর আবু হোসেনের কক্ষে উপস্থিত হইয়া বাহা বাহা দেখিয়াছিল, সকলই বলিল, সে যে স্বয়ং আবু হোসেনের স্ত্রীর মুখবন্দ অপসারিত করিয়া মৃতদেহ দেখিয়াছে, তাহাও প্রকাশ করিল।

মদরুরের কথা শেষ হইলে, খালিক বলিলেন, “আমার আর কিছু জিজ্ঞাস্য নাই, তোমার কথা শুনিয়া আমার সকল সন্দেহ দূর হইয়াছে।” অনন্তর তিনি জোবেদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন মহিষি, ইহার পরও তোমার মনে কোন সন্দেহ আছে কি? এখনও কি তুমি মনে করিবে, তোমার দাসী জীবিত আছে, আর আমার বয়স্ক মরিয়াছে?”

মরণ-নির্ণয়ের
সন্ধান



মূলতান!
হারিলেন!



বালি-হাসের
জ্বর অভিমান



জোবেদী গম্ভীরভাবে এবং ক্রুদ্ধ ভাবে বলিলেন, “আমি আপনার এই ভূতোর কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। সে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, ইহাতে সন্দেহ নাই, আপনার ভৃত্য আপনার মনস্তত্ত্বের জন্য মিথ্যা কথা বলিবে, ইহা আর আশ্চর্য্য কি? আমি অন্ধও হই নাই, আমি আমার বুদ্ধিগতির লোপ করেন নাই। আমি স্বয়ং নোজাতুল আওরাকে স্বামীর মৃত্যুতে বিলাপ করিতে দেখিয়া, রহস্তে তাহার স্বামীর অন্তোষ্টিক্রিয়ার বায় প্রদান করিয়াছি, স্বয়ং তাহার পতিবিয়োগে সাধনা দান করিয়াছি, আর এখন আপনার মিথ্যাবাদী ভূতোর কথা মানিব?”

মসরুর শপথ করিয়া বলিল, “সে যাহা বলিতেছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।” এই কথা শুনিয়া জোবেদী ক্রোধে বাধিনীর হায়ে গর্জন করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “ভুলিত, মিথ্যাবাদী ভূত! আমি মূর্খমধ্যে দেখাইতেছি, তুই কিরূপ মিথ্যাবাদী, কিরূপ নিলজ্জ।” জোবেদী সবেগে কল্পতালি প্রদান করিবামাত্র এক দল দাসী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জোবেদী তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোরা সত্য কহিয়া বল, খালিফ এখানে আসিবার কিকিংকাল পূর্বে আমার কাছে কাদিতে কাদিতে কে আসিয়াছিল?—দাসীগণ একবাক্যে বলিল, “বেগমসাহেব, নোজাতুল আওরাক স্বামিবিয়োগে কাতর হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছিল।” “আমি তাহাকে কি দান করিয়াছি?”—দাসীগণ সম্মুখে বলিল, “তাহার স্বামীর সমাধিবায় নির্বাহের জন্য এক শত আসরদী ও একখানি বস্ত্র।” তখন জোবেদী গর্জন করিয়া মসরুরকে বলিলেন, “যে মিথ্যাবাদী ভূত, আমার এতগুলি দাসীর কথা অবিশ্বাস করিয়া কি আমি তোর কথা বিশ্বাস করিব?—যাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, সেই বলিবে, আবু হোসেনের মৃত্যু হইয়াছে, নোজাতুল আওরাক জীবিত আছে।”

মসরুরের প্রতি জোবেদীর ক্রোধ দেখিয়া খালিফের মনে বড় আমোদের সঞ্চার হইল। তিনি জোবেদীকে বলিলেন, “মহিষি, হারিয়াছ বলিয়া এত রাগ কেন? তোমার দাসীরা যাহাই বলুক, মসরুর এইমাত্র আবু হোসেনের গৃহে গিয়া যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছে, তাহা কি অবিশ্বাস করিবার উপায় আছে? এত বড় মিথ্যা কথা বলিতে কখন তাহার সাহস হইত না। ইহার মধ্যে যে কি রহস্ত আছে, তাহা আমিও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।”

জোবেদী খালিফের কথায় আরও অধিক উদ্ধত হইয়া উঠিলেন, সন্দেহে বলিলেন, “মসরুরের সহিত বড় বড় করিয়া আমাকে এইভাবে বিরক্ত করিতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। আপনি আমার ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতেছেন, তব্বিধয়ে আমার সন্দেহ নাই। আপনি অল্পমতি করিলে আমি এখনই আমার এক জন দাসীকে আবু হোসেনের মহলে প্রেরণ করিয়া প্রকৃত কথা অবগত হইতে পারি।”

খালিফ তৎক্ষণাৎ অল্পমতি দান করিলেন, জোবেদী তাহার বৃদ্ধা ধাত্রীকে আবু হোসেনের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে স্নানোত্তম উপদেশ দান করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমনের আদেশ করিলেন।

আবু হোসেন বাতায়নপ্রান্ত হইতে জোবেদীর বৃদ্ধা ধাত্রীকে দেখিবামাত্র তাহার স্ত্রীকে বলিল, “প্রায়শি, ঐ দেখ, জোবেদীর ধাত্রী আসিতেছে, আর বিলম্ব করা যায় না, আমি মক্কার দিকে পা ছড়াইয়া গালিচার শুইয়া পড়ি, তুমি কাপড় ঢাকা দিয়া আমার পাশে কাদিতে থাক; দেখিও, যেন তোমার রোদন কৃত্রিম বলিয়া তাহার সন্দেহ না হয়।”

দেখিতে দেখিতে আবু হোসেন হস্ত-পদ প্রশান্ত করিয়া, গালিচার উপর পড়িয়া গেল। মক্কার দিকে তাহার পদব্রয় প্রদারিত হইল; তাহার সর্বাঙ্গ বরাবৃত করিয়া, নোজাতুল আওরাক তাহার শিরয়ে বসিয়া, সম্মুখভেদী স্বরে রোদন করিতে লাগিল, গাল ও বুক চড়াইয়া লাল-করিয়া ফেলিল।

প্রেমিকার
সাবাস
শোকাতিনর



বুঝা ধাত্রী সেই কক্ষে উপস্থিত হইয়া, নোজাতুল আওরাতের হ্রস্বতা দেখিয়া, অশ্রুপূর্ণ করিতে পারিল না, সহাস্রভূতিভরে বলিল, “মা, আল্লা তোমার কষ্টে শান্তিদান করুন। আমি তোমার শোকের সময় তোমাকে বিরক্ত করিতে আসি নাই, তোমার মনে সান্থনাপ্রদায়ের জন্ত আসিয়াছি, তুমি স্থির হও মা।”—নোজাতুল আওরাত বলিল, “মা, আর কি আমার বৈধার্যের শক্তি আছে? খাতিয়া করিয়া আমাকে পরম গুণবান স্বামী দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অকালে তাঁহাকে হারাইলাম! হায়, হায়, আমার কি হইবে? এ শোক আমি কেমন করিয়া সংবরণ করিব?”—নোজাতুল আওরাত আরও কাতরভাবে অশ্রুতাগ করিতে লাগিল, লগাটে ঘন ঘন কন্নাঘাত করিতে লাগিল। বুঝা ধাত্রী তাহার শোকে ও ক্রন্দনে অত্যন্ত কাতর হইল, সে নোজাতুলকে কোনক্রমে শান্ত করিতে পারিল না।

কিন্তু তথাপি সে বিম্বিত না হইয়াও থাকিতে পারিল না, মনকর বাহা বলিয়াছিল, ধাত্রীর তাহা কর্ণ-গোচর হইয়াছিল, কিন্তু আবু হোসেনের কক্ষে আসিয়া সে সম্পূর্ণ বিভিন্ন দৃশ্য দেখিল, ইহার অর্থ সে কোনক্রমে বুঝিতে পারিল না।

বাহা হউক, বুঝা ধাত্রী আবু হোসেনের অকালমৃত্যুতে আক্ষেপ করিতে করিতে তাহার মুখের কাপড় সরাইয়া দেখিল, আবু হোসেন নয়ন মুদ্রিয়া, নিঃশব্দ রোদ করিয়া পড়িয়া আছে। ধাত্রী দেখিল, সত্যি আবু হোসেন ভবলীলা সাঙ্গ করিয়াছে। সে বলিল, “আহা, এমন সুন্দর মুখে কালি পড়িয়া গিয়াছে, প্রাণ বাহির হইলে কি আর মাহবের জী থাকে?

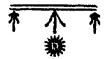


প্রেমি-
কেন-
হত্যা-
নিশঙ্ক



হতভাগা পোড়ারমুখো মনকর থালিফের কাছে গিয়া, কি মিথ্যা কথাই বলিয়াছে! হতভাগার মন্তকে আল্লা বজ্রাঘাত করেন না কেন?” নোজাতুল আওরাত জিজ্ঞাসা করিল, “মনকর কি বলিয়াছে ধাই-মা?” ধাত্রী অশ্রুমাচন করিয়া বলিল, “পোড়ারমুখো মনকর, থালিফের কাছে গিয়া বলিয়াছে, আবু হোসেন তোমার মৃতদেহের কাছে বসিয়া রোদন করিতেছে, তুমি প্রাণত্যাগ করিয়াছ। এমন মিথ্যা কথাও কি মাহবের বলে?” নোজাতুল আওরাত লগাটে কন্নাঘাত করিয়া বলিল, “আহা, আল্লা যদি তাহাই করিতেন। এমন স্বামীকে মাটি দিয়া কি প্রাণধারণ করিতে পারিব? আমি যদি আগে মরিতাম, তাহা হইলে আর আমাকে এ ভাবে কান্নিতে হইত না।” ধাত্রী অশ্রুতাগ করিতে করিতে, নোজাতুলকে অনেক সান্থনার কথা বলিয়া, আবু হোসেনের কক্ষ ত্যাগ করিল, এবং জোববীর অন্তঃপুরাতিমুখে ধাবিত হইল। সে অত্যন্ত বুঝা, ক্রতগমনে একান্ত অসক্তা, কিন্তু মনের উৎসাহে ও

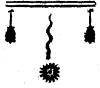
‘ও ভড়
দানবাজ!’



জোবেদীর নিকট পুরস্কারলাভের আশায় ক্রতপদে চলিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে জোবেদীর নিকট উপস্থিত হইয়া বাহা বাহা দেখিয়াছিল, তাহা সকলই বলিল। সে স্বয়ং আবু হোসেনের মৃতদেহ ও তাহার বিবর্ণ মুখ দেখিয়াছে, তাহাও জোবেদীর গোচর করিল।

তখন মসকর ও খাত্তীর মধ্যে কলহের সূত্রপাত হইল। খাত্তী বলিল, “মসকর, তুই মিথ্যাবাদী, যে মরে নাই, মিথ্যা করিয়া সে মরিয়াছে বলিয়া প্রভুর মন রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু সত্য কি কোন দিন গোপন থাকে?” মসকর বলিল, “ফোগ্‌লামুখী বুড়ী, তুই তোমার মনবিরের মন রাখিবার জন্য মিথ্যা কথা বলিতেছিল, তাহাতে কি আমি ভুলি? আমি নিজে বাহা দেখিয়া আসিলাম, তাহা এখন অবিশ্বাস করিতে পারি না।”—জোবেদী তাঁহার খাত্তীর এই অপমানে রাগে জলিয়া উঠিলেন, “কোথাকার মিথ্যাবাদী, খালিক স্বয়ং মসকরের দিকে। মহিষী অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিলেন।

‘গোপ চোপ
দানাওয়ালী
নেহি তোমার
লাজ’



তখন খালিক মহিষীকে সাশ্বনাদানের জন্য বলিলেন, “মহিষী, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, যেমন ব্যাপার দেখিতেছি, তাহাতে কেবল যে তোমার খাত্তী বা মসকর মিথ্যাবাদী, তাহা বোধ হয় না, তুমি আমি সকলেই মিথ্যাবাদী। প্রকৃত সত্য আবিষ্কার করিতে হইলে, আর দাসদাসীর উপর নির্ভর করা যায় না, চল, আমরা উভয়ে আবু হোসেনের গৃহে উপস্থিত হইয়া, চক্ষুর্কণের বিবাদ মিটাই।”

খালিকের এই কথায় জোবেদী কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন; বলিলেন, “জাঁহাপনা, এককণ পরে আপনি সত্য কথা বলিয়াছেন, আমরা স্বয়ং না দেখিলে, কাহার কথা সত্য, তাহা কোনমতে স্থির হইবে না। আর বিলম্বে আবশ্যক নাই, এখনই চলুন।”

খালিক ও জোবেদী, মসকর, খাত্তী এবং এক দল দাসী সঙ্গে লইয়া আবু হোসেনের কক্ষের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আবু হোসেন বাতায়ন-পথ হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইয়া নোজাতুল আওরাৎকে সন্ধানন করিয়া বলিল, “প্রেরণি, ঐ দেখ, খালিক ও জোবেদী উভয়েই দাসদাসীগণকে লইয়া এই দিকে আসিতেছেন। মসকর ও খাত্তী এ উভয়ের কথা সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া তাঁহারা প্রকৃত সত্য কি, তাহাই জানিতে আসিতেছেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখনই একটা উপায় করা আবশ্যক।” নোজাতুল আওরাৎ মহাজীতভাবে গবাক্ষসমীপে আসিয়া দাঁড়াইল; দেখিল, মহিষী ও দাসদাসীগণের সহিত খালিক ভ্রমিতপদে তাহাদের কক্ষাভিমুখেই আসিতেছেন, শীঘ্রই তাহাদের সমুখে উপস্থিত হইবেন। এই দৃষ্ট দেখিয়া নোজাতুল আওরাৎ লগাটে করাঘাত করিয়া বলিল, “হা প্রথম, তোমার বুদ্ধিতে চলিতে গিয়া আমরা উভয়েই নষ্ট হইলাম। উঁহারা ত’ এখনই এখানে আসিয়া পড়িবেন, শেষ দ্রাক্ষা কিরূপে হইবে?”

আবু হোসেন বলিল, “শেষ দ্রাক্ষা অন্য তোমার কোন চিন্তা নাই, মসকর কিংবা খাত্তী কাহাকেও মিথ্যাবাদী হইতে হইবে না, খালিক কিংবা জোবেদী কাহাকেও অপদস্থ হইতে হইবে না। শীঘ্র এস, গালিচার উপর আমরা উভয়েই মৃতের মত পড়িয়া থাকি, তাহার পর আমরা বাহা করেন হইবে।”

মরণের
কারসাজী

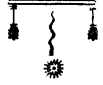


উভয়ে বজ্রতৃপ্ত দেহে মক্তার দিকে পদ প্রসারিত করিয়া, নিশ্চলভাবে গৃহতলস্থ গালিচার উপর পড়িয়া রহিল। ইতিমধ্যে খালিক ও জোবেদী দাসদাসীগণ সঙ্গে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, মসকর দ্বার খুলিয়া প্রথমে অগ্রসর হইল।

কাহারও মুখে কোন কথা নাই, খাম্বানী উভয়ের মৃতদেহ পাশাপাশি পড়িয়া আছে দেখিয়া সকলেই স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনেককণ পরে জোবেদী প্রথমে কথা কহিলেন, “এখন দেখিতেছি, দুই জনেই মরিয়াছে। আগে আবু হোসেন মরিয়াছে, তাহার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া

পরে আমার দাসী নোজাতুল আওরাং মরিয়াছে। আমার খাই খখন দেখিতে আসিয়াছিল, তখনও নোজাতুল আওরাং বাঁচিয়া ছিল।" খালিক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, তাহা কখন হইতে পারে না, আগে নোজাতুল আওরাংই মরিয়াছে, তাহার বিরহ অসহ্য হওয়ার পরে আমার প্রিয়বস্ত্র আবু হোসেন প্রাণত্যাগ করিয়াছে। জ্বীকে যে সে বড়ই ভালবাসিত, তাহা আমি জানি। বাজিতে তোমার হার হইল, তোমার চিত্রশালা আমার হইল।" জোবেদী বলিলেন, "কখনই না, আমার খাই সকলের শেষেও দেখিয়া গিয়াছে, আমার দাসী নোজাতুল আওরাং তাহার স্বামীর বিরহে বুক ও মুখ চড়াইয়া চুল ছিড়িয়া বিলাপ করিতেছিল, সুতরাং সেই পরে মরিয়াছে, আপনায় প্রণোদকানন আমার হইল।"

ক হায়ে
জিনে ?



এইরূপে কোন প্রকারেই প্রকৃত সত্য আবিস্কৃত হয় না দেখিয়া, খালিক অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আবু হোসেন ও নোজাতুল আওরাংয়ের মন্তকের নিকটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; বলিলেন, "ক আগে মরিয়াছে, ঘেসকর্পণমে আমাকে বলিতে পারিবে, আমি তাহাকে সহস্র-মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করিব।"

খালিকের মুখ হইতে এই কথা উচ্চারিত হইতে না হইতে আবু হোসেন তাহার মুখের বস্ত্র অপসারিত না করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "জাঁহাপনা, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি আগে মরিয়াছি।" আবু হোসেন বস্ত্র অপসারিত করিয়া উঠিয়া বলিল, নোজাতুল আওরাংও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া জোবেদীর পদতলে নিপতিত হইতে গেল। জোবেদী ভীতভাবে দশ হাত মরিয়া পাড়াইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই প্রিয়-দাসীকে জীবিত দেখিয়া মহা আনন্দিতা হইলেন। তিনি বলিলেন, "অ পোডায়মুখী, তুই মরিয়াছিস্ ভাবিয়া আমি মনে কতই কষ্ট পাইয়াছি। নানা রকমে তুই আমাকে যন্ত্রণা দিয়াছিস্, তুই যে মরিস্ নাই, ইহাতে আমি ভারী খুসী হইয়া তোমার লজ্জা অপরাধ ক্ষমা করিলাম, মরিলে কখন ক্ষমা করিতাম না।"

আবু হোসেনের কথা শুনিয়া খালিক হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "আবু হোসেন, তোমার অত্যাচারে আমি কোন্ দিন হাসিয়া মারা খাইব দেখিতেছি, আমাকে এ ভাবে বিস্তৃত করিবার জন্য এ খেয়াল তোমার মাথায় কেন আসিল ?"

আবু হোসেন তাহার অপব্যয়িতা ও দারিদ্র্যের কাহিনী বর্ণনা করিয়া বলিল, "জাঁহাপনা, পেটের দায়ে আমাকে এ অভিনয় করিতে হইয়াছে, এরূপ না করিলে অনাহারে আমাদিগকে মরিতে হইত। মরিবার ভয়েই মরিয়াছিলাম, আপনায় করুণাবলে আবার বাঁচিয়া উঠিয়াছি, বন্দার অপরাধ মার্জনা করিতে আজ্ঞা হয়।" আবু হোসেন খালিকের চরণতলে নিপাত্ত হইল।

মরণ-অভিনয়ে
সৌভাগ্য-লাভ



খালিক আবু হোসেনকে মার্জনা করিয়া তাহাদের উভয়কে সঙ্গে লইয়া চলিলেন। খালিক আবু হোসেনকে এবং নোজাতুল আওরাংকে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল খালিক ও জোবেদীর অমৃগ্ৰহে আর তাহাদিগকে অর্থকষ্ট সহ্য করিতে হইল না; পরমানন্দে তাহাদের কাল কাটিতে লাগিল।



অষ্টম অধ্যায়— প্রাচীনকালে চীনদেশের রাজধানীতে এক দরজী বাস করিত, তাহার নাম মুস্তাফা। হুতিকর্ণে সে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সে বড় গরীব ছিল, সমস্ত দিন হুচ ঠেলিয়া বাহা কিছু উপার্জন হইত, তাহার অতি কষ্টে তাহার স্ত্রী ও পুত্রের ভরণপোষণ নির্বাহ করিত।

প্রথম দৃশ্য— মুস্তাফার পুত্রের নাম আলাদীন। আলাদীনের শিক্ষার প্রতি তাহার পিতা-মাতার কোন বিন্দু ছিল না, অল্পবয়সেই তাহার চরিত্র নানা দোষে দূষিত হইয়া উঠিয়াছিল, অল্পবয়স হইতেই সে প্রায় সমস্ত দিন টো-টো করিয়া অনেক গম্য ও অগম্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সমবয়স্ক ছোট বালকগণের সঙ্গে পথে পথে খেলা করিত।

আলাদীনের বয়স হইলে মুস্তাফা তাহাকে দোকানে লইয়া গিয়া, নিজের ব্যবসায়ে ভর্তি করিয়া দিল। কিন্তু মিষ্ট কথাই বা শিরহায়ে, কোন প্রকারেই ব্যবসায় আলাদীনের মন বদান সম্ভব হইল না। তাহার পিতা কার্ধ্যান্তরে বাধ্য হইলেই সে দোকান হইতে উঠিয়া পলাইত এবং বিস্তর চেষ্টাতেও তাহাকে ধরিতে পারা বাইত না। কোন প্রকারেই সে শাসন মানিল না। কিছুদিন পরে আলাদীনের পিতা কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

আলাদীনের মা দেখিল, পুত্রকে দিয়া দরজীর কাজ করান অসম্ভব, অগত্যা সে দোকানখানি উঠাইয়া দিল, তুলা পিজিয়া অতিকষ্টে নিজে ও অবাধ্য পুত্রের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করিতে লাগিল।

পিতার মৃত্যুর পর আলাদীন আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কেবল আমোদ-প্রমোদে দিবানিশি মত্ত থাকত। ভিন্ন তাহার অল্প কাজ রহিল না। পনের বৎসর বয়স হইল, তাখাপি সে এক পয়সা উপার্জন করিতে শিখিল না। এক দিন সে তাহার সমবয়স্ক বালকগণের সহিত পথে পথে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় এক জন অপরিচিত লোক আসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

এই লোকটি আফ্রিকাদেশীয় এক জন বাত্ৰকর, হই দিন পূর্বে সে চীন-রাজধানীতে উপস্থিত হইয়াছিল সে আলাদীনকে দেখিয়া তাহাকে বস্ত্রবর্ণের নিকট হইতে দূরে ডাকিয়া লইয়া গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল— “কেমন হে ছোঁকরা, তুমি মুস্তাফা দরজীর ছেলে নও?” আলাদীন বলিল, “হাঁ, কিন্তু বাবা ক’দিন মরিয়া গিয়াছে।”

পথে কাকা
মিলিল।

বাত্ৰকর আলাদীনের কণ্ঠদেশে তাহার বাস্তব্যের দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া বলিল, “বাবা, তুমি কি কথা শুনাইলে, আমি যে তোমার কাকা, অনেক দূর হইতে তোমার বাবাকে দেখিব বলিয়া আসিতেছি; কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না, আমাকে তাঁহার মৃত্যুসংবাদ শুনিতে হইল; হায় হায়!” রক্ত অশ্রুতাপ করিয়া শোক করিতে লাগিল। তাহার পর সে আলাদীনের হস্তে কতকগুলি শিকি-ছ্যানি দিয়া বলিল, “বাবা, তুমি বাড়ী যাও, তোমার মাকে আমার দেলাম জানাইয়া বলিবে, আমি সময় পাইলে কাল এক সময় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। তোমার বাবার সঙ্গে দেখা হইল না বটে, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার প্রাণ জুড়িল।” আলাদীনের মুখচুমন করিয়া বাত্ৰকর স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

আলাদীন ভারী খুসী হইয়া দৌড়িয়া মায়ের নিকট গেল; তাহার মাতাকে বলিল, “মা, আমার কি কোন কাকা আছেন?” আলাদীনের মাতা বলিল, “না বাবা, তোমার কাকা কি মাঝে কেহই নাই।” “মা, তবে তুমি ঠিক জান না। এক জন বৃদ্ধের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সে বলিল, ‘সে আমার কাকা হয়।’ বাবা মরিয়াছেন শুনিয়া সে কত আক্ষেপ করিতে লাগিল, আমাকে এই শিকি-ছ্যানিগুলি

দিয়াছে। বাইবার সময় বলিয়াছে, কাল তোমার সঙ্গে আসিয়া দেখা করিবে।" মাতা বলিল, "তোমার পিতার এক ভ্রাতা ছিলেন জানি, তিনি ত' অনেক দিন আগে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন, তোমার যে আর কোন কাকা কোথাও আছেন, তাহা এ পর্যন্ত জানিতাম না।"

পরিদর্শন আলাদীন তিন জন বালকের সঙ্গে নগর প্রান্তে খেলা করিতেছিল, বাছুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া, তাহার হাতে ছুটি মোহর দিয়া বলিল, "বাবা, এই মোহর দুট লও, তোমার মাকে দিও, তাঁহাকে বলিও, আজ সন্ধ্যাকালে তাঁহার কাছে গিয়া আমি আহার করিব। তিনি এই মোহর ভাঙ্গাইয়া যেন খাণ্ডপ্রবাদি সংগ্রহ করেন, কিন্তু আমি ত' তোমাদের বাড়ী চিনি না, কোন দিকে তোমাদের বাড়ী?" আলাদীন তাহার গৃহের সন্ধান বলিয়া দিলে বাছুর চলিয়া গেল।

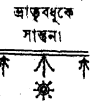
আলাদীন নাচিতে নাচিতে মায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহার হস্তে মোহর দুইটি প্রদান করিল এবং তাহার সেই অজ্ঞাতকুলশীল কাকার প্রস্তাব মাতাকে জানাইল। আলাদীনের মাতা প্রথম পুনর্জন্মভিত্তিতে নানা প্রকার খাণ্ডনামগ্ৰী ক্রয় করিয়া আনি। দেবরের অভ্যর্থনার জন্য দরজার দ্বি বথাসাধা আয়োজন করিল, সমস্ত দিন তাহাতেই অতিবাহিত হইল।

সন্ধ্যাকালে ঘরে ঠক ঠক করিয়া আঘাত হইল। কাকা আসিয়াছে ভাবিয়া আলাদীন ছুটিতে দ্বার খুলিয়া দিল, বাছুর কয়েক বোতল মদ ও নানাবিধ ফল লইয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল।

বাছুর আলাদীনের পিতার শরনকক্ষে তাহার শয্যার কাছে আসিয়া বলিল এবং অশ্রুত্যাগ করিয়া ভয়ঙ্কর বিলাপ করিতে লাগিল; বলিল, "দাদা গো, তোমাকে দেখিব বলিয়া আসিয়া তোমার শূন্য শয্যা দেখিতে হইল।" আরও কত কথা বলিল, তাহার সংখ্যা নাই।

কিন্তু ব্রহ্ম হইয়া বাছুর আলাদীনের মাতাকে বলিল, "আমার ভ্রাতার সহিত আপনার বিবাহের পর আপনি আমার সহকে কোন কথাই জানিতে পারেন নাই, তাহার পর আজ হঠাৎ আমাকে দেখিয়া আপনার বিষয় জন্মবারই কথা। আজ প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল আমি এ দেশ পরিত্যাগ করিয়াছি, এই চল্লিশ বৎসর আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি; ত, সিরিয়া, পারস্য, আরব, মিসর কোন দেশই আমার বাকী নাই, এই সকল দেশভ্রমণের পর আমি আফ্রিকা গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করি। তাহার পর এই বৃদ্ধবয়সে একবার স্বদেশ ও দাদাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়ায় আফ্রিকা হইতে এখানে আসিয়াছি। দেশে আসিলাম বটে, কিন্তু দাদাকে আর দেখিতে পাইলাম না, আপনার পুত্রের নিকট যখন দাদার মৃত্যু-সংবাদ পাইলাম, তখন আমার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল! যাহা হউক, আপনাকে ও আপনার পুত্রকে দেখিয়াই আমার হৃদয় গীতল হইয়াছে। পথে দেখিয়াই আমি দাদার পুত্রকে চিনিতে পারিয়াছিলাম, অদ্যপ্রত্যঙ্গ সকলই ঠিক দাদার মত। উহার কি নাম রাখিয়াছেন?"

আলাদীনের মাতা বাছুরের কথায় একেবারে গলিয়া গেল, সে বহুকাল পরে এক জন আত্মীয়কে তাহার শৈকে ছুবে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে দেখিয়া নিজেই তাহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ বলিয়া মনে করিতে লাগিল; বলিল, "উহার নাম আলাদীন।" "বা, বেশ নাম, আলাদীন, বাবা, তুমি কি কর, তোমার পিতার ব্যবসায় কিছু শিখিয়াছ?" আলাদীন কোন কথা না বলিয়া মাথা নীচু করিয়া রহিল। আলাদীনকে নীরব দেখিয়া তাহার মাতা বলিল, "হা, ও কাজকর্ম কিছুই শেখে নাই, আমার স্বামী উহাকে তাঁহার ব্যবসা শিখাইবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কোনই ফল হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর আলাদীন আরও উচ্ছ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আমি ত' উহাকে কোনমতে শাসন করিয়া উঠিতে





পারিলাম না, মিথ্যাবাদী কেবল টো-টো করিয়া বেড়াইবে, বয়স হইয়াছে, তা যদি উহার বিশ্বাসে লজ্জা থাকে। আমি আর কত কাল উহাকে পুঁথি? আমি মরিলে ও যে কল্পে শেঠের ভাত সংগ্রহ করিবে, তাহা আমি ভাবিয়া পাই না। আমি তুলা পিজিয়া বাহা কিঞ্চিৎ উপায় করি, তাহা হজনের ভরণপোষণের উপযুক্ত নহে, আমি মনে করিয়াছি, আমি আর উহাকে ধাইতে পরিতো দিব না; যেমন করিয়া পারে, নির্ভে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করুক।”

আলাদীনের মাতা অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিল। বাছকর বলিল, “আলাদীন, তোমার মায় মুখে বাহা শুনিতেছি, তাহা সত্য হইলে বড় দোষের কথা। তোমার বয়স হইয়াছে, এখন কোথায় তুমি তোমার বৃদ্ধা মাতাকে প্রতিপালন করিবে, না তোমার মাতাকেই তোমার ভরণপোষণ করিতে হইতেছে। পৃথিবীতে মানুষ কত রকম ব্যবসায় করিতে পারে, দরজীগিরি ভাল না লাগে, আর কিছু কর। তুমি কোন ব্যবসায় করিতে ভালবাস বল, আমি তোমার কাকা, তোমার সাহায্য করিব। যদি তুমি শাশুশিষ্টের মত দোকান কর, বল, আমি তোমাকে দোকান করিয়া দিতেছি, দোকানে জিনিসপত্র বিক্রয় করিয়া বেশ দিন কাটাইতে পারিবে। তোমার বাহা মন্ত, আমাকে বল, আমি তোমার সাহায্যে ক্রটি করিব না।”

আলাদীন অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া পরে বলিল, “দরজীগিরি আমার ভাল লাগে না, সদাগরী উত্তম অপেক্ষা অনেক ভাল, যদি সদাগরী করিবার সুবিধা হয় ত’ আমি করি।”

বাছকর বলিল, “বাবলয়ে যখন তোমার অহুরাগ আছে দেখিতেছি, তখন আমি কালই তোমাকে লইয়া গিয়া একটা চমৎকার দোকান খুলিয়া দিব, সে জন্ত চিন্তা কি?”

আলাদীনের প্রতি বাছকরের মেহান্তিশযা দেখিয়া আলাদীনের মাতার বিশ্বাস হইল, বাছকর গোষ্ঠী সত্যি তাহার মৃত স্বামীর ভাতা, পরে আর পরের প্রতি এতখানি মেহ প্রকাশ করে না। বৃদ্ধা বাছকরকে তাহার পুত্রের প্রতি রূপ মেহ প্রকাশ করিতে দেখিয়া, বাছকরকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতে লাগিল। রাত্রি অধিক হইয়াছিল, “আহারাদি শেষ করিয়া, বাছকর পরদিন আলাদীনকে লইয়া ঘাইবার আশা দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। আলাদীন ও তাহার মাতা শয্যা শয়ন করিল।

পরদিন প্রভাতে বাছকর মুস্তাক দরজীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে আলাদীনকে সঙ্গে লইয়া একটা বড় পোষাকের দোকানে প্রবেশ করিল এবং তাহার মনোমত পরিচ্ছদে আলাদীনকে ভূষিত করিল। আলাদীন তাহার কাকা সাহেবের সজ্জদয়তা ও দয়ায় একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িল।

পরিচ্ছদভূষিত আলাদীনকে লইয়া বাছকর বাজার উপস্থিত হইল, এবং বড় বড় সদাগরদিগের দোকান দেখাইয়া বলিল, “বাবা, তুমি অতি অন্নদিনের মধ্যেই এই সকল বড় বড় সদাগরদিগের মত ধনবান হইয়া উঠিবে। তুমি সর্ব্বদা এই স্থানে আসিয়া এই সকল সদাগরের সঙ্গে আলাপ করিবে।” বাজার ঘুরিয়া বাছকর প্রহরদ্বিত আলাদীনের সহিত নানা বিষয়ে গল্প করিতে করিতে তাহাকে লইয়া এক ধীরে বাড়ী উপস্থিত হইল। এখানে বাছকর বাসা লইয়াছিল, এখানে কয়েক জন সদাগর বাস করিত, বাছকর আলাদীনকে তাহাদের সহিত পরিচিত করিয়া দিল। পানভোজনেরও আয়োজন ছিল, সকলে মহানন্দে আহারাদিতে প্রবৃত্ত হইল।

আহারাদি শেষ হইলে, আলাদীন তাহার কাকা সাহেবের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। বাছকর আলাদীনকে একাকী ছাড়িতে সন্মত হইল না, স্বয়ং তাহার সঙ্গে চলিল, এবং তাহার মাতার নিকট উপস্থিত করিল। আলাদীনের জননী পুত্রের উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দেখিয়া মুগ্ধ হইল, এবং বাছকরকে অগাধা শ্রদ্ধাবাদ প্রদান করিল।



বাছুর বলিল, “ধন্যবাদের আদর্শক নাই, ইহা আমার কর্তব্য, আমার মৃত প্রাণের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার এই একমাত্র উপায় আছে, ইহাতে উদারীন হইলে আমার অর্থ হইবে। আল্লাদীন এ কাণ পর্যন্ত কেবল কতকগুলি চুই বাগকের সঙ্গেই মিশিয়া আসিয়াছে। আল্লাদীন ছেলে মন্দ নহে, আমি বাহা বলি, তাহাতেই ত’ মনোযোগী হয় দেখিতেছি, উহার মধ্যে উচ্চাভিলাষ জন্মিলেই ও অন্যর আমোদ-প্রমোদ পরিত্যাগ করিবে। আমি উহার মনে উচ্চাভিলাষ জন্মিবার জন্য ও বড় বড় লোকের সঙ্গে উহার আলাপ করিয়া দিবার জন্য, অনেক স্থানে আজ উহাকে লইয়া গিয়াছিলাম, কাল আরও নতুন নতুন স্থানে লইয়া যাইব, নতুন নতুন দৃষ্ট দেখাইব। উহার মনটা প্রথমে এইভাবে পরিবর্তিত করিতে হইবে, উহাকে এইভাবে ক্রমে মাদ্রুশ করিতে হইবে।”

আল্লাদীন পোষাক পাইয়া ও অনেক নতুন স্থান ঘুরিয়া বিশেষ সমুদ্র হইয়াছিল, পরদিন আবার নতুন নতুন স্থান ও নব নব দৃষ্ট দেখিবার আশায় তাহার জ্বর পূর্ণকিত হইয়া উঠিল। পরদিন প্রভাত্রে আল্লাদীন শয্যা ত্যাগ করিয়া নতুন পোষাকে সজ্জিত হইল, এবং তাহার কাকার আশায় পথের দিকে চাহিয়া রহিল। কিয়ৎকাল পরে পথের মোড়ে বাছুরকে দেখিতে পাইয়া, সে তাহার নাতাকে তাহার আগমন-সংবাদ জ্ঞাপন করিল, এবং দরজা বন্ধ করিয়া পথে আসিয়া বাছুরের সহিত মিলিত হইল।

বাছুর আল্লাদীনের সহিত অত্যন্ত মেহপূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিল, কত নতুন নতুন পথ, পল্লী, উপবন ঘুরিয়া, বাছুর অবশেষে একটি বিস্তীর্ণ প্রমোদ-কাননে প্রবেশ করিল। সেখানে একটি নির্ঝরমূলে বসিয়া বাছুর বলিল, “আল্লাদীন, বাবা, বড় ক্লান্ত হইয়াছি, এখন একটু বিশ্রাম করি, তুমিও বোধ করি পরিশ্রান্ত হইয়াছ, বোরা ত’ কম হয় নাই, তুমিও আমার পাশে বসিয়া একটু বিশ্রাম কর। ক্লান্তি দূর হইলে আবার আমরা চলিতে আরম্ভ করিব।”

বাছুর তাহার বস্ত্রপ্রান্ত হইতে নানাবিধ সুবাসিত ফলমূল বাহির করিল, আল্লাদীনকে তাহা আহ্বার করিতে দিল, নিজের আহ্বার করিতে লাগিল।

জলযোগ শেষ হইলে, কিয়ৎকাল পরে আল্লাদীনকে লইয়া বাছুর আবার উঠিল, এবং বাগান হইতে বাহির হইয়া গল্প করিতে করিতে আল্লাদীনকে ভুলাইয়া, নদ্রবাহিরে পরিত্যক্ত উপস্থিত হইল।

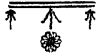
আল্লাদীন জীবনে কখনও এত পথ ভ্রমণ করে নাই, সে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, অবশেষে সে আর চলিতে না পারিয়া বাছুরকে জিজ্ঞাসা করিল, “কাকা সাহেব, আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ ? পা-বাথা হইয়া গেল, আর যে চলিতে পারি না। এ কোথায় আসিয়াছি, সমুদ্রে কেবলই যে পাছা, আমি বাড়ী যাইব।” বাছুর বলিল, “বাপন, কোন ভয় নাই, আমি তোমাকে এমন একটি বাগানে লইয়া যাইব, বাহা সকলের চেয়ে ভাল, এমন বাগান জীবনে কখনও দেখে নাই। সে স্থান এ স্থান হইতে অধিক দূরে নহে; এত দূর আসিয়া যদি বাগানটি না দেখিয়া ফিরিয়া যাই, তবে বড়ই আপশোষ করিতে হইবে।” আল্লাদীন অগত্যা অতি কষ্টে চলিতে লাগিল। বাছুর নানা প্রকার মনোহার গল্পে তাহার মনোব্রজ করিতে করিতে চলিল।

অবশেষে উভয়ে একটি অনতিবৃহৎ উপত্যকায় প্রবেশ করিল। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া বাছুর বলিল, “আমালিগকে আর কোথাও যাইতে হইবে না, আমি এখানে তোমাকে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিব। এমন ব্যাপার কেহ কখনও দেখে নাই, আমি একটা বাতী জালি, আশুন করিবার জন্য তুমি কতকগুলি শুক পাতা সংগ্রহ কর।”



নিকটে কতকগুলি শুক কুণ ও কাঠ পড়িয়াছিল, আলাদীন কতকগুলি কুণ ও কাঠ কুড়াইয়া আনিয়া, বাহকর তাহাতে অগ্নি স্পর্শ করিল। বাহকর সেই অগ্নিতে কতকগুলি চূর্ণ নিক্ষেপ করিল। ঘন কৃষ্ণবর্ণ ধূমে চতুর্দিক আচ্ছন্ন হইল। বাহকর বিড়-বিড় করিয়া কতকগুলি মস্ত উচ্চারণ করিল, আলাদীন তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে আলাদীনের পদপ্রান্তে একটি গহবর সৃষ্ট হইল, গহবরের মুখে একখানি চতুষ্কোণ প্রস্তর দেখা গেল, প্রস্তরের উপর একটি পিতলের আটা।

ধূমরাশির
অস্ত্রশালা
গুহা-পথ



এই দৃশ্য দেখিয়া বালক আলাদীনের মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, ভয়ে সে কাদিতে লাগিল। বাহকর তাহাকে চূর্ণ করিতে বলিল, কিন্তু আলাদীনের রোমন বন্ধ হইল না দেখিয়া, বাহকর সবেগে তাহার গণ্ডে একটি চপেটাঘাত করিয়া তাহাকে ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। আলাদীন ইহাতে এমন আশাত পাইয়া যে,

তাহার দাঁত তালি-একপাত হইল। আলাদীন কাদিতে কাদিতে বলিল, “কাকা সাহেব, আমি কি অপরাধে করিয়াছি যে, আপনি আমাকে এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে মারিলেন?” বাহকর বলিল, “আমি তোমার কাকা, তোমার বাপের মত, আমি কাছে থাকিতে তুই ভয় পাইয়া চীৎকার করিতেছিল কেন? এখন আমি বাহা বলি, কর। তোমার কোন ভয় নাই, আমার কথা শুনিবে আমি তোকে বড়লোক করিয়া দিব।” বাহকরের কথা শুনিয়া আলাদীনের ভয় অনেক পরিমাণে দূর হইল। বাহকর বলিল, “এই পাথরখানার নীচে একটি বহুসূত্রী দ্রব্য লুকান আছে,



আলা-
দীন শাস্ত্র

সেট তুই যদি তুলিয়া আনিতে পারিস, তাহা হইলে তাহার দ্বারা এই পৃথিবীর মধ্যে সকলের অপেক্ষা বড়লোক হইতে পারিবি। এই পাথর সরাইয়া, সেই দ্রব্য উদ্ধার করার মাধ্যমে তোমার ভিন্ন আর কাহারও নাই; এমন কি, আমিও ইচ্ছা করিলে ইহা নিজের তুলিয়া লইতে পারি না। আমি বাহা বাহা বলি, তোকে তাহাই করিতে হইবে, তাহাতে তোমার এবং আমার উভয়েরই ভাল হইবে।”

বহুতম
ভূগর্ভের দ্বার
উন্মুক্ত

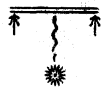


আলাদীন হতবুদ্ধি হইয়া বাহকরের কথা শুনিতে লাগিল, পৃথিবীতে সকলের অপেক্ষা বড়লোক হইবার আশায় আলাদীন পঞ্চম ও দাঁতের বাতনা তুলিয়া গেল, সে বলিল, “কাকা সাহেব, আপনি বাহা বলিলেন, আমি তাহাই করিব।” বাহকর আগ্রহ হইয়া বলিল, “বাহা, তোমার কথা শুনিয়া আমি বড় খুশী হইলাম। তুমি বড় সুবোধ বালক। তুমি এই পিতলের আটাটা ধরিয়া টানিয়া তোল।” আলাদীন

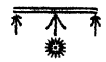
বলিল, “ও পাথর যে বড় ভারী বোধ হইতেছে, আমি তুলিতে পারিব কি ? আমার গায়ে তত বল নাই। আমার সঙ্গে তুমিও ধর।” বাহুর বলিল, “না, না, আমি ধরিলে উহা উঠিবে না, আর কেহ ধরিলেও উঠিবে না, বলে উহা তুলিতে পারা যায় না, তোমারই কেবল উহা তুলিবার অধিকার আছে, আমার সে অধিকার নাই। তুমি তোমার পিতা ও পিতামহের নাম লইয়া, আংটা ধরিয়া টানিলেই পাথর উঠিবে, বেশী বলের দরকার হইবে না।” আলাদীন আর কোন কথা না বলিয়া, বাহুরের কথামত তাহার পিতা ও পিতামহের নাম উচ্চারণ করিয়া, আংটা ধরিয়া টানিবারাত্র পাথর উঠিয়া পড়িল।

পাথর উঠিতেই একটি গম্বর দেখা গেল, গম্বরটি অধিক গভীর নহে, গম্বরের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দ্বার আছে, সেই দ্বার হইতে কয়েকটি সোপান নীচে নামিয়া গিয়াছে। বাহুর সেই দ্বার দেখাইয়া, আলাদীনের বলিল, “এই দ্বার দিয়া গম্বরের মধ্যে নামিয়া যাও, দেখিবে, গম্বরের মধ্যে চারিটি প্রকাণ্ড কণ্ডলী স্বর্ণ-সোণো পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু সে সকলের কোন দ্রব্যই তুমি স্পর্শ করিও না। প্রথমেই তুমি একটি কক্ষে উপস্থিত হইবে, দেখানে কাপড় দিয়া শরীর বঁধিয়া দ্বিতীয় কক্ষে, এবং তাহার পর তৃতীয় কক্ষে প্রবেশ করিবে, কিন্তু তুমি প্রাচীরের নিকটে ঘাইবে না, যদি প্রাচীরে তোমার অন্তর্স্পর্শ হয়, তাহা হইলে তোমার প্রাণ নষ্ট হইবে, এমন কি, সাবধান, যেন প্রাচীরে তোমার শোষাকও স্পর্শ না হয়। তৃতীয় কক্ষের অদূরে একটি দ্বার দেখিতে পাইবে, সেই দ্বার দিয়া বাহির হইয়া গেলে, একটি কলের বাগানে উপস্থিত হইতে পারিবে। সেই বাগানের ভিতর দিয়া চলিতে চলিতে এক স্থানে একটি গুহা দ্বার দেখিতে পাইবে, সেই দ্বার দিয়া পঞ্চাশ ধাপ নামিলেই একটি ঘরের মধ্যে উপস্থিত হইবে, সেই ঘরে একটি দীপাধারে একটি প্রদীপ জলিতেছে, তুমি সেই প্রদীপটি নিবাইয়া, তাহার তেল ও সলিতা ফেলিয়া তাহা কাপড়ের মধ্যে ঢাকিয়া লইয়া আসিবে। আসিবার সময় গাছে যে সকল ফল দেখিবে, তাহা যত ইচ্ছা পড়িয়া আনিতে পার। তোমাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত একটি অমুরী দিতেছি, পর।” অমুরীটি অমুরীতে পরিয়া আলাদীন এক লম্ফে গুহামধ্যে প্রবেশ করিল। বাহুর বাহা বাহা বলিয়া দিয়াছিল, সেইরূপ সমস্তই দেখিতে পাইল, পাছে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে সে অতি সাবধানে বাহুরের উপদেশ অনুসারে চলিতে লাগিল। সে প্রদীপটি দীপাধারের উপর দেখিতে পাইয়া, তাহা তুলিয়া লইল, তাহা নির্দোষিত করিয়া তেল ও সলিতা ফেলিয়া দিয়া, তাহা বস্ত্রের মধ্যে বুকুর কাছে লুকাইয়া রাখিল। তাহার পর গাছে যে সকল ফল ফুলিতেছিল, তাহা কতকগুলি সংগ্রহ করিল। এই সকল ফল সাধারণ ফল নহে, ইহার কোনটা লাল, কোনটা পীত, কোনটা লালিত, কোনটা বা উজ্জল ফটকের মত। এক একটি ফল এক একটি হাঁরা, চুঁপি, পান্না, মুক্তা প্রভৃতি; আলাদীন যত পারিল ফল ছিঁড়িয়া কাপড়ে বঁধিল, তাহার পর সাবধানে গুহাধারে আসিয়া দেখিল, তাহার কাকা সাহেব অতি অসহিষ্ণুভাবে তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। আলাদীন বলিল, “কাকাসাহেব, আমাকে টানিয়া তুলুন, আমি উঠিতে পারিব না।” বাহুর প্রদীপটি গ্রহণের জন্ত হস্ত প্রসারিত করিয়া বলিল, “আগে প্রদীপটি আমার হাতে দাও, পরে তুলিতেছি।”—আলাদীন ফল দ্বারা কোঁড় পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল, প্রদীপ বাহির করিবার হুঁধা ছিল না, তাই বলিল, “আগে তুলুন, পরে প্রদীপ দিব।” বাহুর বলিল, “আগে প্রদীপ দাও, পরে তুলিতেছি, প্রদীপ না দিলে তুলিব না।”—আলাদীনেরও জেদ বাড়িয়া গেল, সে বলিল, “আমাকে না তুলিলে কখনই প্রদীপ দিব না।” “কিভাবে?—বটে। তবে যত হরতাপা !” বলিয়া বাহুর ক্রমশঃ রাগ করিয়া গুহাধারের অগ্নিতে কিছু চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া কি মন্ত উচ্চারণ করিল, দেখিতে দেখিতে গুহাধার রুদ্ধ হইয়া গেল। উপরে গুহা চিকমাকি রহিল না।

আশ্চর্য্য প্রদীপ
অধিকার



গুহামধ্যে
কী বস্তু সমাধি



আলাদীন আহার শেষ করিয়া একে একে তাহার বিপদের কথা মাতার গোচর করিল, আলাদীন যে ফল লইয়া আনিয়াছিল, তাহাও মাতাকে প্রদান করিল। আলাদীনের মাতা সামান্য দরজীর জী, সে মনে করিল, নানাবর্ণের এই সকল ফল কেবল কাচের ভাঁটা, সে জানিত না, ইহা বহুশূণ্য হীরকাধির, রাজার ভাণ্ডারেও এমন রত্ন হ্রদ। আলাদীনও হীরকস্বরূপ, তাহা জানিত না, স্বতরাং সেগুলি সে অবজ্ঞাভরে একটা কুলুঙ্গীর উপর ফেলিয়া রাখিল।

পুত্রের মুখে বাছকরের প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, আলাদীনের মাতা তাহার বিরুদ্ধে নানা প্রকার গালগালি বর্ষণ করিতে লাগিল, তাহার পর আল্লা যে তাহার পুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছেন, সে জ্ঞাত সে তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিল। আলাদীনকে পরিশ্রান্ত দেখিয়া সে তাহাকে শয়ন করিতে বলিল।

আলাদীন শয়নমাত্রে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল। পরদিন অনেক বেলায় তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে অত্যন্ত ক্ষুধা বোধ করিল; মাতাকে বলিল, "মা, কি খাবার আছে, দাও।" মা বলিল, "ঘরে ত' বাবা কিছুই খাবার নাই, বাহা কিছু ছিল, কাল তোমাকে দিয়াছি। আমার ভূলা শিক্তিতে বাকী আছে, সেটুকু পেঁজা হইলে আমি তাহা বিক্রয় করিয়া তোমার জন্ম কিছু খাবার আনিব।" আলাদীন বলিল, "মা, ভূলা থাক, তা তুমি অন্য সময় বিক্রয় করিও, এখন তুমি আমাকে সেই প্রদীপটা দাও, তাহাই বিক্রয় করিয়া আমি কিছু খাবার যোগাড় দেখি। প্রদীপটা বিক্রয় করিলে বোধ হয়, আমাদের দু-বেলায় মত আহারীয় জবোর সংস্থান হইতে পারে।"

আলাদীনের মাতা তাহার আনীত প্রদীপটা লইয়া আসিল; বলিল, "বাবা, প্রদীপটা বড় ময়লা দেখিতেছি, একটু পরিষ্কার করিয়া দিই, তাহা হইলে কিছু বেশী দামে বিক্রয় হইতে পারে।" আলাদীনের মাতা একটু জল ও বালি দিয়া প্রদীপটা ধুইতে বলিল, নিকটে আলাদীন দাঁড়াইয়া রহিল। আলাদীনের মাতা একটু জোরে প্রদীপ ধুইতেই একটা বিকটাকার দৈত্য সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মেঘ-গর্জনের ভায় গর্জন করিয়া বলিল, "আমি প্রদীপের ভূতা, এই প্রদীপ বাহার হাতে থাকিবে, আমি তাহারই আজ্ঞা পালন করিব, তোমার কি আজ্ঞা, বল?" আলাদীনের মা দৈত্যের কথা শেষ হইবার পূর্বেই তাহার বিকট মূর্তি ও ভীষণ কণ্ঠস্বর শুনিয়া মুহূর্ত্তে হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আলাদীন হতবুদ্ধি হইল না, সে তৎক্ষণাৎ প্রদীপট ধরিয়া দৃঢ়ভাবে বলিল, "আমি বড় ক্ষুধার্ত্ত হইমছি, খাদ্যস্বা আন।" দেখিতে দেখিতে বারট দৌপাট্রে নানাবিধ আহাৰ্য্যাদ্রব্য ও দুই বোতল মদ



দৈত্য
সম্মুখে

প্রদীপ-ভূতা
দৈত্যের
ভাষাময়ন

একটি প্রকাণ্ড রৌপ্যানিষ্ঠিত গামলার মধ্যে স্থাপন করিয়া দৈত্য তাহা আলাদীনের সম্মুখে উপস্থিত করিল তাহার পর চক্ষুর নিমেষে সে অদৃশ্য হইয়া গেল।

আলাদীন তাহার মাতার চৈতন্যদম্পাদন করিল। সে বলিল, “মা, তোমার কোন ভয় নাই, উঠ, খাবার প্রস্তুত, এস, আমরা উদর পূর্ণ করিয়া আহ্বার করি। বিলম্ব করিলে এমন উৎকৃষ্ট খাবার ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।”

আলাদীনের জননীর বিষয়ের সীমা রহিল না, এমন উৎকৃষ্ট ভোজনপাত্র, এমন খাদ্যদ্রব্য জীবনে কখন তাহার ভাগ্যে ঞ্চেটে নাই। উভয়ে উদর পূর্ণ করিয়া আহ্বার করিল, বাহ্য অবশিষ্ট থাকিল, তাহা পরদিনের জন্য রাখিয়া দিল।

দৈত্য না
সুস্থিমান
সৌভাগ্য !

আলাদীনের মাতা জিজ্ঞাসা করিল, “এমন উৎকৃষ্ট খাদ্যগামগ্রী কোথায় পাইলে, জানিবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। এমন বাসনই বা কে দিল? তোমার ক্ষুধা অধিক হইয়াছে বলিয়া এতদূর আমি তোমাকে কোন প্রশ্ন করি নাই, এখন তোমার ক্ষুধা নিবৃত্ত হইয়াছে, এখন বল। স্থলতান যে আমাদের হৃদয়ে কাতর হইয়া এ সকল সামগ্রী দিয়া করিয়া উপহার পাঠাইয়াছেন, তাহা ত’ বোধ হয় না, কিন্তু স্থলতান ভিন্ন অন্য কাহারও গৃহে যে এরূপ মূল্যবান পাত্র অপরিপূর্ণ পরিমাণে আছে, তাহাও অসম্ভব হয় না।”

আলাদীন বলিল, “দৈত্য এ সকল জিনিষ দিয়া গিয়াছে, আমাকে পর্তুগলহর হইতে যে দৈত্য উদ্ধার করিয়াছিল, এ সে দৈত্য নহে, এ দৈত্য প্রদীপের ভূতা।” আলাদীনের মাতার মূর্ছার পর যাহা যাহা ঘটয়াছিল, আলাদীন তাহার মাতাকে সমস্ত বলিল, অবশেষে কহিল, “বাহার হাতে প্রদীপ থাকিবে, সে তাহারই আজ্ঞা পালন করিবে।”

আলাদীনের মাতা ভীত ও বিস্মিত হইয়া বলিল, “তাতেই দৈত্যটী আমাকে সন্ধানন করিয়া কথা বলিতেছিল; না বাবা, ও প্রদীপে আর আমার কাজ নাই, আমি না খাইয়া মরি, সেও ভাল, দৈত্যের সাহায্যে আহ্বার চাহি না, তোমার প্রদীপ তুমি তফাতে রাখ, আমার সম্মুখে আনিও না, তুমি আমার উপদেশ মনিতে চাও ত’ ঐ সর্ব্বনেশে প্রদীপ ও অঙ্গুরীটা পরিত্যাগ কর। দৈত্যের সঙ্গে কোন রকম সাধা উচিত নহে, স্বয়ং প্যাগম্বর তাহা নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।”

আলাদীন বলিল, “মা, এমন মজার প্রদীপ কি ফেলিয়া দিতে আছে? না, বিক্রয় করিয়া কিছু খাতি আছে? এই প্রদীপের লোভে বাহুরক বেটা কেন রাজ্য হইতে আসিয়া আমার কাঁকা সজিয়াছিল, দেখ দেখি; আর তুমি আমাকে হঠাৎ ইহা ত্যাগ করিতে বল? যখন ইহা দৈবক্রমে পাইয়াছি, তখন ইহার স্তুতি-ভোগ হইতে কখন নিবৃত্ত হইব না। চিরদিন ত’ হৃদয়েই কাটিল, দেখি, যদি ইহার কল্যাণে একই হৃদয়ের মুখ দেখিতে পাই। আর অঙ্গুরীটাও ছাড়া উচিত নহে, একবার উহারই বলে বাঁচিয়াছি, আবার কখন কি বিপদ ঘটে, কে বলিতে পারে?”

আলাদীনের কথা শুনিয়া তাহার মাতা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিল, “বাহা ভাল বোধ হয় কর, আমি কিন্তু তোমার দৈত্যদানার সঙ্গে কোন কারবার করিব না, আমি উহাদের কথা পর্য্যন্ত শুনিতৈ চাই না।”

দুই দিন পরে খাদ্যদ্রব্য আর কিছুই অবশিষ্ট রহিল না। আলাদীন তখন নিরুপায় হইয়া এক জন ইহুদী সদাগরের নিকট একখানি থালা বিক্রয় করিতে চলিল, আলাদীন কিঞ্চি তাহার মাতা এই রৌপ্যবাসনের মূল্য কত হইতে পারে, তাহা জানিত না। সদাগর আলাদীনকে প্রবঞ্চিত করিয়া একটি মোহর বাহির করিয়া বলিল, “আমি ইহার মূল্য এক মোহর দিতে পারি।” আলাদীন পয়স সঙ্কট-মনে তাহাই লইয়া গৃহে আসিল, রৌপ্যপাত্রের প্রকৃত মূল্য বাহান্তর মোহর, সে সদাগরের নিকট তাহাই এক মোহর মূল্যে বিক্রয় করিল।

দৈত্য-দানার
কারবার
ত্যাগ কর

মোহর ভাঙাইয়া কয়েক দিন চলিল, তাহার পর আবার অর্থকষ্ট উপস্থিত হইল। আর একটি বাসনও সেই সদাগরের নিকট সে পূর্বমূল্যে বিক্রয় করিল, এইরূপে ক্রমে সে বারোখানি খালি বিক্রয় করিয়া ফেলিল। অবশেষে গামলাটা বিক্রয়ের পালা আসিল, তাহা এত ভারী যে, আলাদীন তাহা সদাগরের দোকানে বহিয়া লইয়া যাইতে পারিল না। অগত্যা আলাদীন সদাগরকে তাহার মাতার নিকট ডাকিয়া আনিল, ইহদী সদাগর দশ মোহর দিয়া সেই রৌপ্যানির্মিত গামলাটি ক্রয় করিল। কয়েক দিন এইরূপ নিশ্চিতভাবে অতিবাহিত হইল, আলাদীন খায় আর সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়ায়, কিন্তু এই সময়ে তাহার স্বভাবের একটু পরিবর্তন হইয়াছিল, সে আর নিকশী ছুই বালকগণের দলে বেড়াইত না, অনেক বড় বড় সদাগরের সঙ্গে সে আলাপ করিয়া ফেলিয়াছিল, তাহাদের সহিত ও অনেক শিক্ষিত লোকের সহিত মিশিয়া তাহার কিঞ্চিৎ সাংসারিক অভিজ্ঞতাও জন্মিয়াছিল।

ইহদীর প্রবন্ধনা



শেষ দশ মোহর আহারবয়ে নিঃশেষিত হইলে, আলাদীন পুনর্বার তাহার প্রদীপের শ্রবণ লইল, কিন্তু আলাদীন বেশী জোরে প্রদীপ ধমিল না, একটু বালি তুলিয়া লইয়া তদ্বারা ধীরে ধীরে প্রদীপ ঘর্ষণ করিতেই পূর্ববর্ণিত দৈত্য তাহার সমুখে উপস্থিত হইল; এবার অপেক্ষাকৃত মৃদুবেগে সে বলিল, “তুমি কি চাও? আমি প্রদীপের ভূতা, প্রদীপ বাহার নিকটে থাকে, আমি তাহার আচ্ছাদন করি।” আলাদীন বলিল, “আমি স্তম্ভিত, কিছু খাওয়াইয়া লইয়া এস।” দৈত্য তৎক্ষণাৎ পূর্ববৎ রৌপ্যপাত্র খাওয়াইয়া আলাদীনের গৃহে রাখিয়া প্রস্থান করিল।

আলাদীনের মাতা পূর্বের দৈত্যের ভয়ে গৃহ ত্যাগ করিয়া কার্ণাঙ্কলে স্থানান্তরে গমন করিয়াছিল, সে গৃহে প্রত্যাপন করিয়া প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইল। আলাদীন মাতাকে সঙ্গে লইয়া আহার করিতে বলিল। যে খাদ্যদ্রব্য আনীত হইয়াছিল, তাহাতে তাহাদের দুই দিন চলিল।

দুই দিন পরে খাদ্যদ্রব্য নিঃশেষিত হইল, আলাদীন একখানি রৌপ্যানির্মিত থালা কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া পূর্ববৎ পূর্বোক্ত ইহদী সদাগরের নিকট বিক্রয় করিতে চলিল। সে এক জন সন্ধ্যা ও সাধু-প্রকৃতির স্বর্ণকারের দোকানের নিকট দিয়া যাইতেছিল, আলাদীনকে দেখিয়া স্বর্ণকার তাহাকে নিজের দোকানে ডাকিল, বলিল, “বৎস আলাদীন, আমি অনেক সময়েই দেখিয়াছি, তুমি কাপড়ে ঢাকিয়া ঐ ইহদীর দোকানে কি লইয়া যাও, খানিক পরে শূন্যহস্তে ফিরিয়া যাও, তাহাও লক্ষ্য করিয়াছি; আমার অনুমান হয়, তুমি তাহার দোকানে কোন মূল্যবান সামগ্রী বিক্রয় করিয়া থাক, কিন্তু তুমি ঐ ইহদী সদাগরকে ভান না, লোকটি অত্যন্ত প্রবঞ্চক, এমন কি, সে তাহার লাতার সঙ্গে পঞ্চাশ প্রবন্ধনা করে; স্তবরাং তোমাকে ঠকাইবে, ইহার আর আশ্চর্য্য কি? তুমি কি লইয়া যাইতেছ, তাহা যদি আমাকে দেখাইতে কি আমার কাছে বিক্রয় করিতে আসিলে না থাকে, তাহা হইলে আমি তুমি মূল্য দিয়া তাহা তোমার নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারি। তুমি বরং জিনিষ যাচাই করিয়া দেখিতে পার, যদি আমার কাছে কম মূল্য পাইয়াছ, এরূপ কেহ বলে, তাহা হইলে আমি তোমাকে বিশেষ মূল্য প্রদান করিব।”

বাহাতব
মোহরের
রৌপ্য-পাত্র



স্বর্ণকারের কথায় আক্লান্বিত হইয়া আলাদীন রৌপ্যপাত্র বাহির করিয়া তাহাকে দেখাইল। বৃদ্ধ স্বর্ণকার দেখিয়াই চিনিল, সেই পাত্র বিশুদ্ধ রৌপ্যে নির্মিত। সে আলাদীনকে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি পূর্বে এরকম জিনিষ ইহদী সদাগরের কাছে অবগুই বিক্রয় করিয়াছ, কি মূল্য পাইয়াছ?” আলাদীন অশকটচিত্তে বলিল, “এক মোহর।” স্বর্ণকার সন্মুখে বলিল, “উঃ! কি প্রবঞ্চক!—বাহা হউক, বাহা হইয়াছে, তাহা আর ফিরাইবার উপায় নাই, তোমার এই পাত্র বিশুদ্ধ রৌপ্যে নির্মিত, ইহদী সদাগর

তোমাকে কত টাকা ঠকাইয়াছে, তাহা বলিতেছি।” স্বর্ণকার রৌপ্যখালাখানি ওজন করিয়া দেখিয়া কহিল, “ইহার মূল্য বাহাত্তর মোহর হয়, স্তত্ররাত্রি একরূপ প্রত্যেক খালের জন্ত তুমি একাত্তর মোহর হিসাবে ঠকিয়াছ। এখন যদি তুমি জিনিষ অস্ত্রের খাচাই করিতে ইচ্ছা কর, তবে আমি তাহাতেও সম্মত আছি।” আলাদীন মহানন্দে বলিল, “না মহাশয়, আপনি অতি মংলোক, আপনায় উপর আমার কোন মন্দেহ নাই।” আলাদীন বাহাত্তর মোহর লইয়া গৃহে ফিরিল।

আলাদীন এই স্বর্ণকারের দোকানেই তাহার রৌপ্যবাসনগুলি আবস্তকামুদ্যে বিক্রয় করিতে লাগিল, সকলগুলি বিক্রয় হইলে সে আবার প্রদীপ ঘষিয়া দৈত্যকে আহ্বান করিয়া বাস্ত্রব্রত গ্রহণ করিত, এইরূপে তাহার আর কোনই অভাব থাকিল না। সে নিশ্চিন্তমনে আহাঙ্গাদি করে ও দেশের স্বচ্ছ স্বচ্ছ নগর ও জহরীগণের সহিত আলাপ করিয়া বেড়ায়। অল্পদিনের মধ্যেই সে জহরতের স্বরূপ ও মূল্যসম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিল। সে মৃগিল, সে পুরুষগণের হৃৎক হইতে যে সকল ফল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহা কাচের ভাঁটা মাত্র নহে, তাহা বহুমূল্য হীরকরত্ন। আলাদীন তাহার সংগৃহীত ফলের কথা কাহারোকেও বলিল না, এবং তাহাদের মূল্যসম্বন্ধেও কোন কথা তাহার নাতাকে জানাইল না, কেবল সেগুলি সাধবানে উপযুক্ত স্থানে রাখিয়া দিল।

স্নানাগারে
রাজকতা।
সম্পর্কন



এক দিন নগরের রাজপথ দিয়া চলিতে চলিতে রাজকীয় ঘোষণা শুনিল, রাজকতা স্নানাগারে নান করিতে বাইবেন বলিয়া রাজকর্মচারিগণ বাজারের দোকানশ্রেণী নির্দিষ্ট সময়ের জন্ত বন্ধ রাখিতে আদেশ করিয়াছেন। সে সময়ে কেহই রাজপথে বাহির হইবে না, সে আদেশও শুনিতে পাইল। রাজকতা বদরুল বদর কিরণ হুন্দরী, তাহা দেখিবার জন্ত আলাদীনের যৎপরোনাস্তি আগ্রহ হইল। আলাদীন একটি বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইয়া গবাক্ষপথে রাজকতাকে দেখিবার জন্ত পথের দিকে চাহিয়া রহিল, অল্পক্ষণের মধ্যেই রাজকতা সেই পথ দিয়া স্নানাগারে চলিলেন, কিন্তু তাহার অবগুষ্ঠন বিলম্বিত থাকায় সে রাজকতার মুখ দেখিতে পাইল না; স্তত্ররাত্রি সে এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্নানাগারে ঘরদেশে আসিয়া দাঁড়াইল এবং অন্তরে অগস্ত্য থাকিয়া অবগুষ্ঠনবিহীন রাজকতার অনুপম বদনভা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

রাজকতার রূপ দেখিয়া আলাদীন একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, সে স্থান-কাল বিস্মৃত হইয়া, তাহার রূপ-মুখ পান করিতে লাগিল, এ পর্যন্ত আলাদীন তাহার জননী ভিন্ন কোন নারীর মুখ দেখিতে পায় নাই, অবগুষ্ঠন-উন্মোচিতা যুবতীর মুখ যে কত হৃন্দর, সে ধারণা তাহার ছিল না। অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাজকতাকে দেখিয়া সে মুগ্ধ-হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু তাহার মনটি সে রাজকতার নিকট রাখিয়া আসিল।

প্রণয়ের নেশা



গৃহে ফিরিয়া আলাদীন অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বসিয়া রহিল, কোন বিষয়েই আর তাহার উৎসাহ রহিল না। প্রণয়ের তীব্র হলাহল পান করিল যুবকদিগের যে অবস্থা ঘটে, তাহারও সেই অবস্থা ঘটিল। কিন্তু সে তাহার মাতার নিকট কোন কথা প্রকাশ করিল না, তাহার মা পুত্রের বিমর্ষভাবে দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইল; আলাদীনকে ছুশ্চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। আলাদীন নিরুত্তরভাবে বসিয়া রহিল, আহায়ে তাহার দৃষ্টি রহিল না, কাহারও সহিত সে প্রাণ খুলিয়া আলাপ করিতে পারিল না। রাজ্যে তাহার নিজা হইল না, সমস্ত রাজ্য খণ্ডায় পড়িয়া সে ছটফট করিতে লাগিল। সে ভাবিল, তাহার অশান্তি ও উৎবেগ চিরজীবনের জন্ত তাহার দলী হইয়া রহিল।



পরদিন প্রভাতে আলাদীন আহায়ে বসিয়া তাহার মাতাকে বলিল, “মা, আমাকে চিন্তিত করিয়া তোমার মনে উদ্বেগ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিরাছি। আমি অসুস্থ হইয়াছি, এরূপ মনে করিও না, আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে; কিন্তু আমার মন বড় অসুস্থ, শারীরিক বাতনা অপেক্ষা মনোবিকার আমি অধিক বাতনা পাইতেছি, আমার এ যন্ত্রণা যে কি, তাহা তোমাকে বুঝাইবার আমার সাধ্য নাই; কিন্তু আমার সকল কথা শুনিলে তুমি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিবে।” আলাদীন রাজকুমারী বদরুল বদরকে কিরূপে দেখিয়াছে, এবং তাঁহার রূপরূপি তাহার মনের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সবিস্তারে তাহা বর্ণনা করিয়া বলিল, “মা, আমি স্থলতানের নিকট তাঁহার কন্ডাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব পাঠাইতে চাই, এ বিষয়ে তোমার মত কি?”

আলাদীনের মাতা পুত্রের কথা বিশেষ মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিতেছিল, আলাদীন যখন স্থলতান-পুত্রের পাণিগ্রহণের জন্ত উৎসুক জ্ঞাপন করিল; তখন সে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল; বলিল, “বাবা আলাদীন, তুমি এ কি কথা বলিতেছ? তোমার মাথা কি একেবারেই খারাপ হইয়া গিয়াছে?”—আলাদীন বলিল, “না মা, তুমি কিছু ভয় করিও না, আমার মাথা খারাপ হয় নাই, আমার বুদ্ধি স্থির আছে। আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম, তুমি আমার প্রস্তাবে কখন সম্মত হইবে না, কিন্তু মা, তুমি বাছাই বল, আমি কখন আমার সংকল্প ত্যাগ করিব না, আমি স্থলতান-পুত্রকে বিবাহ করিবই, ইহার কখন অন্তথা হইবে না।”

আলাদীনের জননী গম্ভীরভাবে বলিল, “বাছা, তুমি কে এবং কাহার সম্ভান, এ কথা একেবারেই ভুলিয়া বাইতেছ, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। যদি তুমি এরূপ প্রস্তাব করিতে সাহসী হই, তথাপি কে সাহস করিয়া ইহা স্থলতানের নিকট উপস্থাপন করিবে, তাহাও আমি বুঝিতে পারিতেছি না।” আলাদীন ধীরভাবে বলিল, “কেন, তুমি?”—“আমি?” আলাদীনের মাতা সুবিস্ময়ে বলিল, “আমি স্থলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিব, ‘স্থলতান, আমার পুত্রের সহিত আপনার কন্ডার বিবাহ দিন।’—আমি ইহা কখন পারিব না, তুমি পাগল হইয়া থাকিলেও আমি পাগল ই নাই। তুমি এমন অসঙ্গত কথা আর বুঝে আনিও না। তুমি এই নগরের অতি দরিদ্র সামান্ত এক লন দরজীর পুত্র, তুমি স্থলতান-ছহিতার পাণিগ্রহণে উৎসুক, এ কথা শুনিলে লোকে কি বলিবে? তুমি কি জান না যে, আমাদের দেশের স্থলতান রাজ্যের উত্তরাধিকারী ভিন্ন অরাজপুত্রকেও কন্ডা সম্ভাদান করেন না?”

আলাদীন বলিল, “মা, তুমি যে এ সকল কথা বলিবে, তাহা আমি অনেক আগেই জানি, কিন্তু তোমার উপদেশে আমার মনের ভাব পরিবর্তিত হইবার সম্ভাবনা নাই। আমি বলিতেছি, আমি স্থলতানজাদী বদরুল বদরকে বিবাহ করিতে চাই, আর এ প্রস্তাব তোমাকেই লইয়া বাইতে হইবে। আমার একান্ত অনুরোধ, যদি আমাকে তোমার জীবিত দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিও না।”

আলাদীনের মাতা পুত্রের সংকল্পের দৃঢ়তা দেখিয়া অত্যন্ত ভীত ও দুঃখিত হইল। সে পুত্রকে এই অসম্ভব সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সে ভয়প্রদর্শন করিয়া পুত্রকে তাহার সংকল্প হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। সে স্থলতানের সম্মুখে গিয়া একটা কথাও বলিতে পারিবে না, ভয়ে সে অবসন্ন হইয়া পড়িবে, তাহাও জানাইল। অবশেষে যত্ন দেখিল, আলাদীন কিছুতেই তাহাকে ছাড়িবে না, তখন সে বলিল, “স্থলতানের নিকট

চাদ ধরিবার
সময়!



হীরক-রত্নের
মহামূল্য ফল
উপঢৌকন



কখন শূন্য-হস্তে যাইতে নাই, তোমার গৃহে এমন কি ধনরত্ন আছে, বাহা তুমি হুলতানকে উপহার পাঠাইবে? হুলতানের কাছে তাঁহার বোগা উপহার না পাঠাইলে তাঁহার অপমান করা হইবে, একথা বোধ করি, তুমি অবগত আছ।”

আলাদীন বলিল, “হা, তুমি চিন্তিত হইও না, আমি যে দিন আশ্চর্য্য প্রদীপ লইয়া গৃহে কিরিয়া আসি, সে দিন কতগুলি ফল আনিয়াছিলাম, সেগুলি রত্ন-বেরত্নের কাচের ভাঁটা মনে করিয়া তুমি ফেলিয়া রাখিয়াছিলে, তাহাই হুলতানের বোগা উপহার, তুমি তাহার মূল্য সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহ, কিন্তু আমি এই সহরের বড় বড় জহরীর সহিত আলাপ করিয়া হীরক-রত্নাদির মূল্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি। আমি বাহা আনিয়াছি, তাহা বড় সামান্য দ্রব্য নহে, সেরূপ দ্রব্য হুলতানের ভাগ্যেরে একটুও আছে কি না সন্দেহ। হুলতান সেই সকল ফল দেখিয়া নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবেন এবং তাহার প্রতি কখনও উপেক্ষা প্রকাশ করিতে পারিবেন না, তুমি একখানি রূপার থালায় সেই সকল ফল সাজাইয়া আমার সম্মুখে লইয়া আইস।”

আলাদীনের জননী রূপার থালায় হীরক-রত্নগুলি সজ্জিত করিয়া আলাদীনের সম্মুখে লইয়া আসিল। প্রকাজ্জ দিবালোকে সেই সকল বিভিন্নবর্ণের হীরক-জহরত হইতে এমন অপূর্ণ আভা প্রকাশিত হইতে লাগিল যে, তাহাতে তাহাদের নয়ন ঝলসিয়া গেল। আলাদীন যখন এগুলি গৃহাগর্ভস্থ বৃদ্ধ হইতে পাড়িয়া আনিয়াছিল, তখন সে বালকমাত্র, এগুলি ক্রীড়ার সামগ্রী বলিয়াই তখন তাহার বোধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন বৃদ্ধি, পৃথিবীতে এমন রত্ন অত্যন্ত দুর্লভ।

আলাদীন সেই সকল হীরক-রত্নের বহুবিধ গুণ কীর্তন করিয়া অবশেষে সে তাহার মাতাকে বলিল, “হা, এখন আর তুমি কোন আপত্তি করিতে পার না। এই উপহার লইয়া তুমি এখনই রাজপ্রাসাদে হুলতানের নিকট যাও, তিনি তোমাকে অনাদর করিবেন না।”

আলাদীনের মাতা বলিল, “আমি তোমার আগ্রহ দেখিয়া যাইতে রাজী হইলাম বটে, কিন্তু তাহাকে হয় ত কোন কথাই বলিতে পারিব না। মধ্য হইতে তোমার জিনিসগুলি যাইবে, আর তোমার নিরাশামাত্র সার হইবে। যদি হুলতান আমার নিকট হইতে উপহার পাইয়া সন্তুষ্টিতে আমার পুত্রের উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করেন এবং আমি তোমার অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করি, তাহা হইলে তিনি অবশ্যই আমাকে তোমার অর্থিক অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি তাহাকে কি উত্তর দিবা?”

আলাদীন বলিল, “হা, সে ক্ষত তুমি চিন্তিত হইও না। তিনি এরূপ প্রশ্ন করিলে কি উত্তর দেওয়া আবশ্যক, তাহা আমি বিবেচনা করিয়া সময়ান্তরে তোমাকে বলিব। আমার প্রতীপের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে, আবশ্যককালে আমি দৈত্যের সাহায্যে বঞ্চিত হইব না।”

আলাদীনের মাতা পুত্রের কথার উত্তর করিল না। আলাদীন বৃদ্ধি, তাহার মাতা তাহার কথা বিশ্বাস করিয়াছে, সুতরাং সে দৃষ্টান্তে বলিল, “হা, তুমি কিন্তু আমার প্রতীপসম্বন্ধে কোন কথা হুলতানের নিকট প্রকাশ করিও না।”

সমস্ত রাত্রি উৎকণ্ঠায় বৃদ্ধার নিদ্রা হইল না, পরদিন প্রভাতে আলাদীনের মাতা শয্যাভ্যাগ করিয়া উৎকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া রাজদরবারে হুলতানের সহিত সাক্ষাৎ প্রাপ্তি করিল।

দরবারস্থলে উপস্থিত হইয়া আলাদীনের জননী সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু রাজকাহ্না হুলতানকে ব্যস্ত দেখিয়া সে তাঁহার নিকটস্থ হইবার চেষ্টা করিল না। হুলতানের কার্য্য শেষ হইলে

প্রতীপের
আশ্চর্য্য
শক্তিতে
অসম্ভব সম্ভব



দরবারভঙ্গ হইল, কৰ্মচারিগণ দরবার পরিত্যাগ করিলেন, এবং হুলতানও দরবার-গৃহ হইতে বাস কামরায় প্রবেশ করিলেন। আলাদীনের জননী হীরকরগুলি যে ভাবে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল, তাহা লইয়া সেই ভাবেই গৃহে কিরিয়া আসিল।

মাতাকে হীরকপূর্ণ খালা লইয়া কিরিয়া আসিতে দেখিয়া আলাদীনের মনে অত্যন্ত ভয় ও দৃষ্টিভ্রান্ত সঞ্চার হইল। আলাদীন মাতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহার জননী বলিল, “বৎস, হুলতান আমাকে দেখিয়াছেন, কিন্তু তিনি রাজকাৰ্য্যে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, আমি তাঁহাকে উপহার প্রদানের সুযোগ পাই নাই, তাহার পর হঠাৎ দরবার ভঙ্গ হওয়ায় তিনি উঠিয়া খাণ কামরায় প্রস্থান করিলেন, হুতরাং আজ আর কোন কথা হইল না। আমি আবার কল্য যাইব। হয় ত’ কাল তাহার অবসর হইতে পারে।” মাতার কথা শুনিয়া আলাদীনের দৃষ্টিভ্রান্ত কথঞ্চিৎ দূর হইল।

পরদিন প্রত্যহ্নে বৃদ্ধা পুনর্বার দরবারে যাত্রা করিল, কিন্তু দরবার-গৃহের দ্বারদেশ হইতেই তাহাকে কিরিয়া আসিতে হইল, পরদিন দ্বার বন্ধ ছিল, অগ্রসরিগণের নিকট বৃদ্ধা ইহার কারণ অনুশন্ধানে জানিল, উপগুপ্তির ছই দিন দরবার বসে না। এইরূপে বৃদ্ধা ক্রমাগত ছয়বার দরবারে উপস্থিত হইল; হুলতান প্রত্যহ্নে তাহাকে দেখিতে পাইতেন, কিন্তু বৃদ্ধা কোন দিন হুলতানের নিকট উপহার প্রদানের সুযোগ পাইল না। প্রত্যহ্নে সে বিফলমনোরথ হইয়া কিরিয়া আসিতে লাগিল। আলাদীনের ধৈর্য্য বিলুপ্ত হইল।

এক দিন দরবারভঙ্গে হুলতান খাণ কামরায় উপস্থিত হইয়া, তাহার প্রধান উজীরকে বলিলেন, “দেখ উজীর, কয়দিন হইতে দেখিতেছি, একটা স্ত্রীলোক আমার দরবারে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; কেন আসে, তাহার কি উদ্দেশ্য, কিছুই প্রকাশ করে না; কিন্তু তাহার হাতে কাপড়ে জড়ান কোন দ্রব্য আছে, তাহা আমি লক্ষ্য করিয়াছি; আমার বোধ হয়, সে তাহার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণের জন্তই প্রকাশ-স্থলে আসিয়া দাঁড়ায়। সে কি চায়, জান কি?”

উজীর বলিলেন, “জাহাপনা, এ মাগী ভারি হারামজাদি, কেবল পরের নামে নালিশ করে, আমার বোধ হয়, কাহারও কাছে সে মাংস কিনিয়াছিল, মন্দ মাংস হওয়াতে মাংসবিক্রেতার নামে নালিশ করিতে আসিয়াছে, পাত্রসমেত মাংস রুমালে বাঁধিয়া আনিয়াছে। ঠিক ইহা না হইলেও, এই রকম কিছু হইবে।” উজীর নিজের অজ্ঞতা গোপনের অভিপ্রায়েই এইরূপ মত প্রকাশ করিলেন।

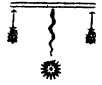
হুলতান উজীরের অনুমানে সন্তুষ্ট না হইয়া বলিলেন, “স্ত্রীলোকটি যদি পুনর্বার দরবারের দিন আসে, তাহা হইলে আমার নিকট তাহাকে উপস্থিত করিবে। আমি তাহার নালিশ শুনিতে ইচ্ছা করি।”

পরে যে দিন দরবার বলিল, সে দিন পুনর্বার আলাদীনের জননী দরবারে উপস্থিত হইল, এবং যথা-স্থানে গিয়া দণ্ডায়মান হইল।

হুলতান তাহাকে দেখিবামাত্র উজীরকে বলিলেন, “উজীর, ঐ দেখ, সেই স্ত্রীলোকটি আসিয়াছে, এখন আমাদের হাতে বিশেষ কাজ নাই, উহাকে ডাকিয়া আন, উহার কি আবশ্যক, শুনা যাক।”—উজীরের আদেশে এক জন কৰ্মচারী আলাদীনের জননীকে লইয়া হুলতানের সমীপে উপস্থিত করিল।

আলাদীনের মাতা হুলতানের সিংহাসন প্রান্তে নিপতিত হইয়া তাঁহার চরণ-বন্দনা করিল। তাহাকে তাহার বস্ত্রব্য বিষয় বলিবার জন্ত আদেশ করিলে, আলাদীনের জননী বিতীয়বার তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া বলিল, “মহাপ্রভাপাশনী হুলতান, আমার অযোগ্য সাহস নার্জ্জন করিতে আদেশ হউক। আমি আপনার নিকট তাহার উল্লেখ করিতেও শক্তি হইতেছি।”

হুলতান-
দরবারে



বিবাহ-
প্রস্তাবনা



হুলতান বলিলেন, “বাছা, তোমার যাঁহা বলিবার আছে, নির্ভয়ে তাহা বলিতে পার, আমি তোমাকে অভয়দান করিতেছি। তুমি যাঁহা বলিবে, তাহা বিশেষ আপত্তিজনক হইলেও তোমার অপরাধ ক্ষমা করা হইবে।”

হুলতানের অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া, আলাদীনের মাতা তাহার পুত্রের প্রস্তাব ধীরে ধীরে হুলতানের গোচর করিল; আলাদীন কিরূপে হুলতানদ্বারা বদরুল বদরকে দেখিয়াছিল, তাঁহাকে দেখিবার পর হইতে আলাদীনের মনে কিরূপ চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইয়াছে, এবং সে তাহার পুত্রকে এই প্রকার ধূর্ততাপূর্ণ সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াছে ও তাহার কি কল হইয়াছে, তাহা সমস্তই যথাযথভাবে বর্ণনা করিল এবং পুত্র আলাদীনের জন্ত হুলতানের মার্জনাভিক্ষাও করিল।

হুলতান আলাদীনের জননীকে সকল কথা ধীরভাবে শ্রবণ করিলেন, তিনি বিস্ময়ভ্রষ্ট ও ক্রোধ বা শিরাগ প্রকাশ করিলেন না। বৃদ্ধার কথার কোন উত্তর না দিয়া, হুলতান তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার কাপড়ের কি বাঁধা আছে?” আলাদীনের জননী হীরক-রত্নাদি পূর্ণ পাত্রি হুলতানের সিংহাসনের নীচে রাখিয়া, আবরণবস্ত্রখানি উন্মোচন করিল, তাহার পর পাত্রি অনাবৃতভাবে হুলতানের সম্মুখে ধিল। হুলতান সেই সকল সূর্যহং সমুজ্জ্বল হৃদয় হীরক-রত্নগুলি দেখিয়া, কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিলেন, এমন উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য রত্ন তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই। অনেকক্ষণ পর্যন্ত তিনি সেই সকল রত্ন পরীক্ষা করিয়া পাত্রি আলাদীনের মাতার হস্ত হইতে গ্রহণ করিলেন, এবং হর্ষে আশ্চর্যবিশ্বৃত হইয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, “কি হৃদয়! অমূল্য রত্নযাজি!” এক একখানি রত্ন, এক একটী হীরক হাতে তুলিয়া লইয়া, তাহার প্রশংসা করিলেন, তাহার পর তিনি উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “উজীর, এমন অদ্ভুত অমূল্য রত্ন তুমি আর কখনও দেখিয়াছ কি? যে ব্যক্তি এমন অমূল্য দ্রব্য পাঠাইতে পারে, তাহার ঐশ্বর্য কিরূপ অতুলনীয়, তাহা সহজেই বুঝিতে পার; আমার বিবেচনায় সে ব্যক্তি হুলতান-চরিত্রের পাণিগ্রহণের অযোগ্য নহে।”

রত্নপ্রদান
আশ্চর্যবিশ্বৃত



হুলতানের এই কথা শুনিয়া উজীর মহা চিত্তিত হইয়া পড়িলেন, কারণ, উজীরের একমাত্র পুত্রের সহিত হুলতান তাঁহার কন্যার বিবাহ দিবেন, পূর্বে এরূপ সম্ভাবনা জানাইয়াছিলেন। হুলতানের কথা শুনিয়া উজীর যৎপরোনাস্তি বিমর্ষ হইলেন, এবং অত্যন্ত দুঃখিতভাবে বলিলেন, “এই হীরকরত্নগুলি যে অতি উৎকৃষ্ট এবং বহুমূল্য, সে সন্দেহে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না; কিন্তু এই বিবাহ স্থির করিবার পূর্বে আমি হুলতানের নিকট তিন মাস সময় প্রার্থনা করিতেছি। ইতিপূর্বে হুলতান আমার পুত্রকে জামাতারূপে গ্রহণ করিবেন, এরূপ আশা প্রদান করিয়াছিলেন। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, আমার পুত্র তিন মাসের মধ্যে ইহা অপেক্ষাও বহুগুণে উৎকৃষ্ট হীরক-রত্ন হুলতানকে উপহার প্রদান করিতে সক্ষম হইবে। আলাদীনের জ্ঞান অজ্ঞাত-কুল-শীল সামান্য ব্যক্তি যাঁহা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছে, তাঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দ্রব্য সংগ্রহ করা হুলতানের উজীরপুত্রের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।” হুলতান যদিও মনে মনে বুঝিলেন, তাঁহার উজীর-পুত্রের পক্ষে এরূপ সামগ্রী সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না, তথাপি তিনি আলাদীনের জননীকে বলিলেন, “ভদ্রে, আমার কন্যার বিবাহের জন্ত যে সকল অলঙ্কারাদির আবশ্যক ও বিবাহের জন্ত যে সকল আয়োজন করিতে হইবে, তাহা তিন মাসের পূর্বে হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তিন মাস পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে।”

তিন মাস পরে
বিবাহ-আশা



আলাদীনের জননী যে স্থলতানের নিকট এগুপ আশ্রয় পাইবে, তাহা সে একবারও কল্পনা করে নাই, সুতরাং সে অত্যন্ত প্রহরচিত্তে স্থলতানের দরবারগৃহে হইতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল, এবং আলাদীনকে সকল কথা আত্মোপাস্ত জানাইল। আলাদীনও এতখানি অস্বস্থ উত্তরে প্রত্যাশা করে নাই, সে আপনাকে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী বলিয়া মনে করিতে লাগিল, এবং অত্যন্ত অধীরচিত্তে তিন মাসকাল প্রতীক্ষা করিতে প্রস্তুত হইল। সে বুলিল, স্থলতান আর কোনমতেই তাঁহার অভিপ্রায় পরিবর্তন করিবেন না।

এই ভাবে দুই মাস কাটিয়া গেল। তৃতীয় মাসের এক দিন সন্ধ্যাকালে আলাদীনের মাতা গৃহে দীপ প্রজ্জ্বলিত করিতে বাইয়া দেখিল, তৈল নাই; সে বাজারে তৈল আনিতে গিয়া শুনিল, উজীর-পুত্রের সহিত স্থলতানের কন্ডার সেই রাত্রিতে বিবাহ হইবে। চরুকির আয়োজন দেখিয়াও তাহার সেইরূপ অস্থান হইল। আলাদীনের মাতা উচ্ছ্বাসে বাড়ী আসিয়া আলাদীনকে সেই সংবাদ জ্ঞাত করিল। আলাদীন রাগে ও বিস্ময়ে কিয়ৎকাল তরু থাকিয়া বলিল, “স্থলতান সহসা তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এ ভাবে কন্ডার বিবাহ দিতেছেন?” আলাদীনের মাতা বলিল, “আজ সন্ধ্যার পরেই বিবাহ, তাহাতে বিস্ময় সন্দেহ নাই; বাজারের সকল লোকের মুখেই এই কথা শুনিয়া আসিলাম।”

আলাদীন কিয়ৎকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া কিংকর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। সহসা অস্তুত প্রদীপের কথা তাহার মনে পড়িল। স্থলতান, উজীর ও উজীরপুত্রের উপর তাহার মনে মহা ক্রোধের সঞ্চার হইল, সে তাহার মাতাকে বলিল, “মা, পৃথিবীর সকল লোকও বলিলে আজ রাত্রে এ বিবাহ কোনমতে স্বসম্পূর্ণ হইতে পারিবে না; তুমি খাবার প্রস্তুত কর, আমি আমার ঘর হইতে আসিতেছি।”

শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া আলাদীন তাহার প্রদীপ বাহির করিল, এবং ঘর্ষণমাত্র সেই বিস্কটিকা দৈত্য তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আমি প্রদীপের দাস, প্রদীপ বাহার কাছে থাকে, তাহার দাস; আপনি আমাকে কি করিতে বলেন?” আলাদীন বলিল, “এ পর্য্যন্ত আমি কেবল তোমার নিকট অহাষি-দ্রবাই চাহিয়াছি, এখন তাহা অপেক্ষা কোন গুরুতর কাজ তোমাকে করিতে হইবে। আমি স্থলতানের নিকটে তাঁহার কন্ডাকে বিবাহ করিবার প্রার্থনা জানাইয়াছিলাম, স্থলতা- আমার প্রস্তাবে সন্মত হইয়া আমাকে তিন মাস অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ শুনিতেছি, উজীরপুত্রের সহিত আজ রাত্রেই স্থলতান-কন্ডার বিবাহ হইবে। তোমাকে আদেশ করিতেছি, বর ও ক’নে একত্র হইবামাত্র, তাহাদিগকে শয্যার সহিত আমার নিকটে উপস্থিত করিবে।” দৈত্য বলিল, “আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আর কোন আদেশ আছে কি?” আলাদীন বলিল, “আপাততঃ আর কিছু আবশ্যক নাই।” দৈত্য তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইল।

অনন্তর আলাদীন তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া, নিশ্চিন্তমনে আহ্বারাদি শেষ করিল; তাহার পর দৈত্যের প্রত্যাশায় বসিয়া রহিল।

সন্ধ্যা অতীত হইয়া গেল, বিবাহকক্ষে উজীরপুত্র কন্ডার পাশে আনীত হইল, তাহার পর স্থলতান-মহিষী কন্ডাকে আলিঙ্গন করিয়া, সহচরীগণের সহিত সেই কক্ষ হইতে বিদায়গ্রহণ করিলেন; দাসীগণ বাহির হইতে কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। দ্বার রুদ্ধ হইবার অতি অল্পকাল পরেই দৈত্য বিমুগ্ধ ভৃত্যের দ্বারা আলাদীনের আদেশে বর-কনেকে তাহাদের শয্যার সহিত শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া আসিল। আলাদীন দৈত্যকে দেখিয়া বলিল, “এই বরকে দেউড়ীর কুঁহুরীতে বন্ধ করিয়া রাখ, প্রভাতকালে পুনর্বার ইহাদিগকে লইয়া যাইবে।” দৈত্য তৎক্ষণাৎ উজীরপুত্রকে তাহার শয্যার সহিত বাঁধিয়া, দেউড়ীর একটি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল, উজীরপুত্র প্রাণভয়ে কোন কথা বলিল না, কেবল বসিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মতপরিবর্তনের



শূল-পথে
নব-দম্পতি
চালান



সুলতান-কন্ডাকে নিজের কক্ষে একাকী দেখিয়া আলাদীন বলিল, “রাজকন্ডা, তুমি কিছুমাত্র ভয় করিও না, তুমি এখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ আছ, তোমার প্রতি আমার যতই অহুস্রাণ ও আশঙ্কি থাক, তোমার সম্মানে কিছুমাত্র আঘাত লাগিবে না, বাধা হইয়া আমি তোমাকে একটি অপদার্থের হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্ত লইয়া আসিয়াছি। তোমার পিতা সুলতান আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা ভঙ্গ না করিলে আমি কখন এক্ষণ কার্য্য করিতাম না।”

তরবারি-
ব্যবধানে
প্রথম মিলন



সুলতানকন্ডা আলাদীনের কথার কোন উত্তর করিতে পারিলেন না, এই অনৈসর্গিক ব্যাপারে অত্যন্ত ভীত হইয়া, নির্বাকভাবে কাঁপিতে লাগিলেন। আলাদীন রাজকন্ডার পাশে একখানি তরবারি রাখিয়া, সেই তরবারির অপর পাশে শয়ন করিল। পরদিন প্রভাতে দৈত্য আলাদীনের নিকট উপস্থিত হইলে, আলাদীন



তাহাকে আদেশ করিল, “উজীরপুত্র ও রাজকন্ডাকে যেখান হইতে আনিয়াছিলে, সেই স্থানে সেই ভাবে রাখিয়া এসো।” তরবারিখানি শব্দা হইতে তুলিয়া লইবামাত্র, দৈত্য আলাদীনের আদেশ পালন করিল। কিন্তু রাজকন্ডা বা উজীরপুত্র দৈত্যকে দেখিতে পাইলেন না, আলাদীনের সহিত দৈত্যের যে কথা হইয়াছিল, তাহাও তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল না, স্ততঃ কিছুই বুঝিতে না পারিলেও ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহারা স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন।

প্রমিকা-
প্রবেশ

দৈত্য উজীরপুত্র ও রাজকন্ডাকে রাজ-প্রাসাদে রাখিয়া আদিবার অল্পকাল পরেই সুলতান তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন; তিনি দেখিলেন, তাহার কন্ডার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, ভয়ে সর্দ-শরীর কাঁপিতেছে, নেন কোন গভীর চক্ষে দেহ ও মন অবসন্ন। সুলতান কন্ডার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। উজীরপুত্র সুলতানের আগমনমাত্রেই বিচলিত হইয়া, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সুলতান কন্ডার চক্ষেয় কারণ জানিবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কন্ডা নীরব; পিতার কোন কথায় তিনি উত্তর করিলেন না। সুলতান কিছুই বুঝিতে না পারিয়া মহিষীর নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং কন্ডার ভাবপরিবর্তনের কথা বলিলেন। মহিষী বলিলেন, “সুলতান, আপনি ইহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা করিবেন না, সকল বানিকাই বিবাহের পর এইরূপ বিবর্ত হইয়া থাকে। দুই তিন দিনের মধ্যেই

আপনি ইহার পরিবর্তন দেখিতে পাইবেন। আমি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছি, আমার বিশ্বাস আছে, সে কখনও আমার নিকট এরূপ উল্লানত প্রকাশ করিবে না।”

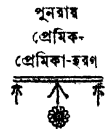
স্বলতানমহিলা কস্তার কক্ষে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু আশ্চর্যকর বিষয় এই যে, মহিলা কস্তার নিকট হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না, কস্তা মাতাকে দেখিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন মহিলা কস্তাকে তাহার চুখকাহিনী বলিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ অহরোধ করিলেন। অনেকবার অহরোধের পর রাজকস্তা বলিলেন, “না, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, আপনার প্রতি অন্তর্ভুক্তি দেখাইবার আমার ইচ্ছা কিঞ্চিৎ কোন কারণে নাই, কাল রাত্রি হইতে এমন সকল অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিতেছে যে, আমি তাহাতে ভীত ও বিম্বল হইয়া পড়িয়াছি, কোন প্রকারে আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছি না।” স্বলতান-দুহিতা সবিস্ময়ে তাহার ভয়ের কারণে মাতার নিকট বিবৃত করিলেন। দুহিতার নিকট সকল কথা শুনিয়া, মহিলা কিয়ৎকাল মৌনবতী রহিলেন, তিনি কোন কথা বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি বলিলেন, “না, এ সকল অসম্ভব কথা স্বলতানের নিকট প্রকাশ না করিয়া, তুমি অতি উত্তম কাছ করিয়াছ, তুমি অল্প কাহারও নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করিও না, প্রকাশ করিলেও, কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না, তোমাকে পাগল মনে করিবে।” স্বলতান-মহিলা উজীরপুত্রকে দাসী দ্বারা আহ্বান করাইয়া, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিও কি আমার কস্তার স্তায় কোন অসম্ভব ঘটনা দেখিয়াছ?” উজীরপুত্র বলিল, “আপনি কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, যাহা কেহ কখনও বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহা শুনিয়া লাভ কি?” স্বলতানমহিলা বলিলেন, “আর তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, তোমার কথা বুঝিয়াছি।”

সমস্ত দিন ধরিয়া প্রাসাদে উৎসব চলিল, স্বলতান তাহার কস্তার মনে হর্ষোৎপাদনের জন্ত যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উজীরপুত্রের স্তায় একটু একটু করিয়া ক্রমিতে লাগিল, রাত্রি ও প্রভাতের অদ্ভুত ঘটনা বরাবর গিয়াই তাহার প্রতীক্ষমান হইল।

প্রাসাদে কি হইতেছে না হইতেছে, সে সংবাদ আলাদীন যথানিয়মে পাইতে লাগিল। সে বৃষ্ণিল, স্বলতানকস্তা ও উজীরপুত্র ভয় পাইয়া থাকিলেও, তাহার। একান্ত শয়ন করিবে। রাত্রে তাহার। ঘাটতে স্নানভাবে নিজা বাইতে না পারে, সে জন্ত আলাদীন পুনরায় তাহার প্রদীপের শরণ লইল। পূর্ববৎ দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, আলাদীন আদেশ করিল, “উজীরপুত্র ও স্বলতানকস্তা আজ পুনরায় একত্র শয়ন করিবে, শয়নমাত্র পূর্ববৎ তাহাদিগকে এখানে লইয়া আসিবে।”

যথাসময়ে দৈত্য আলাদীনের গৃহে উজীরপুত্র ও রাজকস্তাকে লইয়া উপস্থিত হইল। আলাদীন পূর্বরূপে তাহাদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, এবারও তাহাই করিল। পরদিন প্রভাতে প্রাসাদকক্ষে দৈত্য স্বলতান-দুহিতা ও উজীরপুত্রকে রাখিয়া আসিল।

উজীরপুত্র এবার পূর্বদিন অপেক্ষা অধিক ভীত হইয়া পড়িল। কস্তার কক্ষে স্বলতান আসিতেছেন শুনিয়া, পাছে নিজের বিম্বল ও ভীতভাবে দ্বারা কোন কথা প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই আশঙ্কায় উজীরপুত্র কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। স্বলতান পূর্বদিনের স্তায় দুহিতাকে অনেক আগ্রহের কথা বলিলেন, কিন্তু কস্তা নীরবে অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিল; তাহার চুখ ও ভয় যে পূর্ণাপেক্ষা অধিক হইয়াছে, স্বলতান তাহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু কস্তা নিরস্তর, নির্লাক। অবশেষে স্বলতান ক্রোধে উদ্ভগপ্রায় হইয়া তরবারি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, “তুই এখনই আমাকে তোর চুখের কথা খুলিয়া বল, নতুবা তরবারির এক আঘাতে তোর মস্তকচ্ছেদন করিব।”



সুলতান-ছহিতা পিতার কথা শুনিয়া, ভয়ে অভিভূত হইলেন, এবং অশ্রুবর্ণ করিতে করিতে বিনয়-নম্র-বচনে পিতাকে বলিলেন, “বাবা, আমার দুঃখের কথা শুনিলে, আমার প্রতি ক্রোধের পরিবর্তে কৰুণায় আগনার ছায়া বিগলিত হইবে। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন।” সুলতান বলিলেন, “তবে সকল কথা অবিলম্বে শুনিয়া বল।” সুলতান-ছহিতা তাঁহার দুঃখ ও ভয়ের সকল কথা সুলতানের কর্ণগোচর করিলেন। অবশেষে বলিলেন, “আপনি যদি আমার কথা বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে উজীরপুত্রকে এ সম্বন্ধে প্রেরণ করিলে, তিনি আপনার সম্বন্ধে দূর করিবেন।”

কস্তুর কথা শুনিয়া সুলতানের মনে বিস্ময়ের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন, “তুমি কাল কেন এ সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করিলেন না? আমি তোমাকে স্বামী করিবার জন্যই তোমার বিবাহ দিয়াছি, তোমাকে অস্বামী করা আমার ইচ্ছা নহে। তোমার স্বামী সকল বিষয়েই তোমার যোগ্য। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, বাহাতে এরূপ ঘটনা না ঘটতে পায়, তাহা আমি করিব, তুমি ক্ষোভ ও ভয় তাগ করিয়া মন স্থির কর।”

সুলতান প্রাণদে প্রত্যাবর্তন করিয়া উজীরকে তাঁহার পুত্রের নিকট প্রেরণ করিলেন, কস্তুর কথা সত্য কি না, তাহা জানিবার জন্য সুলতানের বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল।

উজীর তাঁহার পুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “রাত্রে কিরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর, কোন কথা গোপন করিবার আবশ্যক নাই।” উজীরপুত্র পিতার নিকট সকল কথাই প্রকাশ করিল, নিজের দুঃখ, বিপদ, দুষ্টিতার কথাও বলিতে ভুলিল না। এ ভাবে আর দু’রাত্রি অভিবাহিত করিলেই যে তাহার প্রাণের আশাও পরিত্যাগ করিতে হইবে, অভাব বিবাহ-বন্ধন-ছেদনই প্রার্থনীয়, তাহাও জানাইল। উজীর সকল কথা শুনিয়া প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, ইহা ইচ্ছা, স্বপ্ন, না সত্য, তাহা কোন ক্রমে বুঝিতে পারিলেন না, অবশেষে বলিলেন, “পুত্র, বাহাই হউক, আর তোমার ভয় নাই, তোমার সকল দুঃখ—সকল ভয় শীঘ্রই দূর হইবে। এ দিকে সুলতানের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যদি কোন ফল না হয়, তবে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করা যাইবে, আগে জীবন।”

উজীর সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, পুত্রের নিকট বাহা বাহা শুনিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করিলেন। অবশেষে বলিলেন, “জাঁহাপনা, দেখিতেছি, আপনার কস্তুর মনে নিদারুণ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছে। আপনি আমার পুত্রকে প্রাণাধ ভাগ্য করিয়া, আমার ভবনে গমন করিবার অহমতি প্রদান করুন। তাহার জন্য যে সুলতান-ছহিতা কষ্টভোগ করিবেন, ইহা কখনও সঙ্গত নহে।”

সুলতান উজীরের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন। রাজধানীতে যে মহোৎসবের আরাধিত হইয়াছিল, তাহা নিবৃত্ত হইল। রাজ্যের কোন দিকে আর উৎসব আনন্দের চিহ্নমাত্র রহিল না, সকলেই দোখিল, উজীরপুত্র উজীরের সহিত অত্যন্ত নিরানন্দমনে গৃহে ফিরিতেছে, কিন্তু কেহই ইহার কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না। আলাদীনই কেবল সকল কথা বুঝিয়া, মনে মনে বড় আনন্দিত হইল। আলাদীন বুঝিল, উজীরপুত্রের সহিত সুলতান-ছহিতার বিবাহ-বন্ধন আর স্থায়ী হইবে না।

নির্দিষ্ট তিন মাসের মধ্যে আলাদীন সুলতানের নিকট আর কোন প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল না। তিন মাস শেষ হইলে সে তাহার মাতাকে সুলতানের নিকট প্রেরণ করিল, আলাদীনের জননী দরবারে উপস্থিত হইয়া, পূর্বে যে স্থানে দণ্ডায়মান হইত, তিন মাস পরে ঠিক সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইল। সুলতান তাহাকে দেখিবার চিন্তিত পারিলেন। তিনি উজীরকে বলিলেন, “উজীর, যে রমণীট আমাকে দ্রুতপা হীরক-রত্নরাজি উপহার প্রদান করিয়াছিল, তাহাকে দেখিতেছি, উহাকে আমার নিকটে আন্বান কর।”



উজীর স্থলতানের আদেশে আগাধীনের মাতাকে তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন, বৃদ্ধা রাজসিংহাসন-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া ধাবাধি চরণ-বন্দনা করিয়া বলিল, “জঁহাপনা, আপনি আমার পুত্র আগাধীনকে তিন মাস অপেক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন, তিন মাস অতীত হইয়াছে; তাই আপনার মতামত জানিবার জন্য আপনার সিংহাসন-প্রান্তে সমাগত হইয়াছি।”

আগাধীনের ভ্রাতৃ অবস্থাপন ও হীনবংশীয় ব্যক্তির সহিত স্থলতান কখনও কস্তার বিবাহ দিবে, ইহা একবারও মনে করিতে পারেন নাই। স্তবরাং বৃদ্ধার আবেদনে স্থলতানকে কিঞ্চিৎ বিরত হইয়া পড়িতে হইল। তিনি প্রকাজ্ঞতঃ কোন জবাব দিতে পারিলেন না; তথাপি তিনি উজীরকে আশ্বাস করিয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন।

উজীর বলিলেন, “জঁহাপনা, ঐ ছোটলোকের ছেলের সহিত কখনও রাজকস্তার বিবাহ হইতে পারে না। আপনি অনায়াসেই বিবাহ-প্রস্তাব রহিত করিতে পারেন, তাহার ধনাগারে বত হীরকরত্ন আছে, তাহা একত্র করিলেও রাজকস্তার মূল্য হইতে পারে না। আগাধীনের নিকট অত্যন্ত অধিক পরিমাণে হীরকরত্নের দাবী করিলেই যে স্থলতান-ভ্রাতার পাণিগ্রহণের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিবে।”

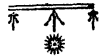
স্থলতান উজীরের পরামর্শ শ্রেয় জ্ঞান করিয়া আগাধীনের মাতাকে বলিলেন, “তোমার পুত্র আমার কস্তার প্রতিপালনে সমর্থ কি না, তাহার কোন পরিচয় জানি না। বাহা হউক, যদি সে অবিলম্বে চলিশ গামলা-পূর্ণ পূর্ববৎ উৎকৃষ্ট হীরক-রত্ন চলিশ জন কৃষ্ণবর্ণ দাসের মন্তকে দিয়া আমাকে উপহার পাঠাইতে পারে, তাহা হইলে আমি তাহার প্রস্তাবে সন্মত হইতে পারি। ভদ্রে, তুমি গৃহে কিরিয়া তোমার পুত্রকে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত কর। আমার আদেশ পালন করিলে তুমি সন্ত উত্তর পাইবে।”

আগাধীনের মাতা সিংহাসন-প্রান্তে দেহ প্রসারিত করিয়া, স্থলতানের চরণবন্দনা করিয়া গৃহে গমন করিল। সে আগাধীনের নিকট স্থলতানের সকল অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিল, “বাবা আগাধীন, তুমি রাজকস্তাকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। স্থলতান আমাকে বিশেষ আদর করেন, তোমার প্রতিও তাঁহার বিরাগ নাই, কিন্তু উজীর তাঁহাকে অঙ্গপথে লইয়া যাত্রা করিতেছেন। উজীরের সহিত পরামর্শ করিয়াই তিনি আবার তোমার নিকট চলিশ গামলাপূর্ণ হীরক-রত্ন চাহিয়াছেন, এগুলি পূর্বের মত উৎকৃষ্ট হওয়া আবশ্যিক। এমন কাজ তুমি করিতেও পারিবে না, স্থলতানের কস্তাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না।”

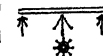
আগাধীন হাসিয়া বলিল, “মা, তুমি কিছু ভয় করিও না, আমি ভাবিয়াছিলাম, স্থলতান আমার নিকট আরও কোন অধিক মূল্যবান দ্রব্য চাহিবেন, তাহাতেও আমার আপত্তি ছিল না, আমি রাজকস্তাকে লাভ করিবার জন্য অসাধ্যসাধন করিতেও প্রস্তুত আছি। তিনি বাহা চাহিয়াছেন, আমি সন্ত-চিন্তে তাহা প্রদান করিব। তুমি এখন খাণ্ডস্রবের আয়োজন কর, বড় সূখা হইয়াছে!”

আগাধীনের মাতা খাণ্ডস্রবের সন্ধানে বাজারে চলিল, ইত্যবসরে আগাধীন প্রদীপটি বাহির করিয়া তাহা ধ্বংস করিল, অবিলম্বে দৈত্যের আবির্ভাব হইল। আগাধীন তাহাকে বলিল, “স্থলতান আমার হস্তে তাঁহার কস্তা দান করিবার পূর্বে চলিশ স্বর্ণ-গামলাপূর্ণ হীরকরত্ন চাহেন, আমি যে বাগান হইতে তোমার মনিব প্রদীপটিকে সংগ্রহ করিয়াছি, সেই বাগানের বৃক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া অবিলম্বে চলিশটি স্বর্ণপাত্র পূর্ণ কর। কেবল রত্নরাশি নহে, চলিশটি সুন্দরী খেতাবিনী দাসীও পাঠাইব। কৃষ্ণবর্ণ দাসেরা স্বর্ণ-গামলাগুলি বহন করিয়া চলিবে, সুসজ্জিতা খেতাবিনী দাসীগণ তাহাদের অগ্রে অগ্রে যাইবে।”

স্থলতানের
অসমত
আবগার



হীরকরত্ন ও
সুন্দরী-বহন
উপহার



আলাদীনের আদেশমাত্র দৈত্য তাহার সমুখ হইতে অন্তহিত হইয়া অন্নকালনমোই চলিষ গামলাপূর্ণ হীরকরত্ন ও চলিষটি কুব্জবর্ণ দাস এবং চলিষটি ষোড়শিনী স্ত্রীচাক্ৰহাসিনী দাসী লইয়া আসিল। গামলাগুলির উপর রৌপ্যহস্তনিষ্ঠ বিচিত্র আভরণ বস, তাহাতে স্ববর্ণহস্তের অপূৰ্ণ কারুকাৰ্য্য, স্ববর্ণের কুল। দাসেরা আলাদীনের গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। আলাদীন অম্মতি করিলে দৈত্য অন্তহিত হইল।

ইতিমধ্যে আলাদীনের মাতা বাজার হইতে ফিরিয়া আসিল, এতগুলি লোককে একত্র দেখিয়া সে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। আলাদীন বলিল, “মা, তুমি কাল প্রত্যুষেই স্নানতানের নিকট যাও, তাঁহাকে এই সকল দ্রব্য প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট বল, আমি তাঁহার কন্ডাকে বিবাহের জন্য বিশেষ উৎসব করিয়াছি, তিনি এখন কি বলেন, তাহা শুনিয়া আসিবে।”

আমি জন দাসদাসী ও চলিষখানি স্বর্ণ-গামলা-পূর্ণ রত্নরাজি উপহার সঙ্গে লইয়া, পরদিন প্রভাতে আলাদীনের মাতা রাজপ্রাসাদভিমুখে যাত্রা করিল। এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া রাজপথের সকল লোক বিস্মিত হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিল। সূর্য্যর দাসীগণের রূপে ও পরিচ্ছদশোভায় সকলেই মুগ্ধ হইল।

সন্ধ্যায় আলাদীনের মাতা চলিতে লাগিল। সে স্নানতানের দরবারে উপস্থিত হইয়া, তুমি স্পর্শ করিয়া স্নানতানকে অভিবাদন করিল। স্নানতান আলাদীনের প্রেরিত উপহারদ্রব্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন। ষোড়শিনী দাসীদিগের সৌন্দর্য্য দর্শনেও তিনি অভিভূত হইলেন। তিনি এই সকল দ্রব্যের শতসুখে প্রশংসা করিয়া উজীরকে বলিলেন, “উজীর, যে ব্যক্তি এই সকল দ্রব্য উপহার পাঠাইতে পারে, তাহার সম্বন্ধে তোমার কিরূপ ধারণা? সে ব্যক্তি কি আমার কন্ডাকে বিবাহ করিবার অঙ্গবস্ত্র?”

উজীর স্নানতানকে বলিলেন, “জাঁহাপনা, এই সকল দ্রব্যের কোনক্রমেই নিন্দা করা যাইতে পারে না, স্নানতানস্বহিতা পৃথিবীর যাবতীয় ধনরত্ন অপেক্ষাও মূল্যবান, কিন্তু আলাদীন আপনাদের নিকট যে সকল হীরকরত্ন প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার সহিত পৃথিবীর কোন দ্রব্যের তুলনা হইতে পারে না, স্নানতান আলাদীন আপনাদের কন্ডাকে বিবাহ করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?” দরবারস্থ সকল লোক উজীরের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বিস্মিত একবাক্যে ইহার অম্মোদন করিল। স্নানতান আর ইতস্ততঃ করিতে পারিলেন না, তাঁহার জামাতা হইবার আলাদীনের অঙ্গ কোন প্রকার যোগ্যতা আছে কি না, এ প্রশ্নও তাঁহার মনে উঠিল না। এই অমূল্য হীরকরত্নের স্তূপ দেখিয়া তিনি বৃষ্ণিলেন, আলাদীন তাঁহার কন্ডার যোগ্য বর। তিনি উপহাররাজি পাইয়া নিরতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া, আলাদীনের জননীকে বলিলেন, “ভগ্নে, তুমি যাও, তোমার পুত্রকে বল, আমি তাহাকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিবার জন্য বসিয়া আছি, যত শীঘ্র সম্ভব, আমি তাহার হস্তে আমার কন্ডা সম্ভবদান করিব।”

আলাদীনের মাতা রাজসভা পরিভ্রমণ করিলে স্নানতান সভাভঙ্গ করিলেন। আলাদীনের মাতা গৃহে ফিরিয়া পুত্রের নিকট স্নানতান জ্ঞাপন করিল; বলিল, “স্নানতান তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তুমি শীঘ্র উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া তাঁহার নিকট যাও।”

আলাদীন এই কথা শুনিয়া দ্রুতপদে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহার পর প্রদীপ লইয়া ঘরিতেই সেই দৈত্য তাহার সমুখে উপস্থিত হইল। আলাদীন দৈত্যকে বলিল, “আমি স্নানতানের রাজসভায় যাইব, আমাকে শীঘ্র কোন সানাগার হইতে স্নান করাইয়া আনি, এবং স্নানশেষে আমাকে একটি অত্যুৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ আনিয়া দাও,—যাহার মত পরিচ্ছদ কোন দেশের কোন স্নানতান, সম্রাটেরই নাই।” দৈত্য তৎক্ষণাৎ অদ্ভুতভাবে আলাদীনকে একটি অতি উৎকৃষ্ট সানাগারে লইয়া চলিল, স্নান করিতে করিতে আলাদীনের

উপহার-

বাচিনীর

শোভাবাত্রা



রাজকীয়

প্রসাধন



দেহ নির্মল, বর্ণ উজ্জ্বল, এবং মুখভাব মাধুর্যমণ্ডিত হইয়া উঠিল। আগাদীন যে স্থানে বস্ত্রাদি খুলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, দানশেষে সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার বস্ত্রাদির পরিবর্তে একটি বহু-মূল্যবান, অতি চিত্রিত, সুদৃশ্য, অপূর্ণপূর্ণ পরিচ্ছদ নিপতিত রহিয়াছে। দৈত্যের সাহায্যে আগাদীন তাহাতে সজ্জিত হইল, তাহার পর দৈত্যকে বলিল, “আমাকে এখন একটা অতি উৎকৃষ্ট অশ্ব আনিয়া দাও; এমন অশ্ব হইবে যে, সুলতানের আন্তাবলে তেমন অশ্ব একটিও নাই; তাহার সাজের মূল্যই মেন দশ লক্ষ মুদ্রা হয়। আর আমি তোমার কাছে চল্লিশ জন ভৃত্য চাই, বিশ জন বহুমূল্য বিবিধ উপহার লইয়া আমার অগ্রে চলিবে, বিশ জন পশ্চাতে আসিবে। ছয় জন দাসী আমার জননীর স্ত্রী দিবে, তাহাদের পরিচ্ছদ সুলতান-হুহিতার পরিচ্ছদের মত উৎকৃষ্ট হইবে। এতদ্বির আমি দশসহস্র চাই; ইহা বাতীত আশাততঃ আমার আর কোন আদেশ নাই, আমার এই আদেশগুলি শীঘ্র পালন কর।”

অতি অল্পকালের মধ্যেই দৈত্য চল্লিশ জন দাস, ছয় জন দাসী ও অস্ত্রাশ্রয় উপহারস্বরূপ লইয়া আগাদীনের সমুখে উপস্থিত হইল। দশ সহস্র মোহরপূর্ণ দশটি তোড়ার মধ্যে চারিটি তোড়া আগাদীন তাহার মাতাকে আবশ্যকীয় বায়নিকীর্ষার্থ প্রদান করিল, দাসী ছয় জনকেও আগাদীন তাহার জননীর হস্তে সমর্পণ করিল।

অনন্তর আগাদীন দৈত্য কর্তৃক আনীত অশ্বে আরোহণ করিয়া, রাজপ্রাসাদান্তিমুখে ধাবিত হইল। আগাদীন ইতিপূর্বে আর কখন অশ্বে আরোহণ করে নাই, কিন্তু দৈত্য কর্তৃক আনীত অশ্বটি এরূপ উৎকৃষ্ট ও সুশিক্ষিত যে, তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আগাদীন কিছুমাত্রও অসুবিধা বোধ করিল না, এমন কি, অতি সুদক্ষ অশ্বারোহিণীও একবার সন্দেহ করিতে পারিত না যে, আগাদীন অশ্বারোহণে অনভিজ্ঞ। রাজপথ লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া উঠিল, আগাদীনের অশ্বের দিকে চাহিয়া কেহ আর দৃষ্টি কিরায়িত পাবিল না। তাহার দেহ অত্যাশ্চর্য হীরকরত্ন ও স্বর্ণালঙ্কারে খচিত। চারিমিকে সকলেই ভুলিতে পাইল, সুলতান আগাদীনকে তাহার কস্তারত্ন সমর্পণ করিবেন; স্ত্রীয়া অনেকেই ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সামান্য পরকীপ্ত আগাদীনের এত সুখ, এত ঈর্ষ্যা দেখিয়া সকলেই বিস্ময়ে ভক্তিত হইল।

আগাদীন মহাসমারোহে রাজদরবারে উপস্থিত হইলে সুলতান আগাদীনের পরিচ্ছদ দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তাহার অশ্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তাহার স্ত্রীর মুখমণ্ডল ও স্নানর অবয়ব, মার্জিত রুচি, মিলিত বাবহার দেখিয়া পুলকিত হইলেন। আগাদীন পদতল চুষন করিবার স্ত্রী যেমন দেহ নত করিবে, এমনই সুলতান সিংহাসনে হইতে অবতরণ করিয়া আগাদীনকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহার হাত ধরিয়া তাহার ও উজীরের মধ্যস্থলে সিংহাসনে বসাইলেন।

সভাসভ হইলে আগাদীনকে লইয়া সুলতান প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। সেখানে সুলতান মহাসমারোহে আগাদীনকে এক ভোজে আপ্যায়িত করিলেন, সেই ভোজনসভায় রাজ্যের প্রধান কর্মচারিগণ স্ব স্ব পদোচ্চিহ্ন হান অধিকার করিয়া বসিলেন। সুলতান আহালাদীনে-শেষে আগাদীনের সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন, আগাদীন অতি বিজ্ঞের স্তায় সুলতানের সহিত গল্প করিতে লাগিল, সুলতান আগাদীনের বিবিধবিষয়ে জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন।

আহারের পর সুলতান কাজীকে আহ্বান করিয়া বিবাহের চুক্তিপত্র লিখিবার আদেশ করিলেন। সুলতান আগাদীনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “আগাদীন, তুমি এখন আমার প্রাসাদেই বাস করিবে, না অশ্ব-কোনরূপ অভ্যপ্রায় করিয়াছ।” আগাদীন বলিল, “জাহাপনা, সুলতানহুহিতার উপস্থিত একটি প্রাসাদ-নির্মাণই আমার অভিপ্রায়; আপনি আপনার প্রাসাদের সম্মুখে একটি স্থান নির্দেশ করিয়া দেন, সেখানে

কল্পনাভীত
সৌভাগ্যের
ঈর্ষ্যা



সুলতানের
সম্বন্ধনা



প্রাসাদ নির্মাণ করিয়া রাজকন্ডার সহিত আমি বাস করিব এবং যথানিয়মে আপনার দরবারে উপস্থিত হইব।
যত শীঘ্র ইহা শেষ হইতে পারে, আমি কোনক্রমে তাহার ক্রটি করিব না।” স্থলতান বলিলেন, “বৎস,
তোমার যে স্থান পছন্দ হয়, তাহাই লইতে পার, আমার প্রাসাদের সমুখে যে স্থানটি রহিয়াছে, সেখানেও
তুমি তোমার বাসভবন নির্মাণ করিতে পার।” অত্যন্ত নানাবিধ কথাবার্তার পর আলাদীন স্থলতানের নিকট
বিদায় গ্রহণ করিল।



স্বর্ণপুত্রী
নির্মাণ

গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া আলাদীন দৈত্যকে আহ্বান করিয়া বলিল, “হে দৈত্যরাজ, এ কাণ পর্যন্ত
আমি তোমার নিকট বাহা বাহা চাহিয়াছি, তাহা সকলই তুমি আমাকে দিয়াছ, এবার আমি তোমার উপরে
একটি গুরুতর কর্ত্তের ভার প্রদান করিব। তোমাকে বিশেষ উৎসাহের সহিত এই কথটি সম্পন্ন করিতে
হইবে। আমি তোমাকে আদেশ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে রাজপ্রাসাদের সমুখে একটি প্রাসাদ আমার
বাসের জন্য নির্মাণ কর। কি উপাদানে তুমি এই প্রাসাদ নির্মাণ করিবে, সে সম্বন্ধে আমি তোমাকে
উপদেশ প্রদান করিব না। আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, প্রাসাদটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইবে,
ইহার মধ্যস্থলে একটি গম্বুজ থাকিবে, দেওয়ালগুলি ক্রমান্বয়ে স্তূপ ও রৌপ্যে নির্মিত হইবে, প্রত্যেক দিকে
ছয়টি করিয়া চব্বিশটি বাতায়ন থাকিবে, বাতায়নদ্বার—কেবল একটি দ্বার বাতীত হীরক-মণিমুক্তা-খচিত
হইবে। প্রাসাদের সমুখে বিস্তীর্ণ আঙ্গিনা ও পশ্চাতে একটি স্তূপ উপবন থাকিবে। যে আস্তাবলটি
নির্মিত হইবে, তাহাও যেন স্তূপশত, স্তূপশত ও সুশোভন হয়, তাহা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অবস্থায় ও পরিচ্ছন্ন
শোভিত অশ্বপালগণে পরিপূর্ণ থাকিবে। রাজকন্ডার পরিচর্য্যার জন্য বহুসংখ্যক দাসীকে এই প্রাসাদে
উপস্থিত রাখিবে, দেখিবে, যেন কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রটি না হয়, যুগিয়া সকল কাঁজ করিবে। যাও, বত
শীঘ্র পার, প্রাসাদ নির্মাণ কর।”

হর্যাস্তকালে আলাদীন দৈত্যকে এই আদেশ প্রদান করিল। পরদিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে
আলাদীনের নিজাভঙ্গ হইবামাত্র দৈত্য তাহার সমুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহাশয়, আপনার প্রাসাদ-
নির্মাণের কার্য শেষ হইয়াছে, আপনি যেরূপ বলিয়াছিলেন, ঠিক তদ্রূপ হইয়াছে কি না, আসিয়া দেখুন।”
আলাদীন তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, অতি উৎকৃষ্ট স্তূপহং সুসজ্জিত প্রাসাদ এক রাত্রির মধ্যেই
রাজপ্রাসাদের সমুখে নির্মিত হইয়া গিয়াছে। আলাদীন দৈত্যকে যেরূপ আদেশ প্রদান করিয়াছিল, তাহা
সম্পূর্ণরূপে প্রতিপালিত হইয়াছে দেখিয়া আলাদীনের আনন্দের সীমা রহিল না। দৈত্য আলাদীনকে সেই
সমুদ্রত স্তূপ দ্বীপের সমুদ্র তীরে তর তর করিয়া দেখাইল। সমস্ত দেখিয়া আলাদীন বলিল, “দৈত্যরাজ,
তোমার কার্য্যনৈপুণ্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইয়াছি, তোমার কার্য্যে নিন্দা করিবার কিছুই নাই,
কেবল একটা কথা পূর্বে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, একখানি অত্যুৎকৃষ্ট মধ্যমলের গাশিচা স্থলতানের প্রাসাদ-
দ্বার হইতে আমার প্রাসাদে রাজকন্ডার কক্ষদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিতে হইবে। রাজকন্ডা এই গাশিচার
উপর দিয়া পিত্তভবন হইতে এখানে পদার্পণ করিবেন।” দৈত্য মুহূর্ত্তমধ্যে আলাদীনের এই আদেশ পালন
করিয়া তাহাকে তাহার প্রাসাদ হইতে গৃহে লইয়া গেল। তখনও স্থলতানের প্রাসাদদ্বার উন্মুক্ত হয় নাই।

দ্বারবানগণ প্রাসাদদ্বার উন্মুক্ত করিয়া প্রথমে সুবিস্তীর্ণ গাশিচা দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইল, তাহার পর
তাহারা স্বয়ং আলাদীনের প্রাসাদ দেখিতে পাইল, তখন তাহারা একেবারে হতভান হইয়া পড়িল। এই
নবনির্মিত প্রাসাদের কথা তৎক্ষণাৎ রাজধানীতে পরিবাক্ত হইয়া পড়িল। উজীর এই নূতন প্রাসাদ দেখিয়া
কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তিনি ক্রতবেগে স্থলতানের সমীপে উপস্থিত হইয়া অদৃষ্টপূর্ব প্রাসাদের কথা

প্রিয়তমার
ভাগ্যমনের
পথ মথন-
আত্মত



বলিলেন, এবং এই প্রাসাদ যে ঐশ্বর্যালোকের ইঙ্গিতপ্রভাবে নির্মিত হইয়াছে, নতুন এক রাত্রির মধ্যে এরূপ প্রাসাদ কোনক্রমে নির্মিত হইতে পারে না, তাহাও স্থলতানকে বলিলেন। স্থলতান বলিলেন, “উজীর, তুমি ইহাকে ঐশ্বর্যালোক ব্যাপার বলিয়া আমাকে বুঝাইবার যত্ন চেষ্টা করিতেছ। ইহা আলাদীনের প্রাসাদ, আলাদীন ইহা নির্মাণ করিবার জন্ত গত কল্য আমার নিকট স্থান প্রার্থনা করিয়াছিল, তাহা ত’ তুমি অবগত আছ। অবশ্য এক রাত্রির মধ্যে ইহা নির্মিত হইয়াছে বলিয়া তুমি বিষয় প্রকাশ করিতে পার, কিন্তু আলাদীন যে কিরূপ ধনবান, তাহা ত’ তোমার অজ্ঞাত নহে, ধনের দ্বারা পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত কার্য সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা ত’ তুমি প্রত্যহ দেখিতে পাও। তথাপি তুমি যে ইহাকে ঐশ্বর্যালোক বলিতেছ, আমি স্পষ্ট বুঝিতেছি, তাহার কারণ, তোমার মনে ঈর্ষার উদ্রেক হইয়াছে।” দরবারের সময় উপস্থিত হওয়ার উজীরের সহিত স্থলতানের আশ্রয় কোন কথা হইল না।



আলাদীন গৃহে ফিরিয়া দৈত্যকে বিদায় করিয়া দিল, তাহার পর মাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “মা, তুমি তোমার দাসীগণকে সঙ্গে লইয়া, সাজ-সজ্জা করিয়া, স্থলতানের প্রাসাদে যাত্রা কর, সন্ধ্যাকালে রাজকন্ডাকে লইয়া তুমি আমার প্রাসাদে বাইবে।” আলাদীনের মাতা দাসীগণে পরিবৃত্ত হইয়া, মহা সমারোহে রাজপ্রাসাদভিত্তিতে যাত্রা করিল। আলাদীনও অর্ধে আনন্দে করিয়া তাহার পিতৃগৃহে পরিভ্রমণ করিয়া নতুন প্রাসাদে যাত্রা করিল। তাহার সঙ্গে নানা প্রকার বাস্তব রাজপথ সজ্জিত করিয়া চলিতে লাগিল। দোকানদারগণ মহোৎসাহে স্ব স্ব দোকান পত্রপুঞ্জে সজ্জিত করিল, যেন নগরমধ্যে মহোৎসব উপস্থিত। নগরবাসিগণ আলাদীনের প্রাসাদ দেখিবার জন্ত দলে দলে তাহার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া, মুক্ত-কণ্ঠে প্রাসাদের প্রশংসা করিতে লাগিল, হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে এত বড় প্রাসাদ কিরূপে নির্মিত হইল, তাহা তাহারা কোনমতে বুঝিতে পারিল না।

আলাদীনের মাতা দাসীগণের সহিত স্থলতান-দুহিতা বদরুল বদরের অন্তরে প্রবেশ করিল। স্থলতান-কন্যা মহা সম্মানের সহিত তাহার সর্ধর্না করিলেন, তাহার জলযোগের জন্ত অতি উৎকৃষ্ট আয়োজন করিয়া দিলেন। স্থলতানও আলাদীনের মাতাকে যথেষ্ট সন্মান ও যত্ন করিলেন। আলাদীন তাহার জননীর প্রতি যেরূপ মনোযোগী ও যত্নপরায়ণ, তাহা দেখিয়া স্থলতান বড় সন্তুষ্ট হইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। স্থলতানদুহিতা পিতার নিকট অক্ষুণ্ণলোচনে বিদায় গ্রহণ করিলেন। আলাদীনের মাতার সহিত তিনি পিতৃপ্রাসাদ পরিভ্রমণ করিয়া স্বামীর প্রাসাদে চলিলেন। স্থলতানের বাস্তব-করণ নানাবিধ বাস্তব তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বাজাইতে বাজাইতে চলিতে লাগিল। তাঁহাদের পশ্চাতে শতাধিক কর্মচারী চলিল, তাহার পর এক শত কুকুর দাস ছই সারিতে বিভক্ত হইয়া, মশাল হস্তে লইয়া চলিল, প্রজ্বলিত মশালগুলির উজ্জ্বল আলোকে অন্ধকার রাত্রি দিনমানের ভায়ে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

স্থলতানদুহিতা আলাদীনের প্রাসাদে উপস্থিত হইলে আলাদীন মহা আগ্রহেরে ও প্রথম সোহাগে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। রাজকন্ডার রূপ দেখিয়া আলাদীনের মনে আনন্দের সীমা রহিল না। সে পুলক-গলাদকণ্ঠে বলিল, “রাজকন্ডা, আমি আপনাকে লাভ করিবার আশাতেই পূর্বে আপনাকে ভয়প্রদর্শন করিয়া আপনার বিরাগভাজন হইয়াছি, সে জন্ত যদি কেহ দোষী হয়, তবে সে দোষ আমার নহে, আপনার স্থলর নয়ন দ্রুত আর ঐ বিষমুখদারিহই দোষ, ঐ নয়নের বিজলী কটাক আমাকে আত্মহারা করিয়াছিল।” রাজকন্ডা আলাদীনকে বলিলেন, “প্রিয়তম, আপনি সে জন্ত কোন চিন্তা করিবেন না, আমি স্থলতানের ইচ্ছানুসারে আপনাকে গ্রহণ করিব, আপনি যেরূপ রূপবান, তাহাতে আপনার প্রতি অহরহ হইতে বিস্ময় হইবে না।”



প্রথম-মিলনের
সোহাগ-
অমরজন

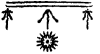


আলাদীন রাজকুমারীর কথা শুনিয়া আনন্দমাগরে ভাসিতে লাগিল। রাজকন্যা আলাদীনের অল্পরোধে আহ্বার করিতে বসিলেন, আলাদীনের আদেশে দৈত্য পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট যে ফলত সুপক ও সুমিষ্ট ফলসমূহ লইয়া আসিয়াছিল, সুবর্ণপাত্রে কিষ্করাগণ সেই সকল ফল রাজকন্যার জন্ত সম্ভজিত করিয়া রাখিয়াছিল। পাত্রগুলিই বা কেমন কান্নকার্য্য-শোভিত! দেখিয়া রাজকন্যা পুনঃপুনঃ তাহাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আলাদীনের অতুল ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রাজকন্যার মনেও বিশ্বয়ের সঞ্চার হইয়াছিল।

আহাৱাদির পর নৃত্যগীতের অমুষ্ঠান চলিতে লাগিল, নর্তক নর্তকীগণ বহুভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিল। মধ্যরাত্রে আলাদীন ও রাজকন্যা চীন দেশের প্রবাহসারে নৃত্য করিয়া বিবাহ-ক্রিয়া সমাপন করিলেন। তাহার পর উভয়ে শয়নমন্দিরে গমন করিলেন, দাসদাসীগণ সকলে ধীরে ধীরে প্রমোদপূহ পরিত্যাগ করিল। প্রমোদ-রজনী প্রবয়-উৎসবে যেন মুহূর্ত্তে অতিবাহিত হইল।

পরদিন আলাদীন দাদাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া মহাসমারোহে স্নানতানের নিকট উপস্থিত হইল, স্নানতান পূর্ববৎ আদরের সহিত তাহার অভ্যর্থনা করিয়া তাহাকে নিকটে বসাইলেন। আলাদীন বলিল, “জাহাপনা, আজ আপনায়, আপনায় উজীর ও প্রধান আত্মীয়বর্গের আপনায় কণ্ঠগৃহে নিমন্ত্রণ। আশা করি, আপনি অল্পগ্রহ করিয়া কশ্মচাৱিবর্গের সহিত সেখানে আপনায় পদধূলি প্রদান করিবেন।” স্নানতান আনন্দের সহিত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং অধিক বিলম্ব না করিয়া স্নানতান আলাদীনকে দক্ষিণে ও উজীরকে বামে লইয়া প্রধান কশ্মচাৱিগণের সহিত আলাদীনের প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন। যতই তিনি প্রাসাদের নিকটবর্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাহার হৃদয় পুলকিত হইতে লাগিল। আলাদীন তাঁহাকে মহা সমাদরে সেই চব্বিশ বাতায়নযুক্ত প্রাসাদে লইয়া চলিল। হীরকরত্নাভিপূর্ণ বাতায়নের শোভা নিরীক্ষণ করিয়াই স্নানতানের চক্ষু হির! তিনি কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাহার পর উজীরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “উজীর, আমার রাজ্যমাঝে আমার প্রাসাদের এত সন্নিকটে যে একগুপ্ত অল্প প্রাসাদ আছে, তাহা আমি জানিতাম না।” উজীর বলিলেন, “জাহাপনা, এ প্রাসাদ দীর্ঘ-কালের নহে, গত পরশ্ব দিন আপনি আলাদীনকে গৃহনির্মাণের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সূর্য্যোস্তের পর আপনি অমৃত্যু দান করেন, প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে এই অলৌকিক প্রাসাদ এই ভাবে সুনির্মিত দেখিতে পাওয়া গেল, আপনাকে আমি পূর্বেই ত’ এ কথা বিস্তারিতরূপে বলিয়াছি।” স্নানতান বলিলেন, “সে কথা আমার মনে আছে, কিন্তু আমি কোন দিন ভাবিতেও পারি নাই যে, তাহা পৃথিবীর মধ্যে একগুপ্ত অশ্বিতীয়,—স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রাচীর নির্মিত। এমন হীরকরত্নবিভূষিত প্রাসাদ ভূমণ্ডলে আর কোথাও আছে কি?”

অলৌকিক
প্রাসাদ-
সম্মর্শনের
বিষয়



ঘুরিতে ঘুরিতে স্নানতান তেইশটি বাতায়ন সম্মর্শন করিয়া চতুর্দিশটিটির সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তাহা অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়াছে, তিনি ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইয়া, উজীরকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উজীর বলিলেন, “জাহাপনা, সম্ভাব্য বশতঃ আলাদীন এইটি সম্পূর্ণ করিতে পারে নাই, শীঘ্রই ইহা সম্পূর্ণ হইবে।”

আলাদীন কার্য্যোপলক্ষে প্রাসাদের অন্তপ্রান্তে গমন করিয়াছিল, উজীরের সহিত স্নানতানের কথা হইতেছে, এমন সময় আলাদীন তাঁহাদের সন্নিকটবর্তী হইল। তাহাকে দেখিয়া স্নানতান বলিলেন, “বৎস, তোমার এই প্রাসাদ প্রকৃতই পৃথিবীর মধ্যে অশ্বিতীয়, কিন্তু একটু বাতায়ন অসম্পূর্ণ অবস্থায় দেখিয়া আমি কিছু বিস্মিত হইয়াছি, একগুপ্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় ইহা ফেলিয়া রাখিবার কারণ কি? সম্ভাব্য, এমন,



না উপেক্ষা ?” আলাদীন বলিল, “সমস্যাভাব কিংবা লম্ব ইহার কারণ নহে, আমার একমাত্র আশা আছে, জাঁহাপনা অল্পগ্রহ করিয়া এই বাতায়নটি অস্ত্রগুলির দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া দিবেন, ইহাতে আমার যথেষ্ট সম্মানযুক্তি হইবে, এই অভিপ্রায়েই কারিকরগণকে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে দিই নাই।” সুলতান বলিলেন, “ভাল ভাল, তোমার কথা শুনিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম, আমি অবিলম্বে আমার কৰ্মচারিগণকে এই বাতায়নটিকে সুসজ্জিত করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিতেছি।” সুলতানের আদেশে রাজধানীর সৰ্ব্বপ্রধান জহুরী ও স্বর্ণকারগণকে আহ্বান করা হইল।

সুলতান আহারা দি শেষ করিয়াছেন, এমন সময় জহুরী ও স্বর্ণকারগণ আলাদীনের প্রাসাদে উপস্থিত হইল। সুলতান নিজে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদের সেই তেইশটি জানালা দেখাইয়া চতুর্বিংশতিটির নিকট উপস্থিত করিলেন, এবং তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা এই বাতায়নটি অস্ত্রগুলির দ্বারা সুসজ্জিত কর, পরীক্ষা করিয়া দেখ, কিরূপ হীরক-রত্নাদির আবশ্যক, কাণ্ডারস্থে কিছুনাও বিলম্ব করিও না।”

স্বর্ণকার ও জহুরীগণ বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই তেইশটি বাতায়ন পরীক্ষা করিল, তাহার পর সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “জাঁহাপনা, আপনার আদেশপালনে আমরা বিশেষ উৎসুক রহিয়াছি, কিন্তু এরূপ মূল্যবান ও উৎকৃষ্ট হীরক-রত্নাদি এত অধিকসংখ্যক কোথায় পাইব যে, এই কার্য শেষ করিব ?” সুলতান বলিলেন, “আমার ভাণ্ডারে এরূপ রত্নাদি প্রচুর পরিমাণে আছে, আমার প্রাসাদে চল। আমি তোমাদিগকে সে সকল দেখাইয়া দিব, তোমরা আবশ্যক হীরকাদি মনোনীত করিয়া লইবে।”

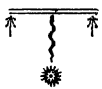
আগ্রহান্বেষী সুলতান নিজেই কারিকরগণকে সঙ্গে লইয়া স্বকীয় প্রাসাদস্থ রত্নভাণ্ডারে প্রবেশ করিলেন, এবং আলাদীনপ্রদত্ত হীরকরত্নাদি তাহাদিগকে দেখাইতে লাগিলেন। তাহারা সেগুলি লইয়া কাজ আরম্ভ করিল, কিন্তু সেই সকল হীরকরত্নে সংকুলান হইল না, সুলতান তাঁহার ভাণ্ডারস্থ যাবতীয় রত্ন এবং বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট হীরক প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও কোন ফলপাত হইল না। প্রায় এক মাস পরিশ্রমের পর কারিকরেরা বাতায়নটি অর্দ্ধসমাপ্ত অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া গেল। আলাদীন তাহাদিগকে পুনর্বার আহ্বান করিয়া সুলতানের সমস্ত হীরকরত্ন বাতায়ন হইতে খুলিয়া লইয়া তাঁহার ভাণ্ডারে রাখিয়া আসিবার আদেশ করিল। তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।

কারিকরগণ প্রস্থান করিলে আলাদীন প্রদীপ ঘষিয়া দৈতাকে তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিল। আলাদীন বলিল, “দৈত্যরাজ, যে বাতায়নটি অসজ্জিত অবস্থায় আছে, তাহা অবিলম্বে সজ্জিত কর।” কয়েক মুহূর্তমধ্যে বাতায়নটি অস্ত্রগুলির দ্বারা সুসজ্জিত হইল।

এ দিকে কারিকরগণ সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, “জাঁহাপনা ! আমরা কৃত দিন ধর্ম্মীয়া কিরূপ কাজ করিয়াছি, তাহা আপনার অজ্ঞাত নহে ; আমরা এত দিনে অর্ধেক টুকু কাজের বেশী করিতে পারি নাই, হীরক-রত্নাদিও ক্ষুদ্রাংশ গিয়াছিল, কাজেই আমরা চলিয়া আসিতে-ছিলাম, আপনার ক্ষামতায় আমাদিগকে পুনর্বার ডাকাইয়া আপনার হীরকরত্নাদি খুলিয়া লইয়া আসিবার আদেশ করার আমরা তাহা লইয়া আসিয়াছি।”

সুলতান কারিকরগণের কথা শুনিয়া অবিলম্বে অশ্বারোহণে আলাদীনের গৃহে উপস্থিত হইলেন, এবং তাহাকে বলিলেন, “বৎস, এত দিন কাজের পর এই সকল হীরকরত্ন খুলিয়া ফেলত দেওয়ান অর্থ কি ?” আলাদীন সুলতানের কোষাগারের হীরকরত্নের অল্পতার কারণ না বলিয়া বলিল, “জাঁহাপনা, আপনি

বাতায়ন-
সজ্জায়
রত্নভাণ্ডার
নিঃশেষিত



সুলতানী-
দর্পচূর্ণ



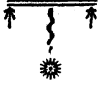
দেখিবেন, ইহা আর অসমাপ্ত অবস্থায় নাই, যদিও কারিকরণ ইহা সুসজ্জিত করিতে অসমর্থ হইয়াছে, তথাপি আপনি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন, আমিই ইহা সম্পূর্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছি।”

সুলতান তৎক্ষণাৎ সেই বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাহার অসম্পূর্ণতা দূর হইয়াছে। বাতায়নটি অত্যন্ত বাতায়নের ছায় শোভা ধারণ করিয়াছে। সুলতান আলাদীনের মন্তকচূষন ও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস, দেখিতেছি, তুমি অতি অসাধারণ মাহুয, তুমি অসম্ভব কাৰ্য্য সম্পন্ন করিতে পার। দেখিতেছি, পৃথিবীতে তোমার তুলনা নাই। তোমার ক্ষমতার কথা বতই জানিতে পারিতেছি, ততই বিশ্বম্ভাবিত হইতেছি।”

আলাদীন বলিল, “জাহাপনা, আপনার অমূল্যগ্রন্থকেই আমি সর্বাধিক মূল্যবান বলিয়া মনে করি। আপনার বিশ্বাস ও ব্ৰহ্মহত্যের জ্ঞান আমি সকলই করিতে পারি।”

সুলতান আলাদীনের গৃহ হইতে রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করিলেন, তিনি প্রাসাদে কিরিয়া দেখিলেন, উজীর তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। সুলতান আলাদীনের অমূল্য ক্ষমতার কথা উজীরকে জানাইলেন,

বিবাহ-নিবারণ
ধায়া-বাঁধী !



উজীর গভীরভাবে বলিলেন, “জাহাপনা, আমি পূর্বেই বলিয়াছি, এ সকল ইচ্ছাজালের কাজ, ঐচ্ছজালিক ভিন্ন ইহা কখনও সম্ভবপর নহে।” সুলতান বলিলেন, “উজীর, পূর্বেও তুমি একরূপ কথা বলিয়াছ, তাহা আমার মনে আছে, কিন্তু তুমি যে তোমার পুত্রের সহিত আমার কস্তার বিবাহের জ্ঞান প্রার্থী ছিলে, সে কথা আমি বিশ্বস্ত হইতে পারি নাই।”

উজীর দেখিলেন, সুলতান অকসংসারের বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং তিনি সুলতানের কোন কথার প্রতিবাদ করিলেন না, কিন্তু তাহার সন্দেহ দূর হইল না। সুলতান প্রায় সর্বদাই নিজের প্রাসাদ বাতায়ন হইতে আলাদীনের প্রাসাদের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকিতেন, এবং মনে মনে তাহার প্রশংসা করিতেন।

আলাদীন ক্রমেই সুলতানের অধিক প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। সর্গসাধারণে আলাদীনের দানশীলতা, বীরত্বের ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিতে লাগিল, রাজ্যের অনেক গুরুতর কার্য্য আলাদীনের সহায়তায় সম্পন্ন হইতে লাগিল। একবার রাজ্যে ঘোর বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, আলাদীনের সাহস ও কৌশলে বিদ্রোহী দল পরাজিত হইয়া সুলতানের বশত স্বীকার করিল। সুলতান আলাদীনকে তাহার দক্ষিণ হস্ত মনে করিতে লাগিলেন।

এইরূপে পরমসুখে আলাদীনের কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। আলাদীন সুলতানজাদীর রূপসুধাপানে বিভোর হইয়া প্রেমমাগরে ভাসিতে লাগিল—নিত্য নব নব প্রমোদ-করনায় আশ্ববিশ্বস্ত হইল। এ দিকে আক্ষিকার সেই যাদুকর বদশে বসিয়া, অনেক সময়ই আলাদীনের কথা চিন্তা করিত। সে যদিও হির জানিত, আলাদীন পর্ত্ত-গুহা হইতে কখনও উদ্ধারলাভ করিতে পারে নাই, নিশ্চয়ই অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তথাপি সময়ে সময়ে তাহার মনে হইত, হয় ত’ আলাদীন কোন কৌশলে বাঁচিতেও পারে। আলাদীন

যাদুকর জড়িত



জীবিত আছে কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে জানিবার জ্ঞান কোতুললবশে যাদুকর এক দিন আলাদীনের জন্ম-পত্রিকা বাহির করিয়া, বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর সে বুঝিতে পারিল, পর্ত্ত-গুহায় আলাদীনের মৃত্যু হওয়া দূরের কথা, সে মহাসুখে ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হইয়া বাস করিতেছে, এবং রাজকস্তার পাবিগ্রহণ করিয়া প্রমোদ-বশে মজ্জগল হইয়া আছে। চান-সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহার ছায় সন্ধান, স্বখ-সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য আর কাহারও নাই।

বাছকর এই তথ্য অবগত হইবামাত্র ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, সে মুখ রক্তবর্ণ করিয়া বলিল, “এই দরজার ছেলেটা দেখিতেছি, অবশেষে প্রদীপের গুণ জানিতে পারিয়াছে! আমি মনে করিয়াছিলাম, সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমার দীর্ঘকালের তপস্যা ও পরিশ্রমের ফল সে নির্বিকার ভোগ করিতেছে! হয় আমি তাহার এই সুখ-সৌভাগ্যের পথ বন্ধ করিব, না হয়, এ চেষ্টায় প্রাণ বিসর্জন করিব।” কিন্তু ভাবে কার্ধ্য আরম্ভ করিবে, তথ্যই চিন্তা করিয়া, বাছকর পরদিন প্রভাতে একটি অশ্ব আনোহণ করিয়া, তাহার আফ্রিকাদেশের গৃহ হইতে চীনদেশাভিমুখে যাত্রা করিল। যথাসময়ে নিরাপদে চীনদেশে উপস্থিত হইয়া, বাছকর এক সরাইখানায় বাসা লইল, এবং দুই দিন সেখানে বাস করিয়া পথশ্রম দূর করিল।

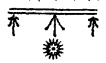
আকোশেব
প্রতিহিংসা



তৃতীয় দিন প্রভাতে বাছকর নগরদর্শনে বাহির হইল, এবং আলাদীন সখকে নগরবাসিগণের কি মত, তাহা জ্ঞানিতে লাগিল, এই উদ্দেশ্যে সে সাধারণ ভজনালয় ও বড় বড় আচ্ছাদিত পরিদর্শন করিতে লাগিল। অবশেষে একটি মন্ডালয়ে প্রবেশ করিয়া মন্তপান করিতে করিতে শুনিতে পাইল, এক জন লোক আর এক জন লোকের সহিত আলাদীনের প্রাসাদসম্বন্ধে গল্প করিতেছে। কথাটা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য বাছকর জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, আপনি যে প্রাসাদের এত প্রশংসা করিতেছেন, তাহার কি বিশেষ কোন গুণ আছে?” বাছকরের এই কথা শুনিয়া এক জন লোক বলিল, “মহাশয়, আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন? আপনি নিশ্চয়ই এখানে নতুন আসিয়াছেন; তাই রাজজামাতা আলাদীনের বিষয়কর প্রাসাদসম্বন্ধে আপনি অনভিজ্ঞ। এই প্রাসাদ পৃথিবীর মধ্যে অতি অসাধারণ, শিল্পের বিচিত্র নিদর্শন! কেবল যে ইহা অদ্ভুত, তাহাই নহে; মাহুবে এমন মূল্যবান, সুরহ্রদ সুরম্য হস্তা আর কখনও দেখে নাই। আপনি বোধ করি, বহুবুয় হইতেই আসিয়াছেন, এখন প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই আপনার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ মিটেবে। বুঝিবেন, আমার কথা সত্য কি না।” আফ্রিকাদেশীয় বাছকর বলিল, “ভাই, আমি এ বিষয়ে কোন কথা জানি না বলিয়া দ্রুতি হইতেছি, আমার অজ্ঞতা ক্ষমা কর। আফ্রিকাদেশ হইতে আমি গতকল্য এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, আমাদের সেই বহুবুয়বর্তী দেশে রাজজামাতার প্রাসাদের খ্যাতি এখনও পৌঁছে নাই। বাহা হউক, এই অত্যুচ্চ প্রাসাদ আমাকে দেখিতে হইবে। যদি ভাই, তুমি অগ্রহ করিয়া আমাকে উহা দেখাইয়া আন, তবে বড়ই বাধিত হই, বিদেশী লোক, পথ-বাট ত’ চিনি না।”

লোকটি বাছকরের কথায় সম্মত হইলে উভয়ে আলাদীনের প্রাসাদভিমুখে যাত্রা করিল। বাছকর প্রাসাদের চতুর্দিক বিশেষ মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিল, অদ্ভুত প্রদীপের প্রাসাদেই আলাদীন এমন অদ্ভুত প্রাসাদ ও অগণিত ধনজন লাভ করিয়াছে। আলাদীনের সৌভাগ্যদর্শনে বাছকর বৎপরোনাতি মন্তপীতা বোধ করিতে লাগিল, স্থলতানের সহিত আলাদীনের বিন্দুযাত্র পার্থক্য নাই দেখিয়া, তাহার জ্ঞয় অত্যন্ত কাতর হইল, সে চিন্তাকুলচিত্তে তাহার বাসা সেই বাঁয়ের ভবনে প্রত্যগমন করিল।

আচ্ছাদিত-প্রদীপ
অগ্নিবর্ণ-প্রাসাদ



অতঃপর বাছকর ভাবিতে লাগিল, “এখন আমার প্রধান কার্ধ্য প্রদীপটি হস্তগত করা, কিন্তু তাহা আলাদীন কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছে, কি তাহা সর্বদা সঙ্গে রাখে, তাহা জানিবার কোন উপায় দেখিতেছি না। দেখি, সাধ্যাঙ্গুসারে গণনা করিয়া যদি ইহার অবস্থানের কথা জানিতে পারি।” বাছকর গণনা আরম্ভ করিল, অল্পকালের মধ্যেই তাহার মুখ হর্ষাৎকুল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, প্রদীপটি আলাদীনের গৃহেই রহিয়াছে, সে হর্ষভরে বলিয়া উঠিল, “এ প্রদীপ আমি হস্তগত করিবই, আমি নিশ্চয়ই আলাদীনকে পুনরায় মূল্যায়ন করিয়া স্বকার্য সাধন করিব।”



হুত্ৰীপা বশন্তঃ এই সময় আলাদীন কয়েকদিনের জন্ত মৃগয়ায় বাজা করিয়াছিল, কিন্তু বাহুরক সে কথা জানিত না, সে এক ঝাঁয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “আমি আলাদীনের অঙ্কৃত প্রাসাদ দেখিলাম, এমন আর কখন দেখি নাই, কখন দেখিব, সে আশাও করি না। প্রাসাদের বিনি মালিক, তিনি কিরূপ লোক, তাহা দেখিবার জন্ত আমার মনে বড়ই আগ্রহের সঞ্চার হইয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই এক জন অসাধারণ ব্যক্তি হইবেন।” ঐ বলিল, “ইহা কিছুই কঠিন কাজ নহে, যে কোন সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পার, কিন্তু কথা এই যে, আপাততঃ তিনি রাজধানীতে উপস্থিত নাই, মৃগয়া করিতে গিয়াছেন, চারি পাঁচ দিন পরে তাঁহার ফিরিবার কথা আছে, তাহার পূর্বে দেখা হইবার কোন সম্ভাবনা নাই।”

আফ্রিকার যাহুরকের আর অধিক কথা জানিবার আবশ্যক হইল না। সে ঐ সাহেবের সম্মুখ হইতে নিজের কক্ষে উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, “এখন যদি কার্যোদ্ধার করিতে না পারি, তবে এমন সুযোগ আর পাইব না।” যাহুরক এক জন প্রদীপবিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া বলিল, “মহাশয়, আমি বারোটা বড় তামার প্রদীপ ক্রয় করিব, আপনি তাহা দিতে পারিবেন কি?” দোকানদার বলিল, “এতগুলি প্রদীপ আজ প্রস্তুত নাই, আপনি যদি কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি দিতে পারি।” যাহুরক বলিল, “আচ্ছা, তাহাই হইবে, কিন্তু প্রদীপগুলি যেন দেখিতে বেশ সুন্দর ও উত্তম-রূপে পালিশ করা হয়, তাহা হইলে আপনি যে মূল্য চাহিবেন, আমি তাহাই প্রদান করিতে সম্মত আছি।”

পরদিন প্রভাতে যাহুরক দ্বাদশটি প্রদীপই প্রাপ্ত হইল, দোকানদার যে মূল্য চাহিল, যাহুরক তাহাই প্রদান করিল। প্রদীপকয়ট একটি ঝুড়িতে সজ্জিত করিয়া, তাহা স্বহস্তে লইয়া, যাহুরক ফেরি করিতে বাহির হইল এবং আলাদীনের প্রাসাদসন্নিহিতে ঘন ঘন হাঁকিতে লাগিল, “চাই, পুরানো প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ, অতি চমৎকার নূতন প্রদীপ।” বালকগণ যাহুরকের কথা শুনিয়া বড় আনন্দে পাইল এবং তাহার চারিপার্শ্বে জমিয়া উঠিল: স্বরে তাহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া তাহাকে ক্ষেপাইতে লাগিল। তাহারা বলিল, “পুরানো প্রদীপ লইয়া নূতন প্রদীপ দিতে চায়, লোকটা নিশ্চয় পাগল!”

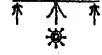
কিন্তু বালকবালিকাদিগের বিজ্ঞপ্তি যাহুরকের ধৈর্য্য নষ্ট হইল না, সে সমান উৎসাহে পূর্ববৎ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, “চাই, পুরানো প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ, অতি চমৎকার নূতন প্রদীপ।” সে প্রাসাদের চারি পাশে পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই একই কথা বলিতে লাগিল। অবশেষে তাহার কঠোর স্থলতানকন্ডার কর্ণগোচর হইল, কিন্তু যাহুরক কি কথা বলিতেছে, তাহা স্থলতান-দ্বিহিতা স্পষ্ট বুঝিতে না পারিয়া এক জন দাসীকে তাহা জানিয়া আসিবার আদেশ করিলেন।

দাসী কিয়ৎকাল পরে হাসিতে হাসিতে স্থলতানজাদীর নিকট প্রত্যাগমন করিয়া ঠাড়াইয়া, দস্তপাট বিকাশ করিয়া হাসিতে লাগিল। স্থলতান-দ্বিহিতা বলিলেন, “আঃ মর মাগি, কি হইয়াছে যে ঐটা বাহির করিয়া এরকম হাসিতেছিস?” দাসী বলিল, “ঠাকুরাণি, লোকটার পান্থলামী দেখিয়া কি না হাসিয়া থাকা যায়? সে এক ঝুড়ি নূতন প্রদীপ আনিয়া গৃহস্থের পুরানো প্রদীপের সঙ্গে বদল করিতে চায়, বিরুদ্ধ করিব না। রাজ্যের ছেলে জুটয়া তাহাকে ঠাট্টা-বিজ্ঞপ্তি করিতেছে, লোকটা অস্থির হইয়া উঠিয়াছে।”

আর এক জন দাসী এই কথা শুনিয়া বলিল, “লোকটা পুরানো প্রদীপের বদলে নূতন প্রদীপ দিতে চায়? ঠাকুরাণি, দেখিয়াছেন কি না, জানি না, আমি দেখিয়াছি, আমাদের কার্ণিগের উপর একটা পুরানো প্রদীপ আছে, এটা বদলাইয়া একটা নূতন প্রদীপ লইলে হানি কি? ঠাকুরাণীর অমুমতি হইলে আমি এই প্রদীপটা বদল করিয়া লই।”

দাদী যে প্রদীপটির কথা বলিতেছিল, তাহা আগাদীনের সেই অদ্ভুত প্রদীপ; আগাদীনের সকল সৌভাগ্যের মূল। পাছে ইহা কেহ কোথাও ফেলিয়া দেয়, এই ভয়ে আগাদীন যুগ্মযাত্রার পূর্বে এই প্রদীপটি সাবধানে কর্ণিসের উপর রাখিয়াছিল, কিন্তু পূর্বে তাহার উপর আর কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই। যুগ্ম যাত্রার জন্য কোন কাজে কোথাও যাত্রা করিলে আগাদীন এই প্রদীপটি সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত, কারণ, যুগ্মযাত্রা বিশেষ সম্ভাবনা যথেষ্ট, দৈবাৎ প্রদীপটি হারাইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। বাহা হউক, আগাদীনের কর্তব্য ছিল, প্রদীপটিকে একটা সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখা, কিন্তু তাহা সে রাখে নাই, ইহা আগাদীনের পক্ষে সাবধানতার অভাব বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে, কিন্তু সাবধানতার একরূপ অভাব সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়।

হুভাগ্যের
ছলনা



মূলতানুহিতা এই প্রদীপের গুণের কথা জানিতেন না, আগাদীনও কোন দিন তাহার স্বীয় নিকট এই

গুপ্তকথা প্রকাশ করা সম্ভব জ্ঞান করে নাই, সুতরাং দাদীর কথা শুনিয়া আগাদীনের স্বী বলিলেন, “তোমার যদি এত সখ হইয়া থাকে, তবে যা, ওটা বদল দিয়া একটা নূতন প্রদীপ আনিয়া রাখ।”

দাদী এক জন খোজার হস্তে প্রদীপটি সমর্পণ করিল, খোজা তাহা লইয়া বাহুরের নিকট আসিয়া বলিল, “এই পুরানো প্রদীপটি লইয়া আমাকে একটা নূতন প্রদীপ দাও।”

বাহুর সেই পুরাতন প্রদীপ দেখিবামাত্র তাহা অদ্ভুত প্রদীপ বলিয়া বুঝিতে পারিল, তাহার মনে আশ্চর্যের সীমা রহিল না। সে অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে খোজার

হস্ত হইতে প্রদীপটি গ্রহণ করিল, এবং তাহা নিজের বকের কাছে রাখিয়া বোড়া-সমত সকল প্রদীপ খোজার সম্মুখে স্থাপন করিয়া বলিল, “তোমার যেটাই ইচ্ছা, ইহার ভিতর হইতে বাছিয়া লইতে পার।” খোজা একটি নূতন প্রদীপ লইয়া আগাদীনের স্বীয় নিকট উপস্থিত হইল, বাহুরও তাঁর ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিল। পুরানো প্রদীপের পরিবর্তে নূতন প্রদীপ দিয়া গিয়াছে দেখিয়া, পল্লীবাণকর্ণ আরও অধিকভাবে বাহুরের উদ্দেশে নানা বিজ্ঞবাক্য বলিতে বলিতে তাহার গলাতে ছুটিতে লাগিল।

নগরের প্রান্তভাগে একটি নির্জন স্থানে আসিয়া বাহুর তাহার নূতন প্রদীপের স্বাভাৱী ফেলিয়া দিল, তাহার পর অতঃপর নগর ত্যাগ করিয়া অস্ত্রের অগত্যে তাহার অভ্যন্তর পথে ধাবিত হইল। ধীরে ধীরে



আশ্চর্য
প্রদীপ
বদল



সে তাহার জিনিসপত্র কেলিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাহার মনে কিছুমাত্র সন্দেহ হইল না, সে তাহার দীর্ঘকালের কামনায় বস্তু হস্তগত করিয়াছে, আর তাহার আক্ষেপ কি ?

রাত্রে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া যাহুকর তাহার বস্তু-সমিধান হইতে প্রতীপটি সাবধানে বাহির করিয়া তাহা ধীরে ধীরে ঘর্ষণ করিল, তখনই সেই বিকটাকার দৈত্য তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া বলিল, “আমি প্রতীপের দাস, প্রতীপ যাহার নিকট থাকে, আমি তাহারই দাস, তোমার কি আদেশ বল, আমি তাহা পালন করিতেছি।” যাহুকর বলিল, “আমি আদেশ করিতেছি, আলাদীনের প্রাসাদটি সকল জবাবের সহিত—

শ্রুতপথে
প্রাসাদ-চালান

জীবিত বা মৃত সকল প্রাণীর সহিত আফ্রিকা দেশের প্রান্তভাগে তুলিয়া লইয়া যাও। সেই সঙ্গে আমাকেও লইয়া চল।” কথা শেষ হইতে না হইতে আলাদীনের প্রাসাদ, অসবাব, রক্তভাঙায় সকল জিনিসের সহিত যাহুকরকে লইয়া দৈত্য শুল্ক উড়িয়া আফ্রিকাদেশে চলিল। স্থলতান-হুজিতা বদরুল বদর, তাঁহার খোজা, দাসদাসী সকলেই শ্রুতপথে উড়িয়া চলিল।

পরদিন প্রভাতে স্থলতান তাঁহার বাতায়নসম্মুখকটে আসিয়া আলাদীনের প্রাসাদ-শোভা সন্দর্শনের জগু দণ্ডায়মান হইলেন। আলাদীনের প্রাসাদ যে দিকে ছিল, সে দিকে আগ্রহভরে দৃষ্টিপাত করিলেন; কিন্তু প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন না; দেখিলেন, খানিক ফাঁকা জমি শুষ্ক করিতেছে। তিনি প্রথমে মনে করিলেন, তাহার দৃষ্টিশক্তির ঘর্ষতা হইয়াছে, তাই দেখিতে গোল হইতেছে। তিনি উভয় করতলে চক্ষুস্বয়ং মার্জনা করিলেন, কিন্তু তথাপি প্রাসাদ তাঁহার দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎকাল সেখানে দণ্ডায়মান রহিলেন, তাহার পর ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া উজীরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, এবং একটি গৃহমধ্যে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, “এ কি হইল! যদি কোন কারণে ইহা চূর্ণ হইয়া বাইত, তাহা হইলে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষও ত’ বর্তমান থাকিত। যদি পৃথিবীর মধ্যে হঠাৎ এই প্রাসাদ প্রবেশ করিত, তাহা হইলেও ত’ মৃত্তিকার বিদারণচিহ্ন থাকিত, কিন্তু কিছুই ত’ দেখিতে পাইতেছি না, আমার প্রিয়তমা কস্তা, তাহার দাসদাসী, বিপুল ঐর্ষ্যা সকলই কি অন্তহিত হইল?”

উজীর অবিলম্বে স্থলতানের সম্মুখানে উপস্থিত হইলেন, তিনি স্থলতানের আদেশ শুনিয়া এত ক্ষণেই স্থলতানের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন যে, আলাদীনের প্রাসাদ বখাওয়ানে আছে কি না, তৎপ্রতি লক্ষ্যপাতও করেন নাই। অস্ত্রের কথা কি, দ্বারবানগণও সে দিকে দৃষ্টিপাত করেন নাই।

উজীর স্থলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “জাঁহাপনা, আপনার ভৃত্য যে ভাবে আমাকে আপনার আদেশ জানাইল, তাহাতে বোধ হয়, কোন অসম্ভব ঘটনা ঘটিয়াছে, আমি ত’ আর একটু পরেই হজুরের দরবারে উপস্থিত হইতাম, তথাপি আমাকে এত তাড়াতাড়ি আহ্বান করিবার কি আবশ্যক ছিল, বুঝিতে না পারিয়া ব্যস্ত হইয়াছি।”

স্থলতান দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, “উজীর, বাহা! ঘটিয়াছে, তাহা বড়ই অসম্ভব; এমন অসম্ভব কাণ্ড কখন দেখি নাই, এমন অস্বাভাবিক ঘটনার কথা আমি শুনি নাই, তুমিও বোধ হয় এ ব্যাপার অসম্ভব বলিয়াই স্বীকার করিবে। আলাদীনের প্রাসাদ কোথায়, কিছু বলিতে পার কি?” উজীর সন্নিহনে বলিলেন, “বলেন কি বোদাবন্দ, আমি যে এখনই তাহার নিকট গিয়া এখানে আসিলাম, আমার বোধ হইল, তাহা সেই স্থানেই সংস্থাপিত আছে। এরূপ একটি স্ববিশ্বীর্ণ হৃদয় সহজে কখন অদৃষ্ট হইতে পারে না।” স্থলতান বলিলেন, “আমার প্রাসাদ-বাতায়নে পাড়াইয়া একবার দেখিয়া এস, দেখিতে পাও কি না, সমস্ত আসিয়া আমাকে জানাইবে।”

উজীর হুলতান-প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া, আলাদীনের প্রাসাদের চিকুদ্বার দেখিতে পাইলেন না। অনেকক্ষণ ধরিয়া চাহিয়া চাহিয়া নিরাশ হইয়া, তিনি হুলতানের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। আদিবামাত্র হুলতান তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কেমন, আলাদীনের প্রাসাদ নজরে পড়িল?” উজীর বলিলেন, “জাঁহাপনা, আমি ত’ বহুদিন পূর্বেই বলিয়াছি, এই অতুলনীয়, মহা ঐশ্বর্য্যালম্পর, হুম্মর, হুম্মর হুম্মা ইম্রাজানসন্ত, কিন্তু তখন আমার কথায় খোদাবন্দের বিরক্তিসঙ্কর হইয়াছিল।”

হুলতান উজীরের উক্তির সারবত্তা অস্বীকার করিতে পারিলেন না, নিজে প্রত্যয়িত হইয়াছেন বুঝিয়া ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন, “সেই নরাদম প্রবঞ্চক কোথায়? এখনই আমি তাহার শিরশ্ছেদনের আদেশ দান করিব।” উজীর বলিলেন, “কয়েক দিন পূর্বে রাজজামাতা মুগয়াবাত্রার ছলনায় হুকুমের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি প্রত্যাগমন করিলে আমরা তাঁহাকে সীতার প্রাসাদের কথা জিজ্ঞাসা করিব। বোধ করি, এ কথা তাঁহার অজ্ঞাতও নহে।”

হুলতানের ক্রোধাবেগ বন্ধিত হইল, তিনি বলিলেন, “সে ছরচাঁর এরূপ কোমল বাবহারের উপবৃত্ত নহে, এখনই তাহার সন্ধানে ত্রিশ জন অখারোহী পাঠাও; সে যেখানে থাক, তাহাকে লৌহশৃঙ্খলে বাঁধিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিবে।” হুলতানের আদেশ অনুসারে উজীর তৎক্ষণাৎ ত্রিশ জন অখারোহীকে আলাদীনের অহুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন। আলাদীন তখন মুগয়া শেষ করিয়া রাজধানী-অভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছিল, তাহার আলাদীনকে দেখিয়া সবিনয়ে বলিল, “হুলতান তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত অধীরভাবে অপেক্ষা করিতেছেন।” এরূপ প্রভূত ক্ষমতাশালী ঐশ্বর্য্যবান রাজজামাতাকে হুলতানের আদেশ সত্ত্বেও তাহার শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে সঙ্গা সাহসী হইল না।



আলাদীন একবারও সন্দেহ করে নাই যে, রাজধানীতে তাহার প্রাসাদবাট কোন গুরুতর বিঘ্নাট উপস্থিত হইয়াছে; হুতরাং আলাদীন নিজের ইচ্ছানুসারে মুগয়া করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছিল। রাজধানীর প্রান্তদেশে উপস্থিত হইলে প্রহরীগণের সর্দার বলিল, “রাজজামাতা, আমাদের অপরাধ লইবেন না, হুলতানের আদেশ প্রতিপালন না করিলে আমাদেরিগকে ঐ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। হুলতান আপনাকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁহার নিকট উপস্থিত করিবার আদেশ প্রদান করিয়াছেন।” প্রহরীদিগের এই কথা শুনিয়া আলাদীন স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তাহার ভয় ও বিষয়ের সীমা রহিল না। আলাদীন নিজেকে নির্দোষ বলিয়া জানিত, তাহার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ হইয়াছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া সে সঙ্কটে সর্দার প্রহরীকে জিজ্ঞাসা করিল, সর্দার বলিল, “তাহারা প্রকৃতই কোন কথা জানে না, হুলতানের আজ্ঞা অনুসারে তাহারা আদেশপালন করিতে আসিয়াছে।”



আলাদীন দেখিল, হুলতানের প্রহরীগণের বিরুদ্ধাচরণে তাহার বিদ্যুদ্গতি ক্ষমতা নাই, তাহার অহুচরসংখ্যা অত্যন্ত, বিশেষতঃ হুলতানের সহিত বিবাদের শেষ ফল মঙ্গলজনক না হইবারই সম্ভাবনা; হুতরাং সে তাহার অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল, “প্রহরীগণ, তোমরা হুলতানের আদেশ পালন কর, আমি তোমাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতেছি। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জানিও, আমি হুলতানের নিকট অপরাধী নহি।” হুলতানের প্রহরীগণ কোন উত্তর না দিয়া আলাদীনকে লৌহশৃঙ্খলে হৃদুদরূপে আবদ্ধ করিল এবং তাহাকে পদব্রজে সম্রাট-সমীপে লইয়া চলিল।

রাজধানীতে প্রবেশ করিবারাত্র নগরবাসিগণের দৃষ্টি আলাদীনের দিকে আকৃষ্ট হইল। সকলেই আলাদীনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিল, কেহ কেহ যথোচিত কৃতজ্ঞও ছিল। তাহার আলাদীনের

বন্দনশা দেখিয়া রক্ষিবর্গের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া লাঠিগোটা, কেহ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার উপক্রম করিল, ইতিমধ্যে প্রহরিগণ, আলাদীনকে লইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করায় তাহারা প্রহরিগণকে আক্রমণ করিতে পারিল না।

নিধম
আদেশের
বিজ্ঞোত



প্রহরিগণ আলাদীনকে স্থলতানের সম্মুখে লইয়া গেল, স্থলতান তখন প্রাসাদবাতায়নপথে আলাদীনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। আলাদীনকে দেখিবামাত্র ঘাতককে ডাকিয়া বলিলেন, “অবিলম্বে উহার শিরশ্ছেদন কর, চরাচারের কোন কথা আমি শুনিতে চাই না।”

ঘাতক আলাদীনের প্রাণবধে উজ্জত হইয়া তরবারি ঘুরাইয়া স্থলতানের ইঙ্গিত প্রতীক্ষা করিতেছে, এমন সময় উজীর দেখিলেন, সমস্ত নগরবাসিগণ প্রাসাদাভিমুখে ছুটিয়া আসিতেছে। ঘাতকের হস্ত হইতে আলাদীনের প্রাণরক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা ছুটিয়া আসিতেছে, উজীর তাহা অবিলম্বে বুঝিতে পারিলেন। তিনি স্থলতানকে বলিলেন, “জাহাপনা, আপনি আলাদীনের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদানের পূর্বে একবার ভাবিয়া দেখিবেন, আপনি কি করিতে বাইতেছেন, আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, আলাদীনের প্রাণ নষ্ট করিলেই প্রজাবিদ্বেহ উপস্থিত হইবে, আপনার প্রাসাদ অবিলম্বে আক্রান্ত ও অধিকৃত হইবে।”

উজীরের এই কথায় বিচলিত হইয়া, স্থলতান ঘাতককে আদেশ করিলেন, “উহার প্রাণবধ করিও না, উহাকে ছাড়িয়া দাও।”—স্থলতান আলাদীনকে মুক্তিদান করিয়াছেন; ইহা চতুর্দিকে ঘোষিত হইবামাত্র নগরবাসিগণ স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিল।

আলাদীন মুক্তিলাভ করিয়াও পলায়ন করিল না, উজ্জ্বলিত স্থলতানের মুখের দিকে চাহিয়া অত্যন্ত কাতরভাবে বলিল, “জাহাপনা, আমার কি অপরাধ, অসুগ্রহ করিয়া আমাকে বলিলে আমি অত্যন্ত বাধিত হই। আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু আপনি যখন আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তখন বুঝিতেছি, আমি কোন বিশেষ অপরাধে অপরাধী হইয়াছি।” স্থলতান অত্যন্ত কর্কশস্বরে বলিলেন, “প্রবঞ্চক, নরাদম, তোমার অপরাধ কি, এখনও তাহা বুঝিতে পারিস্ নাই? আমার নিকট আস, আমি তাহা দেখাইয়া দিতেছি।”

আলাদীন প্রাসাদে আরোহণ করিলে, স্থলতান তাহাকে সঙ্গে লইয়া একটি কক্ষের বাতায়ন-দ্বারিকায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “চাহিয়া দেখ, তুমি অবশ্যই তোমার প্রাসাদ চিনিতে পারিবে, তাহা দেখিয়া আমাকে বল, তোমার প্রাসাদ কোন্ দিকে কি অবস্থায় আছে।” আলাদীন ব্যগ্রদৃষ্টিতে সেই দিকে চাহিল, কিন্তু তাহার প্রাসাদ দেখিতে পাইল না, সে পুনঃ পুনঃ চক্ষু মুছিয়া, তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিষ্কণ করিয়াও প্রাসাদ লক্ষ্য করিতে পারিল না; প্রাসাদ কিরূপে সহসা অস্তিত্ব হইল, তাহাও বুঝিতে সমর্থ হইল না। স্থলতানকে কোন কথা না বলিয়া ভয়ে বিশ্বয়ে স্তম্ভিতভাবে সে দণ্ডায়মান রহিল। স্থলতান তখন সরোবে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার প্রাসাদ কোথায়, আমার কন্ডাই বা কোথায়, শীঘ্র বল।” অনেকক্ষণ পরে আলাদীন নতমস্তক উত্তোলিত করিয়া বলিল, “জাহাপনা, দেখিতেছি, আমার প্রাসাদ এখন হইতে অস্তিত্ব হইয়াছে, কিন্তু আমি আপনার নিকট শপথ করিয়া বলিতেছি, এ জ্ঞাত আমি অপরাধী নহি, কাহার এ কাজ, তাহাও আমি কিছুমাত্র জানি না।”

জীবন-সীমা

চল্লিশ দিন



স্থলতান বলিলেন, “তোমার প্রাসাদের কি হইল না হইল, তাহা জানিবার জ্ঞাত আমি বিমুখমাত্র বাস্তব নহি, আমার কন্ডাকে আমি তোমার সেই প্রাসাদ অপেক্ষা লক্ষণে অধিক মূল্যবান মনে করি। যদি তুমি আমার কন্ডাকে অবৈধন করিয়া আমার নিকট উপস্থিত করিতে না পার, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিব।” আলাদীন বলিল, “জাহাপনা, আমি আপনার নিকট চল্লিশ দিনের সময় প্রার্থনা করিতেছি, এই সময়ের মধ্যে যদি আপনার কন্ডার অন্বেষণ করিয়া তাহাকে আপনার নিকট উপস্থিত করিতে না পারি,

তাঁহা হইলে আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি আপনার সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইব এবং বিনা প্রতিবাদে প্রাণদণ্ড গ্রহণ করিব।” সুলতান বলিলেন, “আমি তোমার অসৌকার্যে সম্মত হইলাম, কিন্তু তুমি প্রাণভয়ে পলায়ন করিও না, যদি পলায়ন কর, তবে পৃথিবীর অপর প্রান্ত হইতে তোমাকে ধরিয়া আনিব।”

আলাদীন অত্যন্ত বাণিতাশ্রমে নিরুৎসাহভাবে সুলতানের সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল, সুলতানের কর্তৃত্বপূর্ণের মধ্যে কেহই আলাদীনের শোকছুখে তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিল না। আলাদীন কাহারও নিকট কোন সাহায্যলাভেরও আশা করিল না, তাহার বুদ্ধিভাঙ্গ হইল, এই বিপদে পড়িয়া যে কি করিতে হইবে, তাহা পথান্ত সে বুঝিতে পারিল না। সে তিন দিনকাল চীনরাজধানীর পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইল, কেহ অসুগ্রহ করিয়া তাহাকে কিছু আহার করিতে দিলে তাহাই আহার করিয়া সে ক্ষমিবারণ করিতে লাগিল।

আলাদীন হতাশভাবে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, একটি পথ ধরিয়া এক দিকে চলিতে লাগিল, চলিতে চলিতে সন্ধ্যাকালে একটি নদী তীরে আসিল, নদীতীরে বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল,—এখন কোথায় যাই? কোথায় আমার অপেক্ষত প্রাসাদের অঙ্গসন্ধান করি? পৃথিবীর কোন অংশে আমার প্রিয়তমাকে কে লুকাইয়া রাখিয়াছে, তাহা কিরূপে জানিতে পারিব? বিপুল বস্তুক্ষর, চক্ষুদিকে চূড়ান্ত বাধা, আমার সমস্ত চলিত দিনমাত্র, তাহারও কয়েক দিন অতিবাহিত হইয়া গেল। আমার আশা যে পূর্ণ হইবে, তাহার কোনই সম্ভাবনা দেখিতেছি না। নানা বিভিন্ন চিন্তায় বিভ্রান্ত হইয়া আলাদীন প্রথমে নদীজলে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণত্যাগের সংকল্প করিল, কিন্তু সহসা তাহার মনে হইল, সুলতানানুশাসনবলবীর পক্ষে এই কাৰ্য্য অত্যন্ত গণ্ডিত, আশ্চর্য্যতম মহাপাপ। যদি আশ্চর্য্যতাই করিতে হয়, তাহা হইলেও সন্ধ্যার উপাসনা শেষ না করিয়া তাহা কর্তব্য নহে। উপাসনা করিবার অভিপ্রায়ে আলাদীন নদীজলে হস্তপদ ধোত করিতে গেল, কিন্তু জল সেখানে গভীর, তীরভূমি হইতে তাহা হাতে পাওয়া যায় না, আলাদীন নত-নতুকে যেমন জল-স্পর্শ করিবার জন্ত হাত বাড়াইল, অমনি পড়িয়া গেল, কিন্তু জলের অব্যবহিত উপরে একখণ্ড প্রস্তর ছিল, জলের মধ্যে না পড়িয়া সে সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর পড়িল। তাহা অঙ্গুলীতে তবন ও দ্বাদশক-প্রস্তর অঙ্গুরীটি ছিল, তাহার কথা আলাদীন সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু শিলাখণ্ডে অঙ্গুরীটি ধরিত হইবারায় এক ভীষণ দৈত্য তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল, “আমি অঙ্গুরীর দাস, যে ব্যক্তির অঙ্গুরী আছে, আমি তাহার দাস, আমাকে তুমি কি করিতে বলিবে, বল; আমি তোমার আদেশ পালন করিব।”

আলাদীন সহসা যেন অনন্ত সমুদ্রে হাবুডুবু খাইতে খাইতে কূলে পদার্পণ করিল, আগ্রহভরে বলিল, “দৈত্যরাজ, একবার তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, দ্বিতীয়বার আমার প্রাণরক্ষা কর, আমার প্রাসাদ কোথায়, তাহা বল, আর তাহা যেখানে ছিল, সেখানে আনিয়া দাও।” দৈত্য বলিল, “তুমি আমাকে বাধা করিতে বলিতেছ, আমার পক্ষে তাহা অসাধ্য, আমি অঙ্গুরীর দাস, প্রদীপের দাস ভিন্ন অন্য কাহারও ইহা সাধ্য হইবে না।” আলাদীন বলিল, “যদি তাহাই হয়, তবে যেখানে সেই প্রাসাদ আছে, আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল, আমাকে রাজকতা বদকল বদরের বাতায়নের নিম্নে রাখিয়া এ।” আলাদীন এই কথা বলিবার দৈত্য আলাদীনকে স্বন্ধে লইয়া শূলভরে লইয়া চলিল, এবং চক্ষুর নিম্নে তাহাকে আফ্রিকা-দেশে উপস্থিত করিল। আফ্রিকার একটি প্রকাণ্ড নগরের সন্নিকটে একটি প্রান্তরের মধ্যে আলাদীনের প্রাসাদ সমিষ্টি ছিল, আলাদীনকে সেই প্রাসাদের বাতায়নের নিম্নে সংস্থাপন করিয়া দৈত্য সুহৃৎসবো অঙ্গু হইল।

আশ্চর্য্যতম
প্রহস



অঙ্গুরী-দাস

দৈত্যের
অভিধান



মৌত্যা-
স্বর্গোদয়



তখন রাজি, তথাপি সেই নৈশ অন্ধকারের মধ্যে আলাদীন তাহার প্রাণাধ ও রাজকন্ডার কক্ষট
অনায়াসে চিনিতে পারিল; কিন্তু রাজি তখন গভীর হইয়াছিল, তত রাত্রে কিছুই করা বাইতে পারে না
বুঝিয়া আলাদীন কিছু দূরে একটি বৃক্ষমূলে গিয়া উপবেশন করিল। আজ তাহার দ্রুততা অনেক পরিমাণে
হ্রাস হইয়াছিল, পাঁচ ছয় দিন তাহার নয়নে নিদ্রা ছিল না, পথপ্রদর্শন যথেষ্ট হইয়াছিল, শ্রান্তির ও নিদ্রাঘোর
তাহার দেহ ও নয়ন ভাঙিয়া পড়িতেছিল, আলাদীন নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সেই অনাবৃত প্রান্তরে
বৃক্ষমূলেই নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে স্বর্গোদয় হইলে আলাদীন বিহঙ্গ-কলকাকলীশব্দে জাগিয়া উঠিল। আলাদীন প্রাসাদের
দিকে দৃষ্টিপাত করিতেই তাহার হৃদয়ের আনন্দধারা উখলিয়া উঠিল। সে বুলিল, আবার তাহা সে লাভ
করিতে পারিবে, আবার রাজকন্ডাকে বন্ধে ধারণ করিয়া স্থখী হইবে। আলাদীন ধীরে ধীরে ভূমিস্থা
পরিভ্রমণ করিয়া রাজকন্ডার কক্ষের বাতায়নসমূহ গিয়া দাঁড়াইল। সে ভাবিল, রাজকন্ডা শয্যাভাগ
করিয়া একবার বাতায়নসমূহকে আসিয়া দাঁড়াইলেই তাহাকে দেখিতে পাইবেন। আলাদীন এতক্ষণে স্পষ্ট
বুঝিতে পারিল, যুগ্মযাত্রাকালে গৃহে প্রবীণতা রাখিয়া যাওয়াতেই এই নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, কেহ
প্রবীণতা কোন কৌশলে হস্তগত করিয়াই তাহার এই সর্বনাশ করিয়াছে; কিন্তু কাহার দ্বারা তাহার এই
সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, আলাদীন তাহা বুঝিতে পারিল না।

একটু বেলা হইলে রাজকন্ডা শয্যাভাগ করিলেন, রাজকন্ডার দাসীগণ বাতায়নসমূহকে আসিয়া
বাতায়ন-দ্বার মুক্ত করিতেই নীচে অদূরে আলাদীনকে দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র তাহার উদ্ভ্রাণে
রাজকন্ডার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে আলাদীনের আগমনসংবাদ জানাইল। রাজকন্ডা বাতায়নের
নিকটে আসিয়া ঝড়ঝড়ি ভুলিলেন, সেই শব্দে আলাদীন উদ্ভ্রাণে দৃষ্টিপাত করিতেই রাজকন্ডাকে
দেখিতে পাইল; আনন্দে সে অধীর হইয়া উঠিল। রাজকন্ডা আলাদীনের দিকে চাহিয়া বলিলেন,
“তুমি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করও না, দাসীরা গুপ্তদ্বার খুলিতে গিয়াছে, সেই দ্বারপথে
এখানে এস।” গুপ্তদ্বার উন্মুক্ত হইবামাত্র আলাদীন প্রাসাদে প্রবেশ করিল। দীর্ঘকাল অদর্শনে পর
স্থানি-পত্নী উভয়ে পরস্পরকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দ অহুভব করিলেন; বিরহের উজ্জ্বলিত আবেগ সংযত
করিয়া উভয়ে একত্র উপবেশন করিলে, আলাদীন বাস্তবতায় বলিল, “রাজকন্ডা, আমি শিকারে যাইবার
সময় কার্ণিসের উপর যে পুরাতন প্রবীণতা রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাহা কি হইল, শীঘ্র বল।” রাজকন্ডা
বলিলেন, “প্রিয়তম, আমার অসুস্থ হইয়া, এই প্রবীণতাকেই বুঝি আজ আমাদিগকে এত যত্না সহ
করিতে হইতেছে। হৃৎকথন কথন বলিব কি, আমি নিজেই সকল অনিষ্টের মূল।” আলাদীন বলিল,
“প্রিয়তম, তুমি আপনাকে অপরাধিনী মনে করিয়া অনর্থক সন্তপ্ত হইও না, প্রকৃত অপরাধী আমিই,
আমি কেন প্রবীণতা সাবধানে রাখিলাম না? যাহা হউক, যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে, এখন
আমাদিগকে সমস্ত ইহার প্রতীকার করিতে হইবে। কিন্তু প্রতীকারের পূর্বে প্রবীণতার কারণ
হাতে পড়িয়াছে, তাহা জানা আবশ্যক।”

প্রিয়তম-
সম্মিলনে

প্রাসাদ-বহন



রাজকন্ডা প্রবীণতাবলয়ের কাহিনী আলাদীনের গোচর করিলেন, তাহার পরদিন নিদ্রাভঙ্গে সহসা সম্পূর্ণ
অপর্যচিত রাক্ষস প্রাসাদটিকে সংস্থাপিত দেখিয়া তাহার মনে কি প্রকার ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইয়াছিল,
তাহাও বলিলেন। রাজকন্ডার সকল কথা শুনিয়া আলাদীন বুঝিতে পারিল, হুজুরা বাতকর এই
প্রাসাদটিকে দৈত্যের সহায়তায় তাহার স্বদেশ আফ্রিকায় আনিয়া ফেলিয়াছে।

আলাদীন বলিল, “রাজকন্যা, এই বাছকর অতি ভয়ঙ্কর লোক, সেই যে আমাদের এই সর্বনাশ-
সাধন করিয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি। সে কিরূপে এ প্রাণীপের সন্ধান পাইল, তাহা আমি
তোমাকে পরে বলিব, আপাততঃ সেই চূর্ণিত প্রাণীপটা কোথায় রাখিয়াছে, তাহা আমার জানা
আবশ্যক, এ সম্বন্ধে তুমি কিছু বলিতে পার কি?”

রাজকন্যা বলিলেন, “আমি জানি, সে সর্বদা এই প্রাণী নিজের নিকটে বৃকের কাছে জামার মধ্যে অতি
সাবধানে রাখে, কখনও তাহা ছাড়িয়া থাকে না। এক দিন সে তাহার জয়চিহ্নরূপ এই প্রাণী বৃকের জামার
ভিতর হইতে বাহির করিয়া আমাকে দেখাইয়াছিল, তাহার পর আবার সে তাহা বৃকের কাছেই
রাখিল দেখিয়াছি।”

আলাদীন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল, “প্রিয়তমে, তুমি আমার কথায় অনন্তই হইও না, আমি
তোমাকে একটি অত্যন্ত গুরুতর কথা জিজ্ঞাসা করিব। আমার বিশেষ অহরোধ, এই নরশিশাচ তোমাকে
হতগুণ করিয়া এ পর্যন্ত তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছে, খুলিয়া বল।”

রাজকন্যা বলিলেন, “আমাকে এখানে আনিয়া পর্যন্ত সেই বাছকর প্রত্যহ একবারমাত্র আমার সঙ্গে
সাক্ষাৎ করে, কিন্তু আমি তাহার প্রতি অত্যন্ত ঘৃণা প্রকাশ করায় বোধ করি, সে আর আমার সঙ্গে
সাক্ষাৎ অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিতে সাহসী হয় নাই। সে আমাকে তোমার প্রতি বিবাসবাদিনী হইয়া
তাহার উপনন্দী হইবার জন্য পুনঃ পুনঃ অহরোধ করিতেছে। সে আমাকে বৃষাইবার চেষ্টা করিতেছে যে,
আমি আর কখনও তোমার সাক্ষাৎ পাইব না, আমার পিতার আদেশে তোমার প্রাণদণ্ড হইয়াছে। সে
তোমাকে অকৃতজ্ঞ, বিবাসবাদাতক প্রভৃতি নানা প্রকার অভ্যর্থনা সোধেন করে; তোমার বাহা কিছু স্রুথ-
দোষাভ্যাস, তাহার কারণই সে, আর যে কত ইতর-জনোচিত গালি তোমার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করে, তাহা আমি
মুখে আনিতে পারি না। সে আমাকে নানা প্রকার বস্ত্রাদি দিবার ভয় দেখাইতেছে; বলিয়াছে, যদি আমি
সহজে তাহার প্রতি অহুরাগিনী না হই, তবে সে অগত্যা আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিবে। বাহা হউক,
এত দিন পরে তোমাকে দেখিয়া আমি মৃতদেহে প্রাণ পাইলাম। আমার সকল ভয়, সকল উদ্বেগ দূর হইল।”

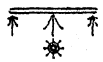
আলাদীন বলিল, “রাজকন্যা, আমি তোমাকে এই শত্রুর কবল হইতে যে উদ্ধার করিতে পারিব,
তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু এজন্য আমাকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। আমি এখন একবার
নগরে যাইব, মধ্যাহ্নকালে আবার ফিরিয়া আসিব। কি উপায়ে কার্যোদ্ধার করিব, তাহা স্থির করিয়া
পরে তোমাকে বলিতেছি। তবে এখন এইমাত্র বলি, যদি পরে তুমি আমাকে এখানে ছদ্মবেশে উপস্থিত
হইতে দেখ, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র বিম্বিত হইও না। তুমি দাগীগণকে বলিয়া রাখিবে যে, শুণ্ডবারে
আমি আঘাত করিবারাত্র বেন তাহারায় ঝার খুলিয়া দেয়।” রাজকন্যা আলাদীনের প্রস্তাবে সম্মতি
জ্ঞাপন করিলেন।

আলাদীন প্রাগাদ পরিত্যাগ করিয়া পথে আসিয়া উপস্থিত হইল; দেখিল, অগ্নুর এক জন ক্রুর
বাইতেছে। আলাদীন ক্রতপদে তাহার নিকটে উপস্থিত হইল, সে পথিককে একটি গুপ্তের অন্তরালে লইয়া
গিয়া তাহাকে কিছু পুরস্কার প্রদান করিয়া তাহার সহিত নিজের পরিচ্ছদ পরিবর্তন করিল। আলাদীন
ক্রুরের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া নানা পথে ঘুরিতে ঘুরিতে বাজারের মধ্যে আসিয়া পড়িল, এবং এক ঔষধ-
বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া দোকানের অধিকারীকে এক প্রকার শুঁড়ার নাম বলিয়া তাহা তাহার
দোকানে আছে কি না জিজ্ঞাসা করিল।

জয়চিহ্ন
বস্তু ধারণ



ছদ্মবেশের
সংকেত



দোকানী আলাদীনের পরিচ্ছদ দেখিয়াই বৃষ্টি, লোকটা বড় গরীব, হুতরাং সে বলিল, “হাঁ, শুঁড়া আছে ষটে, কিন্তু তুমি কি তাহা কিনিতে পারিবে? তোমার যে এত পয়সা আছে, তাহা ত’ দেখিয়া বোধ হইতেছে না।” আলাদীন তাহার মুগ্ধপূর্ণ ধূলি দোকানদারকে দেখাইল, এবং একটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া অর্দ্ধভরি শুঁড়া ক্রয় করিল। অনন্তর আলাদীন গুপ্তধারপথে তাহার প্রাণদে প্রত্যাগমন করিল, রাজকন্ডার কক্ষে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল, “রাজকন্ডা, আমি এখন তোমাকে যে পরামর্শ দিব, তদনুসারে কাণ্ডা করা তোমার পক্ষে কিঞ্চিৎ কষ্টকর হইলেও বোধ করি, উদ্ধারলাভের আশায় তুমি সেই উপদেশ পালন করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমাদের স্বদেশে প্রত্যাগমনের ইহা ভিন্ন কোন আশা নাই, তাহা মনে রাখিবে।

উদ্ধারলাভের
যত্ন যত্ন



“আমার পরামর্শ এই যে, তুমি আজ তোমার সর্বোৎকৃষ্ট বেশভূষায় সুসজ্জিত হইবে, তাহার পর যাহুকর তোমার নিকট উপস্থিত হইলে তাহার প্রতি বিন্দুমাত্র বিরক্তিবাব না দেখাইয়া, ভুবনমোহন হাঙ্রে প্রেমবদ্যী প্রেমিকার ছায়া তাহার অভ্যর্থনা করিবে। তুমি তাহার সহিত কথাবার্তা তাহাকে বৃত্তিতে দিবে যে, তুমি সম্পূর্ণরূপে আমার আশা ভাগ করিয়াছ। তাহার প্রস্তাবে আত্মসমর্পণ করিতে তোমার আর আপত্তি নাই; সে তোমার কথায় স্বয়ং গলিয়া জল হইবে, তখন তুমি তাহাকে তোমার সহিত একত্র বসিয়া আহাদের নিমন্ত্রণ করিবে; বলিবে, ‘তোমার পানের জন্ত উৎকৃষ্ট সত্ত্ব কিছু সংগ্রহ করিলে আমোদটা বেশ পর্যাপ্ত হইতে পারিবে।’ তোমার কথার ভুলিয়া সে মত্ত সংগ্রহ করিতে যাইবে, ইত্যবসরে তুমি একটা পাতে এই শুঁড়া কিরণপরিমাণে ঢালিয়া রাখিবে। সেই পাতে মত্ত ঢালিয়া কোশল-সহকারে তাহাকে পান করিতে দিবে। যাহুকর তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্ত তোমার অমরোষ অমাত্র করিতে পারিবে না, সে সমস্তটুকু নিশ্চেষ্টরূপে পান করিবে; কিন্তু পান করিবার পর আর তাহাকে স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে হইবে না, একেবারে ঢালিয়া পড়িবে। তাহার পর যাহা করিতে হয়, আমি করিব।”

রাজকন্ডা আলাদীনের কথা শুনিয়া বলিলেন, “একটা সামান্য যাহুকরের সঙ্গে এ ভাবে আমোদ-প্রমোদের অভিনয় করিতেও আমার মনে ঘৃণার উদ্বেগ হইতেছে, কিন্তু কার্যোদ্ধারের জন্ত সকলই করিতে হয় আমার মনে ইহাতে যতই ঘৃণার সঞ্চার হউক, আমাকে ইহা করিতেই হইবে। আমি বৃত্তিতেছি, ইহা তোমার কিম্বা আমার উদ্ধারের আশা নাই।” রাজকন্ডার নিকট হইতে আলাদীন বিদায় লইয়া চলিয়া গেল, এবং সমস্ত দিন প্রাণদেবের অধীনে প্রতীক্ষা করিয়া রাত্রিকালে গুপ্তধারপথে প্রাণদেবের মধ্যে প্রবেশ করিল।

রূপের
মোহন ফাঁদ



এ দিকে সন্ধ্যার পূর্বেই রাজকন্ডা পরম যত্নে বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারে দেহ সুসজ্জিত করিলেন, সুন্দররূপে বেশি রচনা করিলেন, মুখে প্রসন্নতা আনয়ন করিলেন, প্রসাধনে তাঁহার রূপ যেন শতগুণে উজ্জলিয়া উঠিল। তাহার পর নির্দোষ যাহুকরকে প্রত্যাশিত করিবার জন্ত তাহার আগমন-প্রতীক্ষায় প্রেমের ফাঁদ পাতিয়া দোকান উপর বসিয়া রহিলেন।

সন্ধ্যাকালে যাহুকর রাজকন্ডার সমীপে উপস্থিত হইল। রাজকন্ডা তাহাকে তাঁহার কক্ষদ্বারে দেখিবামাত্র উত্তীর্ণা দাঁড়াইলেন এবং মহা সমাদরে তাহাকে ভিতরে আহ্বান করিলেন, পার্শ্ববর্তী উৎকৃষ্ট আগনে তাহাকে বসিবার জন্ত অরোহণ করিলেন। রাজকন্ডা যাহুকরকে কোন দিন হর্যাক্য ভিন্ন মিষ্টকথা বলেন নাই, আজ এইপ্রকার সমাদর দেখিয়া এবং রাজকন্ডার রূপ ও বস্ত্রালঙ্কারের আভিশযো শতগুণ উজ্জল হইয়াছে লক্ষ্য করিয়া, যাহুকর একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল, তাহার চৈতন্য ও বুদ্ধি লোপ পাইল, পাপলালসা তাহার বকের মধ্যে ছল করিয়া অগ্নিতে লাগিল, রাজকন্ডার দীপ্ত আভিত্যাস ছুটি তাহার হৃদয় বিধিয়া প্রাণ বাহির করিবার উপক্রম করিল। যাহুকর মুগ্ধ-হৃদয়ে রাজকন্ডার নির্দিষ্ট আসনে বসিয়া পড়িল।

কয়কাল স্থিরভাবে থাকিয়া বাছকর আত্মসম্বরণ করিয়া গইলে, রাজকন্ডা তাহাকে সন্ধান করিয়া
বিলেন, “আজ তুমি আমার ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইয়াছ বোধ হইতেছে, কিন্তু বিশেষের কোন কারণ
নাই। আমি এ কয় দিন অবস্থা-পরিবর্তনে এতই মুগ্ধ, ব্যথিত ও সন্মোহিত হইয়াছিলাম যে, তোমার
ক্ৰিয়-নিবেদন আমার কর্ণে প্রবেশ করে নাই, তোমাকে দুর্ব্বাসা বলিতেও আমি স্মৃতিত হই নাই; কিন্তু আমি
তোমার অগৃহের পরিণাম চিন্তা করিয়া দেখিলাম; বুঝিলাম, আলাদীন আমার পিতার আদেশে এত দিন
কুতুম্বে পতিত হইয়াছে, এ জীবনে যে পিতার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সে আশাও নাই; হৃদয়ং এখন বাহাতে
পূর্ব্বকথা ভুলিয়া যাইতে পারি,—আবার স্বস্থস্থপ্নে নিমগ্ন হইতে পারি, তাহা করাই আমার কর্তব্য।
আমি এখন হইতে তোমার প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করিব মনে করিয়াছি, তুমি ভিন্ন এ বিদেশে আমার
দ্বিতীয় আত্মীয় আর কেহ নাই। আমার প্রতি তোমার প্রেমের পরিচয় পাইয়াছি, তোমার অনুরাগে
আমার অবহেলা করা কর্তব্য নহে। প্রিয়-বন্ধু, তুমি আমার পূর্ব্বকৃত রূঢ় আচরণের কথা বিস্মৃত হও।
আমি তোমার অভাবনার জন্ত খানার আয়োজন করিয়াছি, আজ আমার সহিত তোমাকে আহ্বান করিতেই
হইবে; কিন্তু আমার কাছে চীন দেশের যে মজা আছে, তাহা আদৌ উৎকৃষ্ট নহে, আমার ইচ্ছা, তুমি আফ্রিকা-
দেশোৎসর্গ উৎকৃষ্ট মদিরা ক্রয় করিয়া আন; তাহা হইলে আমাদের আমোদ বেশ জমাটী হইবে।”

বাছকর ইতিপূর্বে এক দিনও মনে করিতে পারে নাই যে, সে এত সহজে রাজকন্ডার প্রণয়ভাজন হইতে
পারিবে, রাজকন্ডার কথাগুলি তাহার নিকট অত্যন্ত সরল প্রেমপূর্ণ বলিয়া বোধ হইল। রাজকন্ডার সৌহার্দে
সে আচ্ছাদে আত্মহারা হইয়া পড়িল। রাজকন্ডাকে বলিল, “প্রিয়তমে, তোমার কথা শুনিয়া আমি বড়ই
আনন্দিত হইলাম, এখানে অতি উৎকৃষ্ট মজা পাওয়া যায়, তাহাতে সন্দেহ নাই; বিশেষতঃ আমার গৃহে যে মজা
আছে, পৃথিবীর আর কোথাও এরূপ উৎকৃষ্ট মজা পাওয়া যায় না। আমি তাহারই ছই বোতল এখন
আনিতেছি।” রাজকন্ডা বলিলেন, “প্রিয়তম, তুমি নিজে ঘাইও না, তোমার বিরহ আমার অদৃষ্ট; তুমি আজ
কাহাকেও পাঠাইয়া এখানে বসিয়া আমোদ কর।” বাছকর বলিল, “শ্রদ্ধারি, আমি কি আর ইচ্ছা করিয়া
যাইতেছি? আমি ভিন্ন সে মজা আর কেহ আনিতে পারিবে না, আমাকেই যাইতে হইবে। তুমি একটু
অপেক্ষা কর, শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।” রাজকন্ডা বলিলেন, “আমি তোমার আশায় বসিয়া থাকিলাম, খাণ্ডব্রব্য
সমস্ত প্রস্তুত, দেখিও, যেন বিলম্ব না হয়, এ অধীনীকে বেশীক্ষণ ভুলিয়া থাকিও না।” বাছকর প্রকুরাচিতে
আলাদীনের প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মজা আনিতে চলিল।

এ দিকে রাজকন্ডা একটি পানপাত্র আলাদীনপ্রদত্ত সাদা চূর্ণ ঢালিয়া পাত্রটি নির্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া দিল।
ইহার অন্তরালে পেরেই বাছকর ছই বোতল মজা লইয়া রাজকন্ডার কক্ষে প্রত্যাপন করিল এবং রাজকন্ডার
পাশে বসিয়া তাঁহার হৃদয় মূখের দিকে মৃদুস্বরে চাহিতে লাগিল। হৃদয় মূখে হাসির ভরস ভুলিয়া
রাজকন্ডা বলিলেন, “আমার ইচ্ছা ছিল, তোমাকে কিছু গান শুনাই, কিন্তু আমরা এখানে বসন কেবল
ছই জন মাত্র আছি, তখন গীত অপেক্ষা গল্পই তোমার অধিক প্রীতিকর হইবে, কি বল? রাজকন্ডার
গভীর প্রেমের পরিচয় পাইয়া বাছকর বিপ্লবিত-হৃদয়ে বলিল, “সেই ভাল, গল্পই বল, তোমার বিধুমুখে
মধুর গল্প শুনিতে আমি বড় ব্যগ্র হইয়াছি।”

গল্প করিতে করিতে রাজকন্ডা বাছকরপ্রদত্ত এক পাত্র মজা পান করিলেন, তাহার পর তিনি বলিলেন,
“তোমার মজা, তাই, সত্যি অতি উৎকৃষ্ট, এমন উত্তম মজা আমি জীবনে কখন পান করি নাই।” বাছকর
বলিল, “রাজকন্ডা, তুমি বড় হুসিকা, মজার গুণ ঠিক বুঝিয়াছ, বলিতে কি, মজা পান করিয়া এত আমোদ

প্রেমচাতুর্যের

অভিনয়



মদের সঙ্গে
গল্পের বৃন্দা



আমি আর কোথাও কখন পাই নাই।” উভয়ের মধ্যে পুনঃ পুনঃ মন্তপান চলিতে লাগিল, বাহুর মনোবৃত্তি বিমোহিত হইল। কিয়ৎক্ষণ আমাদের পরে রাজকন্তা বলিলেন, “এ দেশে মন্তপানের দ্রব্য কি, জানি না, কিন্তু আমাদের চীনদেশের নিয়ম এই যে, আমরা নিজের নিজের স্বতন্ত্র পাত্র রাখি, বাহাকে অভ্যস্ত ভালবাদা যায়, নিজের হাতে সেই পাত্রে মদ ঢালিয়া সেই ভালবাদায় পাত্রকে উপহার প্রদান করা হয়। এ নিয়মটি বড় উত্তম বলিয়া আমার মনে হয়।” বাহুর বলিল, “রাজকন্তা, ঠিক বলিয়াছ, বড় উত্তম নিয়ম। আমি মনে করিতেছি, চীনদেশের এই নিয়ম আমি আফ্রিকাদেশে প্রচলিত করিব। আমি তোমার অগ্রগৃহের কথা কখন ভুলিব

না; তোমাদের দেশের নিয়মেই কিছুকাল মন্তপান চলুক না।”— রাজকন্তা দেখিলেন, ইহাই নৈকোৎকৃষ্ট অবসর, তিনি এক জন দাসীকে একটি মন্তপাত্র বাহির করিয়া দিবার জ্ঞাত আদেশ করিলেন। দাসী পূর্ণাঙ্গিকানুসারে, যে পাত্রে চূর্ণ সংরক্ষিত হইয়াছিল, তাহাই বাহির করিয়া রাজকন্তার হস্তে প্রদান করিল। রাজকন্তা তাহা মত্তে পূর্ণ করিয়া বাহুর হস্তে প্রদান করিলেন। বাহুর রাজকন্তাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পাত্রস্থ মদ্যস্বাদ এক নিম্নাঙ্গে উদরস্থ করিল। যেমন পাত্রটি নিঃশেষিত করিল, অমনি সে সোকার উপর ঢলিয়া পড়িল এবং ষোড়শ নিম্নাঙ্গ আচ্ছাদিত হইল, তাহার বিস্ময় চৈতন্য রহিল না।



মন্ত-
পানে
স্ব-
তন্ত্র



বাহুরকে অচেতন দেখিবামাত্র রাজকন্তা ষাড় খুলিয়া দিলেন, আলাদীন অজ্ঞ কক্ষ আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছিল, সে তৎক্ষণাৎ সেই প্রমোদ-কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজকন্তাকে আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া আলাদীন বলিল, “প্রিয়তমে, এখনও আমাদের আনন্দ প্রকাশ করিবার সময় আসে নাই, তুমি কক্ষান্তরে গমন কর, আমি মত্ত বাত্রার আয়োজন করি।” রাজকন্তা সেই প্রমোদ-কক্ষ পরিত্যাগ করিলে, আলাদীন দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর বাহুরকে পরিচ্ছদ খুলিয়া তাহার বুকের সন্নিকট হইতে অল্পত প্রদীপটি বাহির করিয়া লইল, এবং তাহা ধ্বংস করিল।

আশ্চর্য্য প্রদীপ

উদ্ধার



মুহূর্তমধ্যে প্রবীণের দাস সেই বিকটাকার দৈত্য আলাদীনের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আলাদীন তাহাকে বলিল, “দৈত্যরাজ, তুমি এই প্রাসাদ এখান হইতে ভূমিয়া লইয়া এই মুহূর্তে চীনদেশে যাত্রা কর এবং যেখানে ইহা পূর্বে স্থাপিত ছিল, সেই স্থানে সংস্থাপিত কর।” দৈত্য মন্তক নাড়িয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইল। তাহার পর ভূমিকম্পের মত প্রাসাদটি অতি অল্প পরিমাণে ছুইবার কাঁপিয়া উঠিল, আর কিছু বৃষ্টিতে পারা গেল না; কিন্তু এই অরকাত্মের মধ্যেই দৈত্য আলাদীনের প্রাসাদ চীনদেশে আনিয়া স্থলতান-প্রাসাদসন্নিকটে স্থাপন করিয়া প্রস্থান করিল।

আলাদীন রাজকন্ডার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, “প্রিয়তমে, কলা প্রভাতে আমাদের আনন্দ পূর্ণতা লাভ করিবে, কাল হইতে আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সুখভোগ করিব।” আলাদীন দীর্ঘকাল উপবাসী ছিল, রাজকন্ডা বাহুরের জন্ত যে খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তখনও তাহা টেবিলের উপর সজ্জিত ছিল, আলাদীন রাজকন্ডার পাশে আহার করিতে বসিল, উভয়ে ইচ্ছামুসারে মত্ত পান করিলেন। আলাদীন দেখিল, বাহুরের পুরাতন মত্ত সতাই অতি উৎকৃষ্ট। আহারান্তে উভয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

কন্ডা হারাইয়া স্থলতানের উদয়ে ক্ষুধা কিঞ্চিৎ চক্ষু নিদ্রা ছিল না। তিনি রাজকর্ণা পরিভাগ করিয়া প্রাসাদের একটি নির্জন কক্ষে উপবেশন করিয়া প্রিয়তমা হুহিতার কথাই চিন্তা করিতেন। আলাদীনের প্রাসাদ যেক্ষণে স্থলতানের প্রাসাদ-সন্নিকটে দৈত্য কর্তৃক সংস্থাপিত হইল, তাহার পরদিন প্রভাতে অনেক বেলা পর্যন্ত স্থলতান তাঁহার শয্যা পরিভাগ করিলেন না, শয্যা শায়িত থাকিয়া কন্ডার গুণ ও বিপদের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি ধীরে ধীরে শয্যা ত্যাগ করিয়া, বাতায়ন-সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং সতৃষ্ণদৃষ্টিতে যেখানে আলাদীনের প্রাসাদ ছিল, সেই দিকে একবার চাহিলেন। তিনি বিস্ময়াচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখিলেন, স্থানটি শূণ্য নহে বটে, কিন্তু নিবিড় কুয়াশাজালে সে স্থান সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। এত বেলায় এরূপ গাঢ় কুজ্জটিকা তাঁহার নিকট কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল, তিনি চক্ষু মুছিয়া আগ্রহভরে আর একবার চাহিলেন, কিন্তু এবার আর তাহা কুয়াশা বলিয়া বোধ হইল না, আলাদীনের প্রাসাদটি তাঁহার নয়নসমক্ষে ফুটিয়া উঠিল। দ্ৰুত ও বেদনা তাঁহার অন্তর হইতে মুহূর্তমধ্যে অন্তহিত হইয়া সেখানে আনন্দ ও ব্যাকুলতার সঞ্চার হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিয়া, এক জন ভৃত্যকে একটি অর্থ আনিবার আদেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্ত একটি সুসজ্জিত অর্থ আনীত হইল, স্থলতান সেই অর্থে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে আলাদীনের প্রাসাদটিমুখে ধাবিত হইলেন।

আলাদীন প্রভাতে গাত্রোথান করিয়া বাতায়ন-সন্নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং স্থলতানের প্রাসাদের দিকে দৃষ্টি নিষ্কণ করিতেই দেখিতে পাইল, স্থলতান অধারোহণ করিয়া, দ্রুতবেগে তাহার প্রাসাদের দিকে আসিতেছেন। আলাদীন প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিল এবং সোপানশ্রেণীর পাদদেশে স্থলতানকে দেখিতে পাইল। আলাদীন পদম ভক্তিতে তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া, তাহাকে অর্থ হইতে অবতরণ করাইল। স্থলতান বলিলেন, “আলাদীন, আমার কন্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়া, আর তোমার সঙ্গে আমি কোন কথা বলিতে পারিতেছি না।”

আলাদীন স্থলতানকে সঙ্গে লইয়া, তাঁহার কন্ডা বদল বদলের কক্ষে প্রবেশ করিল। আলাদীন পূর্বেই রাজকন্ডাকে হারাইয়াছিল যে, তাহারা আফ্রিকা হইতে চীনদেশে উপস্থিত হইয়াছে। স্থলতান তাঁহার কন্ডার কক্ষে উপস্থিত হইয়া কন্ডাকে দেখিতে পাইলেন, পিতা ও কন্ডার আবার মিলন হইল, রাজকুমারী স্নেহময় দৃষ্টিকে অনেক ক্ষণ পরে বোর বিপদান্ত দেখিতে পাইয়া বিশেষ সুখী হইলেন। আনন্দাতিশয়ো রাজকন্ডা

শূণ্যপথে
সুসজ্জিত
প্রাসাদ



মিলন-অক্ষর
উল্ল প্রবাহ



আহার
সৌভাগ্য-
শিখরে



অক্রমোচন করিতে লাগিলেন, হুলতানের চক্ষেও আনন্দাশ্রয় আবির্ভাব হইল। অনেকক্ষণ নীরবে অবস্থা করিয়া হুলতান কত্কাকে তাঁহার অন্তর্কানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রাসাদের সহিত কোথায় কিল্লো তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও জানিবার জন্ত তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

রাজকর্ত্তা হুলতানের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। রাজকর্ত্তার মুখেই হুলতান শুনিতে পাইলেন, আলাদীন তাঁহার কত্কাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছে, এবং তাঁহার কত্কা ও প্রাসাদ অপসারণ-কার্যে আলাদীনের কিছুমাত্র দোষ ছিল না।

হুলতান রাজকর্ত্তার মুখে সকল কথা শুনিলেন, আলাদীনকে তাঁহার আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার ছিল না। আলাদীন হুলতানকে সঙ্গে লইয়া ভোজনাগারে প্রবেশ করিল। হুলতান দেখিলেন, হতভাগা যাহকরের মৃতদেহ সোফার উপর পড়িয়া আছে। মত্তের সহিত যে চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অতি উগ্র বিষ, তাহাই পান করিয়া যাহকর গতান্ব হইয়াছিল।

হুলতান যাহকরের মৃতদেহ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আলাদীনকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস, তুমি আমার পূর্ব্ণব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইও না, আমি কত্কাশোকে অত্যন্ত কাতর হইয়াই তোমার প্রতি রক্ত আচরণ করিয়াছিলাম।” আলাদীন বলিল, “জাঁহাপনা, আপনি যাহা কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন, তাহাই করিয়াছেন, সে জন্ত আমার কোন আক্ষেপ নাই। এই যাহকর অতি নরাধম—আমার সকল কষ্ট ও যন্ত্রণার কারণ সে; আপনার অবসরকালে ইহার অত্যাচারের কথা আপনাকে নিবেদন করিব। তাহার সেই বিধাসম্বাতকৃত্য আমার মৃত্যু অনিবার্য ছিল, কেবল আল্লা দয়া করিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।” হুলতান বলিলেন, “সে সকল কথা পরে হইবে, এখন এস, আজ আমরা এই মিলন-আনন্দের জন্ত উৎসবের আদেশ করি।”

আলাদীন যাহকরের মৃতদেহ খাপদজন্তর আহারের জন্ত, দূরে নিক্ষেপ করিবার আদেশ প্রদান করিল। অতঃপর হুলতানের আদেশে নগরমধ্যে দশ-দিনব্যাপী মহোৎসব আরম্ভ হইল, চতুর্দিকে আহার ও আনন্দ ধুম পড়িয়া গেল, দিবসরাত্রি নৃত্যগীতে রাজধানী প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

এই প্রকারে আলাদীন মৃত্যুর হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, সৌভাগ্যশিখরে প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু ইহাই শেষ নহে, অতঃপর আর একবারও তাহার মহাবিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, সে কথা এখন বলিতেছি।

আফ্রিকাদেশীয় যাহকরের একটি ছোট ভাই ছিল, বাহুবল্যায় তাহার নৈপুণ্যও অল্প ছিল না। পাশবিক ষড়্‌যন্ত্র ও অস্ত্রের অনিষ্টকর চক্রান্তে তাহার নৈপুণ্য অনেক অধিক ছিল। তাহার উভয়ে একত্র বাস করিত না, এক জন গৃহে থাকিত, অজ্ঞ জন দেশভ্রমণে কাগক্ষেপণ করিত; কিন্তু উভয়ের সহিত বৎসরের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ না হইলেও, উভয়ে দৈববিজ্ঞা দ্বারা উভয়ের বিপদমগ্ন ও অবস্থানের কথা জানিতে পারিত। ছোট যাহকর এক দিন তাহার দৈববিজ্ঞা-প্রভাবে জানিতে পারিল, তাহার জ্যেষ্ঠ সহোদর দেহত্যাগ করিয়াছে—বিষপ্রয়োগে তাহার মৃত্যু হইয়াছে। হুলতানের জামাতা তাহার প্রাণরক্ষণ করিয়াছে। গণনা-প্রভাবে যাহকর আরও জানিতে পারিল যে, চীনদেশে এই কামণ্ডলু আছে।

ভ্রাতৃহস্তার
প্রতিহাস



ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া, যাহকর রূপা আক্ষেপে সময় নষ্ট না করিয়া, তাহার ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধপ্রদানের সংকল্প করিল, এবং একটি অশ্বে আরোহণ করিয়া চীনদেশান্তিমুখে ধাবিত হইল। বহু পথকষ্ট সহ করিয়া, অনেক দিন পরে সে বহুদূরবর্ত্তী চীন-রাজ্যের রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া একটি বাসা হইল।

এ দিন বাহুর চানরাজধানীতে পৌঁছিল, তাহার পরদিন প্রভাতে সে রাজধানী-পরিদর্শনে বাহির হইল ; সকল স্থানে ঘুরিলে রাজ্যের নতুন নতুন সংবাদ জানিতে পারা যায়, সে সেই সকল স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। এক স্থানে আসিয়া সে ফাতিমা নামে একটি পরমশ্রদ্ধাশীল রমণী গুণ-জ্ঞানের অনেক খ্যাতি জানিতে পাইল। বাহুর ভাবিল, তাহারই সাহায্যে সে কার্যোদ্ধার করিবে। বাহুর এক জন লোককে লিখিতে ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশয়, ফাতিমা কিরূপ ধর্মপরায়াণা, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে পারেন কি ?”

সেই গোষ্ঠী বাহুরের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, বাহুরের মুখের দিকে চাহিয়া বিম্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি ফাতিমার কথা কখনও শোন নাই ? তাহার জায় ধার্মিকা রমণী এ দেশে আর কে আছেন ? এত উপবাস, এমন নিষ্ঠা আর কাহারও করিবার সাধ্য নাই। গোম, শুক্রবার ব্যতীত তিনি কখনও তাহার হুটীর তাগ করেন না, ঐ ছই দিন তিনি নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, লোকের উপকার করিয়া বেড়ান ; তাহার কোন পীড়া থাকে, তাহার মস্তকে তিনি হাত দিলেই আরোগ্য হইয়া যায়।”

বাহুর আর অধিক কথা শুনিতে চাহিল না। সে স্রীলোকটির ঠিকানা জানিয়া লইয়া, তাহার গৃহাভিমুখে ধাবিত হইল। রাজি অধিক হইলে বাহুর একখানি তরবারি হস্তে লইয়া, ধীরে ধীরে ফাতিমার হুটীরে প্রবেশ করিল এবং সে নিদ্রিতা ফাতিমাকে জাগরিত করিল।

ফাতিমা চাহিয়া দেখিল, সম্মুখে এক জন অপরিচিত লোক, তাহার হস্তে তরবারি। তরবারি-খানি ফাতিমার বক্ষের উপর উত্তর করিয়া, বাহুর দৃঢ়স্বরে বলিল, “যদি তুমি চীৎকার করিবে কি কোন প্রকার শব্দ করিবে, তাহা হইলে তরবারির এক ষোঁটাতে তোমার প্রাণবিনাশ করিব। উঠ, উঠিয়া আমি যাঁহা বলি, তদনুসারে কাজ কর।” ফাতিমা কাঁপিতে কাঁপিতে শয্যা ত্যাগ করিল। বাহুর বলিল, “তুমি কোন ভয় করিও না, আমার কথা শোন, আমাকে তোমার বস্ত্র প্রদান করিয়া আমার বস্ত্র তুমি গ্রহণ কর।”

বস্ত্রপরিবর্তন শেষ হইলে বাহুর ফাতিমাকে বলিল, “তোমার মত করিয়া আমার মুখ চিত্রিত করিয়া দাও, যেন লোকে আমাকে দেখিয়া তুমি বলিয়া মনে করে, আর এ রং যেন সহসা উঠিয়া না যায়।” বাহুর ফাতিমাকে অভয়দান করিলে সে ধীরে ধীরে আসিয়া রং ও তুলি আনিয়া বাহুরের মুখ রঞ্জিত করিল ; ফাতিমার কণ্ঠ যে কবচ ছিল, তাহা তাহার কণ্ঠে বিলম্বিত করিয়া দিল, যে লাঠি লইয়া সে ভ্রমণ করিত, সে লাঠি তাহার হস্তে দিল, তাহার পর একখানি দর্পণ আনিয়া, তাহার হস্তে দিয়া বলিল, “দেখ, লোকে তোমাকে ঠিক ফাতিমা বলিয়াই মনে করিবে, তোমাকে ছদ্মবেশী পুরুষ বলিয়া কেহ চিনিতে পারিবে না।” বাহুর এইরূপে সজ্জিত হইয়া সহসা ফাতিমাকে আক্রমণ করিল, এবং পাছে তরবারির আঘাতে তাহার প্রাণবধ করিলে কেহ রক্ত দেখিয়া কোনরূপ সন্দেহ করে, এই ভয়ে গলা টিপিয়া তাহার প্রাণবিনাশ করিল এবং তাহার মৃতদেহ দূরে একটি গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

প্রভাতে বাহুর আগাধানের প্রাসাদসমীপে উপস্থিত হইল। বাহুরকে দেখিয়া রাজধানীতে জনসাধারণ ফাতিমা বলিয়া মনে করিয়া, তাহার চতুর্দিকে সমবেত হইতে লাগিল। অনেকে আসিয়া তাহাদের পীড়া হইতে মুক্তিদানের জন্য তাহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, কেহ কেহ তাহার চরণবন্দন করিয়া অনুরোধ প্রার্থনা করিল। বাহুর কাহারও মস্তকে হাত দিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিল, কাহাকেও ঈর্ষাকো শব্দ করিল। ক্রমেই বাহুরের চারিদিকে জনতারুদ্ধি হইল, মহা কোলাহল উপস্থিত হইল।



প্রাসাদে
প্রতিস্থিত-
প্রাসাদী
বাড়ির



সেই কোলাহল অদূরবর্তী প্রাসাদবাগিনী রাজকন্ডা বদরুল বদরের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি ইহার কারণ জানিবার জন্ত তৎক্ষণাৎ একটি দাসীকে প্রেরণ করিলেন। অবশেষে তিনি শুনিতে পাইলেন, ফাতিমা-নানী একটি ধার্মিকা রমণী সেখানে উপস্থিত হইয়া পীড়িত ব্যক্তিগণের মন্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া, তাহাদিগের রোগ আরোগ্য করিতেছে, সেই জন্ত সেখানে জনসমাগম হওয়াতে এক্ষণ গোলামাল হইতেছে।

রাজকন্ডা অনেক দিন হইতেই ফাতিমার গুণের কথা শুনিয়াছিলেন, ফাতিমা তাঁহার প্রাসাদের এত নিকটে আসিয়াছে শুনিয়া, তাহাকে দেখিবার জন্ত রাজকন্ডার মনে অত্যন্ত আগ্রহ হইল। তিনি কয়েক জন খোজাকে আদেশ করিলেন, “ঐ ধার্মিকা রমণীকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।”

খোজারা ফাতিমারপী বাড়িকরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিল, “ধর্মশীলা রমণী, আমাদের রাজকন্ডা একবার আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন; আপনি আমাদের সঙ্গে তাঁহার প্রাসাদে আনুন।”

বাড়িকর খোজার কথা শুনিয়া পরম প্রীত হইল; আল্লাদভরে বলিল, “রাজকন্ডার আদেশ অবিলম্বেই পালন করা উচিত, চল, বাইতেছি।” সে খোজাগণের অন্তর্গমন করিল।

রাজকন্ডার প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া বাড়িকর প্রথমে আল্লার নিকট রাজকন্ডার মঙ্গলের জন্ত প্রার্থনা করিল, তাহার পর রাজকন্ডার চরিত্রের, গুণের, ধর্মের নানা প্রকার প্রশংসা করিয়া, তাঁহার মনে ভক্তি-বিশ্বাস সঞ্চার করিল এবং তাহার প্রতি রাজকন্ডার চিত্তও আকর্ষণ করিল।

রাজকন্ডা যেমন সরলা, তেমনই সম্ভবতঃ, তিনি বাড়িকরের স্তোকবাক্যে মুগ্ধ হইলেন। তাহার স্ত্রীধ বহুতা শেষ হইলে আদর করিয়া তাহাকে কাছে বসাইয়া রাজকন্ডা বলিলেন, “না, অনেক দিন হইতেই তোমার অসীম গুণের কথা শুনিয়া আসিতেছি, কত দিন হইতে তোমাকে দেখিব মনে করিতেছি, কিন্তু কোন-মতে সুবিধা ঘটয়া উঠে না, এত দিন পরে আল্লা আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন, তোমাকে দেখিয়া আমার নয়ন-মন পবিত্র হইল। শুনিয়াছি, তোমার স্বাম্য ধর্মশীলা, আল্লার অহুগৃহীতা রমণী এ চীনস্বাভ্যে আর দ্বিতীয় নাই। তোমাকে আমার একটি অহুরোধ আছে, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে।”

বাড়িকর মিষ্টবাক্যে রাজকন্ডার মন ভুলাইয়া বলিল, “তোমার অহুরোধে যদি আমাকে প্রাণ-বিসর্জন করিতে হয়, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি, তোমার অহুরোধে রাশিব না? আল্লা তোমার যেমন ধন দিয়াছেন, তেমনি তোমাকে মন দিয়াছেন, তুমি ক্রীড়াতির অলঙ্কারবস্ত্র। আমি দেখিতেছি, আল্লা চিরদিন তোমার মঙ্গল করিবেন, তোমার অদৃষ্টে যে সামান্য দুঃখ-কষ্ট ছিল, তাহা কাটিয়া গিয়াছে, এখন তুমি চিরজীবন সুখভোগ করিবে। আমি আল্লার নিকট তোমার মঙ্গলের জন্ত সর্বদা প্রার্থনা করিব। এখন তোমার অহুরোধ কি, সেই কথা বল, শুনিতে আমার বড় আগ্রহ জন্মিয়াছে।”

রাজকন্ডা বলিলেন, “না, আমি তোমাকে কোন অস্ত্র অহুরোধ করিব না। আমি যে অহুরোধ করিব, তাহাতে তোমার কোন অহুবিধা হইবে না।” বাড়িকর বলিল, “না, আমি সে ভয় করি না, আমার ধর্মকর্ণে বাধা না জন্মে, এক্ষণ কোন অহুরোধ ভিন্ন তোমার আর সকল অহুরোধ প্রাণ দিয়াও আমি পালন করিব। তবে আমি এ কথা নিশ্চয় জানি যে, তুমি আমাকে কোন অস্ত্র অহুরোধ করিবে না। তোমার অহুরোধটি কি?”

রাজকন্ডার
চিত্তস্থ
চাহুরী



রাজকন্ডা বলিলেন, “আর কিছুই নেহে, আমার একান্ত ইচ্ছা এই যে, তুমি সর্বদা আমার নিকট বাস কর। আমি তোমার সহিত সর্বদা ধর্মবিধে আগাগ করিতে চাই। আমি বুদ্ধিহীন বালিকা, তুমি মা আমাকে ধর্ম দিও, তোমার সহিত ধর্ম-বিধে সর্বদা আগাগ করিয়া যেন আমার প্রতি আমার ভক্তি হয়, তুমি আমার ধর্ম-জীবনের সঙ্গিনী হও, তোমার ছায় সাধুসংসর্গে আমার জীবন পবিত্র হউক।”

যাদব বলিল, “এ অতি সুখের কথা, ইহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু আমি ফকিরী, এ রাজসংসারের হট্টগোলের মধ্যে কি আমি নির্বিবাদে ধর্মকর্ম নিষ্পন্ন করিতে পারিব? আমি একটু নির্জনে বাস করিতে চাই, এখানে কি তাহার সুবিধা হইবে?”

রাজকন্ডা বলিলেন, “কেন হইবে না মা? আমি তোমাকে একটি নির্জন কক্ষ প্রদান করিব, সেখানে কেহ তোমাকে বিরক্ত করিতে ধাইবে না। আমি অবসরসময়ে তোমার কাছে গিয়া বসিব, তোমার সুখে ধর্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া হৃদয় পবিত্র করিব।”

যাদব দেখিল, তাহার হৃতিসঙ্গি সিদ্ধ করিবার পক্ষে আর উৎকৃষ্টতর সুযোগ হইবে না। সে বিনয়ময়বচনে বলিল, “রাজকন্ডা, তুমি দীর্ঘজীবিনী হও। আমি তোমাকে সর্বদা শুভমতি রাখুন। আজ তুমি এই দরিদ্রা নারীর প্রতি যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিলে, তাহাতে আমি চিরকাল তোমার নিকট বাধিত থাকিব। আমার প্রতি যখন তোমার এত অধিক শ্রদ্ধা দেখিতেছি, তখন আর আমি তোমার অনুরোধে উপেক্ষা প্রকাশ করিব না, আমি তোমার গৃহে বাস করিতে সন্মত হইলাম।”

রাজকন্ডা যাদবের এই কথা শুনিয়া পরম হৃষ্টচিত্তে উঠিয়া বলিলেন, “এস, আমি তোমাকে তোমার বানের জল নির্জন কক্ষ দেখাইয়া দিতেছি; নির্জন কক্ষ অনেকগুলি আছে, যেটো তোমার পছন্দ হয়, সেইটো তুমি গ্রহণ করিতে পার। সেদিকে জনমানবের সমাগম হইবে না, তোমার ধর্মকর্মেরও কোন বাধা হইবে না।”

রাজকন্ডা যাদবকে কয়েকটি কক্ষ দেখাইলেন, সকলগুলিই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত, নির্জন। যাদব সর্বাঙ্গেক্ষা অপকৃষ্ট কক্ষটিই পছন্দ করিল; বলিল, “তোমার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়াই এই কক্ষটি গ্রহণ করিলাম। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কক্ষে আমার আবশ্যক নাই।”

অনন্তর রাজকন্ডা ছদ্মবেশী যাদবকে তাহার ভোজনাগারে লইয়া গিয়া অতি উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য তাহার কুশাস্তি করিলেন। পাছে রাজকন্ডা তাহার ছদ্মবেশ ধরিয়া ফেলেন, এই ভয়ে যাদব প্রথমে কিছু খাইতে সন্মত হইল না, অবশেষে অনেক অনুরোধে সে যে সকল দ্রব্য খাইলে সুখ ভুঁইতে না হয়, সেইরূপ শুক খাদ্য আহার করিল; নানাবিধ সুমিষ্ট কদম্বল, রুটী, মিষ্টান্নে উদর পূর্ণ করিল। রাজকন্ডা বলিলেন, “মা, তোমার যে খাওয়া হইল না দেখিতেছি, আমার দাসীগণ তোমার কক্ষে আরও কিছু খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া আনুক, আবশ্যকানুসারে তুমি তাহা ভোজন করিবে। আমার যখন আবশ্যক হইবে, তখন তোমাকে আমি সংবাদ পাঠাইব।”

যাদব নিজের কক্ষে আসিয়া আবার কতকগুলি খাদ্য গিলিল, কিয়ৎকাল পরে রাজকন্ডার এক খোকা

যাদবের নিকট উপস্থিত হইয়া জানাইল, “রাজকন্ডা তাহার সহিত শাস্কাতের অভিপ্রায় করিয়াছেন।”

যাদব তৎক্ষণাৎ সহাস্রমুখে রাজকন্ডার কক্ষে উপস্থিত হইল। রাজকন্ডা সমাদরের সহিত পুনর্বার তাহাকে নিকটে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, তোমার ছায় পবিত্রহৃদয়া রমণীর পদমূলিতে এই হৃৎকণ্ড প্রণাম পবিত্র হইয়াছে, এখন আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব, আমার এই প্রণাম তুমি কিরূপ দেখিতেছ? আমার এ কামরাটি তোমার কেমন বোধ হয়?”



কৃষ্ণকীর
ধর্মোপদেশ

সৌন্দর্য-
সম্বন্ধে ক্রটি
আবিষ্কার



বাহুদর এক কথার কোন উত্তর দিল না, অবনতমস্তকে অনেকক্ষণ মাটির দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পঃ
তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই কক্ষের চতুর্দিক বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়া বলিল, “রাজকর্তা, এই কক্ষ
যে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু পৃথিবীর সকল সৌন্দর্যের একজ সমাবেশের দিবে
লক্ষ্য রাখিলে বলিতে হয়, ইহাতে একটি ক্রটি রহিয়া গিয়াছে।” রাজকর্তা আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন
“কি ক্রটি, শ্রী বর, আমার প্রাসাদের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিবার জন্য ক্রটি রাখিব না, আমি এই দণ্ডেই তাহ
সম্পূর্ণ করিব।”

বাহুদর বলিল, “রাজকর্তা, যদি আপনার এই সুসজ্জিত কক্ষটির ঠিক মধ্যস্থলে রকপক্ষীর একটি ডিম
ঝুলাইতে পারেন, তাহা হইলেই এই কক্ষের শোভা সম্পূর্ণ হইতে পারে ; কিন্তু কাজটি কিছু কঠিন।”

রাজকর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, “রকপক্ষী কিরূপ পক্ষী মা ? সে ডিম কোথায় পাওয়া যায় ? বতাই কঠিন
হউক, আমি আনাইয়া লইব।”

বাহুদর বলিল, “রকপক্ষী একপ্রকার অতি প্রকাণ্ডদেহে পার্শ্বতা পক্ষী, ডিম্বের আকারও অতি ক্ষুদ্র,
ককেসস পর্বতের শৃঙ্গদেশে এই জাতীয় পক্ষীর বাস। যে মিস্ত্রী এই প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছে, সে চেষ্টা
করিলে এই ডিম সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারে।”

রাজকর্তা ছদ্মবেশী বাহুদরের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রকপক্ষীর
ডিম্বের কথা তিনি ভুলিলেন না, সমস্ত দিন ধরিয়া সেই কথা তাঁহার মনের মধ্যে তোলাগড়া
করিতে লাগিল।

আলাদীন সে সময়ে গৃহে ছিল না, যুগ্মায় করিতে গিয়াছিল, সেই অবসরে বাহুদর আলাদীনের সর্দানপ
করিতে কৃতলঙ্ঘন হইল। কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাইল না, ইত্যবসরে আলাদীন যুগ্মায় শেষ করিয়া
গৃহে প্রত্যাপন্ন করিল।

গৃহে আসিয়া আলাদীন রাজকর্তার কক্ষে প্রবেশ করিল ; তাহাকে চুপন ও আলিঙ্গন দান করিয়া তাঁহ
কুশল জিজ্ঞাসা করিল ; কিন্তু চুপন-প্রতিদানের পর রাজকর্তা মৌনবতী রহিলেন, আলাদীন তাঁহাকে কিছু
বিমর্ষ দেখিতে পাইল। আলাদীন রাজকর্তার ভাবপরিবর্তনে বিস্মিত হইয়া আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিল,
“প্রিয়তম, তোমাকে এমন অগ্রসর দেখিতেছি কেন ? প্রাণেশ্বর, তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে—
তোমার মূখ এত গম্ভীর বিমর্ষ দেখাইতেছে কেন ?—শ্রী বর, আমার অসুস্থস্থিতিকালে কোন কারণে কি
তুমি মনে বেদনা পাইয়াছ ? আল্লার দিবা, আমার কাছে কোন কথা গোপন করিও না। তোমার
মনের বেদনা দূর করিবার জন্য আমার যাহা সাধ্য, তাহা করিতে কখনও কুন্তিত হইব না, কেবল
তোমার হৃৎকেন্দ্রের কারণ কি, আমাকে খুলিয়া বল।”

রাজকর্তা বলিলেন, “প্রিয়তম, আমার ক্ষোভের কারণ অতি সামান্য, সে জন্য যে আমি বিশেষ
কাতর হইয়াছি, তাহাও মনে করিও না। যাহা হউক, আমি মনে কিঞ্চিৎ কষ্ট পাইয়াছি, তাহাতে
আর সন্দেহ নাই, আমি সেই কথাই তোমাকে বলিতেছি। তুমি আমাকে বলিয়াছিলে এবং
আমিও বিশ্বাস করিয়াছিলাম যে, আমাদের এই প্রাসাদের সর্বাঙ্গসুন্দর, ইহার কোন অংশে কোন
ক্রটি নাই। ইহা যে ভাবে সুসজ্জিত, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সম্ভা আর হইতে পারে না। কিন্তু
আমি অনেক বিবেচনা করিয়া দেখিয়া একটি ক্রটি আবিষ্কার করিয়াছি। আমার মনে হয়, আমার
এই কক্ষের ঠিক মধ্যস্থলে যদি রকপক্ষীর একটি ডিম ঝুলাইয়া রাখা যায়, তাহা হইলে ইহার শোভা

রকপক্ষীর
ডিম ভিন্ন
প্রাসাদ-সম্ভা
অসম্পূর্ণ



কণ্ঠে বহিত হইতে পারে। তুমি কি এ কথা স্বীকার কর না? আল্লাদীন বলিল, “রাজকতা, আর সন্তোষ হইবে না, প্রাসাদকক্ষে যদি একটা বকড়ি ঝুলাইলেই তোমার ক্ষোভ নিবারণিত হয়, তাহা হইলে আমি অবিলম্বেই তোমার ক্ষোভ দূর করিব; অতি সামান্ত কথা। তোমার স্বপ্নের জন্ত আমি সন্ধান করিতেছি, আর এই সামান্ত কাণ্ডটি করিব না?”

আলাদীন ভৎক্ষাৎ রাজকতার কক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, তাহার নিজের কক্ষে উপস্থিত হইল, এবং তাহার সন্নিহিত সন্নিকটে হইতে অস্ফুট প্রদীপটি বাহির করিল। আল্লাদীন প্রদীপ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে না, সর্বদা তাহার নিজের নিকটে রাখিত। আল্লাদীন প্রদীপ বর্ষণ করিবামাত্র তাহার সম্মুখে দৈত্য আবির্ভূত হইয়া তাহার আদেশের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আলাদীন বলিল, “দৈত্যরাজ, আমার প্রাসাদটির সজ্জা সর্বাপেক্ষা করিবার জন্ত প্রাসাদের মধ্যস্থলে বকড়িকার একটা ডিঙ্ক ঝুলাইয়া রাখা আবশ্যক বোধ করিতেছি। আমার আদেশ, তুমি একটা স্তব্ধ ডিঙ্ক রাখি। অবিলম্বে এখানে উপস্থিত হও।”

দৈত্য-গর্জনে
ডুমিকম্প



আলাদীন এই কথা বলিতে না বলিতে দৈত্য এমন ভীষণ গর্জনে করিয়া উঠিল যে, প্রাসাদটি প্রচণ্ড ডুমিকম্পের ভায়ে তাহাতে কম্পিত হইয়া উঠিল। আল্লাদীন ইহাতে এতই ভয় পাইল যে, তাহার মূর্ছার উপক্রম হইল, দৈত্যের এই প্রকার ক্রোধের কারণ সে অসহ্য করিতে পারিল না; কিন্তু দৈত্য তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া বকড়ি বসে বলিল, “রে দুঃখিনী, আমি ও আমার সহযোগী দৈত্যগণ তোমার আদেশ পালন করিবার জন্ত অসাধ্যসাধন করিতেছি, কিন্তু তাহাতে তোমার মনের তৃপ্তি হইল না, তাহাতেও তুমি সন্তুষ্ট না হইয়া এখন আমার প্রভুকে আনিয়া এই প্রাসাদের মধ্যস্থলে ঝুলাইতে চাহিতেছিন, তোর মত অকৃতজ্ঞ নরপথ জগতে বিতীয় নাই। এখনই যদি আমি তোমার প্রাণ বিনাশ করিয়া এই প্রাসাদের সহিত তোর জীকে ক্ষয় করিয়া ফেলি, তাহা হইলে তোমার প্রতি উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা হয়, কিন্তু আমি তোমার প্রাণসংহার করিব না, আমি বুঝিতেছি, এই মন্ম সংকল্প তোমার নহে, যদি হইত, তাহা হইলে আমি কখন তোমার প্রাণরক্ষা করিতাম না। কে এইরূপ মন্ম পরামর্শ দান করিয়াছে, তাহা জানি। শীঘ্র আমাকে বল। আমি বুঝিয়াছি, কে এই পরামর্শ দান করিয়াছে, তোর শত্রুর ভ্রাতা ভিন্ন এ পরামর্শ আর কাহারও হইতে পারে না। সে তোমার এই প্রাসাদে ফাতিমার ছদ্মবেশে বাস করিতেছে, ফাতিমাকে বধ করিয়া তাহার বেশ ধারণ করিয়া তোমার সর্বনাশের জন্তই সে এখানে বাস করিতেছে। সেই তোর জীবিত এই প্রকার কুসংসিত প্রস্তাব করিয়াছে; তাকে বধ করিবার জন্তই তাহার এই ষড়যন্ত্র। তুমি ঈর্ষিতে চাহিলে তা’ সাধনা হইবে।” — দৈত্য আর কোন কথা না বলিয়া সেখান হইতে অন্তহিত হইল।

দৈত্যের সমস্ত কথা শুনিয়া আল্লাদীন ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে পারিল। আল্লাদীন অবিলম্বে রাজকতার কক্ষে উপস্থিত হইল, কিন্তু রাজকতাকে কোন কথা না বলিয়া একবারে ধপ্প করিয়া বসিয়া পড়িল, এবং মাথার বিষম বেদনা হইয়াছে বলিয়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। রাজকতা বলিলেন, “তুমি কোন চিন্তা করিও না, এখনই তোমার শিরোবেদনা আরোগ্য হইবে, আমার প্রাসাদে ফাতিমা-নারী একটি ধার্মিক রমণীকে আশ্রয় দিয়াছি, তিনি তোমার মস্তক স্পর্শ করিবামাত্র আর বেদনা থাকিবে না।”

শিরোগোড়ার
অভিনয়ে
ছুরিকাঘাত

রাজকতার আদেশে নকল ফাতিমা ভৎক্ষাৎ আল্লাদীনের সম্মুখে উপস্থিত হইল। আল্লাদীন তাহাকে দেখিয়া বলিল, “মা, আপনার দর্শনে বিশেষ ভরসা পাইলাম, আমি শিরোবেদনার অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, আপনি দয়া করিয়া আমাকে রোগমুক্ত করুন, আপনার ভায়ে ধার্মিক নারীর প্রার্থনার জালা অবশ্যই কর্ণপাত



আততায়ী
যোগ্য শাস্তি



করবেন।" বাছুর বীরে বীরে আলাদীনের মস্তক বামহস্তে স্পর্শ করিল, একখানি তীক্ষ্ণধার ছুরিকা তাহার পরিচ্ছদের অভ্যন্তরে লুকাইয়া ছিল; আলাদীন বাছুরের গতিবিধি বিশেষ সাবধানে লক্ষ্য করিতেছিল, মহলা বাছুর তাহার কাপড়ের অন্তরাল হইতে অস্ত্রখানি বাহির করিয়া পূর্বেই আলাদীন সজোরে তাহার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ফেলিল, এবং ছুরিখানি কাড়িয়া লইয়া তাহা সমূলে বাছুরের বক্ষস্থলে বসাইয়া দিল, দেখিতে দেখিতে নকল কান্টিমার মৃতদেহ ধরাতলে লুপ্ত হইয়া পড়িল।

"কি সর্বনাশ করিলে, প্রাণনাথ!" বলিয়া রাজকন্যা ছুটিয়া আসিলেন; কহিলেন, "হায়, হায়, তুমি



জীলোকের প্রাণবধ করিলে? এ ধার্মিকা জীলোক, কেন ইহাকে হত্যা করিলে?" আলাদীন বলিল, "না, না, ভ্রমের ভুল হইয়াছে, প্রবঞ্চিত হইয়াছ, তুমি যাহাকে নিহত দেখিতেছ, সে জাল কাতিমা। যদি আমি উহাকে বধ না করিতাম, তাহা হইলে ঐ দুবান্দাই আমাদের প্রাণবধ করিত।" তাহার পর আলাদীন দৈত্যের নিকট যাহা যাহা চুনিয়াছিল, রাজকন্যার নিকট তাহা সমস্তই বলিল। মৃত বাছুরের মেহ তখনই স্বাস্থ্য স্তবিত করা হইল।

এইরূপে আলাদীন দুই দ্রুতের হস্ত হইতে পরিণত লাভ করিয়া নিরাপদ হইল, কয়েক বৎসর পরে বৃদ্ধ সুলতান

প্রাণত্যাগ করিলেন, তাহার কোন পুত্রসন্তান ছিল না, সুতরাং আলাদীনই তাহার সিংহাসন লাভ করিয়া পরবর্ত্তে রাজত্ব করিতে লাগিল; আলাদীনের সুখসৌভাগ্যের আর দীমা রহিল না।

প্রমোদ-নিশা অবসানে শাহরুজাদীর গল্প শেষ হইলে সুলতান শাহরিয়ার বিশেষ প্রীতি লাভ করিলেন। তিনি আর একটি নূতন গল্প শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিলেন, দিনারজাদী তাহার ভগিনীকে সেই অমরোঘ করিলেন। রাত্রি শেষ হইয়াছিল, তথাপি যতটুকু শেষ রাত্রি ছিল, শাহরুজাদী ততটুকুই খালিফ-হাকুম-রসিদের নৈশভ্রমণকাহিনীর বর্ণনায় অতিবাহিত করিলেন।



ইলতান নানা কাহিনী-প্রসঙ্গে অবগত হইয়াছেন যে, খালিক-হাক্ক-অল-রসিদ ছয়-বেশে ভ্রমণের বিশেষ লক্ষ্যপাত্রী ছিলেন। যখন তিনি তাঁহার প্রাসাদে মনের আনন্দে বাস করিতেন, তখনই যে তিনি এই ভাবে ভ্রমণ করিতেন, তাহা নহে, যখন নানা প্রকার ক্রমে তাঁহার ক্ষয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত, প্রাসাদে বাস করা অত্যন্ত অসহ্য মনে করিতেন, তখনও তিনি ভ্রমণ করিতেন। ইহাতে তাঁহার ক্ষয়ভার অনেক পরিমাণে লঘু হইত; নব নব দৃশ্যের মধ্যে তিনি তাঁহার চিন্তাক্রিষ্ট মনটিকে সমাহিত করিয়া, নব নব ঘটনায় তাঁহার অপ্রসন্ন চিত্ত পরিব্রাজ্য করিয়া, তিনি প্রচুর-পরিমাণে শান্তি ও আনন্দ লাভ করিতেন।

এক দিন খালিক তাঁহার কক্ষে চিন্তাকুলচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার হৃদয় উজ্জীর জাকর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। খালিক প্রায়ই একাকী থাকিতেন না, অতরাং তাঁহাকে একাকী দেখিয়া উজ্জীরশ্রেষ্ঠ কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন, খালিককে চিন্তাকুল ও বিমর্ষ দেখিয়া তিনি অধিকতর বিস্মিত হইলেন। খালিক নতমস্তকে অবস্থান করিতেছিলেন, কিছু কাল পরে মস্তক তুলিয়া জাকরকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তাঁহাকে কোন কপা না বলিয়া পুনর্বার তিনি মস্তক অবনত করিলেন।

জাকর খালিকের এই ভাবপরিবর্তনের কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না, খালিক যে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। জাকর খালিককে তাঁহার অপ্রসন্নতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু কোন সমস্ত উত্তর পাইলেন না। জাকর তখন করযোড়ে বলিলেন, “জাহাপনা, এক দিন আপনি বলিয়াছিলেন, রাজধানীতে আপনার কর্মচারিগণ শাস্তিরক্ষার কার্য্য করিবার ভাবে চালাইতেছে, তাহা আপনি গোপনে পরীক্ষা করিবেন, আজ আপনি দিন স্থির করিয়া দিয়াছিলেন, এ বিষয়ে কি অসুখতি হয়, জানিবার জন্য আমি আসিয়াছি।” খালিক বলিলেন, “কথাটা আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, আজ আমার মন ভাল না থাকিলেও দিনপরিবর্তনের কোন আবশ্যক দেখি না। আজই বাহির হইয়া পড়া যাক্, তুমি বেশ পরিবর্তন করিয়া এসো।”

অনন্তর খালিক ও জাকর বিদেশী সবাগরের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া, প্রাসাদ-উত্তানের গুণ্ডবারপথে বাহির হইলেন, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন;—দেখিলেন, কোথাও কোন প্রকার শৃঙ্খলার অভাব নাই। নদীতীরে একখানি নৌকা দেখিয়া তাঁহারা সেই নৌকায় আরোহণ করিয়া নদী পার হইলেন, তাহার পর একটি সেতুর উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন।

সেতুর পারশ্বে তাঁহারা একটি বৃদ্ধ অন্ধকে দেখিতে পাইলেন। বৃদ্ধটি ভিক্ষা করিতেছিল। খালিক অন্ধ ভিক্ষকের হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করিলেন। ভিক্ষুটি মুদ্রা পাইয়া খালিককে বলিল, “হে সাদাশয় মহোদয়, আপনি যিনি ইউন, আমাকে আর একটি অল্পগ্রহ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, দয়া করিয়া আমার দস্তকে একটি চপেটাবাত করুন। আমি ইহা অপেক্ষা গুরুতর শাস্তিলাভের যোগ্য।” পাছে খালিক তাহার মস্তকে করাঘাত না করিয়াই চলিয়া যান, এই ভয়ে ফকির তাঁহার পরিচ্ছদ ধরিয়া রহিল, চপেটাবাতলাভের পূর্বে সে তাঁহাকে কোনক্রমে ছাড়িতে রাজী হইল না।

খালিক ফকিরের এই অদ্ভুত অহরোধে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, “তুমি কেন আমাকে এরূপ অহরোধ করিতেছে, তাহার কারণ না জানিলে আমি কখনও তোমার প্রতি এরূপ নির্ণয় ব্যবহার করিতে পারিব না। খালিক তাঁহার পরিচ্ছদ ছাড়িয়া লইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিলেন।

খালিক
হাক্ক-
অল
রসিদে
কৈশ
ভ্রমণ



স্বর্ণমুদ্রার সহিত
চপেট চাই



ব্রহ্ম কক্ষিক কিছুতেই তাঁহাকে ছাড়িবে না। সে বিশেষ আগ্রহের সহিত বসিতি লালিল, “মহাশয়, আমার অপরূপ মার্জনা করিবেন, হয় আমারে চশটেঁষাৎ করুন, না হয় ভিক্স। কিল্লাইয়া লউন। আঁি চশটেঁষাৎ না ষাইলে ভিক্স। লইতে পারি না, আল্লার নিকট আমি এ বিষয়ে শরণ করিহাই। আপনি আমার সকল কথা উনিলে নিশ্চয়ই ব্রহ্মিতে পারিবেন যে, আমার প্রার্থনা অসম্ভব নহে।”

খালিক আর প্রতিবাদ না করিয়া অন্ধের মন্তকে একটি লুণ চপেটাঘাত করিলেন। বুদ্ধ তৎক্ষণাৎ ধস্তান সহকারে খালিককে ছাড়িয়া দিল। খালিক কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া উজীরকে বলিলেন, “জাকর, এই লোকটির অদ্ভুত প্রার্থনা শুনিয়া আমি বড় বিস্মিত হইয়াছি, নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে কোন গুঢ় রহস্য আছে, তুমি আমার পরিচয় দিয়া ঐ বুদ্ধ ফকিরকে বলিবে, সে কাল বৈকালে নমাজের পর যেন প্রাসাদে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যায়। আমি তাহার সঙ্গে আলাপ করিব।” জাকর ফকিরের নিকট ফিরিয়া প্রত্য

তাহার হাতে কিঞ্চিৎ ভিক্ষা ও
মস্তকে একটি মুগ্ধ চপেটাঘাত
প্রদান করিয়া তাকে রাজাঙ্গা
জানাইলেন; অনন্তর উজ্জীর
থাগিফের নিকট প্রত্যাগমন
করিলেন।

নগরে প্রবেশ করিয়া খাফিজ
ও উজীর একটী পোতা জায়গায়
উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,
সেখানে অনেক লোক জমিয়া
গিয়াছে। তাঁহারাও সেই লোক-
রূপে মিশিয়া গেলেন। এত
লোক একত্র সমবেত হইবার
কারণ অবিলম্বেই তাঁহারা বুঝিতে
পারিলেন। একটী নববেঙ্গদস্য

হলার স্বক একটি ঘোটকীয় উপর আরোহণ করিয়া, তাকে ক্রমাগত ঘুরাইয়া বেড়াইতেছিল, এবং একপ নির্দয়ভাবে অবিশ্রান্ত প্রহার করিতেছিল যে, তাহার শরীর হইতে রক্তপাত হইতেছিল; ঘোটকীয় মুখ কেনরাশিতে আচ্ছন্ন হইয়াছিল।

পালিফ যুবকের এই প্রকার নিষ্ঠুরতা দেখিয়া, কাহাকে কাহাকেও ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কেহই কোন কারণ বলিতে পারিল না। তিনি একথাও জানিতে পারিলেন যে, এই যুবক প্রত্যাহার এত প্রকার নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়া থাকে।

খালিফা উজীরকে বললেন, “উজীর, এই যুবককে কাগ আমার নিকট প্রাসাদে উপস্থিত হইবার আদেশ কর, যে সময় অক্ষর বন্ধ হইবে, যুবকও সেই সময় হাইবে।” উজীর খালিফার আদেশ পালন করিলেন।

চলিতে চলিতে উভয়ে একটি পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং সেই পথের উপর একটি নবনির্মিত গৃহ দেখিতে পাইলেন। খালিক উভারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে এ গৃহ নির্মাণ করিয়াছে, সন্ধান লও।”

ভপেট
উপ-
হারের
ধন্যবাদ



নির্দয়ভাবে
ঘোটকী প্রহার



স্বীয় সন্ধান লইয়া জানিলেন, গৃহস্থামীর নাম খোজা হাসান আলহাথ। এই ব্যক্তি রক্তবাহারী
এবং এক সময়ে ইহার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কিন্তু কিরূপে সে সে অর্থসঞ্চয় করিয়া অস-
হাদের মধ্যে এরূপ ভয়ংকর হত্যা নির্দোষ করিল, তাহা সাধারণে বুঝিতে পারে নাই।

খালিক বলিলেন, “আমি এই দড়ীওয়ালায় সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই, কাণ্ড যে সময়ে অস্ত্র ছুই জন
হইবে, সেই সময়ে উহাকে ও যাইতে বলিবে।” উজ্জীর দড়ীওয়ালা খোজা হাসানের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া
খালিকের আদেশ জ্ঞাপন করিলেন।

পরদিন অপরাহ্নে নমাজের পর খালিক তাঁহার কক্ষে প্রত্যাগমন করিলে, উজ্জীর ঐ তিন জন লোককে
তাঁহার নিকট উপস্থিত করিলেন। তাহারা খালিকের পদতলে নিপতিত হইয়া, তাঁহার চরণবন্দনা করিল।
তাঁহার পর তাহারা উঠিলে খালিক তাহাদের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। ফকির বলিল, “আমার নাম
বাখা আবদালা।” খালিক বলিলেন, “বাবা আবদালা, তোমার ভিক্ষাগ্রহণের নিয়মটি এমন অদ্ভুত যে,
আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, আমি ইহা রহিত করিয়া দিব। কারণ, তুমি সাধারণকে বড়ই বিরক্ত কর,
তাহা আমি বুঝিতে পারিয়াছি। তবে আমি তোমার এরূপ শপথগ্রহণের কারণটি না জানিয়া তোমার প্রতি
কোন আদেশ প্রদান করিব না ভাবিয়াই, তুমি সে দিন নিস্তার পাইয়াছ, আমার কাছে এখন স্পষ্ট
করিয়া বল, কি জন্ম তুমি এই প্রকার শপথ গ্রহণ করিয়াছ। আমার নিকট কোন কথা গোপন
করিবে না, কারণ, আত্মোপাস্ত সকল কথা আমার জানা আবশ্যক, নতুবা তোমার প্রতি জায়াবিচার
সম্ভব হইবে না।”

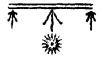
খালিকের কথা শুনিয়া বাবা আবদালা তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয়বার খালিকের চরণে অবনত হইল, তাহার পর
উঠিয়া বলিল, “জাহাপনা, আমি যাহা বলিব, তাহা আত্মপূর্বিক প্রবণ করিয়া, আমাকে ক্ষমা করিতে
হইবে। আমি বুঝিতেছি, আমার কথা অসম্ভব বলিয়া আপনি মনে করিবেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা
অসম্ভব নহে। আমি আপনার কাছে গুরু অপরাধ করিয়াছি, তাহা স্বীকার করিতেছি, কিন্তু আমি
আপনাকে চিনিতাম না বলিয়াই আপনার প্রতি সেরূপ বর্হার করিয়াছিলাম, নতুবা তাহা করিতে
কদাচ আমার সাহস হইত না।

“আমার ব্যবহার মনুষ্যের দৃষ্টিতে যতই বিসদৃশ হউক, ঈশ্বরের নিকট আমার ব্যবহার দৃষ্টিয়
বিবেচিত হইবে না। আমার অপরাধ এরূপ গুরুতর যে, পৃথিবীর সকল লোক যদি আমাকে এক একট
চপেটাঘাত করে, তাহা হইলেও আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় না। আমার পাপ কিরূপ গুরুতর, তাহা
আমি খোদাবন্দের আদেশে বিবৃত করিতেছি।”

হঠাৎ ধনী
বহত কি ?



খালিক-দরবারে
রহস্ত-
প্রকাশের
আহ্বান



২২২
আম-
সাম্রাট
কথিনী
ক



আমি বোম্বাই নগরে জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা-মাতা আমার শৈশবেই প্রাণত্যাগ করেন। আমি তাঁহাদের পরিত্যক্ত কিছু সম্পত্তি লাভ করিয়াছিলাম। আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে যুবকগণের ভায় বৃথা আমোদ-প্রমোদে আমার সম্পত্তি নষ্ট না করিয়া, বিশেষ চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা ধনরক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি অবশেষে কতকগুলি উট কিনিয়া তাহা সদাগরদিগকে ভাড়া দিতে প্রবৃত্ত হইলাম, ইহাতে আমার বেশ অর্থোপার্জন হইতে লাগিল। এইরূপে দৌভাগ্যের সোপানে পদাৰ্পণ করিয়া, আমার আনন্দের সীমা রহিল না। আমি অধিকতর ধনলাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিলাম এবং এই অভিপ্রায়ে হিন্দুধানে পণ্যদ্রব্য পাঠাইবার সংকল্প করিলাম। এক দিন আমি হিন্দুধানে পণ্যদ্রব্য পাঠাইবার জন্ত তাহা জাহাজে তুলিয়া দিয়া ফিরিতেছিলাম, আমার উটগুলিকে কিছু খাতদ্রব্য প্রদান করার আবশ্যক হওয়ায়, আমি তাহাদিগকে একটি অরণ্যের মধ্যে চরাইতে লইয়া চলিলাম। সহসা সেই পথে এক জন দরবেশের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। দরবেশ বলিল, সে বলোয়া যাইতেছে। পথপ্রদে দরবেশটি কিছু কাতর হইয়াছিল, সে আমার পাশে বিশ্রাম করিতে বসিল। আমি জল্পনে উটগুলি ছাড়িয়া দিয়া একটি বৃক্ষচ্ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলাম। আমাদের পরস্পরের পরিচয় শেষ হইলে আমরা খাতদ্রব্য বাহির করিয়া একত্র ভোজন করিতে লাগিলাম।

আহার করিতে করিতে আমরা নানা বিষয় আলোচন করিতে লাগিলাম। কথাপ্রসঙ্গে দরবেশ আমাকে বলিল যে, “অদূরবর্তী একটি গুপ্তস্থানে তুরিগরিমানে ধনরত্ন সংগৃহ্য আছে। সে ধনরত্ন এত প্রচুর যে, আমরা আশীটা উট বোঝাই করিয়া সেখানে হইতে তাহা তুলিয়া আনিলেও তাহার শেষ হইবে না।”

এই স্বসংবাদে আমি অত্যন্ত পুলকিত হইলাম। দরবেশ যে আমাকে মিথ্যা প্রলোভনে যুক্ত করিতে পারে, এ কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। আমি দরবেশকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, “ভাই দরবেশ, পৃথিবীর দ্রব্যসামগ্রীকে তুমি নিতান্ত তুচ্ছ মনে কর, তুমি একা মানুষ, পৃথিবীতে তোমার আত্মীয়-স্বজন অতি সামান্য, তুমি আমাকে সেই অগাধ রত্নভাণ্ডার দেখাইয়া দাও, আমি আমার চারি কুড়ি উট বোঝাই করিয়া ধনরত্ন লইয়া আসি। আমি একটা উটের বোঝা তোমাকে প্রদান করিব।”

আমি দরবেশকে যাহা দিতে চাহিলাম, দরবেশকৃত উপকারের তুলনায় তাহা অতি সামান্য সম্ভব নাই; কিন্তু আমার মনে তখন লোভ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, উনাশীতি উট বোঝাই ধনরত্ন নিজের জন্ত রাখিয়া এই একটি উট-বোঝাই ধনরত্ন দরবেশকে প্রদান করিবার আশঙ্ক্যতেই আমি বিশেষ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলাম।

দরবেশ আমার লোভের পরীক্ষা পাইল, কিন্তু তাহাতে সে বিরক্ত হইল না। সে আমার কথা শুনিয়া বলিল, “ভাই, তুমি আমাকে যে অংশ দিতে চাহিতেছ, তাহা কত সামান্য, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। আমি যদি তোমাকে এই ধনরত্নের সন্ধান না দিই, তাহা হইলে ত’ তুমি এক পয়সাও পাও না। আমার ইচ্ছা, তুমি ধনবান হও, আমার উপকার মনে রাখ, আমারও কিছু অর্থ আবশ্যক। আমি তোমার কাছে আর একটি প্রস্তাব করিতে চাই, ইহা কত দূর সম্ভব, তাহা তুমিই বিবেচনা করিতে পারিবে। তুমি বলিলে, তোমার চারি কুড়ি উট আছে, আমি সেই সকল উট লইয়া গুপ্ত ধনাগারে উপস্থিত হইয়া উটগুলিতে ধনরত্ন বোঝাই দিব, কিন্তু কথা এই যে, ধনরত্ন-বোঝাই আর্দ্রক উট আমাকে প্রদান করিতে হইবে, আর্দ্রক তুমি লইবে, তাহার পর আমরা যেনখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইব, কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধ থাকিবে না। যদি তুমি আমাকে চল্লিশটি উট দিতে কষ্টবোধ কর, তাহা হইলে মনে রাখিও, তুমি যে ধনরত্ন লাভ করিবে, তাহা দিয়া হাজার হাজার উট ক্রয় করিতে পারিবে, সুতরাং ইহাতে তোমার কিছু মাত্র ক্ষতি নাই, বিশেষতঃ আমি ত’ তোমার কাছে আর্দ্রকের অধিক চাহিতেছি না।”

গুপ্ত-রত্ন-
ভাণ্ডারের
সন্ধান



দরবেশ আমার সমান ধনী হইবে, এ কথা আমার বড়ই কটু বোধ হইতেছিল। দরবেশ যে প্রস্তাব করিল, তাহা যে ক্ষতি সন্দেহ, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না ; কিন্তু আমার তাহা বড়ই অস্বীকার বোধ হইল। পরন্তু দরবেশের প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিয়া কোনই লাভ নাই, চিরজীবন উট ভাড়া খাটাইয়া অতি কষ্টে অর্থোপার্জন করিতে হইবে বুঝিতে পারিয়া, আমি অগত্যা তাহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলাম এবং উটগুলিকে জ্বল হইতে তাড়াইয়া আনিয়া একত্র করিলাম। তাহার পর আমরা উভয়ে একটি পরস্পরের সুকীর্ণ উপত্যকার উপস্থিত হইলাম। এই উপত্যকার প্রবেশপথ অতি সংকীর্ণ, আমার উটগুলি এক একটি করিয়া এই পথে উপত্যকায় প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল। কিন্তু ভিতরের দিক বেশ প্রশস্ত, ভিতরে অনেকগুলি পাশাপাশি চলিতে পারিল। চতুর্দিকে উচ্চ পর্বত, মধ্যে উপত্যকা, আমার তাহারই ভিতর উপস্থিত হইলাম। সেখানে জনমানবের সাদৃশ্য নাই।

এই স্থানে উপস্থিত হইলে দরবেশ আনাকে বলিল, “আমাদের আর অন্তহানে যাইতে হইবে না। তোমার উটগুলিকে তুমি শ্রেণীবদ্ধ করিয়া শোয়াইয়া দেও, তাহা হইলে উটের পিঠে বোঝা তুলিতে কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না। আমরা লীজই ধনভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিব।”

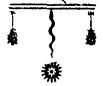
আমি দরবেশের অহরোধক্রমে উটগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে শয়ন করাইয়া দরবেশের অহসরণ করিলাম। দেখিলাম, দরবেশ একখানি প্রস্তর, এক খণ্ড ইস্পাত ও কিছু জালানিকাঠ হাতে লইয়া চলিয়াছে। একটি স্থানে আসিয়া দরবেশ পাথরে ইস্পাত ঠুকিয়া আগুন বাহির করিল, সেই আগুনে কাঠ দহাইয়া তাহার উপর কিছু তৃণ স্থাপন করিল ও বিড় বিড় করিয়া কি ময় উচ্চারণ করিল। কি ময় বলিল, তাহা আমি শুনিতে পাইলাম না। কিন্তু অগ্নিরাশি হইতে প্রবলবেগে ধূম উঠিতে লাগিল ; ক্রমে সেই ধূমে চতুর্দিক আচ্ছাদিত হইল, দরবেশ সেই ধূম ছই ভাগে বিভক্ত করিতেই সেই স্থানে একটি গুপ্তদ্বার বাহির হইয়া পড়িল ; দ্বারটি প্রস্তরের।

দ্বার খুলিয়া দোপান-শ্রেণীর সাহায্যে আমরা একটি স্তবিত্ত প্রাসাদকক্ষে অবতরণ করিলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার বিস্ময়ের সীমা রহিল না ; দোপান, রাশি রাশি স্বর্ণ, হীরকরত্নাদি সম্ভিত রহিয়াছে। আমি ক্রতবেগে সেই স্বর্ণবস্তুর উপর নিপতিত হইলাম এবং এক একটি বস্তুর ভিতর তাহা পূরিতে লাগিলাম। আমার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বস্তাগুলি স্বর্ণরাশিতে পরিপূর্ণ হইলে, উটের পক্ষে তাহা বহন করা কিরূপ দুঃসাধ্য হইবে, সে কথা চিন্তা করিলাম না। দেখিলাম, দরবেশ স্বর্ণ ছাড়িয়া বস্ততে হীরক-রত্নাদি বোঝাই করিতেছে। আমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, অল্পদবোই বহু মূল্য হইবে, অতরাং আমিও তাহার দৃষ্টান্তের অহসরণে প্রবৃত্ত হইলাম। যে পরিমাণ বোঝাই উঠে বহন করিতে পারে, তাহা উটের পৃষ্ঠে চাপাইয়া সেই ধনাগারের দ্বার বন্ধ করিয়া আমরা পর্বত-উপত্যকা পরিভ্রমণ করিলাম।

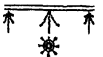
আমি দরবেশের একটি কার্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, যখন সে হীরকরত্নাদি সংগ্রহ করে, সেই সময় দেখিয়াছিলাম, সে একটি স্বর্ণ-পাত্র হইতে একটি ক্ষুদ্র বাস্ক সংগ্রহ করিয়া, তাহা তাহার জামার বুকের জেবে রাখিল, বাস্কটর মধ্যে কি জিনিষ আছে, তাহা জানিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলে, সে আমাকে বাস্ক খুলিয়া দেখাইয়াছিল। দেখিলাম, একপ্রকার আটাল পদার্থে বাস্কটি পরিপূর্ণ।

পর্বত-উপত্যকার বাহিরে আসিয়া চলিষ্ট উট লইয়া আমি এক দিকে যাত্রা করিলাম, অবশিষ্ট চলিষ্ট উট লইয়া দরবেশ অন্য দিকে যাত্রা করিল। দরবেশ বাসোরার দিকে চলিল, আমি বোন্দাধাতিয়ুগে চলিলাম। বিদায় লইবার সময় আমার আর একবার পরস্পরের আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইলাম।

উপত্যকার
বস্তুর প



আজিট
উটের পিঠে
ধনরাশি চালান



আকাশ-
উল্লীপনার
চাকসা



কিন্তু অগ্নির হইয়াই আমার মনে লোভ ও রুত্নতা প্রবল হইয়া উঠিল। চল্লিশটি উট হারাইয়া আমার মনে কষ্টের আর সীমা রহিল না, বিশেষতঃ দরবেশ এই উটগুলির পিঠে চাপাইয়া যে অগাধ অর্থ লইয়া গেল, যদি তাহা আমি পাইতাম, তাহা হইলে আমার মনে কি আনন্দই হইত! আমার নির্বুদ্ধিতার কথা ভাবিয়া আমি বিলাপ করিতে লাগিলাম, অহুতাপে আমার অন্তরাঙ্গা দগ্ধ হইতে লাগিল; অবশেষে আমি স্থির করিলাম, দরবেশকে একটি উটও প্রদান করা হইবে না, সকলগুলিই আমি তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া আসিব।

অনন্তর আমার অজীর্ণ সিক করিবার ক্ষমতা আমি আমার উটগুলিকে এক স্থানে দাঁড় করাইয়া দরবেশের উদ্দেশে ধাবিত হইলাম। কিছুদূর গমন করিয়া আমি দরবেশকে দেখিতে পাইলাম, উটের দ্বারা ডাকিয়া তাহাকে ধামিতে বলিলাম, দরবেশ আমার কথা শুনিয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইল।

আমি দরবেশের নিকটে আসিয়া বলিলাম, “ভাই, আমি তোমাকে কিছুদূর ছাড়িয়া গমন করার পর একটি নূতন কথা চিন্তা করিয়াছি, পূর্বে কথটা একবারও আমার মাথায় প্রবেশ করে নাই। তুমি এক জন অতি ধার্মিক দরবেশ, আমার চিন্তা করিয়া সময় অতিবাহিত করা ভিন্ন তোমার ত’ অন্য কোন কাজ নাই; হুতরাং আমার বিবেচনায় চল্লিশটির পরিবর্তে ত্রিশটি উট-বোঝাই ধনরত্ন হইলেই তোমার জীবনবাস্তা নিশ্চয়ই হইবে, দশটি উট আমাকে প্রদান কর।” দরবেশ বলিল, “তুমি উত্তম কথা বলিয়াছ, এক কথটা ইহা যে একবারও আমার মনে উঠে নাই। যে দশটি উট তোমার পছন্দ হয়, এই চল্লিশটির ভিতর হইতে বাছিয়া দিয়া যাও।”

আমি বোঝাইসমত দশটি উট লইয়া নিজের উটগুলির কাছে আসিলাম এবং পঞ্চাশটি উট দ্বারা চলিতে লাগিলাম। কিছুকাল পরে আমার মনে আবার প্রবল লোভ ও স্বেচছার সঞ্চার হইল। আমি আমার পূর্ববর্তী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, “ভাই, তোমার মত দরবেশের পক্ষে ত্রিশ উট-বোঝাই ধনরত্ন অত্যন্ত অধিক, আমার ছায় সংসারীর পক্ষে পঞ্চাশটি রত্ন বোঝাই উটও যথেষ্ট নয়, তুমি আর দশটি ধনরত্নসমূহ উট আমাকে দিয়া যাও।” দরবেশ কোন আপত্তি না করিয়া আমাকে আর দশটি উট প্রদান করিল, আমার বাটটি ও তাহার কুড়িটি উট হইল।

ধন-আকাশের
নিবৃত্তি নাই



আমি আমার গন্তব্যপথে অগ্নির হইলাম, কিন্তু আমার ধনতৃষ্ণা নিবারণিত হইল না। যতই আমার আকাশ-পূর্ণ হইতে লাগিল, ততই আমার আশা বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। দরবেশ কুড়িটি উট-বোঝাই ধনরত্ন লইয়া কি করিবে? তাহার পক্ষে যাহা অনাবশ্যক, তাহাতে তাহার অধিকার নাই, মনে করিয়া আমি আবার ফিরিলাম। দরবেশের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানা প্রকার যুক্তি ও হিতকরবচনে বলিলাম, “যে দরবেশশ্রেষ্ঠ, আমাকে আরও দশটি উট দিয়া যাও, তোমার ছায় দরবেশের পক্ষে আবশ্যকান্তিরূপে ধনসম্পত্তি অনর্থের মূল হইবে, অতএব ইহার আক্কেশে তাগা কর।” দরবেশ একটু হাস্ত করিয়া আরও দশটি উট আমাকে প্রদান করিল। আমার সমস্তটি উট হইল, দরবেশের অবশেষে থাকিল কেবল দশটি।

আমার ধনতৃষ্ণা ইহাতেও প্রশমিত হইল না। আমি ভাবিলাম, দরবেশের জীবিকা ভিক্ষাবৃত্তিরই উপর নির্ভর করে, এত ধনরত্ন সে কি করিবে? তাহার হস্তে এত ধনরত্ন থাকা উচিত নহে, দরবেশ যে দশটি উট লইয়া যাইতেছে, ওগুলিও আমার হস্তগত হওয়া উচিত।

পুনর্বার দরবেশের নিকটস্থ হইয়া সে কয়টিও তাহার নিকট চাহিলাম। দরবেশ বিনা প্রতিবাদে সে কয়টিও আমাকে প্রদান করিয়া বলিল, “ভাই, এই সকল ধনরত্নের সন্ধ্যাবহার করিও, দরিদ্রকে প্রতিপালন করিও, ভিক্ষুককে ভিক্ষা দিও, ধনের সন্ধ্যাবহার না করিলে ধন থাকে না থাকা সমান।” ইত্যাদি অনেক উপদেশ প্রদান করিল, আমি তাহার প্রস্তাবে সন্মত হইয়া শেষ দশটি উট লইয়া গন্তব্যপথে চলিলাম।

চলিতে চলিতে আমার মনে হইল, দরবেশ তাহার বৃকের জেবে যে মলমের মত জিনিষের বাস্কাট রাখিয়াছে, সেটি হয় ত সকল ধনরত্ন অপেক্ষা মূল্যবান, নতুবা দরবেশ সেটি পরম আগ্রহে নিজের কাছে রাখিবে কেন? আমাকেই বা তাহার অংশ দান না করিবে কেন? ও জিনিষটি বাহাই হউক, তাহা হস্তগত করিতে হইবে, হয় ত' তাহা লাভ করিলে, আমি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুখী হইতে পারিব। সুতরাং আমি আবার ক্রতবেগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম, “ভাই, তুমি তোমার আলবেশার বৃকের জেবে যে মলমের বাস্কাট রাখিয়াছ, সে বাস্কাটতে কি আছে? আমাকে যখন তুমি সকলই দিয়াছ, তখন ঐ বাস্কাটও উপহার দিলে করিয়া দাও, কেন বুঝা উঠা বহিয়া মরিবে? যে পৃথিবীর সকল সুখ ও ঐশ্বর্য-লালসা পরিত্যাগ করিয়াছে, এক বাস্কা মলমে আর তাহার কি আবশ্যক?”

হায়! যদি আমাকে দরবেশ তখন সেই বাস্কা প্রদান করিতে অসম্মত হইত, তাহা হইলে বোধ করি, আমার জীবন এখন হুঃখময়, এত হুঃখ হইত না, কিন্তু আমি পরিণামফল বুঝিতে পারিলাম না; তাবলিাম, আমি সহজে সেই বাস্কাপ্রদানে সন্মত না হয়, আমার শরীরে তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক বল আছে, আমি বলপ্রকাশে তাহা কাড়িয়া লইব।

কিন্তু দরবেশ সেই বাস্কাপ্রদানে কিছুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ করিল না। প্রথমমনে বাস্কাট বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিল; বলিল, “তুমি যখন বাস্কাট চাহিতেছ তখন আমি তোমাকে ইহা না দিয়া কিরূপে স্থির থাকি? তুমি ইহাও গ্রহণ কর।”

আমি বাস্কা খুলিয়া তাহার ভিতরের সেই আটাল জিনিষটি একবার মনোযোগে র সহিত দেখিলাম, তাহার দরবেশকে বলিলাম, “তুমি ত চাহিবামাত্র আমাকে বাস্কাট প্রদান করিলে, এখন এই জিনিষ কি কাজে লাগিবে, তাহা বলিয়া আমার কোতুল দূর কর।” দরবেশ বলিল, “এই মলমের গুণ অতি আশ্চর্য। যদি তুমি ইহার এক বিন্দু লইয়া তোমার বামচক্ষুর চতুর্দিকে ও চক্ষুর পাতার উপর ইহার প্রলেপ দাও, তাহা হইলে পৃথিবীর ভিতর যেখানে যত ধনরত্ন আছে, তাহা সকলই তুমি দেখিতে পাইবে; কিন্তু যদি বামচক্ষুতে তাহা না দিয়া দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রলেপ দেও, তাহা হইলে তুমি জন্মের মত অন্ধ হইবে।”

কথাটা কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য আমি অধীর হইয়া উঠিলাম। বাস্কাট খুলিয়া একটু মলম তুলিয়া তাহা দরবেশের হস্তে প্রদান করিলাম, বলিলাম, “ভাই, কিরূপে লাগাইতে হইবে, তাহা ত’ আমি জানি না, তুমি আমার বাম চক্ষুতে ইহা লাগাইয়া দাও, তোমার কথা কতদূর সত্য, তাহা পরীক্ষার জন্য বড়ই বাস্তব হইয়াছি।”

দরবেশ সহজেই আমার অনুরোধে সন্মত হইল। সে সেই মলমটুকু আমার হাত হইতে লইয়া আমাকে চক্ষু মুদিত করিতে বলিল। আমি চক্ষু মুদিত করিলে সে সেই মলম আমার বামচক্ষুর চতুর্দিকে ও চক্ষুর পাতার উপর লাগাইয়া দিল, তাহার পর চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, তাহার কথা একটুও মিথ্যা নহে; জগতের কত স্থানে কত স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরকরত্ন লুক্কায়িত আছে দেখিয়া আমি বিস্ময়ে গুপ্তিত—আনন্দাতিশয়ে আত্মহারা হইলাম। আমি তখন দরবেশকে বলিলাম, “ভাই, আমার দক্ষিণচক্ষুতেও ঐ মলম ধানিকটা লাগিয়া দাও।” দরবেশ বলিল, “তোমার কথা অনুসারে কাজ করিতে আমার আপত্তি নাই, কিন্তু আমি ইহা বলিয়াছি, যদি তুমি ইহা তোমার দক্ষিণ চক্ষুর উপর লাগাও, তাহা হইলে জন্মের মত অন্ধ হইবে।”

আমি দরবেশের কথা বিধাণ করিলাম না; তাবলিাম, তাহার নিচুই কোন কু-মতলব আছে, হয় ত’ প্রকৃত কথা আমার নিকট হইতে গোপন রাখিবার জন্য আমাকে এই ভাবে প্রবঞ্চিত করিতেছে। সুতরাং

বাস্কাের ভিতর
বিশেষ সংগুপ্ত
ধনভাণ্ডার

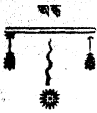


বিশেষ
অনন্ত-বস্তুরাশি
সম্পর্শন



আমি বলিলাম, “আমি বুঝিছি, তুমি আমাকে কীকি দেওয়ার মতলবে এবার মিথ্যা কথা বলিতেছ, আমি তোমায় এ কথা বিশ্বাস করি না, আমার অদৃষ্টে বাহাই থাক, আমি বাহা বলিতেছি, তুমি আমারে তুমি কল্প কর, আমার এই শেষ অনুরোধটি রক্ষা কর।”

আমার উচ্চাঙ্গে



দরবেশ বলিল, “আজ্ঞা সাকী, আমার কোন অপরাধ নাই, আমি বাহা বলিছি তাহা সত্য কথা, কিন্তু তুমি তাহা বিশ্বাস করিলে না। ভাল, তোমার অনুরোধ আমি রক্ষা করিব।”

আমি মূৰ্খ, ভাবিলাম, এ সকলই দরবেশের প্রবন্ধনামাত্র। বাম চক্ষুতে মলম লেপিলে যখন ভূগর্ভস্থ বাবতীর ধনরত্ন দৃষ্টিগোচর হয়, তখন দক্ষিণ চক্ষুতে তাহা লেপিলে নিশ্চয়ই সেই সকল ধনরত্ন হস্তগত হইবে। সুতরাং আমি দরবেশকে আবার সেই অনুরোধ করিলাম, দরবেশ আমাকে পুনঃ পুনঃ এই অববেচনার কার্য্য করিতে নিষেধ করিল, কিন্তু আমি তাহার কোন কথায় কর্ণপাত করিলাম না। আমি বলিলাম, “আমার অদৃষ্টে বাহাই থাক, তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা কর। আমার দক্ষিণ চক্ষুর উপর প্রলেপটি দিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর। যদি আমি সত্যই অন্ধ হই, তাহাতে তোমার কোন দায়িত্ব নাই।”

দরবেশ তখন আমার দক্ষিণ চক্ষুর চারিদিকে ও পাতার উপর সেই মলম কিঞ্চিৎপরিমাণে লাগাইয়া দিল। মলম লাগাইবার সময় আমি চক্ষু মুদিত করিয়াছিলাম, চক্ষু খুলিয়াও কিছু দেখিতে পাইলাম না, সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখিলাম; বুঝিলাম, দরবেশের কথা ঠিক, আমি অন্ধ হইয়াছি। আমি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলাম, এবং অবশেষে ক্রন্দন নিশ্বাস বুঝিয়া দরবেশকে ব্যাকুলভাবে বলিলাম, “ভাই, তুমি আমার অনেক উপকার করিয়াছ, আমি নিজের হৃদয়বৃত্তি বশতঃই তোমার সাধনাবলীকে বিশ্বাস না করিয়া চক্ষুদুটি নষ্ট করিলাম। তুমি এখন আমার চক্ষু দুটির দৃষ্টিশক্তি দান করিয়া আমার প্রাণরক্ষা কর। এ প্রকার অন্ধভাবে জীবন ধারণ করা বড়ই ক্লেশকর, ইহা অপেক্ষা বরং মৃত্যু ভাল।”

দরবেশ কঠোরভাবে বলিল, “রে চরচর লোক, ধনলোভে অজ্ঞান হইয়া তুমি আমার হিতোপদেশ শ্রাব্য করিয়াছিলি, এখন বিলাপ-পরিচায়ে আর কি ফল হইবে? তোমার যেমন মন, তাহার উপযুক্ত প্রতিকার পাইয়াছিস। তোমার দৃষ্টিশক্তি পুনঃ প্রদান করিবার শক্তি আমার নাই, আজ্ঞার শরণ গ্রহণ কর। তজ্জি-ভরে তাঁহাকে আশ্বাস করিয়া দেখ, যদি তিনি তোমার অন্ধত্ব আরোগ্য করেন। তিনিই কেবল অন্ধকে চক্ষু দান করিতে পারেন। তিনি তাকে প্রচুর পরিমাণে ধনদান করিয়াছিলেন, কিন্তু তুমি তাহার যোগ নস; আজ্ঞা এই সকল ধন তোমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া আমাকে তাহা পুনঃপ্রদান করিলেন, আমি উহার সদ্ব্যবহার করিব।”

নৈঃশব্দে
ভীষণ
অন্ধকার

দরবেশ আর কোন কথা বলিল না, আমিও কিছু বলিতে পারিলাম না, নীরবে সেখানে দণ্ডায়মান রহিলাম। অনন্তর দরবেশ আমার আশীর্ষি উঠ গিয়া, আমাকে পথিপ্ৰান্তে পরিত্যাগ করিয়া, বাসের অভিমুখে বাত্মা করিল।

আমি চক্ষু হারাইয়া পথে পীড়িত হইয়া একাকী কাদিতে লাগিলাম। আমাকে অসহায় অবস্থায় অপর্যিত স্থানে ফেলিয়া না গিয়া দূরে লইয়া এক স্থানে সরিয়া রাখিয়া বাইবার জন্ত দরবেশকে কাতরভাবে অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তাহার দ্বন্দ্ব কল্পনার উদ্রেক হইল না, সে আমাকে সেইখানে ফেলিয়া রাখিয়াই চলিয়া গেল। পরদিন এক জন পথিক আমার ঘূষে ঘূষিত হইয়া, দয়া করিয়া আমাকে একটি পান্থনিবাসে রাখিয়া গেল।

ইরূপে অতুল ঐশ্বর্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি ভিক্ষুকে পরিণত হইলাম। আমার মনে অহুতাপের
ইয়া হইয়াছিল; ভিক্ষা বহিবার সময় এক এক চপেটাঘাত গ্রহণে পাণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে লাগিলাম।

বাবা আবদাল্লায় কাহিনী শেষ হইলে খালিক বলিলেন, “বাবা আবদাল্লা, তোমার অপরাধ গুরুতর, তাহাতে
বহু নাই, তুমি এজন্য যে মৃত গ্রহণ করিয়াছ, তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে, কিন্তু আমার বিবেচনায় তুমি এই-
শাস্তির শাস্তির দ্বারা শাস্তিলাভের আশা ত্যাগ করিয়া আমার শরণাপন্ন হও, তাহার অহুগ্রহণাভের জন্য সর্বদা
কিন্তু কর। তোমাকে আর ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ করিতে হইবে না; আমি উজীরকে আদেশ করিতেছি,
তোমাকে প্রত্যহ চার মুদ্রা দান করিবেন। ভিক্ষাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া তুমি ধর্মকর্মে জীবন বাপন কর।”

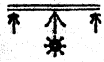
বাবা আবদাল্লা খালিকের কথা শুনিয়া তাহার পদতলে লুটাইয়া পড়িল। খালিকের এই অহুগ্রহের জন্য
খালিককে অগাধ ধন্যবাদ প্রদান ও যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। অতঃপর খালিক যুবককে
কিন্তু, “এখন তুমি বল, তোমার ঘোটকীকে এরূপ নির্দয়ভাবে পীড়ন করিতেছিল কেন?—তোমার
কি?” যুবক বলিল, “আমার নাম সিদি হুমায়ন।”

খালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, “সিদি হুমায়ন, আমারও অবশ আছে এবং আমি অখারোহে লুপ্ট, কিন্তু
কবীর প্রতি তোমার ঋণ নির্দয় ব্যবহার করা আমি কখনও আবশ্যক বোধ করি নাই। তোমার ব্যবহারে
কিন্তু লোকই বিরক্ত হইয়াছিল, আমিও এতই বিরক্ত হইয়াছিলাম যে, তৎক্ষণাতঃ তোমার সেই নির্দয়
প্রহার রহিত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু আমি ছয়বেশে ছিলাম
লিয়া তোমাকে সেরূপ আদেশ করি নাই। শুনিলাম, তুমি প্রত্যহই এইরূপ ছয়দশ-দশ কার্য দ্বারা লোকের
বিরক্তির উদ্দেশ্য কর, ইহার কারণ কি, অবিলম্বে আমার নিকট ব্যক্ত কর, কোন কথা গোপন করিও না।”

সিদি হুমায়ন খালিকের চরণে প্রণিপাত করিয়া পিঁড়িহীন, তাহার পর কি কথা বলিবার চেষ্টা করিল,
কিন্তু বলিতে পারিল না, লজ্জা ও ভয়ে তাহার মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। খালিক তাহার মনের ভাব
ব্রিতে পারিয়া ও তাহাকে নির্দয় দেখিয়া, ক্রোধ, বিরক্তি বা অধীরতা প্রকাশ করিলেন না। তিনি বুকিলেন,
গাহার কথা গোপনীয় এবং তাহা বলিবার পূর্বে তাহার মনে ষষ্ঠ সাহস-সঙ্কয়ের আবশ্যক; সুতরাং খালিক
বলিলেন, “সিদি হুমায়ন, তুমি আমার নিকট কোন কথা বলিতে সম্মতি হইও না, তুমি মনে করিও, তোমার
কান হিতৈষী বন্ধু তোমাকে এই অহুরোধ করিতেছেন। যদি তুমি মনে কর, তোমার কাহিনীর কোন অংশ
নিয়া আমি বিরক্ত হইব, কিম্বা তাহা প্রকাশ করা তোমার পক্ষে গজ্জাজনক, তাহা হইলেও তাহা
প্রকাশ তুমি কুস্তি হইও না, আমি তোমার কথা শুনিবার পূর্বেই তোমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করিলাম।
তুমি নির্ভয়ে সকল কথা প্রকাশ করিয়া বল। তোমার প্রিয়তম বন্ধুর নিকট বলিবেছ, এই ভাবিয়া বল।”

সিদি হুমায়ন বলিল, “জাহাপনা, আমার এই কাহিনী অতি বিচিত্র। আপনি এখন আমাকে অভয় দান
করিতেছেন, এখন সকল কথা আপনার নিকট প্রকাশ করিতেছি। আমি নির্দোষ মানুষ, সকল
আমুবেদই কিছু দোষ আছে, আমারও আছে; কিন্তু আমি এরূপ নরপিশাচ নহি যে, বিনা কারণে একটি
নৈরপরাধ পশুর প্রতি অজ্ঞায় অত্যাচার করিব। কিন্তু তথাপি আমার ঘোটকীর প্রতি আমাকে বৈরুপ
কর্মের দ্বারা ছয়দশ-দশ আচরণ করিতে হয়, তাহার কারণ শুনিলে আপনি ব্রিতে পারিবেন, ইহা যতই
শেল হউক, অজ্ঞায় নহে। জাহাপনা যে আদেশ দান করিবেন, তাহাই আমি নতশিরে পালন করিব।”

মুন্সি মুন্সি আমি কাহিনী



অনন্তর সিঁদে মুন্সি তাহার আশ্রয়কাহিনী বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইল।

“বংশবর্ধনায় আমি একরূপ সন্তান নহি, যে, জ্ঞাপনা আমার বংশের পরিচয় জানিতে পারেন। আশ্রয় ধনশালীও সন্তান নহি, তবে আমার পিতা আমার জন্ত যে সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা বাধীনভাবে বিনা কষ্টে আমার জীবিকানির্ভাহ হইতে পারিত।

সংসারে আমার কোনই অভাব ছিল না, অভাবের মধ্যে একটীকী। মনের মত সুলক্ষী ও গুণবর্তী জী লাভ করিলেই আমার সকল আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে ভাবিয়া, আমি বিবাহের জন্ত উৎসাহ হইলাম কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া, পছন্দ করিয়া বিবাহ করা আমাদের দেশচারবিরুদ্ধ, সুতরাং আমার জাগো বের জী জুটল, তাহাকেই বিবাহ করিলাম।

বিবাহ করিয়া জীকে গৃহে আনিয়া তাহার মুখ দেখিলাম। মুখ দেখিয়া বুলিলাম, আমার অষ্ট নিত্য মন্দ নহে, জীট পরমা সুলক্ষী, দেখিয়া আমার মনে আশ্বাস হইল।

বিবাহের পরদিন আমি আমার জীর সহিত একত্র টেবিলে খান খাইতে বসিলাম। সান্নাতি খাওয়া সংগৃহীত হইয়াছিল, আমি চামচের সাহায্যে আহার করিতে লাগিলাম, কিন্তু দেখিলাম, আমার জী চামচের পরিবর্তে একটা কাঁটা বাহির করিয়া তদ্বারা এক একটা ভাত বিধিয়া মুখে নিষ্ক্ষেপ করিতেছে।

আমার জীর নাম আমিনা। আমিনার এই ব্যবহারে আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম; তাহাকে বলিলাম, “আমিনা, তোমার পিতৃগৃহে কি এই ভাবে অন্নভোজের নিয়ম প্রচলিত আছে? তুমি কম খাও বলিয়া এইরূপ করিতেছ? যদি আমার অপব্যয়-ভয়ে তুমি এই পন্থা অবলম্বন করিয়া থাক, তাহা হইলে আমি তোমাকে অভয় দান করিতেছি, তুমি এইপ্রকার অন্নভোজ পরিচালনা কর। আমি বিশেষ ধনবান নহি, তাহা স্বীকার করি, কিন্তু তুমি স্থির জ্ঞানিও, আহারের বায়ে আমার কতরূপ হইবার আশঙ্কাও নাই। সম্বোধিত্যাগ করিয়া সকলে যেনো আহার করে, তুমিও সেইভাবে আহার কর, ইহাই আমার আশা।”

আমার অমরোপ বৃথা হইল। আমিনা আমার কোন কথা জবাব করিল না, আহা! নিয়মও পরিবর্তন করিল না। তাহার এই ব্যবহারে আমি বড় হুঃখিত হইলাম; বুলিলাম, আমিনা সুলক্ষী হইলেও, বড়ই অবাধ্য; অবাধ্য জী যতই সুলক্ষী হউক, তাহাকে লইয়া সংসার করা বড় কষ্টকর। আমার মনে বড় কষ্ট হইল।

কিন্তু সে জন্ত তাহার মনে কষ্ট দিল না। আমার জীকে সতাই আমি ভালবাসিতাম; ভাবিলাম, এক দিনে না হউক, পাঁচ দিন উপদেশ দিয়া তাহার এ অভ্যাস ছাড়াইব, কাঁটার করিয়া ভাতের এক একটা দানা মুখে তুলিয়া পক্ষীর মত আহার, এ কি কদভ্যাস!

কিন্তু আমার উপদেশ বা অমরোপে কোন ফল ফলিল না। আমার জী আরও অধিক অবাধ্যতা দেখাইতে লাগিল; আহারের পরিমাণ আরও হ্রাস করিল। কদাচিৎ মুখে এক আধ টুকরা কটী নিষ্ক্ষেপ করিত, তাহা নিতান্তই পক্ষীর আহারের মত। আমি তাহার এই ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইলাম, কিন্তু একটাও কটু কথা বলিলাম না।

যেমন দিবসে আহার, তদ্বিত্তি আহারও সেইরূপ ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলাম। এক, দুই, তিন, চার, পঞ্চ দিন আমার একত্র বসিয়া আহার করিলাম, ব্যবহারের পরিবর্তন দেখিলাম না। আমার বিষয় কৌতূহলে, এবং বিরক্তিতে পরিণত হইল। আমি বুলিলাম, মানুষ কখন এত সামান্য জীব আহার করিয়া দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না, এ ভাবে আহার করিয়া আমিনা কয় দিন বাঁচিবে? কিন্তু

আমার দেহে ত' ছন্দলভারও কোন লক্ষণ দেখিতে পাইলাম না। তবে কি আমিনা আমার অসামান্যতায় আমাকে কিছু আহ্বার করে? তাহারই বা কারণ কি? আমার বিষয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আমি মনে মনে স্থির করিলাম, গোপনে আমিনার প্রতিবিধি লক্ষ্য করিতে হইবে।

এক দিন রাত্রিতে আমি শয়ন করিয়া আছি, আমিনাও আমার পাশে ভুয়া আছে, আমার নিদ্রাকর্ষণ নাই, আমি চক্ষু নিবীলিত করিয়া আমিনার বিচিত্র ব্যবহারের কথা চিন্তা করিতেছি, এমন সময় বুলিলাম, আমিনা অতি ধীরে ধীরে উঠিয়া সাবধানে শয্যা ত্যাগ করিল। বুলিলাম, আমিনা আমাকে সজাগ ভাবিয়াই এ ভাবে উঠিতেছে। সে উঠিয়া কোথায় যায়, কি করে, জানিবার জন্য আমার বড় আগ্রহ হইল। গভীর নিদ্রায় ছলে শয্যার উপর পতিত থাকিয়া, চক্ষু স্বয়ং উন্মুক্ত করিয়া দেখিলাম, আমিনা বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া লঘুপদক্ষেপে শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল। আমিনা গৃহত্যাগ করিবামাত্র আমি শয্যা হইতে উঠিলাম এবং অতি সাবধানে তাহার অহসরণ করিলাম।

রাত্রি চন্দ্রকিরণ সমুজ্জ্বল। দেখিলাম, আমিনা বহির্দ্বার খুলিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। আমি দ্রুত থাকিয়া তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিতে লাগিলাম, চলিতে চলিতে একটি সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম। আমিনা আমার অগ্রেই সমাধিভূমিতে প্রবেশ করিয়াছিল।

কি ভয়ানক! সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমিনা একটি প্রেতের হস্ত ধারণ করিল, তাহার পর তাহার হস্ত একটি নূতন সমাধির নিকট উপস্থিত হইয়া দুই হস্তে সমাধিভূমি বিহারণ করিয়া ব্রতদেহ তুলিয়া ফেলিল এবং সেই সমাধির পাশে বসিয়া সে সেই কদাকার প্রেতের সহিত মহানন্দে সেই ব্রতদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙিতে লাগিল।

ভয়ে আমার দেহে ঘর্ম ছুটিতেছিল! আমি দেখিলাম, তাহাদের আহ্বার শেষ হইলে তাহারা সেই ব্রতদেহের অস্থিগুলি কবরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহার উপর মৃত্তিকারান্নি স্থাপন করিল। আমি বুলিলাম, আমিনার গৃহে ফিরিতে আর বিলম্ব নাই, স্তব্ররাং আমি দ্রুতবেগে গৃহে আসিয়া শয্যা শয়ন করিলাম এবং পূর্ববৎ সজাগ আছি, এইভাবে পড়িয়া রহিলাম।

কিঞ্চৎকাল পরে আমিনা শয়নগৃহে প্রত্যাবর্তন করিল, এবং বস্ত্রপরিবর্তন করিয়া আমার পাশে পড়িয়া পড়িল। আমার মনে এমন স্তম্ভ ও ভয় হইতেছিল যে, আমি সে রাত্রিতে আর নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে পারিলাম না। বড় কষ্টে রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া মসজিদে নমাজ করিতে চলিলাম।

নমাজের পর বাগবাগিচা ও নানা স্থানে ঘুরিয়া মন একটু সংগত হইল। আমিনাকে কিছু বলা কর্তব্য কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম; বুলিলাম, কঠোরতা প্রকাশ করিয়া আর সংশোধনের সময় নাই, মুহূর্তব্যবহারে তাহার চরিত্র সংশোধন করিতে হইবে। ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া ধীরতা অবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

আহারের সময় গৃহে ফিরিলাম। আমিনা আমার পাশে আহার করিতে বসিল, কিন্তু সেই এক দৃশ্য; সে কাঁটায় বিধিয়া এক একটা ভাত মুখে ফেলিতে লাগিল। ক্রোধে আমার সর্বশরীর জ্বলিতে লাগিল, কিন্তু আমি হইলে তখনই তাহার চুলের মুষ্টি ধরিয়া বেদন প্রহার করিত, তাহার বন্ধাতী ঘূর করিত; কিন্তু আমি কিছু ধীরপ্রকৃতির লোক, ক্রোধ ধমন করিলাম; ধীরে ধীরে আমিনাকে বলিলাম, 'আমিনা, আমি আহারের পর হইবেই দেখিয়া আসিতেছি, তুমি কাঁটায় করিয়া পক্ষীর মত খণ্ডখণ্ড আহ্বার কর। আমি আমার নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তোমাকে এ অভ্যাস ত্যাগ করিতে বহুবার অহরোধ



গলিত মৃতদেহ
কি হৃৎযন্ত্র ?

করিয়াছি, কিন্তু তুমি কি ভাবিয়াছ জানি না, আমার অকুরোধে কর্ণপাত কর নাই। তোমার কোথাও পছন্দ হইবে, না হইবে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি প্রত্যাহাই নানাবিধ ষাণ্ডষ্যের আয়োজ করি, কিন্তু তুমি তাহা স্পর্শও কর না। তোমাকে আহ্বারে বাধ্য করা অকর্তব্য জানি করিয়া আ ধীরভাবে সকল শূন্য করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু আমি, আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি- চাই। এই সকল স্মৃষ্টি স্রষ্টা উৎকৃষ্ট ভোজ্যাদ্রব্য অপেক্ষা কি গলিত হৃৎযন্ত্র মৃতদেহ অধিক হৃৎযন্ত্র- অধিক তৃপ্তিকর ?

আমার কথা শেষ হইতে না হইতে আমি, আমি সিংহীর ভায় পর্জন করিয়া উঠিল। সে বুঝিল, আমি গোপনে থাকিয়া তাহার বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ্য করিয়াছি। তাহার নয়নে বিদ্রোহ-কুলিঙ্গ প্রকাশিত হইল কোষে তাহার সর্বাঙ্গ কঁপিতে লাগিল।

তাহার সেই স্মৃষ্টি দেখিয়া আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইল, আমি অশঙ্কভাবে বলিয়া রহিলাম কিন্তু আমি বাহা কখন কল্পনা করি নাই, এমন ভয়ানক কার্য যে সে করিতে পারে, তাহা আমি জানিতাম না। আহ্বারস্থানে টেবিলের উপর গেলো সে জল ছিল, আমি, আমি রাগে ফুলিতে ফুলিতে সেই জলে অঙ্গুলী স্পর্শ করিল, তাহার পর তাহা আমার গাত্রে নিক্ষেপ করিয়া বহিল, ‘হতভাগ্য, তোর কোত্থকের উপযুক্ত ফল ভোগ কর ! এই দণ্ডে তুই কুকুরদেহ প্রাপ্ত হু !’ সে বিড় বিড় করিয়া কি মন্ত্র উচ্চারণ করিল।

দেখিতে দেখিতে আমি কুকুরদেহ প্রাপ্ত হইলাম। আমি এই আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলাম ; ইত্যবসরে দেখিলাম, আমি, আমি একখানি লাঠি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাকে প্রবলবেগে আঘাত করিতে লাগিল। আমার বোধ হইল, সে আমার প্রাণবধ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না। অনেক ক্ষণ পর্যন্ত আমাকে প্রহার করিয়া আমি, আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িল, আমি কেবল গৃহের এ কোণে ও কোণে আশ্রয় খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। অবশেষে আমি, আমার নির্ধ্যাতনের নতুন উপায় অবলম্বন করি; দরজা একটু ফাঁক করিয়া ধরিল, অভিপ্রায়, আমি সেখান দিয়া পলায়নের চেষ্টা করিলেই সে কপট হাসি দিয়া আমাকে শিথিয়া মারিবে। আমি তাহার অভিসন্ধি বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু আমি প্রাণভয়ে হত হইয়াছিলাম, আমি, আমি সাবধান হইবার পূর্বেই আমি দরজার ফাঁক দিয়া পলায়ন করিলাম। আমার লেজো কিঞ্চিৎ আঘাত লাগিল মাত্র।

আমি সেই আঘাতেই চীৎকার করিতে করিতে পথে আসিয়া দাঁড়াইলাম ; দেখি, রাজ্যের কুকুর আমাকে আক্রমণ করিবার জন্ত চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিতেছে। আমি আত্মরক্ষার জন্য উপায় না দেখিয়া এক জন কসাইয়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

অজান্ত কুকুরগুলিও কসাইয়ের দোকানে প্রবেশের চেষ্টা করিল, কিন্তু কসাই তাহাদিগকে দূর করিয়া দিল, আমার প্রতি দয়াপরবশ হইয়া আমাকে আর তাড়াইল না। আমি একটি সিদ্ধকের তলায় গিয়া বলিলাম।

কিন্তু কসাই লোকটি কিছু কুসংস্কারাক্রম, কুকুরকে সে অত্যন্ত অপবিত্র জীব বলিয়া স্থণা করিত। অজান্ত কুকুরগুলি তাহার দায়প্রাপ্ত হইতে প্রহান করিলে, কসাই আমাকে তাহার দোকান হইতে তাড়াইবার জন্ত অনেকবার বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু আমি সেই সিদ্ধকের তলদেশ কোন ক্রমে তাগ করিলাম না। সে রাতিটা আমি সেই দোকানেই কাটাইয়া দিলাম। এইরূপে আমি সে দিন সেই দোকানে কিঞ্চিৎ বিশ্রামলাভ করিলাম।

৩৫: পরদিন কসাই কতকগুলি মাংস ক্রয় করিয়া দোকানে ফিরিয়া আসিল। তাহাকে মাংস-হস্তে দোকানে আনিত দেখিয়া দোকানের কাছে অনেকগুলি কুকুর আসিয়া জুটিয়াছিল। কসাই তাহাদের সম্মুখে এক কুয়া মাংস বা হাড় নিক্ষেপ করিতেছিল, আমার বড় কুয়ার উদ্দেশ্যেই হইয়াছিল, আমি আর হির থাকিতে পারিলাম না, অজ্ঞাত কুকুরের ভায় আমিও মাংসের জন্য দোকানের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। কসাই আমার অবস্থা দেখিয়া সদয়ভাবে আমাকে একটু অধিক পরিমাণে মাংস আহার করিতে দিল, তাহাতে আমার ক্ষুধাশান্তি হইল। আমি আবার দোকানে উঠিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কসাই এবার আমাকে কোনমতে দোকানে উঠিতে দিল না।

আমি তখন অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ করিলাম। কিছু দূরে এক রুটাওয়ালা দোকান ছিল, আশ্রয়-লাভের আশায় আমি সেই দোকানে উঠিলাম। দোকানদার লোকটি ভাল, সে আমাকে আদর করিয়া তাহার দোকানে গ্রহণ করিল, আমাকে রুটা খাইতে দিল। আমার অধিক ক্ষুধা ছিল না, কিন্তু কাতর-ভাবে একবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার দয়াজনিত ধন্যবাদ প্রকাশ করিয়া, রুটার কিয়দংশ ভক্ষণ করিলাম; দোকানীকে বৃত্তিতে দিলাম, তাহার অন্তর্গত প্রতি আমার ঐদৃশ্যই নাই, এজন্যই তাহার দান অনাবশ্যক হইলেও গ্রহণ করিলাম।

দোকানদার আমার প্রতি বিশেষ আদর ও যত্ন প্রকাশ করিতে লাগিল। আমিও তাহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত হইলাম। নানা প্রকারে তাহার প্রতি আমার অনুরাগ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতাম। আমি বৃত্তিতে পারিতাম, দোকানদার আমার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট আছে।

আমি এই রুটাওয়ালা দোকানে কয়েক দিন বাস করিলাম। কয়েক দিন পরে একটি স্ত্রীলোক সেই দোকানে রুটা কিনিতে আসিল, সে রুটার দাম প্রদান করিলে, দোকানী একটি পয়সা ফেরত দিয়া বলিল, “এ পয়সাটি চলিবে না, ইহা বদলাইয়া দিতে হইবে।” স্ত্রীলোকটি বলিল, “কেন চলিবে না? ইহা অচল পয়সা নহে।” দোকানী বলিল, “ইহা একেবারেই অচল, আমি দূরের কথা, আমার কুকুরকে দেবাইলে সেও বৃত্তিবে, ইহা অচল।” দোকানী আমাকে আহ্বান করিল। আমি অদূরে বসিয়াছিলাম, তাহার কথা শুনিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দোকানী আমার সম্মুখে কয়েকটি পয়সা ফেলিয়া দিয়া বলিল, “দেখ দেখি, ইহার মধ্যে খারাপ পয়সা আছে কি না?” আমি পয়সাগুলি ভাল করিয়া দেখিলাম, তাহার পর খারাপ পয়সাটি অন্তর্গত হইতে তফাৎ করিয়া একটু দূরে রাখিলাম; তাহার পর আমার আশ্রয়দাতা রুটাওয়ালা মুখের দিকে আগ্রহভরে চাহিতে লাগিলাম।

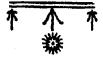
দোকানী আমার এইপ্রকার বুদ্ধিনৈপুণ্য দেখিয়া যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল। স্ত্রীলোকটি অগত্যা পয়সাটি বদলাইয়া দিতে বাধ্য হইল। দোকানী আমার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া অজ্ঞাত দোকানদারগণকে ডাকিল এবং আমার গুণের কথা তাহাদিগকে বলিল। আমি যে খারাপ পয়সা চিনিয়া ভাল পয়সার ভিতর হইতে তফাৎ করিতে পারি, আমাকে আর একবার তাহার পরীক্ষা দিতে হইল।

স্ত্রীলোকটিও গৃহে ফিরিবার সময় পথে বাহার দেখা পাইল, তাহার কাছেই আমার গুণের কথা বলিল। সমস্ত দিন আমাকে দেখিবার জন্য চারিদিক হইতে লোক আসিতে লাগিল, তাহার আমার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল, এবং সকলেই আমার বৃত্তি দেখিয়া আনন্দ ও বিস্ময় প্রকাশ করিল।

এক দিন আর এক জন স্ত্রীলোক সেই দোকানে আসিয়া ছয় পয়সার রুটা কিনিল। পয়সাগুলির মধ্যে একটি খারাপ পয়সা ছিল, আমি পয়সাগুলি দেখিয়াই খারাপটি দূরে রাখিলাম এবং স্ত্রীলোকটির মুখের দিকে



পয়সা-বাছা
কুকুর



চাহিলাম। জীলোকটি আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল; বলিল, ‘হাঁ, একটি পদ্মা খারাপ বটে, ঠিক খয়িরাছ।’ পদ্মা বদল করিয়া জীলোকটি দোকান পরিভাগ করিল, দোকানীর অলঙ্কার সে আমাকে তাহার অঙ্গরণ করিবার জন্ত ইঙ্গিত করিল। আমি কুকুরদেহ পরিভাগ করিবার জন্ত বড়ই উৎসুক হইয়াছিলাম, যদি সেরূপ কোন সুবিধা হয়, এই আশায় আমি জীলোকটির অঙ্গরণ করিলাম। দোকানী তখন ক্রেতাদিগকে বিদায় করিবার জন্ত বিশেষ ব্যস্ত ছিল, আমার পলায়ন দেখিতে পাইল না।

কিছুকাল পরে জীলোকটি তাহার গৃহে উপস্থিত হইল। সে ঘর খুলিয়া আমাকে বলিল, ‘ভিতরে এস, আমার সঙ্গে আসিয়াছ, এ জন্ত তোমাকে আশ্রয় করিতে হইবে না।’ আমি গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি সুন্দরী যুবতী সেই কক্ষে উপবেশন করিয়া একমনে কার্পেট বুনিতোছে। বুঝিলাম, যে জীলোকটি

রুচী ক্রয় করিতে গিয়াছিল, এ যুবতী তাহারই কন্যা। পরে আমি জানিতে পারিলাম, এই যুবতী বাহুবিন্ধ্যার স্নানপুণা।

গৃহকর্ত্রী কন্যাকে সন্ধানন করিয়া বলিল, ‘মা, তোমার জন্ত আমি রুচীওয়ালার বিধাত কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি। আমি এখন পূর্বে তোমাকে ইহার কথা বলিয়াছিলাম, তখনই আমার মনে হইয়াছিল, এ কুকুর নহে, মানুষ, কোন বাছুর ইহাকে এই মূর্তিতে রূপান্তরিত করিয়াছে। তোমার পুত্রাকার জন্ত আমি ইহাকে কৌশলক্রমে সঙ্গে আনিলাম, তুমি একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।’

যুবতী আসন ত্যাগ করিয়া উঠিল, এক পাঁজ জল মন্ত্রপূত করিয়া

তাহা আমার গায়ে নিক্ষেপ করিল, বলিল, ‘যদি তুমি কুকুর না হইয়া কাহারও বাহুবিন্ধ্যাপ্রভাবে কুকুরমূর্তি প্রাপ্ত হইয়া থাক, তবে তোমার প্রকৃত মূর্তি গ্রহণ কর।’ আমি তৎক্ষণাৎ আমার পূর্বদেহ প্রাপ্ত হইলাম।

আমি যুবতীর নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিলাম। তাহার বস্ত্রপ্রাপ্ত চূষন করিয়া বলিলাম, ‘আমি তোমার ক্রীতদাস, তুমি আমার জীবনদান করিলে, আমার জীবনের সকল কথা তোমাকে খুলিয়া বলিতেছি।’ অল্প কথায় আমি যুবতীকে আমার জীবনকাহিনী বলিলাম।

যুবতী আমাকে বলিল, ‘সিদি মুহান, কৃতজ্ঞতার কথা আর তোমাকে বলিতে হইবে না, আমি যে তোমার কিঞ্চিৎ উপকার করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমি আমার পক্ষে যথেষ্ট পুরস্কার মনে করিতেছি। আমি তোমার স্ত্রী আনিমাকে তাহার বিবাহের পূর্ব হইতেই জানি। সে আমাকে চেনে, আমার উভয়েই



সুন্দরী
বস্ত্রপ্রাপ্ত
চূষন

কৃপান্তরের
কৃতজ্ঞতা

এক গুরুর কাছে বাহুবিন্দা শিক্ষা করিয়াছি। আমি তাহার ব্যবহারে কিছুমাত্র বিম্বিত হই নাই, কারণ, প্রথম হইতেই আমি তাহার মেজাজের পরিচয় পাইয়াছিলাম, তাহার উগ্র স্বভাবের জন্ত আমি তাহার সঙ্গে কখনোই পরাধীনতা পূর্ণতা কহিতাম না। আমি তোমার জন্ত যেটুকু কাজ করিয়াছি, তাহা অতি সামান্য, এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। বাহা আরম্ভ করিয়াছি, আমি তাহার শেষ করিব। তুমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া তাহার প্রতি উপযুক্ত শাস্তিবিধান কর, আমি এ বিষয়ে তোমাকে সাহায্য করিব। তুমি এখানে আমার মাতার সঙ্গে গল্প কর, আমি শীঘ্রই আসিতেছি।’

আমি যুবতীর মাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলাম। সেই রজনী সহজে আমাকে বলিল, ‘বাহা, তুমি দেখিতেছ, আমার কত আশা! অপেক্ষা বাহুবিন্দা অল্প নিপুণা নহে, পরের উপকার করিবার জন্তই আমি তাহাকে এই বিদ্যা শিক্ষা দিয়াছিলাম। পরের অনিষ্ট করিবার জন্ত কখন আমি আমার কতাকে অহুযিত করি নাই।’

কিয়ংকাল পরে যুবতী বাহুবিন্দা একটি বোতল লইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল। যুবতী আমাকে বলিল, ‘সিদ্ধি-হুমান, আমি আমার পুত্রকে দেখিয়া বুলিলাম, আমি এখান গৃহে নাই; কিন্তু সে শীঘ্রই গৃহে প্রত্যাপিত করিবে। তুমি এই বোতল লইয়া তোমার গৃহে গমন কর, তুমি তোমার স্ত্রীর প্রতীক্ষা করিবে, অধিকক্ষণ তাহার জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। সে গৃহে আসিয়া তোমাকে দেখিবামাত্র এমন বিম্বিত হইবে ও ভয় পাইবে যে, তোমার সম্মুখে আর ক্ষণকালও দাঁড়াইতে সাহস করিবে না, তোমাকে দেখিয়াই গলায়ন করিবে। তুমি তৎক্ষণাৎ এই জল কিয়ংপরিমাণে তাহার শরীরে নিক্ষেপ করিয়া বলিবে,— ‘হুচ্চারিণি, তোর আচরণের প্রতিফল গ্রহণ কর, আমি অধিক কোন কথা বলিতে চাহি না, তুই অবিলম্বেই ইহার ফল ভোগ করিবি।’

আমি যুবতী ও তাহার মাতাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া গৃহে ফিরিয়া সাংগেই আমি আমার প্রতীক্ষা করিতে থাকিলাম। আমাকে অধিকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না, আমি আসিয়া আমাকে দেখিবামাত্র ভয়ে ও বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল, তাহার পর ক্ষুণ্ণ পলায়নের চেষ্টা করিল; কিন্তু আমি তাহাকে সে অবসর প্রদান করিলাম না, ‘পাপীয়াসি, তোর দুর্কর্মের ফলভোগ কর’ বলিয়া তাহার দেহে বোতলের জল ঢালিয়া দিলাম। আমি ভয়ে আতঙ্কিত করিয়া উঠিল, তাহার পরই সে একটি ঘোটকীতে পরিণত হইল, জাঁহাপনা কলা সেই ঘোটকীই দেখিয়াছেন।

আমি তাহাকে ধরিয়া আস্তাবলে পুরিলাম, তাহার পর তাহার প্রতি যে মণ্ডের ব্যবস্থা করিয়াছি, তাহা জাঁহাপনা স্বয়ং দেখিয়াছেন। আমি আশা করি, জাঁহাপনা এখন এই হুচ্চারিণীর প্রতি এই প্রকার দণ্ডের অহুযোদন করিবেন। তাহার স্ত্রায় হুশীলা রজনী কদাচ ভদ্রব্যবহারের যোগ্য নহে।’

খালিক সিদ্দিক হুমানের কাহিনী শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ‘সিদ্দিক হুমান, তোমার কাহিনী অতি আশ্চর্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তোমার স্ত্রীর দৃষ্ট ব্যবহার কোনক্রমে সমর্থন করিতে পারা যায় না; কিন্তু সে যে ঘোটকীদেহ লাভ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার পাপের যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে, তাহার উপর এক্ষণ পীড়ন করা ক্ষয়হীনতার পরিচায়ক। আমি ইহাকে ক্ষমা করিবার জন্ত তোমাকে অহুযোদন করিতাম, কিন্তু আমি বৈষ্ণব প্রতিহিংসা-পরায়ণ, তাহাতে সে যে তোমার উপর প্রতিশোধ লইবার প্রয়াস পাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উহাকে মনুষ্যদেহ দান করিলে শিশাটী তোমাকে অধিকতর বিপদে ফেলিতে পারে।’



খোজা
হাসেন
আল-হা-
বলেন
কাহিনী

সিদি হুমানের কাহিনী শেষ হইলে খালিক খোজা হাসেনকে সোধোধন করিয়া বলিলেন, “খোজা হাসেন! কাল আমি তোমার গৃহমন্ডিকটবর্তী পথ দিয়া বাইতে বাইতে তোমার স্রবহৎ স্রবজ্জিত গৃহ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিলাম। গৃহ কাহার, তাহা জানিবার জন্ত উৎসুক হইয়া কোন কোন পথিককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা তোমার নাম বলিল। তাহাদের মুখে আরও শুনিতে পাইলাম, তুমি নিজে দরিদ্র অবস্থায় হইতে এই অতুল সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছ; কিন্তু তুমি পূর্ব-স্বব্যহার কথা বিশ্বত হও নাই, কেবল তাহা নহে, তুমি তোমার অর্থের স্বব্যবহার করিতেও কুচিত্রিত নও। তোমার গুণের কথা শুনিয়া আমি তোমা প্রতি অত্যন্ত সম্ভ্রষ্ট হইয়াছি। কি উপায়ে তুমি দরিদ্র অবস্থা হইতে এরূপ ধনশালী হইলে, তোমার নিজে মুখে তাহা শুনিবার জন্ত আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। আমার অন্ত কোন উদ্বেগ নাই, সত্যতা আশা করি, তুমি আমার নিকট কোন কথা গোপন করিবে না। তুমি আমার প্রশংসালাভে কখনও বক্রি হইবে না।”

খোজা হাসেন খালিকের কথা শুনিয়া তাঁহার সিংহাসনপ্রান্তে নুষ্ঠিত হইয়া, খালিকের প্রতি সন্মানপ্রদর্শন প্রকাশ করিল, তাহার পর উঠিয়া সে তাহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিল।

আমার এই স্রবসৌভাগ্যের জন্ত আমি আমার দুইটি বন্ধুর নিকট সর্বাঙ্গাঙ্গীকৃতজ্ঞ। বন্ধুর এই বোধ্যাদা নগরেরই অধিবাসী; এক জনের নাম সাদী, অজ্ঞের নাম সাদ। সাদী অত্যন্ত ধনবান ব্যক্তি। তাহার বিশ্বাস, যে পরিমাণ অর্থের অভাবে স্বাধীনভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারা যায় না, সে পরিমাণে অর্থ না থাকা বিড়ঘনার বিষয়। সাদের বিশ্বাস অন্তরূপ। সে বলিত, পরের উপকারের জন্ত টাকা ধাকা আবশ্যক, আমাদের অভাব দূর করিবার জন্ত যে পরিমাণ ধনের প্রয়োজন, তাহা থাকিলেই যথেষ্ট হইল। সাদ তাহার নিজের অবস্থাতেই সুখী, এবং সাদী যদিও সাদ আত্মীয় বন্ধুগণ অধিক ধনবান, তথাপি উভয়ের মধ্যে অকৃত্রিম বন্ধুত্বের অভাব নাই। অর্থের আধিবেশ্য জন্ত সাদী কখনও সাদ অপেক্ষা আপনাকে কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করিত না। তাহাদের মধ্যে কখন মনোভেদ ঘটিতে দেখি নাই।

ভাষ্যপরিবর্তনে
মনোবর্তিত

এক দিন উভয় বন্ধুতে অর্থ-ব্যবহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের সেই আলোচনের মর্ম্ম পর তাহাদের মুখে শুনিয়াছি। সাদী বলিল, “আমার বিশ্বাস, দরিদ্রগণ এই জন্ত দরিদ্র যে, তাহারা তাহা দিগের দুঃখ দূর করিবার জন্ত কিবা ব্যবসায়ের উন্নতির নিমিত্ত ইচ্ছা করিলেই অনেক অর্থ হস্তগত করিতে পারে না। যদি তাহারা আবশ্যকানুরূপ টাকা লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই ধনের স্বব্যবহার করে, ক্রমে তাহারা প্রচুর ধনবান হইতেও পারে।”

সাদ বলিল, “পর্যায় লোক অনেক উপায়েই ধনবান হইতে পারে, কেহ দৈবাৎ বহু অর্থ পাইয়া ধনবান হয়, আবার অল্প মূলধনে কারবার করিতে করিতে মিতব্যয়িতা ও সন্ধিবেচনার ফলেও অনেকে বহু অর্থ সম্ভব করিতে পারে।”

সাদী বলিল, “আচ্ছা সাদ, আমি যে কথা বলিলাম, আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার নিকট তাহা প্রমাণ করিব। প্রথমে একটি আজন্ম দরিদ্রের উপর দিয়া পরীক্ষা চালান যাক; যদি আমার মত প্রমাণ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে তোমার মতামতসারে কাজ করা যাইবে।”

এইরূপে তর্কের পর চই বন্ধু এক দিন নগরের পথে অগ্রসর হইতেছিলেন, আমি সেই পথের ধারে দাঁড়ি নির্দোষ করিতেছিলাম, সেইখানেই আমার গৃহ। আমার দরিদ্র পিতা ও পিতামহ সেই স্থানে আমায়

করিব বরিত্ত অবস্থায় রক্ত নিষ্কাশন করিয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। আমারও অল্প কোন আশা—আকাঙ্ক্ষা ছিল না, আমার পরিচ্ছদে আমার দারিদ্র্য পরিব্যক্ত হইতেছিল।

সাদী সাদীর তর্ক মনে রাখিয়াছিল। সে বলিল, “ভাই সাদী, তুমি যে দিন যে যুক্তির কথা বলিতেছিলে, তাহা যদি পরীক্ষা করিয়া দেখিবার সংকল্প থাকে ত’ ঐ দেখ, এক জন গরীব লোক। আমি ইহাকে দীর্ঘকাল হইতেই এই কাণ্ডে নিমুক্ত দেখিতেছি। লোকটি বড়ই গরীব, তোমার দয়ার উপযুক্ত পাত্র, তুমি ইহার উপর তোমার যুক্তি প্রয়োগ করিতে পার।”

সাদী বলিল, “তুমি ভাল কথা মনে করিয়া দিয়াছ, আমি ইহার উপরেই আমার যুক্তি প্রয়োগ করিব, পরীক্ষার ফলাফল বথাকালে জানিতে পারা যাইবে। আগে সংবাদ লও, লোকটি প্রকৃত গরীব কি না।”

সাদী বলিতে আবার নিকট উপস্থিত হইল। দেখিলাম, তাহার আমার সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছুক, আমি তৎক্ষণাৎ কণ্ঠস্বত্যাগ করিয়া তাহাদের নিকট উপস্থিত হইলাম। তাহার আমার নাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি সেলাম করিয়া নান বলিলাম। সাদী বলিল, “হাসেন, তুমি যে ব্যবসয়ে প্রবৃত্ত আছ, তাহাতে তোমার সংসারভাতা বেশ স্বচ্ছন্দে নির্বাহ হয় ত’? তুমি যেসব দীর্ঘকাল ধরিয়া রক্তের ব্যবসায় প্রবৃত্ত, তাহাতে আমার বোধ হয়, তুমি কিছু অর্থদ্বন্দ্বের সমর্থ হইয়াছ। যে টাকা দক্ষিণ হইয়াছে, তাহা গাঁজার ব্যবসয়ে খাটো না কেন? তাহা হইলে শীঘ্রই ত’ তুমি ধনবান হইয়া উঠিতে পার।”

আমি বলিলাম, “মহাশয়, আপনরা বিশ্বাস করিবেন কি জানি না, কিন্তু আমি এ পর্য্যন্ত দক্ষিণ কামের করিয়া এক পয়সাও জমা হইতে পারি নাই। দিবারান্তি কঠোর পরিশ্রম দ্বারা বাহা কিছু উপার্জন করি, তদ্বারা অতি কষ্টে আমার সংসার নির্বাহ হয়। সংসারে আমার স্ত্রী আছে, পুত্র-কন্যা সংখ্যায় পাঁচটি, তাহাদের সকলেই অল্পবয়স্ক, হুতরাং তাহার কোন বিষয়ে আমার সাহায্য করিতে পারে না। আমি একাকী উপার্জন করিয়া তাহাদিগকে প্রতিপালন করি। গাঁজার ব্যবসয়ে প্রবৃত্ত হওয়া কঠিন কাজ নহে, তাহা জানি; কিন্তু সে জন্ত অর্থের আবশ্যক। সংসার প্রতিপালন করিয়া অর্থ উদ্ভূত থাকিলেই তাহাতে প্রস্তুত হইতে পারা যায়; নতুবা স্ত্রীপুত্রকে অনাহারে রাখিয়া ব্যবসয়ে প্রবৃত্ত হওয়া কদাচ সম্ভবপর নহে। আল্লা আমাকে যাহা দান করেন, তাহার জন্তই আমি ঠাহার নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি ত’ আমার স্ত্রীপুত্রকে অনাহারে রাখেন নাই, ভিক্ষারূপে দ্বারাও জীবনধারণ করিতে হইতেছে না; হুতরাং আমার ক্ষোভ বা আক্ষেপের কোন কারণ নাই।”

আমার কথা শুনিয়া সাদী বলিল, “হাসেন, তোমার সকল কথাই বিশ্বাস করিলাম, তোমার অবস্থায় আমি অসম্মত নহ দেখিয়া সুখী হইলাম; কিন্তু মনে কর, যদি আমি তোমাকে এখন দুই শত স্বর্ণমুদ্রা উপহার দান করি, তাহা হইলে কি তুমি তাহার সম্যবহার কর না? আর এই টাকা দ্বারা ব্যবসয়ে তুমি কি ধনবান হইতে পার না?”

আমি বলিলাম, “মহাশয়, আপনি নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে অনর্থক রহস্তালাপ করিয়া আমার কাজ নষ্ট করিতেছেন না। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি, আপনি আমাকে যে পরিমাণ অর্থদানে সৌকৃত্য হইতেছেন, তাহা আপেক্ষা অনেক অল্প মূলধন পাইলেই আমি রক্তব্যবসায়িগণের মধ্যে প্রধান লোক হইয়া উঠিতে পারি। কিন্তু, কিছু দিনের মধ্যে আমি এই বোম্বাই নগরের অনেকের অপেক্ষাই ধনবান হইতে সমর্থ হই।”

সাদী আমার কথা বিশ্বাস করিয়া স্বর্ণমুদ্রা-পূর্ণ একটি তোড়া বাহির করিল এবং তাহা আমার হস্তে দান করিয়া বলিল, “হাসেন, এই দুই শত স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ কর। তুমি এই অর্থের দ্বারা ভবিষ্যতে উন্নতি হইতে সমর্থ হইয়াছ তুমিতে পাইলে আমি ও আমার বন্ধু সাদ উভয়েই বিশেষ আনন্দলাভ করিব।”



আমি এতগুলি স্বপ্নমুদ্রা হঠাৎ লাভ করিয়া আনন্দে উদ্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম, প্রাণ খুলিয়া আমার উপকারককে ধন্যবাদ দান করিলাম, তাঁহার বহুপ্রাপ্ত কৃতজ্ঞতাভরে পুনঃ পুনঃ চূষন করিলাম সান্নী ও তাহার বহু তৎক্ষণাৎ সে স্থান পরিত্যাগ করিল, তাহাদের মুখে দ্বিতীয় কোন কথা শুনিতে পাইলাম না।



প্রথমেই আমার চিন্তা হইল, স্বপ্নমুদ্রাগুলি রাখি কোথায়? গৃহে তেমন ভাল বাক্স নাই, কোথাও নো লুকাইয়া রাখিব, এমন স্থানও নাই। অবশেষে আমি তাহা আমার পাগড়ীর মধ্যে সেলাই করিয়া রাখাই সর্বাপেক্ষা নিরাপদ ও সমস্ত মনে করিলাম। আমি বাড়ী আসিলাম; এ অর্থের কথা কাহারও নিকট— এমন কি, কোন প্রকার অনর্থপাত্তভয়ে আমার স্ত্রীর নিকটও প্রকাশ করিলাম না। গোটা দেশকে মোহে বিশেষ আবদ্ধকায়-নির্কাহের জন্ত বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্টগুলি আমি পাগড়ীর মধ্যে দৃঢ়রূপে সেলাই করিয়া রাখিলাম। যে টাকা বাহিরে রাখিয়া দিলাম, তাহার কিয়দংশ দিয়া উৎকৃষ্ট গাঁজা ক্রয় করিলাম, তাহার পর দীর্ঘকাল ধরিয়া আমাদের মাংসভক্ষণ করা হয় নাই ভাবিয়া, কিঞ্চিৎ মাংস ক্রয় করিবার বড় সখ্য হইল— আমি মাংসক্রয়ের জন্ত বাজারে চলিলাম।

আমি মাংস কিনিয়া তাহা লইয়া বাজার হইতে বাড়ী বাইত্রেছি, সহসা কোথা হইতে একটা চিল উড়ি আসিয়া আমার হাতের মাংসের উপর ছৌ মারিল। আমি দৃঢ়রূপে মাংসগুলি ধরিয়াছিলাম, হতভাগ্য সে হেঁ মারিয়া কিছু করিতে পারিল না; কিন্তু যদি আমি মাংসগুলি ছাড়িয়া দিতাম, সে-ও আমার পক্ষে অনেক মঙ্গলের বিষয় ছিল, তাহা হইলে আমার সর্বনাশ হইত না।

আমার হাতের মাংস লইতে না পারিয়া চিল পুনঃ পুনঃ আমার উপর ছৌ মারিবার চেষ্টা করিতে লাগিল আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। বাস্তবতা বশতঃ আমার মাথার পাগড়ী মাথা হইতে খুলিয়া হঠাৎ মাটি উপর পড়িয়া গেল, আমি তাহা তুলিয়া লইতে না লইতে চিলটা এক ছৌ মারিয়া পাগড়ীটা মুখে তুলিয়া লইয়া উড়িয়া গেল। আমি ঘোররবে আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম। আমার আর্তনের শুনিয়া বহুসংখ্যক নর-নারী বালক-বালিকা পথে আসিয়া জুটিল। তাহারা হাত উর্দ্ধে তুলিয়া চীৎকার করিয়া চিলটাকে ভয় দেখাইয়া তাহার কবল হইতে পাগড়ীটা মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু আমাদের চীৎকারে কোন ফল হইল না, চিল পাগড়ী ফেলিল না, তাহা মুখে লইয়া দ্রুতবেগে উড়িয়া চলিল এবং অল্পকালের মধ্যেই অদৃশ্য হইল।

আমি শোকে চম্বে মুতপ্রায় হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। যে দশ ঘোহর বাহিরে ছিল, তাহা প্রায় গাঁজা কিনিতেই ব্যয় করিয়াছিলাম, কিছু অবশিষ্ট ছিল, তদ্বারা একটা নূতন পাগড়ী ক্রয় করিলাম। আমার ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা মরীচিকার ভায় শূন্যে বিলীন হইয়া গেল।



আমার সকল অপেক্ষা আক্ষেপের কারণ এই হইল যে, আমার উপকারী বহু যে এতগুলি টাকা দান করিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হইল। তাঁহারা যদি অতঃপর শুনিতে পান, পাগড়ী-সমস্ত সমস্ত টাকা চিলে লইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে কখনও তাহা বিশ্বাস করিবেন না, বলিবেন, টাকাগুলি অপব্যয় করিয়া আমি একটা বাজে ওজর করিতেছি।

যাহা হউক, আমি সম্ভ্রমমনে পূর্ববৎ আমার কাজ করিতে লাগিলাম। আজ হঠাৎ আমাকে এত টাকা দান করিয়াছিলেন, আবার হঠাৎ তিনিই গ্রহণ করিলেন! আমি ত? কখনও এ টাকা পাইবার আশা করি নাই, এই ভাবিয়া আমি মনকে শাস্ত দান করিলাম; ভাবিলাম, আমার ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছে।

এই ঘটনার ছয় মাস পরে সেই ছই বন্ধু আবার আমার বাড়ীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। এই ষ মাসে আমার অবস্থার কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি না, দেখিবার জন্য তাঁহারা আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

দূর হইতে সাদ আমাকে দেখিতে পাইলেন, আমার পূৰ্ণ-অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নাই দেখিয়া তিনি বলিলেন, “তোমার চেষ্টা বৃথা হইয়াছে, ঐ দেশ, হাসেন পূৰ্ণেও যেরূপ ছিল, এখনও সেইরূপ আছে।”

সাদী দেখিলেন, সাদের কথা ঠিক। সাদ আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, “হাসেন, ছই শত মাসের এত দিনে একটুও অবস্থা-পরিবর্তন করিতে পার নাই! টাকাগুলি লইবার পূৰ্ণে তুমি ত’ অল্পদিনেই ডুলোক হইবার আশা করিয়াছিলে।”

আমি বলিলাম, “মহাশয়, আপনাদের অভিশ্রম ও আমার আশা-ভরসা সকলই বার্থ হইয়াছে। আপনাদের দয়া করিয়া আমাকে যে স্বর্ণমুদ্রাগুলি দিয়াছিলেন, আমি হুৰ্ভাগ্য বশতঃ তাহার সদ্যবহার করিতে পারি নাই, আমি সেগুলি হইতে বঞ্চিত হইয়াছি।” আমি কিরূপে পাগড়ীর মধ্যে সেগুলি গোপিয়া রাখিয়াছিলাম ও চিলে তাহা কিরূপে লইয়া গিয়াছে, সে কথা তাঁহাদের নিকট বলিলাম।

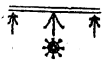
সাদী আমার কথা বিশ্বাস করিলেন না; তিনি বলিলেন, “হাসেন, আমি দেখিতেছি, তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া করিতেছ, আমাকে প্রতারণিত করিবার জন্য যে মিথ্যা গল্পটি রচনা করিয়া বলিলে, তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না, কারণ, মানুষের পাগড়ী চিলে ছৌ দিয়া লইয়া গিয়াছে, এ কথা সম্পূর্ণ অবিষ্মত। চিল কেবল ষাণ্ডামন্ত্রীর উপরই ছৌ মারে। তুমি টাকা লইয়া কি করিয়াছ, তাহা আমি বুঝিয়াছি, আমার মত অবস্থার লোক টাকা পাইলে বাহা করে, তুমিও তাহাই করিয়াছ, অর্থাৎ কাজ বন্ধ করিয়া বাহরগুলি ভাঙ্গাইয়া কয়েক দিন খুব ধুমধামে আহালাদি করিয়াছ, এইরূপে তাহা ফুরাইয়া গেলে আমার কাছে চিলের বদনাম দিতেছ; তোমার অবস্থার উন্নতির জন্য বৃথা তোমাকে এতগুলি টাকা দিয়াছি, দেখিতেছি, তুমি ইহার উপযুক্ত নহ, তাহা বুঝিলাম।” আমি বলিলাম, “মহাশয়, আপনি যত ইচ্ছা আমাকে ধরবার করিতে পারেন, তাহাতে আমি ক্ষুব্ধ নই, কারণ, আমি জানি, আমি প্রকৃতই নিরপরাধ, চিলে গুড়ী লইয়া যাওয়ার কথা আপনার নিকট অবিষ্মত হইতে পারে, কিন্তু আমার পাগড়ী যে চিলে ছৌ দিয়া ইয়া গিয়াছে, তাহা অনেক লোক দেখিয়াছে, তাহা চিলের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্য অনেকই তাহার দ্বাৰে ছুটিয়াছিল, আপনি এখানকার যে কোন লোককে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। শিবীতে নিতাই অসম্ভব কাণ্ড ঘটতেছে, যতক্ষণ আমরা তাহা চোখে না দেখি, ততক্ষণ তাহা বিশ্বাস করিতে পারি না।”

সাদ আমার কথা বিশ্বাস করিলেন, তিনি আমার পক্ষাবলম্বন করিয়া, তাঁহার বন্ধকে বুঝাইতে গিলেন। সাদী পুনর্বার ছই শত স্বর্ণমুদ্রা বাহির করিয়া আমার হস্তে প্রদান করিলেন,— লিলেন, “হাসেন, আমি পূৰ্ণে তোমাকে যে ছই শত স্বর্ণমুদ্রা দান করিয়াছিলাম, তাহা তোমার হান কাজে লাগে নাই, আশা করি, এবার আর ইহা তুমি নষ্ট করিবে না, ভাল জায়গায় রাখিবে, এবং ইহার দ্বারা অবস্থার উন্নতি করিবে।” আমি সাদীর এই অস্বাভাবিক হুগ্রহে তাঁহার পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে ধন্যবাদ দান করিতে লাগিলাম, তজ্জতা প্রকাশ করিলাম, সাদী আমাকে অধিক কথা বলিবার অবসর না দিয়া সাদের সহিত সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

উপকারী
কৈফিয়ৎ



পুনরায়
আশার
উদ্বোধন



টাকাগুলি লইয়া আমি ধরে ফিরিলাম। এবারও এ টাকার কথা আমি কাহাকেও বলিলাম না— এমন কি, আমার স্ত্রীকেও না। আমি দশটি মোহর বাহিরে রাখিয়া অবশিষ্টগুলি একখানি কাপড়ে বাধিলাম এবং ঘরের কোণে একটি তুঘের হাঁড়া ছিল, সেই তুঘের হাঁড়ার মধ্যে লুকাইয়া রাখিলাম। তাহার পর দ্বিগুণে কাজে বাহির হইলাম।



ইতিমধ্যে এক জন সাজিমাটী-বিক্রেতা সাজিমাটী বিক্রয়ের জন্য আমার বাড়ী আসিল। আমার স্ত্রী কয়েক সের সাজিমাটী কিনিয়া তাহার পরিবর্তে হাঁড়া সমেত তুঘ তাহাকে দান করিয়া ফেলিল। খুব সস্তায় সাজিমাটী কিনিয়াছে ভাবিয়া আমার স্ত্রী ভারী আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, এমন সময় আমি বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

বাড়ী ফিরিয়াই আমি প্রথমে গৃহকোণে দৃষ্টিপাত করিলাম, তুঘের হাঁড়া নজরে পড়িল না। আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হাঁড়া কি হইল?—আমার স্ত্রী বলিল, সস্তায় সাজিমাটী কিনিয়াছি, সাজিমাটীর পরিবর্তে তুঘ-সমেত হাঁড়াটা সাজিমাটী-বিক্রেতাকে দিয়া দিয়াছি।”

এই কথা শুনিয়াই আমার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি গালে মুখে চড়াইয়া কাদিতে কাদিতে বলিলাম, “করিয়াছি কি মাগী! একেবারে আমার সর্বনাশ করিয়াছিস? হায়, হায়, আমি যে উহার মধ্যে একশ নব্বইটা মোহর লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, মোহরগুলো সমেত তাহাকে দিয়া ফেলিয়াছিস!”

আমার স্ত্রী প্রথমে আমার কথা অবিবাস করিল, তখন আমি মোহরগুলি কিরূপে কোথা পাইয়াছিলাম, তাহা আমার স্ত্রীকে বলিলাম। শুনিয়া সে মাটিতে পড়িয়া চাঁৎকার করিতে লাগিল, আমি যে তাহাকে মোহরের কথা না বলিয়া ভান্নী অস্তায় করিয়াছি, তাহাকে বলিলে সে কখনও এমন কাজ করিত না, এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল। দেখিলাম, তাহার চাঁৎকারে পাড়ার লোক জড় হইবার উপক্রম! বলিলাম, যে সকল লোক আসিয়া আমার ঘৃণে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরের কথা, আমার বিপদে হাতই করবে। আমি নানা প্রকার প্রবোধবাক্যে আমার স্ত্রীকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু তাহাকে কি শান্ত করা যায়? তাহার পর অনেক ধর্মকথা, অদৃষ্টের কথা বলিয়া তাহার শোক উপশম করিলাম।

এই ঘটনার পর যেমন কাজ করিতেছিলাম, সেই ভাবে কাজ করিতে লাগিলাম, কিন্তু আমার মনে একটু অশান্তি লাগিয়াই রহিল, সাদী ও সাদ কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই আমার কাছে ফিরিয়া আসিবে, তাহারা আমার অবস্থার একটুও উন্নতি দেখিতে পাইবেন না, আমি তখন তাহাদিগের কাছে কি জবাব দিব? দুই শত মোহর একবার ত’ চিলের মুখে দিয়াছি, এবার কি আমার মোহর হারানোর কথা তাহারা বিবাস করিবেন?

টাকায় অদৃষ্ট
ফেরে না



এবার আমি নিশ্চয়ই বড় লোক হইয়াছি স্থির করিয়া সাদী সাদকে সঙ্গে লইয়া অনেক দিন পরে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আসিবার সময় উভয়েই তরু করিতে করিতে আসিতেছিলেন। সাদী বলিতে ছিলেন, “এবার নিশ্চয়ই হাসেনের অবস্থা ফিরিয়াছে।” সাদ বলিতেছিলেন, “আমি ইহা মনে করিতে পারি না। অবস্থা যখন ফেরে, তখন ত’ সামান্য উপলক্ষেই ফেরে, হাতে হঠাৎ কতকগুলি টাকা আসিলেই অবস্থা ফেরে না।”

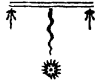
উভয় বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে বড়ই লজ্জার সঞ্চার হইল। প্রথমে ভাবিলাম, কোথাও গিয়া লুকাই, উহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ করিব না। কিন্তু পলাইতে পারিলাম না, যেন তাহাদিগকে

মিটেই পাই নাই, এই ভাবে নতমুখে কাজ করিতে লাগিলাম, অবশেষে তাঁহারা উঠয়ে আমার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন; বলিলেন, “দেলাম, খোজা হাণান!” আমি আর কি করিয়া কথা না বলিয়া চুপ কুড়িয়া থাকি? আমি নতমুখে আমার বিপদের কথা তাঁহাদিগের কাছে বলিলাম এবং এই ব্যাপারে আমার কোন দোষ নাই, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বলিলাম, “আপনারা হয় ত” বলিবেন, মোহরগুলা একটু ভাল জায়গায় ঝুকাইয়া রাখিলে না কেন, তাহা হইলে ত’ আর হারাইত না। কিন্তু সেই তুবের হাঁড়া অপেক্ষা নিরাপদ স্থান আর গৃহে আর দ্বিতীয় ছিল না। কত দিন হইতে হাঁড়াটি ঐ স্থানে রহিয়াছে, কখনও এমন ঘটনা ঘট নাই। আমার দ্বীকে মোহরগুলায় কথা বলিয়া রাখিলে হয় ত’ তাহা থাকিত, কিন্তু জ্বালোকের উপর বিশ্বাস করিয়া এমন গুরুতর কথা বলিবে, এরূপ নির্দোষ আমি নহি; আমি নিশ্চয়ই বুঝিতেছি, আপনার টাকায় আমি বড়লোক হই, আল্লার এরূপ অভিপ্রায় নহে; যদি হইত, তাহা হইলে চিলে কখনও হেঁদারিয়া পাগড়ী লইয়া বাইত না, আর সামান্য সাম্রাজ্যের পরিবর্তে আমার দ্বী সাম্রাজ্যটিকে বিক্রয় করিয়া পাগড়ী লইয়া বাইত না, আর সামান্য সাম্রাজ্যের পরিবর্তে আমার দ্বী সাম্রাজ্যটিকে বিক্রয় করিয়া পাগড়ী লইয়া বাইত না, আর সামান্য সাম্রাজ্যের পরিবর্তে আমার দ্বী সাম্রাজ্যটিকে বিক্রয় করিয়া পাগড়ী লইয়া বাইত না। আমার দ্বী এই হাঁড়া হইতে তুব লইয়া কতবার কত কাজ করিয়াছে, কিন্তু এমন বিস্ময় ত’ কখনও হয় নাই। যাহা হউক, যদিও আপনার এতগুলি টাকা অপব্যয় হইল, তথাপি আপনার নিকটে সে জন্য আমি অল্প কৃতজ্ঞ নহি।”

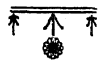
আমার কথা শেষ হইলে সাদী বলিলেন, “তোমার কথা সত্য হইতে পারে, কিন্তু আমি যে বিষয় পরীক্ষার দ্বারা তোমার হস্তে এই মোহরগুলি প্রদান করিয়াছিলাম, সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। চারিশত স্বর্ণমুদ্রা রাখা নষ্ট হইল বলিয়া আমি দুঃখিত নহি, আমি এই জন্য দুঃখিত হইতেছি যে, আমি যে পরীক্ষার জন্য এত টাকা ব্যয় করিলাম, তাহা তোমার উপর ব্যয় না করিয়া যদি অন্যের উপর ব্যয় করিতাম, হয় ত’ আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারিত, অজ্ঞে হয় ত’ ইহাতে প্রকৃতই উপকৃত হইত,” অনন্তর সাদী সাদের দিকে কিরিয়া বলিলেন, “সাদ, আমি ইহার উপর আর পরীক্ষা করিতে চাহি না, যদিও চারিশত স্বর্ণমুদ্রা রাখা গেল, তথাপি আমি বিশ্বাস করি, আমার বুদ্ধি অসার নহে, এখন আমি ক্ষান্ত হইলাম, ইহার জন্য তুমি তোমার ক্রি প্রয়োগ করিয়া দেখ, কৃতকার্য হইতে পার কি না। টাকা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যদি ইহাকে নবানু করা তোমার সাধ্য হয়, তবে এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। আমি কিন্তু ভাই তোমার চেষ্টা সফল হইবে বলিয়া কোনক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমি চারিশত স্বর্ণমুদ্রা রাখা উহার মন্থা কিরাহিতে পারিলাম না, আর তুমি যে যাঁ করিয়া বিনা সম্মলে উহাকে বড়লোক করিয়া তুলিবে, ইহা কোনক্রমে আশা করিতে পার না।”

সাদের হাতে এক টুকরা সীসা ছিল। বোধ করি, তিনি কোথাও তাহা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, সেই সীসটুকু সাদীকে দেখাইয়া সাদ বলিলেন, “দেখ ভাই সাদী, আমি সীসটুকু হাসেনকে দিব; তুমি পুরে জানিতে পারিবে, হাসেন এই সীসার বলে কালে কি রকম বড়মানুষ হইয়া উঠে।” সাদের কথা শুনিয়া সাদী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, সেই দৃশ্যে আমারও হাসি পাইল। সাদী বলিলেন, “তুমি কি কেশিয়াছ, চারিশত স্বর্ণমুদ্রার যে লোকের অবস্থা একটু ফিরিল না, সিকি পরগা অপেক্ষাও কম মূল্যের এক টুকরা সীসার তাহার অবস্থা কিরবে! এ কথা যে বলে, সে পাগল ভিন্ন আর কি? এ সীসা ইহার কি প্রয়োজনে আসিবে, তাহাও ত’ বুঝিতে পারিতেছি না।” সাদ সাদীর কথায় কোন উত্তর না দিয়া আমাকে বলিলেন, “হাণান, সাদী আমার কথা শুনিয়া যত ইচ্ছা হাসুক, তুমি ইহা গ্রহণ কর, এক দিন তুমি বুঝিবে, আমার কথা সত্য, এক দিন তুমি এই সীসাইকুরার কল্যাণেই বড়লোক হইবে।”

মোহর গেল,
তর্কের মীমাংসা
হইল না।



বিনা সম্মলে
ভাগ্য-পরিবর্তন



সীসার টুকরা
বহিমা



আমি বলিলাম, “আপনি কি আমাকে বিজ্ঞপ্তি করিতেছেন? একটু সীসা হইতে যে এত অধিক আশা করে, হয় সে বিজ্ঞপ্তি, না হয় উজ্জ্বল।” আমি যাদের কথায় একটু আহত হইলাম, কিন্তু ভয়ভা-প্রকাশে দ্বন্দ্ব হইলাম না, ধন্বদার মিনা তাঁহার হাত হইতে সীসটুকু লইলাম এবং আমার কোর্তার বুকের পকেটে অবজ্ঞা-ভায়ে তাহা নিশ্চেষ্ট করিলাম। দুই বন্ধু আমার নিকট হইতে চলিয়া গেলেন। আমি পূর্বকথ্য কাণ্ড করিতে লাগিলাম, সীসটুকুর কথা একবারেই ভুলিয়া গেলাম।

রাত্রে শয়ন করিব; কোর্তা খুলিতে গিয়া দেখি, পায়ের কাছে ঠক করিয়া কি পড়িল। জিনিটটি হাতে তুলিয়া লইয়া দেখিলাম, তাহা আর কিছু নহে, দাদপ্রদত্ত সীসার টুকরাটুকু। আমি পদতল হইতে তাহা তুলিয়া লইলাম, তাহার পর অবহেলাক্রমে ঘরের এক কোণে কেলিয়া রাখিলাম।

সেই রাত্রে আমার এক জন প্রতিবাসী জেলের জাল মেরামত করিবার ভজ্ঞ খানিক সীসার দরকার পড়িল। জাল মেরামত না করিয়া, সে শেষরাত্রে মাছ ধরিতে বাইতে পায় না। কিন্তু তত রাত্রে সীসা কিনিতে পাওয়াও সহজ নহে। সে সীসার খোঁজে তাহার স্ত্রীকে পাড়ার মধ্যে পাঠাইল।

জেলের স্ত্রী পাড়ায় অনেক বাড়ী ঘুরিল, কিন্তু কোথাও সীসা পাইল না। জেলের নিকট আসিয়া সে এ কথা জানাইল। জেলে জিজ্ঞাসা করিল, “সকল বাড়িতেই খোঁজ করিয়াছিস? কোন্ কোন্ বাড়ী গিয়াছিস, বল দেখি?” জেলের স্ত্রী অনেক গৃহস্থের নাম করিল। জেলে বলিল, “হাসান আলহাবালের বাড়ী যাস্ নি কেন?” জেলের স্ত্রী বলিল, “সে পোড়ারমুখের বাড়ী আবার এত রাত্রে সীসে মিলবে? তার ঘরে সকল জিনিসই পাওয়া যায় কি না, তাই সীসে পাওয়া যাবে!” জেলে ভারী গরম হইয়া বলিল, “তুই কুড়ের বাদশা! একটু দূরে যেতে হবে কি না, আমি একটা গুজর ক’রে বসেছি! আমি বলছি, ভাল চাস্তো এখনই গিয়ে, তার বাড়ী সীসা আছে কি না দেখ, আর দশ জিনিস পাওয়া যায় না বলে এ সামান্য জিনিষটাও পাওয়া যাবে না, এ কি একটা কথা? হারামজাদি, ছোট লোকের বেটা!”

গালি খাইয়া জেলের স্ত্রী রাগে গম গম করিতে করিতে আমার বাড়ী আসিল। তখন আমার একটু আশিরাছিল, জেলের স্ত্রীর ডাকাডাকিতে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। স্ত্রীলোকটি আমাকে বলিল, “হাসান আলহাবাল, আমাদের মিন্বে মাছ ধরতে যাবে, তা তার জাল ছিঁড়ে গিয়েছে, একটু সীসে ভিন্ন জাল মেরামত হয় না, আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দিলে, একটু সীসে দিতে পার?”

দাদ আমাকে যে এক টুকরা সীসা দিয়াছিল, তাহার কথা তখনও আমি ভুলি নাই। জেলের স্ত্রীকে বলিলাম, “তুমি একটু দাঁড়াও, একটু সীসা ঘরে আছে, খুঁজিয়া দিতেছি।” আমার স্ত্রীরও ইতিমধ্যে মিনা ভাঙ্গিয়া গেল, সে উঠিতেই আমি তাহাকে বলিলাম, “ঘরের কোণে এক টুকরা সীসা ফেলিয়া রাখিয়াছি, ঐ জেলেনী মাগীকে তাহা দাও ত’।” আমার স্ত্রী সীসটুকু লইয়া ঘর খুলিয়া তাহা জেলেনীকে প্রদান করিল।

জেলেনী প্রত্যাশা করে নাই যে, এত রাত্রে আমার ঘরে সীসা পাইবে। সে বড় আনন্দিত হইয়া আমাকে বলিল, “হাসান মিনা, আজ তুমি আমাদের বড় উপকার করিলে, আমি বলিয়া বাইতেছি, আমার স্বামী আজ প্রথমবার জাল কেলিয়া যত মাছ পাইবে, তাহা তোমাদের দিব। আমার কথা অস্তথা হইবে না।”

জেলেনী আমার নিকট যে প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল, তাহা জেলের নিকট বলিল। জেলে সেই সীসটুকু পাইয়া এতই খুসী হইয়াছিল যে, সে তাহার স্ত্রীর প্রস্তাবে সন্তুষ্ট হইল। তাহার পর জাল মেরামত করিয়া

প্রথম জালের
মাছ



সে ছই দণ্ডী রাত্রি থাকিতে নদীতে মাছ ধরিতে গেল। প্রথমবার জাল ফেলিতেই সে নাতিবৃহৎ একটা মাছ পাইল। তাহার পর কয়েকবার জাল ফেলিয়া সে অনেক মাছ পাইল বটে, কিন্তু প্রথমদ্বয়ের মাছটির মত বড় মাছ আর একবারও পাইল না।

কেলে মাছ লইয়া বাড়ী আসিয়া সর্বপ্রথমে ধরা মাছটি লইয়া আমার বাড়ী আসিয়া বলিল, “হাসান মিক্রা, আমার জী বে কথা বলিয়া গিয়াছিল, তাহা রক্ষা করিতে আসিয়াছি, আল্লা তোমার জন্য এই মাছটি আমার জালে দিয়াছিলেন, ইহা তোমাকে লইতেই হইবে। যদি প্রথম ক্ষেপে আরও বেশী মাছ পাইতাম, তাহা হইলে তাহাও তোমার জন্য আনিতাম।”

আমি জেলের কথা শুনিয়া তাহাকে বলিলাম, “ভাই, তুমি আমার প্রতিবেশী। প্রতিবেশিগণের পরস্পরের সাহায্য করা উচিত, আমার সামর্থ্য অধিক নহে, যাহা লাগে তোমার জন্য তাগ করিয়াছি, প্রত্যাপকারলাভের আশায় করি নাই; তোমাকে আর মাছ দিতে হইবে না।” কিন্তু কেলে আমাকে ছাড়িল না, মাছ লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। পাছে মাছটি না হইলে সে গুণ্ধিত হয়, এই ভাবিয়া আমি তাহার হাত হইতে মাছটি লইলাম এবং তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বিদায় করিয়া আমি আমার জীর কাছে আসিয়া তাহাকে মাছ দিয়া বলিলাম, “কেলে আমাদের সেই সীসাটুকু লইয়া কৃতজ্ঞতার চিত্তব্রূপ এই মাছ দিয়া গিয়াছে। এ সীসাটুকু যদি আমাকে দিয়াছিল; বলিয়াছিল, ইহার দ্বারা আমার অদৃষ্ট প্রসন্ন হইবে।”

সাদ ও সাদী আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, আমার জীকে তাহা সকলই বলিলাম।

আমার জী মাছ কুটিতে বলিল। মাছের পেটের মধ্যে একখণ্ড অতি উজ্জ্বল প্রকাণ্ড হীরক বাহির হইল। আমার জী মনে করিল, তাহা একখণ্ড কাচ হইবে; কারণ, আমার জী কখন হীরক দেখে নাই, হীরক কিরূপ, তাহা আমিও জানিতাম না। হীরকখানি আমার জী আমার ছোট ছেলের হাতে প্রদান করিল। আমার ছোট ছেলের হাত হইতে আমার অন্ত ছেলে-মেয়েরা তাহা লইয়া তাহার উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য্য দেখিতে লাগিল।

রাত্রে হীরকখণ্ডের উজ্জ্বলতা শতগুণ বদ্ধিত হইয়া উঠিল। আমার জী আমাদের শয়ন-ঘরের প্রাণীপট রান্নাঘরে লইয়া গেলে ছেলেরা হীরকখানি বাহির করিল, তাহার উজ্জ্বল আভাষ গৃহ আলোকিত



সীসা
বিনি-
ময়ে
মাছ

মাছের পেটে
সুদৃশ্য হীরক





হইয়া উঠিল, তাহা দেখিয়া ছেলেদের মনে মহানন্দের সঞ্চার হইল; তাহারা হীরকখানি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল, তাহাদের চীৎকার-ক্রন্দন-কোলাহলে চারিদিক প্রভিক্ত হইয়া উঠিল।

রাত্রে আহারাদি শেষ হইল, কিন্তু তাহাদের বিবাদ মিটিল না, তাহাদের চোখে ঘুমও আসিল না। তাহাদিগকে এই ভাবে বিবাদ করিতে দেখিয়া আমি আমার বড় ছেলেকে ডাকিলাম এবং তাহাকে তাহাদের বিবাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। আমার বড় ছেলেটি বলিল, “বাবা, এক টুকরা কাচ পাওয়া গিয়াছে, তাতে অঙ্ককার ঘর আলোকিত হয়, সেই কাচখানা লইবার জন্য সকলে বিবাদ করিতেছে।” আমি তাহাকে সেই কাচখানি আমাকে দেখাইবার জন্য বলিলাম। আমি তাহার উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ইহা কোথা হইতে আসিল? আমার স্ত্রী বলিল, “মাছ কুটিতে কুটিতে নাছের পেটের মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।”

আমি ভাবিলাম, হয় ত একখানা কাচই হইবে। আমার স্ত্রীকে বলিলাম, “প্রাণীপটা বাহিরে লইয়া যাও ত।”

আমার স্ত্রী প্রাণীপটা বাহিরে লইয়া যাইবামাত্র হীরকের জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল, ইহাতে আমি পুলকিত হইয়া আমার স্ত্রীকে বলিলাম, “সাদের কথা বড় মিথ্যা নয়, তাহার প্রদত্ত নীসাতে আর কিছু না হউক, আমরা আলানি তেল কিনিবার দায় হইতে মুক্ত হইলাম। এই কাচটা ঘরে থাকিলে আর প্রাণীপ আলিবার দরকার হইবে না।”

ঘরে প্রাণীপ নিক্ষেপ করিয়া গৃহ আলোকিত করিবার জন্য হীরকখণ্ড গৃহমধ্যে রাখা হইল। ঘর আলোকিত হইল দেখিয়া ছেলেরা সকলে মিলিয়া এমন সিংহনাদ আরম্ভ করিল যে, পাড়ার সকল লোক সে শব্দ শুনিতে পাইল। আমি ও আমার স্ত্রী আমাদের পূজকতাপ্রাণকে শাস্ত করিবার জন্য আরও অধিক চীৎকার করিতে লাগিলাম। অনেক রাত্রে তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলে ঘর স্থির হইল।

পরদিন প্রত্যুবে উঠিয়া আমি আমার কাজে চলিয়া গেলাম। হীরকখণ্ডের কথা আর আমার মনেই বাহন না, এক টুকরা কাচ, তাহার কথা আর কি ভাবিব? আমি তাহার মূল্যস্বন্ধে কোন কথাই জানিত্তাম না।

আমার গৃহের পাশেই এক জন ইহুদী বাস করিত। এই ইহুদী অত্যন্ত ধনবান, সে জহরতের ব্যবসায় করিত, এই ব্যবসাতেই সে অতুল সম্পত্তি উপার্জন করিয়াছিল। রাত্রে আমার পূজ-কতাপ্রাণের গোলমালে ইহুদী ও তাহার স্ত্রীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইয়াছিল। সকালে ইহুদীর স্ত্রী রাকেল আমার স্ত্রীকে বলিল, “হাঁ! লো আইলাক, কাল রাত্রে কি তোরা বাড়ী হাট বন্দিয়াছিল? তোরা ছেলেদের গণ্ডগোলে আমাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, সমস্ত রাত্রি আর আমরা স্বামি-স্ত্রীতে চোখের পাতা বুজিতে পারিলাম না। ভাল, হইয়াছিল কি?”

আমার স্ত্রী বলিল, “ঠাকুরাণি, আমাদের অপরাধ লইবেন না। আমার ছেলেরা বড় চুষ্ট, সকল ছেলে পিলেই সমান, অল্পতেই তাহারা হাসে, অল্পেই ক্রোধ; কাল রাত্রে যে গোলমাল হইয়াছিল, তাহার কারণ আপনাকে দেখাইতেছি।” আমার স্ত্রীর কথা শুনিয়া রাকেল কৌতুহলক্রান্ত হইয়া আমার স্ত্রীর সহিত আমাদের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

ইহুদীপত্নী হীরকখানি হাতে তুলিয়া ভাল করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। আমার স্ত্রী বলিল, “হীরক জন্তই কাল রাত্রে যত গোলমাল, একখানা কাচ পাইয়া ছেলে-মেয়েরা, হাট বন্দিয়াছিল।” আমার স্ত্রী ক্রুদ্ধে উচ্চ পাইয়াছে, ইহুদীর স্ত্রীকে তাহা বলিল।

ইহুদীর স্ত্রী হীরক চিনিত। তাহা যে কিরূপ মূল্যবান সামগ্রী, তাহা সে মুহূর্তমধ্যে বুঝিতে পারিল, কিন্তু আমার স্ত্রীকে তাহা বুঝিতে দিল না; বলিল, “আইগাক, আমার বোধ হয়, ইহা কাচ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তবে জোলুন দেখিয়া বোধ হইতেছে, একটু ভাল কাচ। আমার একখানা এই রকম কাচ আছে, এখানা পাইলে জোড় মেলে, তাই তোমার কাছে ভাই এখানি চাহিতেছি। একেবারে অমনই চাহি না, যদি কিছু দাম লইয়া দাও ত’ ভাল হয়।” আমার ছেলেরা এই কথা শুনিয়া একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল; বলিল, “না, উহা বিক্রয় করিতে পারিবি না, আমরা উহা লইয়া বেণা করিব।” তাহাদিগের পীড়ানীড়িতে বাধা হইয়া আমার স্ত্রী বলিল, “আচ্ছা, তোদের কেন ভয় নাই, আমি উহা বিক্রয় করিব না।”

ইহুদীর স্ত্রী গৃহে ফিরিয়া গেল। ফিরিবার সময় গোপনে আমার স্ত্রীকে বলিয়া গেল, “এ কাচ যদি বিক্রয় কর, তবে আমাকে না জানাইয়া হঠাৎ কোথাও বিক্রয় করিয়া ফেলিও না।”

ইহুদী প্রত্যয়ে তাহার দোকানে চলিয়া গিয়াছিল। ইহুদীপত্নী আমার বাড়ী হইতে বাহির হইয়াই ক্ষতবেগে তাহার দোকানে উপস্থিত হইল। সে তাহার স্বামীর নিকট আমার হীরকের কথা বলিল, তাহার শ্রুণেরও পরিচয় প্রদান করিল, রাজ্জে তাহা কিরূপ দীপ্তিশীল হয়, সে কথা বলিতেও ভুলিল না। সকল কথা শুনিয়া জহরী তাহার স্ত্রীকে পুনর্বার আমার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিল, হচ্ছা, যদি কিছু দাম দিয়া হীরকখানি হস্তগত করিতে পারা যায়! হীরকখানি সহজে পাওয়া না গেলে যে দামে হউক, সেই দামেই তাহা ক্রয় করিবার জন্য ইহুদীর বড় আগ্রহ হইয়াছিল, তাহাও পড়ে বুঝিতে পারিয়াছিল।

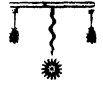
ইহুদীর স্ত্রী আমার স্ত্রীর কাছে আসিয়া বলিল, “ভাই, তোমার কষ্টের সংসার, কাচখানিতে আমার কিছু উপকার হইবে, তোমাকে বিশ মোহর দিতেছি, উহা আমাকে প্রদান কর।” একখণ্ড কাচের দাম বিশ মোহর! আমার স্ত্রী ভাবিল যে, দাম খুব অতিরিক্তই হইয়াছে। কিন্তু ইহুদীপত্নী সামান্য একখণ্ড কাচের দাম বিশ মোহর দিতে প্রস্তুত হওয়ায়, আমার স্ত্রীর মনে একটু সন্দেহও হইল। তাই আমার স্ত্রী বলিল, “তুমি যে দামই দিতে স্বীকার কর, আমার স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া ইহা তোমাকে দিতে পারিব না।”

আহারের সময় আমি বাড়ী আসিলাম। আমার স্ত্রী আমাকে জহরীর স্ত্রীর কথা বলিল। আমি সাদের কথা মনে করিলাম। সাপ বলিয়াছিল, তাহার প্রদত্ত সীলতেই আমার দোভাগ্যবাহী মুক্ত হইবে, সুতরাং আমি বিশ মোহরে হীরকখণ্ড বিক্রয়ে সম্মত হইলাম না; বস্তুতঃ আমি কোন কথা না বলিয়া নীরব রহিলাম। জহরীর স্ত্রী ভাবিল, দাম কম হইয়াছে ভাবিয়া আমি চুপ করিয়া আছি। সে বলিল, “ইহার মূল্য আমি পক্ষাণ মোহর প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি। ইহাতে বিক্রয় করিবে ত’?”

ইহুদী-পত্নী কুড়ি মোহর হইতে একেবারে পক্ষাণ মোহরে উঠিল দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম; বুঝিলাম, আমার কাচ সামান্য কাচ নহে। আমি বলিলাম, “তুমি যে দাম বলিতেছ, ও দামই নহে, ওরূপ দামে আমি ইহা বিক্রয় করিব না।” ইহুদী-পত্নী একশত মোহর দিতে চাহিল। আমি তখন সাহস পাইয়া বলিলাম, “যদি লক্ষ মোহর প্রদান করিতে পার, তাহা হইলে আমি ইহা তোমাকে প্রদান করিতে পারি। তাহার এক পরগা কম হইলে নয় না। আমি বাজারে বাচাই করিলে বড় বড় জহরীগণ অন্যায়সেই আমাকে ইহার এই মূল্য প্রদান করিবে।”

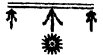
ইহুদী-পত্নী ক্রমে ক্রমে পক্ষাণ হাজার মোহর পর্যন্ত দিতে সম্মত হইল, কিন্তু আমি আমার কথা পরিবর্তন করিলাম না। তখন সে বলিল, “আমি স্বামীর মত না জানিয়া ইহার অধিক মূল্য প্রদান করিতে পারি না। আমি আমার নিকট একটি অল্পগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি, আমার স্বামীর সহিত এবিষয়ে পরামর্শ করিয়া বাহা স্থির হয়, তুমি আমাকে বলি, তাহার পূর্বে এই হীরক বিক্রয় করিও না।” আমি ইহুদী-পত্নীর এই প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

সোনালী-হীরক
গৃহপথের আগ্রহ



বিশ মোহর
হইতে

লক্ষ মোহর



দোকানের কাজ শেষ করিয়া ইহুদী আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি তখন বাড়ী আসিয়াছিলাম। ইহুদী বলিল, “ভাই হায়েন, আমার স্ত্রী যে হীরাখানা তোমার স্ত্রীর নিকট দেখিয়া গিয়াছে, সেখানি আমাকে একবার দেখিতে দাও।” আমি তাহাকে ঘরে আসিয়া দেখিতে বলিলাম।

লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার
হীরক বিক্রয়



তখন স্ত্রী হইয়াছিল, আমি ঘরে আসিয়া জহরীর হস্তে হীরকবস্ত্র প্রদান করিলাম। অন্ধকার গহ তাহারই আলোকে আলোকিত হইতেছিল। জহরী অনেকক্ষণ ধরিয়া হীরকবস্ত্রখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, তাহার পর বলিল, “আমার স্ত্রী তোমাকে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ইহার মূল্য প্রদান করিতে চাহিয়াছেন, যদি তুমি এ দামে অসম্মত হও, তাহা হইলে আমি আরও বিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিতে প্রস্তুত আছি, ইহার উপর আর কথা বলিও না।” আমি বলিলাম, “তোমার স্ত্রীকে ত’ আমি বলিয়াছি, লক্ষ স্বর্ণমুদ্রার কমে ইহা বিক্রয় করিব না। কেহ ইহার কম মূল্য বলে, আমি বিক্রয় করিব না, আমার এক কথা।” জহরী দেখিল, আমি যে দাম বলিয়াছি, তাহার কমে হীরকখানি বিক্রয়ে রাজী হইব না। তখন সে বলিল, “আচ্ছা, আমি তোমাকে ইহার মূল্য লক্ষ মোহরই দিব, কিন্তু আপাততঃ আমার হাতে এত টাকা নাই, কাল তোমাকে এক সময়ে সমস্ত টাকা বুঝাইয়া দিয়া হীরক লইয়া যাইব। আজ ছই হাজার মোহর বায়না লও।” জহরী সেই দিনই আমাকে ছই হাজার মোহর বায়না প্রদান করিয়া গেল।

পরদিন জহরী আমাকে বাকি আটানব্বই হাজার স্বর্ণমুদ্রা আনিয়া দিয়া হীরক লইয়া গেল।

এইরূপে আশ্রয় অল্পগ্রহে আমি আশাভীত ধনী হইলাম। আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, আমি সাদের পদতলে পড়িয়া, তাহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসি, কিন্তু আমি তাঁহার ঠিকানা জানিতাম না; সুতরাং আমি তাঁহার কাছে যাইতে পারিলাম না। সাদীর কাছেও আমি অল্প কৃতজ্ঞ ছিলাম না; কারণ, যদিও তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, তথাপি তাঁহার যে সং উদ্দেশ্য ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, আমি সাদীরও ঠিকানা জানিতাম না।

ইহাও আমাকে বড়লোক হইতে দেখিয়া আমার স্ত্রীর অহঙ্কার শতগুণে বর্ধিত হইয়া উঠিল। সে তাহার নিজের ও ছেলে-মেয়েদের বস্ত্রালঙ্কারের লক্ষ্য ফর্দ দিয়া বলিল। আমি বলিলাম, “রোসো, আগে কতখানের সুবিধা করি, ঘরবাড়ীর স্ফূল্ভা করি, ক্রমে সকলই হইবে। টাকা হাতে আসিলেই কতকগুলি বাড়ি খরচ ইহাও বাড়িয়া ফেলা কর্তব্য নহে।”

সৌভাগ্য-
শিখরে



ক্রমে আমি বাবসায়ে প্রভূত উন্নতি করিলাম। দড়ির বাবসায় আমার একচেটে হইয়া পড়িল। বড় লোক এই কাজ করে, আমি সকলকে বেতন দিয়া আমার কর্মে নিযুক্ত করিলাম। বড় বড় গুলাম নির্মাণ করিলাম। নিজের বাসের জন্যও অবস্থাভূরূপ একটা বাড়ী করিলাম। সেই বাড়ীই গতকাল মহামান্ন বানিত বাহারের পথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমার অবস্থা-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমার নামটাও একটু জমকালো হইয়া উঠিল। আমার নাম হইল—খোজা হাসান আলহাবাল।

আমি আমার নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিলে সাদী ও সাদ আমার অবস্থা পরীক্ষার জন্য আমার অনুরোধে আসিলেন। অনেক স্থানে ঘুরিতে ঘুরিতে যে পথে আমার বাড়ী, অবশেষে তাহার সেই পথে উপস্থিত হইলেন। আমার বাড়ী দেখিয়া তাঁহাদের প্রথমেই সন্দেহ জন্মিল, সে বাড়ী আমার কি না। বাহা হউক, ঘরোয়ান তাঁহাদের সন্দেহ দূর করিল, ঘরোয়ান দরজা খুলিয়া দিলে তাঁহারা আমার নিকট উপস্থিত হইলেন।

আমি তাঁহাদিগকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিলাম। মহা সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের বস্ত্রপ্রাপ্ত চুধনের জন্য অগ্রদর হইলাম, তাঁহারা আমাকে সে অবদর দিলেন না, আমাকে

আমালিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ করিলেন। আমি তাঁহাদিগকে উচ্চাসনে বসিবার জন্ত অহরোধ করিলাম, কিন্তু তাহারা তাহাতে না বসিয়া নিম্ন আসন গ্রহণ করিলেন।

দুই বন্ধ উপবেশন করিলে আমি সবিনয়ে তাঁহাদিগকে বলিলাম, “মহাশয়গণ, আমি যে সেই গরীব জনান আলহাভাল, সে কথা ভুলি নাই, আমি আজ যে অবস্থা লাভ করিলাম, সে জন্ত আপনাদের নিকট কল্যাণরূপে কৃতজ্ঞ, স্মৃত্যং আমার প্রতি আপনাদের এরূপ মর্যাদা-প্রদর্শন কর্তব্য নহে।”

সাদী প্রথমে কথা কহিলেন, বলিলেন, “খোজা হাসান, আজ তোমার এই প্রকার উন্নতি দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দের সঞ্চার হইয়াছে। আমি বুঝিতেছি, আমি তোমাকে এইবারে যে চারিশত স্বর্ণমুদ্রা উপহার প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই তোমার এরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে। কিন্তু তুমি আমার নিকট যে সত্য গোপন করিয়া বলিয়াছিলে, চিলে টাকা লইয়া গিয়াছে, আর তুমি হাঁড়ার টাকা লুকাইয়া রাখিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ বলিয়া ধামা দিয়াছিলে কেন? তুমি আমার কাছে প্রকৃত কথা বলিতে এত কুণ্ঠিত হইতেছিলে কেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই।”

সাদ সাদীর কথা শুনিয়া যেন অধীর হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত হইলেন না। সাদীর কথা শেষ হইলে সাদ বলিলেন, “ভাই সাদী, তুমি খোজা হাসানের কথা অবিশ্বাস করিয়া তাহার প্রতি বড়ই অবিচার করিয়াছ। খোজা হাসান নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলে নাই। যাহা হউক, এখন খোজা হাসানের কথা শুনা বাক, কাহার সাহায্যে তাহার এই সৌভাগ্য, অবিলম্বেই বুঝিতে পারা যাইবে।”

আমি তাঁহাদের কথা শুনিয়া বলিলাম, “মহাশয়গণ, আমি যদি না জানিতাম যে, এরূপ ভর্তুকি আপনাদের বন্ধু-বন্ধন কদাচ শিথিল হইবে না, তাহা হইলে আমি কখনও সম্বন্ধে একটি কথাও বলিতাম না। আমি পূর্বেও আপনাদিগকে মিথ্যা কথা বলি নাই, এখনও বলিব না।” এই কথা বলিয়া আমি আমার সৌভাগ্যলাভের বিবরণ বিস্তারিতরূপে দুই বন্ধুর নিকট ব্যক্ত করিলাম।

দুঃখের বিষয়, আমার কথা সাদী বিশ্বাস করিলেন না। আমার কথা শেষ হইলে তিনি বলিলেন, “খোজা হাসান, চিলে মাথার পাগড়ী ছেঁ। মারিয়া লইয়া যায় কিবা সাজি: নীর পরিবর্তে তুমি হাঁড়া বিক্রয় করা হয়, এ উভয়ই যেমন অবিশ্বাস, মাহের পেটে লক্ষমোহর মুলোর হীরক পাওয়াও তেমনিই অবিশ্বাস। যাহা হউক, তুমি যে বড় লোক হইয়াছ, ইহাই বিশেষ স্মরণের কথা। তবে তুমি আমার টাকার বড়লোক হইয়া সে কথা স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছ, এ জন্তই আমার মনে কিঞ্চিৎ আক্ষেপ হইয়াছে।”

আমি দেখিলাম, সাদীকে আমার কথা বিশ্বাস করান কঠিন, আমার একটু দুঃখ হইল; কিন্তু তথাপি আমি যে তাহার নিকট প্রকৃতরূপে কৃতজ্ঞ, তাহা ভুলিলাম না। সাদী ও সাদ উভিবার উপক্রম করিলে, আমি তাঁহাদিগকে বলিলাম, “আপনাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা আছে, আপনারা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। আমি স্বেচ্ছা আপনাদের জন্ত কিঞ্চিৎ আহায়েদের আয়োজন করিব, আপনাদিগকে আমার গৃহে স্বাগ্তি বাশন করিতে হইবে। কাল আমার সঙ্গে আপনারা আমার পল্লীভবনে যাইবেন, এক দিনেই ফিরিয়া আসিতে পারিবেন। অগণপথে যাইবেন, স্থলপথে আগিবেন। আমার আস্তাবল হইতে ঘোড়া পাঠাইব, সেই ঘোড়ায় আগিবেন।”

সাদী বলিলেন, “যদি সাদের অন্ত কোন কাজ না থাকে, তাহা হইলে আমার আগন্তি নাই।” সাদ বলিলেন, “না, আমার এমন কোন জরুরী কাজ নাই, যে জন্ত এতখানি আমোদ মাটি করিতে পারি। তবে আমাদের বাড়ীতে সোকা পাঠাইয়া সংবাদটা জানান ভাল, কেন না, আমাদিগকে না দেখিয়া পরিবারেরা উৎকণ্ঠিত হইতে পারে।” আমি উভয়ের গৃহেই ভৃত্য পাঠাইয়া সংবাদ দিলাম ও আহাঙ্গানির আয়োজন করিলাম।

ধামা বাজী
কেন?



আতিথ্যের
সম্মাননা





পাখীর
বাসা
মোহন-
বাঁধা
পাগড়ী

আমার সাধাঙ্গলারে আহারাদি ও গান-বাজনার আয়োজন করিলাম। উচ্চশ্রেণীর পুষ্ক পায়ক ও মৃদরী নর্তকীগণ আমায় সম্মানিত অতিথিদের চিত্তবিনোদনের জন্য নৃত্যগীতের জলসা আরম্ভ করিল। আহারাদির পর নৃত্যগীতে সাদ ও সাদী বিশেষ সজ্জা হইলেন দেখিয়া আমার মনে বড়ই আনন্দ হইল। পরদিন প্রত্যুষে স্বপ্না সয়ের পূর্বেই আমরা নদীতীরে উপস্থিত হইলাম। আমার আদেশ অনুসারে একখানি উৎকৃষ্ট পানদী স্থপঞ্জিত অবস্থায় নদীতীরে রাখা হইয়াছিল, আমরা পানদীতে উঠিতেই ছয় জন গাড়ী সবলে নৌকা বাহিয়া চলিল অল্পকাল শ্রোতে নৌকা দ্রুত চলিতে লাগিল। প্রায় দেড়ঘণ্টার মধ্যে আমরা পরী-নিকেতনে উপস্থিত হইলাম। আমার এই পরীগৃহটি অতি সুবহৎ নহে বটে, কিন্তু স্থপঞ্জিত; চারিদিকে খোলা, বায়ুর অব্যাহত গতি, চতুর্দিকে খেজুরগাছের ছায়া, নিকটেই একটি মৃদর উপবন, উপবনে নানা জাতীয় ফলিত ফলের বৃক্ষ, ফলের



সৌরভে বাগানটি আমোদিত হইতেছে, নিব্বরের বরষা শব্দ, পাখীর অশ্রান্ত কণ্ঠস্ব, পঞ্চগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আমার সেই গৃহ ও উপবন দেখিয়া সাদ ও সাদীর মনে আনন্দের সীমা রহিল না। আমি তাঁহাবিগকে আমার গৃহে বিশ্রামের জন্য অল্পরোখ করিলাম।

আমার দুই পুত্র সেই পরী ভবনে পূর্ব হইতেই আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল, আমরা দেখানে উপস্থিত হইলে তাহারা পাখীর ছানা পাড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। একটি উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় পাখীর বাসা ছিল, কিন্তু তাহারা সে বৃক্ষে

উঠিতে সাহস না করায় একটি ভৃত্যকে তাহারা সেই বৃক্ষে উঠিয়া পক্ষীর বাসা পাড়িবার জন্য আদেশ করিল।

ভৃত্য বৃক্ষে আরোহণ করিল, কিন্তু পাখীর বাসা দেখিয়া তাহার বিষয়ের সীমা রহিল না। সে দেখিল, একটি পাগড়ীতে পাখী বাসা করিয়াছে। ভৃত্যটি পাগড়ী সমেত পক্ষিবাক পাড়িয়া ফেলিল এবং নামিয়া আমার পুত্রের হস্তে তাহা প্রদান করিল। আমার বড় ছেলে পাগড়ী লইয়া আমার কাছে ছুটিয়া আসিল, বলিল, “বাবা, বড় মজা, একটা পাগড়ীতে পাখীর বাসা হইয়াছে।” আমি এই অপূর্ণ পাখীর বাসা দেখিয়া বড় আনন্দ বোধ করিলাম, সাদ ও সাদীও অল্প বিস্মিত হইলেন না। আমার বিষয় সহসা আরও বাড়িয়া উঠিল; কারণ, একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলাম যে বৃক্ষিতে পারিলাম, এ আমারই সেই পাগড়ী, যাচা চিপে ছোঁ মাঝিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমি সাদ ও সাদীকে সে কথা বলিলাম।

হয় ত' আমার পূর্বদিক্ত মোহরগুলি পাগড়ীর মধ্যে আছে ভাবিরা, আমি পাগড়ীটা ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। পাগড়ীটা অত্যন্ত ভারী বোধ হওয়ায় আমার সন্দেহ বৃদ্ধি হইয়াছিল। পাগড়ী ছিঁড়িবার সময় কতকগুলি মোহর পড়িয়া পড়িল। আমি সাদকে তাহা গণিতে বলিলাম, সাদ গণিয়া বলিলেন, “এক শত নব্বই মোহরই আছে।”

আমি বলিলাম, “আমার বোধ হয়, চিলটা আমার পাগড়ী লইয়া উড়িতে উড়িতে এখানে আসিয়াছিল এবং এ গাছের উপর উহা কলিয়াছিল, তাহার পর তাহা গাছের ডালে আটকাইয়া যাওয়ায় পরে পাখীতে উহার মধ্যে ডিম পাড়িয়াছিল। সাদ আমার কথায় সমর্থন করিয়া বলিলেন, “আমারও তাহাই অসম্ভব নয়, তাই সাদী, তুমি দেখিলে, খোজা হাসান আমাদিগকে মিথ্যা কথা বলে নাই।”

সাদী বলিলেন, “খোজা হাসান, বুখিলাম, এই এক শত নব্বই মোহর তোমার ধনবান্ হওয়াতে কিছু সাহায্য করে নাই, কিন্তু ইহাই ত' সমস্ত নহে, দ্বিতীয়বার তোমাকে যে মোহরগুলি দিয়াছিলাম, তাহার সাহায্যে যে তুমি বড়লোক হও নাই, তাহার প্রমাণ কোথায়?”

আমি বলিলাম, “মহাশয়, আমি ত' আপনাকে বলিয়াছি, সেই টাকার মধ্যে এক শত নব্বই মোহর আমি কুড়ার মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, হাঁড়ানমেত তাহা হস্তান্তরিত হইয়াছে; সাক্ষিমাটিকে তাহা লইয়া গিয়াছে। আমি মিথ্যা কথা বলি নাই।”

সাদ এই কথা শুনিয়া আমাকে বলিলেন, “খোজা হাসান, সাদী তোমাকে যাহা ইচ্ছা বলুক, তাহাতে তুমি ও মনে আনন্দ পায়, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি? তুমি যে আমার সীসা হইতেই বড়লোক হইয়াছ, তাহা আমি বিশ্বাস করি।”

সাদী বলিলেন, “সাদ, তুমি কি জান না, টাকায় টাকা আসে? আমি টাকা না দিলে, খোজা হাসান কখন বড়লোক হইতে পারিত না।”

সাদ বলিলেন, “তুমি নিরপেক্ষ মত কথা বলিতেছ, আমি যদি কোথাও একখণ্ড হীরা কুড়াইয়া পাই, আর যদি তাহা পঞ্চাশ হাজার মোহরে বিক্রয় করিতে পারি, তাহা হইলে আমার ধনবান্ হওয়া কি কঠিন কাজ?”

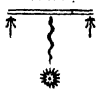
যাহা হউক, এ বিষয় লইয়া আর অধিক তর্ক হইল না। আমাদের আহ্বানাদি শেষ হইলে আমরা বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। হৃৎযাত পর্য্যন্ত আমরা সেই গৃহে বিশ্রাম করিলাম। তাহার পর অর্ধে আরোহণ করিয়া আমরা বোঙ্গাদে অভিমুখে ধাবিত হইলাম। বোঙ্গাদে পৌছিতে আমাদের একটু রাত্রি হইল। কখন চন্দ্রোদয় হইয়াছিল।

বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, ঘোড়ার দানা ফুরাইয়া গিয়াছে। গোলা অনেক দূরে, তাহাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, শুনিয়া আমি পল্লীর মধ্যে দানার সন্ধানে লোক পাঠাইলাম, দানা পাওয়া গেল না। অভাবে আমার ভৃত্য এক হাঁড়া ভূষ একটা দোকান হইতে লইয়া আসিল।

ভূষগুলি ঢালিতেই তাহার ভিতর হইতে একখানি কাপড়ে বাধা কি বাতির হইয়া পড়িল। আমার ভৃত্য তাহা না খুলিয়াই আমার নিকট উপস্থিত করিল।

আমি দেখিয়াই চিনিতে পারিলাম, আমার মোহরবাধা কাপড়। আমি মোহরগুলি খুলিয়া গণিলাম, এক এক শত নব্বইট হইল। আমার স্ত্রীকে হাঁড়াটা দেখাইলাম, সে বলিল, “এ আমারই সেই হাঁড়া বটে, সাক্ষিমাটীর পরিবর্তে ভূষসমেত ইহা দিয়াছিলাম।”

দ্বিতীয় প্রমাণ
কোথায়?



ঘোড়ার দানা
সংগ্রহে মোহর
আবিষ্কার



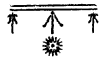


সাদী এবার বিশ্বাস করিলেন, আমি তাঁহার টাকাত বড় লোক হই নাই, বিশ্বাস না করিবার উপায়ও ছিল না। তাঁহার সমুখেই যে অকটা প্রমাণ! সাদী তখন বলিলেন, “তাই, আমি এত দিনে বিশ্বাস করিলাম, টাকা লিয়া সাহায্য না করিলে যে কেহ ধনবান্ হইতে পারে না, এ কথা ভুল, অল্প উপায়েও মাহুষ ধনবান্ হইতে পারে।”

সাদীর কথা শেষ হইলে আমি বলিলাম, “আমি এখন আপনাকে এই তিন শত আশী মোহর দিয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিতে পারি না। আল্লাহ ইচ্ছায় আমার এখন যথেষ্ট অর্থ হইয়াছে, সুতরাং ইচ্ছাতে আমার আর আবশ্যক নাই, আপনার অনুমতি হইলে আমি ইহা দীনদুঃখীকে দান করিতে পারি।”

সাদী তৎক্ষণাত আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। সেই রাত্রে আর আমি তাঁহাদিগকে ছাড়িলাম না, তাঁহারা আহাঙ্গা করিয়া আমার গৃহেই শয়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া উভয় বন্ধু বিদায় গ্রহণ করিলেন। আমার আতিথ্যসংস্কারে তাঁহারা বিশেষ স্নিহিতাভ করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে তাঁহাদের দুজনের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল। আমি অনেক সময়েই তাঁহাদের বাড়ী যাই, তাঁহারাও মধ্যে মধ্যে আমার গৃহে আসিয়া আমার আনন্দ বর্দ্ধন করেন। আমি আমার ধন-সম্পত্তির সম্ভাবহার করিতে কোন দিনই কাতর নই।

খালিকের চমক



খালিক খোজা হাসানের কাহিনী শ্রবণ করিয়া অনেকক্ষণ বিষয়াবিহীনভাবে অবস্থান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, “খোজা হাসান, তোমার জীবনের কাহিনী শুনিয়া আমি বেক্রম আনন্দলাভ করিলাম, এমন আনন্দ আমি বহুদিন লাভ করি নাই। আল্লা তোমাকে অতি অল্প উপায়ে ধনবান্ করিয়াছেন, এমন সকলের অদৃষ্টে ঘটে না। তুমি আল্লাহর যে প্রসন্নতা লাভ করিয়াছ, সর্বদা পরোপকারসাধন করিয়া সেই প্রসন্নতা স্থায়ী কর। তুমি মাছের পেটে যে হীরকখণ্ড পাইয়াছিলে, তাহা আমার ধনাগারে সঞ্চিত আছে, আমি তাহা বহু অর্থব্যয়ে ক্রয় করিয়াছি। বস্তুতঃ এমন উৎকৃষ্ট হীরক আমার ধনাগারে আর দ্বিতীয় নাই। আমার ইচ্ছা, তোমার বন্ধু সাদী ও সাদ আমার এখানে আসিয়া স্বচক্ষে তাহা দেখিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের তোমার কথায় সন্দেহের আর কোন কারণ থাকিবে না। গল্পের লোক যে অন্তরে নিকট অর্থসাহায্য না পাইলে বড়লোক হইতে পারে না, এ কথা ভুল। অল্প নানা উপায়ে মাহুষ ধনবান্ হইতে পারে। তুমি তোমার কাহিনী আমার খাজানীর নিকট বলিবে, তাহা সে নিশ্চয় লইবে, তোমার ভাগ্য-পরিবর্তন-কাহিনী হীরকখণ্ডের সহিত রক্ষিত হইবে।”

অনন্তর খালিক সন্তুষ্টচিত্তে খোজা হাসান, দিদিসুমান ও বাবা আবদাল্লাকে বিদায় দান করিলেন। বিদায় গ্রহণের পূর্বে তাহারা গভীর সম্মানভরে খালিকের সিংহাসন চুম্বন করিল।

মূলতানা শাহরজাদী এই গল্প শেষ করিয়া মূলতান শাহরিয়ারের অনুরোধে আর একটি অত্যন্ত দীর্ঘ গল্প আরম্ভ করিলেন, কিন্তু অন্তর্কণের মধ্যে রাত্রি প্রভাত হওয়ায় সে দিনের মত তাহা স্থগিত রাখিতে হইল। পরদিন রাত্রিতে প্রমোদ-ভৃগু-মুখে হাসির লহর ভুলিয়া শাহরজাদী আবার তাহা বলিতে লাগিলেন।

সারস্বতীমায় কোন নগরে কাসিম ও আলিবাবা নামে দুই ভ্রাতা বাস করিত। তাহাদের পিতা মৃত্যু-
কালে যে বংশসম্রাজ্য সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিল, তাহা তাহারা দুই জনে ভাগ করিয়া লয়, দুজনই সমান
কিন্তু পাইয়াছিল বটে, কিন্তু দৈববিধানে উভয়ের অবস্থা একরূপ হয় নাই।

কাসিম এক অবস্থাপন্ন সদাগর-দুহিতার পাণিগ্রহণ করে। কিছুদিন পরে কাসিমের স্বতন্ত্র
পরিচালকগণন করিলে কাসিমের স্ত্রীই সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয় এবং এইরূপে কাসিম একটি
মোকান, যথেষ্ট ভূসম্পত্তি ও বহুসংখ্যক পণ্যদ্রব্য লাভ করিয়া, তাহাদের দেশের মধ্যে এক জন সম্ভ্রান্ত
সদাগর হইয়া উঠে।

আলিবাবা যেমন গরীব, সে সেইরূপ গরীবের কলারই পাণিগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং তাহার
অবস্থার উন্নতি হইল না, তাহার পরিবার-প্রতিপালনের আর কোনই উপায় ছিল না। তাহার
সম্পত্তির মধ্যে কেবল ছিল তিনটি গাধা। সেই গাধা জুড়লে লইয়া গিয়া আলিবাবা কাঠ ভাঙ্গিয়া
আসিত এবং তাহা নগরে বিক্রয় করিয়া যে কিছু অর্থোপার্জন হইত, তাহাতেই সে অতি কষ্টে
সিদ্ধান্ত করিত।

এক দিন আলিবাবা অরণ্যে গিয়া কাঠকাটা প্রায় শেষ করিয়াছে, এমন সময় দূরে সে ধূলিরাশি দেখিতে
পাইল। খোলা মাঠের উপর দিয়া দেখিল, ধূলিরাশি আকাশতল আচ্ছন্ন করিয়া, তাহার দিকেই অগ্রসর
হইতেছে। আলিবাবা বিশেষ মনোযোগের সহিত সেই দিকে চাহিয়া রহিল, কিয়ৎকাল পরে দেখিল,
অশ্বারোহী ক্রান্তবর্ণে সেই দিকে আসিতেছে।

আলিবাবার অসুস্থমান হইল, এই সকল অশ্বারোহী দল; সুতরাং সে প্রাণরক্ষা করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ
একটি বৃক্ষে আরোহণ করিল। এই বৃক্ষটির পত্ররাশি অত্যন্ত ঘন, শাখাপ্রশাখাগুলি একটি পাহাড়ের
পরে আসিয়া পড়িয়াছে, আলিবাবা সেই গাছের একটি ডালের উপর চূপ করিয়া বসিয়া রহিল। সে যেখানে
বসিল, সেখান হইতে সে সকলই দেখিতে পাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে কাহারও দেখিবার সাধা ছিল না।
পাহাড়ের ধারেই গাছের মূলদেশ।

অশ্বারোহিগণ সেই বৃক্ষমূলে আসিয়া অশ্বের গতি সংযত করিল। আলিবাবা দেখিল, দলগণ সংখ্যায়
চলিগতি। আলিবাবার অসুস্থমান মিথ্যা নহে, বাস্তবিকই ইহারা দল, কিন্তু ইহারা নিকটে দল্যবৃত্তি
করিত না, দূরদূরান্তরে দল্যবৃত্তি করিয়া আসিয়া লুপ্তিত ঘন এই স্থানে সঞ্চয় করিতে আসিত। আলিবাবা
আগে দেখিল, অশ্ব হইতে নামিয়া বোড়াগুলিকে দানা খাইতে দিল, এবং এক এক জন দল্য লুপ্তিত
অশ্বপূর্ণ ব্যাগগুলি লইয়া সেই পাহাড়ের শাদতলে উপস্থিত হইল। আলিবাবার অসুস্থমান হইল, এই সকল
দল্যে অনেক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা সঞ্চিত আছে।

আলিবাবা একটি লোককে দল্যগণের দলপতি বলিয়া চিনিতে পারিল। তাহার দেহ যেমন বলবান,
তাহার চেহারাও তেমনই একটু বৈচিত্র্য ছিল—তাহা ঠিক অজ্ঞাত দল্যের পরিচ্ছদের মত নহে। দলপতি সর্বাঙ্গে
দল্যের ব্যাগটি লইয়া পাহাড়ের শাদদেশে গাছের অদূরে আসিয়া দাঁড়াইল এবং কতকগুলি লতাগুল্মের
মাঝে প্রবেশ করিয়া সুপটুগরে বলিল, 'সিসেম খোল'—আলিবাবা কণ্ঠাট উত্তমরূপে শুনিতে
পারিল। দলপতি 'সিসেম খোল' বলিবারাত্র সেই পাহাড়ের গাত্রস্থ একটি গুপ্তস্থান খুলিয়া গেল, দল্য
সম্রাজ্য দলপতি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল, অজ্ঞাত দল্যও তাহার অনুসরণ করিল, আবার তৎক্ষণাৎ
বন্ধ হইয়া গেল।

দহ্মাগণ সেই গিরিগুহায় কিয়ৎকাল থাকিল, সেই অবসরে আলিবাবা ভাবিল, সে দহ্মাদিগের একা
অথে আরোহণ করিয়া তাহার গাথা কয়টিকে তাড়াইয়া নগরে প্রবেশ করিবে, কিন্তু পাছে যদি হঠাৎ কো
দহ্মা তাহারকে দেখিতে পায়, এই ভয়ে সে গাছ হইতে নামিতে পারিল না; গাছের উপরে বসিয়াই দহ্মাদে
প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

‘সিসেম বন্ধ’



অনেকক্ষণ পরে দ্বার খুলিয়া দহ্মাগণ গুহাগর্ভ হইতে বাহিরে আসিল। সকলে বাহিরে আসি
দলপতি সকলের শেষে গুহা হইতে বহির্গত হইয়া বলিল, ‘সিসেম বন্ধ’ আর খট করিয়া দরজা বন্ধ হইয়
গেল। অখারোহিণ অথে আরোহণ করিয়া অশ্বগুরুদ্বারিত পার্শ্ব প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যে পথে
আসিয়াছিল, সেই পথে প্রস্থান করিল।

আলিবাবা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিল, দহ্মাগণের আর প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই, তখন
বন্ধ হইতে অবতরণ করিল। দহ্মাদিগের গমনপথ লক্ষ্য করিয়া দেখিল, সকলেই অদৃশ্য হইয়াছে, তাহাদের
চিহ্নমাত্র কোন দিকে নাই। সেই গিরিগুহা কিরূপে খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারা যায়, আলিবাবা দলপতির
নিকট তাহা শুনিয়াছিল, সে একবার ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্ত বিশেষ ব্যগ্র হইল। সে ধীরে
ধীরে লতাগুহের সমীপবর্তী হইল, তাহার পর গিরিগুহার দরজা দেখিতে পাইয়া তাহার নিকটে দাঁড়াইয়
স্থলপৃষ্ঠস্থ, ‘সিসেম খোল’, কথা আলিবাবার মুখ হইতে উচ্চারিত হইবামাত্র গুহাদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল।

আলিবাবা মনে করিয়াছিল, সে একটি সংকীর্ণ অন্ধকারায় গিরিগুহামাত্র দেখিবে, কিন্তু তৎপরিবর্তে
আলিবাবা দেখিতে পাইল, একটি সুপ্রশস্ত কক্ষ, পঙ্কত কাটিয়া তাহা নিশ্চিত বলিয়া বোধ হইল। উজ্জ্বল
হইতে আলো আসিয়া কক্ষটি আলোকিত করিতেছে, কক্ষটি আলোকিত করিবার জন্তই পঙ্কতের শিখরদেশে
বিশেষ নৈপুণ্যসহকারে কিয়দংশ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। বাহ্যে হউক, এ সকল ভূ সামান্য কথা, সেই
কক্ষে সম্ভ্রান্ত ভ্রাবাসিন্দ্রী দেখিয়া আলিবাবা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। কক্ষটি গালিচা, তুলিচা, ব
মহামূল্য বস্ত্রভরণ, রাশি রাশি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা, কতক বস্ত্র বস্ত্র সম্ভ্রান্ত রহিয়াছে, কতক
খোলা অবস্থায় ঢালা রহিয়াছে, মুদ্রাপূর্ণ চামড়ার ব্যাগগুলি আকাশ সমান উজ্জ্বল করিয়া সম্ভ্রান্ত। আলিবা
বলিল, এই অগণ্য ধন ছই এক বৎসরে এখানে সঞ্চিত হয় নাই, যুগযুগান্তর ধরিয়া এখানে ধনসঞ্চি
স্তুপীকৃত করা হইতেছে। এক পক্ষের দহ্মাগণ কখন এত অর্থসময় করিতে পারে নাই, পুরুষ-পরম্পরা
ইহা এখানে ধনসঞ্চয় করিতেছে।

যুগ-যুগান্তর-
সৃষ্টিত ধন-বস্ত্র
স্তুপীকৃত



অতঃপর কি করা কর্তব্য, তাহা স্থির করিতে আলিবাবার অধিক সময় নষ্ট হইল না; গুহার মধ্যে
প্রবেশ করিবামাত্র গুহাদ্বার বন্ধ হইয়া গেল, কিন্তু সে জন্ত সে চিন্তিত হইল না; কারণ, দ্বার খুলিবার মত
সে দলপতির মুখে শুনিয়াছিল। সে রৌপ্যমুদ্রার দিকে মনোযোগ না করিয়া রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা সম্ভ্রান্ত
করিতে লাগিল। তাহার তিনটি গাথা যত স্বর্ণ বহন করিতে পারে, তাহা একত্র করিয়া আলিবাবা তিনটি
তাড়াইয়া সেই গুহার দ্বারদেশে লইয়া আসিল, তাহাদের পিঠে স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ বস্ত্রগুলি ঢাপাইল। পাছে
টাকার বস্ত্র কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে বস্ত্রের উপর সে কয়েক আঁট করিয়া কাঁচ চাপাইয়া বস্ত্রগুলি
বেশ ভাল করিয়া ঢাকিল, এবং গুহাদ্বারের কাছে গিয়া ‘সিসেম বন্ধ’ বলিল। দেখিতে দেখিতে দ্বার
বন্ধ হইয়া গেল, তখন সে গাথাগুলিকে লইয়া, নগরের দিকে করিল।

গৃহে করিয়া আলিবাবা সাবধানে সদর-দরজা বন্ধ করিয়া দিল, তাহার পর বস্ত্রের উপর হইতে কাঁচ
আঁটগুলি সরাইয়া ফেলিয়া বস্ত্রগুলি টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল।

আলিবারা দ্বী একটি ছোট চৌকীতে বসিয়াছিল। আলিবারা ঘরের মধ্যে বস্তু ফেলিতেই তাহার উঠিয়া দুই হাতে বস্তু টলিয়া দেখিতে লাগিল;—কি শস্ত আছে, তাহাই দেখিবার মতন। যখন সে দেখিল, বস্তুগুলি কেবল স্বর্ণমুদ্রাতেই পরিপূর্ণ, তখন তাহার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে চিন্তাকার করিয়া বলিল, “আলিবারা, তোমার আকলটা কি বল দেখি! এত সোনার টাকা তুমি—” আলিবারা তাহার মুখ হাত দিয়া বলিল, “আল্লাহ কসম, তুই চুপ কর, তোমার কোন ভয় নাই। আমি চোর নই, আমি কোন সাধুলোকের টাকাও চুরি করি নাই, চোরের ঘনের উপর বাটপাড়ী করিলে পাপ হয় না, আমি তোকে সকল কথা পরে বলিব, আগে এগুলি সামাল কর।” আলিবারা স্বর্ণমুদ্রাগুলি ঘরের মধ্যে স্তূপাকারে ঢালিল, এত স্বর্ণমুদ্রা একত্র দেখিয়া লোভে আলিবারার দ্বীৱ চক্ষু অলিয়া উঠিল। আলিবারা তাহার

দ্বীকে সকল কথা বলিল, তাহার পর তাহাকে সাবধান করিবার জন্য বলিল, “দেখিস্ মাগী, খবরদার, যেন এক কথা প্রকাশ না হয়; প্রকাশ হইলে আমাদের কাহারও প্রাণরক্ষা হইবে না।”

আলিবারার দ্বীৱ বিষয় হয় হইলে সে এক একটি করিয়া টাকাগুলি গণিতে লাগিল। আলিবারা হাসিয়া বলিল, “দুই মাগী, তুই এত টাকা কত দিনে গণিয়া ঠিক করিবি? ও আর গণিবার সময় নাই, আমি ঘরের কোণে একটা গর্ত খুঁড়ি, তাহার মধ্যে এগুলি লুকাইয়া

রাখা যাক।” আলিবারার দ্বী বলিল, “সে উত্তম কথা বটে, কিন্তু কত টাকা থাকিল, তাহার একটা হিসাব থাক। ভাল। আমি প্রতিবেশীদের বাড়ী হইতে একটা ছোটখাট কুন্কে চাহিয়া আনি। এই ততক্ষণ গর্ত খোঁড়, কুন্কেতে মাটিয়া উহা গর্তের মধ্যে ঢালিয়া রাখা যাইবে।” আলিবারা বলিল, “কুন্কেতে মাটিয়া ফল কি? ও সকল হাঙ্গামায় কাজ নাই।” তাহার দ্বী বলিল, “তা কি হয়, মাটিতেই বসে।” আলিবারা দেখিল, তাহার দ্বী না মাটিয়া নিরন্ত হইবে না, তখন সে বলিল, “মাগি কর আর যা দেখিস্ যেন কথা প্রকাশ না হয়।”

“তোমাকে আর সে ভয় করিতে হইবে না।” বলিয়া আলিবারার দ্বী কুন্কে আনিতে ছুটিল। আলিবারা দাদা কাসিমের বাড়ী কিছু দূরে, আলিবারার দ্বী সেই বাড়ীতে আসিয়া কাসিমের দ্বীকে বলিল,

চোরের উপর
বাটপাড়ী

মোহরের
স্তম্ভ



“দিদি, এক লহমার জন্ত তোমাদের কুনকেটা দিতে পার ? আমি আবার এখনই ফিরাইয়া দিয়া বাইব।” কাসিমের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, “কত বড় কুনকে চাও, বড় না ছোট ?” আলিবার স্ত্রী বলিল, “ছোট কুনকে হইলেই হইবে।” কাসিমের স্ত্রী বলিল, “তবে একটু পাঁড়ো, আনিয়া দিতেছি।”

কাসিমের স্ত্রী জানিত, আলিবার অবস্থা অতি মন্দ, প্রতিদিন আহার জোটে না। সেই আলিবা এমন কি শস্ত আনিয়াছে যে, কুনকেতে মাগিবে, তাহা জানিবার জন্ত কাসিমের স্ত্রীর মনে বড় কৌতূহল হইল। সে একটু কুনকের তলায় একটু আঠা লাগাইয়া সেট আলিবার স্ত্রীর হাতে দিল ; তাবিল, যে শস্তই মাগ করুক, এক আখটা দানা কুনকের তলার আঠায় নিশ্চয় লাগিয়া আসিবে।



আলিবার স্ত্রী কুনকে পাইয়া তৎক্ষণাৎ গৃহে ফিরিয়া আসিল। তাহার পর ধান-চাউলের মত করিয়া মোহরগুলির উপরে কুনকেটা রাখিয়া মোহর মাগ করিতে লাগিল। মাগ শেষ হইলে আলিবা মোহরগুলি ঘরের কোণে গঠের মধ্যে পুতিতে লাগিল। আলিবার স্ত্রী কুনকেট লইয়া কাসিমের স্ত্রীকে ফিরাইয়া দিয়া আসিল, হাসিয়া বলিল, “দেখ দিদি, আমি একটুও বিলম্ব করি নাই, কাজ শেষ হইবামাত্র তোমার কুনকে ফেরত দিতে আসিয়াছি।”

কাসিমের স্ত্রী ব্যগ্রভাবে কুনকেট উল্টাইল দেখিল, একট চকচকে মোহর কুনকেতে আঠায় আটকাইয়া আছে! দেখিয়া কাসিমের স্ত্রীর বিশ্বাসের আর সীমা রহিল না। হিংসায় তাহার বুকের মধ্যে জ্বালা করিতে লাগিল। কাসিমের স্ত্রী মনে মনে বলিল, “হা আশা, এই আলিবাঝেকে আমি গরীব মনে করিয়া স্ত্রী হইতাম, আলিবাঝ কুনকে করিয়া মোহর মাগে, আলিবাঝ গরীব, আর আমরা বড়লোক! আগে মিন্বে বাড়ী আহুক। কিন্তু আলিবাঝ এত মোহর কোথায় পাইল ?” কাসিম তখন দোকানে গিয়াছিল, তাহাকে তখনই মনের কথা বলিতে না পাইয়া কাসিমের স্ত্রীর পেট ফুলিয়া উঠিল, দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। সন্ধ্যার সময় কাসিমের দোকান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়, কাসিমের স্ত্রী কেবল পথ ও বাড়ী করিতে লাগিল। এক এক ঘণ্টা তাহার কাছে এক এক বসন্তের মত দীর্ঘ বোধ হইতে লাগিল। কাসিম আলিবার ঘনের কথা শুনিয়া কি ভাবিবে, তাহাই তাহার প্রধান চিন্তার বিষয় হইল।

সন্ধ্যাকালে কাসিম গৃহে ফিরিল। কাসিমের স্ত্রী তাহাকে দেখিবামাত্র বলিল, “পোড়ারমুখে মিন্বে, তুই মনে করিস্, তুই ভারি নবাব, তোর অনেক টাকা! তোর ভাই আলিবাঝ তোর চেয়ে কত বড়লোক, তার কত টাকা, তার কিছু হিসাব রাখিস্ ? তুই টাকা গণিস্, সে কুনকের করিয়া মোহর মাগে! বাধ গো বাবা, এমন হতভাগা গরীবের হাতে সঁপে দিয়েছিল, আমি কুনকেয় ক’রে মোহর মাগবার স্বপ্ন পেলেন না।” কাসিম সমস্ত দিনের পরিশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়া গৃহে আসিয়াছিল, স্ত্রীর কথা শুনিয়া প্রথমে কিছু বক্তিতে পারিল না; বলিল, “আরে ধাম মাগী, সব কথা থুলে বল্বে না—একবারেই জলে উঠলো! কি হয়েছে কি ?” কাসিমের স্ত্রী কাসিমকে সকল কথা বুলিয়া বলিল, এবং কুনকের নীচে আঠায় আটকান যে চকচকে মোহরটি পাইয়াছিল, তাহা কাসিমকে দেখাইল। কাসিম দেখিল, মোহরটি বহু পুরাতন, এত পুরাতন যে, তাহার উপর যে রাজার নাম লেখা আছে, সে রাজার কথাই তাহার অজ্ঞাত।



ভাতার সোভাগ্যচক্রে দেখিয়া কাসিম স্ত্রী বা সন্তুষ্ট হওয়া দুয়ের কথা, হিসোনাল তাহার বুকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল, সমস্ত রাত্রি সেই জ্বালায় সে ছটকটি করিতে লাগিল, একবারও চোখ বন্ধিতে পারিল না। পরদিন প্রভাতে হৃদ্যোদয়ের পূর্বেই কাসিম আলিবার নিকট উপস্থিত হইল। আলিবার প্রতি কাসিমের বিশ্বাসও স্নেহ ছিল না, তাহার গৃহে কখন পদার্পণ করা দুই থাক, ধনবানের কন্ডাকে বিবাহ কর

কাসিম আলিবাবাকে ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জিত হইত। কিন্তু আজ সে আলিবাবার সঙ্গে কথা না করিয়া থাকিতে পারিল না। কাসিম আলিবাবাকে বলিল, “আলিবাবা, তুই ভাদি কুটল মাল্হব, তুই দেখাশু তোর অবস্থা বড় মন্দ, তোর দিন চলে না, কিন্তু এ দিকে দেখি, তুই কুনকের মোহর মাপ করিস! রাপারখানা কি বল দেখি?” আলিবাবা বলিল, “দাদা, তোমার কথা বুঝিতে পারিতেছি না, খেলনা করিয়া বল।” কাসিম রাগ করিয়া বলিল, “নে,—আর ছাকামো করিস নে।” সে তাহার জীর প্রদত্ত মোহরটি বাহির করিয়া তাহা আলিবাবাকে দেখাইল; বলিল, “এ রকম মোহর কতগুলি পাইয়াছিস, বল দেখি, কাল আমার দ্বী কুনকের নীচে এটা পাইয়াছে, তোর দ্বী যে কুনকে মোহর মাপ করিবার জন্ত লইয়া গিয়াছিল, তাহার নীচে, বুঝিয়াছিল?”

আলিবাবা দেখিল, গুপ্তকথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার দ্বীর নিবৃদ্ধিতাবোধেই কাসিম ও তাহার দ্বী মোহরের কথা জানিতে পারিয়াছে। কিন্তু তখন আর কথা গোপন করিয়া কোন লাভ নাই, সুতরাং আলিবাবা কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সরলভাবে সকল কথা স্বীকার করিল। কিরূপে সে গুপ্তধনাগারের সন্ধান পাইয়াছে, তাহাও বলিল। কাসিমকে সে এ কথাও জানাইল যে, যদি কাসিম আর কাহারও নিকট এরূপ প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আলিবাবা তাহাকে সেই গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান বলিয়া দিবে।

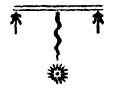
কাসিম মেজাজ গরম কবিতা বলিল, “তা তুই বলিবিই, তোর বাড়ি যে সে বলিবে; না বলিলে কি আমি তোকে সহজে ছাড়িব? আমি কেতোয়ালের কাছে গিয়া তোর সকল কথা প্রকাশ করিয়া দিব, তাবধাতে তুই আর কিছু আনিতে পারিবি না, বাহা আনিয়াছিস, তাহাও সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। আর বল, সেই ধনাগার কোথায়, কোন্ পথে সেখানে বাইতে হয়, কিরূপেই বা ধন পাওয়া যায়? আমি নিজে গিয়া কিছু ধন সংগ্রহ করিয়া আনিব।”

আলিবাবা তাহার দাবার ভয়প্রদর্শনে তত ভীত না হইলেও তাহার স্বাভাবিক সরলতা ও সাধুতা বশতঃ গুপ্ত গহ্বরের সন্ধান বলিয়া দিল, কিরূপে গহ্বরদ্বার খুলিতে পারা যায় এবং কিরূপে তাহা বন্ধ করিতে হয়, তাহাও বলিয়া দিল। কাসিম আলিবাবাকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। সে ভাবিল, এক দিনেই সে সমস্ত ধন উঠাইয়া লইয়া আসিবে, আলিবাবা যে আবার গিয়া কিছু লইয়া আসিবে, তাহার পথ বন্ধ করিবে।

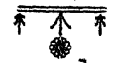
এই সংকল্প স্থির করিয়া কাসিম পরদিন প্রভাতে দশটি বলবান্ অশ্বতর লইয়া, তাহাদের পিঠে ঝোড়া ঝোঝাই দিয়া আলিবাবার নির্দিষ্ট পথে গুপ্ত গহ্বরের সন্ধানে চলিল, আলিবাবা ঠিক পথ বলিয়া দিয়াছিল, সুতরাং কাসিমের গহ্বর-সরিকটে উপস্থিত হইতে অসুবিধা হইল না। সে গহ্বরদ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিল, দ্বার বন্ধ। কিরূপে দ্বার খুলিতে হয়, তাহা তাহার স্মরণ ছিল, সে তৎক্ষণাৎ বলিল, ‘সিসেম খোল!’ যেমন এই কথা বলা, অমনি গহ্বরদ্বার তুই খণ্ড হইয়া খুলিয়া গেল। দ্বার খুলিবার পর সে গহ্বরগর্ভে প্রবেশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে গহ্বরদ্বার বন্ধ হইয়া গেল।

গুহার ভিতর যে অতুল ঐশ্বর্য্য সজ্জিত ছিল, তাহা দেখিয়া কাসিমের বিস্ময়ের সীমা রহিল না; সে ভাবিল, প্রত্যহ যদি সে দশ বিশটা অশ্বতরে ধন বহিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে সমস্ত জীবনেও সে সমস্ত ধন উঠাইয়া লইয়া বাইতে পারিবে না। আলিবাবার মুখে সে যে ধনের পরিচয় পাইয়াছিল, তাহা ইহার স্বেচ্ছাও নহে। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে ধনরত্ন নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার পর দ্বারপ্রান্তে স্বর্ণময়ূর্ণ লিখিত টানিয়া আনিতে লাগিল। দশটি অশ্বতর বহুগুলি ধলি বহন করিতে পারে, ততগুলি ধলি ধারের মধ্যে আনিয়া দ্বার খুলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ধনশেস্ত্রে সে দ্বার খুলিবার ক্ষমতা তুলিয়া গিয়াছিল, কি

গুপ্ত
ধনাগারের
সন্ধান



অতুল ঐশ্বর্য্য
আশ্চর্য্যবৃত্তি





কথা বলিলে যে দ্বার খুলিতে পারা যায়, তাহা তাহার মনে ছিল না। ভাবিল, একটি শস্ত্রের নাম করিয়া দ্বার খুলিতে হইবে, সুতরাং সে বলিল, “ধান খোল।” তার পর “বব খোল” কিন্তু তথাপি দ্বার খুলিল না। তখন উদ্ভ্রান্ত মনে সে একে একে যত শস্ত্রের—ফলের—জিনিসের নাম জানিত, সবগুলির নাম করিতে লাগিল। কিন্তু গুহার লৌহদ্বার অটল রহিল, একটুও নড়িল না।

এমন বিপদ ঘটিবে, তাহা কাসিম একবারও মনে করে নাই। তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। ধনতৃষ্ণা মুহূর্তের মধ্যে তাহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল। নয়নে সেই গুপ্ত ধনাগার তাহার তখন বিভীষিকার সঞ্চার করিল। তাহার দেহ বর্ণাশ্লুত হইয়া উঠিল, পিপাসায় কণ্ঠতালু শুষ্ক হইল, যতই সে ‘সিসেম’ কথাটি মনে করিবার জ্ঞান ব্যাকুল হইয়া উঠিল, ততই তাহার স্মরণশক্তি বিলুপ্ত হইয়া আসিল। অবশেষে ক্রোধে, ভয়ে সে মোহরের ধলিগুলি দ্বারদেশে হইতে দূরে ছড়াইয়া ফেলিয়া ক্রতপদে গুহামধ্যে পদচারণ করিতে লাগিল।

সেই দিন মধ্যাহ্নকালে দম্ভাদল তাহাদের গুপ্ত ধনাগারের নিকট উপস্থিত হইল। পূর্বতপ্রাপ্তে আসিয়া তাহার দৈর্ঘ্য, সেখানে দশটি অশ্বতর চরিতেছে, তাহাদের পিঠে বোড়া চাপান। এই দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের মনে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। তাহার প্রথমে অশ্বতরগুলিকে গভীর বনে তাড়াইয়া দিয়া আসিয়া, অশ্বতরের অধিশাস্ত্রীর অনুসন্ধান করিয়া, কাহাকেও দেখিতে পাইল না, কিন্তু নিশ্চয়ই যে এখানে কেহ আসিয়াছে, তাহাতে তাহাদের সন্দেহ রহিল না, তাহার কোষযুক্ত অসি হস্তে গুহাদ্বারের নিকট উপস্থিত হইল এবং মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল।

কাসিম গুহামধ্যে থাকিয়াই অদূরে অধনমুহুর পদশব্দ শুনিতে পাইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল, দম্ভাদল আসিতেছে, তাহার আশ্রয়কাল নিকটবর্তী হইয়াছে, এখন তাহার গুহাদ্বার উন্মুক্ত করিলে যদি কোন কৌশলে সে পলায়ন করিতে পারে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিল এবং দম্ভাপতি দ্বার খুলিবার পূর্বেই দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া রহিল, দম্ভাপতি দ্বার খুলিবামাত্র কাসিম দম্ভাসদারকে চৈলিয়া ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল, কিন্তু তাহাকে অধিক দূর পলায়ন করিতে হইল না, দম্ভাগণ তরবারির আঘাতে তাহার প্রাণবিনাশ করিল।

কাসিমকে বধ করিয়া, দম্ভাগণ গুহায় প্রবেশ করিল এবং কাসিম স্বর্ণযুগ্মাশ্রুণ্ণ যে সকল ধলি অশ্বতরে পিঠে বোকাই করিবার জ্ঞান দ্বারের নিকট আনিয়াছিল, তাহা বধস্থানে সন্নিবেশিত করিল। কাসিম কিয়ৎ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহাই লইয়া তাহার আন্দোলন করিতে লাগিল। অবশেষে তাহার পিছু করিল, পূর্বতর উর্দ্ধ প্রদেশে ফাঁক দিয়া সে গল্পের অবতরণ করিয়াছে, কিন্তু এ কথাও সহজে তাহার বিবাস করিতে পারিল না; কারণ, পূর্বতর একে অতি উচ্চ, তাহার উপর সেখানে উঠিয়া তাহার শিরঃ দেশঃ ছিন্নপথে পূর্বতরগর্তে অবতরণ কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু দ্বার খুলিয়া যে গল্পের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে, এ কথাও তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত অসম্ভব বোধ হইল। কারণ, তাহাদের বিবাস ছিল, দ্বার খুলিবার বা দ্বার বন্ধ করিবার মন্ত্র তাহার ব্যতীত অন্য কেহ অবগত নহে।

কিন্তু তাহার বুদ্ধি বৈ, এক জন কেহ কোনও কৌশলে তাহাদের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান পাইয়াছে; সুতরাং তাহাদের যুগযুগ-সঞ্চিত ধনাগার আর নিরাপদ নহে। ভবিষ্যতে বাহাতে কেহ ধনাগারে প্রবেশ সাহসী না হয়, একজন কাসিমের মৃতদেহ চারি খণ্ড করিয়া গুহার দ্বারদেশে রাখিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার অতীপ্ত পথে চলিয়া গেল।



এ দিকে দিবাবসান হইল, রাত্রি আসিল, তথাপি কাসিমের দেখা নাই, কাসিমের স্বী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার পর সে ভীতভাবে আলিবাবার নিকট আসিয়া বলিল, “ঠাকুরপো, তোমার দাদা আজ ফকালবেলা জঙ্গল গিয়াছে, কেন গিয়াছে, সে বোধ হয় ভূমি জান। রাত্রি হইল, এখন পর্য্যন্ত সে বাড়ী ফিরিল না কেন? আমার বড় ভাবনা হইয়াছে।”

আলিবাবা কাসিমের সঙ্গে সে দিন যায় নাই, তাহার অর্প ছিল; সে ভাবিয়াছিল, হয় ত’ কাসিম তাহাকে সঙ্গে দেখিলে, আরও ঈর্ষান্বিত হইবে, কিন্তু কাসিমের যে কোন বিপদ ঘটয়াছে, তাহা একবারও তাহার মনে হইল না; সে কাসিমের দ্বীকে বলিল, “ভূমি কোন ভাবনা করিও না, দাদা বড় হিঙ্গাবী ষ্টোক, পাছে বেলা থাকিতে সহরে আসিলে কেহ টের পায়, তাহার অশ্বতরের পিঠে কি আছে, তাই সে রাস্তা গোপনে নগরে প্রবেশ করিবে, এইরূপ মতলব করিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে, আর কিছুকাল পরে তাহার ফিরিবার সম্ভাবনা আছে।” আলিবাবার মুখে এই কথা শুনিয়া কাসিমের স্বী কিছুকালের জন্য নীরবে হইল। সে বাড়ী ফিরিয়া স্বামীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, মধ্যরাত্রি অতীত হইল, তখনও কাসিম ফিরিল না। তাহার ভয় অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল, কিন্তু সে তাহার স্বামীর অদর্শনে কাতর হইয়া মুখ ফুটিয়া কোন কথা বলিতেও পারে না, আবার চুপ করিয়া থাকিও তাহার পক্ষে কঠিন। সমস্ত রাত্রি ঘুমিয়া সে পথ আর ঘর করিতে লাগিল। রাত্রি শেষ হইল, কাসিম ফিরিল না। প্রত্যুষে সে কান্দিতে কান্দিতে পুনর্বার আলিবাবার গৃহে উপস্থিত হইল। আলিবাবা ক্রুদ্ধকণ্ঠে কি মণিবে, তাহা জানিবার জন্য তাহার যে কৌতূহল হইয়াছিল, এখন সেজন্ত তাহার মনে অত্যন্ত অসুতাপের সঞ্চার হইল।

আলিবাবার মনেও দুশ্চিন্তা হইল। কাসিমের স্বী অমুরোধে, সে তখন কাসিমের সন্ধানে সেই জঙ্গলের দিকে চলিল। বাইবার সময় তাহার গাধা তিনটি লইয়া বাইতে ভুলিল না। সে গুহাঘারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, ঘরদোশে রক্ত পড়িয়া আছে! তাহার ভ্রাতা কিংবা অশ্বতরগুলি কোথাও নাই। দেখিয়া সে গভীর বড় ভাল বলিয়া মনে করিল না। গুহার দ্বার খুলিয়াই সে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; দেখিল, তাহার দাদার দেহ চারি খণ্ডে বিভক্ত হইয়া, গুহার ভিতর দ্বার-সন্নিকটে পড়িয়া আছে। ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। কাসিম আলিবাবাকে কখন দেখে করে নাই, বরং যথাই করিত, কিন্তু সেজন্ত আলিবাবা তাহার সহোদরের মৃতদেহের প্রতি কর্তব্য বিম্বৃত হইল না। সে তাহিল, এমন করিয়া হুঁক, কাসিমের মৃতদেহের সন্ধানিত করিতে হইবে! গুহার মধ্যে অনেক বস্তা ছিল, আলিবাবা কয়েকখানি বস্তা টানিয়া লইয়া, তদ্বারা কাসিমের মৃতদেহ বঁধিল, এবং গাধা তিনটিকে গুহাঘারের নিকট আসিয়া, একটির পিঠে কাসিমের মৃতদেহ আর দুইটির পিঠে দুই খলি স্বর্ণমুদ্রা ঢাশাইয়া, তাহা সতর্কভাৱে কাঠ দিয়া উত্তমরূপে আবৃত করিল, তাহার পর গুহাঘার বন্ধ করিয়া গুহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিল। বাড়ী আসিয়া আলিবাবা স্বর্ণমুদ্রার খলি-বোঝাই গাধাদুটিকে তাহার দ্বীকে কাছে আনিয়া দিল, এবং ঢাকা-গুলি নামাইয়া, বগাছানে রাখিবার আদেশ দিয়া, অজ গাধাটিকে সঙ্গে লইয়া কাসিমের গৃহে উপস্থিত হইল।

কাসিমের গৃহঘারে আসিয়া আলিবাবা দরজায় ধাক্কা দিল। এক জন দাসী আসিয়া তৎক্ষণাতঃ দ্বার খুলিয়া দিল, এই দাসীর নাম মজ্জিহানা। মজ্জিহানা ধূর্ত, বুদ্ধিমতী, অত্যন্ত বিশ্বাসী, প্রহুভক্ত ও স্নানদী; তাহার প্রতিভা-বুদ্ধি অত্যন্ত অধিক ছিল। আলিবাবা তাহার বুদ্ধি-নেপথ্যের পরিচয় পাইয়া তাহাকে যথেষ্ট প্রেম করিত। আলিবাবা বলিল, “মজ্জিহানা, আমি তোমাকে যে কথা বলিব, তাহা বড়ই গোপনীয়; তাই পূর্বে কখনো তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি, এ কথা যেন কাহারও কাছে প্রকাশ না হয়। এই গাধার

দুবাশার উৎসেগ



মৃতদেহ ও
স্বর্ণমুদ্রার খলি
ঢাশান



পিঠে বে বোকা দেখিতেছে, ইহাতে তোমার মনিব কাসিমের মৃতদেহ আছে। ডাকাডরা তাহাকে কাটিয়ে ফেলিয়াছে। এখন তাহার মৃতদেহের গোর দেখা আবশ্যক। আমি বাহা বলিলাম, কাসিমের স্ত্রীকে সকল কথা জানাইও।—আলিবাবা কাঠের আঁটি খুলিয়া ফেলিয়া, তাহার নীচে হইতে কাসিমের মৃতদেহ মাতীতে নামাইয়া দিল।

কাসিমের স্ত্রী তাহার স্বামীর নিধনবার্তা শুনিয়া, চুল ছিড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া কাদিতে লাগিল, কিন্তু কঠোর অধিক উচ্চ করিতে পারিল না, পাছে লোকে টের পায়। আলিবাবা বলিল, “বাহা হইবার তাহা হইয়াছে, এখন যদি তুমি গোলমাল কর, তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া কঠিন হইবে। কাসিম যে রোগে মরিয়াছে, তাহাই লোককে জানাইতে হইবে। তুমি অজ্ঞ কোন চিন্তা করিও না, আমি তোমাকে নিকা করিতে প্রস্তুত আছি, আমার স্ত্রী তাহাতে অস্বস্তি বা হুঃখিত হইবে না। আমার বাবা কিছু আছে, তাহা তোমারাই ভোগ করিবে, একত্র আমরা সুখে বাস করিব। যদি আমার এ প্রস্তাবে তোমার আপত্তি না থাকে, তবে আর কোন গোল মাই, মজ্জিয়ানা কাসিমের মৃতদেহ ধবান্বীতি সমাধি করিবার বন্দোবস্ত করিবে, আমি তাহাকে সাহায্য করিব।”

আলিবাবার চরবস্ত্রের কথা জানা থাকিলে, হয় ত’ কাসিমের স্ত্রী এত মূঢ়কে আলিবাবার প্রস্তাবে সম্মত হইত না, ভাবিত, তাহার বাবা কিছু আছে, তাহা আশ্রয় করিবার জন্ত আলিবাবা এরূপ প্রলোভন করিতেছে; কিন্তু কাসিমের স্ত্রী জানিত, আলিবাবার আর সে কাল নাই, এখন সে কুনুকে করিয়া মোহর মাণ করে! সুতরাং আলিবাবার প্রস্তাবে তাহার চোখের জল একদম বন্ধ হইয়া গেল, হা-হুতাশ ও রোদনধ্বনি মধ্যাপথেই নিরত হইল। আলিবাবা বুকিল, কাসিমের স্ত্রী নিকার সম্মত আছে।

আলিবাবা মজ্জিয়ানার হস্তে কাসিমের মৃতদেহ সমাহিত করিবার সকল ভার প্রদান করিয়া পাখা লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

এ দিকে মজ্জিয়ানা তাহার প্রতিবেশী এক জন হাকিমের কাছে উপস্থিত হইয়া, সন্দিগ্ধগি ঔষধ চাহিল। হাকিম উপযুক্ত নাম লইয়া ঔষধ প্রদান করিল; মজ্জিয়ানাকে জিজ্ঞাসা করিল, “আর কত ঔষধ লইতেছ?”—মজ্জিয়ানা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, “হা আমার কপাল! আমাদের মনিবটী দোকান হইতে আসিয়া, ভয়ানক সন্দিগ্ধগিতে কষ্ট পাইতেছেন, বাচেন কি না! সংজ্ঞাও নাই, কথাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে।”

পরদিন মজ্জিয়ানা পুনর্বার হাকিমের নিকট উপস্থিত হইল, কাদিতে কাদিতে বলিল, “আমার মনিবের শেষ দশা উপস্থিত, জীবনের আশা নাই, এ অবস্থায় যে ঔষধ কিছু উপকার হইতে পারে, এরূপ কোন ঔষধ দাও।”—মজ্জিয়ানা টাকা ফেলিয়া দিল। হাকিম আর একটি ঔষধ দিল, মজ্জিয়ানা কাদিতে কাদিতে ঔষধ লইয়া চলিল, বলিল, “হায়, হায়, এমন গুণের মনিব আর কি হয়, এবার আর আমার মনিবকে বাচাইতে পারিলাম না।”—মজ্জিয়ানা একা এক শত জনের মত কাদিতে ও শোক করিতে লাগিল।

সন্ধ্যাকালে পাড়ার লোকে শুনিল, কাসিম প্রাণত্যাগ করিয়াছে। মজ্জিয়ানা ও কাসিমের স্ত্রী সমস্ত রোদন আরম্ভ করিল, ক্রন্দনের রোল ক্রমেই উচ্চতর হইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে কাহারও বিষয় জ্ঞান না; কারণ, সকলেই কাসিমের হঠাৎ সন্দিগ্ধগি হওয়ার কথা শুনিয়াছিল। বিজ্ঞ প্রতিবেশিগণ সহায়ত্বভরে মাথা নাড়িয়া বলিতে লাগিল, “সন্দিগ্ধগি বড় শঙ্ক্য ব্যাধি, উহার হাত হইতে রক্ষা পাওয়া কঠিন, কাসিমের স্বাস্থ্য ভাল ছিল, তাই তাহার কিংকং বিলম্ব হইয়াছে, অন্তের অতঃকণ সময়ও লাগিত না।”

নিকার
আশ্রয়ে
সাহসনা



শোকের
আওয়াজ





श्री १२४

श्री १२४

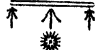
হাসিম সর্দিগন্ধিতে মরিয়াছে, তাহা ত' সকলে জানিল, কিন্তু তাহার চারি খণ্ড দেহ একত্র না জুড়িয়া
কাজের দেওয়া যায় না; সে কাজটি কিরূপে সম্পন্ন করা যায়, মজ্জান্না তাহাই ভাবিতে আগিল। হঠাৎ
মজ্জান্না মনে পড়িল, বাজারে এক বুড়ো মূর্তি আছে, তাহার সাহায্যে এ কাজ উদ্ধার হইতে পারে। মজ্জান্না
কান্নিত, বুড়ো প্রত্যহ খুব সকালেই দোকানে আসে। প্রত্যুবে মজ্জান্না এই মূর্তির দোকানে উপস্থিত হইল।

এই মূর্তির নাম বাবা মোস্তাফা। বাবা মোস্তাফার চুলগুলি সব সাদা হইলেও তাহার প্রাণের মধ্যে রসের
নদী শুকায় নাই, হুন্দরী মজ্জান্নার রূপ দেখিয়া তাহার প্রাণ নীতল হইয়া গেল। মজ্জান্নার সঙ্গে তাহার
আলাপ না থাকিলেও, মজ্জান্না যখন তাহাকে সেলাম করিয়া তাহার দোকানে আসিয়া বসিল, তখন বাবা
মোস্তাফা হাতে স্বর্ণ পাইল। মজ্জান্না সেই প্রভাতকালে নবোদিত অরুণের ভায় প্রহুস্রমে হাসি আনিয়া
বাবা মোস্তাফার হাতে একটি মোহর দিল। বাবা মোস্তাফা তখন আরও বিম্বিত হইল। মোহরটি লগাটে
স্বর্ণ করিয়া বলিল, "আদরফি!—কিয়া ভাঙ্কব কি বাৎ!—তবে, হুন্দর, কি করিতে হইবে বল দেখি
তাই!" হুন্দরী মজ্জান্না মধু ছড়াইয়া

বলিল, "বাবা মোস্তাফা, কাজ কিছ
কেন্ন নয়, তবে একটু ছ'লিয়ারির কাজ
কাজ, একটু শিলাই করিতে হইবে,
কিন্তু এখানে হইবে না, আমার সঙ্গে
আসিতে হইবে।" শিলাইয়ের কথা
শুনিয়া বাবা মোস্তাফার রসিকতা
কিন্তু মূর্তি লাভ করিল, বলিল,
"আমি বৎ করিব, ঐ ত' আমার কাজ,
কিন্তু হুন্দর, শিলাইটা এখানে হইলেই
জন্ম হইত না কি?" প্রেমরসে চলিয়া
গিয়া, হুমধুর হাসি হাসিয়া মজ্জান্না
বলিল, "না, সেইট হইবে না, তুমি
তোমার হাতয়ার লইয়া আমার সঙ্গে



রূপের বাহার
মোহরের চাল



রূপের
সঙ্গে
রুম্মা-
লের
বস্ত্র



এক আমি কিন্তু তোমাকে খোলাচোখে আমার সঙ্গে যাইতে দিব না, রুম্মাল দিয়া চোখ বাঁধিয়া তোমাকে লইয়া
করিব।" বাবা মোস্তাফা এবার ইতস্ততঃ করিতে লাগিল; বলিল, "তাই ত' হুন্দর, একে তোমার রূপের
বাহার, তাহার উপর রুম্মালের বন্ধন, অত বন্ধন এ বুড়ো চোখে সহ্য হইবে না। আমি বুঝিতেছি, তুমি আমাকে
কি একটা ফ্যাগদে ফেলিবে বলিয়া লইয়া যাইতে চাহিতেছ, আমি বুড়ো মানুষ, কোন ফ্যাগদের মধ্যে নাই।"
মজ্জান্না রুম্মদন্তে জিহ্বা দংশন করিয়া, গালে হাত দিয়া, বিষমভায়ে ভায় দেখাইয়া বলিল, "তোরা
কাজ! আমি কি তোমাকে ফ্যাগদে ফেলিতে পারি? আমি সে রকম মেয়ে নই, তবে কথাটা কি না,
আমাদের কাণ্ড, কাজেই একটু সাবধানে কাজ করিতে হয়।" মজ্জান্না আর একটি উজ্জল মোহর
বাবা মোস্তাফার হাতে গুঁজিয়া দিল।

দ্বিতীয় মোহরপ্রাপ্তিমায়ে বাবা মোস্তাফার সকল আপত্তি চলিয়া গেল। সে বলিল, "বুঝিয়াছি, বড়বয়ের
কথাই বটে, তবে চল।" মজ্জান্না তাহার চোখ রুম্মাল দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া তাহার হাত ধরিয়া লইয়া চলিল।

গোপন-
পীরিতের ফল
সামান্য



মজ্জিয়ানা বা মোস্তাকাকে একেবারে কাসিমের ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। তাহার চক্ষু হইতে ক্রমশঃ খুলিয়া বলিল, “বাবা মোস্তাক! এই মৃতদেহটি চারি খণ্ডে বিভক্ত দেখিতেছে, এই চারি খণ্ড একত্র শিলাই করিতে হইবে, বিলম্ব করিল চলিবে না। শীঘ্র কাজ শেষ কর—তোমার বকসিস্ আর এক আশ্রয়ি।”—বাবা মোস্তাক কখন এমন অদ্ভুত কাজও পায় নাই, কাজের জ্ঞাত এত প্রচুর অর্থও পায় নাই, সে সবিস্তার ব্যাখ্যাখানা কি, তাহাই ভাবিতে লাগিল। অনেকবার ভাবিয়া মনে মনে বলিল, “গোপনে পীরিত কর ফলই এই রকম, কোন বড়লোকের বাড়ী প্রবেশ করেছিলেন, চারটুকরো ক’রে ফেলেছে। বাচ্চ, আমায় লোকসান কি?” বাবা মোস্তাক হুচ ও হুতা বাহির করিয়া, মৃতদেহ উত্তমরূপে শিলাই করিল। তাহা কাথ্যে সন্তুষ্ট হইয়া মজ্জিয়ানা তাহার হস্তে প্রতীক্ষিত মোহরটি প্রদান করিল, এবং এ কথা বহা কাহারও নিকট প্রকাশ না হয়, সে জন্ত বাবা মোস্তাককে পুনঃ পুনঃ অমুরোধ করিয়া মজ্জিয়ানা আর তাহার চোখ ক্রমশঃ বান্ধিয়া তাহার দোকানের কাছে রাখিয়া আসিল, এবং পাছে বাবা মোস্তাক তাহার অহসরণ করে, এই ভয়ে ক্রমশঃ খুলিবার পূর্বেই মজ্জিয়ানা অমৃগ হইল।

অনন্তর মজ্জিয়ানা গৃহে ফিরিয়া কাসিমের মৃতদেহ ধোত করিল, তাহার উপর স্থপকি জ্বালাই ছড়াই তাহার পর কফিনে পুরিয়া ঘরের বাহির করিল। মজ্জিয়ানা চারি জন প্রতিবেশীকে মৃতদেহ-বহনে জন্ত ডাকিয়া আনিতে তাহার। কাসিমের দেহ বহন করিয়া মসজিদে লইয়া গেল। মসজিদের লোকে বখাবিধি মৃতদেহ বান করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। মজ্জিয়ানা বলিল, “আমরা বাড়ী হইতে সকল কাজ মাঝিয়া আসিয়াছি, এখন সমাধির ব্যবস্থা কর।” সুতরাং ইমাম মন্ত্র পড়িয়া সমাধিত করিবার অমন্ত্র দিল। সমাধি হইয়া গেল। মজ্জিয়ানা ও কাসিমের জীবিত প্রেমিনীকে অশ্রুতরূপে প্রতীবেশিগণ বাতিবাস্ত হইয়া উঠিল। সন্দিগ্ধিতে কাসিমের মৃত্যুসংবাদে কান্নাও বিদূর সন্দেহ রহিল না।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে আলিবাবা তাহার জ্বালাই ও টাকাকড়ি সমস্ত লইয়, কাসিমের গু উঠিয়া আসিল, এবং সমারোহের সহিত কাসিমের বিধবা পত্নীকে নিকা করিল। মুসলমানগণে এ প্রথা প্রচলিত থাকায় এ ঘটনায় কাহারও মনে কিছুমাত্র বিষয়ের সন্দেহ হইল না।

আলিবাবার একটি প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র ছিল। সে একটি বড় সদাগরের কারখানায় তায়েন্দারী করিত। আলিবাবা কাসিমের দোকানখানি তাহার হস্তে সমর্পণ করিল, তাহাকে এ কথাও জানাই যে, যদি সে ব্যবসারে উন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার মনোমত হুন্দরীর সহিত তাহার বিবাহ দিবে।

এইরূপে আলিবাবা প্রৌঢ়বয়সে নূতন করিয়া স্ত্রের সংসার পাতিয়া বসিল। সে স্ত্রের সংসার করিতে থাকুক, আমরা এখন সেই চম্পি জন দস্যুর অহসরণ করি।

কয়েকদিন পরে দস্যুদল তাহাদের উক্ত ধনাগারে ফিরিয়া আসিল। তাহার। ষাণ খুলিয়া বাহা দেখিল, তাহা হঠাৎ বিখাদ করিতে পারিল না। তাহার। দেখিল, কাসিমের মৃতদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে! পণ্ডিত গলিয়া গেল ও হাড়গুলি থাকিত, কিন্তু যখন তাহাও নাই, তখন নিশ্চয়ই কেহ তাহা সরাইয়া লইয়া গিয়াছে! তাহার। বিষয়ে সন্তুষ্ট হইয়া বসিয়া রহিল, প্রথমে কাহারও স্ত্রের কথা স্মরণ না। তাহার। বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিয়া দেখিল, কেবল যে মৃতদেহ অন্তর্হিত হইয়াছে, তাহাই নয় বহুসংখ্যক স্বর্ণরুদ্রাও সঙ্গে সঙ্গে অপহৃত হইয়াছে। দস্যু-সর্দার কোথায় ছদ্ম দিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে অর্থাৎ

প্রৌঢ় বয়সে
প্রেমের বলা



স্বাধীনতার ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিল, অবশেষে সন্দির বলিল, “ভাই সব, এত দিনে লোক আমাদের এই ধর্মশাস্ত্রের সন্ধান পাইয়াছে; যদি আমরা এখন সাবধান না হই, তাহা হইলে আমাদের দারুণ ক্ষতিগত হইতে হইবে। পূর্বস্বাক্ষরক্রমে, যুগে যুগে অশেষ পরিশ্রমে অগাধ অর্থ এখানে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া তাহা অবশেষে বাটপাউন্ডের সেবার লাগিবে, ইহা কখনই হইতে পারিবে না। আমরা যে খোঁজটাকে গম্বরমধ্যে খুন করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলাম, সে নিশ্চয়ই প্রবেশের উপায় জানিত, বোধ করি, সেই হইবার উপায় জানিত না বলিয়া বাহির হইতে পারে নাই। কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার মৃতদেহ সন্ধান করিতে হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, সে ভিতরে প্রবেশ করিবার ও বাহির হইবার কৌশল জানে। আমাদের গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান রাখে, এমন লোক এখনও জীবিত আছে, এই আশ্চর্য; কিন্তু তাহাকে আর কিছু রাখা হইবে না। কোথায় তাহার বাস, সে কে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার প্রাণবিনাশ করিতে হইবে, নতুবা আমাদের ধনভাণ্ডার নিঃশেষিত হইবে। ভাই সব, এ বিষয়ে তোমাদের কি মন্তব্য?”

দুস্হাশব্দদের কথা অজ্ঞাত দহ্মাগণ সম্মত বলিয়া স্বীকার করিল। তাহার বলিল, “বর্ত্ত দিন এই খোঁজকে খুঁজিয়া বাহির করা না যায়, তত দিন অজ্ঞ কার্য বন্ধ করিতে হইবে।”

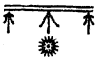
প্রতিশোধ-
প্রহা



ক্যাপ্টেন তখন বলিল, “ভাই সব, তোমাদের মধ্যে কে ছদ্মবেশে নিকটবর্তী নগরে উপস্থিত হইয়া আমাদের সন্ধান করিবে বল। বাহার সাহস, বুদ্ধি, চাতুর্য্য অধিক, সেটী এ কার্যের ভার গ্রহণ কর। যে এই ধর্মশাস্ত্র হস্তক্ষেপ করিবে, তাহার বিশেষ গৌরবলাভ হইবে, কিন্তু যদি ইহাতে বিফলপ্রসব হয় তাহা সে কিরিয়া করিল, তবে আমরা তাহার প্রাণদণ্ড করিব। ব্যাপারটি এমন গুরুতর যে, বাধ্য হইয়া আমাদেরকে এই ধর্মশাস্ত্র নিয়ম করিতে হইতেছে, নতুবা এই কার্যে কেহই প্রাণপণ আগ্রহ প্রকাশ করিবে না।”

এক জন সাহসী দহ্মা অবশেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইল। সে বলিল, “যদি আমি চোর ঘরিতে না পারি, তাহা হইলে আমি শির দিব।” দলপতি তাহাকে সম্মানে বিদায় দান করিল। দহ্মাটি পথিকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, সেটী রাত্রিই নগরে যাত্রা করিল এবং অতি প্রভাতে বাজারে বসিয়া উপস্থিত হইল।

সন্ধান
শির বাজী



দহ্মা বাজারে আসিয়া দেখিল, বাজারের সকল দোকান বন্ধ, কেবল একটি দোকান খোলা আছে, সে দোকান বাবা মোস্তাফার। দহ্মা মোস্তাফার দোকানে আসিয়া বলিল।

বাবা মোস্তাফা তখন টুলের উপর বসিয়া এক খণ্ড চর্খ লইয়া তাহা শিলাই করিবার উত্তোষ করিতেছিল। দহ্মা দেখিল, যদিও বাবা মোস্তাফার বয়স হইয়াছে, তথাপি তাহার চক্ষু নিস্তেজ হয় নাই। দহ্মা তাহাকে বলিল, “কি হে, মিস্ত্রী সাহেব, এত সকালেও এ বয়সে ত’ তুমি বেশ দেখিতে পাইতেছ, চক্ষু ছুটির এখনও ত’ বেশ তেজ আছে।”

বাবা মোস্তাফা শিলাই বন্ধ করিয়া মাথা তুলিয়া বলিল, “তুমি বল কি? আজ কয়েক দিন হইল, আমি ইহা অপেক্ষাও অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া মাহুকের মৃতদেহ শিলাই করিয়াছি, অজ চামড়া ত’ দুয়ের কথা, আমাদের কি তুমি সামান্য লোক মনে কর?”

সেই দহ্মা বাবা মোস্তাফার কথার আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে যে অজ্ঞ আসিয়াছিল, সেটা যে সত্য হইতে দিচ্ছ হইবে, এ কথা একবারও তাহার মনে হয় নাই। দহ্মা বিষম প্রকাশ করিয়া বলিল, “মৃতদেহ শিলাই করিয়াছ? কোথায় তুমি মৃতদেহ শিলাই করিলে তাই?”

বাবা মোস্তাফা বলিল, “না, না, সে কথায় আর কাজ নাই, বড়বরের কথা, ঐ করিয়া আমার মুখ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, এ কথা আর নয়। তুমি এ সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পাইবে না।”

দহা বুলিল, বাবা মোস্তাকাকে হস্তগত করিতে পারিলেই তাহার কার্য সিদ্ধ হইবে। সে একটি মোহর বাহির করিয়া বাবা মোস্তাকার হস্তে প্রদান করিল; বলিল, “আমি তোমার গুপ্তকথা শুনিবার জন্য কিছুমাত্র ব্যস্ত নই, তোমাকে সে কথা বলিতে বলিতেছি না। কেবল তোমার কাছে আমার একটা অসুযোগ আছে, যে বাড়ীতে তুমি মৃতদেহ শিলাই করিয়াছ, দয়া করিয়া আমাকে সেই বাড়ীটি একবার দেখাইয়া দাও।”



বাবা মোস্তাকা মোহরটি দহার হস্তে প্রত্যর্পণের জন্য উদ্ভত হইয়া বলিল, “যদি আমি তোমাকে সে বাড়ী দেখাইবার ইচ্ছাও করি, তাহা হইলেও আমার কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই। তাহার কারণ আমার চোখ ক্রমশঃ দিয়া বাধিয়া সেই বাড়ীতে লইয়া গিয়াছিল, আমার আমার চোখ বাধিয়া তাহার আমাকে এখানে রাখিয়া গিয়াছে; সুতরাং তুমি বুঝিতে পারিতেছ, সে বাড়ী কোথায়, সে সম্বন্ধে আমার কোনই ধারণা নাই।”

দহা বলিল, “তবে এক কাজ কর; আমি তোমার চোখ বাধিয়া, তোমার হাত ধরিয়া লইয়া চলি, তোমার একটা আন্দাজ আছে ত? সেই আন্দাজ অনুসারে তুমি চলিবে, তাহার পর যেখানে গিয়া তোমার মনে হইবে, তোমাকে তাহার চোখ বাধিয়া তত দূর লইয়া গিয়াছিল, সেখানে গিয়া আমি তোমার চোখ খুলিয়া দিব, তুমি আমার সঙ্গে চল। অবশ্য তোমার একটু কষ্ট হইবে, কিন্তু তোমাকে সে ক্ষত পারিশ্রমিক দিতেছি।” দহা আর একটা মোহর বাহির করিয়া বাবা মোস্তাকার হস্তে প্রদান করিল। বাবা মোস্তাকা আর আশঙ্কিত করিল না। সে বলিল, “আচ্ছা, চল, কিন্তু কত দূর ফল হইবে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না।”

দহার সঙ্গে বন্ধুত্ব অবস্থায় বাবা মোস্তাকা চলিতে লাগিল। তাহার পর এক স্থানে আসিয়া বলিল, “আমি বোধ করি, এই পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম, চোখ খোল।” দহা তাহার চক্ষু খুলিয়া দিল। তাহার সম্মুখে একটি বাড়ী দেখিতে পাইল।

বাবা মোস্তাকার অস্থান মিথ্যা নহে, সে যে বাড়ীর সম্মুখে আসিয়াছিল, সেই বাড়ী কাসিমেরই। সে সময় আলিবাবা সে বাড়ীতে বাস করিতেছিল।

দহা বাবা মোস্তাকাকে জিজ্ঞাসা করিল, “এ বাড়ী কার, তা তুমি জান?” বাবা মোস্তাকা বলিল, “কাহার বাড়ী, তাহা আমি নিশ্চয় জানি না।” দহা দেখিল, বাবা মোস্তাকার নিকট সে আর কোন সংবাদই পাইবে না। সে বাবা মোস্তাকাকে বিদায় করিয়া দিল এবং কাসিমের বাড়ীর দরজায় চা-খড়ি দিয়া একটি দাগ দিয়া ভিন্ন পথে অরণ্যের দিকে প্রস্থান করিল।



বাবা মোস্তাকা এবং দহা প্রস্থান করিলে, তাহার অক্ষণ পরে মজ্জিয়ানা কোন কার্যের জন্য বাড়ীর বাহিরে আসিল, দরজার পায়ে চা-খড়ির চিহ্নটি তাহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পড়িয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, “ইহার অর্থ কি? ইহা কি কোন শত্রুর কাজ, না অজ্ঞ ব্যক্তি আমোদ করিবার জন্য এই চিহ্ন দিয়া গিয়াছে? বাহাই হউক, লক্ষণ ভাল বোধ হইতেছে না; ভালই হউক, মন্দই হউক, আমিও একটু চালাকি করি।” মজ্জিয়ানা একখানি চা-খড়ি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, তদ্বারা পথের উভয় পার্শ্বের আরও পাঁচ সাড়টি বাড়ীর দরজায় দহা প্রদত্ত চিহ্নের মত চা-খড়ির চিহ্ন দিয়া কাঙ্ক্ষিত চলিয়া গেল। কিন্তু এ কথা সে তাহার প্রভু কিং প্রভুপত্নী কাহাকেও জানাইল না।

এ দিকে দহা আনন্ডিত-মনে তাহার সঙ্গীর নিকট উপস্থিত হইয়া সঙ্গীরকে সকল কথা বলিল। দহাগণ সকলেই বিশেষ সন্তোষের সহিত তাহার কথা শুনিয়া, এবং তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিতে লাগিল।

দলপতি সকল কথা শুনিয়া বলিল, “ভাই সকল, আর আমাদের বিলম্ব করা হইবে না। যত শীঘ্র শক্রনিপাত করিতে পারা যায়, ততই উত্তম। চল, আমরা গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া নগরে প্রবেশ করি। যাহাতে আমাদের উপর কাহারও সন্দেহ জন্মিতে না পারে, সে জন্য আমাদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া যাত্রা করা কর্তব্য। আমরা নগরে উপস্থিত হইয়া ও বাড়ী দেখিয়া পরে শত্রুক্ষণের উপায় স্থির করিব।”

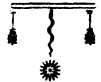
দলগণ সর্দারের কথার অম্বোদন করিল। দুই তিন জনে এক এক দলে বিভক্ত হইয়া তাহারা নগরে যাত্রা করিল। যে দল্য কাসিমের (এখন আলিবাবার) বাড়ী চা-খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিল, সে দল্য-দলপতিকে লইয়া সেই দিকে আসিল। প্রথমেই একটা বাড়ী, মর্জিয়ানা সেই বাড়ীর দ্বার চা-খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল। দল্য, সর্দারদল্যকে বলিল, “এই দেখুন, এই সেই বাড়ী—আমি চা-খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছি।” দলপতি আরও দুই চারিটা বাড়ীর দিকে চাহিল; দেখিল, সকল বাড়ীতেই সেই এক রকম চিহ্ন; সর্দার তাহার সঙ্গী দল্যকে বলিল, “তোমার কথা বৃষ্টিতে পারিতেছি না। তুমি বলিতেছ, তুমি একটা বাড়ীর দরজায় চা-খড়ি দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি অনেকগুলি বাড়ীর দরজাতেই ত’ এক রকম চিহ্ন দেখিতেছি।”

দল্য বলিল, “আজ্ঞার দিব্য, আমি একটা বাড়ীর দরজাতেই চিহ্ন দিয়া রাখিয়াছি, কিন্তু এখন অনেকগুলি বাড়ীতেই সেইরূপ চিহ্ন দেখিতেছি। আমি বে কোন্ বাড়ীর দরজায় চিহ্ন দিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখন গ্রহণে পারিতেছি না।”

দল্য-সর্দার তাহার সহকারী দল্যার কথা শুনিয়া তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইল, এবং কার্যোদ্ধারে কোন আশা নাই দেখিয়া অরণ্যে ফিরিয়া আসিল। তখন অন্ত্য দল্যগণও তাহাদের আজায় প্রত্যাগমন করিল।

দল্যগণ সকলে সম্মিলিত হইলে দলপতি বলিল, “এই ব্যক্তির নির্ভুক্তিতার আমাদের সকল যত বিফল হইল, এবং কার্যোদ্ধারে বিলম্ব পড়িয়া গেল। ইহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত, পূর্বে যেরূপ কথা ছিল, সেইরূপই কাজ করিতে হইবে।” সকলেই প্রস্তাব মন্ত বলিয়া স্বীকার করিল, এমন কি, যে দল্য সন্ধানের ভার গ্রহণ করিয়াছিল, সেও বলিল, “আমি আমার প্রতিজ্ঞা-পালনে অসমর্থ হইয়াছি, অতএব আমি শির দিব।” তখন দলপতির আদেশ অনুসারে এক জন দল্য তরবারির এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিল। মৃত্যুকালেও সে কোনরূপ কাতরতা প্রকাশ করিল না, তাহার মুখে বিমুখতাও বিবাদচিহ্ন প্রকাশিত হইল না। এইরূপ চরিত্র জন দল্যার এক জন কমিয়া গেল।

চিহ্ন-লোপে
প্রাণদণ্ড



দ্বিতীয় দল্যার
অভিধান



অনন্তর আর এক জন দল্য বলিল, “আমি স্বয়ং চোর ধরিব, যদি কৃতকাৰ্য্য না হয়, আমিও এই শাস্তি বহন করিব, আমিও শির দিব।” দলপতি তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিল। এই দ্বিতীয় দল্যটি পূর্ববৎ বাণা মোস্তাফার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে পুরস্কার প্রদান করিয়া, তাহার সঙ্গে আলিবাবার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, এবং দ্বারদেশে একটি অতি ক্ষুদ্র লোহিত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসিল। এই চিহ্নটি কেবল ক্ষুদ্র নহে, তাহা দ্বারের রঙ্গের সহিত মিশিয়া রহিল।

কিন্তু তাহাও মর্জিয়ানার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারিল না। মর্জিয়ানা গৃহের বাহিরে আসিয়াই দ্বারদেশে সেই চিহ্নটি দেখিতে পাইল, তখন সে তাহার প্রতিবেশিগণের গৃহদ্বারেও সেইরূপ ক্ষুদ্র লোহিত-চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া আসিল।



দ্বিতীয় দহ্মাও প্রথম দহ্মার ছায় অরণ্যে তাহার সর্দারের নিকট প্রত্যাগমন করিল, এবং তাহাকে জানাইল, এবার সে যে উপায় অবলম্বন করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের উদ্দেশ্যনিষ্করি কোন বাধাত বাটবে না। তখন দলপতি ও দহ্মাগণ বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল। আলিবারা গৃহ যে পথে, সেই পথে আদিয়া তাহারা দেখিল, অধিকাংশ গৃহঘারেই অভিন্ন লাল চিহ্ন! ইহা দেখিয়া দহ্মা-সর্দারের মনে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হইল, সে বার্ষমনোরথ হইয়া অরণ্যে প্রত্যাগমন করিল, তাহার পর দ্বিতীয় গোয়েন্দা-দহ্মার শিরশ্ছেদনের আদেশ করিল। এইরূপে দুইটি দহ্মা এই উদ্ভমে প্রাণত্যাগ করিল।

কিন্তু দহ্মা-সর্দারের মনে চিন্তিতার সীমা রহিল না। দুইটি সাহসী সহযোগী হারাইয়া সে কিছু কাতর হইয়া পড়িল, এবং এই উপায়ে অপরাধীর গৃহের সন্ধান করিতে বাহিয়া, আরও কাহারও কাহারও প্রাণদণ্ড হইতে পারে বলিয়া তাহার বিখাশ হইল। দহ্মা-সর্দার বৃথিল, একেবল বলপ্রয়োগের কাজ নহে, তাহাদের উদ্দেশ্য বার্থ করিবার জন্ত শত্রুদলের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকের অভাব নাই; স্ত্রতঃ এই ব্যাপারে বল ও বুদ্ধি উভয়েরই আবশ্যক বলিয়া সে বুঝিতে পারিল। স্ত্রতঃ অল্প কাহারও হস্তে গোয়েন্দাগিরির ভার অর্পণ না করিয়া, সে স্বয়ং এই ভার গ্রহণ করিল।

অনন্তর দহ্মা-সর্দার বাবা মোস্তাফির সহায়তায় আলিবারা বাড়ী চিনিল, কিন্তু বাড়ী ঠিক রাখিবার জ্ঞান সে তাহার দ্বারে কোন প্রকার চিহ্ন অঙ্কিত করিল না। সে বুঝিয়াছিল, চিহ্নাঙ্কিত করিয়া বাড়ী ঠিক রাখা তাহার পক্ষে অসাধ্য হইবে; হইবার যে অসুবিধা ঘটয়াছে, তৃতীয়বারও তাহা ঘটিতে পারে। দলপতি আলিবারার গৃহের সমুখে পুনঃ পুনঃ পদচারণ করিয়া ও তাহার বিভিন্ন অংশ অত্যন্ত তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া সেই বাড়ীটি চিনিয়া রাখিল। অবশেষে যখন বুঝিল, তাহার আর কোন গোল হইবে না, তখন অরণ্যে ফিরিয়া আসিল।

অরণ্যে তাহার সহযোগী দহ্মাগণ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। সর্দার তাহাদিগকে সন্ধান করিয়া বলিল, “বন্ধুগণ, আমাদের প্রতিহিংসাগ্রহণের আর কোন বিষ নাই, আমি স্বয়ং অপরাধীর গৃহের সন্ধান করিয়া আসিয়াছি। আমরা অতি গোপনে তাহাকে প্রতিফল প্রদান করিব। সে যেমন গোপনে আমাদের সন্ধানসাধনে প্ররত্ব হইয়াছে, আমরাও সেইরূপ গোপনে তাহার সন্ধান সাধিব। আমি যে উপায় অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়াছি, তাহা তোমরা শোন। যদি তোমরা হঁহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর উপায়ের কথা বলিতে পার, তদনুসারে কাজ করিতে আমরা আগন্তি নাই।” দলপতি কি উপায়ে আলিবারার সন্ধানসাধন করিবে, তাহা তাহাদিগের নিকট বর্ণনা করিল, তাহারা সকলেই দলপতির প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বলিল, “হঁহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর কিছুই নাই।”

তৈলের কুপোয়
দহ্মা চালান



তখন দলপতি তাহাদিগকে কয়েকটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া নিকটবর্তী পল্লী ও নগরে যাত্রা করিবার আদেশ করিল; বলিল, “তোমরা উনিশটি অশ্বতর ও তাহার দ্বিগুণ সংখ্যা অর্থাৎ আটত্রিশটি তৈলের কুপোয় ক্রয় করিবে, কিন্তু একটিমাত্র কুপোয় তৈলপূর্ণ থাকিবে, অবশিষ্টগুলি শূন্যগর্ভ রাখিতে হইবে।”

দুই তিন দিনের মধ্যে দহ্মাগণ উনিশটি অশ্বতর ও আটত্রিশটি কুপোয় ক্রয় করিয়া ফেলিল। কুপোয়গুলির মুখ অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া দলপতির আদেশে তাহা কাটয়া বিশেষ প্রশস্ত করা হইল। তাহা এরূপ করা হইল যে, এক একটি কুপোয় মধ্যে এক এক জন মানুষ প্রবেশ করিয়া অনায়াসে বসিয়া থাকিতে পারে।

দলপতি তখন প্রত্যেক কুপোয় মধ্যে এক এক জন দহ্মাকে প্রবেশ করাইয়া কুপোয় মুখ বন্ধ করিয়া দিল। পাছে বাহ্যিক অভাবে দহ্মাগণ কুপোয় মধ্যে দহ্মাটকাইয়া মরিয়া যায়, এই ভয়ে সর্দার কুপোয় গায়ে দুই

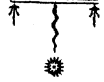
একটি ছিদ্র করিয়া বায়ুপ্রবেশের পথ মুক্ত করিয়া রাখিল। তাহার পর যে এক কুশো তৈল ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা হইতে একটু একটু তৈল ঢালিয়া কুশোগুলির গায়ে মাখাইয়া দেওয়া হইল; যেন দেবিয়াই লোক বৃষ্টিতে পারে, কুশোগুলি তৈলপূর্ণ আছে, তৈল ভিন্ন আর কিছুই নাই।

এই সকল কাজ শেষ হইলে দহ্মা-দলপতি সেই দহ্মাপূর্ণ কুশোগুলি তৈলপূর্ণ কুশোটির সহিত অশ্বতরদিগের পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিয়া নগ্নাভিমুখে যাত্রা করিল। যখন সে আলিবাবার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল, তখন দহ্মা উজ্জীর্ণ হইয়া গিয়াছে; নগর আলোকমালায় সজ্জিত হইয়াছে। সেই আলোকে তীক্ষ্ণদৃষ্টি দহ্মাসদীর আলিবাবার গৃহ চিনিতে পারিল। দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দরজার কড়া ধরিয়া নাড়িতে লাগিল। আলিবাবা তখন গৃহের বারান্দায় বসিয়া সাক্ষ্যবায়ু সেবন করিতেছিল, ধীরে শব্দ শুনিয়া স্বয়ং দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। আলিবাবাকে দেখিয়াই দহ্মাদলপতি সম্মানে বলিল, “মহাশয়, বহুদূর হইতে আমি এখানকার বাজারে বিক্রয় করিবার জন্ত কয়েক কুশো তৈল আনিয়াছি, আজ আর সময় নাই, কালই বিক্রয় করিতে হইবে; কিন্তু আমি বড় অসময়ে এখানে আসিয়া পড়িয়াছি, একে অপরিচিত স্থান, তাহার উপর রাত্রি উপস্থিত, কোথায় রাত্রি কাটাইব, তাহা কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি একটু আশ্রয় দেন, তাহা হইলে আমি এই অশ্বতরগুলি লইয়া কোনরূপে রাত্রিটা কাটাইতে পারি, আর আপনার নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হই।”

আলিবাবা যদিও অরণ্যে দহ্মা-সদীরকে দেখিয়াছিল এবং তাহার কথাও শুনিয়াছিল, তথাপি এ যে সেই লোক, তাহা সে বৃষ্টিতে পারিল না, বৃষ্টির কোন সম্ভাবনাও ছিল না; কারণ, দহ্মাপতি তখন এক জন বৈদেশিক সদাগরের পরিচ্ছদে সজ্জিত; সুতরাং আলিবাবা তাহাকে তৈলবাবসায়ী বলিয়াই মনে করিল, এবং তাহার অশ্বতরগুলির পৃষ্ঠে যে কুশোগুলি রহিয়াছে, তাহা তৈলপূর্ণ বলিয়াই অনুমান করিল, একবারও তাহার সন্দেহ হইল না যে, তাহার মধ্যে এক একটি দুর্দান্ত দহ্মা আছে এবং তাহারা তাহারই সর্বনাশ করিতে আসিয়াছে। আলিবাবার প্রকৃতি যেমন সরল, সে সেইরূপ অতিথিবৎসলও ছিল, বিপন্ন সদাগরকে আশ্রয়দানের জন্ত সে বিশেষ বাগ্ন হইয়া বলিল, “আশ্রয়ের জন্ত চিন্তা কি? তুমি রাত্রিটা অনায়াসেই আমার গৃহে বাস করিতে পার, তোমার অশ্বতরগুলিরও স্থানান্তর হইবে না, আমার গৃহে যথেষ্ট স্থান আছে।” অনন্তর আলিবাবা একটি ভৃত্যকে আহ্বান করিয়া বলিল, “দেখ, ঐ অশ্বতরগুলিকে আস্তাবলে জায়গা দিবি, আর উহাদের ঘাস-জলের বন্দোবস্ত করিবি।” তাহার পর আলিবাবা রাস্তাঘরে উপস্থিত হইয়া মর্জিয়ানাকে বলিল, “মর্জিয়ানা, এই অসময়ে হঠাৎ এক জন অতিথি আসিয়াছে, তুমি তাহার আহ্বানের যোগাড় কর, আর শয়নের বন্দোবস্তটাও করিয়া দিও। বিদেশী সদাগর যেন কোন রকম কষ্ট না পায়।”

আলিবাবা দহ্মাপতির প্রতি যথেষ্ট সদাশয়তা প্রকাশ করিল। তেলের কুশোগুলি নামান হইলে, অশ্বতর-গুলিকে আস্তাবলে পাঠাইয়া দিয়া, দহ্মাসদীরকে সে বলিল, “সদাগর সাহেব, তুমি এখানে কোন প্রকার সন্ধ্যাচ বোধ করিও না। অতিথির জন্ত আমার গৃহস্থার সর্বদা উদ্রুক্ত থাকে। তোমার বাহিরে থাকিবার ফোঁস আবশ্যক নাই, আমি যে ঘরে বন্ধুবান্ধবগণকে বাস করিতে দিই, তুমি সেই ঘরে থাক।” দহ্মাদলপতি বলিল, “মহাশয়, আপনার অগ্রগৃহের জন্ত ধন্যবাদ, আপনার নিকট আমি চিরবাহিত রহিব; কিন্তু আমি শাহিরেই থাকি, জিনিবগত সব বাহিরে পড়িয়া থাকিল, অশ্বতরগুলিও বড় ছষ্ট, কখন কি আবশ্যক হয়, বলা যায় না।” সহচরবর্গের সহিত পরামর্শ করিবার হুবিধা হইবে বলিয়াই যে দলপতি এই কথা বলিল, তাহা

দহ্মাদলপতির
আতিথ্য গ্রহণ



ছদ্মবেশে
অগ্রগ্রহ-লাভ



আলিবা বাবুতে পারিল না। সে ভাবিল, জিনিষপত্র বাহিরে ফেলিয়া, সে স্বয়ং অন্তর্য থাকিতে ভরসা করিতেছে না; সুতরাং বলিল, “তোমার বাহাতে সুবিধা হয়, তাহাই কর, তবে বাহিরে থাকিতে কিছু কষ্ট হইতে পারে বলিয়াই আমি এ কথা বলিতেছিলাম।”

মজ্জিয়ানা আল-সদাগরের জন্ত নুতন করিয়া রন্ধন করিতে লাগিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার পাক-শালার কার্য শেষ না হইল, ততক্ষণ পর্যন্ত আলিবা বাবু সেই জরুরী দস্তাগদাগরের নিকট বসিয়া গর করিতে লাগিল।

দহ্মাপতির আহার শেষ হইলে, আলিবা বাবু বলিল, “তুমি এখন বিশ্রাম কর গে, শয্যা প্রস্তুত। যদি কিছু আবশ্যক হয়, ভূতা দ্বারা আমাকে জানাইবে; জানাইবামাত্র তোমার অভাব পূর্ণ করিব।”



দহ্মাপতি আবার আলিবা বাবুকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া উঠিয়া আস্তাবলে গেল, আলিবা বাবুকে বলিল, “একবার অন্তর্যগুলি দেখিয়া আসি।”

আলিবা বাবু মজ্জিয়ানাকে বলিল, “দেখিস, অতিথির যেন কোন অসুবিধা না হয়। আর একটা কথা শুনিয়া রাখ, কাল অতি প্রভাতে আমি রান করিব, ভূতা আবদাল্লাকে আমার গামছা প্রভৃতি তিক করিয়া রাখিতে বলিবি, আর রানের পর আমি যেন একটু সুকর পাই তিক সময়ে তাহা প্রস্তুত রাখিবি।” অনন্তর আলিবা বাবু উঠিয়া শয়ন করিতে গেল।

ইতিমধ্যে দহ্মাদলপতি আস্তাবল ত্যাগ করিয়া, তাহার সহযোগীগণকে আদেশ জ্ঞাপন করিতে গেল। প্রথম

কুপো হইতে আরম্ভ করিয়া, শেষ কুপো পর্যন্ত এই বাক্য বলিতে বলিতে চলিল, “আমি গভীর রাতে চিল ফেলিয়া সজ্জত করিবামাত্র তোমরা কুপোর ভিতর হইতে ছুরি লইয়া বাহির হইয়া আসিবে, আমি তাহার পরই তোমাদের সঙ্গে মিলিত হইব।” দহ্মাগণ ছোরাতে ধার দিতে লাগিল। দহ্মাপতি আস্তাবল হইতে ফিরিয়া আসিলে, মজ্জিয়ানা একটি প্রদীপ হাতে লইয়া, তাহাকে সঙ্গে করিয়া শয়নকক্ষ দেখাইয়া দিল; সেখানে অতিথির জন্ত শয্যা প্রস্তুত ছিল। মজ্জিয়ানা বলিল, “যদি আপনার কোন জিনিষের আবশ্যক থাকে, বলিবেন, আমি দিব।” দলপতি দীপ নির্বাণ করিয়া শয্যায় শয়ন করিল; ঘির করিল, এক ঘুম দিয়া উঠিয়া তাহার দলস্থ দহ্মাগণকে ডাকিয়া ডুলিবে।

মজ্জিমানা আলিবারার আদেশ অনুসারে সেই রাজিতে আলিবারার গামছাখানি আবদালাকে প্রদান করিল, তাহার পর সূক্ষ্মা প্রশস্ত করিবার জন্ত উনানে কড়া তুলিল। ইতিমধ্যে তাহার প্রদীপটা নিবিয়া গেল। ঘরে তৈল কিংবা বাতী কিছুই ছিল না, কিন্তু প্রদীপ না জ্বলিলেই নয়, সে কি করিবে, প্রথমে তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে আবদালাকে ডাকিয়া তাহার নিকট বৃত্তি চাহিল। আবদালা বলিল, “তোরা এত ভাবনা কি?—ঐ যে তেলের ব্যাপারীটা এসেছে, ওর ত’ আটত্রিশ কুপো তেল আমাদের বাড়ীতেই মজুত; যা না, একটা কুপো হ’তে পোয়াখানেক তেল তেলে নিয়ে আয়।”

মজ্জিমানা দেখিল, এ অতি উত্তম বৃত্তি। সে তেলের ভাঁড় লইয়া, প্রাঙ্গণে একটি কুপোর কাছে তৈলের কুপোর উপস্থিত হইল, তাহার পদস্ব পাইবামাত্র, এক জন দম্ভা তাহাকে দলপতি মনে করিয়া, নিরঞ্য়ের জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন সর্দার, সময় হইয়াছে কি?” দম্ভাগুলি কুপোর মধ্যে বসিয়া থাকিয়া, একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই তাহার বাহির হইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু দলপতির অনুমতি ব্যতীত বাহির হইবার উপায় নাই।

দম্ভার কথা শুনিয়া মজ্জিমানা ক্ষণকাল স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান রহিল। মজ্জিমানা ব্যতীত অত্র কোন দাসী হইলে, তেলের কুপোর ভিতর হইতে মানুষের গলার আওয়াজ শুনিবামাত্র ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া, হয় ত’ এমন আত্মনাদ করিয়া উঠিত যে তাহাতে আলিবারার বিশেষ অপরকার হইত; কিন্তু বলিয়াছি, মজ্জিমানা যেমন বৃষ্টি, তেমনই তাহার উপস্থিত-বুদ্ধি। সে কুপোর ভিতর হইতে দম্ভার কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র বুলিল, ভিতরে একটা প্রকাণ্ড রহস্য আছে, এখন গোলমাল করিলে একটা ভয়ঙ্কর বিভ্রান্ত ঘটতে পারে। সে অনুমান করিল, আলিবারার বাড়ী ডাকতি করিবার জন্তই দম্ভাদল কুপোর ভিতর বসিয়া আছে, অতএব যাহাতে তাহাদের অভিষ্টসিদ্ধি না হইতে পারে, এখন তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিরূপে এই দম্ভাদলকে শাসন করা যায়, তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতে, মজ্জিমানার উর্বরমস্তিষ্কে একটি অতি কৌশলপূর্ণ উপায়ের কথা প্রবেশ করিল। সে তৎক্ষণাৎ চিন্তা সংবৃত্ত করিয়া, দম্ভাদলপতির মত গভীরস্বরে বলিল, “এখনও সময় হয় নাই, শীঘ্রই হইবে।” মজ্জিমানা দ্বিতীয় কুপোর নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু সেই এক প্রশ্ন—“সময় হয়েছে কি?” মজ্জিমানাও সেই একরূপ উত্তর করিল,—“এখনও হয় নাই, শীঘ্রই হইবে।” অবশেষে শেষ কুপোটির নিকট উপস্থিত হইলে, সে কুপো হইতে আর কেহ কোন প্রশ্ন করিল না। মজ্জিমানা বুলিল, এ কুপোতে কোন দম্ভা নাই, বুদ্ধি-কৌশলে সত্যই তৈল আছে।

মজ্জিমানা বুলিল, তাহার মনিব যে লোকটিকে তৈল-বাবগারী ভাবিয়া রাজিবাসের জন্ত গৃহে আশ্রয় দিয়াছেন, সেই-ই দম্ভাদলের সর্দার, আর কুপোর মধ্যে অধিষ্ঠিত সাঁইত্রিশ জন দম্ভা তাহার সহকারী মাত্র। মজ্জিমানা তাহার ভাণ্ড তেলপূর্ণ করিয়া, পাকশালায় কিরিয়া আসিল, প্রদীপ জালিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ তৈল ঢালিয়া দিল, তাহার পর একটি প্রকাণ্ড কড়া লইয়া সেই তেলের কুপোর কাছে গিয়া, কুপো হইতে প্রায় এক কড়া তেল ঢালিল, এবং তৈলপূর্ণ কড়াখানি ঘরে আনিয়া তাহা উনানে বসাইয়া, প্রবলবেগে আল দিতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই তৈল উগ্ৰবর্ণ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাহার পর সে আবদালাকে ডাকিয়া, উভয়ে সেই ফুটন্ত তৈল লইয়া প্রত্যেক কুপোর মধ্যে ঢালিয়া দিতে লাগিল। সেই ফুটন্ত তৈল শুরুর পড়িবামাত্র দম্ভাগণ অত্যন্ত যত্নশীল পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এইরূপে সাঁইত্রিশ জন দম্ভাই অল্পকালের মধ্যে ভবলীলা সমাপ্ত করিল।

এই কার্য শেষ করিয়া মজ্জিয়ানা পাকশালায় ফিরিয়া গেল, এবং বড় কড়াখানি এক পাশে রাখিয়া ও তাহার প্রভুর জন্ত সূর্য্য প্রস্তরের উপরুক্ত আশ্রয় রাখিয়া, পরে অগ্নি নির্বাণ করিল, তাহার পর প্রদীপ নিবাহিয়া, বাতায়নপথে প্রাঙ্গণের দিকে চাহিয়া রহিল; ভাবিল, “এই বাপারের শেষ কি, তাহা না দেখিয়া আর শয়ন করা হইবে না।”



মজ্জিয়ানার বাতায়নপথে বসিবার অল্পকাল পরেই দম্ভ্যপতি শয্যাভ্যাগ করিল। সে জানালা খুলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল; দেখিল, চতুর্দিক্ অন্ধকার, চতুর্দিক্ নিস্তব্ধ; দম্ভ্যপতি কতকগুলি পাথরের হুড়ি কুপোগুলির উপর নিক্ষেপ করিল, তাহা কুপোর উপর পড়িয়া ‘ছড় ছড়’ শব্দ হইল, তাহাও সে শুনিতে পাইল, কিন্তু তাহার ইঙ্গিতে এক জনও কুপো হইতে বাহিরে আসিল না। ইহাতে সন্দ্বিগ্ন বড় চিন্তিত হইয়া পড়িল, দম্ভ্যগণের বাহিরে আসিতে বিলম্ব দেখিয়া সে দ্বিতীয়বার আর কতকগুলি হুড়ি নিক্ষেপ করিল, তথাপি কেহ নিকটে আসিল না। ইহার কারণ বুঝিতে না পারিয়া সন্দ্বিগ্ন প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিল, এবং প্রথম কুপোটির নিকট উপস্থিত হইয়া, কুপোর কাছে মুখ আনিয়া অতি নিদ্রাবশে জিজ্ঞাসা করিল, “কি হে, ঘুমাইলেন না কি?” কিন্তু কেহ উত্তর দান করিল না। সন্দ্বিগ্ন অধিকতর ভীত হইয়া, কুপোর আরও নিকটে মুখ আনিয়া দ্বিতীয়বার সেই প্রশ্ন করিবে, এমন সময় হঠাৎ তাহার নাকে তপ্ত তৈল ও দগ্ধ চর্শ্বের উগ্র গন্ধ প্রবেশ করিল। দম্ভ্য-সন্দ্বিগ্ন বুলিল, সে যে মংগলবে আসিয়াছিল, তাহা ফাঁসিয়া গেল।

যাহা হউক, সে দ্বিতীয় কুপোর নিকট উপস্থিত হইল, কিন্তু তাহার ভিতর হইতেও কাহারও সাড়া পাইল না, দেখিল, দ্বিতীয় কুপোর দহাও প্রাণভ্যাগ করিয়াছে, এইরূপে ক্রমে সে দীর্ঘকালি কুপোর কাছে গেল, সকলগুলির ভিতরই দম্ভ্যগণের সমান অবস্থা। তৈলপূর্ণ কুপোটির নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেটি খালি। স্তম্ভাৎ বাপার কি, তাহা সে অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝিতে পারিল, পরে অধীর হইয়া দম্ভ্যপতি সেই রাত্রেরই আলিবাবার গৃহভ্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

যখন মজ্জিয়ানা দেখিল, সমস্ত শেষ হইয়াছে, আর কোন গোলাযোগের আশঙ্কা নাই, কিম্বা দম্ভ্য-দলপতিও আর প্রভ্যাগমনের সম্ভাবনা নাই, তখন সে আলিবাবার জীবন ও সম্পত্তি নিরাপত্তা হইয়াছে মনে করিয়া নিঃশ্বাস কক্ষে প্রবেশ করিয়া বিশ্রামার্থে শয্যা শয়ন করিল এবং অল্পকালের মধ্যে গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইল।

অতি প্রত্যুষে শয্যাভ্যাগ করিয়া আলিবাবা স্নানাগারে প্রবেশ করিল, রাত্রের তাহার গৃহে যে কি বাপার হইয়া গিয়াছে, তাহার সে কোন সন্ধানই পাইল না, মজ্জিয়ানাও রাত্রিকালে তাহাকে জাগাইয়া কোন কথা বলা আবশ্যক মনে করে নাই।

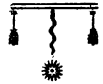
স্নানাগার হইতে ফিরিয়া আলিবাবা দেখিল, তৈলের কুপোগুলি যথাস্থানে পড়িয়া আছে, সদাগর সেগুলি তখনও বাজারে লইয়া যায় নাই। আলিবাবা মজ্জিয়ানাকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। মজ্জিয়ানা আলিবাবাকে সঙ্গে লইয়া একটি কুপোর নিকট উপস্থিত হইল, এবং বলিল, “আপনি দেখুন, কুপোর মধ্যে তৈল আছে কি না?” আলিবাবা কুপোর মধ্যে তৈলের পরিবর্তে এক জন মানুষ দেখিয়া স্তম্ভে শিহরিয়া আসিল। মজ্জিয়ানা বলিল, “আপনার কোন ভয় নাই, কুপোর মধ্যে যে মানুষ দেখিয়াছেন, তাহার প্রাণ নাই।” আলিবাবা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “মজ্জিয়ানা, ইহার কারণ কি?” সকল কথা শুলিয়া বলিল, “মজ্জিয়ানা বলিল, ‘আপনি চাঁৎকার করিয়া কোন কথা বলিবেন না, প্রতিবেশী-গণ টের পাইলে অর্ধ হইতে পারে, আপনি আগে সকল কুপো দেখুন।’”

আলিবাবা দেখিল, একটি ব্যতীত আর সকল কুপের মধ্যেই এক একটি মানুষ, কিন্তু কাহারও দেখে প্রাণ নাই। তেলের কুপোটো প্রায় শূন্য পড়িয়া আছে। আলিবাবা বিষয় দমন করিতে না পারিয়া বলিল, “মজ্জিয়ানা, আমি ত’ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সদাগর কোথায়?”

মজ্জিয়ানা হাসিয়া বলিল, “আপনি এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না যে, আপনি বাহাকে সদাগর মনে করিয়াছিলেন, সে জাল-সদাগর! আপনি আপনার গৃহের মধ্যে গোপনে সকল কথা শুনিবেন, এখন আপনি সূর্য্য পান করিয়া একটু সুস্থ হউন।”

আলিবাবা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, মজ্জিয়ানা পূর্ব্বরাত্ৰের সকল ঘটনা আলিবাবাকে বলিল, শেষে সে বলিল, “আমি ছই দিন পূর্ব্বে যে কাণ্ডের আভাস পাইয়াছিলাম, ইহা সেই যজ্ঞব্রতের ফল। কিন্তু আমি পূর্ব্বে আপনার নিকট কোন কথা প্রকাশ করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি নাই। ইহারা নিশ্চয়ই সেই অরণ্যের চল্লিশ দস্যুর দল, দুজন মধ্য হইতে কি রকম করিয়া কমিল, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। বাহাই হউক, এ দলে এখন তিন জনের অধিক থাকিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহারা আপনার প্রাণবধের জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছিল, সৌভাগ্য বশতঃ ইহাদের যজ্ঞব্রত বার্থ করিয়াছি, এখনও আমি আপনার প্রাণরক্ষার জন্য যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিব, ইহা আমার কর্তব্য। আপনি এখনও যে সকল বিপদ হইতে উদ্ধারলাভ করিতে পারিয়াছেন, তাহা বোধ হয় না।”

দস্যুদলের
সমাধি

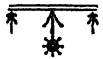


আলিবাবা সকল কথা শুনিয়া মজ্জিয়ানার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, “মজ্জিয়ানা, তুমি আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছ, আমি মুক্তার পূর্ব্বে তোমার এ ধন শোধ করিব। আমি বুঝিতেছি, সেই চল্লিশ জন দস্যু আমার প্রতি অত্যাচারে কৃতসংকল্প হইয়া ছদ্মবেশে আমার আতিথ্যস্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু আল্লা তোমার হাত দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিলেন। আমার বিশ্বাস আছে, তিনিই অতঃপর আমাকে রক্ষা করিবেন। এখন অবিলম্বে এই নরশিচাগুলির মৃতদেহ সমাহিত করা আবশ্যক, আমি এজন্য আবদান্নার সহিত পরামর্শ করিয়া সকল কাজ শেষ করিতেছি।”

আলিবাবার একটি সূর্য্য বাগান ছিল, সেই বাগানে আলিবাবা ও আবদান্না মৃতদেহগুলি টানিয়া আনিয়া গোপনে পুতিয়া ফেলিল, তাহার পর অশ্বতরগুলি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভূত্যের দ্বারা বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করিল।

এ দিকে দস্যুদলপতি একাকী অরণ্যে প্রত্যাগমন করিয়া, সহযোগী দস্যুগণের বিয়োগে মর্মান্বিত হইয়া, অতি কাতরভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। তাহার সেই অগণ্য ধনপূর্ণ শুশ্রূষাধার তাহার পক্ষে অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল। সে আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল, “সাহসী সহযোগীগণ, তোমরা! এখন কোথায়? তোমরা আমার কষ্ট ও পরিশ্রমের সঙ্গী, কিন্তু অকালে আমি তোমাদিগের সহায়তা হইতে বঞ্চিত হইলাম! তোমাদের সহায়তা ব্যতীত আমি কি করিব? একাকী আমার কতটুকুই বা ক্ষমতা আছে? তোমরা এই ভাবে নিহত হইবে, এই জন্তই কি আমি তোমাদিগকে শত্রুদমনের জন্য লইয়া গিয়াছিলাম? যদি তোমরা অসি-হস্তে সমুদ্রবৃন্দে বীরের জায় প্রাণত্যাগ করিতে, তাহা হইলে আমার আক্ষেপের কোন কারণ থাকিত না। আমি তোমাদের মত বিশ্বস্ত অশ্বতর আর কোথায় পাইব? আমি পুনর্বার অশ্বতর-সংগ্রহের চেষ্টায় স্থানান্তরে প্রস্থান করিলে এ ধনসম্পত্তি শত্রুকবল হইতে কে রক্ষা করিবে? এখন আমি একাকী শত্রুদমনের চেষ্টা করিব, অস্ত্রধা সেই চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিব?” এইরূপ নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে দলপতি সেই গম্ভীরমধ্যে নিদ্রিত হইয়া পড়িল, এবং সেই অবস্থাতেই ব্রাহ্মি অতিবাহিত করিল।

বীর-বাহিত
মৃত্যু হইল না
কেন?



তথ্য-
বাসনার
বন্ধ-প্রসার

প্রতিদিন প্রভাতে সন্ধ্যায় একটি নতুন পরিচ্ছেদে সম্বৃত্ত হইয়া, নগরে যাত্রা করিল এবং এক ধীর বাড়ীতে বাসা লইল। তাহার সঙ্গিগণের মৃত্যু লইয়া নগরের মধ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে কি না, জানিবার জন্ত দল্লা-সন্ধ্যায় ধীর সহিত অনেক গল্প করিতে লাগিল; কিন্তু ধীর মুখে সে সম্বন্ধে কোন কথাই শুনিতে পাইল না। ইহাতে সে ব্যথিত হইয়া, আলিবাবা তাহার সম্পদগণের উপায়টি সাধারণের নিকট গোপন করিবার জন্ত দল্লাদিগের মৃত্যু-সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করে নাই। দল্লা-সন্ধ্যায় গোপনে আলিবারার প্রাণ-নাশের উপায় স্থির করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিতে কৃতসংকল্প হইল।

দল্লাদলপতি কয়েকটি মূল্যবান পণ্যদ্রব্য তাহার গুপ্ত ধনাগার হইতে একটি অশ্বের-পৃষ্ঠে চাপাইয়া বাজারের মধ্যে আসিল এবং একটি দোকান-ঘর ভাড়া লইল। এই দোকান কাশিমের দোকানের ঠিক সম্মুখে ছিল। কাশিমের দোকান এই সময় আলিবারার পুত্রই চালাইত।

দল্লা-সন্ধ্যায় বাজারের মধ্যে খাজা হোসেন বলিয়া নিজের পরিচয় দান করিল; সে নগরস্থ সদাশরণের সহিত এমন সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করিতে লাগিল যে, সকলেই তাহার অত্যন্ত বাধ্য হইয়া পড়িল, আলিবারার পুত্রের সহিতই সে সর্দাপেক্ষা অধিক বন্ধুত্ব স্থাপন করিল। আলিবারার পুত্র তাহার সন্মুখতা ও বন্ধুত্বে বিশেষ প্রীত হইয়া, অধিকাংশ সময়ই তাহার সঙ্গে বাস করিত। আলিবাবা তাহার পুত্রের ব্যবসায় দেখিবার জন্ত মধ্যে মধ্যে সেই দোকানে আসিত, খাজা হোসেন অর্থাৎ দল্লাপতি আলিবাবাকে দেখিয়া, তাহার পর হইতে আলিবারার পুত্রের সহিত অধিক ঘনিষ্ঠতা করিতে লাগিল; মধ্যে মধ্যে সে আলিবারার পুত্রকে উপহারও দান করিত; কখন কখন তাহাকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণও করিত; আলিবারার পুত্রের প্রতি দল্লাপতির আদর-যত্নের সীমা ছিল না।

আলিবারার পুত্র খাজা হোসেনের নিকট এত আদর, অগ্রগ্রহ, উপহার ও নিমন্ত্রণ পাইয়া যে প্রতিদানে উদাসীন রহিবে, সে প্রকৃতির লোক সে ছিল না। সে তাহার পিতার নিকট সকল প্রকাশ করিয়া বলিল, “খাজা হোসেন যেকদম ভদ্র সদাগর ও সে আমাকে যেকদম অগ্রগ্রহ করে, তাহাতে তাহাকে এক দিন নিমন্ত্রণ না করিলে ভাল দেখায় না।”

আলিবারারও তাহাতে অনিচ্ছা ছিল না। সে তাহার পুত্রকে সোধন করিয়া বলিল, “কাল শুক্রবার, বড় বড় সদাগরেরা দোকান খুলিবেন না, খাজা হোসেনও নিশ্চয়ই দোকান বন্ধ রাখিবেন, কালই উৎকৃষ্ট দিন, তুমি খাজা হোসেনের সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হইবে, ভ্রমণ করিতে করিতে আমাদের বাড়ীর দিকে আসিবে, তাহার পর আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিবে। রীতিমত নিমন্ত্রণ করা অপেক্ষা এই ভাবে তাঁহাকে বাড়ীতে আনিয়া সাদরে খাওয়াইয়া দেওয়া বোধ হয় অধিক সঙ্গত হইবে। আমি মস্তিস্কিয়ানাকে বলিব, সে তোমাদের জন্ত খাবার প্রস্তুত করিবে। যখন তুমি খাজা হোসেনকে সঙ্গে লইয়া আসিবে, তখন তোমাদের জন্ত সকল প্রস্তুত থাকিবে।”

শুক্রবারের অপরাত্রে আলিবারার পুত্র খাজা হোসেনের বাসার দিকে বেড়াইতে গেল, তাহার পর দুই বন্ধুতে ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িল। উভয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে আলিবারার পুত্র, যে দিকে তাহাদের বাড়ী, সেই দিকে গিয়া উপস্থিত হইল, এবং বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া কড়া নাড়িল। আলিবারার পুত্র খাজা হোসেনকে বলিল, “এই আমাদের বাড়ী, আমার পিতা আমার মুখে তোমার সন্মুখসম্বন্ধে অনেক গল্প শুনিয়াছেন, তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ত বড়ই ইচ্ছুক হইয়াছেন, তুমি ভাই, আমার প্রতি বিস্তর অগ্রগ্রহ প্রকাশ করিয়াছ, এই সামান্য একটু অগ্রগ্রহও আজ তোমাকে দেখাইতে হইবে, আমাদের বাড়ীতে একবার তোমার পদখলি প্রদান করিতে হইবে।”

সাগরে দল্লা-
পতি-নিমন্ত্রণ

খাজা হোসেনের ইচ্ছাই ছিল, কোনরূপে আলিবারার গৃহে উপস্থিত হইয়া কোন চলনায় তাহার প্রাণসংহার করে, কিন্তু সে আলিবারার পুত্রের অহরোধ শুনিয়া বিস্তর মৌখিক আপত্তি করিল, এবং আলিবারার পুত্রকে দ্বারদেশে পরিত্যাগ করিয়া, বাসার দিকে প্রস্থান করিবার উদ্বোধন করিল। কিন্তু আলিবারার পুত্র কোনক্রমে তাহাকে ছাড়িল না, তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার জন্ত বিশেষ অহরোধ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে আলিবারার ভূতা আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল, আলিবারার পুত্র স্বয়ং দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া, তাহার বন্ধুটির হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে টানিয়া লইল। খাজা হোসেন যেন বিশেষ অনিচ্ছার সহিত বন্ধুগৃহে প্রবেশ করিল।

অতিথোর
প্রস্তাবনা



আলিবারা বিশেষ সদাশয়ের সহিত খাজা হোসেনের অভ্যর্থনা করিল, পুত্রের প্রতি খাজা হোসেনের অহরোধের জন্ত আলিবারা তাহাকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল। অবশেষে বলিল, “খাজা হোসেন, পৃথিবী সম্বন্ধে আমার পুত্রের অধিক অভিজ্ঞতা নাই, সে ভদ্রসমাজেও অধিক মিশে নাই, তুমি তাহাকে যথেষ্ট তরিকা শিক্ষা দিয়াছ।”

খাজা হোসেনও আলিবারার প্রতি ভদ্রতা-প্রকাশে কৃপণতা করিল না। সে আলিবারার পুত্রের সদাশয়তা, বিনয় প্রভৃতির যথেষ্ট প্রশংসা করিল; বলিল, “আমার সঙ্গে অনেক দেশের অনেক লোকের আলাপ আছে, কিন্তু আপনার পুত্রের জায় এমন বিনয়ী, সদাশয়, মধুরপ্রকৃতির লোক অধিক দেখি নাই। না হইবে কেন, কত বড় সদাশয় ব্যক্তির পুত্র!” আলিবারা খাজা হোসেনের সহিত যতই অধিক আলাপ করিতে লাগিল, ততই তাহার বাকচাতুর্য্যে মুগ্ধ হইল।

কিয়ৎকাল কথোপকথনের পর খাজা হোসেন আলিবারার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল। আলিবারা বাধা দিয়া বলিল, “বিলম্ব! তাও কি হয়, কখন যাওয়া-আসা নাই, আমার দোভাগ্যক্রমে যখন একবার পদধূলি পড়িয়াছে, তখন কি আমি এ ভাবে আপনাকে বিদায় দান করিতে পারি? আমি কিছুতেই আপনাকে ছাড়িব না। আপনি এখানে ঐটি থাইবেন, ইহাই আমার একান্ত আগ্রহ। আমার আগ্রহ পূর্ণ না করিয়া আপনি যাইতে পারিবেন না। যদিও আমার কোন আয়োজন নাই, তথাপি আমার বিশ্বাস, আপনার উপারতাপ্তে তাহাতে আপনার অপ্রীতিসংকার হইবে না।”

লবণবর্জিত
খাড়ে অন্নভাগ



খাজা হোসেন বলিল, “মহাশয়, আপনার অহরোধে আমি অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি, কিন্তু আপনি আমার অপরাধ মার্জনা করিবেন, আমি আপনার গৃহে আহারাদি করিতে অদয়ত হইতেছি, ইহাতে আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, আপনার মনে কষ্ট প্রদান করিবার ইচ্ছায় বা আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের জন্ত আমি একরূপ করিতেছি না। আমার সকল কথা শুনিগেই আপনি আমার অনিচ্ছার কারণ বুঝিতে পারিবেন।”

খাজা হোসেনের কথা শুনিয়া আলিবারা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, “আমার গৃহে আহারে আপনার কি আপত্তি, তাহা জানিতে পারি কি?”

খাজা হোসেন বলিল, “কারণ অতি সামান্য, আমি লবণ আহার করি না। আপনার গৃহে মনুষ্যই লবণহীন খাদ্য নাই, তাহা আমি আপত্তি করিতেছিলাম। নতুবা বন্ধুগৃহে আহারে আমার আর কি আপত্তি হইতে পারে?”

আলিবাবা বলিল, “ইহাই যদি আপত্তির কারণ হয়, তাহা হইলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমার গৃহে যে কটা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সহিত লবণের কোন সম্বন্ধ নাই, মাংস ও অন্যান্য লবণ-সম্পর্কিত দ্রব্য বাহ্যতে আপনাদয় পাতে না দেওয়া হয়, আমি তাহার আদেশ করিব। আমি এ সম্বন্ধে পাচিকাকে উপদেশ দিয়া লীজাই আপনার নিকট ফিরিয়া আসিতেছি।”

আলিবাবা মজ্জিয়ানাকে দুই তিন রকম খাদ্যসামগ্রী বিনা লবণে সম্বরণ করিবার আদেশ করিল। তখন নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য রন্ধন প্রায় হইয়া গিয়াছিল। আলিবাবার এই অনুরোধ করমাহিমে মজ্জিয়ানা কিছু বিরক্ত হইল। সে আলিবাবাকে জিজ্ঞাসা করিল, “লবণ খায় না, এমন আশ্চর্য্য মানুষ কে? আমি খাবার প্রস্তুত করিয়া ফেলিয়াছি, এখন বিলম্ব করিলে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, কিছুই খাইতে পারিবেন না।” আলিবাবা বলিল, “মজ্জিয়ানা, রাগ করিও না, একটি ভদ্রলোককে খাওয়াইব, তাহারই এ রকম ফরমাইস। বাহা বলিলাম, তদনুসারে কাজ কর।”



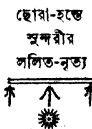
মজ্জিয়ানা ইচ্ছায় বিস্কছেই প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল। কিন্তু সে রাঁধিতে রাঁধিতে ভাবিতে লাগিল, লবণ খায় না, এমন মানুষ কি পৃথিবীতে আছে? কি রকম মানুষ? তাহাকে ত একবার দেখা দয়কার। লবণের প্রতি বিশ্বাস লোকটিকে দেখিবার জন্য মজ্জিয়ানার কৌতূহল-বুদ্ধি হইল। কিন্তু রন্ধন শেষ না করিয়া সে উঠিতে পারিল না। ইতিমধ্যে আবদাল্লা আহারের স্থান পরিষ্কার করিয়া টেবিল সুসজ্জিত করিল। আবদাল্লা একাকী খাদ্যদ্রব্য সাজাইতে পারিবে না ভাবিয়া, মজ্জিয়ানা পরিবেষণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল।

ভোজনানাগারে প্রবেশ করিয়াই সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বর্ণিকবর্ণী দল্লহাসদাঁরকে লক্ষ্য করিল। ছদ্মবেশ সবেও সে বুঝিতে পারিল, এই লোকটি দল্লহাসদাঁর ব্যতীত আর কেহ নহে। সে লক্ষ্য করিয়া আরও দেখিতে পাইল, খাজা হোসেনের কটতে তীক্ষ্ণধার ছোরা লুক্কায়িত আছে। তখন সে বুঝিল, কেন এই ব্যক্তি লবণ গ্রহণে অসম্মত।

আলিবাবা অতিথির সহিত ভোজনে উপবিষ্ট হইল। মজ্জিয়ানা ও আবদাল্লা তাহাদিগকে আহার্য্য পরিবেষণ করিতে লাগিল। আহার সমাপ্ত হইলে আবদাল্লা ও মজ্জিয়ানা ভোজনাবশেষ সরাইয়া ফেলিয়া ও মজা রাখিয়া গেল।

দল্লহাসদাঁর দেখিল, বেশ সুযোগ হইয়াছে। সে এক স্নানান্তেই আলিবাবার প্রাণনাশ করিতে পারিবে। কিন্তু দাগ-দাসীরা নিমিত্ত না হইলে এ কার্য্য করা সম্ভব নহে ভাবিয়া, সে আলিবাবার সহিত নানা প্রকার গর করিতে লাগিল।

মজ্জিয়ানা নিশ্চিন্ত ছিল না। সে বন্দিদের হাব-ভাব দেখিয়া সতর্ক হইল। সে দল্লহাস উদ্দেশ্য বার্থ করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার সংকল্প করিল। তদনুসারে সে উৎকৃষ্ট বেশভূষায় সজ্জিত হইল। নৃত্য করিবার পরিকল্পনা ভূরিয়া হইয়া সে কটবন্ধে একটি তীক্ষ্ণধার ছোরা রক্ষা করিল। তার পর আবদাল্লার হস্তে বাস্তব দিয়া সে আলিবাবার সম্মুখে উপস্থিত হইল।



মজ্জিয়ানা হুল্লরী তরঙ্গী; তাহার দেহের সৌন্দর্য্যে ও নৃত্যভঙ্গীতে সে আরও লোভনীয় হইয়া উঠিল। দল্লহাসদাঁর আনন্দ প্রকাশ করিয়া এই উৎসবের জন্য আলিবাবাকে ধন্যবাদ প্রদান করিল। আবদাল্লা চমকিতভাবে বাস্তব বাজাইতে লাগিল, মজ্জিয়ানা তালে তালে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। অবশেষে সে কটবন্ধ হইতে শাণিত ছোরা বাহির করিয়া তাহা লইয়া, ললিত নৃত্যে সকলকে মুগ্ধ করিল। নাচিতে নাচিতে মজ্জিয়ানা আবদাল্লার হস্ত হইতে বাস্তবটিকে বাম হাতে লইয়া, দক্ষিণ হস্তে ছোরা লইয়া,

আলিবাবার সমুখে নৃত্য করিতে লাগিল। খুশী হইয়া আলিবাবা তাহাকে একটি আসরফি পুরস্কার প্রদান করিল। তাহার পুত্রও একটি মোহর দান করিল। তদুপে খাজা হোসেন তাহার মুসাখার হইতে অর্থ বাহির করিবার জন্ত পকেটে হাত ঢুকাইল।

মর্জিয়ানা এই সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সে তখন খাজা হোসেনের সন্নিহিতে পিড়িয়া নাচিতেছিল। জাল সরাগর যেমন অচমনর হইয়াছে, অমনই সে সজোরে তীক্ষ্ণর ছুরিকা তাহার বক্ষস্থলে আসুল বিদ্ধ করিল। সহসা ছোৱার সাংঘাতিক আঘাতে দহস্যসদৃশ গতজীবন হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

আলিবাবা মর্জিয়ানাকে তিরস্কার করিলে সে বলিল, “এ ব্যক্তি সেই দহস্যসদৃশ; আপনাকে হত্যা করিবার জন্ত আসিয়াছিল।” তাহার পরচুলা

টানিয়া ফেলিবারাত্র তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইল। আলিবাবা অত্যন্ত বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া বলিল, “তুমি ত’ আমার দাসী নহ। আমি তোমাকে আশাতীত পুরস্কার প্রদান না করিলে তোমার প্রতি আমার আঘাত করা হইবে। আমি পূর্বেই বলিয়াছিলাম, তোমাকে আমি বখায়েগা পুরস্কার প্রদান করিব, এখন সেই পুরস্কার-দানের সময় আসিয়াছে। তোমাকে আমি আমার পুত্রের হস্তে প্রদান করিলাম, তুমি তাহাকে বিবাহ করিয়া সুখী হও। আজ হইতে তুমি আমার পুত্রবধূ হইলে, তোমার অন্তঃস্থ ও চেষ্টাতেই আমার প্রাণরক্ষা হইল। তুমিই আমার সংসার



সুন্দরী দাসী
চাতুর্য ও
শৌখিন



নৃত্য-
মৌল্য
দহস্য-
সংসার



বন্ধায় রাখিলে। তোমার সাহস ও বুদ্ধিকৌশলে দুর্বৃত্ত দহস্যদলের নিপাত হইল। মর্জিয়ানা, তুমি আমার রক্ষয়িত্রী।”

আলিবাবার পুত্র তৎক্ষণাৎ পিতার অভিপ্রায়ে সম্মত জ্ঞাপন করিল। কারণ, মর্জিয়ানার নিকট পিতা-পুত্র যে কেবল রক্তজ, তাহাই নহে, মর্জিয়ানা পরমা সুন্দরী ও তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী ছিল, তাহাকে বিবাহ করিয়া আলিবাবার পুত্র সুখী হইবে, সে আশা তাহার ছিল।

অনন্তর আলিবাবা গোপনে দহস্যদলপতিক তাহার স্নিগ্ধগণের পাশে উজানের মধ্যে সমাহিত করিয়া বিবাহের আয়োজনে ব্যস্ত হইল। মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল। আলিবাবার তখন অর্থের অভাব ছিল না, প্রায় এক মাস ধরিয়া আলিবাবার গৃহে অবিরাম উৎসব আনন্দ চলিতে লাগিল;—দেশের যত দরিদ্র পরিভ্রমণে আহ্বার করিল।

কাসিমের মৃত্যুর পর আলিবাবা আর সেই পার্শ্বতা ধনাগারে প্রবেশ করে নাই, দহা-সর্দারের মৃত্যুর পরও সে সে দিকে ঘাইতে সাহস করে নাই; কারণ, ছই জন দহা জীবিত আছে কি না, সে সম্বন্ধে সে তখনও কোন কথা জানিত না।

এক বৎসর পরে যখন আলিবাবা দেখিল, দহাগণ আর তাহার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করিল না, তখন সে বিশেষ সাবধানে সেই গুপ্তধনাগারে উপস্থিত হইল, কিন্তু সেখানে কোন শত্রুর সন্ধান পাইল না। আলিবাবা গুহারায় খুলিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত, বহুদিন আর কেহ সেই ধনাগারে প্রবেশ করে নাই। সে বিস্মিত, ধনাগারের কোন মালিক আর জীবিত নাই, সুতরাং সমস্ত ধন তাহারই অধিকারে আসিয়াছে। সে ক্রমে ক্রমে ধনরত্নরাশি গৃহে লইয়া আসিতে লাগিল।

আলিবাবার জীবদশায় সেই যুগযুগান্তর-সম্পত্তি ধনরাশি নিঃশেষে গৃহজাত করা সম্ভব হইল না। সে তাহার পুত্রকে ধন আলিবার পুত্রা বণিয়া দিল, আলিবাবার পুত্রও সেই ধন ও বুদ্ধিমত্তী স্বন্দরী প্রেমময়ী স্ত্রী লইয়া মহা সজ্জমে, অতুল ঐশ্বর্যে পরমমুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

শাহারজাদী যখন এই কাহিনী শেষ করিলেন, তখনও একটু রাত্রি ছিল, সুতরাং তিনি স্ত্রীতানের অল্পমতক্রমে কোম্পানীর সদাগর আলি খাজার কাহিনী বর্ণন করিতে আরম্ভ করিলেন।



দেখো-
দেখ

মুন্সীগড়



খালিক হারুন-অল-রসিদের রাজত্বকালে বোম্বাদ নগরে আলি খাজা নামে এক জন সদাগর বাস করিত। সদাগরের স্ত্রী কিছা পুত্র-কন্যা ছিল না, বাবদয়ে যাহা লাভ হইত, তাহাতেই তাহার দিন বেশ চলিয়া যাইত, কোন বিষয়ে সে কাহারও নিকট ঋণী ছিল না।

সদাগর একবার উপযুপরি তিন রাত্রি স্বপ্ন দেখিল যে, এক জন সম্ভ্রান্ত চেহারায়া লোক তাহাকে ক্রকুটি করিয়া বলিতেছে, “য়ে নরাত্ম, ধর্মকর্মে তুই এমন উদাসীন কেন? সজ্জিত সবেও তুই এত দিনে মধ্যে একবারও মক্কা গরিফ সন্দর্শন করিলি না, তোর গতি কি হইবে?”

এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া, আলি খাজার মনে বড় হুশিয়ার উদ্বেগ হইল, সে ধর্মবিখ্যাত মুসলমান ছিল, প্রত্যেক মুসলমানেরই যে একবার মক্কা সন্দর্শন করা কর্তব্য, সে জান তাহার ছিল, কিন্তু দেশে ঘরবাড়ী, দোকান, বাবদায় দেখিতে হইত; সে একাকী বসিয়া তাহার এই পরমকর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে নাই, তৎপরিবর্তে সে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিকে দান ও অন্নাত্ত সাধু অন্নটান করিত। কিন্তু উক্ত স্বপ্ন দেখিয়া সে ভাবিল, একবার মক্কা সন্দর্শন না করিলে হয় ত কোন বিষম বিপদে পড়িতে হইবে, সুতরাং সে মক্কা-গমনের জন্য উৎসুক হইল।

আলি খাজা তৈজসপত্র বিক্রয় করিয়া, দোকান তুলিয়া, মক্কা-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহার একটা বিপদ উপস্থিত হইল। গৃহসামগ্রী বিক্রয় করিয়া, তাহার হাতে এক সহস্র সপ্তসূত্রী সঞ্চিত হইল, এ টাকাগুলি সে কোথায় রাখিয়া যাইবে, তাহাই ভাবিয়া অস্থির হইল। বিদেশে এত টাকা সঙ্গে লইয়া যাওয়াও অবিধ, আবার দেশে গচ্ছিত রাখিবার মত উপযুক্ত বিখ্যাতী লোকেরও অভাব।

অবশেষে অনেক চিন্তার পর আলি খাজা এক মংলব করিল। একটি ইঁড়ার মধ্যে সেই হাজার মোহর রাখিয়া ইঁড়ায় ঢলপাই দ্বারা পরিপূর্ণ করিল, তাহার পর ইঁড়ার মুখ উত্তমরূপে আঁটিয়া সে তাহা লইয়া তাহার একটি সদাগরবন্ধুর নিকট উপস্থিত হইল; বন্ধুকে বলিল, “ভাই, তুমি ও’ জান, আমি মক্কাগরিফে

বাইবার জন্ত কত ব্যস্ত হইয়াছি, কয়েকজন লোক চাই এক দিনের মধ্যেই মক্কা যাত্রা করিবে, আমিও তাহাদের সঙ্গে বাওয়া স্থির করিয়াছি ; আমি প্রভাগমন না করা পর্যন্ত আমার জলপাইয়ের হাঁড়টা তোমার জিহ্বায় রাখিয়া যাইতেছি।” তাহার সদাগরবন্ধ এক পোছা চাবি তাহার সমুখে ফেলিয়া দিয়া বলিল, “এই লগু আমার শুভাশ্রমের চাবী, তোমার বেখানে থুসী, এই হাঁড়টা শুভাশ্রমের মধ্যে রাখিয়া যাও, আমি তোমার নিকট এইটুকু অঙ্গীকার করিতে পারি যে, যেখানে তুমি ইহা রাখিয়া যাইবে, সেইখানেই পাইবে।”

আলি খাজা যথাকালে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য সঙ্গে লইয়া, মক্কাভ্যন্তরে উপস্থিত হইল। অত্যন্ত ব্যক্তিগণের সহিত সমস্ত দর্শনযোগ্য স্থান ও দ্রব্য দর্শন করিয়া, মক্কার কার্য শেষ হইলে সে পবিত্রস্থলদ্বয়ে তাহার পণ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে বসিল।

দুই জন সদাগর আলি খাজার পণ্যদ্রব্যগুলি দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহারা কিছু ক্রয় করিল না। তাহাদের দেখা শেষ হইলে এক জন সদাগর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বলিল, “যদি এই লোকটার কাণ্ডোঁড়ান থাকিত ত’ এ জিনিষগুলি এখানে বিক্রয় না করিয়া, কায়রো নগরে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। এখানে এ সকল জিনিষ তেমন অধিক মূল্যে বিক্রীত হইবে না।”

আলি খাজার কণ্ঠে এ কথা প্রবেশ করিল। আলি খাজা পূর্বেও মিশরের অনেক প্রশংসা শুনিয়াছিল, সদাগরের কথা শুনিয়া তাহার মিসরদর্শনের বাসনা বলবতী হইয়া উঠিল। তাহার পণ্যদ্রব্য মক্কার বিক্রয় না করিয়া তাহা মিশরে বিক্রয় করিতেই বাসনা করিল। সে তাহার পণ্যদ্রব্যগুলি রীতিমত গাটবন্দী করিয়া বোম্বাদে প্রত্যাবর্তনের পরিবর্তে মিশরের পথে অগ্রসর হইল এবং কয়েক জন সার্ববাহের সজ্জা লাভ করিয়া কায়রোর পথে চলিল। কায়রোনগরে উপস্থিত হইয়া, সে এত অধিক মূল্যে পণ্যদ্রব্যগুলি বিক্রয় করিল যে, অল্পে তত অধিক মূল্যে বিক্রয় কখন সম্ভবপর ছিল না। তাহার প্রচুর পরিমাণে লাভ হইল। তখন সে কায়রো-নগরজাত কতকগুলি উৎকৃষ্ট সামগ্রী ক্রয় করিয়া, তাহা বিক্রয়ের জন্ত দামাঙ্ক নগরে যাত্রার সংকল্প করিল। কিন্তু প্রায় দেড় মাসকাল সঙ্গী লাভ করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে সে কায়রো নগরে দর্শনযোগ্য স্থানগুলি দেখিয়া লইল, তাহার পর সঙ্গী জুটিলে তাহাদিগের সঙ্গে দামাঙ্ক যাত্রা করিল।

দামাঙ্ক যাইতে হইলে জেরুজেলম নগর অতিক্রম করিয়া যাইতে হয়, আলি খাজা জেরুজেলম নগর দর্শন করিল, তাহার পর যথাকালে দামাঙ্কসে উপস্থিত হইল। দামাঙ্ক দেখিয়া আলি খাজা মোহিত হইয়া গেল। হৃদয় পরিচ্ছন্ন রাজপথ, পরমরমণীয় প্রশস্ত প্রান্তর, স্বচ্ছ-সলিলবাহিনী ধরস্রোতা নদী, নয়নরঞ্জন মনোরম উপবনশ্রেণী দেখিয়াও তাহার আশা মিটিল না, সে কিছু দীর্ঘকাল দামাঙ্ক নগরে বাসের সঙ্কল্প করিল।

অবশেষে দামাঙ্ক পরিভ্রমণ করিয়া, আলি খাজা আপেলো নগরে উপস্থিত হইল, সেখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করিয়া ইউফ্রেটিস নদী অতিক্রম পূর্বক মোসলের পথে অগ্রসর হইল।

মোসলে উপস্থিত হইয়া আলি খাজা দেখিল, সে যে সকল পারসীক বণিকের সহিত আপেলো নগর হইতে একত্র পথপর্যটন করিয়াছিল, তাহাদের সকলেই সেখানে উপস্থিত আছে। তাহাদের সহিত আলি খাজার বিশেষ বন্ধুতা জন্মিয়াছিল, তাহারা আলি খাজাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল; বলিল, “ভাই, চল, এই সময়ে একবার সিরাজ নগরটা দেখিয়া আসা যাক, তাহার পর সেখান হইতে বোম্বাদে প্রত্যাগমন করিলেই হইবে।” স্থলতানীয়া, রেই, কোম, কাদান, ইম্পাহান প্রভৃতি নগর অতিক্রম পূর্বক তাহারা সিরাজ নগরে উপস্থিত হইল। এখানে আসিয়া সরাগর ভাবিল, এত দূর আসিয়া হিন্দুস্থানে পদার্পণ না করিলে দেশভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে, অতএব হিন্দুস্থান দেখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমনই কর্তব্য।

জলপাই চাপা
মোহর



মিসর হইয়া
হিন্দুস্থান



এইরূপে বিভিন্ন দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে আলি খাজা প্রবাসে সাত বৎসর বিলম্ব করিল। আলি খাজা বিলম্ব কর্তব্য নহে বিবেচনা করিয়া, আলি খাজা অভ্যন্তর বোন্দাদে প্রত্যাবর্তনের সঙ্কল্প করিল।

আলি খাজা তাহার যে সদাগরবন্ধুর গুদামে জলপাইপূর্ণ হাঁড়া রাখিয়া গিয়াছিল, সে তাহার হাঁড়া ও তাহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। ইতিমধ্যে সেই সদাগরের একটি বন্ধু তাহার গৃহে অভিযি হইলে কথাপ্রসঙ্গে জলপাইয়ের কথা উঠিল। সদাগরের পত্নী বলিল, “জলপাই জিনিষটি বেশ, অনেক দিন উহা বাই নাই, গোটাকতক জলপাই পাইলে বাইতাম।”

বিশ্বাস-
যাতকতায়
জীব নিষেধ
ক

সদাগর বলিল, “তোমাদের কথায় আজ আলি খাজার কথা মনে পড়িল। আলি খাজা আজ সাত বৎসর হইল মক্কাযাত্রা করিয়াছে, দেশত্যাগের পূর্বে সে আমার গুদামে এক হাঁড়া রাখিয়া গিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়া তাহার তাহা লইবার ইচ্ছা আছে। আলি খাজা কোথায় কি অবস্থায় আছে, তাহার কিছুই জানি না। মধ্যে একবার শুনিয়াছিলাম, সে মিসরে আছে; আমার অনুমান হয়, সে মিসরে প্রাপত্যাগ করিয়াছে, নতুবা এত দিনের মধ্যে কি সে দেশে ফিরিত না? তাহার জলপাইগুলি যদি এখনও ভাল থাকে, তবে তাহা বাইতে আপত্তি কি? আমাকে একখান ডিস্ ও একটা বাতী দাও, আমি গুদাম হইতে গোটাকতক জলপাই বাহির করিয়া আনি, বাইয়া দেখা যাইবে।”

সদাগরের স্ত্রী বলিল, “আজ্ঞার কসম, এমন কুর্কস করিও না, সাত জন্ম জলপাই বাইতে না পাই, সেও ভাল, পনের গচ্ছিত জিনিষ তসকুফ করিয়া, যেন জাহারমের দরজা খোলসা করিতে না হয়। তুমি জান, আলি খাজা মক্কা গিয়াছে, তাহার পর সে মিসরে গিয়াছে, তাহাও শুনিয়াছি, মিসর হইতে যে সে অজ্ঞ দেশে গমন করে নাই, তাহা কে বলিল? তুমি তাহার মৃত্যু-সংবাদ পাও নাই, হয় ত’ সে কাল কিংবা পরন্তু এখানে আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে, সে তাহার হাঁড়া ফেরত চাহিলে তাহাকে কি জবাব দিবে? বলিবে কি, ‘ভাই, তুমি মরিয়াছ সাব্যস্ত করিয়া তোমার স্থাপাধন উদরদাং করিয়াছি?’ এমন কলঙ্ক যেন পড়িতে না হয়। বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা পাপ আর নাই, আমি সে পাপের ভাগী হইতে চাহি না। আমি যদি আলি খাজার জলপাই একটুও বাই, তবে তাহা আমার নিকট হারাম। আর এই সাত বৎসরের পুরাতন পচা জলপাই, তাহা কি মুখে করা যাইবে? আমার বিশ্বাস, আলি খাজা নীত্বই ফিরিয়া আসিবে, আসিয়া যদি সে দেখে, তুমি হাঁড়া খুলিয়াছ, তখন সে তোমাকে কি মনে করিবে?—তুমি ও বধেখয়াল পরিত্যাগ কর।”

অর্থসোভে
খণ্ডজান-বন্ধন

ক

সদাগর পত্নীর সংপরামর্শে মনোযোগ করিল না, তাহাকে কোন কথা না বলিয়া, সে একখানি ডিস্ ও বাতী লইয়া গুদামে চলিল। তাহার স্ত্রী রাগ করিয়া বলিল, “মনে রাখিও, তোমার এই অজ্ঞা কাজের জন্য আমি একটুও দায়ী নহি, তোমার কাজের জন্য যদি ভবিষ্যতে তোমাকে অনুতাপ করিতে হয়, তবে তখন আমার গালি দিও না।”

সদাগর কোন কথা বলিল না। সে গুদামে প্রবেশ করিয়া আলি খাজার হাঁড়ার মুখ খুলিয়া ফেলিল; দেখিল, জলপাইগুলি পচিয়া গিয়াছে। সে মনে করিল, উপরের জলপাইগুলি পচিলেও হাঁড়ার নীচে যেগুলি আছে, সম্ভবতঃ তাহা ব্যবহারোপযোগী আছে। হতরাসে সে হাঁড়া নত করিয়া ডিসের উপর জলপাইগুলি ঢালিতে লাগিল। হঠাৎ জলপাইয়ের ভিতর হইতে ঠুন করিয়া একটি চক্চকে স্বর্ণমুদ্রা ডিসের উপর পড়িল। সদাগর লোভী ও স্বর্ণজ্ঞানশূন্য ছিল, সে এই স্বর্ণমুদ্রাটি দেখিয়া অত্যন্ত প্রমত্ত হইল। তাহার

ক্রিয়ায় লাগার সঞ্চায় হইল, সে সমস্ত জলপাইগুলি ঢালিয়া ফেলিল; দেখিল, উপরে অতি অল্পসংখ্যক জলপাই ঢাকা দেওয়া রাশি রাশি মোহর হাঁড়ার ভিতর সম্ভব। সে মোহরগুলি হাঁড়ার পুরিয়া তাহার উপর জলপাইগুলি রাখিয়া গুদাম বন্ধ করিল এবং গৃহে ফিরিয়া আসিল।

গৃহে আসিয়া সদাগর তাহার স্ত্রীকে বলিল, “বিবি, তুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাই ঠিক বটে, সাত বৎসরের জলপাই কি আর খাবার যোগ্য থাকে? সব পচিয়া গিয়াছে, আমি সেগুলি হাঁড়ার মধ্যে পুনরায় রাখিয়া আসিলাম। আলি খাজা ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাঁড়া দেখিলে বুকিতেও পারিবে না যে, আমি তাহার কাছে গিয়াছিলাম।”

সদাগরের স্ত্রী বলিল, “তুমি আমার পরামর্শ শুনিলেই ভাল করিতে, ও জিনিস স্পর্শ না করা তোমার কর্তব্য ছিল, আল্লা করুন, যেন এ জন্ত আমাদের কোন বিপদে পড়িতে না হয়।”

স্ত্রীর কথা সদাগরের কর্ণধরে প্রবেশ করিল না, সে তখন আলি খাজার মোহরের কথা মগ্ণ ছিল; ভাবিতেছিল, এতগুলি চক্কে মোহর! কি করিয়া ইহার প্রলোভন ত্যাগ করা যায়? সমস্ত রাত্রি মোহরের চিন্তায় তাহার নিদ্রা হইল না, যদি আলি খাজা ফিরিয়া আসে, তাহা হইলে তাহাকে মোহরগুলি ফাঁকি দিয়া লইয়া ফেনন করিয়া হাঁড়াটা ফিরিয়া দেওয়া যায়? আলি খাজাকে হাঁড়াপূর্ণ জলপাই প্রদান করিয়া মোহরগুলি নিজের জন্ত রাখিবার ইচ্ছা তাহার মনে এতই বলবতী হইল যে, পরদিন সকালে সে বাজারে গিয়া কতকগুলি নূতন জলপাই ক্রয় করিয়া ফেলিল, তাহার পর তাহা লইয়া গুদামে আসিয়া আলি খাজার হাঁড়ার জলপাইগুলি ফেলিয়া দিল, মোহরগুলি বাহির করিয়া লইল এবং তাহার ক্রীত জলপাই বার হাঁড়াটা পূর্ণ করিয়া তাহার মুখ পূর্ববৎ আঁটিয়া রাখিল।

সদাগর এই বিধানবাক্য ক্রিয়ায় প্রায় এক মাস পরে, আলি খাজা দীর্ঘপ্রবাসের পর বোন্দাদ নগরে প্রত্যাগমন করিল। আলি খাজা মজাবাত্রার পূর্বে তাহার গৃহ ভাড়া দিয়া গিয়াছিল, স্ত্রীর বোন্দাদে প্রত্যাগমন করিয়া সে এক ঝাঁয়ের বাড়ীতে বাসা লইল, তাহার পর যাহাকে সে বাড়ী ভাড়া দিয়াছিল, তাহাকে বাড়ী খালি করিয়া দিবার জন্ত অল্পরোধ করিল।

যে দিন আলি খাজা বাসভূমিতে প্রত্যাগমন করিল, তাহার পরদিনই সে তাহার বন্ধ সদাগরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিল। ভণ্ডবন্ধু ছই হাত প্রসারিত করিয়া আলি খাজাকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল, যেন তাহাকে দেখিয়া আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছে, আলি খাজার আদর্শনে তাহার মনে কিরূপ হৃদিস্তার সঞ্চায় হইয়াছিল, তাহা সদাগর শতমুখে বর্ণন করিতে লাগিল।

আলাপ শেষ হইলে আলি খাজা বলিল, “ভাই, বিদেশে ঘাইবার সময় যে জলপাইয়ের হাঁড়াটা তোমার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলাম, সেটা চাই যে!—তুমি আমার জন্ত অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছ। তুমি দয়া করিয়া, আমার হাঁড়াটা রাখিয়া মহোপকার করিয়াছ। আমি তোমার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।”

সদাগর বলিল, “বিলম্ব। ও সকল কথা বলিও না, আমার মাঠের মত গুদাম পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার এক পাশে একটা হাঁড়া রাখিয়া গিয়াছ, তাহার জন্ত আবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ?—হাঁ, যদি বৃথিতাম, তোমার জন্ত খুব বানিক স্বার্থত্যাগ করিতে হইয়াছে, তাহা হইলে না হয় কৃতজ্ঞতার কথা একদিন মুখে আনিতে সক্ষম ছিল না। তোমার হাঁড়ার কথা আমি ভুলিয়াই গিয়াছিলাম, এই চাবি নাও, গুদাম খুলিতে তোমার হাঁড়া বাহির করিয়া লইয়া এস। যেখানে তুমি রাখিয়া গিয়াছ, হাঁড়াটা বোধ করি, সেই স্থানেই আছে।”



আলি খাজা শুদ্ধানে গিয়া হাঁড়া বাহির করিয়া লইয়া আসিল; দেখিল, হাঁড়ার মুখ পূর্ণবৎ বন্ধ আছে, সে সদাগরকে শুদ্ধামের চাবি প্রদান করিয়া, হাঁড়া লইয়া তাহার বাসায় সেই বায়ের বাড়ী চলিল।

মোহরের বগলে
জলপাই

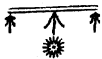


বাসায় উপস্থিত হইয়া সে হাঁড়ার মুখ খুলিল, তাহার পর তাহার ভিতরে হাত পুরিয়া দিয়া মোহরগুলি টানিয়া বাহির করিতে গেল, কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহার হাতে একটি মোহরও স্পর্শ হইল না। আলি খাজা মহা বিস্মিত হইয়া হাঁড়া উলটাইয়া ফেলিল; দেখিল, কেবলই জলপাই, তাহার মধ্যে একখানা মোহরও নাই। সে বিষয় ও বিধাদে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার পর তাহার দুই হাত ও দুই চকু আকাশের দিকে তুলিয়া বলিল, “হা, আল্লা, আমি বাহাকে পরম বিশ্বাসী বন্ধ বলিয়া জানিতাম, অর্গলোভে সে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করিল।”

কিন্তু হাজার মোহর ত’ আর টাকা নয়! এক জন লোকের সমস্ত জীবনের উপার্জন, সহজে তাহার মারা পরিত্যাগ করিতে পারা যায় না। আলি খাজা বাস্তবাবে তাহার বন্ধুর গৃহে ফিরিয়া আসিল, এবং সেই সদাগর বন্ধুকে বলিল, “ভাই, এত শীঘ্র তোমার কাছে ফিরিয়া আসিতে হইল দেখিয়া তুমি বিস্মিত হইও না। আমি আমার হাঁড়া ফেরত পাইলাম বটে, কিন্তু আমি ইহার মধ্যে যে হাজারখান মোহর রাখিয়াছিলাম, তাহা আর পাইলাম না! আমার বোধ হয়, তুমি তাহা ব্যবসায়ে লাগাইয়াছ, যদি তাহাই করিয়া থাক, তবে ভালই করিয়াছ, টাকাগুলি পড়িয়া না থাকায় তাহা দ্বারা তোমার কিছু অর্থগম হইবে, ইহা সুখের কথা। কিন্তু ভাই, টাকার জন্য আমার যে চিন্তিতা হইয়াছে, তাহা দূর করিয়া দূর কর, অথবা টাকাগুলির একটা রদিদ আমাকে লিখিয়া দাও। যখন তোমার সুবিধা হইবে, টাকাগুলি আমাকে ফিরাইয়া দিও।”

আলি খাজার বন্ধু জানিত, আলি খাজা শীঘ্রই তাহার নিকট প্রত্যাগমন করিবে, সুতরাং কি উত্তর দিতে হইবে, তাহা সে স্থির করিয়াই রাখিয়াছিল। সে সবিস্ময়ে বলিল, “বন্ধু, তুমি বল কি? তুমি যখন জলপাইপূর্ণ হাঁড়াটা আমার কাছে আনিয়াছিলে, তখন আমি কি তাহা স্পর্শ করিয়াছিলাম? আমি ত’ তোমার হাতেই আনার চাবি সঁপিয়া দিয়াছিলাম, তোমার হাঁড়া তুমি তোমার পছন্দমত স্থানে রাখিয়াছিলে। যেখানে তুমি তাহা রাখিয়াছিলে, হাঁড়া সেইখানেই ছিল, সেখান হইতে তুমি স্বয়ং তাহা তুলিয়া লইয়া বাসায় গিয়াছ, হাঁড়া যেভাবে বন্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলে, সেইভাবেই বন্ধ আছে দেখিয়াছ, যদি তুমি ইহার মধ্যে মোহর রাখিয়া থাক, তবে তাহা হাঁড়ার মধ্যেই আছে। তুমি তখন বলিয়াছিলে, তোমার হাঁড়ায় জলপাই আছে। আমি তাহাই বিশ্বাস করিয়াছিলাম, এখন হ্রস্ব বদলাইয়া বলিতেছ, উহার মধ্যে মোহর ছিল; তোমার কোন কথা সত্য, কেমন করিয়া জানিব? তুমি আমার কথায় বিশ্বাস কর বা নাই কর, আমি সত্যই বলিতেছি, তোমার হাঁড়া আমি স্পর্শও করি নাই।”

অস্বীকারের
ধারা



আলি খাজা দেখিল, বন্ধু সরলভাবে কথা কহিতেছে না, সুতরাং সেও একটু বক্রতা অবলম্বন করিল; বলিল, “সহজে বাহাতে গোপনযোগ মিটিয়া যায়, আমি সেইরূপ উপায়ই ভাল মনে করি, কিন্তু সহজে যদি তুমি আমার মোহর না দাও, তবে অগত্যা আমাকে শেষ উপায়ই অবলম্বন করিতে হইবে। তখন তুমি আমার নিন্দা করিও না, আমি সহজে নাশিশ করিতে রাজী নই, তোমার মানসসম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাজ করিও। বেশী কথা বলবার আবশ্যক দেখি না।”

সদাগর আলি খাজার কথা শুনিয়া ভারী চট্টয়া গেল, সে বলিল, “আলি খাজা, বুঝা ভয় দেখাইয়া ক’ই পাইও না। আমি শিশু নহি, তুমি আমার কাছে এক হাঁড়া জলপাই গচ্ছিত রাখিয়াছিলে, তুমি তাহা যেমন রাখিয়াছিলে, সেই অবস্থাতেই ফেরত লইয়া গিয়াছ। এখন তুমি হঠাৎ হাজার মোহর দাবী করিয়া বলিলে, আমি তাহা কিরূপে দিব? তুমি কি পূর্বে বলিয়াছ, তোমার হাঁড়ার মধ্যে মোহর থাকিল? তাহা কি আমার দেখাইয়া রাখিয়াছিলে? মোহরের কথা না বলিয়া হাঁড়ার মধ্যে হীরক-জহরত রাখিয়াছ, এ কথা যে বল নাই, এই অনেক! আমার পরামর্শ শোন, বাড়ী-বাও, এখানে গোলমাল করিয়া হাটের লোক জড় করিও না, তাহাতে বড় সুবিধা হইবে না।”

গোলমাল দেখিয়া সদাগরের দরজায় অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল, আলি খাজা তাহাদের কাছে গিয়া বক্তৃতা বিধাঙ্গনা শুকতার কথা প্রকাশ করিল। সদাগর এ কথা পুনঃ পুনঃ অব্যাহত করিতে লাগিল, অবশেষে সে আলি খাজাকে বলিল, “যদি সহজে তুমি এখান হইতে চলিয়া না যাও, তবে তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।”

আলি খাজার ঐর্ষ্যাচাতি ঘটিল, সে সদাগরের হাত ধরিয়া বলিল, “তুমি নিজে অপমানিত হইবে, মান-সম্মত হারাইবে, তাহারই উপায় করিলে। আমি আল্লাকে সাক্ষী মানিলাম, তুমি কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া মোহর চুরির কথা কিরূপে অব্যাহত কর, তাহা দেখা যাইবে।”

আলি খাজা কাজীর কাছে নালিশ রুজু করিল। বাহা ঘটনা,

সে কাজীর কাছে দমস্তই প্রকাশ করিয়া বলিল। কাজী আদানীকে তলব দিলেন। আদানী সদাগর বলিল, “আমি মোহরের কথা কিছুই জানি না, আলি খাজা এক হাঁড়া জলপাই আমার জিহ্বায় রাখিয়াছিল, তাহা সে লইয়া গিয়াছে, তাহার হাঁড়াতে টাকা ছিল কি না, তাহা আমাকে পূর্বে বলে নাই, আল্লার দিবা করিয়া বলিতে পারি, আমি হাঁড়া স্পর্শও করি নাই।”

তখন কাজী আলি খাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি হাঁড়ায় মোহর রাখিয়াছিলে, তাহার কেহ সাক্ষী আছে?” আলি খাজা বলিল, “কোন মানুষ সাক্ষী নাই, আল্লা সাক্ষী আছেন।”

কাজী বলিলেন, “আল্লা তোমার জন্য হুকুম লইয়া মানুষের মত সাক্ষী দিবেন না। তুমি যেমন আল্লার দিবা করিতেছ, আদানীও সেইরূপ করিতেছে। কাহার কথা আমি বিশ্বাস করিব? যখন তুমি মোহর



গোল-
মালে
অপমান

আল্লার সাক্ষী

সম্ভব নয়



রাখিবার কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারিতেছ না, তখন আমি এ নাশি অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য, আমি আসামীকে মুক্তিদান করিলাম।”

কাজীর বিচার।



আলি খাজা কাজীর বিচারে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, “কাজী সাহেব, আপনার জায়-বিচারের শক্তি নাই, আপনি কেবল সাক্ষ্য-প্রমাণ লইয়াই বিচার করেন। বাহা হউক, আমি আপনার, আমার ও সকলের মনির খালিফ হারুণ-অল-রসিদের নিকট বিচার প্রার্থনা করিব, তাঁহার নিকট বিচারের অভাব হইবে না।” কাজী আলি খাজার ভয়প্রদর্শনে বিচলিত হইলেন না।

আলি খাজার সহস্র স্বর্ণমুদ্রা আশ্রয় করিয়া দুর্ভুক্ত সদাগর মহানন্দে তাহা ভোগ করিতে লাগিল। এ দিকে আলি খাজা একখানি দরখাস্ত লিখিল। পরদিন মধ্যাহ্নকালে খালিফ ভজনালয়ে গমন করিলে আলি খাজা পথে তাঁহার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিল। খালিফ নমাজের পর প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিতেছেন, এমন সময় আলি খাজা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সেই দরখাস্তখানি প্রদান করিবার জন্ত প্রস্তুত হইল। পেশকার খালিফের সঙ্গেই ছিল, সে তৎক্ষণাৎ দরখাস্তখানি গ্রহণ করিল।

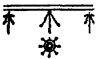
আলি খাজা জানিত, খালিফ হারুণ-অল-রসিদ স্বয়ং না দেখিয়া কোন বিচার করেন না। কি হুকুম হয়, তাহা জানিবার জন্ত আলি খাজা খালিফের অহুগমন করিল, এবং প্রাসাদে গিয়া বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে এক জন কর্মচারী আসিয়া আলি খাজাকে বলিল, “খালিফ তোমার দরখাস্ত পাঠ করিয়াছেন, আগামী কল্য তোমাকে হজুরে হাজির হইতে হইবে।” বিবাসবাক্যক সদাগরের ঠিকানাও রাজকর্মচারী লিখিয়া নাইল, কারণ, খালিফ তাহাকেও সে সময় হাজির থাকিবার জন্ত এতেলা দিতে বসিয়াছিলেন।

সে দিন সন্ধ্যাকালে খালিফ হারুণ-অল-রসিদ, তাঁহার উজীর জফির এবং খোজাদার মদকরকে সঙ্গে লইয়া ছয়বেশ নগরভ্রমণে যাত্রা করিলেন। “খালিফ তাঁহার অহুচরবর্গের সহিত নগরের একটি পথ দিয়া যাইতে যাইতে অনেক লোকের গোলমাল শুনিতে পাইলেন। শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটা গোলা জায়গায় দশ বারোট বালক চক্রাঙ্গকে খেলা করিতেছে।

ছেলেরা কি খেলা খেলিতেছে, তাহা জানিবার জন্ত খালিফের কৌতূহল হইল, তিনি কিছু দূরে একখানি শিলাখণ্ডের উপর উপবেশন করিয়া, তাহাদের ক্রীড়া দেখিতে লাগিলেন। তিনি শুনিলেন, একটা অতি বুদ্ধিমান বালক তাহার সহচরগণকে বলিতেছে, “ওহে, আজ আমরা কাজীর খেলা খেলি, আমি কাজী হইলাম, আমার কাছে তোমরা আলি খাজা ও যে সদাগর তাহার হাজার মোহর চুরি করিয়া আসামী হইয়াছে, তাহাকে লইয়া আইস।”

বালকের

বিচার-খেলা।



এই কথা শ্রবণমাত্র আলি খাজার দরখাস্তের কথা খালিফের মনে পড়িয়া গেল। বালকেরা কিরূপ বিচার করে, তাহা দেখিবার জন্ত তাঁহার বড় কৌতূহল হইল, তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত তাহাদের বিচার দেখিতে লাগিলেন।

আলি খাজা ও সদাগরের মামলা সে সময় বোঙ্গাদ নগরের ঘাটে পথে একটা আজন্মবি গরের বিধ্ব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঘাটে পথে সকলের মুখেই সেই মামলার কথা; স্মৃত্তরাং নগরের বালকগণও সেই কথা শুনিয়াছিল, সে দিন তাহারা বালকবৃদ্ধি বশতঃ কাজীর বিচারের অভিনয় করিতে লাগিল।

যে বালক কাজী সাজিয়াছিল, সে গম্ভীরভাবে কাজীর মত বিজ্ঞতার বোকা মুখে নামাইয়া একখানি আসনে বসিল, সকলেই তাহার প্রতি কাজীর মত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে লাগিল, তাহার চাপরাসী, বরকলাঙ্গ আদিল, এবং তাহার আলি খাজা ও সদাগর সাজাইয়া দুই জন বালককে তাহার নিকট উপস্থিত করিল।

তখন সেই নকল কাজী মহা গভীরভাবে নকল আলি খাজাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “আলি খাজা, তোমার এই আসামীর বিরুদ্ধে কি নালিশ?” নকল আলি খাজা নালিশের কারণ অনতিরঞ্জিতভাবে অবিকল সেই কাজী অভিনেতার নিকট বলিল। কাজী বিশেষ মনোযোগের সহিত অভিযোগ শুনিয়া সদাগরকে বলিল, “ওহে সদাগর, তুমি আলি খাজার হাজার মোহর কেন তাহাকে প্রদান করিতেছ না?” আসল সদাগর আসল কাজীর নিকট উপস্থিত হইয়া যে ভাবে আত্মসমর্থন করিয়াছিল, নকল সদাগর নকল কাজীর নিকটও সেই ভাবে আত্মসমর্থন করিল। অবশেষে সে আলার দিবা দিয়া বলিল, “আমি এই হাঁড়া স্পর্শও করি নাই।”

নকল কাজী বলিল, “আলার শপথ এখন রাখিয়া দাও, আমি আগে জলপাইয়ের সেই হাঁড়া দেখিতে চাই। আলি খাজা, তুমি হাঁড়া সঙ্গে আনিয়াছ?”

নকল আলি খাজা বলিল, “খোদাবন্দ, তুমি হইলে এখনই আনিতে পারি।”—তুকুম হইল, “অবিলম্বে লইয়া এসো।”

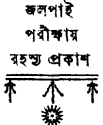
আলি খাজার অংশের অভিনেতা তখন কিছু কালের জন্য বিচারস্থান হইতে অস্থগিত হইল, তাহার পর একটু হাঁড়া আনিয়া সে বলিল, “হুজুর, এই হাঁড়া আমি সদাগরের কাছে গচ্ছিত রাখিয়াছিলাম।” হাঁড়ার মুখ বন্ধ ছিল। নকল কাজী জিজ্ঞাসা করিল, “কেমন হে সদাগর, তুমি এই হাঁড়াই গচ্ছিত রাখিয়াছিলে?”—নকল সদাগর মাথা নাড়িয়া সে কথা সমর্থন করিল।

নকল কাজী বলিল, “হাঁড়া খোল।”—তৎক্ষণাৎ হাঁড়ার মুখপাত্র অপদারিত হইল, নকল কাজী কতকগুলি জলপাই তাহার ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়া একটি জলপাই চর্কণ করিয়া বলিল, “এ অতি উৎকৃষ্ট জলপাই, এখনও কিছুমাত্র বিবাদ হয় নাই, আমার বিশ্বাস, সাত বৎসর যে জলপাই হাঁড়ার মধ্যে আছে, তাহা বর্জন এমন টাটকা থাকিতে পারে না। কয়েক জন জলপাই-ব্যবসায়ীকে ডাকিয়া আন, তাহারা এ মাল বাচাই করুক।” তৎক্ষণাৎ দুই জন বালককে সেই নকল কাজীর সম্মুখে আনয়ন করা হইল, কাজী অত্যন্ত গভীরভাবে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল, “তোমরা জলপাই খাইয়াছ?” বালকদ্বয় বলিল, “হাঁ হুজুর।” কাজী পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিল, “জলপাই ক’ বৎসর খাড়াপযোগী থাকে?” জলপাই-ব্যবসায়িকদ্বয় বালকদ্বয় বলিল, “যতই যত্নে রাখা যাক, জলপাই তৃতীয় বর্ষের পর আর খাড়াপযোগী থাকে না, তাহার পর ফেলিয়া দিতে হয়, কোনই কাজে লাগে না।”

নকল কাজী বলিল, “তোমরা মিথাকথা বলিতেছ, ফরিয়াদী আলি খাজা বলিতেছে, সে এই আসামীর নিকট সাত বৎসর পূর্বে এক হাঁড়া জলপাই গচ্ছিত রাখিয়াছিল। হাঁড়ার মধ্যে জলপাই আছে, তোমরা তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার, তাহা সম্পূর্ণ টাটকা আছে।”

নকল জলপাই-ব্যবসায়িকদ্বয় হাঁড়া হইতে দুই একটি জলপাই তুলিয়া লইল, এবং তাহা চর্কণ করিয়া বলিল, “হুজুর, এ অতি অসম্ভব কথা! এই সকল জলপাই এই বৎসরের ফল। আমরা কেন, সহরের যে কোন জলপাই-ব্যবসায়ীই এ কথা বলিবে। আপনি বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।” আসামী সদাগর এই কথায় প্রতিবাদ করিতে বাইবে, এমন সময় নকল কাজী তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, “চোপন্নও বদমাস, তুই চোর, তোর কাঁদার হুকুম হইল।” বিচারকের এই আদেশে বালকগণ করতালি দিয়া আসামী সদাগরকে বালককে যেন কাঁদা দিতে লইয়া বাইতেছে, এই ভাবে তাহাকে টানিয়া লইয়া শেল।

খানিক হারুণ-অল-রসিদ সেই বালক বিচারকের বুদ্ধির ক্ষমতা ও বিচারনৈপুণ্য সন্দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, তিনি শিলাখণ্ড হইতে গাত্রোধান করিয়া, উজীরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “জাফর, এই বালকের



বালকের
বিচার-
নৈপুণ্যের
প্রকাশ



বিচারপ্রণালী দেখিলে, তোমায় এ বিষয়ে মত কি ?" জাফর বলিলেন, "জাঁহাপনা, আমি এই বালকের এত অল্পবয়সে বিচারনৈপুণ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি।"

খালিক বলিলেন, "আসল আলি খাজা আজ আমার নিকট এই মকদ্দমার বিচারের জন্য প্রার্থনা করিয়াছে, আগামী কল্য আমাকে এ মামলার রায় প্রকাশ করিতে হইবে। তুমি কি মনে কর, এই বালক যে ভাবে বিচার করিল, ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিচার আমার দ্বারা সম্ভব হইতে পারে ?" উজ্জীর বলিলেন, "যদি ঘটনা ঠিক এইরূপ হয়, তাহা হইলে ইহা ভিন্ন অন্তরূপ বিচার কখনও সম্ভবপর হইবে না।" খালিক বলিলেন, "এই স্থানটি ঠিক করিয়া রাখ, সে বালকটি আজ বিচার করিল, কাল তাহাকে আমার সম্মুখে হাজির করিও। কাল আমি আসল মামলার বিচারভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিব, আমার সম্মুখে বসিয়া



বালক-
বিচারক
আস্থান



সে বিচার করিবে। তুমি আলি খাজাকে বলিবে, যে যেন তাহার জলপাইয়ের হাঁড়। আমার নিকট উপস্থিত করে, আর যে কাজী এই মামলার বিচার করিয়া পূর্বে আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহাকেও আমার সম্মুখে হাজির থাকিতে বলিবে, যে যেন বালকের নিকট বিচারকৌশল শিখিয়া ভবিষ্যতে সাধন হয়। তুমি দুই জন জলপাই-ব্যবসায়ীকেও বিচারমতায় উপস্থিত রাখিবে।"

পরদিন প্রভাতে উজ্জীর বালক-গণের পূর্বকথিত বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া গৃহস্থানীর অস্থম্মান করিলেন, কিন্তু তিনি শুনিলেন, গৃহস্থানী স্থানান্তরে গিয়াছেন, এবং তিনি গৃহস্থানীর জীর সহিত সাক্ষাৎ

করিলেন, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছেলে আছে কি ?" রমলী বলিল, "আমার তিন পুত্র।" সে পুত্রগণকে উজ্জীরের সম্মুখে উপস্থিত করিল। উজ্জীর জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎসগণ, কাল সন্ধ্যায় তোমরা যে খেণা করিতেছিলে, তাহাতে কে কাজী সাঝিয়াছিল ?"—বড় ছেলেটি লজ্জিত অবনতমুখে বলিল, "সে আমি।" উজ্জীর বলিলেন, "বাবা, তুমি আমার সঙ্গে এস, খালিক হারুণ-অল-রসিদ তোমাকে একবার দেখিতে চান।"

উজ্জীরের কথা শুনিয়া বালকের মাতা অত্যন্ত ভীত হইল। সে বলিল, "মহাশয়, আমার ছেলেটি এমন কি অপরাধ করিয়াছে যে, খালিক তাহাকে লইতে পাঠাইয়াছেন ? আপনি দয়া করিয়া উহাকে ছাড়িয়া দান, উহাকে কাছছাড়া করিলে আমি বাঁচিব না।" উজ্জীর বালকের মাতাকে অনেক আশা-ভরসা দিয়া বলিলেন, "তোমার কোন ভয় নাই, তোমার ছেলেকে শীঘ্রই তোমার কাছে দিয়া বাইব। আমি যে কেন তাহাকে

খালিকের নিকট লইয়া যাইতেছি, তাহা তোমার ছেলে কিরিয়া আসিলে তাহার মুখেই শুনিতে পাইবে। ইহাতে তোমার মনে আনন্দ ভিন্ন দুঃখ হইবার কোন কারণ নাই।”

উজীরের কথা শুনিয়া বাগকের মাতার ভয় দূর হইল, সে পুত্রের পরিচ্ছদ পরিবর্তন করাইয়া, উজীরের সঙ্গে পুত্রকে খালিকের সন্নিকটে প্রেরণ করিল।

উজীর বালকটিকে খালিকের নিকট বিচারসভায় উপস্থিত করিলেন। খালিককে দেখিয়া ও রাজদরবারের বিরাট ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া বালক ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। খালিক তাহাকে ঘিটবাক্যে বলিলেন, “বৎস, তোমার কোন ভয় নাই, তুমি আমার কাছে এস, কাল রাত্রে তুমি কি আলি খাজার মামলার বিচারের অভিনয় করিয়াছিলে? তোমার বিচারশক্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি।” বালক বলিল, “শোদাবন্দ, আমিই সেই নকল বিচার করিয়াছিলাম।” খালিক বলিলেন, “বৎস, আজ আমার বিচারসভায় তুমি আসল আলি খাজা ও আসল সদাগরকে দেখিতে পাইবে, আমার পাশে আসিয়া বসো।”

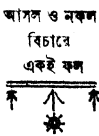
খালিক সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সেই বালককে তাঁহার পাশে উপবিষ্ট করাইলেন। তাহার পর আসামী ও করিয়াদার ডাক হইল। তাহার খালিকের সিংহাসন-সমীপে অবনত হইয়া খালিককে অভিবাদন করিল, তাহার পর গাত্রোখান করিল। খালিক বলিলেন, “তোমরা তোমাদের বক্তব্য বলিতে পার, এই বালক তোমাদের মামলার বিচার করিবে। যদি তাহার বিচারে কোন ভ্রম হয়, তাহা হইলে আমি তাহা সংশোধন করিয়া দিব।”

আলি খাজা ও সদাগর স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করিলে, সদাগর বলিল, “আলার দিবা, কখনও আমি উহার জলপায়ের হাঁড়া স্পর্শ করি নাই।” বিচারক বালকটি গভীরভাবে বলিল, “আলার কসমে কোন আবত্তক নাই, আমি আগে জলপাইপূর্ব সেই হাঁড়াটি দেখিতে চাই।” আলি খাজা জলপাইপূর্ব হাঁড়াটি খালিকের পদপ্রান্তে স্থাপন করিল। খালিক সেই হাঁড়ার মধ্য হইতে একটী জলপাই তুলিয়া লইয়া তাহা দংশন করিলেন, অনন্তর জলপাইগুলি কয়েক জন হৃদক জলপাই-বাবসায়ীকে দেখান হইল, তাহার বলিল, সে জলপাইগুলি সেই বৎসরেরই ফল। বালকটি তাহাদিগকে বলিল, “আলি খাজা কি এই জলপাইগুলি সাত বৎসর পূর্বে সেই সদাগরের নিকট পছিত রাখিয়াছিল, এ বিষয়ে তোমাদের কি বলবার আছে?” নকল জলপাই-বাবসায়ীগণ ইহাতে যে উত্তর দিয়াছিল, আসল জলপাই-বাবসায়ীগণও সেই উত্তরই প্রদান করিল।

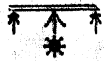
সদাগর আশ্চর্যমর্শনের চেষ্টা করিতে উদ্ভত হইলে, বালক-বিচারপতি তাহাকে বাধা দিয়া খালিককে বলিল, “জাহাপনা, ইহা খেলা নহে; সুতরাং দণ্ডদানের ভার আমি গ্রহণ করিতে পারি না, কাল খেলাচ্ছলে বাহা করিয়াছিলাম, আজ তাহা করিবার সাধ্য আমার নাই।”

খালিক সদাগরের বিশ্বাসঘাতকতা স্বরণ করিয়া, তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন, দণ্ডাভ্যন্তর পূর্বে সদাগর তাহার অপরাধ স্বীকার করিয়া আলি খাজাকে তাহার সহস্র মোহর প্রতাপ্ত করিল। বিচারান্তে খালিক তাঁহার অকর্ণ্য্য কাজীকে তীব্র ভৎসনা করিয়া সেই বালকের নিকট বিচারপ্রণালী শিখিবার আদেশ করিলেন; কাজী ভয়, বিস্ময়, লজ্জা ও অপমানে নতমস্তকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। খালিক বালকটিকে আলিঙ্গনদান করিয়া তাহাকে একশত স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দান করিয়া গৃহে পাঠাইলেন।

শাহারজাদার এই গল্প শুনিয়া জুলতান শাহরিয়ার বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়া, নূতন গল্প আরম্ভ করিবার জগু তাহাকে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে শাহারজাদী নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলিতে আরম্ভ করিলেন।



মহা-
অশ্ব-
কাহিনী



পারভদ্রেশে বসন্তকালে নোরোজের উৎসব জ্ঞাপিত প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ উৎসব। মুসলমানধর্মের উৎপত্তির পূর্বে পৌত্তলিকভায়ে প্রচলনকালে এই উৎসবের সূত্রপাত, মুসলমানধর্মের অভ্যাসেও এই উৎসব রহিত হয় নাই, দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে ইহা প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। পারভদ্রেশে এমন নগর—এমন গ্রাম ছিল না, যেখানে নোরোজ উৎসবের আনন্দছটা বিকীর্ণ না হইত।

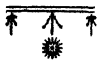
বিভিন্ন দেশের অনেক শিল্পী এই সময়ে পারভদ্রাজের সমীপে তাহাদের শিল্পত্ব প্রদর্শনার্থ লইয়া আসিত, রাজা তাহাদিগকে উৎসাহ-প্রদানে ক্রটি করিতেন না। উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি পছন্দ হইলে অনেক অধিক মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া লইতেন।

একবার এক জন ভারতীয় শিল্পী এই নোরোজ উৎসবের সময় পারভদ্রাজের সভায় এক কৃত্রিম অশ্ব লইয়া আসিল। অশ্বটি লাগাম-বলগায় সুসজ্জিত, দেখিয়া অকৃত্রিম অশ্ব বলিয়াই ভ্রম হয় শিল্পী পারভদ্রাজের সিংহাসনপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া পতীর ভক্তিতে তাহার চরণবৃগল বন্দনা করিয়া বলিল, “শাহানু শাহা, যদিও আমি বহুদূর হইতে আপনার গৌরবপূর্ণ সিংহাসনচ্ছায়ায় আমার শিল্পত্ব লইয়া আসিয়াছি, তথাপি আমার জন্মভূমির দূরত্বের জন্যই যে আপনার অমুগ্ধভাজন হইব ও নিকটস্থ যোগাশিক্ষণ উপেক্ষিত হইবে, ইহা আমি কদাচ আশা করিতে পারি না, আমার অভিপ্রায়ও সেজন্য নহে; আপনি এমন অকৃত পদার্থ কখনও দর্শন করেন নাই, এ কথা আমি সাহস সহকারে বলিতে পারি।”

রাজা বলিলেন, “ধাম বাপু, অত বক্তৃতায় আবশ্যক নাই, আমি কথায় ভুলি না। তুমি যে বোড়া আনিয়াছ, ইহাতে কি অসাধারণ আছে, তাহা ত’ বুঝিতেছি না, অবশ্য বোড়াটি বেশ, যেন জীবন্ত বোড়া, এমন বোড়া নির্মাণ কিছু কঠিন হইতে পারে, কিন্তু একেবারে অসম্ভব নহে। আর এক জন শিল্পীও এ রকম একটি বোড়া প্রস্তুত করিতে পারিত, সেও আমার নিকট পুরস্কারের প্রার্থনা করিতে পারিত।”

ভারতবাসী কারিকরটি বলিল, “রাজন, আপনি কেবল ইহার অঙ্গশৌভব দেখিয়াই শিরনৈপুণ্যের বিচার করিবেন না, ইহা দেখিতে ঠিক জীবিত অশ্বের স্তায় হইয়াছে, অতএব আমি পুরস্কার ইচ্ছা করি, ইচ্ছাও আমার অভিপ্রায় নহে। ইহার গুণের প্রতি আপনার কিঞ্চিৎ লক্ষ্য করিতে হইবে। আমার এই অশ্বের গুণ অতি অদ্ভুত, যদি আমি ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করি, তাহা হইলে আমি পৃথিবীর যে অংশেই থাকি না কেন, আমি ইচ্ছামাত্র আমার অভিপ্রেত স্থানে উপস্থিত হইব। আমার অশ্বের এই অদ্ভুত গুণ অজ্ঞাত হুলত কি না, তাহা আপনারাই বিচার করিবেন।”

বিশ-ভ্রমণে
শক্তিমান
কৃত্রিম অশ্ব



শিল্পীর সূত্রে এই সকল কথা শুনিয়া, রাজার মনে বিশ্বাসের সীমা রহিল না। তিনি অশ্বটি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিলেন, কিন্তু কোনই বিশেষত্ব দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে তিনি শিল্পীকে বলিলেন, “তোমার কথা বড় অদ্ভুত বটে, কিন্তু ইহা সত্য কি না, প্রমাণের আবশ্যক। যদি আমার সমুপে একবার প্রমাণ দিতে পার, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিব, এমন অদ্ভুত অশ্ব আমি জীবনে দেখি নাই, তোমার স্তায় বিচরণ শিল্পীও ভূমণ্ডলের কৃত্রাপি নাই।”

রাজা এই কথা বলিবামাত্র শিল্পী অশ্ব আরোহণ করিয়া স্রিকাবদলে পদ প্রবেশ করাইল, তাহার পর পারভদ্রাজকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজ, অশ্বকে কোথায় পরিচালিত করিব, আদেশ করুন?”

শিরাঙ্গ নগরের পাঁচ কোশ দূরে একটি উচ্চ পর্বত ছিল, রাজপ্রাসাদ হইতে এই পর্বত দৃশ্যশৃঙ্খল দৃষ্টি-গোচর হইত, রাজা সেই পর্বতট শিল্পীকে দেখাইয়া বলিলেন, “ঐ যে পর্বত দেখিতেছ, তুমি ঐ পর্বতে

অথটিকে লইয়া গিয়া, সেখান হইতে কিরিয়া এসো, পর্ততটি অধিক দূরবর্তী না হইলেও ইহাতেই তোমার অখের ক্ষমতা পরীক্ষিত হইবে। তুমি যে সে স্থানে গিয়াছিলে, তাহার প্রমাণস্বরূপ ঐ পর্ততের পাদদেশে যে তাণপাছ আছে, তাহারই একটি শাখা ভাঙ্গিয়া আনিবে।”

রাজা এই কথা বলিবামাত্র শিল্পী অখের গলদেশস্থ একটি হাতলে মোড়কা দিল, আর অখটি তাহাকে পিঠে লইয়া বিদ্যাবক্ষেণে আকাশে উঠিল, এবং চকুর নিমিষে সেই পর্ততাভিমুখে ধাবিত হইল। রাজা ও তাঁহার মন্ত্রিগণ এই দৃষ্ট দেখিয়া বিস্ময় দমন করিতে পারিলেন না।

কিয়ৎকাল পরে তাঁহার। দেখিতে পাইলেন, শিল্পী সেই অখে আরোহণ করিয়া তালবৃক্ষের একটি শাখা লইয়া, শূন্যপথে মহা বেগে রাজধানী-অভিমুখে ধাবিত হইতেছে। অখ অবিলম্বে রাজসভায় অবতরণ করিল, দর্শকগণ সকলে মহানন্দে অর্থনিষ্ঠাটাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল।

রাজা অখটি ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, শিল্পীকে বলিলেন, “তোমার বোড়া দেখিয়া উহার অসাধারণ কিছুই বুঝিতে পারা যায় না বটে, কিন্তু তুমি ইহার যে গুণ প্রত্যক্ষ করাইলে, তাহা অতি অদ্ভুত ও অসাধারণ। আমি অখটি ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত আছি।”

শিল্পী উত্তর করিল, “মহারাজ, আপনি যথার্থ গুণজ্ঞ ব্যক্তি, আপনি আমার অখের গুণপনার পরিচয় পাইয়া আমার প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিলেন, তাহা আপনাই যোগ্য। কিন্তু এই অখ আপনাকে প্রদান করিবার পূর্বে আপনাকে একটি অঙ্গীকার-পাশে আবদ্ধ হইতে হইবে। আমি দশম এই অখ বাহার নিকট পাইয়াছি, সে আমাকে ইহা বিক্রয় করে নাই, আমি তাহাকে আমার একমাত্র কন্যা দান করিয়া ইহা লাভ করিয়াছি, সেই ব্যক্তি আমাকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়াছে যে, এই অখ আমি কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে পারিব না, তবে ইহার পরিবর্তে আমার ইচ্ছানুসারে অন্য যে কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে পারি।”

রাজা বলিলেন, “ইহার পরিবর্তে তুমি আমার নিকট যে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে, তাহাই আমি তোমাকে প্রদান করিব। আমার রাজ্য স্থবিত্তীর্ণ, তাহাতে অনেক জনপূর্ণ নগর আছে, যে কোন নগর তুমি চাহিবে, তোমাকে আজীবনকাল ভোগ করিবার জন্য তাহা প্রদান করিব।”

রাজসভার সমস্ত লোক একবাক্যে স্বীকার করিল, রাজার এই উক্তি যথার্থই রাজোচিত হইয়াছে; কিন্তু অখবানী এ প্রস্তাবে সন্মত হইল না, সে বলিল, “মহারাজ, আপনার দানশীলতা ও সন্মানভার পরিচয়ে আমি মুগ্ধ হইলাম, কিন্তু আমি এই দানের পরিবর্তে অখটি আপনাকে প্রদান করিতে পারিতেছি না। আপনার কন্যা—রাজকুমারীকে যদি আপনি আমার হস্তে জীর্ণপে সম্প্রদান করেন, তাহা হইলে আপনার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারি।”

অখবানীর এই অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া সভাসদগণ হো হো করিয়া হাসিতে লাগিল। রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র যুবরাজ কিরোজ শাহ এই প্রস্তাব শুনিবামাত্র ক্রোধে ও ক্রোড়ে উদ্ভ্রান্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন, কিন্তু রাজা এই প্রস্তাবে অগ্রগর হইলেন না, তিনি ভাবিলেন, ইহার হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিয়া যদি অখটিকে হস্তগত করিতে পারা যায়, তাহাও কর্তব্য।

ফিরোজ তাঁহার পিতার অভিপ্রায় বুলিলেন, রাজা যদি এই অভিপ্রায় অনুসারে কাজ করেন, তাহা হইলে রাজবংশের বোর অপমান ও কলঙ্ক ঘোষিত হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত অস্বীকৃত হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার পিতা কোন মতামত প্রকাশ করিবার পূর্বেই তিনি পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “বাবা, আপনি এই অভদ্র, অজ্ঞাত-বংশোদ্ভব, বৈদেশিকের প্রস্তাবে সন্মত হইলে আর আমাদের মানসম্মত কিছুই থাকিবে না, বংশগৌরবের কথা চিন্তা করিয়া আপনার মতামত প্রকাশ করিবেন, ইহাই প্রার্থনা।”



রাজ-সৌরব
বিস্ময়নে
আপত্তি



রাজপুত্র অদৃষ্ট



রাজা বলিলেন, “পুত্র, তুমি যে কথা বলিতেছ, তাহা সৎসজাত স্তম্ভনোরই উপযুক্ত বটে; পদসৌরব ও দীক্ষা যেরূপ, তাহাতে তোমার মুখেই এ কথা শোভা পায়। কিন্তু তুমি অশ্বটির অসাধারণব্ধের কথা একবার চিন্তা করিলে না! যদি আমি উহার প্রস্তাবে স্বীকৃত না হই, অশ্বস্বামী অস্ত্র কোন রাজার রাজ্যে গমন করিয়া, এই প্রস্তাব উপস্থিত করিবে এবং সেই রাজ্যের রাজকন্ডার পরিবর্তে এমন একটি অমূল্য সামগ্রী প্রদান করিবে। অস্ত্র কোন রাজা যে আমার অপেক্ষা অধিক দানশীলতা দেখাইয়া এই সামগ্রী হস্তগত করিবে, আমি বাহা গ্রহণ করিতে পারিলাম না, তাহাই অধিকার করিয়া বলিবে, ইহা আমি সন্তুষ্ট করিতে পারিব না। আমি অবশ্য এখনই যে অশ্বস্বামীর প্রস্তাবে সন্মতি প্রকাশ করিতেছি, তাহা নহে; সন্তুষ্ট করিতে পারিব না। আমি অবশ্য এখনই যে অশ্বস্বামীর প্রস্তাবে সন্মতি প্রকাশ করিতেছি, তাহা নহে; সে বাহা চাহে, তাহার মূল্য অশ্ব অপেক্ষা অনেক অধিক; আমি বাহাতে অস্ত্র কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অশ্বটি হস্তগত করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করি বলাই বাহুল্য।”

এই কথাপকথন যদিও অশ্বস্বামী শুনিতে পাইল না, তথাপি রাজার মুখের ভাব দেখিয়া তাহার অস্থান হইল, রাজা এই প্রস্তাবে তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইল না, স্তম্ভন রাজপুত্র যদিও এই প্রস্তাবে বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, তথাপি তাঁহার মত পরে পরিবর্তিত হইতে পারে। রাজপুত্রের মন নমন করিয়া; জ্ঞাত অশ্বস্বামী ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহাকে একবার অশ্বটিতে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল; কিন্তু সে অশ্বের গতি পরিচালিত করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে উপদেশ করিবার পূর্বেই রাজপুত্র অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন, এবং রিকাবদলে পদব্ধ প্রবেশ করাইয়া হাতল ঘুরাইয়া দিলেন। অশ্ব তৎক্ষণাৎ তীরবেগে রাজসভা হইতে একদিকে ধাবিত হইল, এবং মহুর্ন্তমধ্যে সকলের অদৃষ্ট হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র কিঞ্চিৎ অশ্ব ফিরিল না, রাজা পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হইল না। অবশেষে অশ্বস্বামীর মনে অন্তঃস্থ ভয়ের সঞ্চার হইল, সে রাজসিংহাসনের পাদদেশে মন্তক পা করিয়া বলিতে লাগিল, “মহারাজ, আপনি বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, রাজপুত্র ব্যগ্রতা বশত উপদেশে কর্ণপাত না করিয়াই অশ্ব আরোহণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছেন, আমাকে অশ্ব আরোহণ করিতে ও হাতল ঘুরাইয়া অশ্ব পরিচালন করিতে দেখিয়াই তিনি অস্থান করিয়াছেন, আর কোন উপদেশে প্রয়োজন নাই, কিন্তু আমার উপদেশ ভিন্ন তিনি অশ্ব ঘুরাইয়া গিয়া প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবেন, তাহা সম্ভাবনা দেখি না। আমাকে আপনি অগ্রহ করিয়া একজ্ঞ অপরাধী করিবেন না।”

অশ্বস্বামীর কথা শুনিয়া রাজা বিস্ময়িত, তাঁহার পুত্রের বিপদ অনিবার্য; কিন্তু তিনি পুত্রের জ্ঞান দেখিয়াও দেখিতে পাইলেন না, অশ্বস্বামীরই ক্রটি দেখিলেন, তখন রোষকষায়িতনয়ে বলিলেন, “তুমি কেন তাহাকে পূর্বে বলিলে না?”

অশ্বস্বামী বলিল, “মহারাজ, দেখিলেন ত’ অশ্ব ক্রিপণ বেগবান্, তিনি আমাকে উপদেশপ্রদানের অবদরই দিলেন না। অশ্ব আকাশে উঠিবার পর আর তিনি আমার কথা শুনিতে পাইতেন না, শুনিলেও অশ্ব ফিরাইতে পারিলে না। বাহা হউক, রাজপুত্রের প্রত্যাগমনের এখনও কিঞ্চিৎ আশা আছে, আর একটা হাতল আছে, সেটি ঘুরাইয়া অশ্ব আর উদ্ধারিত না উঠিয়া পৃথিবীর দিকে নামিতে থাকিবে। রাজপুত্র যদি বুদ্ধি খাটাইয়া সেই হাতল ঘুরাইতে পারেন, তাহা হইলে আকাশপথ হইতে পৃথিবীতে অবতরণ করিলে আর বিপদের কোন আশঙ্কা থাকিবে না।”

অশ্বস্বামীর এইরূপ প্রবোধবাক্য শুনিয়াও রাজা মনে বিমুগ্ধতার সান্নিধ্য লাভ করিতে পারিলেন না পুত্রের বিপদভয়ে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, “তুমি যেরূপ বলিতেছ, তাহাতেই বা বিপদে সম্ভাবনা অল্প কোথায়? ঘোড়া পৃথিবীর দিকে নামিতে নামিতে হঠাৎ পূর্বতের উপর পড়িতে পারে

সমুদ্রেও পড়িতে পারে, তাহা হইলে ত' কোনক্রমেই তাহার প্রাণরক্ষা হইবে না।" অশ্বখামী বলিল, "মহারাজ, আমার এ অশ্ব অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া যায়, সমুদ্রে পড়িবার কোন আশঙ্কা নাই, বিশেষতঃ আরোহী যে স্থানে বাইতে চাহে, অশ্ব তাহাকে সেইখানেই লইয়া যায়।" রাজপুত্র একটা স্তম্ভাশ্রমস্থানে নামিয়া সেখানে নিজের পরিচয় দিলেই ত' নিরাপদ হইতে পারিবেন।"

রাজা বলিলেন, "তুমি যে সকল স্তম্ভ দেখাইতেছ, তাহা কার্যে পরিণত হইবার সম্ভাবনা কতটুকু আছে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমি আদেশ করিতেছি যে, তিন মাসের মধ্যে যদি রাজপুত্র এ রাজ্যে প্রত্যাপন না করেন কিম্বা তাহার কুশলসংবাদ শুনিতে না পাই, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণদণ্ড করিব।" অনন্তর রাজার আদেশে প্রহরীগণ অশ্বখামীকে ধরিয়া কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। রাজা অতি বিষন্নমনে নৌরোজের উৎসবে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে রাজপুত্র কিরোজ শাহ অথবা আরোহণ করিয়াই বিদ্যাদগতিতে উদ্ধাকাশে ধাবিত হইলেন। এত দ্রুত অশ্ব চলিতে লাগিল যে, আধঘণ্টার মধ্যেই আকাশের অন্ত্য উর্দ্ধে উঠিল, সেখান হইতে পৃথিবীর কোন বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি উচ্চ পর্বতশ্রেণীও তাহার নিকট অতি ক্ষুদ্র বস্তুকল্পে প্রায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি সেই উদ্ধাকাশ হইতে অবতরণ করিবার নিমিত্ত উৎসব হইলেন, কিন্তু ক্রমশে নামিতে হইবে, তাহা কিছুই জানিতেন না। সে বিষয়ে অশ্বখামীর উপদেশ গ্রহণ করেন নাই, স্তব্ধতা তিন একটা উপায় উদ্ভাবনের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি বিপরীতদিকে সেই হাতালা ঘুরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা ঘুরিল না। বোড়া ক্রমে আরও উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তখন রাজপুত্র ভয়ে অভিভূত হইলেন। তিনি অশ্বখামীর উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া যে কি অজ্ঞান কার্য করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন, তাহার মনে অসুস্থতাপের সঞ্চার হইল। যাহা হউক, ভয়ে তিনি হতবুদ্ধি হইলেন না, তিনি অশ্বের গ্রীবাভাগ বিশেষ মনোযোগের সহিত পরীক্ষা করিতে করিতে অজ্ঞ করণের পার্শ্বে আর একটা হাতল দেখিতে পাইলেন, সেই হাতলটা ঘুরাইবামাত্র অশ্ব পৃথিবীর দিকে অবতরণ করিতে লাগিল।

রাজপুত্র যে সময় পৃথিবীর দিকে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন আধঘণ্টা রাত্রি হইয়াছিল, কিন্তু তিনি অতি উর্দ্ধে ছিলেন বলিয়া রাত্রি অস্পষ্ট করিতে পারেন নাই। পশ্চিম-আকাশে তখনও অন্তাচলোদ্গুপ্ত তপনকে দেখা যাইতেছিল, রাজপুত্র দ্রুতবেগে অবতরণ করিতে লাগিলেন; দেখিলেন, তপনও সেইরূপ দ্রুত অন্তাচলপথে ধাবিত হইতেছেন, ক্রমে চতুর্দিক অন্ধকারজালে সমাক্রম হইল, অবশেষে রাজপুত্র আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। অশ্ব পর্বতশৃঙ্গে পতিত হয় কি সমুদ্রের উপরেই অবতরণ করে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া রাজপুত্র অন্ত্য উত্তম্ব হইলেন,—মধ্যরাত্রে অশ্ব স্থির হইল।

অশ্ব স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইবামাত্র রাজপুত্র কিরোজ শাহ অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সমস্ত দিন কিছু আহার হয় নাই, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় তিনি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি কোথায় নামিয়াছেন, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না, ইতস্ততঃ পাদচারণা করিয়া তিনি বুঝিলেন, তিনি অতি প্রকাণ্ড প্রাসাদের ছাদে অবতরণ করিয়াছেন। ছাদটি প্রান্তরের ঠায় প্রশস্ত, তাহার চতুর্দিকে এক বৃক উচ্চ প্রাচীর। রাজপুত্র ঘুরিতে ঘুরিতে সোপানশ্রেণী দেখিতে পাইলেন, একটি ঘাঘর নিম্ন হইতে সোপানশ্রেণী নিরানুসরণে কোন নিম্নতলবর্তী প্রাসাদ-কক্ষে চলিয়া গিয়াছে, দ্বারটি অর্দ্ধোন্মুক্ত।

এরূপ অন্ধকার রাত্রিতে সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া, অজ্ঞ কোন ব্যক্তি কখনই এই সোপানশ্রেণী অবলম্বন করিয়া, অপরিচিত প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না, কিন্তু রাজপুত্রের মনে



বিন্দুবার ভয়ের স্ফার হইল না। তিনি অর্ধোন্মত্ত হারপথে অবতরণ করিতে করিতে ভাবিলেন,—‘আমি তা’ এখানে ইচ্ছা করিয়া আসি নাই, কাহারও অপকারের চেষ্টাতেও আসি নাই, আমার হাতে কোন প্রকার অস্ত্রও নাই, স্তম্ভাং আমার সহিত প্রথমে বাহাদুরের দেখা হইবে, তাহার। আমার অনধিকার প্রবেশের জন্য প্রাণবধের চেষ্টা না করিয়া অবশ্যই আমার কথা শুনিবে।’ পাছে প্রাণাশঙ্ক কাহারও নিত্ৰাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কার অন্ধকারময় সোপানশ্রেণী বহিয়া তিনি অতি সাবধানে ও নিশ্চেষ্টে অবতরণ করিতে লাগিলেন। তিনি অনেকক্ষণ পরে একটি প্রশস্ত কক্ষ দেখিলেন; দেখিলেন, কক্ষদ্বার উন্মুক্ত, কক্ষমধ্যে একটি আলোক জ্বলিতেছে।

রাজপুত্র দ্বার প্রান্তে উপস্থিত হইয়া, ঘরে কোন লোক জাগরিত আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু নিত্রিতের অক্ষুট নাগিকাধ্বনি ভিন্ন আর কোন প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলেন না।



নাগ-গর্জনের বিভিন্ন সুর শুনিয়া বুঝিলেন, ঘরে একাধিক মহিষা নিদ্রিত রহিয়াছে; তিনি আরও কিয়দূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ কান্দ্রী খোজা কোষ-যুক্ত-তরবারি পার্শ্বে রাখিয়া নিদ্রা বাইতেছে। তখন তিনি বুঝিলেন, এই সকল ভূতা রাজকন্তার অন্তর বন্ধা করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে রাজপুত্র এক রাজকন্তার অন্তরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রাজকন্তার কক্ষ প্রহরিগণের কক্ষের পরই অবস্থিত। রাজপুত্র দেখিলেন, রাজকন্তার কক্ষ হইতে উজ্জল দীপালোক বিকীর্ণ হইয়া দ্বারপ্রান্তবর্তী নীলবর্ণ রেশমী পর্দার উপর

পড়িয়াছে। রাজপুত্র লবু-পদক্ষেপে সেই পর্দার নিকট উপস্থিত হইলেন, প্রহরীরা তাহা অহুত্তব করিতে পারিল না; তাহার পর তিনি পর্দা অপসারিত করিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। গৃহের সাক্ষাৎ অতি উৎকর্ষ হইলেও, রাজপুত্র সে দিকে লক্ষ্যপাত করিলেন না, তিনি দেখিলেন, কয়েকটি নিরশ্বা ও একটি সুশঙ্কিত উচ্চশ্বা; নিরশ্বায় রাজকন্তার দাসীগণ নিদ্রিত, সুশঙ্কিত উচ্চশ্বায় স্বয়ং রাজকন্তা নিদ্রা বাইতেছেন।

রাজপুত্র দ্বারপদক্ষেপে রাজকন্তার শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন, তিনি দীপালোকে রাজকন্তার নিদ্রাশয্য মুখের সৌন্দর্য্য-দীপ্তির উপর ব্যাধুষ্টি সংস্থাপন করিলেন, কিন্তু চক্ষু ফিরাইতে পারিলেন না; দেখিলেন, অতি হৃদয় একখানি মুখ, অ-চুটি তখন তুলি দিয়া অস্তিত, চক্ষুচুটি পয়কলির দ্বায় যেন নিশাগমে মুখিত হইয়া গিয়াছে,

সুন্দরী
শয্যা-
প্রান্তে

নিদ্রা-শয্য
মুখের
সৌন্দর্য্য-দীপ্তি

নৈশবাসের শিরশ্রাণ মস্তকে লইয়া পরোথরতুল্ল আপানাদিগের সমুদ্রত মহিমা ব্যক্ত করিতেছে। রাজপুত্র সেই অল্পম সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার স্বপ্নে প্রেমের হস্তাশন দাবানলের স্ফটিক করিল। তিনি মনে মনে বলিলেন,—হায়, আত্মা শেষে কি আমাকে আমার অজ্ঞাতনারে স্বন্দরীয় শয়নকক্ষে আনিয়া নারীপ্রেমের কুহকে নিক্ষেপ করিলেন। এমন বিপদে ত' কখন পড়ি নাই। কিন্তু এ কি অসাধারণ রূপ, এমন রূপ ত' কখন দেখি নাই, ইহাকে ত' জীবনে আর ভুলিতে পারিব না। চক্ষুচুটি মুদিত আছে, এখনই ইহা বধন একরূপ স্বন্দর, তখন এই চক্ষুদ্বয় উন্মীলিত হইলে যে তাহাদের সৌন্দর্য ও জ্যোতি কিরণ ভাবে ব্যক্ত হইবে, তাহা না দেখিলে জীবনই বুঝা। আমি বধন আসিয়াছি, তখন হঠাৎ এ স্থান পরিত্যাগ করিব না, শেষ পর্যন্ত দেখি, অদৃষ্টে বাহা আছে, তাহাই হইবে।

এই সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে উদ্ভ্রান্ত হইয়া, রাজপুত্র রাজকন্ডার শয্যাপ্রান্তে জাহ্ন নত করিয়া উপবেশন করিলেন, এবং রাজকন্ডার করপ্রান্তবর্তী বসনাঞ্চল ধরিয়া অতি ধীরে আকর্ষণ করিলেন। রাজকন্ডা চক্ষু খুলিয়াই তাঁহার সমুখে পরম রূপনার একটি নবীন যুবককে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু তিনি এমন বিশ্বয়াগম হইলেন যে, বিশ্বয়ের সঙ্গে ভয় তাঁহার অন্তরে স্থান পাইল না।

রাজপুত্র রাজকন্ডার নিজাভঙ্গ হইতে দেখিয়া, অবনতমস্তকে তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, তাহার পর তিনি বলিলেন, “রাজকন্ডা, আমি অত্যন্ত অদ্ভুত উপায়ে এখানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি, আমি পারত্যাগিপতির পুত্র, যদি আপন দয়া করিয়া এখন আমাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমার জীবনের আশা নাই। আমার বিশ্বাস আছে, আপনি অল্পগ্রহ করিয়া আমাকে আশ্রয় দান করিবেন। আপনার এই অপক্লম রূপে মধুর দয়া সমিস্ত্রিত না থাকিয়াই পারে না, বিধাতার রাজ্যে এমন সামঞ্জস্যের অভাব প্রায়ই দেখা যায় না।”

যে রাজকন্ডাকে পারত্যাগপুত্র এই ভাবে সম্বোধন করিয়াছিলেন, তিনি বঙ্গদেশের রাজনন্দিনী। রাজা রাজকন্ডার জন্ত এই প্রাসাদ রাজধানীর কিছু দূরে নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। রাজকন্ডা পারত্যাগপুত্রের কথা শুনিয়া মধুরস্বরে বলিলেন, “রাজপুত্র, আপনার ভয়ের কোন কারণ নাই, আপনি কোন অসভ্য রাজ্যে পদার্পণ করেন নাই, পারত্যাগ রাজ্যের জায় এ বঙ্গভূমিতেও আঁখি খেঁয়তা, সঙ্কল্পতা ও বিনয় বিয়ল নহে। আমি যে আপনাকে অভয়দান করিতেছি, তাহাই নহে, আপনি অভয়লাভের যোগ্য পাত্র, আমার প্রাসাদেই যে কেবল আপনি নিশ্চয় হইলেন, তাহাই নহে, এ বঙ্গরাজ্যের কোন স্থানেই আপনার প্রাণের আশঙ্কা নাই। আপনি আমার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করিতে পারেন।”

রাজকন্ডা রাজপুত্রকে এইরূপ কথা বলিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজকন্ডার দাসীর নিজাভঙ্গ হইল। সে প্রথমে রাজকন্ডার কক্ষ প্রকৃত দেখিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। রাজকন্ডার আদেশমাত্র দাসী অজ্ঞাত দাসীগণের নিজাভঙ্গ করিল, এবং তাঁহার আদেশে তাহার রাজপুত্রকে একটি সুসজ্জিত কক্ষে লইয়া গেল, কেহ তাঁহার জন্ত শয্যা প্রস্তুত করিতে লাগিল, কেহ বা আহাৰ্য্যাদ্যবোর আয়োজনে তৎপর হইল। অল্পকালের মধ্যেই দাসীগণ রাজপুত্রের জন্ত নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্য সুসজ্জিত করিয়া, তাঁহাকে আহারের জন্ত অহরোধ জ্ঞানাইল। রাজপুত্র আহার শেষ করিয়া শয়ন করিলেন।

রাজপুত্রের রূপবর্ণন—সৌন্দর্য ও বিনয়মন্ত্র বাক্যকৌশলে রাজকন্ডা এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি সেই মন্ত্রে শয্যা শয়ন করিয়া কেবল পারত্যাগপুত্রের কথায় ভাবিতে লাগিলেন। অনেককাল পরে দাসীরা তাঁহার কক্ষে প্রত্যাপন করিলে, তিনি রাজপুত্রের আহার ও শয়ন হইয়াছে কি না, প্রথমে তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহার পর রাজপুত্রকে তাহার কেমন দেখিল, তাহাই জানিতে চাহিলেন।



দাসী বলিল, “রাজকন্যা, আপনি রাজপুত্রকে কিরূপ মনে করিতেছেন, তাহা জানি না, তবে আমরা এইটুকু বলিতে পারি যে, আমরা এমন সুপুরুষ জীবনে দেখি নাই। আমাদের রাজা যদি এই রাজপুত্রের সহিত আপনার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করেন, তাহা হইলে বোধ্য পাত্রেরই আপনাকে সমর্পণ করা হয়। বাঙ্গালা দেশে এমন সুপুরুষ গুণবান যুবক আর নাই, এ কথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।”

দাসীর এই কথা শুনিয়া রাজকন্যা বিশেষ খ্রীতি লাভ করিলেন, কিন্তু তিনি দাসীর নিকট তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিলেন না। তিনি দাসীকে চুপ করিতে আদেশ করিয়া বলিলেন, “তোরা ভারী খোলাসুদে, বাহার প্রশংসা করিস, তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিস। যা, এখন শুইতে যা, আমার ঘুমের ব্যাঘাত করিস্ নি।”

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া রাজকন্যা নানাগারে প্রবেশ করিলেন, প্রানের পারিপাট্যে এমন ভাবে তিনি আর কখনও সময়ক্ষেপ করেন নাই, অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি দর্পণে মুখ দেখিলেন ও গাট্রে গন্ধদ্রব্য লেপন করিলেন, দাসীগণ বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহার অঙ্গমার্জনা করিল, দীর্ঘকাল পরে তাঁহার স্নান শেষ হইল।



স্নান শেষ করিয়া রাজকন্যা মনে করিতে লাগিলেন, কাল রাত্রে আমি স্পষ্টই বুকিয়াছিলাম, রাজপুত্র আমাকে দেখিয়া বড় আনন্দিত হইয়াছেন, আমার সজ্জাহীন দেহ দেখিয়াই তিনি যখন খুসী হইয়াছিলেন, তখন আমাকে সুসজ্জিত দেখিয়া তাঁহার যে আনন্দের সীমা থাকিবে না, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। রাজকন্যা সঙ্গে বহুসংখ্য হীরক-অলঙ্কার পরিধান করিলেন, কণ্ঠে কণ্ঠমালা, হস্তে বলয়, কটদেশে রত্নখচিত মেঘলা শোভিত করিয়া, মনোমোহিনী বেশে সজ্জিত হইলেন। অতি উৎকৃষ্ট চীনাগুস্তকে দেহ মণ্ডিত করিলেন, তাঁহার রূপ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। আবার তিনি দর্পণে প্রতিবিম্ব দেখিলেন, দাসীগণকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন, সৌন্দর্যের কোনখানে কোন খুঁত—সাজসজ্জার কোন অভাব আছে কি না? সকলে বলিল, “না রাজকন্যা, তোমার এ রূপে আজ ভুবন ভুলিতে পারে।” রাজকন্যা তখন দাসীকে বলিলেন, “রাজপুত্রের নিজাভঙ্গ হইয়াছে কি না দেখিয়া আয়। আর যদি তাঁহার নিজা ভাঙ্গিয়া থাকে, তবে তাহাকে বলিবি, আমি তাঁহার সঙ্গে লাক্ষ্য করিতে আসিতেছি। সাপক্ষেতর একটু বিশেষ প্রয়োজনও আছে।”

রাজপুত্র দীর্ঘকাল নিদ্রায় ক্লান্ত দূর করিয়া তখন উঠিয়া বসিয়াছিলেন, বস্ত্রপরিবর্তন করিয়া বসিবামার রাজকন্যার দাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল।



দাসীর নিকট তিনি রাজকন্যার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলে, দাসী বলিল, “রাজকন্যা আপনার নিকটেই আসিতেছেন, আমি তাঁহার আদেশানুসারে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিলাম।”

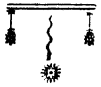
পারতন্ত্ররাজপুত্র রাজকন্যার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ইতিমধ্যে রাজকন্যা রূপের বিজলী-তরঙ্গ তুলিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন, উভয়ে তখন পরস্পরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রাজকন্যা বলিলেন, “কাল রাত্রে আপনি বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন বুকিয়াছি, অপরাধ মার্জনা করুন।” রাজপুত্র বলিলেন, “আপনার ঘুম ভাঙিয়া রাত্রে বড়ই অন্তায় করিয়াছি, আমাকে মার্জনা করুন।” রাজকন্যা দোফার উপর বসিলেন, তাঁহার প্রতি সন্মানপ্রদর্শনার্থ পারতন্ত্ররাজপুত্র কিঞ্চিৎ দূরে উপবেশন করিলেন।

অভ্যন্তরীণ উত্তরের মধ্যে আশা আশঙ্ক হইল। রাজকন্তা বলিলেন, “রাজপুত্র, আমি কাল রাতে আপনাকে আমার কক্ষে রাখিতে পারিতাম, কিন্তু আমার কক্ষে আমার খোজা ভৃত্যগণ সর্বদাই প্রবেশ করে, পাছে আপনার নিজের ব্যাঘাত হয় তাবিয়া আমি আপনার শয়নের স্থান এই কক্ষে নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, এখানে আমার অসুখতি ভিন্ন কাহারও প্রবেশের অধিকার নাই। আপনি এক্ষণে মধ্যরাতে কোথা হইতে কিরূপে আসিলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন, শুনিতে আমার বড় কৌতূহল হইয়াছে।”

রাজপুত্র রাজকন্তাকে নৌরোজ উৎসব হইতে আরম্ভ করিয়া, মায়া-অশ্বের বিচিত্র কাহিনী পর্য্যন্ত সকল কথা আন্তোপান্ত বলিলেন, তাহার পর বলিতে লাগিলেন, “রাজকন্তা, আপনি এখন স্পষ্ট বুঝিয়াছেন, আমার পিতা পারস্তাধিপতি এই অখট লাভ করিবার জন্য কিরূপ ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এ জন্য তিনি অশ্বস্বামীর নিকট অশ্বের মূল্যের কথাও তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। কিন্তু অশ্বপতি বলে যে, আমার ভগিনী রাজকন্তার সহিত তাহার বিবাহ না দিলে যে এই অশ্ব পিতার হস্তে সমর্পণ করিবে না। পিতার অমাত্যগণ অশ্বস্বামীর এই উঃসাহস দেখিয়া হাসিয়াছিল, কিন্তু পিতার ভাব দেখিয়া বোধ হইল, কন্তাদান করিয়াও তিনি এই অশ্ব লইতে প্রস্তুত। আমি তাহাকে এ ভাবে বংশের গৌরব বিসর্জন করিতে নিবেদন করিলাম। পিতা তখন ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অশ্বস্বামী আমাকে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে তাহার অশ্বের গুণ ও শক্তি প্রদর্শনের জন্য আমাকে অশ্ব আরোহণ করিতে বলিল, আমি অশ্ব-পরিচালনা-সম্বন্ধে তাহার কোন উপদেশ শ্রবণ না করিয়াই অশ্ব আরোহণ করিলাম, অশ্ব বায়েবেগে উজ্জ্বল উজ্জ্বল চলিল, ক্রমে আমি এত উচ্চ উড়িলাম যে, পৃথিবী আর দেখা যায় না, আমি নামিবার জন্য চেষ্টা করিলাম, যে হাতল ঘুরাইয়া অশ্বের গতিসংকার করিয়াছিলাম, উল্টা দিকে তাহা ঘুরাইতে লাগিলাম, কিন্তু কোনই ফল ফলিল না, অবশেষে অশ্বের কবচুলে আর একটি হাতল দেখিতে পাইলাম, তাহা ঘুরাইতেই অশ্ব নামিতে আরম্ভ করিল। আমি অনেক পরিশ্রমে অশ্বত্ব হইলাম।

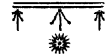
“অশ্ব ভূমিস্পর্শ করিলে আমি তাহার পৃষ্ঠদেশ হইতে অবতরণ করিলাম। আমি কোথায় আসিয়াছি, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে চাহিতে লাগিলাম, অবশেষে তাহা একটি প্রাদাদেশ ছাদ বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। সোপানের দ্বারা অর্ধমুগ্ধ দেখিয়া সোপানশ্রেণী নামিয়া প্রাদাদেশকে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম, কতকগুলি লোক নাসিকাধারি করিতেছে। বুঝিলাম, লোকগুলি নিদ্রিত, কক্ষে একটি আলো জলিতেছিল, সেই আলোকের সাহায্যে দেখিলাম, তাহাঙ্গা ভৃত্য, কালো কাস্তী, খোলা তরবারি পাশে রাখিয়া নাসিকা-গর্জন করিয়া আপনার পুরী রক্ষা করিতেছে; হস্তরাং সেই গৃহ অতিক্রম করিয়া আপনার কক্ষে উপস্থিত হওয়া আমার পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইল না। তাহার পর বাহা বাহা বটিয়াছে, তাহা সমস্তই আপনি জ্ঞাত আছেন। আপনার করুণা ও সদাশয়তাগুণেই আমি কাল রক্ষা পাইয়াছি। আপনি আমার যে উপকার করিয়াছেন, সে জন্য আমি আপনার চরণমূলে বিনামূল্যে বিক্রীত হইয়াছি; আমার আর কিছুই নাই, আছে কেবল আমার স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন, ভ্রবনমোহিনি, বাহা আছে বলিতেছি, সে স্বপ্নও কি আর আমার আছে? আপনি তাহাও আপনার ঐ শরম-রমণীয় রূপরঞ্জিতে বোধিয়া আশ্বাস করিয়াছেন, আমার আর কিছুই নাই, কিন্তু সে জন্য আমি স্থগিতও নহি, আমি তাহা আর আপনার নিকট ফিরিয়াও চাহি না। আমি আপনার হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম। আপনি আমার দেহের ও স্বপ্নের অধীশ্বরী হউন।”

গ্রেম-
নিবেদনের
হুচনা



রূপের

মোহন কালে



রাজকতা কথাগুলি শুনিয়াই বুঝিলেন, তাঁহার রূপে রাজপুত্র যুগ্ম হইয়াছেন, পারস-রাজনন্দনের প্রেম-নিবেশনে তিনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হইলেন না। তাঁহার হৃদয় যুগ্ম লক্ষ্যে আরম্ভ হইয়া উঠিল, প্রণয়ের ঘোরে তাহার যৌবনজী আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাজপুত্র নীরব হইলে, রাজকতা ধীরে ধীরে বলিলেন, “রাজপুত্র, আপনি উর্জাকালে উঠিয়া যেরূপ বিপদে পড়িয়াছিলেন, তাহা শুনিয়া আমি বড় ভীত হইলাম। তাৎক্ষণিক আপনি আমার প্রাণীদের ছায়ে নাশিয়াছিলেন; যদি আর কোথাও পড়িতেন, তাহা হইলে ত’ নানারূপ বিপদ ঘটিতে পারিত। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, এখানে আমি যে ভাবে আপনার অভ্যর্থনা করিয়াছি, অতঃপর হইবে ত’ তাহা দ্রুত হইবে। এই অভ্যর্থনার জন্য আপনি আমার দাস, এ কথা প্রকাশ করায় আমি বড় লজ্জিত হইয়াছি, আমার একটু রাগও হইয়াছে। বোধ হয়, আপনি বিনয়াতিশয়া বশতঃ এই সব কথা বলিলেন, সম্ভবতঃ ইহা আপনার মৌখিক ভদ্রতা মাত্র। তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি, আপনার পারসরাজ্যে আপনার যে আদর, যে সম্মান, আমার এখানেও আপনি তাহা অপেক্ষা অল্প আদর বা অল্প সম্মান লাভ করিবেন না। আর আপনি যে আপনার হৃদয়ের কথা বলিতেছেন, ও কথাটার উল্লেখ না করাই ভাল ছিল; কারণ, আমি স্পষ্ট বৃত্তিতে পারিতেছি, ঐ জিনিষটি হইতে আপনি পূর্বেই বঞ্চিত হইয়াছেন, কোন হৃদয়ী রাজকতা তাহা অপহরণ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার প্রকৃত সামগ্রী অপহরণ করিতে গিয়া আমি চোরের উপর বাটপাড়ী করিতে পারিব না, তাহাতে অধর্ম্ম হইবে। আমরা বাঙ্গালা দেশের মেয়ে, অধর্ম্মকে বড় ভয় করি।”

রাজপুত্র রাজকতাকে বলিতে বাইতেছিলেন,—না, আমার হৃদয় এ পর্য্যন্ত কোন হৃদয়ী কর্তৃক অপহৃত হয় নাই, আপনিই সর্বপ্রথমে ইহা অপহরণ করিয়াছেন—এমন সময় দাসী আশিয়া সংবাদ দিল, আহা! প্রস্তুত। এই কথা শুনিয়া তাঁহার হৃদয়-হরণের কথা সম্বন্ধে আন্দোলন বন্ধ করিয়া ক্ষুধা-হরণের বিষয়ে মনোযোগী হইলেন। রাজকতা রাজপুত্রের কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন, রাজপুত্রও বুঝিলেন, রাজকতা তাঁহার প্রেমকান্দে বন্দী হইয়াছেন, তাঁহার মনে অনিশ্চয়ের সীমা রহিল না।

রাজকতা দাসীর কথা শুনিয়া সোফা ত্যাগ-করিয়া উঠিলেন, রাজপুত্র কিরোজ শাহও উঠিলেন। রাজকতা তাঁহাকে বলিলেন, তিনি তত সকালে আহা! করেন না, তবে রাজপুত্রের রাগে ভাল আহা! হয় নাই বলিয়াই তিনি সকালে আহা! প্রকৃত আদেশ করিয়াছিলেন।

অতঃপর রাজকতা রাজপুত্রকে সঙ্গে লইয়া, সুসজ্জিত স্ত্রীপুত্র ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। অত্যন্ত আহার্য্য দ্রব্য আহারের স্থান পরিপূর্ণ ছিল, তাহার আহারে বসিমাত্র এক জন হৃদয়ী যুবতী দাসী আশিয়া, বাস্তব্য বাজাইয়া গান আরম্ভ করিল।

গান অতি ধীরে অতি মধুরে চলিতেছিল, তাহাতে তাঁহাদের আলাপের ব্যাধাত জন্মিল না। উভয়ে মনের স্তবে আলাপ করিতে লাগিলেন, প্রেমের বন্ধন ক্রমে নিবিড়তর হইতে লাগিল।

আহারের পর উভয়ে আর একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন, কক্ষটি নীল বর্ণে ও সুবর্ণ-রেখায় চিত্রিত। তাহার বারান্দায় একখানি সোফার উপর উপবেশন করিলেন, সমুখেই উপবন, রাজপুত্র দেখিলেন, উপবন অসংখ্য জাতীয় ফলের ও ফলের গাছ, লতা, গুল্ম, কত নুতন নুতন বৃক্ষ দেখিলেন; পারস্যদেশে সে সব বৃক্ষ নাই, সুগন্ধ ও শোভায় সকল ফুলই অতুলনীয়।



রাজপুত্র উপবনের শোভানন্দনে মুগ্ধ হইয়া, রাজকন্যাকে বলিলেন, “রাজকন্যা, আমি মনে করিতাম, পৃথিবীতে পারস্তদেশে ভিন্ন অন্য কোন দেশে বৃষ্টি স্রবের রাজপ্রাণদ, হরম্য উপবন নাই, কিন্তু আপনার এই উত্তান দেখিয়া আমি বুঝিতেছি, পৃথিবীর যেখানে বস্তু ঐশ্বর্য্যবান নরপতি আছেন, সেখানেই উৎকৃষ্ট প্রাণদ ও নরনরজন উপবনের অভাব নাই।”

রাজকন্যা বলিলেন, “রাজপুত্র, পারস্তরাজের প্রাণদ ও উপবন প্রভৃতি সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নাই, সুতরাং উভয় রাজ্যের উপবন ও প্রাণদাবির মধ্যে আমি এখন তুলনা করিতেছি না। আমি আমার প্রাণদকে মন্য বলিতেছি না, কিন্তু আমার পিতার প্রাণদ এই প্রাণদের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ। আপনি সেই প্রাণদ সম্বন্ধন করিলেই আমার কথায় বাথার্থ্য্য বুঝিতে পারিবেন। আপনি যখন ঘটনাটকে পড়িয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছেন, তখন আপনাকে একবার আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতেই হইবে, আপনার ভ্রায় রাজপুত্র আমার পিতার নিকট আদর ও যত্নলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।”

রাজকন্যার মনের ভাব এই যে, বঙ্গাধিপতি পারস্তরাজপুত্রের পরিচয় পাইলে তাঁহার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহাকে জামাত্বপে বরণ করিলেও করিতে পারেন। রাজপুত্র রাজকন্যার মনের ভাব সহজেই বুঝিতে পারিলেন, রাজকন্যা যে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হইল না, সুতরাং পিতার অনুমতি হইলে রাজকন্যা তাঁহার কণ্ঠে বরমালা সমর্পণ করিবেন, তাহা তিনি বুঝিতে



তোথে
তোথে
প্রেমের
ভাষা



পারিলেন, কিন্তু পারস্তরাজকুমার রাজকন্যার নিকট তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিলেন না। তিনি বলিলেন, “রাজকন্যা, আপনার পিতার প্রাণদ যে আপনার প্রাণদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা আপনার কথা হইতেই বুঝিতে পারিয়াছি। আপনার পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আদর লাভ করা কেবল আনন্দের বিষয় নহে, তাহা সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে, কিন্তু রাজকন্যা, আপনিই স্বয়ং বিচার করিয়া দেখুন, আপনার পিতার ভ্রায় অশেষ ঐশ্বর্য্যশালী, ক্ষমতাদম্পন নরপতির নিকট আমার একাকী অসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় উপস্থিত হওয়া দক্ষ কি না?”

পূর্ব্বরূপ
অবদানে
নিকটস্থতি
প্রার্থনা



রাজকন্যা বলিলেন, “সে জন্ত আপনি স্বর্ণকালের জন্তও উদ্বিগ্ন হইবেন না। আপনার বাহা ইচ্ছা হইবে, আমি তাহা পূর্ণ করিবার জন্ত অকাতরে অর্থব্যয় করিব, আমার অর্থের অভাব নাই। আপনি বস্তু ভূতা, বৈদ্য পরিজ্ঞান চান, তাহাই আমি সংগ্রহ করিয়া দিব। আপনার স্বদেশীয় অনেক সদাগর এই নগরে বাস

मिशन-रचनास
विग्रह आशङ्क।



বঙ্গদেশের রাজকন্ডায় অপরূপ রূপালাবা, যৌনপুষ্টি দেহ রাজপুত্রের হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিয়াছিল রাজপুত্র কিরোজ ও তরুণ যুবক। তাঁহার মুষ্টিতে হৃদয় মদনমোহনরূপে তরুণী রাজকন্ডাও আত্মবিহ্বল হইয়াছিলেন। পরম্পর পরম্পরের প্রেমে আকর্ষিত নিমজ্জিত। কাজেই মদনের কুলশর অবার্য নাকে উভয়কে জর্জর করিয়া তুলিল। উভয়ে উভয়কে যখন কামনা করিতেছিলেন, তখন মিলনকামী তরুণ যুগলের দেহের মিলনে কে প্রতিবন্ধকতাচরণ করিবে! ভবিষ্যতে লৌকিক বিবাহ আবার পালন করা যাইবে মনে করিয়া এক দিন শুভ মুহূর্ত্তে পরম্পর পরম্পরের-কঠলগ্ন হইলেন। সমগ্র রজনী উভয়ে যৌনের অতৃপ্ত মগ্নিরা পান করিয়া প্রেমদেবতার চরণে অর্ঘ্য নিবেদন করিলেন।

প্রেমদেবতার
চরণে অর্ঘ্য



প্রশ্ন-মিশ্রনের পর কয়েক দিন ধরিয়া, কেবল আমোদ ও আনন্দের তরঙ্গ বহিতে লাগিল। নৃত্য, গীত, ভোজ, শিকার প্রভৃতিতে জগজগতের স্তার অবশেষে দিন কাটিতে লাগিল। এইরূপ আমোদের পর সময়কালে বঙ্গদেশাধিপতির হুহিতা ও পারস্তরাজপুত্র উপবনহ কোন বিহঙ্গ-কাকিল-মুখরিত শাখা-পত্র-চ্ছিন্ন বৃক্ষের শ্রাবল ছায়ায় বসিয়া, বৎসবশের রাজ্য দৃষ্টে কত কথা বলিতেন। রাজপুত্রকে এমনই রিয়া প্রতিদিন প্রেম-শিকলে বাঁধিবার জন্য রাজকন্যা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র ক্রিরোজ শাহ দুইমাসকাল রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, নানাভাবে তাঁহার প্রমোদ-পিয়াগা তৃপ্ত রলেন। দুইমাসকাল দুই দিনের মত কাটিয়া গেল, অবশেষে এক দিন রাজপুত্র রাজকন্যাকে বলেন, “আমি অনেক দিন এখানে থাকিলাম, আর অধিক বিলম্ব করিলে আমার কর্তব্যভঙ্গ হইবে। তার প্রতি আমার যে কর্তব্য, তাহা পূর্ণ করিবার জন্য তুমি আমাকে অনুমতি কর। আমি যত পারি, তোমার পিতৃরাজধানীতে প্রত্যাপন করিব, তাহার পর তোমার পিতার নিকট বিবাহের প্রার্থনা রব। তুমি আমাকে কপট-প্রণয়ী বলিয়া মনে করিও না। প্রিয়তমে, তোমাকে যে কত ভালবাসিয়াছি, তাহা দি বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। আমি জানি, তোমাকে না পাইলে আমার জীবন মরুপ্রাঙ্গ হইবে; ত উপায় নাই, যদি আমি জানিতাম, বিবাহ অসম্ভব জানিয়া তুমি আমার সহিত বাইতে প্রস্তুত ছ, তাহা হইলে আমি তোমাকে সে অল্পবয়সে করিতে সঙ্কচিত হইতাম না।”

রাজকন্যা এই কথা শুনিয়া প্রথমে লজ্জায় অধোমুখী হইলেন, তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু পারস্তরাজপুত্রের কথার কি উত্তর দিবেন, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহার এই ভাব বিয়া রাজপুত্র পুনর্বার বলিলেন, “প্রাণেশ্বর, যদি তুমি মনে করিয়া থাক, আমাদের এই বিবাহে ত’ তোমার পিতার সম্মতি না হইতেও পারে, তাহা হইলে আমি তোমাকে নিঃসঙ্কোচে জানাইতেছি, সে এ বিষয়ে সকল আশঙ্কা ত্যাগ কর, তুমি তোমার পিতার যে সকল গুণের কথা বলিয়াছ, হাতে তাঁহাকে আদর্শ নরপতি বলিয়াই আমার বোধ হয়। তিনি অনর্থক তোমার স্নায় গুণবতী হুহিতার ন কষ্টদান করিবেন, এ কথা কোনমতে বিশ্বাস করা যায় না; সুতরাং আমাদের বিবাহের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছে। আমার পিতার দূত-যুগ্মে সকল বার্তা শুনিলেই তিনি নিশ্চয়ই বিবাহে সম্মতি জ্ঞাপন করিবেন।”

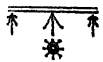
রাজকন্যা একবারও কোন উত্তর দিলেন না। প্রিয়তমার এই মৌনভাব দেখিয়া, রাজপুত্র বুঝিলেন, তাঁহার পিতার পক্ষে গমন করিতে রাজকন্যার আপত্তি বা অনিচ্ছা নাই। রাজকন্যা জানিতেন, রাজপুত্র মায়-শিষ্যচালনের সকল কৌশল অবগত নহেন, সুতরাং পাছে পথে কোন বিপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে তিনি দুই ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজপুত্র অবিগড়ে তাঁহার ভয় দূর করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন, এখন নি অশ্বারী অপেক্ষা ভাল অশ্বশিষ্যচালন করিতে পারেন। রাজকন্যা তখন রাজপুত্রের সহিত পারস্তদেশে যাত্রা আরম্ভ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহা এত গোপনে যে, কেহই সে কথা জানিতে পারিল না।

পরদিন অতি প্রত্যুবে—তখন রাজপুরবাসিগণ সকলেই নিদ্রাধোরে আছেন, রাজকন্যা রাজপুত্রের হাত তাঁহার প্রাসাদের ছাদের উপর উঠিলেন। রাজপুত্র তাঁহার অশ্বটি গুপ্তস্থান হইতে বাহির করিয়া, যাত্রা যাত্রার দিকে কিয়দূর প্রথমে তাহার উপর আরোহণ করিলেন, তাহার পর তাঁহার সমুখে দাঁড়াইয়া অশ্ব আরোহণ করাইলেন, রাজকন্যা মায়-অশ্বপটে আরোহণ করিয়া, অশ্বশিষ্যচালনার জন্য দৃষ্টান্তে সজ্জিত করিলেন। রাজপুত্র পারস্তরাজধানী হইতে বহির্গত হইবার সময় যে হাতল ঘুরাইয়া শিষ্যচালন করিয়াছিলেন, সেই হাতলটি ঘুরাইলেন। দেখিতে দেখিতে অশ্ব আকাশপথে উভিত হইল।

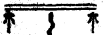
প্রণয়ী
মহা-আখ্যায়িক



বিমানে
সুন্দর-সুন্দরী
চম্পট



পূজ-আগমনে
আনন্দ-উৎসব



পারভ্রাজপুত্র অর্থাৎ এমন কৌশলের সহিত পরিচালিত করিলেন যে, বঙ্গদেশের রাজকন্ডার প্রাসাদে পরিভ্রাণ করিবার প্রায় আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পারভ্রাজধানী তাঁহাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইল। পারভ্রাজ-কুমার যে স্থানে অর্থাৎ আরোহণ করিয়াছিলেন, সেখানে কিঞ্চিৎ রাজপ্রাসাদে অবতরণ না করিয়া রাজধানীর কিঞ্চিৎ দূরে একটি পল্লীভবনে অবতরণ করিলেন। তিনি সেই গৃহের একটি সুসজ্জিত কক্ষে রাজকন্ডাকে রাখিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তিনি তাঁহার পিতার নিকট তাঁহার আগমনসংবাদ জানাইয়া তাঁহার উপযুক্ত অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়া সম্বর এখানে কিরিয়া আসিবেন। সেই প্রাসাদস্থিত কন্ডাকে রাজকন্ডার প্রয়োজনীয় ব্যবসায়গামী প্রদানের আদেশ করিয়া, আবার অর্থাৎ আরোহণ করিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন।

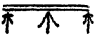
রাজপুত্রকে পথ দিয়া বাইতে দেখিয়া প্রজাগণ আনন্দমগ্ননি করিতে লাগিল। তাহারা রাজপুত্রকে পুনর্বার দেখিবার আশা করে নাই। রাজা মন্ত্রিগণের সহিত শোকবস্ত্র পরিধান করিয়া রাজকাৰ্য্য নির্বাহ করিতে ছিলেন। রাজা পুত্রকে দেখিয়া আনন্দবশে অশ্রুস্রবণ করিতে পারিলেন না। বিষম ও আনন্দে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তিনি অবিলম্বে রাজপুত্রকে মায়া-অশ্রু সঞ্চকে প্রেরণ করিলেন।

এই প্রেরণ শুনিয়া রাজপুত্র তাঁহার বিপদের আহুপুর্ষিক বিবরণ শিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন। বঙ্গদেশের রাজকন্ডার প্রাসাদে নিপতিত হইয়া, তাঁহার নিকট কিরূপ ভাবে আদর ও বহু লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিয়া, পারভ্রাজে তাঁহার সহিত রাজকন্ডার আগমনসংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি যে রাজকন্ডাকে বিবাহ করিতে অন্তত হইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন, অবশেষে বলিলেন, “আমার বিশ্বাস, আপনি রাজকন্ডার সহিত আমার বিবাহে অমত প্রকাশ করিবেন না। মায়া-অশ্রু আমি সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, আমি রাজকন্ডাকে আপনার একটি পল্লী-ভবনে রাখিয়া আসিয়াছি, বিবাহ সম্বন্ধে আপনি আদেশ প্রদান করিলে, আমি তাঁহাকে সে কথা জানাইয়া তাঁহার ভয় দূর করিতে পারি।”

রাজা তাঁহার পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “বৎস, আমি আনন্দের সহিত এই বিবাহে অনুমতি প্রদান করিলাম, কেবল অন্তিমতমাত্র নহে, আমি স্বয়ং রাজকন্ডার নিকট উপস্থিত হইয়া, তোমার প্রতি তাঁহার অঙ্গপ্রোহের জন্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিব, তাহার পর তাঁহাকে সম্মুখানো আমার প্রাসাদে লইয়া আসিয়া আজই বিবাহের আয়োজন করিব।” রাজার আদেশে সকলে শোকবস্ত্র ত্যাগ করিয়া আনন্দে যোগদান করিল; গীতবাত্ত রাজপুরী সুধরিত হইয়া উঠিল। অতঃপর রাজা অর্থবাহীকে কাগাপার হইতে মুক্তিদান করিয়া, তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

অর্থবাহী তৎক্ষণাৎ রাজার সন্নিকটে আনীত হইল। রাজা বলিলেন, “আমার পুত্রের বিপদের জটিল ক্রম হইয়া তোমার প্রতি কঠিন দণ্ডের বিধান করিয়াছিলাম, আমার পুত্র নির্দোষে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে, তুমি অবিলম্বে তোমার অশ্রু লইয়া আমার রাজধানী হইতে দূর হইয়া যাও।”

অশ্রু-নির্মীত
প্রতিশোধ



অর্থবাহী পথে আসিতে আসিতে শুনিতে পাইল, রাজপুত্র তাহার অর্থাৎ আরোহণে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, তিনি একাকী আসেন নাই, একটি শ্রম্য কুমারী রাজকন্ডাকেও সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন, সুলতান তাঁহার পুত্রের সহিত সেই রাজকন্ডার বিবাহ দিবেন, এবং পল্লীভবন হইতে অবিলম্বে তাঁহাকে প্রাসাদে লইয়া যাইবেন। এই সংবাদে অর্থবাহী রাজার পুত্রকে রাজকন্ডার জন্ত নির্দিষ্ট ভবনে উপস্থিত হইল, এবং রাজকন্ডাকে জানাইল, আমি রাজা ও রাজপুত্রের আদেশ অঙ্গারে আসিয়াছি। রাজকন্ডাকে মায়া-অশ্রু চড়াইয়া আকাশপথে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্ত আমার প্রতি অনুমতি হইয়াছে।”

রাজত্ব অর্থবাহীকে চিনিত, রাজার আজায় যে সে কারাকন্ড হইয়াছিল, তাহাও সে জানিত। রাজত্ব তাহাকে মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া তাহার কথা সত্য বলিয়াই মনে করিল, স্বতরাং সে রাজকন্তাকে সে কথা জানাইল। রাজকন্তা রাজপুত্রের সহিত লাক্ষ্যতের জন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তিনি অর্থবাহীর কথাই বিস্ময়িতও সন্দেহ না করিয়া অর্থবাহীর পক্ষাভেদে অর্থে আরোহণ করিলেন। অর্থবাহী তৎক্ষণাৎ হাতল ঘুরাইয়া দিতেই অর্থ আকাশপথে উঠিল। রাজপুত্র অত্যন্ত ব্যস্তভাবে রাজকন্তাকে পিতার শুভাগমনলংঘনজ্ঞাপন করিতে বাইতেছিলেন, স্থলভানও অনাত্যপারিধিবর্ষণে বেষ্টিত লইয়া পল্লী-ভবনান্তিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার। সভয়ে দৃষ্টিতে দেখিলেন, অর্থবাহী রাজকন্তাকে ভুলিয়া লইয়া উজ্জ্বল বায়ুবেশে ধাবিত হইয়াছে।

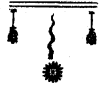
রাজা এই দৃষ্ট দেখিয়া ঘৃণায়, লজ্জায় ও অপমানে স্রিয়মাণ হইলেন, ক্রোধে তিনি কম্পিতকলেবর হইয়া অর্থবাহীকে নানা প্রকার অভিশপ্তা দান করিতে লাগিলেন, কিন্তু অর্থবাহী তৎপ্রতি ক্রোধমাত্র না করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। রাজা অবশেষে হতাশভাবে প্রাসাদে পুনঃ প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিন্তু রাজপুত্রের শোকদ্রুতের সীমা রহিল না, তাঁহার মনের অবস্থা বর্ণনা করা যায় না। তিনি রাজকন্তাকে অর্থবাহীর সঙ্গে উজ্জ্বল দিয়া উড়িয়া বাইতে দেখিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত মূতবৎ অবস্থান করিলেন, তাহার পর তিনি অর্থবাহীর নীচতাপূর্ণ ব্যবহারে যেমন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, রাজকন্তার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সেইরূপ ক্ষোভে বিচলিত হইলেন। কিছুকাল পরে অর্থ তাঁহারিগণের দৃষ্টিগোচর অন্তরালে চলিয়া গেল। অতঃপর তিনি কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। এখন তাঁহার কর্তব্য কি, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদের একটি গোপন কক্ষে পড়িয়া, দিবানিশি অশ্রুত্যাগে সাধনলাভের চেষ্টা করিবেন, না যে ছুরাশয় প্রবন্ধনা করিয়া তাঁহার প্রিয়তমাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে, তাহার অন্বেষণ করিয়া তাহার হস্ত হইতে রাজকন্তাকে উদ্ধার ও তাহার হৃৎকণের প্রতিফল প্রদান করিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে, রাজকন্তা যে পল্লীভবনে ছিলেন, সেই ভবনের দিকে অগ্রসর হইলেন।

রাজপুত্রকে দেখিয়া রাজত্বভায়ে কাঁপিতে লাগিল; কারণ, এক্ষণে সে অর্থবাহীর চাতুরী বুঝিতে পারিয়াছিল। রাজত্বভায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে অশ্রুপূর্ণলোচনে রাজপুত্রের চরণে নিপতিত হইল। রাজপুত্র তাহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন, “এজন্ত আমি তোমাকে অপরাধী করিতেছি না, ইহা আমারই নির্বুদ্ধিতার দোষ। বাহা হউক, তুমি আমার দরবেশের একটি পরিচ্ছদ আনিয়া দাও, আমি যে এই পরিচ্ছদ চাহিতেছি, এ কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।”

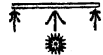
এই পল্লীভবনের কিঞ্চিৎ দূরে কয়েক জন দরবেশের এক আস্তানা ছিল, এই দরবেশদিগের সর্দারের সহিত রাজত্বভায়ে বন্ধু ছিল। রাজত্বভায়ে দরবেশের দলপতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে জানাইল, এক জন অতি উচ্চদম্ভ রাজকর্তব্যচারী, রাজার ক্রোধভাজন হইয়া, রাজা তাগণ করিয়া, পলায়নের জন্ত যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন, স্বতরাং তাঁহার ছদ্মবেশধারণের জন্ত একটি দরবেশের পরিচ্ছদ আবশ্যক। দরবেশের দলপতি রাজত্বভায়ে তৎক্ষণাৎ একটি দরবেশের পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। রাজপুত্র সেই পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, কতকগুলি হীরক ও মণিমুক্তা পাণ্ডেরশরঙ্গ সঙ্গে লইয়া এক দিন রাত্রে। পিতৃপ্রাসাদ পরিভ্রমণ করিয়া, অরণ্যপথে যাত্রা করিলেন। তিনি কোন্ দিকে বাইবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া উদ্বেগজনকভাবে যে দিকে চাই চক্ৰ গেল, সেই দিকেই চলিতে লাগিলেন।

রাজকুমারী-
হরণ

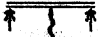


প্রণয়নী
উদ্ধায়ে

নিরুদ্দেশ যাত্রা



অপহৃত।
রাজকুমারী
কাশীরে



সুন্দরী-
প্রাণ



এ দিকে অশ্বখানী রাজকন্যাকে লইয়া, সেই দিনই অশ্বখানী কাশীরে উপস্থিত হইল। দীর্ঘকাল অশ্বখানীর দুখবোধ হইয়াছিল, সে রাজকন্যাকে একটি অশ্বখানীর সন্নিকটবর্তী প্রান্ত প্রান্তরে নামাইয়া কিছু ফলমূল সন্ধান গেল। রাজকন্যা তাহার চরভিত্তি দৃষ্টিতে পরিচয় করিলেন, সুতরাং তাহার হস্তে নিগূহীত হইবার ভয়ে তিনি প্রথমে পলায়নের সংকল্প করিলেন, কিন্তু অশ্বখানী তাহা করিলেন, এতই ক্রান্ত হইয়াছিলেন যে, অগত্যা পলায়নের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। অশ্বখানী প্রায় পরিমাণে ফলমূল লইয়া, রাজকন্যার নিকট ফিরাই আসিল। রাজকন্যা কিছু আহার করিলেন, অশ্বখানীও আহার করিল। তাহার পর সে রাজকন্যাকে তাহার অশ্বখানী লইয়া তাহার পাশপাশে পরিচরিত করিতে অশ্বখানী করিল। এই কুৎসিত প্রস্তাবে রাজকন্যা ক্রোধে ও রাগে অগ্নি উঠিলেন, তিনি অশ্বখানীকে ভৎসনা করিয়া বলিলেন, হতকণ্ঠ তাহার দেহে জীবন রহিলে, হতকণ্ঠ তিনি রাজকন্যাকে কিরূপে শাস্তি দিবে। অশ্বখানী তরুণী রাজকন্যার যৌবনোন্মত্ত দেহের মাধুর্য্যে আত্মহারা হইল। নির্জন অরণ্যমাধ্য তরুণী তাহার কামবজ্র আহুতি প্রদান করবার জন্য সে পুনঃ পুনঃ অশ্বখানী করিতে লাগিল; কিন্তু রাজকন্যা কোন ক্রমেই তাহার পাপ বান্দা পূর্ণ করিতে সম্মত হইলেন না। এই কথা শুনিয়া কামোন্মত্ত অশ্বখানী সেই নির্জন অরণ্যপ্রদেশে রাজকন্যার প্রতি বলপ্রয়োগের অভিপ্রায়ে তাহাকে বাহুপাশে ঢাপিয়া ধরিল, রাজকন্যার মেহম্পর্শে তাহার



দেহে আশ্রয় জন্মিয়া উঠিল। সে তরুণীর দেহকে ধর্ষিত করিবার জন্য দানবের ভায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল, রাজকন্যা প্রাণপণ বলে তাহার আলিঙ্গনশাস হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আত্মরক্ষা সমগ্র অরণ্য পরিপূর্ণ হইল। সেই আত্মরক্ষা প্রবণ করিয়া এক দল অশ্বখানীরা ক্রমবশত তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাহাকে ও তাহার আত্মরক্ষাকে পরিত্যাগ করিল।

এই অশ্বখানীরা কাশীরের স্বলতান ও তাঁহার অশ্বখানী, ইহারা মুগ্ধ করিতে অশ্বখানী প্রবেশ করিয়াছিলেন, দিব্যবদন দেখিয়া রাজধানী অতিমুগ্ধ অশ্বখানী হইতেছিলেন, রাজকন্যার বদনে তাহাদের দৃষ্ট আকর্ষণ হইয়াছিল।

কাশ্মীরস্থিতি অর্থবাহীকে লক্ষ্যে রাখিয়া রাজকন্ডার আর্জনারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, অর্থবাহী বলিল, “এই রমণী আমার স্ত্রী, আমাদের দাম্পত্যকলহ চলিতেছে, এ বিষয়ে কাহারও হস্তক্ষেপের অধিকার নাই।”

রাজকন্ডা কাশ্মীরের সুলতানকে চিনিত না পারিলেও এ বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিবার ক্রমতা তাঁহার আছে বুঝিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ শান্ত হইলেন; বলিলেন, “মহাশয়, আপনি বেই হউন, আমাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য পরামর্শ আপনাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। এই মিথ্যাবাহী তব্বর বাহা বলিতেছে, তাহা সত্য নহে; এমন অশদার্থ হীন ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, এ কথা আপনি কখনই বিশ্বাস করিবেন না। এ লোকটি এক জন দুর্বৃত্ত বাহকর, আমার বাগ্মত্ব স্বামী পারস্তের বুর্জাজের নিকট হইতে আমাকে মায়া-অর্থে চাপাইয়া দিয়া করিয়া আনিয়াছে।”

দুর্বৃত্ত-সংহা-
রপণী উদ্ধার



রাজকন্ডাকে আর অধিক কথা বলিতে হইল না, তাঁহার রূপ দেখিয়া ও কথা শুনিয়াই নরপতি বুঝিলেন, তিনি সত্যই কোন দেশের রাজকন্ডা হইবেন। সুলতান তাঁহার সৈন্তগণকে আদেশ করিলেন, “এই দুরাত্মকে অবিলম্বে বধ কর।” অর্থবাহীর আশ্রয়কার কোন উপায় ছিল না, কাশ্মীরপতির অহুচরণ রাজকন্ডা প্রতিপালন করিল।

রাজকন্ডা এইরূপে পরিত্রাণলাভ করিয়া কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন, সুলতান তাঁহাকে অর্থে আরোহণ করাইয়া কাশ্মীর রাজধানীতে লইয়া চলিলেন, এবং তাঁহার জন্য একটি প্রশস্ত স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত করিয়া দিলেন, দামদাসীরও অভাব রহিল না। রাজকন্ডা কাশ্মীরপতি দত্তবাবদানের উপযুক্ত ভাষা গুলিয়া পাইলেন না, রক্তজ্ঞতাভরে মোনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। কাশ্মীরপতি তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, “রাজকন্ডা, আমি বুঝিতেছি, আপনার বিশ্রামের আবশ্যক, আপনি এখন বিশ্রাম করুন, আগামী কলা আপনি আপনার বিপদের বার্তা আন্তোপান্ত আমাকে জ্ঞাপন করিবেন।” কাশ্মীরপতি এই কথা বলিয়া বিদায়গ্রহণ করিলেন।

রাজকন্ডা অত্যন্ত আনন্দিতচিত্তে সেই কক্ষে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন, তাঁহার চিন্তা ভিরোহিত হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন, “দুর্বৃত্ত বাহকরের হাত হইতে বধন মুক্তিলাভ করিয়াছি, তখন আমার প্রিয়তম রাজপুত্রের সহিত মিলনের একটা পন্থা হইবেই। উপযুক্ত আশ্রয়েই আদিয়াছি।”

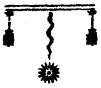
কিন্তু রাজকন্ডা বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি এক দুরাত্মের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর এক দুরাত্মের কবলে নিপতিত হইয়াছেন। কাশ্মীরের সুলতান রাজকন্ডাকে পরদিন বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব হইলেন এবং তাঁহার আদেশে রাজপুত্রীতে তুর্কী, তেঙ্গী, দামামা ও অন্তান্ত মঙ্গলবাৎস নিনাদিত হইতে লাগিল, চতুর্দিকে আনন্দকোলাহল আয়ত্ত হইল। রাজকন্ডা প্রথমে এই আনন্দধ্বনির কোন কারণ বুঝিতে পারিলেন না। রাজকন্ডার বিশ্রামের পর কাশ্মীরপতি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিতে আসিলে, রাজকন্ডা তাঁহাকে এই আনন্দোচ্ছ্বাসের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কাশ্মীরপতি সহাস্তে বলিলেন, “রাজকন্ডা, আপনার রূপ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি, সেই জন্য আগামী কলা আপনাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি; সেই বিবাহের শুভচিহ্ন জ্ঞাপন করিবার জন্য এই সকল আনন্দধ্বনি নিনাদিত হইতেছে, প্রজাবর্ণ আপনাকে কোলাহল করিতেছে।” রাজকন্ডা কাশ্মীরপতির কথা শুনিয়া মহা হিংস্র লজ্জাকার ভাব মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন।

রাজকন্ডার
রপণালসা



রাজকন্ডার দাসীগণ তাঁহার শুক্রবার জন্ম ছুটিয়া আসিল। কান্দীরপতিও রাজকন্ডার চেতনা-সঞ্চারের জন্য বিধিমাতে বস্তু করিতে লাগিলেন; কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার চৈতন্ত্যের কোন চিহ্নই হইল না। রাজকন্ডা চেতনা-লাভ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার আর অব্যাহতি নাই, রাজপুত্র ফিরোজ শাহের প্রতি বিশ্বাসভাজিনী হইয়া তিনি জীবিতা থাকিও বাঞ্ছনীয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু মৃত্যুলাভেরও সহসা কোন উপায় দেখিলেন না। অবশেষে তিনি এক উপায় স্থির করিলেন, মুর্ছাভঞ্জে তিনি উন্মত্ততার ভান করিলেন। তিনি সুলতান সুলতানকে অতি কষ্টকর গালি দিলেন, তাহার পর দাসীগণকে প্রহার করিতে উত্তত হইলেন। সুলতান রাজকন্ডার এই বিচিত্র ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন, সুলতান রাজকন্ডার শুক্রবার জন্ম দাসীগণকে আদেশ করিয়া প্রহান করিলেন। সুলতান পুনঃ পুনঃ রাজকন্ডার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে সংবাদ লইতে লাগিলেন। কিন্তু রাজকন্ডার পীড়া উত্তরোত্তর বর্ধিত হইতেছে, এইরূপ শুনিতে পাইলেন। রাজিকালে পীড়া অত্যন্ত বর্ধিত হওয়ার সংবাদ সুলতানের কর্ণগোচর হইল।

প্রেমিকা
উমাদিনী



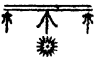
পরদিন রাজকুমারী বোর উমাদের জায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন, সুলতান তখন রাজ্যের চিকিৎসকগণকে ডাকিয়া রাজকন্ডার চিকিৎসার জন্য নিযুক্ত করিলেন।

রাজকন্ডা দেখিলেন, যদি চিকিৎসকগণ তাঁহার নাড়ীর পতি পরীক্ষার সুবিধা পান, তাহা হইলে তাঁহার সকলই একবারে তাঁহাকে সম্পূর্ণ সুস্থ বলিয়া মত প্রকাশ করিবেন; সুতরাং চিকিৎসকগণ রাজকন্ডার নিকটস্থ হইবামাত্র তিনি এমন অধীরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ও চিকিৎসার প্রতি এমন বীতরাগ প্রকাশ করিলেন যে, কেহই তাঁহার চিকিৎসায় অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তাঁহার বিরাজভয়ে সকলেই শঙ্কিত হইলেন।

অবশেষে এক জন প্রধান চিকিৎসক বলিলেন, "রাজনন্দিনীর অঙ্গ স্পর্শ করিয়া রোগনির্ণয়ের প্রয়োজন নাই, আমি রোগ দেখিয়াই ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি। আমি ঔষধ দিতেছি, এই ঔষধ রাজকন্ডাকে সেবন করিতে দেওয়া হউক।" রাজকন্ডা এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি করিলেন না। তিনি ভাবিলেন, যদি তিনি নিজে সুস্থ না হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে এমন কোন ঔষধ নাই, বাহার প্রয়োগে তাঁহাকে কেহ সুস্থ করিতে পারে। রাজকন্ডা ঔষধ গলাধঃকরণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে রাজকন্ডার ব্যাধি আরোগ্য হইল না।

কান্দীরপতি যখন দেখিলেন, তাঁহার রাজ্যের কোন চিকিৎসকই রাজকন্ডার ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারিলেন না, তখন রাজা তাঁহার সম্বন্ধে সামন্ত রাজগণের চিকিৎসকবর্গকে আহ্বান করিলেন; বোধগা করিলেন, রাজকন্ডার ব্যাধি যিনি আরোগ্য করিতে পারিবেন, তিনি বহুমুগ্য পুরস্কার ও পাণ্ডেয় প্রাপ্ত হইবেন। অনেক রাজা হইতে অনেক চিকিৎসক আসিলেন, কিন্তু কেবল তাঁহাদের পঞ্চমই সার হইল, রাজকন্ডাকে কেহই আরোগ্য করিতে পারিলেন না। সুস্থ ব্যক্তিকে আরোগ্য করিবার শক্তি পৃথিবীতে কাহারও নাই।

উমাদিনী-
প্রথমদে
নিরুপায়



এ দিকে রাজপুত্র ফিরোজ শাহ দরবেশের বেশে তাঁহার প্রিয়তমা প্রাণমিত্রীর সন্ধানে বহরাজের রাজধানী ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার আশা পূর্ণ হইল না। তাঁহার দৈহিক পরিশ্রম ও আন্তরিক অব্যাদ উভয়েই প্রবল হইয়া উঠিল। মধ্যে মধ্যে তাঁহার সন্মোহ হইতে লাগিল, এই সুবিধা বহরাজের রাজকন্ডার সন্ধানে যে দ্বিক তাঁহার যাওয়া উচিত, হয় ত' তিনি তাহার বিপরীত দিকে বাহ্যেতছেন।

অবশেষে রাজপুত্র কিরোজ শাহ একটি জনপদে আশ্রয় উপস্থিত হইলেন, সেখানে লোকমুখে শুনিলেন, কান্দীররাজ্যে বঙ্গদেশাধিপতির এক কন্যা উদ্যাদরোপে বড় কষ্টে পাইতেছেন, যে দিন কান্দীররাজ্যের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবার কথা ছিল, সেই দিন হইতেই এই রোগে রাজকন্যা আক্রান্ত হইয়াছেন। বঙ্গদেশের রাজকুমারী, এই কথা শুনিয়া কিরোজ শাহের মন এই পক্ষের প্রতি আকৃষ্ট হইল। তিনি বুঝিলেন, এইবার তিনি তাঁহার হারা-নিধির সন্ধান পাইবেন। তিনি তৎক্ষণাৎ কান্দীর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জীবনে ত' আর কোনই উদ্দেশ্য ছিল না, পঞ্চশতকে শ্রম জ্ঞান না করিয়া, অন্যায়ের অনিগ্রাহ্য দ্বন্দ্ব না হইয়া, সাধকের ভায় তিনি তাঁহার দুর্গম সাধনাপথ ধরিয়া চলিতে চলিতে বহু গিরি, নদী, অরণ্য, প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক দিন কান্দীররাজধানীতে পদার্পণ করিলেন।

কিরোজ শাহ কান্দীররাজধানীতে এক ঝাঁ সাহেবের বাড়ীতে বাসা লইলেন, সেই দিনই তিনি রাজকন্যা-স্বকীয় সকল কথা শুনিতে পাইলেন। দুঃখী অশ্বখারীরা কি পরিণাম হইয়াছে, তাহাও তাঁহার অজ্ঞাত রহিল না। মায়-আবের কথা শুনিয়াই তিনি বুঝিতে পারিলেন, এ রাজকন্যা তাঁহারই প্রিয়তমা, অজ্ঞ কেহ নহে। এই সকল কথা শুনিয়াই তিনি ইহাও বুঝিতে পারিলেন যে, রাজকন্যার উন্নততা ভাণ মাত্র।

রাজপুত্র কিরোজ শাহ পরদিনই একটি চিকিৎসকের পরিচ্ছদ নির্ধারণের ফরমায়স দিলেন। এক দিনের মধ্যেই পরিচ্ছদ নিশ্চিত হইল, ছয়বেশের আর আবশ্যক ছিল না, সুদীর্ঘকাল পথপর্যটনে তাঁহার যে স্থবর্তীর্ণ গুণ্ড-শশুর সৃষ্টি হইয়াছিল, তিনি বুঝিলেন, তাঁহার অভিশ্রাস্তিক্রিয় তাহাই যথেষ্ট অহুত্ব। তিনি রাজকন্যাকে দেখিবার অজ্ঞ অত্যন্ত অধীর হইয়া উঠিলেন; চিকিৎসক পরিচয়ে রাজকন্যার উপস্থিত হইলেন, এবং কান্দীরাধিপতির সমুখে নীত হইয়া, তিনি বিনয়মন্ত্রভাবে বলিলেন,—অজ্ঞাত চিকিৎসকগণ যেখানে বার্ষপ্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেখানে তাঁহার চিকিৎসা করিতে আসা ধুটতা মাত্র; কিন্তু তিনি এমন দুই একটি সুযোগ জানেন, বাহা অনেক স্থলেই অব্যর্থ হইয়াছে, এবং অনেক চিকিৎসায় হতাশ হইবার পরও তাহা ফলপ্রসূ হইতে দেখা গিয়াছে। স্থলতান বুঝা বাক্যব্যয় অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়া, কিরোজ শাহকে রাজকন্যার কক্ষের সিকটস্থ বাতায়নপার্শ্বে লইয়া চলিলেন। রাজকন্যা চিকিৎসক দেখিলেই অধিক কেপিয়া উঠেন, স্থলতান তাহা জানিতেন, সুতরাং রাজকন্যা বাহাতে চিকিৎসককে দেখিতে না পান, অথচ চিকিৎসক বাহাতে রাজকন্যাকে দেখিতে পান, এই অভিপ্রায়েই তাঁহাকে সেই জানালার নিকটে লইয়া যাওয়া হইল।

পারস্তরাজকুমার তাঁহার বিধাদিনী প্রিয়তমার মুখকমল সতৃকনয়নে নিরীক্ষণ করিলেন; দেখিলেন, মুখ-ধানি অশ্রুপাশিতে ভাসিতেছে, রাজকন্যা দুঃখের গান করিতেছেন, সে বুঝি তাঁহারই প্রেমের গান, কথা শুনিতে পাইলেন না, কিন্তু হৃদে মন-প্রাণ মুগ্ধ হইল। রাজপুত্র প্রিয়তমার শোচনীয় অবস্থা সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইলেন। তিনি বুঝিলেন, রাজকন্যা যে উন্নততার ভাণ করিতেছেন, তাহাতে বিমুগ্ধ সন্দেহ নাই। পারস্তরাজকুমার ধীরে ধীরে সেই বাতায়নপ্রান্ত পদাভ্যাগ করিলেন, তাঁহার পর স্থলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজকুমারীর ব্যাধির একটি বিস্তীর্ণ সমালোচনা করিলেন, অবশেষে বলিলেন, “জাহাঙ্গানা, রাজকন্যার এই ব্যাধি অতি দ্রুতিক্রিয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অসাধ্য নহে। আমি ইতিপূর্বে একজন ব্যাধি আরোগ্য করিয়াছি, অনেক গণ্যমান্ত চিকিৎসক বিকলপ্রায় হইয়াছেন, শেষে আমার ঔষধেই প্রকৃত নিলাত হইয়াছে; এ ক্ষেত্রেও যে তাহাই হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে আমারে রাজকন্যার সহিত প্রায়শঃ গোপনে আলোচন করিতে হইবে, সেখানে কেহ থাকিলে চলিবে না। আর আমার ঔষধের একটি

হাধানিধি
সত্যের আশা



প্রাথমিক
বিধাদিনী



প্রেমিকের
আশ-প্রকাশ



তখন এই পরীক্ষা করিবেন যে, রাজকন্যা অস্ত্র চিকিৎসকের ছায়া স্পর্শ পর্যন্ত অসুস্থ জ্ঞান করেন কিন্ত আশার সঙ্গে আলাপ করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র আপত্তি হইবে না। তিনি শান্তভাবে আমার সমা কথা শ্রবণ করিবেন।”

অনন্তর সুলতানের আদেশে রাজকন্যার ককে রাজকুমার ফিরোজ শাহের প্রবেশ করিবার আর বাহি ছিল না। রাজকন্যার ককে তিনি প্রবেশ করিবারাত্র রাজকন্যা তাঁহাকে চিকিৎসক মনে করিয়া ক্রোধে আসন্ন পরিত্যাগ করিলেন; তাঁহার মুখ হইতে অনেক অসংলগ্ন কটু কথা উচ্চারিত হইতে লাগিল। কিন্তু এ প্রকার কটুচি শ্রবণ করিয়া ও রাজকন্যার ক্রোধ দেখিয়া রাজপুত্র ফিরোজ শাহ কিছুমাত্র বিরক্ত বা বিস্ত্র হইলেন না, তিনি রাজকন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরে ধীরে অথচ স্থম্পষ্টবরে বলিলেন, “রাজকন্যা

আমি চিকিৎসক নহি, তোমার প্রেমের দাস ফিরোজ, তোমাকে মুক্তিদান করিবার জন্য পায়ত্স হইতে আসিতেছি।”

এই কথা শুনিবামাত্র রাজকন্যা অশেষ্কাকৃত সংবতচিত্তে রাজপুত্রের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন, দাড়ী-মৌকে মুখ আচ্ছন্ন হইয়া থাকিলেও রাজকুমারী সে মুখ চিনিতে পারিলেন, আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। ফিরোজ শাহ তাঁহার নিকটে বসন্তাননয়িত মুহুরে তাঁহার হৃৎকণ্ঠে প্রভৃতি কাহিনী বর্ণনা করিলেন, তাহার পর রাজকন্যা কিছু কান্দীর-রাজপ্রাণে উপস্থিত হইলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজকন্যা অকপটে সংক্ষেপে এই কথা



আশার
আলোক
দীপ্তি



ধীরে সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন; কি অন্ত যে তিনি উম্মাদিনী সাজিয়াছেন, তাহাও বিবৃত করিতে ভুলিলেন না।

রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “বাছকর বেটার বৃত্তার পর মারা-অবটায় কি হইয়াছে, জান কি?” রাজকন্যা বলিলেন, সুলতান সেই অবশেষে কি আদেশ দিয়াছেন, তাহা আমি অবগত নহি। তবে আমি অনুমান হয়, সেই অবশেষে কন্যার পরিচর পাইয়া সুলতান তাহাকে কখনই অগ্রাহ করিবেন না।”

রাজপুত্র বলিলেন, সুলতান অষ্টকে সাবধানে রাখিয়া দিয়াছেন। তিনি স্থির করিলেন, রাজকন্যাকে উদ্ধার করিতে হইলে সেই অবশেষে একান্তই অপরিহার্য। স্থির হইল, রাজকন্যা পরদিন অতি উপায় পরিশ্রমে সজ্জিত হইয়া কান্দীরপতির সর্জন করিবেন, রাজপুত্রই সুলতানকে রাজকন্যার ককে আনিবেন, কিন্তু রাজকন্যা মুখে কোন কথা বলিবেন না।

অনন্তর রাজপুত্র হুলতানের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া বলিলেন, “রাজকন্ডার ব্যাধি প্রায় আরোগ্য হইয়াছে। পরদিন রাজকন্ডা বিশেষ সম্বন্ধের সহিত হুলতানের সন্মিলন করিলেন দেখিয়া হুলতান ভাবিলেন, এমন হুনিপূর্ণ চিকিৎসক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। হুলতান অত্যন্ত সী হইয়া রাজকন্ডাকে অনেক আদরের কথা বলিলেন ও তাঁহার রোগমুক্তির জন্ত বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু রাজকন্ডা কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া হুলতান সে কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

হুলতান রাজকন্ডার কক্ষ ত্যাগ করিলে, রাজপুত্র তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন। গনি কথাপ্রসঙ্গে হুলতানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “বঙ্গদেশের রাজকন্ডা দানীবদ্ধিত অবস্থায় এত র ক্রমে আসিলেন?” হুলতান প্রকৃত কথা বাহা, তাহাই বলিলেন, এবং মায়্যা-অখের গুণ বর্ণিত করিলেন। হুলতান, কিরোজ শাহের মনোভাব কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। পারিলেনই বা কি করিয়া? হুলতান অকপটভাবে সকল কথা বলিলেন। তিনি অখট তাঁহার রাজভাণ্ডারে থিচ্চাছেন, এ কথাও প্রকাশ করিলেন এবং অখের পরিচালনাকৌশল জানেন না বলিয়া বোধ করিলেন।

রাজপুত্র বলিলেন, “আমি দেখিতেছি, এই মায়্যা-অখটির সংস্পর্শে রাজকন্ডার ব্যাধি, এই ব্যাধি সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার জন্ত মায়্যা-অখটি শোধিত করা দরকার। শোধনের উপায় আমি অবগত আছি। আপনি যদি রাজকন্ডার ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিতে চান, তাহা হইলে আপনার ভাণ্ডার হইতে অখটকে বাহিরে আনিয়া, আপনার প্রাসাদের দ্বার-সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্ত আদেশ করুন। রাজকন্ডাকে বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া সেই স্থানে আনিতে হইবে, আমি অতি অল্পসময়ের মধ্যেই পিনাকে ও আপনার সভাসদবর্গকে দেখাইব যে, রাজকন্ডা কি দৈহিক কি মানসিক সকল ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন।” রাজকন্ডা সম্পূর্ণরূপে মুক্তিলাভ করিবেন, এই আশার রূপমুদ্র হুলতান নিজের সহিত পারস্তরাজকুমারের সকল প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

পর দিন হুলতানের আদেশে মায়্যা-অখটি রাজভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া, রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ স্থানে স্থাপন করা হইল। রাজধানীর চতুর্দিক হইতে বহু সহস্র ব্যক্তি তামাসা দেখিবার জন্ত সেই স্থানে সমবেত হইল। প্রহরীগণ দলে দলে সজ্জিত হইয়া শাস্ত্রিয়ক্ষা করিতে লাগিল।

হুলতান সভা করিয়া বলিলেন, তাঁহার অনাতাগণ হুলতানের সন্নিকটে বধ্যাযোগ্য স্থান অধিকার করিলেন। অবশেষে দানীয়েন্দে পরিবেষ্টিত হইয়া, হুসজ্জিতা রাজকন্ডা সেই অখের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন, এবং অখের আরোহণ করিলেন। রাজপুত্র তাঁহার হস্তে অখ-বল্লা প্রদান করিয়া, অখ-সন্নিকটে রক্ষিত অগ্নিকুণ্ডের প্রকীর্ত্তন করিয়া চূর্ণ নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নিকুণ্ডে চতুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন রাজপুত্র মন্ত্রোচ্চারণের লে বক্ষ্যদেশে হস্তার্পণ করিয়া তিনবার অখট প্রদক্ষিণ করিলেন, দেখিতে দেখিতে ধূম এত অধিক হইল, যে অখ, রাজপুত্র বা রাজকন্ডা কাহাকেও আর সে ধূমের মধ্যে দেখা গেল না। রাজপুত্র চক্ষুর নিমিষে রাজকন্ডার পঞ্চাতে আরোহণ করিয়া অখের কক্ষদেশস্থ হাতল টিপিয়া দিলেন, আর অখ রাজপুত্র ও রাজকন্ডাকে গুপ্তে লইয়া মহাবাগে আকাশে উঠিল। হুলতান রাজপুত্রের স্বর শুনিলেন, রাজপুত্র গভীরস্বরে কহিলেন, “কান্দীরগতি, যখন আপনি শরণাগত কোন রাজকন্ডাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিবেন, প্রথমে হার সমস্ত গ্রহণ করিবেন।”

রূপ-মুদ্র

হুলতানের

বুদ্ধিলাপ



প্রাণিনী উদ্ধার

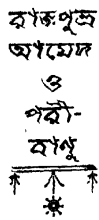




এইরূপে পারস্তরাজপুত্র রাজকন্যাকে কাশ্মীরের সুলতানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া, পারস্তভূমিতে
ধাবিত হইলেন, এবং সেই দিনই পারস্ত-রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। পারস্তরাজ তাঁহাদিগকে স্বদেশে
প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন, এবং সেই দিনই মহা সমারোহে বঙ্গ-রাজকুমারীর সহিত
রাজপুত্রের বিবাহ প্রদান করিলেন। বাহিত-মিলনের প্রমোদলোভে পুলক-প্রবাহ উজ্জ্বলিত হইতে লাগিল।

বিবাহের উৎসব শেষ হইলে পারস্তপতি বন্ধাধিপের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া, তাঁহার কস্তার সহিত
তাঁহার পুত্রের বিবাহের সংবাদ অবগত করাইলেন। কস্তাশোকাভূত বন্ধাধিপ এই আনন্দের সংবাদে
যৎপরোনাস্তি প্রীতি লাভ করিলেন।

সুলতান শাহারবাদী মায়া-অশ্বের কাহিনী শেষ করিয়া, সুলতানের সম্মতিক্রমে সুবরাজ আমেদ ও
পরীবাণু পরীর বিচিত্র উপাখ্যান আরম্ভ করিলেন।



পূর্বকালে ভারতবর্ষে এক জন মহা পরাক্রান্ত সুলতান ছিলেন, তাঁহার তিন পুত্র ও এক ভাতৃপুত্রী ছিল,
পুত্রদের নাম যথাক্রমে হোসেন, আলি ও আমেদ এবং ভাতৃপুত্রীর নাম নোরোহিহাবু। সুলতানের পুত্রগণ
সকলেই হুশিাক্ত, বুদ্ধিমান, বিবেক ও ধর্মশীল ছিলেন; ভাতৃপুত্রীটি যেমন হুশীলা সুলতানী, তেমনই ধর্মশীলা।
নোরোহিহাবু সুলতানের কনিষ্ঠ ভ্রাতার কস্তা, সুলতান তাঁহাকে নিজের কস্তার ভ্রাতৃ স্নেহ করিতেন, এবং
তাঁহাকে বশেষ পরিমাণে ধনসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন; নোরোহিহাবুর শৈশবকালেই তাঁহার পিতৃ-
বিয়োগ হয়। কনিষ্ঠ সহোদরের মৃত্যুর পরই নোরোহিহাবুকে সুলতান নিজের প্রাদানে আনিয়া পুত্রগণের
সহিত প্রতিপালন করিতেছিলেন। রূপে ও গুণে নোরোহিহাবুর ভ্রাতৃ রমণীয়রূপে সে সময় আর দ্বিতীয় ছিল না।

সুলতান মনে করিয়াছিলেন, নোরোহিহাবুর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তিনি কোন রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহ
দিয়া তাঁহার ভ্রাতৃ কোন পরাক্রান্ত সুলতানকে বৈবাহিক-বন্ধনে আবদ্ধ করিবেন। তিনি নোরোহিহাবুর
বিবাহের চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে এক দিন জ্ঞানিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্রগণের সকলেই নোরোহি-
হাবুর প্রতি আকৃষ্ট, তিন পুত্রের জন্মই যুবতীর প্রতি সমান অম্বরক। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান বিশেষ
চঞ্চল ও চিন্তাস্কল হইলেন, কোন পরাক্রান্ত সম্রাটকে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ করিবার সম্ভাবনা লুপ্ত
হইল দেখিয়া যে তিনি চাঞ্চল্য বা চিন্তিত হইলেন, তাহা নহে। তাঁহার তিন পুত্র সকলেই সমান রূপবান,
গুণবান, বোণা, কাহাকে কেলিয়া কাহার হস্তে তিনি এই রমণীয়রূপ প্রদান করিবেন, তাহা স্থির করিতে
না পারিয়াই চিন্তিত হইলেন। অবশেষে তিনি পুত্রত্ৰয়কে একে একে গোপনে ডাকিয়া তাহাদিগকে এই
সংকল্প ভাগ্য করিতে অহরহ করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, প্রত্যেকেই এমন ভান
দেখাইতে লাগিলেন যে, নোরোহিহাবুকে লাভ করিতে না পারিলে তাঁহার জীবন ধারণই ব্যথা হইবে।
সুলতান তখন রাগ করিয়া বলিলেন, “বেশ, ঘরে একটিমাত্র মেয়ে, তোমরা তিন জনেই তাঁহাকে বিবাহ
করিতে চাও, কাহাকে কেলিয়া কাহাকে আমি তাঁহাকে সমর্পণ করিব? তাহার সহিত ত’ তোমাদের
তিন জনেরই বিবাহ হইতে পারে না। এ অবস্থায় নোরোহিহাবু বাহাকে বিবাহ করিতে চায়, তাহার সহিত
বিবাহ হইতে পারে, আর যদি সে এ সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আমার বিবাহে

জ্ঞত কোন রাজপুত্রের সহিতই তাহার বিবাহের সম্বন্ধ করা উচিত।" পিতার এ প্রস্তাবেও পুত্রগণ সম্মত হইলেন না, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই সংক্ষিপ্ত মত, "আমি বিবাহ করিব।" তখন মূলতান ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সকলকে একত্র আহ্বান করিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তোমরা প্রত্যেকেই নৌরোরিয়ারকে বিবাহের জন্য উৎসুক হইয়াছ, আমি পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়া কাহারও হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিব না। তোমরা কৃত্ত্ব দেখাইয়া তাহাকে গ্রহণ কর। আমি আদেশ করিতেছি, তোমরা তিন সহোদরে ভিন্ন ভিন্ন দেশে পর্যটনে যাত্রা কর, তাহাতে কাহারও সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই। তোমাদের তিন জনের মধ্যে যে সকলের অপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য পদার্থ আনিতে পারিবে, আমি তাহারই হস্তে নৌরোরিয়ারকে সম্ভাদন করিব। এই কার্যের জন্য তোমাদের যে পরিমাণ অর্থের আবশ্যক, তাহা আমার ভাণ্ডার হইতে লইয়া যাইতে পার। দেশভ্রমণে তোমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারিবে, সুতরাং এক কার্যে দুই কল হইবে।"

প্রেমের

প্রতিশ্রুতি



মূলতানের এই প্রস্তাবে রাজপুত্রগণ সকলেই সম্মত হইলেন, এবং পরদিন প্রভাতেই প্রবাসে যাত্রা করিবার জন্য সকলে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সদাগরের পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া, এক এক জন সহচর সঙ্গে লইয়া, পরদিন যথাসময়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিলেন। তিন জন প্রথমে একত্রই বাহির হইলেন, তাহার পর একটি পাখুশালায় আসিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, তিনটি পথ তিন দিকে গিয়াছে, তাঁহারা তিন জনে সেই তিনটি বিভিন্ন পথ ধরিয়া চলিবার প্রস্তাব করিলেন। স্থির হইল, বিদেশে কেহ এক বৎসরের অধিক কাশ্মিরে করিবেন না। এক বৎসরের মধ্যে সকলেই সেই পাখুশালায় প্রত্যাগমন করিয়া, একত্র মিলিয়া রাজধানী যাত্রা করিবেন, যদি কেহ আগে ফিরিয়া আসেন, তবে তিনি এই স্থানে অপেক্ষা করিবেন।

বিশনগর রাজ্যের ঐশ্বর্য্য, সম্পদ ও গৌরবের অনেক কাহিনী রাজপুত্র হোসেনের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তিনি ভারতমুদ্রাভিক্ষে যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ তিন মাস পথপর্যটনের পর অনেক মরুভূমি, অরণ্য, পর্বত অতিক্রম করিয়া, তিনি বিশনগর রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজধানী বিশনগরে উপস্থিত হইয়া হোসেন এক বায়ের বাড়ীতে বাগা লইলেন।

বিশনগরের বাজারের সৌন্দর্য্য দর্শনে হোসেন মুগ্ধ হইলেন, শিল্পভবোর মধ্যে রেশমী বস্ত্রই তাহার অধিক মনোহর বোধ হইল। অনেকগুলি ভারতীয় শিল্প-নির্মিত, কতকগুলি পায়ন্ত চাঁদ প্রভৃতি বেশ হইতে আমদানী। চারিদিকে কত মনোহর সামগ্রী তিনি সম্বর্ধন করিলেন, তাহার সংখ্যা নাই। অবশেষে তিনি এক স্বর্ণকারের দোকানে পদার্পণ করিলেন, সেখানে অসংখ্য স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক, চুনি, পাশা ও মূল্যবান অলঙ্কার দেখিলেন। এত অলঙ্কার কোথায় বিক্রয় হয়, তাহার অল্পসম্বন্ধে তিনি জানিতে পারিলেন, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য সকল জাতিই অলঙ্কার পরিধান করিয়া থাকে। অধিবাসিগণ সকলেই বিলাস-পরায়ণ। তাহারা নিজ নিজ দেহের শোভাবৃদ্ধি হইবে ভাবিয়া সকলেই অলঙ্কার পরে।

সুন্দরীলাভের

যোগ্য আশ্রয়

নির্দর্শন চাই



নগরের একটি বিশেষ রাজপুত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি দেখিলেন, অনেকেই গোলাপফুল বিক্রয় করিতেছে; ইহা দেখিয়া রাজপুত্রের অস্থান হইল, সেখানকার লোকেরা পুষ্পের প্রতি অস্থিরক। সকলকেই তিনি পুষ্প ক্রয় করিতে দেখিলেন, এমন কি, দোকানদারগণ পর্যন্ত পুষ্পগুচ্ছে স্ব স্ব দোকান সজ্জিত রাখিয়াছে।

অনেকক্ষণ ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হওয়ায় রাজপুত্র কিছুকাল বিশ্রামের জন্য এক দোকানদারের দোকানে উপবেশন করিলেন। দোকানদার বিশেষ উদ্বিগ্নতার সহিত তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিল। তিনি দোকানে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় তিনিতে পাইলেন, এক জন কেরিওয়ালা একখানি

আসন-কিরকের অন্ত পথে ইাকিয়া বেড়াইতেছে। তিনি শুনিলেন, আসনখানি দীর্ঘ-গ্রন্থে ছয় ফুট, তাহা ত্রিশটি বিভিন্ন কার্যে ব্যবহৃত হইতে পারে। তিনি আসনখানি দেখিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র অসাধারণত্ব আছে বলিয়া বৃত্তিতে পারিলেন না, অথচ ফেরিওয়াল তাহার অসাধারণ দাম ইাকিল। তিনি এক্ষণ সামান্য ত্রব্যের অত অসামান্য দাম হইবার কারণ কি জিজ্ঞাসা করায় ফেরিওয়াল বলিল, “মহাশয়, শুণ না থাকিলে কি আর এত মূল্য হয়? আপনি এই আসনে বসিয়া যেখানে বাইবার ইচ্ছা করিবেন, তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে বাইতে পারিবেন, কোন বস্ত্র আপনার গমনে বাধা জন্মাইতে পারিবে না।”

রাজপুত্র ভাবিলেন, তাঁহার পিতার জন্ত ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য সামগ্রী আর কিছুই সংগ্রহ হইতে পারে না, হুতরাং তিনি এই আসনখানি ক্রয় করিবার ইচ্ছায় হুটচিতে বলিলেন, “খবর তোমার কথাই সত্য হয়, তাহা হইলে আমি তোমার প্রার্থনামত চলিশ মোহর দাম দিয়াই ইহা ক্রয় করিব।” ফেরিওয়াল

বলিল, “আমি আপনার সঙ্গে রুখিব না, আপনি চলিশ মোহর দিয়া ইহা কিনিবেন, সকল টাকা অবশ্য আপনার সঙ্গে নাই, আমি আসন পাতিতেছি, আপনি আমার সঙ্গে ইহার উপর আরোহণ করিয়া চলুন, বাসায় গিয়া আপনি টাকা দিবেন। যদি আসন আমাদিগকে বহন করিয়া শীঘ্র যথাস্থানে উপস্থিত হইতে না পারে, তাহা হইলে আমি টাকা চাহি না।”

রাজপুত্র হোসেন ফেরিওয়ালার কথা সঙ্গত জ্ঞান করিলে, ফেরিওয়ালার প্রস্তাবে তিনি সন্মত হইলে, ফেরিওয়াল আসন-



আসন-
শের
মহিমা

খানি পাতিল, তখন উভয়ে সেই আসনে উপবেশন করিলেন, দেখিতে দেখিতে আসন তাঁহাদিগকে লইয়া রাজপুত্রের বাসায় উপস্থিত হইল। হোসেন মহা আনন্দিত হইয়া চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে আসন গ্রহণ করিলেন, ফেরিওয়ালকে আরও বিশ মুদ্রা পুরস্কারও প্রদান করিলেন।

পিতার হস্তে এই আসন প্রদান করিয়া প্রাণাধিকা নোয়োরিহারকে লাভ করিবেন, এই আশায় হোসেন অত্যন্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার বস্ত্র ভাঙুপণ কখনই এমন আশ্চর্য্য পর্য্যবসংগ্ৰহ করিতে পারিবেন না বলিয়াই তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। তিনি সে আসনে বসিয়া সেই দিনই তথা হইতে সেই পাঞ্চালার বাইতে পারিতেন ও ভাঙুথরের আগমনের জন্ত অপেক্ষা করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি সে দেশবাসীদের আচার ব্যবহার, ব্যবস্থা-ধর্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভের ইচ্ছা করিলেন, হুতরাং আরও কিছু দিন এই রাজধানীতে বাস করা তাঁহার অভিপ্রেত হইল।

বাকীমাতের
আশা



বিশ্বনগরের রাজা সপাথে এক দিন বৈদেশিক সদাগরগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। অজ্ঞাত সদাগরগণের জায় রাজপুত্র হোসেনও রাজদরবারে উপস্থিত হইতেন। রাজা তাঁহার রূপ, বৃদ্ধি, বিচারশক্তি প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রতি বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিতেন। সদাগরগণকে আহ্বান করিয়া কোন কথা বলিতে হইলে রাজা তাঁহাকেই সে কথা বলিতেন, এবং তাঁহার স্বদেশ-স্বন্ধে, তত্ত্বতা রাজনীতি, সমাজনীতি, সম্পদগোচর প্রভৃতি বিষয়ে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। রাজপুত্রকে তিনি সদাগর বলিয়াই জানিতেন।

রাজপুত্র এই নগরে থাকিয়া অনেক অদ্ভুত পদার্থ দেখিলেন। এক দিন তিনি একটি হিন্দু-মন্দিরে গিয়াছিলেন। মন্দিরটি পিত্তলনির্মিত, দশ বর্গ-হাত প্রশস্ত এবং পঞ্চাশ হাত উচ্চ। ইহার ভিতরে যে দেবমূর্তি ছিল, সেটি বিস্তৃত স্বর্ণে নির্মিত, পুস্তলিকার চক্ষু ছটি ছাখানি পদ্মরাগণি, যেখান হইতেই সেই মূর্তির দিকে দৃষ্টিপাত করা হউক, বোধ হয় যেন চক্ষু ছটি ঘুরিতেছে। আর একটি মন্দিরও তিনি দেখিলেন, এ মন্দিরটি একটি প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। মন্দিরের চতুর্দিকে পুষ্পকানন, মন্দিরটি প্রাচীরবেষ্টিত। যেন মন্দিরটি একখানি প্রস্তরে নির্মিত বলিয়াই বোধ হয়;—প্রস্তর গালবর্ণ, উত্তমরূপে পালিশ করা, মন্দিরটি দীর্ঘে ত্রিশ হাত, প্রস্থে বিশ হাত। মন্দিরচূড়া অতি সুন্দররূপে নানাবর্ণে সুরঞ্জিত। মন্দিরগাত্রে কত চিত্র, কত মূর্তি ক্ষোদিত, তাহার সংখ্যা নাই, অপূর্ণ শিল্পচতুর্ধ্য।

এই মন্দিরে প্রত্যহ সকালে পূজা ও আরতি হইত; নৃত্যগীত, বাজ ও নানা প্রকার তামাসাও দেখা যাইত, নানা দেশ হইতে পৌত্তলিক ব্যক্তিগণ আসিয়া এখানে পূজা দিত।

রাজপুত্র হোসেন দীর্ঘকাল বিশ্বনগর রাজ্যে বাস করিয়া, তত্ত্বতা বিশেষগুলি পর্যবেক্ষণ করিতে পারিতেন, কিন্তু ঈশ্বর এক বৎসর শেষ হইয়া আসিল, সুতরাং ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য তিনি বড় ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। নোরোনিহারকে বিবাহ করিবার ইচ্ছার তাঁহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। বর্ষশেষদিনে তিনি ঝায়ের প্রাণ্য বাড়ীভাড়া মিটাইয়া দিয়া, গৃহস্থে গোপনে তাঁহার সেই অদ্ভুত গালিচা প্রদর্শিত করিলেন, তাহার পর তিনি ও তাঁহার সহচর সেই গালিচায় উপবেশন করিলে রাজপুত্র ইচ্ছা করিলেন, তাঁহার পূর্বনির্দিষ্ট পাছশালায় উপস্থিত হইবেন,—যেমন ইচ্ছা করা, অমনি গালিচা শুল্ক উঠিয়া পড়িল এবং মহাবোগে তাঁহাদিগকে সেই পাছশালায় উপস্থিত করিল। গালিচা হইতে অবতরণ করিয়া রাজপুত্র দেখিলেন, তাঁহার ব্রাহ্ম্য তখনও প্রত্যাবর্তন করেন নাই, সুতরাং তিনি সদাগরের বেশে সেই পাছশালাতেই তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

হোসেনের মধ্যম ভ্রাতা রাজপুত্র আলি পারস্তাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। এক জন বশিকের সহিত চারিঘাসকাল পঞ্চপাঁটন করিয়া, অবশেষে তিনি পারস্ত-রাজধানী সিরাজ নগরে উপস্থিত হইলেন। তিনি অনেক সদাগরের সহিত পথে আলাপ করিয়াছিলেন, তাহাদিগের নিকটে জহুরী বলিয়া, তিনি আশ্চর্যচিত্র দান করিয়াছিলেন। সিরাজ নগরে উপস্থিত হইয়া, তিনি এক পাছাবাসে বাসা লইলেন।

অজ্ঞাত সদাগরগণ তাহারে পথপ্রদ্য গুণমাঝাত করিতে লাগিল, কিন্তু আলি সে সকল হাজারা কিছুই ছিল না, তিনি বজ্রাদি পরিবর্তন করিয়া নগরদর্শনে যাত্রা করিলেন ও ঘুরিতে ঘুরিতে বাজারে মধ্য উপস্থিত হইলেন। বাজারে নানাজাতীয় পণ্যপ্রদ্য এবং বিচিত্র শিল্পসামগ্রী দেখিয়া, তাঁহার মনে বিস্ময়ের স্ফূর্তি হইল। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন, এক জন কেরিওয়ালা একটি দুর্ঘবীকণ বয় বিক্রয়ের জন্য হাঁকিতেছে। যমটি প্রায় এক হাত লম্বা। বস্তুটি গজদন্ত-নির্মিত, ফেরিওয়ালা তাহার দান হাঁকিল ত্রিশ স্বর্ণদ্বীপ।

ভারতের
অতীত ঐশ্বর্য
↑ ↑ ↑
✽

অত্যাশ্চর্য
দ্রব্য



কেরিওয়ালকে ভাকিয়া আলি বলিলেন, “বাপু, তোমার জ্ঞান লোপ পাইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, তুমি এই একটি সামান্য বস্তুর মূল্য গ্রিশ স্বর্ণমুদ্রা চাহিতেছ ?” কেরিওয়াল বলিল, “মহাশয়, আপনি একা কেন, অনেকেই সন্দেহ করিতছেন, আমি কেশিয়াছি, কিন্তু আমার এই বস্তুর যে কি গুণ, তাহা যদি একবার জানিতে পারেন, তাহা হইলে আর আমাকে ক্যাপা মনে করিবেন না। মহাশয়, আপনি দেখিতেছেন, এটি সামান্য বস্তু—এক হাত কি তিন পোয়া লম্বা, দুই মুখে দুইখানি কাচমাত্র আবরণ, কিন্তু একবার ইহার তিতর দিয়া চাহিয়া দেখুন, বাহা দেখিতে চাহিবেন, তাহাই দেখিতে পাইবেন।”

আলি বলিলেন, “বটে! যদি তোমার এ বস্তুর এমন অসাধারণ গুণ হয়, তাহা হইলে তাই, তুমি ইহার এত দাম চাহিতে পার বটে।” তিনি যন্ত্রটি হাতে লইয়া একবার এদিক তদিক ঘুরাইয়া দেখিলেন; তাহার পর বলিলেন, “কেন্দ্রিক দিয়া দেখিতে হয়, তাহা বলিয়া দাও।” আলির চক্ষুর উপর কেরিওয়াল যন্ত্রটি স্থাপন করিলে আলি তাঁহার পিতাকে দেখিবার ইচ্ছা করিলেন, এমনই আলির চক্ষুর সম্মুখে তাঁহার পিতা রাজসভার সহিত দীপ্যমান হইয়া উঠিলেন। আরও দেখিলেন, হুম্মারী নৌরোরিয়ার সর্বাঙ্গ পর্যন্ত হইয়া দ্বানাপারে দান করিতেছেন। আলি বলিলেন, “বলি হাদি তাই, তোমার এ চমৎকার বস্তু, আমি ইহা ক্রয় করিব, তোমার বুদ্ধিতে যে সন্দেহ করিয়াছিলাম, সে জ্ঞান মাপ কর, কিন্তু গ্রিশ মোহর বড় বেশী দাম, কিছু কম হইলে চলে না?” কেরিওয়াল জিহ্বাদংশন করিয়া বলিল, “খোদার কসম, উহার এক পয়সা কমে বিক্রয় করিবার জকুম নাই।” আলি কেরিওয়ালকে সঙ্গে লইয়া বাগায় আসিলেন, এবং যন্ত্রটি ক্রয় করিলেন।

আলির মনে মহা আনন্দ! এমন অদ্ভুত সামগ্রী কি পৃথিবীতে আছে? তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল, ইহা তাঁহার পিতাকে উপহার প্রদান করিতে পারিলেই বৃদ্ধ হুলতান তাঁহার স্নেহপ্রতিমা নৌরোরিয়ার হুম্মারীকে তাঁহার হস্তেই সমর্পণ করিবেন। দেশে ফিরিতে যে কিছু বিলম্ব! পারতদশে সন্ধ্যাে কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা-সম্বন্ধ করা ভিন্ন সে দেশে অবস্থানের তাঁহার আর কোন উদ্দেশ্য রহিল না।

কিছুদিন পারতদশে অবস্থান করিয়া তত্ত্ব্য রীতিনীতিতে অভিজ্ঞতা সম্বন্ধ করিয়া, রাজপুত্র আলি তাঁহার এক জন সহযোগী পর্যটকের সহিত ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তাঁহার কোন অসুবিধা বা বিশম ঘটিল না, তিনি সেই পূর্বনির্দিষ্ট পাণ্ডশালায় উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা তাঁহার প্রতীক্ষায় সেখানে সমাগত হইয়া অপর ভ্রাতৃবরের প্রতীক্ষা করিতেছেন, কনিষ্ঠ রাজপুত্র আনন্দের আগমন প্রত্যাশায় তাঁহার সেখানে বাদ করিতে লাগিলেন।

রাজপুত্র আমেদ সময়কালে যাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি সেখানে বাস স্থির করিয়াই ছদ্মবেশে বাগার দেখিতে বাহির হইলেন। তিনি বাজারের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে দেখিলেন, এক জন ফলবিক্রেতা একটি নাসপাতি কুলের দাম হাঁকিতেছে—পয়গ্রিশ স্বর্ণমুদ্রা। আমেদ বলিলেন, “দেখি হে বাপু, তোমার কল, ইহার দাম ত’ দুই চারি পয়সায় বেশী হইতে পারে না, তা তুমি যে বড় পয়গ্রিশ মোহর দাম হাঁকিতেছ, তোমার কি এ সোনার নাসপাতি?” নাসপাতিটা আমেদের হাতে দিয়া ফলবিক্রেতা বলিল, “জায়ে কর্তা, সোনার নাসপাতির কি এত গুণ? আমার এই নাসপাতি বাহির হইতে দেখিলে একটা সামান্য কলই বোধ হইবে; কিন্তু যদি ইহার গুণের কথা শোনেন ত’ অবাক হইবেন। এ তো কল নয়,—অদ্ভুত। মাছরের যোগ বড়ই কর্তন হইক, সে মুহূর্ত-মধ্যায় পড়িয়া খাবি খাৎ না কেন, কোন রকমে ইহার একটু জাপ নাগারকে প্রবেশ করিলেই রৌপী একেবারে স্বহ হইয়া উঠিবে। তা সে যে রোপই হোক না, নাসিকায় এই নাসপাতি



ফল নয়—
অদ্ভুত!



একটু জ্ঞান বাঙা চাই মাত্র। অল্পত নাসপাতি !” আমের বলিলেন, “সত্য হইলে অল্পতই বটে, কিন্তু ভাই, আমি কেমন করিয়া বুঝিবে, তুমি যাঁহা বলিতেছ, তাঁহা ছাঁকা সত্য কথা, একটুও ভেদাঙ্গ মিশান নহে ?” কলবিক্রেতা বলিল, “মশায়, সমরকন্দ সহরের সকল লোক এ ফলের গুণ জানে, আপনি বাক্যে এ সহকে জিজ্ঞাসা করিবেন, করুন না ; আমি ফলের যে গুণের কথা বলিলাম, তাঁহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। আপনি এমন লোক দুই চারি জন দেখিতে পাইবেন, যাঁহারা এই ফলের আশ্রমে মৃত্যুমুখ হইতে কিরিয়া আসিয়া, এখন সুস্থদেহে সদাধারক পালন করিতেছে। এক জন চিকিৎসক বহু বৎসর চেষ্টা করিয়া এই অল্পত ফল প্রস্তুত করিয়াছেন। সমস্ত জীবন তিনি এই চেষ্টাতেই ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহার পর হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি মৃত্যুকালে এই অল্পত ফলের জ্ঞান লইবার অবসর পান নাই, এখন তাঁহার বিধবা পত্নী দ্রুতবাহ্য পড়িয়া এই ফল বিক্রয় করিতেছেন।”

রাজপুত্র আমের ফলের বিশেষ পরিচয় পাইয়া, বিক্রেতার প্রার্থিত মূল্যেই সেই ফল ক্রয় করিলেন, এবং আরও কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিয়া, সমরকন্দের অল্পত জব্যরাজি দেখিতে লাগিলেন। অবশেষে এক জন সদাগরকে সঙ্গে পাইয়া স্বদেশবাত্তা করিলেন।

আমের পূর্বনির্দিষ্ট পাঁচশালায় উপস্থিত হইয়া, তাঁহার অপর দুই ভ্রাতার সাক্ষাৎ পাইলেন; দেখিলেন, তাঁহার দুই ভ্রাতা সুস্থদেহে তাঁহার প্রতীকা করিতেছেন, দেখিয়া তাঁহার মনে অনির্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইল।

আমি পাঁচশালায় কিরিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর হোসেন তাঁহার অগ্রে কিরিয়াছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “দাদা, তুমি কত দিন এখানে কিরিয়াছ ?” হোসেন বলিলেন, “তিন মাস হইবে।” আমি বলিলেন, “ও, তাঁহা হইলে তুমি বোধ করি, অতি অল্প দূর হইতেই কিরিয়া আসিয়াছ।” হোসেন গভীরস্বরে বলিলেন, “আমি কোথায় গিয়াছিলাম, কি লইয়া কিরিয়াছি, সে কথা এখন কিছুই বলিব না। আমি বিদেশে পাঁচ মাস ছিলাম, যদি আরও বেশী দিন থাকি দরকার মনে করিতাম, তাঁহাও থাকিতাম।”—“তুমি পাঁচ মাস ছিলে, তিন মাস আসিয়াছ বলিতেছ, তাঁহা হইলে সেখানে বাহিতে কত দিন লাগিয়াছিল ?”—হোসেন বলিলেন, “চারি মাস।” “তাঁহা হইলে তুমি কি উড়িয়া আসিয়াছ না কি ? তোমার হিসাবেই ত’ সেখানে এক মাসের বেশী বাস করা হয় না।”—আমি এই কথা বলিলে হোসেন বলিলেন, “ভাই, জেরায় কিছু বাহির হইবে না, আমি এখন কোন কথা ভাবিব না। আগে আমের আমুক, তখন সকলই জানিতে পারিবে; বুঝিবে, আমার একটা কথাও মিথ্যা নহে, এখন আমি এই পর্যন্ত বলিতে পারি, আমি যে সামগ্রী আনিয়াছি, তাঁহা অল্পতপূর্ণ, তুমি বাহাই আনিয়া থাক, আমার জিনিষ তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাঁহা অপেক্ষা অল্পত, এমন অল্পত সামগ্রী আর কিছুতেই হইতে পারে না।”

আমি কিছুই ভাবিলেন না; কেবল গভীরস্বরে বলিলেন, “তাঁহা হইবে!”—আমি জানিতেন, তাঁহার সঙ্গীত হৃদয়-নির্ভর দূরবীণ অপেক্ষা অল্পত পদার্থ সংগ্রহ করা কাহারও সাধ্য নহে। আমেরের আগমনের পূর্বে কেহই স্ব স্ব অল্পতজব্যের কথা প্রকাশ করিলেন না, উভয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে আমেরের আগমনপ্রতীকা করিতে লাগিলেন।

তিন ভ্রাতা সম্মিলিত হইলে, তাঁহারা প্রথমে পরস্পরকে অভিনন্দন করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহার পর হোসেন বলিলেন, “আমরা তিন ভাই একত্র হইয়াছি, আমাদের ভ্রম-বৃত্তান্ত পরে পরস্পরের গোচর করিব, আপাততঃ আমরা কে কি আনিয়াছি, তাঁহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। এখন আর গোপনের আবশ্যক নাই। আমরা এখনই বুঝিতে পারিব, শিতা কাহার জব্যে মুক্ত হইয়া কাহাকে

মৃতসজীবনী
শক্তি সংগু



অত্যাচর্য
জব্য সংগ্রহের
প্রতিযোগিতা





অন্তর্গত করিবেন। আমি সকলের বড়, সুতরাং আমি যাহা আনিয়াছি, তাহাই সর্বাগ্রে প্রদর্শন করি। আমি যে গালিচার উপর বসিয়া আছি, বিশনগর রাজ্যে আমি এই গালিচা ক্রয় করিয়াছি, ইহাই আমার সর্কশেকা অঙ্কত পদার্থ। গালিচাখানি দেখিতে অতি সামান্য বটে, কিন্তু ইহার গুণ অসাধারণ। আমি চল্লিশ মোহর দিয়া ইহা ক্রয় করিয়াছি। এই গালিচার উপর বসিয়া আমি যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিব, সেখানে তৎক্ষণাৎ বাইতে পারিব। আমি এ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া তবে আসন ক্রয় করিয়াছি। আমি বিশনগর রাজ্যের রাজধানী হইতে চারি মাসের পথ এই গালিচার উপর চড়িয়া চারি দণ্ডের মধ্যে আনিয়াছি। তোমাদের যখন ইচ্ছা হইবে, বলিও, আমার গালিচার গুণ পরীক্ষা করিয়া দেখাইব।”

হোসেনের কথা শেষ হইলে আলি বলিলেন, “দাদা, আমি স্বীকার করিতেছি, তোমার এই গালিচা খুব অঙ্কত বটে; কিন্তু আমি যাহা আনিয়াছি, তাহা তোমার ঐ গালিচা অপেক্ষা অঙ্কত না হউক, সমান অঙ্কত বটে। তবে সম্পূর্ণ অল্প প্রকারের অঙ্কত, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমার এই যে চোঙ দেখিতেছে, এটা সন্মুখ দিকের দিকের চোঙ, দুই দিকে দুইখানি কাচ বদান; কিন্তু এ বড় সাধারণ চোঙ নহে। ইহার ভিতর দিয়া যাহা দেখিতে চাহিবে, তাহাই দেখিতে পাইবে, তা সে দ্রব্য লক্ষ ক্রোশ দূরে থাক। আমি আমার কথায় তোমাদের বিশ্বাস করিতে বলিতেছি না, তোমরা এখনই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।”

হোসেন ভাবিলেন, আর কাহাকে দেখিব। একবার দেখি, আমার জ্বরবিসম্বাদিনী নোরোমিহার কি ভাবে আছেন, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি। হোসেন চোঙটিকে চক্ষু স্থাপন করিয়া আগ্রহপূর্ণ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন।

আলি ও আমেদ হোসেনের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন; দেখিলেন, হোসেনের মুখ অন্ধকার হইয়া আনিয়াছে, লগাট ধরাইল। তাঁহার এই প্রকার মুখ দেখিয়া উভয়েই বুঝিলেন, কিছু গুরুতর ঘটনা ঘটয়াছে। আলি ও আমেদ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার পূর্বেই হোসেন বলিলেন, “ভাই, আমাদের এক চেষ্টা, বস্তু ও পথপ্রদর্শক বৃক্ষ অনর্থক হয়। নোরোমিহারকে লাভ করা বৃক্ষ আমাদের কাহারও ভাগ্যে ঘটনা উঠিল না। আর কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই নোরোমিহারের প্রাণবিয়োগ হইবে। হায়, হায়, তাহার সহিত আমাদের সাক্ষাতেরও আর আশা নাই।”

আলি হোসেনের নিকট হইতে চোঙ লইয়া তাহার উপর চক্ষু স্থাপন করিলেন। তিনি দেখিলেন, তাঁহার দাদার কথা কিছুমাত্র অতিরিক্ত নহে, নোরোমিহারের আন্তিমকাল সত্যই সন্নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

অনন্তর দূরবীক্ষণটি হস্তে লইয়া আমেদ সাবধানে নোরোমিহারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিলেন, তাহার পর আলির হস্তে দূরবীক্ষণটি প্রদান করিয়া বলিলেন, “দাদা, অবিলম্বে যদি আমরা নোরোমিহারের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তাহা হইলে তাঁহার প্রাণ-রক্ষার উপায় হইতে পারে।” আমেদ তাঁহার যত্নসজ্জীবন নাসপাতি বাহির করিয়া সোষ্ঠ সোধোরঘরকে দেখাইলেন; বলিলেন, “এই নাসপাতি আশনাদের অঙ্কত গালিচা ও অঙ্কত চোঙ অপেক্ষা অল্প অঙ্কত নহে, আমি ইহা পরিত্রিশ মোহরে ক্রয় করিয়াছি। ইহার গুণ এই যে, কে কোন রোগে এই নাসপাতির আজ্ঞা লইবামাত্র ব্যাধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে, রোগীর দেহে প্রাণ থাকিলেই আর তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা নাই, সুতরাং বুঝিতে পারিতেছেন, যদি অবিলম্বে নোরোমিহারের নিকট উপস্থিত হইতে পারি, তবে তাহার প্রাণবিয়োগের আর আশঙ্কা নাই।”

হোসেন বলিলেন, “যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, আমার এই আসনে চড়িয়া আমার অবিলম্বে গৃহে উল্লসিত হইতে পারি, আর সময় নষ্ট করিবার আবশ্যক নাই, আমাদের সহচরণগণকে বিদায় দিয়া আমরা ইহাতে চড়িয়া যাই, আসনে অনাস্রাসেই তিন জনের স্থান হইবে।”



আগনে উপবেশন করিয়া তিন জনই তাঁহাদের পিতার প্রাসাদে উপস্থিত হইবার ইচ্ছা করিলেন। ইচ্ছামাত্র তাঁহারা পিতার প্রাসাদে নোরোমিহায়ের কক্ষে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে হঠাৎ সেখানে উপস্থিত হইতে দেখিয়া দাসী ও ষোড়শগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। প্রথমে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্ভত হইল; কিন্তু তাহারা অবিলম্বেই তাহাদিগের দ্রব্য ব্রীতে পারিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল।

রাজপুত্র আমেদ কণ্ঠকাল বিলম্ব না করিয়া নোরোমিহায়ের শয্যা প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইলেন, নোরোমিহায়ের তখন নাভিখাগ উপস্থিত, জীবনের কোনই আশা ছিল না। আমেদ তাঁহার নাসপাতি বাহির করিয়া নোরোমিহায়ের নাসিকা প্রান্তে ধরিলেন। দেখিতে দেখিতে নোরোমিহায়ের ব্যাধি দূর হইল, তিনি চারিদিকে চাহিয়া উঠিয়া বসিলেন, তাহার পর তিনি তাঁহার পরিচ্ছদ পরিধানের ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার বোধ হইল, দীর্ঘকাল নিদ্রার পর যেন সহসা জাগিয়া উঠিলেন।

তিনি রাজপুত্রগণকে, বিশেষতঃ আমেদকে তাঁহার প্রাণরক্ষায় জন্ত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাঁহারাও ঠিক সময়ে আসিতে পারিয়াছেন, এজ্ঞা আনন্দ প্রকাশ করিয়া সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর তাঁহারা স্বলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণবন্দনা করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন, নোরোমিহায়ের দাসীগণ তাঁহাদের সেখানে গমনের পূর্বেই তাঁহাদের মনিবের আয়োগানুবাদ স্বলতানের গোচর করিয়াছে। স্বলতান পুত্রগণকে দীর্ঘকাল পরে দেখিতে পাইয়া সময়েই তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন



প্রেম-
কান্ন মন-
জীবন

দান করিলেন। পদম্পর্শ কুশলাদি জিজ্ঞাসা শেষ হইলে, রাজপুত্রগণ তাঁহাদের সংগৃহীত আশ্চর্য্য দ্রব্যগুলি একে একে স্বলতানকে প্রদান করিলেন, এবং স্ব স্ব দ্রব্যের গুণকীর্তন করিয়া, স্বলতান কোন দ্রব্যটি সর্বাধিক অধিক আশ্চর্য্য মনে করিতেছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিলেন।

স্বলতান অনেককণ পণ্ডিত দ্রব্যত্রয়ের গুণাবলীর কথা চিন্তা করিলেন, সেই তিনটি দ্রব্যই যে নোরোমিহায়ের জীবনবানানের সহায়, তাহাতে তাঁহার সন্দেহ রহিল না। অনেককণ পরে তিনি বলিলেন, “বংশগণ, তোমাদের সংগৃহীত দ্রব্যত্রয়ের মধ্যে কোনটি সর্বাধিক অধিক অদ্ভুত, তাহা বিচার করিয়া যদি মত স্থির করিতে পারিতাম, তাহা হইলে বিশেষ অর্থের বিষয় হইত বটে, কিন্তু তোমরাই বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি

পরীক্ষা-সমতা





এ সময়ে কিরণ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি। নাস্তপাতি আশ্রয় করাইয়া আমেন নোরোরিহাদের প্রাণরক্ষা করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পীড়ার সংবাদ আলির দূরবীণ ভিন্ন আমেন কখনই পাইত না, বিশেষতঃ হোসেনের শালিচা ভিন্ন তোমরা কখনই নোরোরিহাদের আসন্ন-মৃত্যুকালে এখানে উপস্থিত হইতে পারিতেন না, আবার আমেনের নাস্তপাতি না থাকিলে আসন ও দূরবীণের উপকারিতা কোনই কাজে আসিত না। নোরোরিহাদের তাহার জীবনের জন্ত তোমাদের সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞ। আমি মনে করিতেছি, তোমাদের তিন জনের সংগৃহীত পদার্থই সমান বিষয়জনক, সমান অমূল্য। আমি তোমাদের মধ্যে-যে কোন প্রাতার হস্তে নোরোরিহাদের দান করিতে পারি। তোমরা বিদেশভ্রমণে যাত্রা করিয়া এই সকল অমূল্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছে বলিয়াই নোরোরিহাদের প্রাণরক্ষা হইল। কিন্তু তোমরা তিন জনে কখনই একটি বালিকাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, হুতরাং তোমাদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্ত পুনরায় পরীক্ষা দিতে হইবে। আজ এখনও কিঞ্চিৎ বেলা আছে, অতএব আজই সেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হউক। আমার ইচ্ছা, তোমরা ধর্ম্মার্থী হস্তে দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে গিয়া তোমাদের ধর্ম্মবিক্রয়ার পরিচয় প্রদান কর। আমি স্বয়ং যাইতেছি। তোমাদের তিন প্রাতার মধ্যে বাহার শর অধিক দূরে নিক্ষেপ হইবে, আমি তাহারই হস্তে নোরোরিহাদের সমর্পণ করিব। তোমরা আমার জন্ত বিভিন্ন দেশ হইতে যে সকল দ্রব্য উপহার সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছ, তাহা লাভ করিয়া আমি তোমাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি, তোমাদিগকে পুস্ত্ররূপে লাভ করিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। তোমাদের সংগৃহীত দ্রব্য কয়টি আমার ধনভাণ্ডার শোভিত করিবে, আমার আশা আছে, এ সকল দ্রব্যের দ্বারা আমি ভবিষ্যতে উপকার পাইব।”

হুলতান পুস্ত্রের শক্তি-পরীক্ষার জন্ত যে আদেশ প্রদান করিলেন, সে বিষয়ে কাহারও প্রতিবাদ করিবার কোন কারণ ছিল না। তাঁহারা দুর্গ-প্রাচীরের বহির্ভাগে চলিলেন। নগরমধ্যে এই পরীক্ষার কথা অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিবোধিত হইল। “দলে দলে নগরবাসী রাজপুত্রগণের বাহুর শক্তিপরীক্ষা দেখিতে নাঠে আসিয়া জমিতে লাগিল।

হুলতান পরীক্ষাক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, রাজপুত্র হোসেন ধর্ম্মার্থী গ্রহণ করিয়া তাঁহার দেহের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া বাণ নিক্ষেপ করিলেন, হোসেনের শর বহুদূরে গিয়া ভূমিস্পর্শ করিল। হোসেনের পক্ষ আলি হোসেনের পাশে পাড়াইয়া নোরোরিহাদের আশ্রয় প্রবলশক্তিতে পরনিক্ষেপ করিলেন, আলির শর হোসেনের শর ছাড়াইয়া কিছু দূরে গিয়া পড়িল। দেখিয়া হোসেনের মুখ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার আশা ফুঁড়াইয়াছে, কিন্তু আলির মনের আনন্দ প্রবল হইল না, তবে তাঁহার বৃকের মধ্যে চক্রবর্ত্ত করিয়া কাঁপিতে লাগিল, পাছে আমেনের শর আরও অধিক দূরে গিয়া পড়ে, পাছে নোরোরিহাদের আমেনের হস্তগত হয়। বাহা হউক, আমেন সর্ব্বশেষে শর নিক্ষেপ করিলেন, শন শন শব্দে শর ছুটিয়া গেল। সকলেই ভাবিল, আমেনের শর সকল শরকে ছাড়াইয়া অধিক দূরে গিয়া পড়িবে। কাহার শর কোথায় পড়িয়াছে, দেখিবার জন্ত তিন সহোদরই অধঃ ছুটাইয়া দিলেন। হোসেন ও আলির শর পাওয়া গেল, কিন্তু আমেনের শর কিছুতেই খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সকলেই বলিল, হোসেনের শর অপেক্ষা আলির শর দূরে পড়িয়াছে, অতএব নোরোরিহাদের তাঁহারই প্রাণ। কিন্তু আমেনের শর নিকটে পড়িয়াছে কি দূরে পড়িয়াছে, তাহা বখন স্থির হইল না, তখন হুলতান তাঁহার হস্তে নোরোরিহাদের সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। আলির সহিত নোরোরিহাদের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। কয়েক দিনের মধ্যেই বিবাহের উৎসব আরম্ভ হইল।



হোসেন এ বিবাহে যোগদান করিলেন না। তিনি নোরোরিয়ারকে আত্মীয়িক ভালবাসিতেন, তাঁহার প্রেমে তিনি বিবাহের হইয়াছিলেন, সেই প্রশংসিত অপরের সহিত বিবাহিতা হইতেছেন, এ দৃশ্য তিনি প্রশংসিত দেখিতে পারিবেন না বলিয়াই বিবাহে যোগদান করিলেন না। তিনি তাঁহার পিতার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া মনের ক্ষোভে পিতৃস্বাক্ষর পরিত্যাগ করিয়া, দরবেশের পরিচ্ছদে একটি মসজিদে উপস্থিত হইয়া এক জন বিখ্যাত দরবেশের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।

রাজপুত্র আমেদও ঠিক এই কারণে আলির বিবাহে যোগদান করিলেন না। কিন্তু তিনি হোসেনের স্ত্রীর দরবেশ হইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না যে, তাঁহার নিকৃষ্ট শর অশুভ হইল কেন? এ শর নিশ্চয়ই কোথাও গিয়া পড়িয়াছে। কোথায় পড়িয়াছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে স্থির করিয়া, আমেদ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং যেখানে হোসেন ও আলি-নিকৃষ্ট শর নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে বামে, দক্ষিণে ও সম্মুখে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে করিতে অগ্রগমন হইলেন। তিনি বহুদূরে অগ্রগমন হইয়াও তাঁহার নিকৃষ্ট শর দেখিতে পাইলেন না। চলিতে চলিতে অবশেষে তিনি এক পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। এই পর্বতটী রাজপ্রাসাদ হইতে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

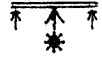
নিকৃষ্ট শরের
অগ্রগমন



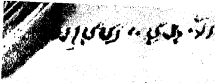
আমেদ এই পর্বতের পাদদেশে তাঁহার নিকৃষ্ট শরটি নিপতিত দেখিতে পাইলেন, তিনি সন্মুখে শরটি হাতে তুলিয়া লইয়া, তাহা দেখিতে দেখিতে বলিলেন, এটি আমারই শর, কিন্তু আমি কিহা অস্ত্র কোন মন্তব্যই এত দূরে কখনও শর নিক্ষেপ করিতে পারেন না। তিনি আরও দেখিলেন, শরটি মাটিতে না বিধিয়া তাহা মাটিতে পড়িয়াছিল, স্বতরাং তাঁহার অমুমান হইল, শর পর্বতে প্রতিহত হইয়া, এখানে আদিয়া পড়িয়াছে। রাজপুত্র মনে করিলেন, ইহাও মধ্যে নিশ্চয়ই কোন বিষয়কর রহস্য আছে, হয় ত' তাহা তাঁহার মঙ্গলের জন্তও হইতে পারে। বস্তুতঃ রহস্যটী কি, তাহা নির্ণয়ের জন্ত তিনি ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, এবং নানা কথা চিন্তা করিতে করিতে অদূরবর্তী একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

আমেদ দেখিলেন, গুহার এক প্রান্তে একটি লোহস্রাব রহিয়াছে। ঘরটি অন্ধকার। তিনি প্রথমে ভাবিলেন, হয় ত' ঘর ভিতর হইতে অর্ঘ্যবদ্ধ, কিন্তু তাঁহার করস্পর্শমাত্র ঘরটি ভিতরের দিকে খুলিয়া গেল। সেই ঘরপথে তিনি তাঁহার শরটি হস্তে লইয়া অগ্রগমন করিলেন। অন্ধকারের পথ, সোপান নাই, পর্বতগুহা ঢালু হইয়া যেন নিম্নদিকে চলিয়া গিয়াছে। আমেদ ভাবিলেন, হয় ত' শীতল হাঁহাকে অন্ধকারের মধ্যে পড়িয়া প্রত্যাপমনে বাধা হইতে হইবে, কিন্তু কিয়দূর নামিয়াই দেখিলেন, অন্ধকারের পরিবর্তে একটি অপূর্ণ জ্যোতিতে তাঁহার গমনপথ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। এই জ্যোতি ঠিক স্বর্য়ালোকের স্তায় নহে, অনেক পরিমাণে বৈজাতিক আলোর স্তায় শুভ্র, উজ্জ্বল, স্থিরচকুর আলোক নহে, শরতের পূর্ণচন্দ্র গগনগুণে উদ্ভিত হইলে যেরূপ আলোকের আশা করা যায়, সেইরূপ আলোক। আমেদ যখনই সেই পথে চলিতে লাগিলেন।

জ্যোতির্লীলা
গুহাপথে



পক্ষপাতি ধাপ পা চলিয়াই আমেদ একটি সুপ্রশস্ত স্বপ্নজিত প্রাসাদ দেখিতে পাইলেন। তিনি প্রাসাদের মধ্যে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছেন, এমন সময় একটি সালঙ্কারী পরমাত্মকরী যুবতী কতকগুলি সহচরীযুগে পরিবৃত্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমেদ বুঝিলেন, সেই অপার্থিব স্বপ্নময়ী এই প্রশস্ত হর্ষ্যের অধিবাসিনী। রাজপুত্র আমেদ যুবতীটিকে দেখিয়াই তাঁহাকে নমস্কার করিবাম জন্ত অগ্রগমন হইলেন। কিন্তু যুবতী তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াই মধুরবর্ণে বলিলেন, "রাজপুত্র আমেদ, আত্মন, আমরা আপনাকে সাধরে অভ্যর্থনা করিতেছি।"



এই অজ্ঞাতস্থানে অপরিচিত যুবতীর মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হইতে শুনিয়া, রাজপুত্র আমেদ বড়ই বিম্বিত হইলেন, তাঁহার পিতার রাজ্যের সন্নিকটে যে একশ এক অদ্ভুত প্রাসাদ আছে, তাহাও তিনি জানিতেন না। তিনি যুবতীকে অভিবাধন করিয়া বলিলেন, “ঠাকুরাণি, আমি এখানে অনধিকারপ্রবেশ করিয়া মনে মনে বড়ই সম্বুচিত হইতেছিলাম, কিন্তু আপনার অভয়বাণীতে আমার সকল সঙ্কোচ ও আপত্তা দূর হইল। আপনি আমার পিতার রাজ্যের এত নিকটে বাস করেন, তথাপি আমি এ পর্য্যন্ত কখনও আপনাকে দেখি নাই, আপনাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও কোন কথা অবগত ছিলাম না, ইহাতে আমি বড়ই বিম্বিত হইয়াছি।”



যুবতী বলিলেন, “রাজপুত্র, আপনি অগ্রে বিশ্রাম করুন, তাহার পর আপনাকে সকল কথা বলিব।”— যুবতীর ইচ্ছিতে রাজপুত্র আর একটি সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। এই কক্ষটি নীলবর্ণে ও স্বর্ণরেখায় সজ্জিত, এমন সুন্দর গৃহ তিনি আর কোন স্থানে সন্মর্শন করেন নাই। তাঁহার বিষয় দেখিয়া যুবতী বলিলেন, “রাজপুত্র, আমার প্রাসাদের এই কক্ষটি বিশেষ কিছুই নয়, সমস্ত প্রাসাদ সন্মর্শন করিয়া আপনিও এ কথা স্বীকার করিবেন।” যুবতীর অনুরোধে রাজপুত্র এক সোকার উপর বসিলেন, যুবতীও তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। অনন্তর যুবতী তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, “রাজপুত্র, আপনার সহিত আমার পরিচয় না থাকিলেও আমি আপনাকে চিনি, আমাকে দেখিয়া আপনি বিম্বিত হইয়াছেন; আমার পরিচয় শুনিলে আর আপনার বিষয় থাকিবে না। আপনি বোধ হয় অবগত নহেন যে, এই পৃথিবীতে মানব অপেক্ষাও এক উচ্চশ্রেণীর জীবের বাস আছে, তাহারা দৈত্য। আমি এক জন প্রধান দৈত্যের কন্যা, আমার নাম পরীবাণু পরী। আমি আপনাকে, আপনার ভ্রাতৃগণকে, পিতাকে, এমন কি, নোরোসিহাকে পর্য্যন্ত চিনি। আপনি নোরোসিহাদের প্রণয়ে মুগ্ধ, তাহাও জানি, এবং আপনার সমরকল্প-দ্রুপের কাহিনীও আমি অবগত আছি। আপনি সমরকন্দে যে নদীপতি, আলি সিরাঞ্জে যে দূরবীক্ষণ এবং হোসেন বিশনগরে যে গালিচা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তা আমিই পাঠাইয়াছিলাম, সুতরাং আমার কথা হইতেই আপনি বৃত্তিতে পারিতেছেন, আমি সকল সংবাদই অবগত আছি। আমি আপনাকে এখন একটা কথা বলি। নোরোসিহাকে বিবাহ করিতে পারিলেন না বলিয়া আপনি ক্ষুব্ধ হইবেন না, আপনার আত্মা তাহা আপেক্ষা অধিক সুখ আছে। আপনাকে সেই সুখপ্রদানের পূর্ব্ণাভাস্বরূপ আমি আপনার নিকট তাঁর উড়ইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে নিক্ষেপ করি। এখন আপনার স্বরী হওয়া আপনার হাতেই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।”



পরীবাণু এই কথা বলিয়া মুখ নত করিলেন, লক্ষ্য্য তাঁহার সুন্দর গৌরবর্ণ মুখে রক্তিমভা সূঁটিয়া উঠিল। তাঁহার মুখের দিক চাহিয়াই রাজপুত্র আমেদ বৃত্তিতে পারিলেন, পরীবাণু কোন সুখের কথা বলিতেছেন। আমেদ মনে মনে চিন্তা করিয়া দেখিলেন, নোরোসিহাকে তিনি কখন লাভ করিতে পারিবেন না। অন্তিমিক পরী পরীবাণু নোরোসিহার অপেক্ষা সহস্রগুণে অধিক সুন্দরী। তিনি পরীবাণুকে সন্নিবেশ করিলেন, “হৃদয়ি, যদি আমি আপনার দাম হইতে পারি, এবং আপনার অঙ্গুগ্রহলাভে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমি নিঃসন্দেহই পৃথিবীতে সকল মহুয়া অপেক্ষা অধিক সুখী হইব। আপনি আমার এই সাক্ষ্য মার্জ্জনা করিবেন, আমি আপনার অলৌকিক রূপগুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি।”

পরীবাণু বলিলেন, “রাজপুত্র, পিতা-মাতার অনুরোধক্রমে দীর্ঘকাল হইতেই আমি স্বাধীন। আমি আপনাকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া, আমার প্রাসাদে গ্রহণ করিব না, আপনি এই বিস্তীর্ণ প্রাসাদের

ধর্মধামিরূপেই এখানে বাস করিবেন। আমার সর্ব্ব্ব আপনাই হইবে। আপনি আমাকে আপনার পরীক্ষণে গ্রহণ করিলে, আমি নিজের জীবন ধন্য মনে করিব। আপনাকে আমার জীবন, যৌবন, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সকলই প্রদান করা তির আমার অন্ত উদ্দেশ্য, অন্ত সংকল্প নাই। আমার কথা শুনিয়া আপনি আমার সম্বন্ধে কোন মন্দ ধারণা করিবেন না, আমি বলিয়াছি, আমি স্বাধীন। মানুষের মধ্যে রমণী কখন পুরুষকে সাথিয়া তাহাকে ভজনা করে না। কিন্তু আমরা পরী, আমাদের নিয়ম স্বতন্ত্র, ইহাতে আমরা কোন দোষ দেখি না।”

পরীবাণু পরীর কথা শুনিয়া রাজপুত্র আমেদ কোন উত্তর করিলেন না। ক্রতজ্ঞতাভরে তিনি পরীবাণুর বহুপ্রাপ্ত চূষন করিতে উত্তত হইলেন, কিন্তু তাহার অবগর প্রদান না করিয়া পরীবাণু তাহার হৃদয়, মৃগোল, স্তন হাতখানি আমেদের সম্মুখে ধীরে ধীরে প্রসারিত করিলেন। আমেদ কল্পিতহস্তে তাহা ধারণ করিয়া গভীর প্রেমভরে পরীবাণুর করতল চূষন করিলেন। পরীবাণু বলিলেন, “রাজপুত্র, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে গ্রহণ করিলে আমি আপনার হইব, কিন্তু আপনি ত’ সেরূপ অঙ্গীকার করিলেন না?” আমেদ



আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিলেন, “সুন্দরি, আমি কি ইহাতে অসম্মত হইতে পারি, ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলাম।” পরীবাণু হাসিয়া বলিলেন, “ভাঃ হইলে তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার জী, আজ হইতে আমি তোমারই হইলাম। আমাদের মধ্যে বিবাহের ছায়া কোন সামাজিক প্রথা নাই, আমাদের কথাতেই বিবাহ, আমাদের এই বিবাহ মানুষের বিবাহ অপেক্ষা অল্প পবিত্র নহে, আমাদের প্রেম অধিকতর হৃদয়। আমার সচেতরীগণ আজ রাত্রিকালে বিবাহের উৎসবের আয়োজন করুক, আমার বোধ হইতেছে, তুমি দীর্ঘকাল অসুস্থ, এগো, এখন আমরা কিঞ্চিৎ আহার করি।” পরীবাণু কয়েক জন দাসীকে ইজিত করিলেন, তাঁহারা প্রথিতবর্ণের অল্প উৎকৃষ্ট খাদ্যজবা ও মন্ড লইয়া আদিল।

আহার শেষ হইলে পরীবাণু রাজপুত্র আমেদকে বিভিন্ন কক্ষ দেখাইবার অল্প সময়ে লইয়া ফিরিতে গেলিলেন। কক্ষে কক্ষে কত দীর্ঘক-রত্ন, কত পদ্মরাগ মরকত মণি, কত চূর্ণিপাশা, কত নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত

পরী
কর-
চূষন

কথার বিবাহ
অধিক হৃদয়





তাহাকে চিরকালের জন্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তাই বিরহাশ্রয় তিনি অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তিনি কাতরভাবে আমেদকে বলিলেন, “প্রিয়তম, আমি কি কোনরূপে তোমার মনে বেদনা দিয়াছি যে, তুমি আমাকে সহস্র বিরহ-আখারে কেলিয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছ? তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তুমি চিরজীবন আমার প্রতি অধরকৃত থাকিবে, সে প্রতিজ্ঞার কি এই পরিণাম? আমি বুঝিতেছি, আমার প্রতি তোমার প্রেমের আসক্তি কমিয়াছে, কিন্তু আমি এখনও আমার সমস্ত প্রাণ দিয়া তোমাকে ভালবাসি, আমি ত’ প্রণয়-অমুরাগ প্রকাশ করিতে যুহুর্তের জন্য ও ক্রটি করি নাই।”

রাজপুত্র আমেদ বলিলেন, “হৃদয়েশ্বর, আমার প্রতি তোমার যে স্বগভীর ভালবাসা দেখিতে পাইতেছি, যদি আমি তাহার মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার হৃদয় নরাদম অকৃতজ্ঞ পৃথিবীতে আর কেহই নাই; যদি আমার প্রার্থনায় তুমি অসন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে আমি সর্ব্বপ্রকার প্রার্থনিত করিতে প্রস্তুত আছি। আমি তোমার নিকট যে বিদায় প্রার্থনা করিয়াছি, তাহা তোমার প্রতি আমার প্রণয়ের অভাববশতঃ নহে। আমার বৃদ্ধ পিতার প্রতি আমার কর্তব্য মন্বণ করিয়াই আমি তোমাকে এ অনুরোধ করিয়াছি, তিনি আমাকে কত দিন দেখেন নাই, আমার অদর্শনে তিনি মনে কত বেদনা পাইতেছেন, ইহা ভাবিয়াই আমি বিদায় প্রার্থনা করিয়াছিলাম। যদি আর কিছু দিন তিনি আমাকে দেখিতে না পান, তাহা হইলে আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছি ভাবিয়া তিনি অধিকতর সন্তপ্ত হইবেন। বাহা হউক, আমি কয়েক দিনের জন্য তোমাকে ছাড়িয়া যাই, ইহা যখন তোমার ইচ্ছা নহে, তখন আমি পিতার নিকট যাইবার সংকল্প পরিত্যাগ করিলাম। তোমাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য আমি সকলই করিতে পারি।”

পরীবাণ রাজপুত্রের কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন, তাহার হৃদয়ে প্রেমের অভাব হয় নাই, তিনি রাজপুত্রকে স্তম্ভী করিবার জন্য তাহাকে পিতৃ-সন্দর্শনে যাত্রা করিবার অন্তিম প্রদান করিবেন, প্রতিশ্রুতি দিলেন।

বাদশাহ্‌ ছই পুত্রের অদর্শনে নিরতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, তাহার মনে বিন্দুমাত্রও স্নেহ ছিল না। তিনি আলির বিবাহে আনন্দ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই শুনিতে পাইলেন, হোসেন দরবেশ হইয়া অদূরবর্তী মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। পুত্র ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিয়াছেন শুনিয়া, তিনি তাহার অদর্শন-কষ্টে ধীরভাবে বহন করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমেদের সংবাদ না পাইয়া তাহার হৃদিতার সীমা রহিল না, তিনি রাজ্যের চতুর্দিকে আমেদের সন্ধানে অখারোহী দল প্রেরণ করিলেন, কিন্তু অখারোহীরা তাহাকে কোথায় খুজিয়া পাইবে? তাহার সন্ধানই অকৃতকার্য হইয়া ক্রমে ক্রমে কিরিয়াম আলি। স্থলতানের হৃদিতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইয়া উঠিল। সর্ব্বদাই উজীরকে আমেদের কথা বলিতেন। তিনি এক দিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, “উজীর, তুমি জান, আমার তিন পুত্রের মধ্যে আমেদকে আমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রেম করি। আমি তাহার সন্ধানের জন্য কত চেষ্টা করিয়া দেখিলাম, তাহাও তুমি অবগত আছ, কিন্তু আমার চেষ্টা ফলবর্তী হইল না। আমার মনে এক্ষণ ভীষণ যাতনা হইয়াছে যে, বোধ করি, আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। যদি তুমি আমাকে আশ্রয়দাতা হইতে রক্ষা করিতে চাও, তবে কোন সংপরাশর্ম্ম থাকিলে তাহা প্রদান কর।”

উজীর কেবল স্থলতানের বিবস্ত্র কণ্ঠস্বরী মাত্রই ছিলেন না, তাহার স্নেহ-দ্রুতের বন্ধু ছিলেন, স্থলতানের দ্রুত তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল, কিন্তু তিনি কোন প্রকার সুপরাশর্ম্মদানেই সমর্থ হইলেন না। অবশেষে উজীর এক প্রসিদ্ধা যাত্রিকরী সন্ধান পাইলেন, উজীর স্থলতানকে পরামর্শ প্রদান করিলেন যে, যাত্রিকরীকে লইয়া আসিয়া তাহার পরামর্শ গ্রহণ করা যাউক। স্থলতান সেই প্রস্তাবেই সম্মত হইয়া যাত্রিকরীকে



টাহার নিকটে আনাইলেন। বাহুরূপে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে আমদের কোন সংবাদ বলিতে পারে কি না, সে জীবিত আছে কি না, জীবিত থাকিলে কোথায় আছে?” বাহুরূপে বলিল, “জীবিত, আমি বাহুরূপে বতই নৈপুণ্য লাভ করি না কেন, হঠাৎ আপনার প্রেমের উত্তর দান করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না, আমি কাল আপনার প্রেমের উত্তর প্রদান করিতে পারিব।” হুলতান তাকে বিশেষরূপ পুরস্কারের প্রসাদে মগ্ন করিয়া বিদায় দিলেন।

পরদিন বাহুরূপে হুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, “শাহান শা, আমি আমার সমস্ত বিজ্ঞা খরচ করিয়া দেখিলাম, কিন্তু রাজপুত্র আমের যে কোথায়, তাহা স্থির করিতে পারিলাম না। তবে আমি এটুকু জানিতে পারিয়াছি যে, তিনি জীবিত আছেন। এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন, তাহা নির্ণয় করা বাহুরূপের সাধ্যাতীত।” হুলতান এই সংবাদে বিমুগ্ধ হইয়া প্রবেশলাভ করিতে পারিলেন না।

এখন রাজপুত্র আমেরের কথা বলি। রাজপুত্র দেখিলেন, তিনি পরীবাণুর সম্মতি ব্যতীত পিতৃ-সমিধানের বাইতে সমর্থ নহেন, কিন্তু পরীবাণু সম্মতিপ্রদানে ক্রমেই বিলম্ব করিতে লাগিলেন, আমের অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন, তথাপি আর দ্বিতীয়বার পরীবাণুর নিকট সম্মতি চাহিলেন না।

পরীবাণু রাজপুত্রের মনের ভাব ব্রূহিতে পারিলেন, তাই এক দিন বলিলেন, “প্রিয়তম, তুমি তোমার পিতাকে দেখিতে বাইবে বলিয়া আমার মনে বড় ভয় হইয়াছিল, কি জানি, যদি একেবারেই এ অধীনীকে ভুলিয়া যাও! সেই জন্যই আমি সে সময়ে তোমার গমনে সম্মত হইতে পারি নাই, কিয়ং আমি ব্রূহিছি, আমার প্রতি তোমার প্রেম মৌখিক উচ্ছাসমাত্র নহে, ইহা আন্তরিক;—তুমি দীর্ঘকাল আমাকে পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারিবে না; স্ত্রীরা একরূপ অবস্থায় তোমাতে ছাড়িয়া না দিলে বড়ই অস্তায় হয়, আমি সেরূপ অস্তায় কর্তব্য আমার হৃদয়ের অধরোধে করিতে প্রস্তুত নহি, কিন্তু তোমার দীর্ঘকাল বিরহও আমার পক্ষে অসহ্য; তুমি পিতৃপ্রসাদে বাইবার পূর্বে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, তুমি দীর্ঘকাল সেখানে বাস করিতে পারিবে না, শীঘ্রই তোমাকে এখানে আগমন করিতে হইবে। আমি তোমাকে অধিবাস করিয়াই যে একরূপ অধীকার করিতে বলিতেছি, তাহা নহে, আমি তোমার বিচ্ছেদবাতনার কথা ভাবিয়াই একরূপ অধরোধ করিতেছি।”

এই কথা শুনিয়াই রাজপুত্র আমেরের মনে এতই আনন্দের সন্ধান হইল যে, তিনি তাঁহার প্রিয়তমার পাদমূলে নিপতিত হইয়া কৃতজ্ঞতাপ্রকাশের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পরীবাণু তাহাতে বাধা দিয়া, চক্ষুণে পরিবৃত্ত করিয়া, তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। রাজপুত্র বলিলেন, “প্রিয়তমে, একরূপ অধীকার নিতান্তই অস্বাভাবিক, আমিই কি কখন তোমার বিরহ দীর্ঘকাল সহ করিতে পারিব? আমার সে শক্তি নাই, দীর্ঘকাল তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। আমি যত শীঘ্র পারি, তোমার নিকটে উপস্থিত হইব, আবার কিরিয়া আসিয়া ঐ বিধুমুখ দেখিয়া প্রাণে আনন্দ ও শান্তি লাভ করিব, এখন প্রলম্বমুখে আমাকে বিদায় দান কর। তোমার প্রলম্বতার জন্যই কেবল আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, নতুবা প্রতিজ্ঞার আবশ্যক ছিল না।”

পরীবাণু প্রসন্নচিত্তে বলিলেন, “প্রাণেশ্বর, তোমার কথা শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দলাভ করিলাম। যে ভাবে তোমাকে বাইতে হইবে, সে সম্বন্ধে আমি ছই একটু উপদেশ প্রদান করিতে চাই, ইহাতে কিছু দল ভাবিও না। তুমি পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আমাদের বিবাহের কথা কিঞ্চিৎ কোথায় তুমি



এত দিন বাস করিলে, তোমার সে সম্বন্ধে কোন কথাই উল্লেখ করিবারই আবশ্যক নাই। তাহাকে তুমি কেবল এই কথা জানাইবে যে, এত দিন তুমি বেশ সুখেই ছিলে, আর স্থলতানের দৃষ্টিভঙ্গি দূর করিবার জন্যই তাহার প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়াছ।”

পরীবাণ রাজপুত্রের সহিত বিশ জন অখারোহী প্রহরী পাঠাইলেন, তাহারা সকলেই বলবান, সশস্ত্র সৈন্য। রাজপুত্র পরীবাণকে শাশুরে কাছে টানিয়া আনিলেন। সেই হুমকী প্রেমিকার সাহচর্য্য তাহার দ্বায়ে যে অননুভূতপূর্ব্ব রসস্বারসার উৎস সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা বিদায়ক্ষেপে যেন লক্ষ খারায় নৃত্য করিয়া উঠিল। পরীবাণের হৃদয়-কোশল দেখে আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, তাহার রক্তধারে সহস্র চুম্বনরোমা মুদ্রিত করিয়াও তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তার পর আবেগকম্পিত কণ্ঠে বলিলেন, তিনি শীঘ্রই কিরিয়া আসিবেন।

সহচর্য্যগণের সহিত তিনি পরীবাণের প্রাসাদ হইতে নিজ্জাত হইলেন। তিনি যে অথচ আরোহণ করিয়া চলিলেন, তাহা রেক্ষণ দেখিতে হুমক, উচ্চ ও সম্বৎসরাত, সেইরূপ বহুমূল্য্য বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত। স্থলতানের আন্তরালে এমন সুন্দর উৎকৃষ্ট অর্থ একটিও ছিল না।

সেই অথচ আরোহণ করিয়া, আমেদ অল্পসময়ের মধ্যেই পিতৃপ্রাসাদ-সমীপে সমাগত হইলেন। তাহাকে রাজপথ দিয়া যাইতে দেখিয়া নগরবাসিগণ আনন্দপূর্ণ-হৃদয়ে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। অনেকেই তাহাদের কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার অন্বেষণে অধুগমন করিতে লাগিল। স্থলতান বহুদিন পরে প্রিয়তম পুত্রকে সন্দর্শন করিয়া, হর্ষবিগলিতচিত্তে তাহাকে আলিঙ্গন দান করিলেন, অশ্রুপূর্ণগোচনে স্থলতান পুত্রকে বলিলেন, “পুত্র, তোমার অদর্শনে আমি জীবন্ত অবস্থার কালধারণ করিতেছি, আমি তোমার সকল আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু করুণাময় আল্লা দয়া করিয়া তোমাকে আমার কোঁড়ে কিরাইয়া দিলেন।”

আমেদ বলিলেন, “বাবা, নোরোমিহারকে লাভ করিবার আশা ত্যাগ করিয়া, আলির সহিত তাহার বিবাহের উৎসব-সন্দর্শন আমার পক্ষে কিরূপ ক্ষোভের কারণ, আপনি তাহা বিবেচনা করিলেই আমার দেশত্যাগের কারণ বুঝিতে পারিবেন। যদি আমি এই উৎসব অবিলম্বে চিত্তে সন্দর্শন করিতাম, তাহা হইলে নোকে আমার প্রণয়নশব্দে কিরূপ ধারণা করিত? আপনি শ কি মনে করিতেন? প্রণয় হৃদয় হইতে দূর করা যায় না। প্রণয় হৃদয়ে তাহার আসন দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত করে,—জীবন অনন্তরূপ-প্রবাহে সম্ভাপিত করে। প্রেম-নৈরাশ্রে বিভ্রান্ত ইয়া আমরা মৃত্যুর অধিক বাতনা ভোগ করি, তথাপি সে সুখের মোহ ত্যাগ করিতে পারি না। প্রকৃত প্রণয় বক্তিতর্কে বাধা হয় না।”

আমেদ বলিতে লাগিলেন, “আপনার মনে আছে, আমি যে দিন নোরোমিহারকে লাভ করিবার আশায় আপনার আদেশে ধর্ম্মব্রতের পরীক্ষা প্রদান করি, সে দিন আমার তীর কোথায় পড়িল, তাহা কোনমতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সুতরাং আমি নোরোমিহারকেও লাভ করিতে পারিলাম না, অদৃষ্টের ফেরেই আমি তাহাকে লাভ করিতে পারিলাম না, তাহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু আমার তীর কোথায় গিয়া পড়িল, তাহা জানিবার জন্য আমার মনে অত্যন্ত কৌতূহলের সঞ্চার হইল। আমি সেই তীরের সন্ধানে ধাবিত হইলাম। আমি অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিলাম, কিন্তু আমার আশা পূর্ণ হইল না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইয়াও তীর খুঁজিয়া পাইলাম না। ক্রমে আমি নিরাশ-হৃদয়ে ছয় কোশ পথ অতিক্রম করিলাম, একটি পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, আমার শরটি সেই পর্ব্বতের পাদদেশে নিপতিত রহিয়াছে, আমার শর কি না, সন্দেহ হওয়ার আমি তাহা হাতে তুলিয়া লইলাম, দেখিলাম, তাহা আমারই শর।

বিবাহ-বেশন
শবে
তাহু ভেল
জহাজে



প্রণয়ের
নীতি-শাস্ত্র



3



“এত দূরে কখনও মহত্ত্বভেদ-নিষ্কিপ্ত শর আসিতে পারে না, হুতরাং আমি আপনাদের স্বাক্ষরে মনে বিশেষ পাইলাম না; ভাবিতে লাগিলাম, এখানে—এত দূরে এ তীর কিরূপে আসিল? ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই কোন রহস্ত আছে। সে রহস্ত ভেদ করিতে হইবে, হয় ত’ রহস্তভেদ করিতে পারিলে আমার মঙ্গলও হইতে পারে, এই ভাবিয়া আমি রহস্তভেদে প্রবৃত্ত হইলাম এবং অবশেষে কৃতকার্যও হইলাম। কিরূপে কৃতকার্য হইলাম, সে কথা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না, সে অধিকার আমার নাই, তবে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, পরে বাহা ঘটয়াছে, তাহাতে আমি অসুখী হই নাই, বরং আশাতিরিক্ত সুখীই হইয়াছি। কিন্তু আমার মনে একটি দৃষ্টিভঙ্গি বড়ই বলবতী হইয়াছিল, আপনি আমার কোন সংবাদ না পাইয়া কি ভাবে কালাধাপন করিতেছেন, তাহা জানিতে না পারিয়াই আমি অত্যন্ত উদ্বেগ-চিত্তে কালাধাপন করিতাম। আর আমি সুখে আছি, এই সংবাদ জানাইবার জন্তই আমি আপনাদের সন্নিধি প্রত্যাগমন করিয়াছি। আপনি যে সুস্থ আছেন, ইহা দেখিয়া আমার সকল দৃষ্টিভঙ্গির অবশান হইল। কয়েক দিন পরে আপনি আমাকে প্রেমস্রোতে বিদায় দান করিলেই আমি সুখী হইব, তবে মধ্যে মধ্যে আপনার চরণদর্শন করিয়া যাইতে পারি, আমাকে এই অনুমতি দান করুন।”

হুতরান বলিলেন, “বৎস, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমার অমত নাই, কিন্তু তুমি আমার প্রিয়তম পুত্র, আমার নিকট বাস কর, ইহাই আমার ইচ্ছা। তবে তুমি যখন স্থানান্তরে বাসের অভিপ্রায় করিয়াছ, তখন তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করা আমার কর্তব্য হইবে না, কিন্তু আমি যথাযথকালে কিরূপে তোমাকে সংবাদ দান করিতে পারিব, তাহার উপায় জনিয়া রাখা আবশ্যক। তাহা হইলে, প্রয়োজন বুঝিলে, সেই উপায়ে তোমার নিকট সংবাদ পাঠাইব। আমি তোমার গুপ্তকথা জানিতে ইচ্ছা করি না, পুত্রের গুপ্তকথা শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করা পিতার কর্তব্যও নহে। তোমাকে দেখিলেই আমি সুখী হই, এত দিন তোমার অদর্শনে মৃতবৎ অবস্থান করিতেছিলাম, আজ দেখে যেন নবজীবন পাইলাম। তুমি যখন অবদর পাইবে, আমার নিকট উপস্থিত হইলে আমি বড়ই আনন্দলাভ করিব।”

রাজপুত্র আমেদ তাঁহার পিতার প্রাসাদে তিন দিন মাত্র অবস্থান করিলেন, চতুর্থ দিন প্রভাতে তিনি তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী পরীবাণুর নিকট যাত্রা করিলেন। পরীবাণু তাঁহাকে দেখিলামাত্র আনন্দে অভিভূত হইলেন, তিনি কোন দিন মনে করেন নাই যে, রাজপুত্র এত শীঘ্র তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিবেন। রাজপুত্রের প্রণয়ের গভীরতার পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি পরীবাণুর সকল সময়ে দুর হইল। আমেদ তাঁহার পিতাকে যে যে কথা বলিয়াছিলেন, পরীবাণুর নিকট সমস্তই প্রকাশ করিলেন, তিনি যে পিতার নিকট পরীবাণু-সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করেন নাই, তাহা শুনিয়া পরীবাণু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন।



এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরে পরীবাণু আমেদকে বলিলেন, “প্রিয়তম, তুমি তোমার পিতাকে কি একবারেই বিস্মৃত হইয়াছ? তুমি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে বাইবে বলিয়া আদিয়াছ, সে অসীকারপালনে ত’ তোমার কোনরূপ আগ্রহ দেখা বাইতেছে না। তোমার পিতার নিকট তোমার মধ্যে মধ্যে বাগ্ম্য উচিত।”

রাজপুত্র বলিলেন, “প্রিয়তমে, আমার আগ্রহের অভাব নাই, কিন্তু পাছে আমি তোমার অসন্তোষভাজন হই, এই ভয়ে আমি তোমার নিকট আমার প্রার্থনা জানাইতে পারি নাই।” পরীবাণু বলিলেন, “না, আমি

অসহ্য হইব না, প্রথমবার আমার সঙ্গে হইয়াছিল। তখন আমার পিতার কথায় আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম।
না আইস, বলি তুমি আমাকে একবারেই ভুলিয়া গিয়াছ। আমিও তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলাম।
দিত একটি আপত্তি করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আমার সে ভয় আর নাই। আমি বলিতেছি, এখন মনে
অন্ততঃ একবার গিয়া তোমার পিতাকে দেখিয়া আসিবে। এজন্য আমার আর মত লইতে হইবে না,
কাল সকালেই তুমি যাইতে পার।”

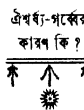
পরদিন প্রাত্তে আমের পূর্বের ছায় সহচরবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া, পূর্বাপেক্ষা আরও অধিক সূর্য্যকান
পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া, পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। তাঁহার পিতাও তাঁহার পূর্বের
ছায় পরন সমালয়ে ও সবেহে গ্রহণ করিলেন। আমের অন্তঃসার প্রতি মাসেই তাঁহার পিতার নিকট
এক একবার আসিতে লাগিলেন, কিন্তু যখনই তিনি আসিতেন, তাঁহার অশু ও সাজসজ্জা পূর্ব পূর্ববার
অপেক্ষা অধিক উৎকৃষ্ট ও আড়ম্বরপূর্ণ হইত।

কিছু দিন পরে সুলতানের কয়েক জন মন্ত্রী আসিয়া আমদের ঐশ্বর্য্যের পরিচয় পাইয়া, অত্যন্ত বিস্ময়ে উদ্বেগিত
ঈর্ষাকুল হইয়া উঠিল এবং সুলতানকে কুমন্ত্রণা দ্বারা পুঞ্জের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা
করিতে লাগিল। তাহারা বলিল, “জাঁহাঙ্গীর, রাজপুত্র আমের কোথায় কি ভাবে অবস্থান করেন,
তাহা অবগত হওয়া আপনার অবশ্য কর্তব্য। তিনি আপনার নিকট অর্থ-সাহায্য না লইয়াও যে
বিশেষ সুখসম্পদ ভোগ করিতেছেন, তাহা দেখাইবার জন্যই এজন্য সাজসজ্জা করিয়া আপনার
নিকট উপস্থিত হন। আমাদের আশঙ্কা হয়, তিনি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধবোধনা করিয়া আপনাকে
সিংহাসনচ্যুত করিবেন।”



সুলতান সে কথা বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না, পুঞ্জের প্রতি স্নেহভীরু বোধ এই নিদারুণ মিথ্যা
অভিযোগে হ্রাস হইল না, তিনি হাসিয়া বলিলেন, “না, না, তোমরা বোধ হয় আমার সঙ্গে পরিহাস
করিতেছ। আমার পুত্রকে আমি উত্তমরূপে চিনি। আমার প্রতি তাহার অবিশল্য শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে।
বিশেষতঃ আমি ত’ তাহার কোনই অপকার করি নাই, তবে সে কেন আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে?”

এই কথা শুনিয়া এক জন চাটুকার বলিল, “সুলতান, আপনি আমায়গকে মার্জনা করিবেন, আপনি
যেহাঙ্গ হইয়াই এ কথা বলিতেছেন। আপনি কি জানেন না, আপনি আমেরকে অগ্রাহ্য করিয়া
নৌদারিয়ারকে আলিফ হস্তে সমর্পণ করায় আমের মনে কি গভীর বেদনা পাইয়াছেন? হোসেনের কথা,
বতঃ; তিনি সফারারাম ত্যাগ করিয়াই গিয়াছেন। কিন্তু আমের কি সহসা সে অপমানের কথা ভুলিতে
পারেন? নৌদারিয়ারের প্রতি আমেরের যে গভীর প্রণয় ছিল, তাহা কাহারও অজ্ঞাত নহে, সেই
নৌদারিয়ারকে আপনি তাঁহার দ্বন্দ্ব হইতে ছিড়িয়া লইয়া, অস্ত্র পুঞ্জের হস্তে দান করিয়াছেন, আপনি যে
তাঁহার প্রতি অস্ত্রায় করিয়াছেন, ইহা কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই? আপনি হয় ত’ বলিবেন, রাজপুত্র
আমের আপনার প্রতি বিশ্বাস্ত্র বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই, আমাদের আশঙ্কা অমূলক;
কিন্তু জাঁহাঙ্গীর, আপনি একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিলেই বুঝিবেন, আমাদের সঙ্গেই অমূলক নহে।
রাজপুত্র আমের মধ্যে মধ্যে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাহা কি কেবল পিছুচরণ দর্শনের
জন্য মাত্র? তাহা হইলে প্রতিবারই এত ভিন্ন ভিন্ন সাজসজ্জা কেন, এত ঐশ্বর্য্য দেখান কেন? যে
অচরমণ্ডল তাঁহার সঙ্গে আসে, তাহাদের বেশভূষা ও অশু দেখিয়া মনে হয়, তাহারাও যেন এক একট
রাজপুত্র। এমন বলবান অস্ত্রচর, এমন তেজস্বী অশু আপনার কণ্ঠে আছে? আরও দেখুন, রাজপুত্র



এই নগরের অতি নিকটে কোথাও বাস করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অশ্রুচরবর্গের অথ বেশিরা বুঝিতে পারা যায়, তাহারা যেন বায়ুলেবনে বহির্গত, প্রমচিত্তে দেখিতে পাওয়া যায় না, অন্ততঃ আমরা কোন দিন তাহা দেখিতে পাই নাই; কিন্তু তিনি যে কোথায় কি অবস্থায় বাস করেন, তাহা তিনি প্রকাশ করেন না, তাঁহার কোন গুপ্ত অভিসন্ধি না থাকিলে পিতার নিকট তিনি এ কথা গোপন রাখিবেন কেন? জীহাঙ্গনা, আমরা সকলেই আপনায় শুভাকাঙ্ক্ষী, আপনিই ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমাদের অস্থান সঙ্গত কি না?”

শুলতান বলিলেন, “তোমরা যাহাই বল, আমার পুত্র আমেদ যে এরূপ হুশাশ, সে বিষয়ে তোমরা কোনমতে আমার বিশ্বাস জন্মাইতে পারিবে না। যাহা হউক, তোমাদের এই পরামর্শের জন্ত আমি তোমাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি, আমি স্বীকার করিতেছি, আমার মঙ্গলের জন্তই তোমরা আমাকে এই পরামর্শ দান করিলে।”



শুলতান এ ভাবে কথা কয়টি বলিলেন, যেন তাঁহার অমাত্যগণের কথা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তাঁহার অন্তরে বিলক্ষণই স্থান পাইয়াছিল। রাজগণের জীবন অত্যন্ত অনিশ্চিত, কোথ হইতে কখন কোন বিপদ উপস্থিত হয়, তাহা তাঁহারা কিছুই বুঝিতে পারেন না, তাঁহাদের সুখ-সম্পদের দিকে সকলেরই দৃষ্টি; সুতরাং সর্বদা তাঁহাদিগকে ভয়ে ভয়ে বাস করিতে হয়। রাজা অমাত্যগণের কথা শুনিয়া মনে কর্তাই ভয় পাইলেন, ভয় অমূলক হইলেও যখন একবার তাহা মনুষ্য-হৃদয়ে প্রবেশ করে, তৎ সহজে তাহা পরিত্যাগ করে না, অকারণে বা সামান্য কারণেই তাহা বাড়িয়া উঠে, তিনি আমেদের বাসস্থান সন্নিহিত সকল কথা জানিবার জন্ত অত্যন্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু পাছে তাঁহার জন্ম-ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তিনি প্রধান উজীরকেও সে সন্নিহিত কোন কথা বলিলেন না। তাঁহার পূর্ব-পরিচিতি বাছকরীকে গোপনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আদেশ করিলেন।



বাছকরী শুলতানের অভিপ্রায়ক্রমে গুপ্তদ্বার দিয়া তাঁহার কক্ষে উপস্থিত হইলে, শুলতান তাহাকে বলিলেন, “তুমি পূর্বে আমাকে বলিয়াছিলে, আমার পুত্র আমেদ জীবিত আছে, তোমার সে কথা যতখন আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই, কিন্তু পরে জানিয়াছি, তোমার গণনা ঠিক। এখন আমায় জন্ত তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। আমেদ এখন প্রায় প্রতিমাসেই আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসে, কিন্তু কোথা হইতে যে আসে, তাহা আমি আজও জানিতে পারি নাই, তাহাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত’ জানিতে পারি; কিন্তু দেখিয়াছি, সে তাহা বলিতে ইচ্ছুক নহে, সুতরাং তাহাকে এজন্ত আমি বাধ্য করিতে সর্বোচ্চ বোধ করিতেছি। তোমার প্রতি আমার অজ্ঞরোধ, তুমি তাহার অজ্ঞাতপারে তাহার বাসস্থানের সন্ধান জানিয়া আইন, তুমি এ বিষয়ে কৃতকার্য হইবে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আমার অমাত্যগণও যেন জানিতে না পারে যে, আমি তোমাকে এই কাণ্ডে নিযুক্ত করিয়াছি। তুমি বোধ হয় সন্নিহিত, আমেদ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, আমাকে বা অন্য কাহাকেও না বলিয়াই সে হঠাৎ এক সময় চলিয়া যাইবে, এইরূপ করা তাহার অভ্যাস। সে যে পথে যায়, সে পথে গিয়া তুমি লুকাইয়া থাক, সে কোথায় গিয়া আশ্রয়গ্রহণ করে, তাহা জানিয়া আসিয়া আমাকে সে সংবাদ বলিবে।”

শুলতানের অহমতিমাত্র বাছকরী প্রাপদ পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে আমেদ তাহার শর কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া বসিয়া থাকিল।

পরদিন প্রভাতে আমের রাজপ্রাসাদে হইতে বহির্গত হইয়া, অম্বারোহণে সহচরবর্গের সহিত পৰ্বতে আরোহণ করিলেন। বাহুকরী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহাদের দিকে চাহিয়া থাকিল, কিন্তু হঠাৎ রাজপুত্র ও তাঁহার সঙ্গিগণ পৰ্বতের উপর হইতে কোথায় অদৃশ্য হইলেন, তাহা বাহুকরী কিছুই বুঝিতে পারিল না।

বাহুকরী তাহার গুপ্তস্থান হইতে বাহির হইয়া দেখিল, কোন দিকেই জনমানবের সাদৃশ্য নাই, পৰ্বত এত উচ্চ ও দুরারোহ যে, তাহা অম্বারোহণে তাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা সে কোনক্রমে বিশ্বাস করিতে পারিল না; বিশেষতঃ সে স্বয়ং দেখিয়াছে, তাঁহারা অধিক উর্দ্ধে আরোহণ করিবার পূর্বেই অস্তহিত হইয়াছেন; স্তবরাং সে অস্বস্থান করিল, হয় রাজপুত্র সহচরগণের সহিত পৰ্বতগাত্রই কোন গুহার প্রবেশ করিয়াছেন, না হয় পৃথিবী-গহবরে যে সকল দৈত্য ও পরীদিগের বাসস্থান আছে, কোন গুপ্ত উপায়ে সেই স্থানে গমন করিয়াছেন, অস্ত্র বাহিবার কোন সম্ভাবনা নাই। বাহুকরী পৰ্বতের প্রত্যেক গুহা তন্ন তন্ন করিয়া অন্বেষণ করিল, কিন্তু রাজপুত্র যে গুহার প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে গুহার মধ্যস্থিত লোহাঘাট তাহার দৃষ্টিপথে নিশ্চিত হইল না; কারণ, পরীবাণুর ইচ্ছা ভিন্ন কোন মনুষ্য তাহা দেখিতে পাইত না, দ্রৌলোকের নিকট ত' তাহা একবারেই অদৃশ্য ছিল।

বাহুকরী অগত্যা বার্ষপ্রবৃত্ত হইয়া রাজপ্রাসাদে প্রত্যাপন করিল এবং তাহার চেঁচায় কিরূপ ফল হইয়াছে, তাহা সুলতানের নিকট নিবেদন করিয়া বলিল, “জাঁহাপনা, আপনি এই ঘটনাতেই বুঝিতে পারিতেছেন, রাজপুত্র আমের যে কোথায় বাস করিতেছেন, তাহা আমার পক্ষে আবিষ্কার করা কঠিন, কেবল আমি কেন, কোন মনুষ্যই তাহা আবিষ্কার করিতে পারিবে না; কারণ, মনুষ্যের সাধ্য হইলে আমি পারিতাম। বাহা হউক, আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক, আমি সকল কথা জানিয়া আসিয়া আপনার গোচর করিব, কিন্তু আপনার নিকট একটি বিষয়ে অস্বস্থি আছে; আমি কার্যোদ্ধারের জন্ত যে কিছু কলকৌশল বা চাতুরী-প্রত্যারণা খাটাইতে চাই, তাহা বাটাইব, সে জন্ত সুলতান আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না, কিম্বা আমার কার্যের প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। সুলতান যদি আমাকে এই অস্বস্থি প্রদান করেন, তাহা হইলে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা আছে, নতুবা নাই।”

সুলতান বলিলেন, “সে জন্ত তোমাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। তুমি যেমন করিয়া, পার, আমাদের বাসস্থানের সন্ধান লইয়া আইস, আমি তোমার কোন কার্যের প্রতিবাদ করিব না, কার্যসিদ্ধি হইলে তোমাকে উপযুক্ত পুরস্কার প্রদান করিব, তোমাকে উৎসাহিত করিবার জন্ত এখন কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিতেছি, লইয়া যাও।” সুলতান একটি মহামূল্য হীরকাসুন্দরী বাহুকরীর হস্তে প্রদান করিলেন।

পরীবাণু আমেরকে প্রতি মাসে এক একবার তাঁহার পিতার সহিত সাক্ষাতের অস্বস্থি প্রদান করিতেন, আমেরও প্রতি মাসেই একটি নির্দিষ্ট সময়ে সহচরবর্গে পরিবৃত্ত হইয়া, সুলতানসমীপে গমন করিতেন। আমের কোন সময় সুলতানের নিকট আগমন করেন, বাহুকরী তাহা জানিত; যে দিন রাজপুত্রের রাজপ্রাসাদে আসিবার কথা, তাহার পূর্বদিন বাহুকরী পৰ্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইল।

পরদিন প্রভাতে রাজপুত্র আমের সহচরবর্গের সহিত পৰ্বতগহবরের বহির্ভাগে পদাৰ্পণ করিয়া দেখিলেন, একটি শিলাগুপ্তে মন্তকস্থাপন করিয়া, স্তবপ্রায় এক বৃদ্ধা বসিয়া আছে, যেন তাহার উপাশক্তি একবারেই নিশ্চুপ হইয়াছে। বৃদ্ধার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে কণ্ঠার উদ্বেগ হইল, এবং বৃদ্ধা কি জন্ত সেখানে সেইভাবে পড়িয়া আছে, তাহা জানিবার জন্ত আমের তাহার নিকট উপস্থিত হইলেন। চতুর্থ বাহুকরী

চাতুরী-জ্ঞান
বিতারকের
অস্বস্থি



শীঘ্রের ভাগে
করণ উদ্বেগ



মারাদিনীর
হলনা



করুণার
আলোক



উহার দিকে চাহিয়া কাতরভাবে অকথ্য ক্রিতে গলিল, এবং অতি কষ্টের ভাণ করিয়া ঘন ঘন, নিশ্বাসত্যাগ করিয়া ভরবরে বলিল, “আমি মরি, আমাকে বাচান, আমি এই পর্বতের গায় দিয়া ঘুরে এক প্রাণে বাইতেছিলাম, হঠাৎ বড় অন্ন আসিল, এখানেই পড়িলাম, উঠিবার শক্তি নাই, দেখিবার লোক নাই, এখানেই মরিতে হইবে।” রাজপুত্রের হৃদয় করুণার বিস্মিত হইল, তিনি বলিলেন, “বাহা, তোমার কোন চিন্তা নাই, আমি নিশ্চয়ই তোমাকে কোন স্থানে আশ্রয় দিতেছি, তুমি বাহাতে গারিয়া উঠিতে পার, তাহার ভর তোমারই হইবে না। তুমি উঠ, আমার এক জন লোক তোমাকে বহাঙ্কনে রাখিয়া আসিতেছে।”

রাজপুত্র এই কথা শুনিয়া মনে মনে মহা খুসী হইল, সে দুই একবার উঠিবার চেষ্টা করিয়াও যে উঠিতে পারিতেছে না, এইজন্য তাব দেখাইল। তখন আমেদের আদেশ অনুসারে দুই জন অল্পচর বড়ীকে বলিয়া উঠাইল এবং একটি অবৈ আরোহণ করাইয়া গুহাঘারে লইয়া চলিল। এক জন অধারোহী গুহাঘার মুক্ত করিলে, বাক্য কবীকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করান হইল। রাজপুত্রও পরীবাগকে সেই পীড়িতা বৃদ্ধার গুপ্তবার জন্ত অনুরোধ করিতে পরীপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

পরীবাগ রাজপুত্রকে সহসা প্রত্যাবর্তন করিতে দেখিয়া তাহার নিকটে আসিয়া, প্রত্যাবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্র বলিলেন, “প্রিয় ভনে, ঐ বৃদ্ধার দিকে দেখ, অত্যন্ত পীড়িত হইয়া ও পথের ধারে পড়িয়াছিল, আমি না দেখিলে মরিয়াই বাইত, উহার অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় দয়ার উদ্বেগ হইয়াছে; বাহাতে

উহার ব্যাধি শীঘ্র আরোপ্য হয়, তোমাকে সে জন্ত একটু ব্যবস্থা করিতে হইবে, আর উহার গুপ্তবার ঘন অভাব না হয়, আমি উহাকে আশ্রয় দিয়া এখানে আনিয়াছি, ইহার জন্ত অনুরোধ করিতেছি ফিরিয়া আসিয়াছি। জানি, তুমি দয়ালব, তোমাকে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই।”

পরীবাগ তীব্রদৃষ্টিতে বৃদ্ধা বান্ধকরীর মুখের দিকে চাহিয়াই আমেদের সকল কথা শুনিতেছিলেন, তিনি দুই জন দাসীকে আদেশ করিলেন, “উহাকে লইয়া প্রাসাদের একটা কুঠুরীতে রাখিয়া আয়, আর উহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবি, গুপ্তবার ও বস্ত্রের ঘেন কোন জট না হয়।”

দাসীদ্বয় বৃদ্ধাকে বরাহরি করিয়া প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিলে, পরীবাগ আমেদকে নিরবরে বলিলেন, “রাজপুত্র, তোমার দয়া প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, ইহা তোমার বংশ ও কঠির উপবৃদ্ধি, তোমার অনুরোধ

আমি জানিবে সবে রক্ষা করিব; কিন্তু আমি তোমাকে বলিতেছি, তোমার এই দয়া অস্থান প্রযুক্ত হইয়াছে। আমি দেখিতে পাইতেছি, এই দয়া-প্রকাশের জন্তই তোমাকে মহা বিপদে পড়িতে হইবে। এই বৃদ্ধ হইতে তোমাকে শোর বিপদে পড়িতে হইবে। বাহা হউক, সেজন্য তুমি ভীত হইও না, তোমার পরীবাণ থাকিতে তোমার পদে কোন দিন কুশাস্ত্রের বিদ্ধ হইবে না। আমি তোমাকে সকল বিপদ হইতে উদ্ধার করিব, তুমি এখন তোমার শিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাও।”

পরীবাণের শেষ কথা শুনিয়া আমাদের আশঙ্কা দূর হইল। তিনি বলিলেন, “প্রাথমিক, আমি যে জীবনে কাহারও অপকার করিরাছি, তাহা ত’ মরণ করিতে পারিতেছি না, ভবিষ্যতে কাহারও কোন অনিষ্ট করিব, সে ইচ্ছাও রাখি না, তবে কেন বৃদ্ধ। আমার অনিষ্ট করিবে? যদি আমার অনিষ্ট হয়, তাহাতেও আক্ষেপ নাই, কারণ, অনিষ্টভরে যেন কখনও কাহারও উপকার করিতে সক্ষমিত না হই।”

পরীবাণের নিকট হইতে চুপ ও বিদায় গ্রহণ করিয়া, রাজপুত্র পুনর্বার গুহা পরিভ্রমণ করিয়া, মূলতানের প্রাঙ্গণের অভিমুখে অর্ধ পরিভ্রমণ করিলেন। তাঁহার সহচরবর্গের অধের খুরঝনিতে নিকর প্রাশুর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। মূলতান এক মাস পরে পুত্রকে দেখিতে পাইয়া, পূর্ববৎ মেহাদরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, যেন তাঁহার মনরে পূর্বজীব অক্ষুর আছে, যেন রাজপুত্রের বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা তাঁহাকে বলে নাই, কিবা তাহাতে তিনি বিচলিত হন নাই।

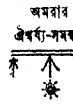
পরীবাণের দাসীষয় বাহুকরীকে একটি মৃদঙ্গ সুসজ্জিত কর্কে লইয়া গিয়া, একটি সুকোমল আস্তরণ-বিস্তৃত সোকার উপর শয়ন করাইল, তাহার মস্তকে সুবর্ণস্থরের কারুকার্যবিশিষ্ট উপধান প্রদান করিল, গাটনের লেপ দ্বারা তাহার সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া দিল। অনন্তর এক জন দাসী একটি স্বর্ণপাত্রে এক প্রকার পানীয়দ্রব্য আনিয়া তাহাকে বলিল, “ইহা সিংহরক্ষিত প্রসবণের জল, এই জলপানে সর্ববাধি আরোগ্য হয়, তোমার রোগও দীর্ঘ সাধিয়া যাইবে। তুমি এই জলপান করিয়া নিদ্রা যাও, আমরা এখন চলিলাম, আশা করি, ফিরিয়া আসিয়া তোমাকে সুস্থ দেখিব।”

আমাদের বাসস্থান দেখিবার জন্তই বাহুকরীর রোগের ভাণ, হার উদ্ভক্ত সিদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু এখন হঠাৎ চলিয়া গেলে পাছে পরীবাণ কিবা তাঁহার দাসীগণের মনে কোন সন্দেহ উপস্থিত হয়, এই ভয়ে বাহুকরী তৎক্ষণাৎ পরীবাণের প্রাঙ্গণ-পরিভ্রমণ সঙ্গত জ্ঞান করিল না, বিশেষ অনিচ্ছাসেবেও ঔষধ পলায়ন করণ করিরা শব্দায় পড়িয়া রহিল, দাসীষয় কাঁধাঙ্করে প্রস্থান করিল।

দাসীষয় প্রত্যাপমম করিলে বাহুকরী সোকার উপর উঠিয়া বলিল, এবং কাপড় পরিতে পরিতে বলিল, “কি চমৎকার ঔষধ, আহা মরি, ঔষধের এমন প্রত্যাক ফল ত’ আর কখনও দেখি নাই, তোমার বাহা বলিয়াছে, ঠিক, দেখিতে দেখিতে আমার জর পলাইয়াছে, আমার শরীরের সকল মানি দূর হইয়াছে, আমি এক্ষণ তোমাদেরই প্রতীক্য করিতেছিলাম, তোমাদের দয়াবতী মহারাগির কাছে আমাকে লইয়া চল, আমি তাঁহাকে আমার প্রতি অমৃতগ্রহের জন্ত ধন্যবাদ দিয়া নিজের গ্রামে চলিয়া যাই। এখন ব্যাঘ্ররাম সাধিয়া গিয়াছে, তখন এখানে থাকিরা আর কি করিব?”

দাসীষয় বৃদ্ধার আরোপ্যার্শনে পরম পুলকিত হইয়া, তাহাকে লইয়া পরীবাণের নিকট চলিল। বৃদ্ধা অনেক মৃদঙ্গ সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত কর্কে অতিক্রম করিয়া, পরীবাণের উপবেশনকক্ষে উপস্থিত হইল।

পরীবাণ একখানি স্বর্ণনির্মিত সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন, সিংহাসনখানি জয়ন্তের পুষ্পপত্র সুসজ্জিত, “কত হারক, চুপি, পায়া, কত পয়রাগ, মরকত, নীলকান্ত মনি দ্বারা এই সকল পত্রপুষ্প নিষ্পিত। সেই অষ্টপুর্



স্বভাৱতঃ
ঐশ্বৰ্য্য বৰ্ণনে
ঐশ্বৰ্য্য আছে।



জ্যোতিৰ্ময় সিংহাসনৰ দিকে চাহিবাৰাও বৃদ্ধা বাহুবকস্বীৰ চকু বলিয়া গেল। পৰীবাণুৰ নিকটে অবেশিনী, হুন্দৰী বনশীপন পঞ্জায়মান ৰহিয়াছে, তাহাৰেও হীৰক-বহুমন্তিত অলকাৰেও প্ৰভাৱ চাৰিখিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, যেন স্থিৰ-সৌম্যমিণী সভাতলে পঞ্জায়মান হইয়াছে। বাহুবকৰী এত ঐশ্বৰ্য্য, এমন সৌন্দৰ্য্য আৰু কোথাও সন্দৰ্শন কৰে নাই, তাহা তাহাৰ কল্পনাও অতীত। সে পৰীবাণুৰ চৰণতলে নিশ্চিত হইয়া নিশ্চয়তাৰে অবস্থান কৰিতে লাগিল, কিন্তু তাহাৰ কোন কথা বলিবাৰ পূৰ্বেই পৰীবাণু বলিলেন, “ভয়ে, তোমাৰ পীড়া আশ্ৰয় হইয়াছে দেখিয়া আমি বড় সুখী হইলাম, তুমি যদি এখন বাড়ী বাইতে সমৰ্থ হও, তাহা হইলে আমি তোমাকে এখানে আটকাইয়া ৰাখি কষ্ট দিতে চাহি না। তবে আমাৰ ইচ্ছা, তুমি একবাৰ আমাৰ প্ৰাসাদেৰ শোভা দেখিয়া যাও; আশা কৰি, ইহাতে তোমাৰ আপত্তি হইবে না, আমাৰ দাসীয়া তোমাক প্ৰাসাদেৰ সকল কক দেখাইবে।”

বৃদ্ধা বহুবক অবনত কৰিয়া, পৰীবাণুৰ আদেশ শিৰোধাৰ্য্য কৰিয়া, দুই জন দাসীৰ সহিত প্ৰাসাদেৰ বিভিন্ন অংশ সন্দৰ্শন চলিল। যতই সে এক একট নতুন নতুন কক দেখিতে লাগিল, ততই তাহাৰ বিস্ময় উত্তৰোত্তৰ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দাসীষৰ বলিল, “এ প্ৰাসাদ ভেমন সম্বিত ও সুন্দৰ নয়, ঠাকুৰাণীৰ প্ৰাসাদেৰ জিৰ জিৰ অংশে আয়ও সুবৃহৎ, সুসজ্জিত প্ৰাসাদ আছে; যদি একবাৰ তাহা দেখিতে পাও, তাহা হইলে এ প্ৰাসাদটো আৰু তোমাৰ মনে ধৰিবে না।”—এইকথা নানা কথা বলিতে বলিতে দাসীষৰ বৃদ্ধাকে লোহাৰ পাৰু কৰিলে, ওহাৰ বাহিৰে ৰাখিয়া প্ৰস্থান কৰিল।

বৃদ্ধা বাহুবকী তাহাৰদিক্কে ধনুৰাৰ দিয়া কয়েক পদ অগ্ৰসৰ হৈল, তাহাৰ পৰ কিৰিয়া আলিয়া প্ৰাসাদেৰ প্ৰবেশপথ বুজিতে লাগিল, কিন্তু দেখিল, লোহাৰ অলুপ্ত হইয়াছে। সে সেখান হইতে স্থলভানেৰ নিকট প্ৰত্যাপন কৰিয়া, সকল ঘটনাৰ কথা আভ্যাপিত তাহাৰ কৰ্ণগোচৰ কৰিল। পৰীবাণুৰ সৌন্দৰ্য্য, তাহাৰ অনন্ত ঐশ্বৰ্য্য, তাহাৰ অপূৰ্য্য দাসদাসী, বহুসম্ভব সুসজ্জিত সুবিত্তীৰ্ণ প্ৰাসাদপ্ৰেক্ষণী, সকল বিষয়েৰ বৰাৰণ বৰ্ণনা কৰিয়া অবশেষে বৃদ্ধা বলিল, “স্থলতান, এই অনন্ত ঐশ্বৰ্য্যৱান্নি সম্বন্ধে আপনি কি মনে কৰেন? আপনি হয় ত আপনাৰ পুত্ৰ আমাদেৰ সৌভাগ্য স্মৰণ কৰিয়া সুখী হইবেন, পৰিত হইবেন; হয় ত মনে কৰিবেন, এমন সৌভাগ্য এ কাল পৰ্য্যন্ত আৰু কোন মহুযোৱাই হয় নাই; কিন্তু জাহাপনা, আমাৰ চিন্তাৰ বিষয় বতৰ। আপনাৰ সতিত আমি একমত হইতে পাৰিতেছি না, আমাৰ ক্ৰটি মাৰ্জনা কৰিবেন। আমি নিশ্চয়ই বলিতে পাৰি, এই সৌভাগ্যই আপনাৰ পুত্ৰেৰ দুৰ্ভাগ্যেৰ কাৰণ হইবে, এই সম্ভৱই আপনাৰ পুত্ৰকে যোৱা বিপজ্জালে বিজড়িত কৰিবে। এ কথা ভাবিয়া পৰ্য্যন্ত আমাৰ মনে সুখ নাই, সেই জন্তই ত আমি পুত্ৰ-সুখে আপনাৰ নিকট উপস্থিত হইতে পাৰি নাই। আপনাৰ পুত্ৰ আমোদে আপনাৰ প্ৰতি বিশেষ ভক্তিমান, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু কে বলিতে পাৰে, সেই দুৰ্ভাগ্য পৰীবাণুৰ মোহে মুগ্ধ হইয়া, তাহাৰ অজ্ঞানে আপনাকে সিংহাসনচ্যুত ও কাৰাক্ষত না কৰিবে?—জাহাপনা, আপনি সময় থাকিতে সাধনাৰ হউন, ইহাই আমাৰ নিবেদন।”

বাহুবকস্বীৰ বক্তৃতায় স্থলতান বিচলিত হইলেন। তিনি বুলিলেন, তাহাৰ পুত্ৰ তাহাৰ একান্ত বান্ধা, কিন্তু এত ক্ষমতা বাহাৰ হস্তে, যে একপৰ অতুল ঐশ্বৰ্য্যেৰ অধীশ্বৰ, সে অতি সহজেই তাহাৰ অবাধ্য হইতে পাৰে, তখন তাহাকে কিৰূপে শাসন কৰিবেন? কিন্তু তিনি মনেৰে তাৰ মুখে প্ৰকাশ কৰিলেন না, বহুবকীকে উপস্থিত পুৰস্কাৰ দান কৰিয়া বিদায় কৰিলেন এক তাহাকে অপদাৰ্হে তাহাৰ নিকটে উপস্থিত হইবাৰ আদেশ কৰিলেন।

পুত্ৰেৰ বিৰুদ্ধে
পিতাকে
উত্তেজনা



অপরারে হুলতানের চাহুকার অমাত্যগণ উপস্থিত হইল, বাহুকরীও আসিল। হুলতান বাহুকরীর মুখে আসেন ও পরীবার্থ-সংক্রান্ত যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন, তাহা অমাত্যগণের গোচর করিলেন, এবং অতঃপর কি কর্তব্য, সে সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যগণ 'অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ করিয়া বলিল, "জাহাঙ্গীর, বড়ি কর্তন সমস্তা বটে! ভয়ের সম্ভাবনা সম্পূর্ণই বর্তমান দেখিতেছি, আমাদের বিবেচনায় রাজপুত্র আমেরকে বধ না করুন, যাবজ্জীবন তাঁহাকে কারাগারে অবরুদ্ধ করিয়া রাখুন, বাহাতে সেই পরীর সঙ্গে আর তাহার সাক্ষাৎ না হইতে পারে, তাহাই করুন। রাজপুত্র এখন এখানে আসিয়াছেন, এই সর্বোৎকৃষ্ট অবসর।"

বাহুকরী এই পরামর্শ শুনিয়া মন্তক ঘোরতর আন্দোলন করিয়া বলিল, "না, না, এ অতি মূঢ়ের মত পরামর্শ। আপনার মন্ত্রিগণ বলিলেন, 'রাজপুত্রকে ধরিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করুন,' ইহা উত্তম কথা, কিন্তু রাজপুত্র একাকী আসেন নাই, তাঁহার সঙ্গে যে অশুচর বা প্রহরিদল আছে, তাহাদেরও ত' সেই সঙ্গে কারাদন্ড করা চাই, কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, তাহারা এক একট দৈতা? তাহারা ইচ্ছামত রূপধারণ করিতে পারে, এক আবশ্যক হইলে অশুভ্র হইতেও পারে। তাহারা ইচ্ছামত অশুভ্র হইয়া, সেই পরীরদ্বার নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনি তাহার স্বামীর প্রীতি যে অত্যাচার করিতেছেন, সে যদি প্রকাশ করে, তাহা হইলে সেই ক্রুদ্ধ পরীর পীড়ন হইতে আপনি কিরণে আত্মরক্ষা করিবেন? তাহা অপেক্ষা আপনি আর এক কাজ করুন, আপনি আপনার পুত্রের নিকট কোন একটা অসম্ভব ত্রব্যের প্রার্থনা করুন। রাজপুত্র এই ত্রব্য পরীর নিকট হইতে আনিয়া দিলে, পুনর্বার আরও অসম্ভব ত্রব্যের প্রার্থনা করিবেন, আপনার পুত্র তাহা আপনাকে প্রদান করিতে অসমর্থ হইলে, আর লজ্জায় আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন না, সেই পরীর সহযোগেই অবশিষ্ট জীবন বাশন করিবেন, আপনারও সকল বিপদের আশঙ্কা দূর হইবে।"

হুলতান তাঁহার অমাত্যবর্গকে ইহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্ট যুক্তি আছে কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। অমাত্যগণ বলিলেন, "তাঁহাদের মতে এই যুক্তিই শ্রেষ্ঠ।" তদনুসারে কার্য্য করা হইল।

পরদিন রাজপুত্র আমের পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, হুলতান পুত্রের সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অবশেষে তিনি পুত্রকে বলিলেন, "দীর্ঘকাল অশ্রুজিষ্ট থাকিয়া এখন তুমি আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ কর, এখন তুমি কোথায় কি ভাবে আছ, সে কথা আমার নিকট প্রকাশ কর নাই, আমিও তাহা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তাহার পর আমি তোমার স্বপ্ন ও উন্নতির কারণ জানিতে পারিয়াছি, এ সকল কথা আমার নিকট গোপন করিবার তোমার কোনই আবশ্যক ছিল না। তুমি যে পত্নীকে বিবাহ করিয়া সুখী হইয়াছ, ইহাতে আমিও অত্যন্ত সুখী; কারণ, এরূপ ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতালাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না; আমি বতই ক্ষমতাপন্ন নরপতি হই না কেন, তোমাকে এরূপ সুখসম্পাদ ও ঐশ্বর্য্য প্রদান করা কখনই আমার সাধ্য হইত না। তুমি যে স্থান অধিকার করিয়াছ, আমি ভিন্ন অস্ত্র সকলেই তোমার হিংসা করিবে। তোমার এই সৌভাগ্যে আমিও স্বয়ং ভাগ্যবান মনে করি, তবিস্যতে বিপদ আপদ উপস্থিত হইলে, তোমার ক্ষমতাপালিনী পত্নী নিশ্চয়ই আমাকে নানারূপে সাহায্য করিবেন, কিন্তু সম্ভ্রুতি তোমার নিকট আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যাই, তখন সৈন্য, সামন্ত, অশ্ব, রতন, বাহক প্রভৃতি সকলের সমস্ত ভিন্ন বস্ত্রাবাস ছুটাইতে আমাকে বহু পরিশ্রমে অর্থব্যয় করিতে হয়, অল্পবিধাও বিস্তর। তোমার পরীরদ্বারকে বলিয়া আমাকে এমন একটি তাম্র নিতে হইবে যে, তাহা এক জনে অন্যায়সেই হাতে করিয়া লইয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহা প্রদানিত

পুত্র-বয়সের
যত্ন



অশ্রুত আবশ্যক



করিলে, আমার সমস্ত সৈন্ত তাহার নীচে আশ্রয় লইতে পারে। তোমার স্ত্রীকে বলিবে, আমি ইহা বহু চাহিয়াছি, তিনি তোমাকে নিশ্চয়ই ইহা প্রদান করিতে পারিবেন, জিনিহাট তোমার দৃষ্টিতে অসম্ভব হইলেও, পরীক্ষা পক্ষে ইহা সম্ভব বলা কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।”

এ প্রেম
অপাখি,
স্বার্থপণ্ডে
বিস্ত নহে



আমের পিতার নিকট এরূপ কথা বা প্রার্থনা শুনিবার জন্ত কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি জানিতেন, দৈত্য বা পরীরা অনেক অসম্ভব কাজ জানিতে পারে, কিন্তু এ যে একেবারেই অসম্ভব; যিহেতু এ পর্যন্ত তিনি পরীবাণুর নিকট কোন প্রকার অসুগ্রহই প্রার্থনা করেন নাই। তিনি তাঁহার পুত্র লাভ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাও না চাহিয়া, প্রণয়ের মধ্যে তিনি স্বার্থপরতা আনিয়া কেলিতে কোনক্রমে প্রস্তুত হইলেন না। এরূপ প্রার্থনায় তিনি তাঁহার স্ত্রীর কাছে কিরূপ অবজ্ঞাজ্ঞান হইবেন, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন, সুতরাং তিনি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে তাঁহার পিতাকে বলিলেন, “বাবা, আপনি কিরূপে আমার গুপ্তরহস্য ভেদ করিলেন, জানি না; আমি ইচ্ছা করিয়া বাহা আপনার নিকট গোপন করিয়াছিলাম, তাহা জ্ঞাত হওয়ার আপনার পক্ষে উপকার সাধিত হইয়াছে কি না, সে তর্ক করিবার অধিকার আমার নাই; কারণ, আপনি পিতা, আমি পুত্র, আপনি যখন জানিতে পারিয়াছেন, তখন তাহা অস্বীকার করিবার আমার আবশ্যক নাই, সত্যই পরীরাষ্ট্রকে বিবাহ করিয়াছি, আমার স্ত্রী আমাকে আন্তরিক ভালবাসেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রেম যোগ্যতার উপর নির্ভর করে কি না, জানি না, কিন্তু আমাকে তিনি তাঁহার অযোগ্য স্বামী বলিয়া মনে করেন না। ইহার মধ্যে কোন স্বার্থপরতাপূর্ণ অভিসন্ধি নাই, কিন্তু আপনার আমের পালন করিতে হইলে আমাকে স্বার্থপর হইতে হইবে। আপনি পিতা, আপনার আমের অবশ্য পালনীয়, সুতরাং আমার স্ত্রীর নিকট অসম্ভব পদার্থ প্রার্থনা করিব, কিন্তু তাহা লাভ করিতে পারিব কি না, তাহা জানি না, সুতরাং পূর্বে আপনার নিকট আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে পারিতেছি না। তবে এ কথা নিশ্চয় জানিবেন, যদি আমি ইহা লাভ করিতে না পারি, তাহা হইলে আমি আর আপনারকে সুখ দেখাইব না, আপনার নিকট এই আমার শেষ বিদায় জানিবেন। আপনিই আমাকে এরূপ করিতে বাধ্য করিলেন।”

হলতান আমেরকে অনেক কথা বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু আমেরের মনোমালিন্ত দূর হইল না, পরীরা নিকট পিতার জন্ত অসুগ্রহ-প্রার্থনার যে হীনতা বা অসৌরব নাই, তাহা তিনি কোনমতে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বিরক্ত হইয়া নির্দিষ্টকালের তিন দিন পূর্বেই পরীবাণুর প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। পরীবাণু তাঁহার সুখ দেখিয়াই তাঁহার ভাবান্তর বুঝিতে পারিলেন। তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া আমেরকে এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। আমের তাঁহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, “তুমি কেমন আছ, আগে বল।” পরীবাণু উত্তর হস্তে স্বামীকে বাহুগশে আবদ্ধ করিয়া, শতচুষ্টে তৃপ্ত করিয়া বলিলেন, “তুমি আগে আমার কথায় লবাব দাও।” আমের অনেকক্ষণ পর্যন্ত কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু অবশেষে কৃতকাৰ্য্য হইলেন না।

চুষ্টন আলিঙ্গনে
চিত্ত-বিনোদন



পরীবাণুর আগ্রহাতিশয্যে ও সুপ্রেম অমুরোধে বাধ্য হইয়া বলিলেন, “প্রিয়তম, আমার পিতাই আমার মনঃকষ্টের কারণ। প্রথমতঃ আমি তাঁহার নিকট যে কথা গোপন রাখিয়াছিলাম, কোন দিন প্রকাশ করি নাই, সেই কথা তিনি কোন রকমে জানিতে পারিয়াছেন। দ্বিতীয় কথাটি—” পরীবাণু দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দিয়াই বলিলেন, “প্রথম কার্যের কারণটি আগে আমার কাছে শোন। তুমি যে রূপ স্ত্রীলোকটিকে আমার কাছে আনিয়া আশ্রয় দিয়াছিলে, এ তাহারই কীর্তি। আমি তখনই বুঝিয়াছিলাম, তাহার রোগ-তাপ মিথা কথা, আমাদের সংবাদ জানিবার জন্তই কৌশল করিয়া সে এখানে আসিয়াছিল, কিরূপা সিদ্ধা তোমার পিতাকে সকল কথা বলিয়াছে।—সে কথা যাক, তাহার পর তোমার মনোবেদনার বিশেষ কারণ কি, তাহা বল।”

ব্রাহ্মণ বলিলেন, “আমি তোমাকে প্রাণদেবতা ভালবাসি, কিন্তু তাহাতে কোন স্বার্থস্বপ্ন নাই, তোমার বোধ হয় স্বপ্নরূপ আছে, এত দিনের মধ্যে আমি তোমার নিকট প্রেম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ চাহি নাই, তোমার ভায় হুজুরী, হুশীল, প্রেমময়ী পরী লাভ করিয়া আমার পৃথিবীতে আর অধিক কি কামনার বস্তু থাকিতে পারে? আমি জানি, তোমার ক্ষমতা অসীম, কিন্তু আমি কোন দিন সেই ক্ষমতার পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি নাই; পরন্তু এত দিন পরে আমার পিতা তোমার নিকট একটি প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাতে আমি বড়ই বিরক্ত হইয়াছি, ইহা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত হয় নাই তাঁহার সমস্ত সৈন্ত, অশারোহী, পদাতিক, বোড়া, পাখা, উট ধরে, এমন একটি তাম্বু তিনি চান, কিন্তু তাম্বুটি খন মোড়া থাকিবে, তখন এক জন লোক হাতে করিয়া লইয়া অনায়াসে বাইতে পারে, এত ক্ষুদ্র হইবে। এমন অসম্ভব প্রার্থনা আমি আর কখন কোথাও শুনি নাই।”

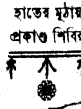
পরীবাণু হাসিয়া বলিলেন, “প্রাণেশ্বর, এই ক্ষুদ্র বিরসবদন? আমি বলি, না জানি, কি গুরুতর কাজই ঘটাইছে। বাহা হউক, তুমি যে আমার অমুরাগ ও প্রেম এরূপ মৃণাবান মনে কর ও এরূপ তুচ্ছ প্রার্থনা আমার নিকট করিতে সশেষ বোধ করিতেছ, এ ক্ষুদ্র আমি সুখী হইয়াছি; কিন্তু তোমার পিতার প্রার্থনা অপূর্ণ থাকিতে পারে না, এ প্রার্থনা বিন্দুমাত্রও অসম্ভব নয়, ইহা অপেক্ষা অনেক অসম্ভব কার্যও আমার সম্পাদন করিতে পারি। বাহা হউক, তুমি শান্ত হও, আমি অবিলম্বেই তোমার চিন্তা দূর করিতেছি। তোমার বাহা কিছু প্রার্থনা থাকিবে, তাহা জানিলে আমি তদগ্বেই পূর্ণ করিব, তোমাকে আমার কি অদেয় আছে প্রিয়তম?”

পরীবাণু অনন্তর তাঁহার কোথাগারের অধ্যক্ষকে আহ্বান করিলেন। সেও এক জন পরী। তাহার নাম হুরজিহান, সে পরীবাণুর নিকটে আসিলে, পরীবাণু বলিলেন, “হুরজিহান, আমার কোথাগারে যে সর্সাপেকা বৃহৎ তাম্বু আছে, তাহা সম্বর লইয়া এস।” হুরজিহান তৎক্ষণাৎ কোথাগারে প্রবেশ করিল এবং একটি শিবির তাহার হাতের ঘুরায় মধ্যে করিয়া লইয়া আসিল। পরীবাণু হুরজিহানের হস্ত হইতে তাহা লইয়া আয়েনের হস্তে প্রদান করিলেন।

তাম্বুর আকার দেখিয়া আয়েদ মহা বিস্মিত হইলেন। তাঁহার মুখের ভাব দেখিয়াই পরীবাণু বুঝিতে পারিলেন, রাজপুত্র তাম্বুর বিশালতায় সন্দেহ করিতেছেন, সুতরাং তিনি হাসিয়া বলিলেন, “প্রাণাধিক, তুমি কি মনে করিতেছ, আমি তোমার সঙ্গে বিজ্ঞপ্ত করিতেছি? তুমি এখনই দেখিবে, তোমার পিতা যেদূর তাম্বু চাহিয়াছিলেন, ইহা তাহা অপেক্ষা ক্ষুদ্র নহে?—হুরজিহান, এই তাম্বু মাঠে লইয়া গিয়া ইহা খাটাইয়া দেখাইয়া রাজপুত্রের সন্দেহ ভঞ্জন কর।”

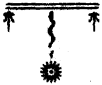
হুরজিহান তাম্বু লইয়া, প্রাণদেবের বাহিরে উপস্থিত হইয়া, মাঠে তাহা প্রসারিত করিল। আয়েদ দেখিলেন, তাঁহুতে তাঁহার পিতার বিশৃঙ্খল পরিমাণ সৈন্তের স্থান হইতে পারে, তখন তাঁহার সন্দেহের ক্ষুদ্র রাজপুত্র পরীবাণুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরীবাণু বলিলেন, “তাম্বুটি এত বৃহৎ বটে, কিন্তু প্রয়োজনানুসারে ইহার আকার সঙ্কুচিত করা বাইতে পারে।”

হুরজিহান তাম্বুটি খাটাইয়া তাহা আয়েদের হস্তে প্রদান করিলেন, আয়েদ তাহা লইয়া পরদিন প্রভাতে তাঁহার পিতার নিকট বাজা করিলেন। মূলতান পুত্রকে পূর্বকং পরম সন্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। তাম্বু লাভ করিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত আনন্দের সঞ্চার হইল, কিন্তু তাম্বুর আকার দেখিয়া তাঁহার প্রাণে কিছু সন্দেহ হইল, রাজপুত্র প্রায়তনম্বা তাম্বু খাটাইলে তাঁহার সে সন্দেহ দূর হইল; কিন্তু পুত্রের ক্ষমতাও



ঠল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, বাহায় হস্তে এত
অধিক ক্ষমতা, সে ইচ্ছানুসারে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে। কিন্তু তিনি পুত্রের প্রভাব নষ্ট
করিবেন, এই চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তিনি বাহুকরীকে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, বাহুকরী
বলিল, “জাহাঙ্গীর, আপনি আপনার পুত্রকে সিংহরক্ষিত বরণার জল আনিবার জন্য আদেশ করেন, তাহা
হইলেই সিংহ-কবলে পতিত হইয়া আপনার পুত্র প্রাণত্যাগ করিবেন।”

নক্ষত্রমান
পুত্র-সংহারে
পিতার চক্রান্ত



হুলতান আমেদকে সন্ধান করিয়া বলিলেন, “বৎস, তুমি আমাকে এই তাড়ুটি আনিয়া আমায়
মহোপকারসাধন করিলে। আমার ভাগ্যে ইহা সর্বাঙ্গের মূল্যবান ও অমূল্য পদার্থরূপে রক্ষিত হইবে,
কিন্তু আমার জন্য তোমাকে আর একটি কাজ করিতে হইবে। আমি শুনিলাম, তোমার স্বামী একটি সিংহ-
রক্ষিত নির্বর আছে, সেই বরণার জল পান করিলে সর্বপ্রকার রোগ আরোগ্য হয়। আমার বয়স অনেক
হইয়াছে, কখন পীড়া হয়, তাহার স্থিরতা নাই, বিশেষতঃ শরীর অনিত্য ও কণ্ডভূর, হৃৎকায় আমার
অসুস্থ, আমার জন্য তোমার পত্নীর সেই বরণা হইতে কিছু জল আনিয়া দাও। আমার স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য
তুমি এই কষ্টটুকু স্বীকার করিতে অসম্মত হইবে না, তাহা আমি জানি। এই কাজটি করিলেই আমার
প্রতি তোমার কর্তব্য সম্পূর্ণ হয়।”

আমেদ ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার পিতা আর কোন দ্রব্য আনিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে শীঘ্র অসুস্থ
করিবেন না, পুনঃ পুনঃ অগ্রহ প্রার্থনা করিলে পরীবাণু তাঁহাকে স্বার্থপর মনে করিতে পারেন ভাবিয়া, তিনি
অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া নিস্তব্ধ থাকিয়া তিনি বলিলেন, “বাবা, আপনার স্বাস্থ্য-
রক্ষার জন্য আমার বাহা কর্তব্য, তাহা করিতে আমি কখন পশ্চাত্তাপ হইব না, কিন্তু সেজন্য আমার স্বামী
অগ্রহ প্রার্থনা করিতে সক্ষম বোধ করিতেছি। এই জন্যই আপনার প্রার্থিত জল আনিয়া দিতে পারিব কি না,
সে সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করিতে পারিতেছি না। আমি আমার স্বামী নিকট আপনার প্রার্থনা জানাইব, কিন্তু
এজন্য আমাকে বড়ই আশঙ্কানি ভোগ করিতে হইবে।”

আমের পরদিন পরীবাণু প্রাণদে প্রত্যাগমন করিলেন, তাঁহার পিতার সহিত তাঁহার যে সমস্ত কথা
হইয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার পত্নীর গোচর করিলেন, পিতার নূতন প্রার্থনার কথাও ব্যক্ত করিলেন;
অবশেষে বলিলেন, “এ বিষয়ে আমার কোন অসুস্থ নাই, আমার পিতা বাহা বলিয়াছেন, তাহাই
তোমার গোচর করিলাম, এ বিষয়ে তুমি বাহা করিবে, তাহাতে আমার ক্ষতি বা অসুস্থ কিছুই হইবে
না, আমি তোমাকে কোন অসুস্থ বোধ করিতেছি না।”

অসম্মত
আমের
উদ্দেশ্য কি?



পরীবাণু বলিলেন, “তোমার পিতা আমার শত্রু, তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিব না; কিন্তু একটা কথা
আমি কিছুতেই ভুলিতেছি না, তিনি যে জিনিষ চাহিয়াছেন, তাহা তোমার অনিষ্টের আশাতেই চাহিয়াছেন,
সকল কথা শুনিয়া তুমি বুঝিতে পারিবে, আমার এই ধারণা সত্য কি না। একটি সুবৃহৎ ফুগের মধ্যস্থলে
এই বরণা, চারিটি ভীষণদর্শন হিংস্রপ্রকৃতির সিংহ কর্তৃক সুরক্ষিত, দুইটি সিংহ নিশ্চিত থাকে, আর দুইটি
জাগিয়া সেই বরণা পাহারা দেয়। যে কেহ সেই নির্ভরের নিকট গমন করে, সিংহ তাহাকেই আক্রমণ
করিয়া তাহার প্রাণবধ করিয়া থাকে, প্রাণের আশা লইয়া সেখানে কেহ বাইতে পারে না। বাহা হউক,
তোমার কোন ভয় নাই, তুমি বাহাতে নিরাপদে জল লইয়া ফিরিতে পার, আমি তাহার উপাস্থিতি করিব।”

পরীবাণু এই সময় হঠকর্ণ করিতেছিলেন, তাঁহার পাশে কয়েকটি হত্যার গুলি পড়িয়াছিল, তিনি একটি
গুলি আমেদের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন, “তুমি এই হত্যার গুলিটি কাছের দ্বারা, ইহা কি কাজে

সিংহ-বক্ষিত
অবগার উদ্দেশ্যে

এক হাত
মাছুয়ের
হুড়ি হাত ঘাতি

এইরূপ মানুষ যে কোথাও আছে, তাহা আমেদ জানতেন না, অতীত এইরূপ মনুষ্য সংগ্রহ করিবার
 পর তিনি গ্ৰেহণ করিতে সম্মত হইলেন না, কিন্তু সুলতান তাঁহাকে ছাড়িলেন না; বলিলেন, “পরীয়া ইহা
 অপেক্ষাও অসম্ভব সারগ্ৰী সংগ্রহ করিয়া দিতে পারে।”

পরদিন আমেদ পরীয়াখুর নিকটে উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত বিবরণভাবে সুলতানের প্রার্থনা
 এবং বলিলেন, “এমন অদ্ভুত মানুষ পৃথিবীতে কোথাও আছে বলিয়া ত’ বোধ হয় না। বীথি বোধ হয়,
 আমার বুদ্ধি ও কষ্টগচ্ছিততা পরীক্ষা করিবার জন্যই এইরূপ আদেশ করিয়াছেন,—আমার মৃত্যুই হয় ত’
 তাঁহার বাঞ্ছনীয়; নতুবা তিনি এমন অসম্ভব মনুষ্য-সংগ্রহের আদেশ করিবেন কেন? আমি কোথায়
 এরূপ লোক খুঁজিয়া পাইব, তাহাকে ধরিবই বা কিরূপে? আমি একবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি।”

পরীয়াখুর বলিলেন, “প্রিয়তম, অধীর হইও না। এরূপ লোক সংগ্রহ করা কিছুমাত্র কঠিন নহে, সিংহরাজ
 নিকরের জল সংগ্রহ করা অপেক্ষা অনেক সহজ কাজ। বলিতে কি, আমাদের সহোদর সাইবার

ঠিক এইরূপ মানুষ, আমাদের
 পিতা-মাতা অভিন্ন হইলেও আমা-
 দের আকারের মধ্যে এত বৈশা-
 দ্য! আমার ভ্রাতা লোক মল
 নহে, তবে কিছু কোপনবতাব,
 অপমান যে কোনক্রমে সহ করিতে
 পারে না। তাহার হাতে সর্বদাই
 একটি লৌহনির্মিত গদা দেখিতে
 পাওয়া যায়; এই গদার ভয়ে
 সকলকে সম্মত থাকিতে হয়, গদাটি
 ওজনে ছয় মণ দশ দেয়। আমি
 তাহাকে এখনই এখানে আনান
 করিতেছি, তুমি তাহাকে দেখিয়া
 ভয় পাইও না।”



লৌহ-
 গদা-
 ধারী
 সুলতান

আমেদ বলিলেন, “তোমার ভাই বতই ভীষণবতাব হটক ও তাঁহার আকার বতই কদাকার হটক,
 তিনি আমার পরম আশীষ, আমি তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান করিব। তুমি তাঁহাকে আনান কর।”

পরীয়াখুর উৎসাহে একটি স্বর্ণনির্মিত ধূপাধারে অগ্নি ও একটি স্বর্ণনির্মিত বাস্র আনিবার জন্য এক জন
 দাসীকে আদেশ করিলেন। দাসী সেই ধূপাধার ও বাস্র লইয়া আগিলে পরীয়াখুর বাস্রের ভিতর হইতে এক
 প্রকার চূর্ণ বাহির করিয়া, তাহা ধূপাধারের অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন, অগ্নি হইতে প্রচুর ধূম উত্থিত হইয়া
 গৃহটি অন্ধকারপূর্ণ করিয়া ফেলিল। পরীয়াখুর আমেদকে বলিলেন, “রাজপুত্র, সাবধান, আমার ভ্রাতা
 আসিতেছেন।” গৃহের ধূরশি অশদারিত হইলে আমেদ সাইবারকে দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন,
 গৃহকণ্ঠে এক হাত মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়াছে, হাতে ছয় মণ দশ দেয় ভারী একটি গদা, বিশ হাত লম্বা
 দাড়ী বাহুভয়ে উড়িতেছে, গোক কাণ পঞ্চাঙ্গ বিস্তৃত, দাড়ী-গোঁচে ধূরশি ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। চক্ষু হঠাৎ
 বস, কিছু দূর দেখিলেই ভয় হয়; মাথার চূড়াকার একটি টুপী, বুক পিঠে হুঁক।

ধূরশি
 অন্ধকারে
 নিরাট দাড়ী



পরীবাণ আমেদকে পূর্বে সাবধান না করিলে এই মূর্তি দেখিয়া, আমেদ নিশ্চয়ই প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেন, কিন্তু সাইবার হইতে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই জানিয়া, তিনি স্থিরভাবে পরীবাণের পাশে দণ্ডায়মান হইয়া, তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং সপশ্রবনে অভিবাদন করিলেন।

সাইবার কুটিল কটাক্ষে আমেদের দিকে চাহিয়া পরীবাণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এই লোকটি কে?” পরীবাণ বলিলেন, “ভাই, উনি আমার স্বামী, উহার নাম আমেদ, ইনি ভারতবর্ষে স্থলতানের পুত্র। আমি আমার বিবাহের সময় তোমাকে নিমন্ত্রণ করি নাই; কারণ, আমি জানিতাম, তখন তুমি দিগ্বিজয়ে বাজা করিয়াছ। বাহা হউক, তুমি জয়লাভ করিয়া কিরিয়া আসিয়াছ শুনিয়া, আমি বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। অনেক দিন তোমাকে দেখি নাই, তাই তোমার অবসর আছে বুঝিয়া তোমাকে স্মরণ করিয়াছি।”

পরীবাণের কথা শুনিয়া সাইবার একবার অতি সক্রিয়দৃষ্টিতে আমেদের দিকে চাহিয়া, তাহার পর পরীবাণকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভগিনি, আমি কি আমার ভগিনীপতির কোন উপকার করিতে পারি? তোমার স্বামীর জন্য আমি সকলই করিতে প্রস্তুত আছি।” পরীবাণ বলিলেন, “উহার শিতা স্থলতান তোমাকে একবার দেখিতে চান, অতএব আমার অনুরোধ, আমার স্বামীর সহিত তুমি তাঁহার রাজধানীতে গমন কর।” সাইবার আমেদকে বলিল, “চল হে বোনাই, তোমার বাবাকে দেখা দিয়া আসি।” পরীবাণ বলিলেন, “আজ এ অসময়ে আর গিয়া কাজ নাই, কাল সকালে যাইও; আমাদের বিবাহের পর আমার স্বামীর সহিত তাঁহার শিতা কিরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা শুনিয়া রাখ। আজ সন্ধ্যার সময় তোমাকে সকল কথা বলিব।”

পরদিন প্রভাতে সাইবার আমেদের সহিত স্থলতানের প্রাসাদে বাজা করিল। তাহাকে নগরমধ্যে উপস্থিত হইতে দেখিয়া লোকজন ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। দোকানদারগণ দোকান ও গৃহস্থগণ নিজ নিজ গৃহের দরজা বন্ধ করিয়া, উৎকণ্ঠিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল, পথে একটি লোকও দেখা গেল না। প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইলে সাইবারের অঙ্কুর মূর্তি ও ভীষণ গদা দেখিয়া দ্বাররক্ষীগণ অস্ত্রশস্ত্র ফেলিয়া যে যে দিকে পারিল পলায়ন করিল, কেহই তাহার পতিরোধের চেষ্টা করিল না। স্থলতান তখন সভাগৃহে বসিয়া রাজকাৰ্য্য সম্পাদন করিতেছিলেন, অমাত্যগণ চতুর্দিকে বসিয়াছিলেন। অনেক দর্শকও উপস্থিত ছিল। সাইবার সভাঘূলে প্রবেশ করিবামাত্র সকলেই সভাস্থল হইতে উত্থাপ্তে পলায়ন করিতে লাগিল, কেবল রাজা ও মন্ত্রিগণ আসন ত্যাগ করিলেন না; কিন্তু দেখে বিকট মূর্তি দেখিয়া, রাজা উভয় চক্ষু হস্ত দ্বারা আবৃত করিয়া, চক্ষু মুগ্ধিত করিয়া রহিলেন। মন্ত্রীদিগেরও সেই অবস্থা, সাইবারের দিকে চাহিতে কাহারও সাহস হইল না।

সাইবার আমেদকে কথা বলিবার অবসর না দিয়াই স্থলতানের সিংহাসন-সমীপে উপস্থিত হইল; কর্ণশব্দে বলিল, “তুমি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছ, আমি আসিয়াছি, কি করিতে হইবে বল।”

স্থলতান ভয়ে কোন কথা বলিতে পারিলেন না, চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিলেন। সাইবার মনে করিল, তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া স্থলতান ইচ্ছা করিয়া অপমান করিলেন। সে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, তাহার গলা তুলিয়া, স্থলতানের মস্তকে এক আঘাত করিল; স্থলতান সে আঘাতে তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন, তাঁহার দেহ চূর্ণ হইয়া গেল। আমেদ তাহাকে বাধা দিবারও অবসর পাইলেন না।

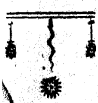
বিকট দৈত্যের
ভয়ানক
সভাবর্ণ



গদাঘাতে
স্থলতান চূর্ণ



মস্তিষ্ক সাবাদ



সুন্দরীকুল-
গৌরবিলী
পরীবাণু
সুলতান



সুলতানের প্রাণবধ করিয়া সাইবার প্রধান উজীরকে বধ করিবার জন্ত তাহার গদা ভূগিল। আমেদ বলিলেন, “উহাকে মারিবেন না, উনি সুলতানকে চিরদিন হিতোপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন; অতি বিধিত অমাত্য।” সাইবার গদা সঞ্চরণ করিয়া বলিল, “হা হা হা! সুলতানকে সুপরিদর্শ দিত, তাহার কোথায়?” উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া সাইবার অস্বস্ত অমাত্যগণের মস্তক তাহার গদার আঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিল। আমেদের শত্রুগণ দেখিতে দেখিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

অনন্তর সাইবার দরবারগৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাদেশের প্রাক্ষণে উপস্থিত হইল। সে উজীরকে আহ্বান করিয়া বলিল, “এক বেটা বাছুরী আমার ভগিনীপতিয় সর্বনাশ করিবার জন্ত ক্রমাগত সুলতানকে মন্দ পরামর্শ দিয়া আসিয়াছে, সে বেটা কোথায়, এখনই তাহাকে চাই।”

উজীর ভয়েভয়ে তৎক্ষণাৎ বাছুরীকে আনিবার জন্ত লোক পাঠাইলেন। বাছুরী সাইবারের সমুখ উপস্থিত হইলে সাইবার তাহার গদা মাথায় উপর তুলিয়া, গর্জন করিয়া বলিল, “মন্দ পরামর্শ দেওয়া ও মিথ্যা করিয়া রোগী সাজার মজা দেখ।” সঙ্গে সঙ্গে তাহার গদা বুড়ার মস্তকের উপর পড়িল, যজ্ঞ তৎক্ষণাৎ পঞ্চম প্রাপ্ত হইল।

সাইবার তখন গদা ঘুরাইয়া বলিল, “এখনও হয় নাই, আমার ভগিনীপতিকে সুলতান না করিলে আমি রাজধানীতে একটি লোকেরও প্রাণ রাখিব না।” তখন চারিদিক হইতে “সুলতান আমেদ ধীরাজীবী হউন” এই শব্দ উদ্ভূত হইল। দেখিতে দেখিতে রাজধানীর সর্বত্র সেই ধ্বনির প্রতিধ্বনি হইল। সাইবার আমেদকে তাঁহার পিতৃ-সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিল, তাহার পর তাহার ভগিনী পরীবাণুকে মহা সমারোহে রাজধানীতে লইয়া আসিল। পরীবাণু সেই দিন হইতে ভারতবর্ষের সুলতান নাম ধারণ করিলেন।

আগ্নি ও তাঁহার পত্নী নোরোজিহার আমেদের বিব্রন্ধে কোন চক্রান্তে যোগদান করেন নাই, তাঁরা কোন ধরনই রাখিতেন না। আমেদ আলিকে একটি বিস্তীর্ণ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন, আলি সজীক সেই দেশে যাত্রা করিলেন, জীবনের অবশিষ্ট কাল তিনি সেখানেই রাজত্ব করিয়াছিলেন। আমেদ তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদর হোসেনকেও এক প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া, তাঁহার নিকট এক জন অখারোহী পাঠাইলেন; কিন্তু হোসেন আমেদকে ষড়যন্ত্র প্রদান করিয়া জানাইলেন, তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া বেশ হুখে আছেন, আর সংসার-মায়ায় জড়িত হইবেন না, তিনি দরবেশ হইয়াই জীবনযাপন করিবেন।

এই কাহিনী শেষ করিয়া শাহারজাদী আর একটি সুন্দর কাহিনী আরম্ভ করিলেন। সুলতান শাহরায় তখন শাহারজাদীর প্রেমভরূপে ও গল্পকে ভাগিতেছেন। তাঁহার সমস্তির আর বিশেষ প্রয়োজন হইল না।



পূর্বকালে এক জন পায়তরায়কুমার পিতার মৃত্যুর পর রাজসিংহাসনের অধিকারী হন, তাঁহার নাম খসক শা। তিনি শৈতৃক সিংহাসন লাভ করিয়া, প্রজাবর্গের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্ত ছদ্মবেশে অগ্রচর সঙ্গে লইয়া নৈশভ্রমণ করিতেন, ইহাতে তিনি বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন।

এক দিন তিনি ছদ্মবেশে উজীরকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইলেন; তখন রাজি প্রায় এক প্রহর হইয়াছিল, কিয়দূর ভ্রমণ করিতে করিতে একটি পল্লীর মধ্যে তিনি কোন গৃহমধ্যবর্তী কয়েক জন লোকের উচ্চ কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। যে গৃহ হইতে ঐ স্বর আসিতেছিল, সেই গৃহের নিকট উপস্থিত হইয়া বাতায়নপথে তিনি দেখিতে পাইলেন, তিনটি ভগিনী সেই গৃহমধ্যে আহ্বানান্তে গোকায়া বসিয়া গল্প করিতেছে। স্থলতান তাহাদের আলাপ শ্রবণের জন্ত কোতুলকাক্রান্ত হইয়া, বাতায়ন-দরজা দৃষ্ট করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; ভগিনীজন তাহাদের স্ব স্ব ইচ্ছা সম্বন্ধে গল্প করিতেছে। জ্যেষ্ঠা ভগিনী বলিতেছে, “ইচ্ছার কথা যদি বল, তবে আমার ইচ্ছা, আমি স্থলতানের রুটীওয়ালাকে বিবাহ করি, তাহা হইলে আমি স্থলতানের জন্ত প্রস্তুত স্বাক্ষর কটা বত ইচ্ছা পাইয়া সুখী হই। এখন তোমাদের ইচ্ছা কি ভনি।” দ্বিতীয় ভগিনী বলিল, “স্থলতানের বাবুচাঁকে বিবাহ করিলে আমি সুখী হই, তাহা হইলে আমার আহ্বানের আর অস্বাধ থাকে না। রুটী ত’ ইচ্ছা করিলেই পাওয়া যায়।” তৃতীয় ভগিনীটি যেমন স্বন্দরী, তেমনি বুদ্ধিমতী, সে বলিল, “তোমাদের মত নৌচলোককে বিবাহ করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি স্থলতানকে বিবাহ করিলেই সুখী হইতে পারি। আমার ইচ্ছা, আমি স্থলতানকে বিবাহ করিয়া একটি পুত্রসন্তানের জননী হইব, সেই সন্তানটির এক দিকের চুল দোনার মত, অত্র দিকের চুল রূপার মত হইবে। কাঁদিলে তাহার চক্ষু দিয়া মুক্তা বরিবে, হাসিলে মুখখানি গোলাপের হুঁড়ির মত দেখাইবে।”

ভগিনীত্রয়ের কথা শুনিয়া স্থলতানের ইচ্ছা হইল, তিনি তাহাদিগের কামনা পূর্ণ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহার মনের ভাব উজীরকে জ্ঞাপন না করিয়া, কেবল তাঁহাকে আদেশ করিলেন, “এই বাড়ী ঠিক রাখিও, কাঁল এখানে আসিয়া এই বুবতীত্রয়কে আমার দরবারে লইয়া যাইবে।”

পরদিন প্রাত্যহিক উজীর উক্ত বুবতীত্রয়ের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে জানাইলেন, স্থলতান তাহাদিগকে দরবারে হাজির হইবার জন্ত আদেশ করিয়াছেন। স্বন্দরীগণ ইহাতে ব্যস্তমস্ত হইয়া বেশপরিবর্তন করিয়া উজীরের সহিত চলিল। স্থলতানের নিকটে উপস্থিত হইলে, স্থলতান তাহাদিগকে বলিলেন, “কাঁল যাত্রা তোমার কে কি কামনা করিয়াছিলে, তাহা আমার নিকট প্রকাশ কর। মিথ্যা কথা বলিও না, কারণ আমি সকলই জানি।”

বুবতীগণ স্থলতানের কথা শুনিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। তাহারা নতমুখে সলজ্জভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। কনিষ্ঠা ভগিনীটির লজ্জাক্রিম মুখখানি দেখিয়া স্থলতানের হৃদয় মুগ্ধ হইল। স্থলতান তাহাদিগকে মৌনভাষণ দেখিয়া সদয়ভাবে বলিলেন, “তোমাদের কোন ভয় নাই, আমি তোমাদের মনে কোন প্রকার কষ্ট দিব বলিয়া তোমাদিগকে এখানে আহ্বান করি নাই, আমি তোমাদের কামনার কথা শুনিয়াছি, তোমাদের কামনা পূর্ণ করিব বলিয়াই তোমাদিগকে এখানে আনিয়াছি।” অনন্তর তিনি কনিষ্ঠা ভগিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “স্বন্দরী, তুমি আমার বেগম হইবার ইচ্ছা করিয়াছিলে, অতই আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।” পূর্ণ হইয়া ভগিনীকেও বলিলেন, “তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইবে, আমার রুটীওয়ালা ও সন্ধ্যার বাবুচাঁর সঙ্গে তোমাদের বিবাহ দিব।”

মিত্র
ভগিনী
সুগল



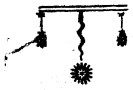
স্বন্দরীর
মনের কথা



২১৫

স্বলতানের কথা শেব হইলে, কনিষ্ঠা যুবতী স্বলতানের চরণমূলে নিপতিত হইয়া এই অমুগ্ৰাহের জন্ত তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিল এবং বলিল, “জ্ঞাহাপনা, আমি কা’ল রায়ে আমার ভগিনীগণের নিকট যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহা কেবল আমোদচ্ছলে, প্রকৃতপক্ষে আপনাকে বিবাহ করিব, এ চ্ছরাশা আমার কোন দিনই ছিল না। আমার সাহস ও দৃষ্টতার জন্ত আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি।” স্বলতান বলিলেন, “না না, আমি যখন তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে প্রীতিপ্ত হইয়াছি, তখন আমার কথার পরিবর্তন হইবে না। আমি তোমাদের কোন কথা শুনিব না।” অল্প ভগিনীদ্বয় স্বলতানের মত-পরিবর্তনের জন্ত অনেক বক্তৃতা করিল, কিন্তু তাঁহার মত ফিরিল না; তিনি কেবল বলিলেন, “তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিব।”

অদৃষ্টের নিষ্ঠুর
পরিহাস



সেই দিনই তিন ভগিনীর বিবাহ হইয়া গেল, কিন্তু তিন জনের বিবাহে কি পার্থক্য! স্বলতান কনিষ্ঠাকে বিবাহ করিলেন। মহাসমারোহে, মহাধুমধামে, প্রচুর বাজতান্ত্রে, অজস্র অর্থব্যয়ে সে বিবাহ সম্পন্ন হইল। অল্প দুই ভগিনীর বিবাহে বিশেষ কিছু সমারোহ হইল না, রুটীওয়ালার ও রাজবাড়ীর পাচকের বিবাহে যেমন ধুমধামে আয়োজন সম্পন্ন হয়, তেমনই হইল।

বড় দুই ভগিনীর ক্ষণেই সেই দিনই ঈর্ষার সঞ্চার হইল। তাহারা তাহাদের কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত বৎসর অদৃষ্টের ভারতম্বা বন্ধিতে পারিল। ইচ্ছা পূর্ণ হওয়াতে তাহারা স্বর্ষী হওয়া দুয়ের কথা, খোর অলঙ্কার হইয়া উঠিল। কয়েক দিন পর্যন্ত রুটীওয়ালার পত্নী ও পাচকের পত্নীর পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হইল না, অবশেষে নানাগারে এক দিন তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। বড় ভগিনীটি মধ্যমাকে বলিল, “কেমন লো, আমাদের ভগিনী বড়ই রূপসী, সে স্বলতানের মহিষী হইয়াছে!” মধ্যমা বলিল, “হী, রূপের বাগাই লইয়া মরি। কি শুধেই যে স্বলতান ভুলিলেন! পুরুষগুলার কি চোখ আছে? নহিলে বানরীকে দেখিয়া স্বন্দরী ভাবিবে কেন? যা হোক তাই, যদি স্বন্দরী আমাদের মধ্যে কেহ থাকে, তবে সে তুমি, স্বলতান তোমাকে অগ্রাহ্য করায় আমার ক্ষমর বিদীর্ণ হইয়া বাইতেছে।”

হিংসার দাবদাহ



জ্যোষ্ঠা ভগিনী বলিল, “আমার কথা তাই ছাড়িয়া দাও, স্বলতান যদি তোমাকে মহিষী করিতেন, তাহা হইলে আমার স্বর্ষের সীমা থাকিত না। কিন্তু ত্র কালপৌরুষে স্বলতান মহিষী করায় আমার অন্তর জলিয়া যাইতেছে, আমি প্রতিহিংসা না লইয়া আর স্থির হইতে পারিতেছি না। তুমি আমার চক্ৰান্তে যোগ দিলেই আমি কার্যোদ্ধার করিতে পারি। কিরূপে আমি তাহার সর্বনাশ করিব, তাহা পরে জানিতে পারিবে।”

অতঃপর দুই ভগিনীতে অনেক সময়েই সাক্ষাৎ হইত। তাহারা কিরূপে তাহাদের কনিষ্ঠা ভগিনীর সকল শ্রুত নষ্ট করিবে, সেই আশাপ ভিন্ন তাহাদের অন্ত কোন কথা ছিল না। তাহারা বৎসর অতীতগিন্দির জন্ত নানাবিধ মতলব করিতে লাগিল, কিন্তু কোন মতলবই কার্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা উভয়ে একবাক্যে তাহাদের কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল,—মধ্যে মধ্যেই ঘাইতে লাগিল। আর তাহাকে কত আদর-বন্দ করিত, মিষ্টকথা বলিত, তাহার সংখ্যা নাই। স্বলতান-মহিষী ভগিনীদ্বয়কে সমাদর করিতে আরম্ভ করিতেন না, তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন, সহোদরা ভগিনীদ্বয়ের প্রতি বৈরধা ব্যবহার করা উচিত, ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিতেন।

বিবাহের কিছুকাল পরে সুলতান-মহিবীর গর্ভাক্ষণ প্রকাশ পাইল। রাজধানীতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইল। ক্রমে সমস্ত পারস্ত-রাজ্যে সেই উৎসব তরঙ্গিত হইল। ভগিনীদ্বয় গমের নিকট আসিয়া আদরবশ দেখাইয়া বলিল, “সুলতান যেন তাহাদের দুই ভগিনীকে তাঁহার মহিবীর দ্বারা জন্ত হৃতকাগুর্বে গ্রহণ করেন, সহোদরা ভিন্ন আর সেরূপ অসময়ে সহোদরার প্রতি কে যত্ন করিবে, নৈ আন্তরিক শুশ্রূষা আর কে করিতে পারে?” সুলতানমহিবী বলিলেন, “বড়মিদি, বড়মিদি, যদি বিষয়ে আমার কোন হাত থাকে, তবে আমি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে লইয়া আসিব। তোমরা আমার জন্ত কষ্ট স্বীকার করিবে, এত কি অপরে করিবে?—তাহা কখনও সম্ভব নহে; কিন্তু সুলতানের অভিপ্রায়ের দ্বন্দ্ব ত আমি কিছু করিতে পারিব না, আমার মতামতও খাটিবে না। যদি এ বিষয়ে তিনি আমার মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি তোমাদের আনিবার জন্তই অগ্রসর হইব। তাঁহার মত হইলে আমি দুই আনন্দিত হইব।”

অসময়ে
প্রতিহিংসার
সংযোগ
↑ ↓

সুলতান অবশেষে তাঁহার মহিবীর মতেই মত করিলেন। তিনি দেখিলেন, হৃতকাগরে সম্পূর্ণ পরিচিত স্ত্রীলোক আশিষ্টা বেগমের সেবা করিবে, তাহা অপেক্ষা তাঁহার সহোদরাধ্বয় সে ভার গ্রহণ করিলে তাহা পক্ষে মঙ্গলজনকই হইবে। সুলতানের আদেশ শুনিয়া মহিবীর আনন্দের নীমা রহিল না।

অনন্তর সুলতান ষড়শ শা মহিবীর ভগিনীদ্বয়কে তাঁহার শুশ্রূষার নিযুক্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলেন, দম্ভমারে তাহাদের উভয় ভগিনীকে প্রাসাদে লইয়া আসা হইল। তাহারা এত দিন পরে ভগিনীর প্রতি দ্রুত-নাথনের সুযোগ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইল।

অবশেষে এক দিন সুলতান-মহিবী একটি পরম দৃশ্যবান পুত্র-সন্তান প্রসব করিলেন; কিন্তু ভগিনীপুত্রের ই পরম সুলতান মুখ দেখিয়াও পিশাচাধ্বয়ের জ্বলেই ঘেঁষের সঙ্কার হইল না, তাহারা নব-প্রসূত রাজকুমারকে কখনি কাপড়ে জড়াইয়া অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে একটি ঝোড়ার মধ্যে নিক্ষেপ করিল; তাহার পর সেই ঝোড়-সমত রাজপুত্রকে সুলতান-মহিবীর প্রাসাদ-প্রান্তবর্তী খালের জলে ভাসাইয়া দিয়া আসিল, তাহার পর কোথা হইতে একটি মৃত কুকুরছানা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া প্রচার করিল, মহিবী একটি মৃত কুরশাবক প্রসব করিয়াছেন। সুলতানের নিকটও এ সংবাদ প্রেরিত হইল। সুলতানমহিবী কুরশাবক প্রসব করিয়াছেন শুনিয়া সুলতান ক্রোধে ও কোড়ে হতজ্ঞান হইলেন, সুলতান সেই দিনই হয় ‘সুলতানকে পরিত্যাগ করিতেন, কেবল উজীর তাহাকে শাস্ত করিয়া রাখিলেন; তিনি বুঝাইয়া দিলেন, প্রকৃতির কোন কার্যে মানুষের হাি নাই, সুতরাং একজন মহিবীর প্রতি কোনরূপ উৎপীড়ন রিলে তাহা বড়ই অজ্ঞান হইবে।

সুলতান-
কুরশাবক
প্রসব!
↑ ↓

রাজপুত্র কুড়ির ভিতর থাকিয়া খাল দিয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিল, ক্রমে ঝোড়াটি প্রাসাদদল্লখ বাগানের কট উপস্থিত হইল। সুলতানের বাগানের পরিদর্শক সেই সময়ে বাগানের ভিতর ভ্রমণ করিতেছিলেন, খালের মতর ঝোড়াটি দেখিতে পাইয়া তিনি মালীকে ডাকিয়া বলিলেন, “মালী, শীঘ্র জলে নামিয়া ঐ ঝোড়াটি লিয়া লইয়া আর, উহার মধ্যে কি আছে দেখি।” মালী এক হাঁটু জলে নামিয়া হাত বাড়াইতেই ঝোড়াটি ধরিতে পারিল; সে ঝোড়াটি জল হইতে তুলিয়া আনিয়া পরিদর্শকের সম্মুখে রাখিল।

উত্তান-পরিদর্শক ঝোড়া তুলিয়া তাহার মধ্যে সেই অনিন্দ্যসুন্দর প্রভাতারূপং সস্ত্রোজাত শুটকে দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইলেন, তাঁহার মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দও হইল। তিনি অনেক দিন বাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এ কাল পর্যন্ত পুত্রসুখদর্শন লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ



কেনে বর্ষিকৃত হইয়া গৃহস্থে বাবিত হইলেন, দানীকে বোঝা লইয়া তাঁহার অঙ্গুষ্ঠমেনে
আলোচন করিলেন। অনন্তর তিনি তাঁহার জীয় নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, “শিখরতমে, আমাদের
পুত্রসন্তান নাই; তাই আমরা দয়া করিয়া আমাকে একটি সন্তান পাঠাইয়া দিয়াছেন, তুমি
অন্যকে নিজের পুত্রের ভায় স্বগ্রন্থপালন কর। আমি ইহাকে নিজের পুত্র বলিয়াই মনে করিব।”
উত্তান-পরিবর্শকের পত্নী পন্নয় আত্মাদে স্থলতানের নবজাত শিশুটিকে গ্রহণ করিল। উত্তান-পরি-
বর্শক একবার সন্তানও লইলেন না, কোথা হইতে এ বোড়া আসিল কিছা এ সন্তান কাহার।
কিন্তু তিনি মনে মনে বলিলেন, “আমি দেখিতেছি, এ বোড়া স্থলতানের অঙ্গুষ্ঠম হইতেই
আসিয়াছে; কিন্তু আমার সে সব আন্দোলন করার কোন প্রয়োজন নাই; রাজপ্রাসাদের কথা লইয়া
যত কম আন্দোলন হয়, ততই
ভাল।”



পর-বৎসর স্থলতান-মহিষী
আর একটি পুত্রসন্তান প্রসব
করিলেন। স্থলতান-মহিষীর
রাক্ষসী ভগিনীষ্ম এই শিশুর
প্রতিও ক্রুপা প্রকাশ করিল
না; তাহারাই সেই শিশুটিকেও
তাহার জন্মদিনে ঝোড়ায় পুরিয়া
পূর্বস্বং খালের জলে ভাগাইয়া
দিল। স্থলতান-মহিষী তখন
প্রসব-যাতনায় অচেতন, পূর্বস্বং
এবং তিনি তাঁহার ভগিনী
ষ্মের কীর্তি জানিতে পারিলেন
না। তাহারাই নিঃশঙ্কিতে একটি
বিড়াল-শাবক আনিয়া সুভিকা-
পারে স্থাপন করিল; স্থলতানকে
সংবাদ দিল, এবার মহিষী
বিড়ালশিশু প্রসব করিয়াছেন।

সোভাগ্যক্রমে দেবায়ও সেই বোড়াটি উত্তান-পরিবর্শকের হস্তগত হইলে, তিনি শিশুটিকে লইয়া
তাঁহার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। উত্তান-পরিবর্শকের পত্নী এই শিশুটিকেও পন্নয় বেহে প্রতিপালন
করিতে লাগিলেন।

স্থলতানমহিষী বিড়ালশাবক প্রসব করিয়াছেন শুনিয়া, স্থলতান আর কোথ সংকল্প করিতে পারিলেন
না, কিন্তু উজীর পুনরীর বহু কষ্টে তাঁহাকে শান্ত করিয়া রাখিলেন, কিন্তু এবার তাঁহাকে শান্ত করিতে
উজীরকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল। পিতায় বিজ বিখণ্ড কর্মচারী উজীরের কথা স্থলতান অগ্রাধ
করিতে পারিলেন না, কোন উপায়ে কোথ দমন করিলেন।

১৯০৭/০৮

তৃতীয় বর্ষে সুলতান-মহিবী পুঞ্জের পরিদর্শকে একটি পরমরূপবতী কস্তা প্রসব করিলেন, কিন্তু শিশাটীয়া তাহাকেও বাতুলকোড় হইতে ছিন্ন করিল। মহিবীকে সুলতান কর্তৃক বিভাজিত ও উৎপীড়িত হইতে না দেখিয়া আর তাহারের হিংসাতাণের সম্ভাবনা ছিল না। কস্তাটিকেও তাহারা পূর্ববৎ ঝোড়ায় পুরিয়া ধালের জলে ভাসিয়া দিয়া আশিল। উজীরের পরিদর্শক এই কস্তাটিকেও মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার করিয়া প্রতিপালনের জন্য তাঁহার পত্নীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। অকস্মে পুত্র হইট ও কস্তাটিকে যথাকালে তিনি শিক্ষকের নিকট বিভাগশিক্ষার্থ অর্পণ করিলেন।

রাজী কস্তা প্রসব করিলেন, মহিবীর ভগিনীঘর সুলতানের নিকট সংবাদ পাঠাইল, মহিবী এবার ইন্দুরপাবক প্রসব করিয়াছেন। এই সংবাদে সুলতান ক্রোধে পূর্ণন করিয়া উঠিলেন; বলিলেন, “এই ১৩তামিনী আমার প্রণয়ের উপযুক্ত নহে, সে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিলে আমার সম্ভার এই বকম করণা প্রাপ্তিতে ভরিয়া ফেলিবে, আমি ইহা কোনক্রমে সহ্য করিব না, এ রাজকন্যা, আমি ইহার প্রাণদণ্ড করিলাম। উজীর, তুমি অবিলম্বে আমার আদেশ প্রতিপালন করিবে। আমি এবার আর তোমার কোন কথার কর্ণপাত করিব না।”

হুমরী
রাজকস্তার
পরিদর্শকে
ইন্দুর-হান



উজীর ও দরবারের অন্তঃ প্রমাত্যগণ সুলতানের চরণে নিপতিত হইয়া, মহিবীকে মার্জনা করিবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। উজীর সুলতানকে নানা প্রকার উপদেশ দান করিয়া তাঁহার মন একটু নরম করিলেন। সুলতান বলিলেন, “আচ্ছা, আমি মহিবীর প্রাণদণ্ডের আদেশ রহিত করিলাম, কিন্তু আমি তাহাকে তাহার জীবনান্তকাল পর্যন্ত মৃত্যুর অধিক কষ্ট প্রদান করিব, আমার আদেশে অবিলম্বে একটি লৌহময় শিকর নির্মিত হইবে, সেই শিকর তিন দিকে বদ্ধ করিয়া এক দিক পুরিয়া রাখিতে হইবে, মহিবীকে এই শিকরে আবদ্ধ করিয়া, আমার প্রধান মসজিদের সম্মুখে স্থাপিত করিতে হইবে, দার্শনিক মুলমানগণ যখন উপাসনা করিতে বাইবেন, তখন তাঁহারা প্রত্যেকে মহিবীর মুখে নিজের ভাগ্য করবেন। যাবজ্জীবন তাহাকে এই দণ্ড বহন করিতে হইবে। যদি কোন মুলমান আমার এই আদেশ পালন না করে, তাহা তাহার প্রতিও এই দণ্ডবিধান করা হইবে। আমার আদেশ প্রতিপালিত হয় কি না, তাহা দেখিবার জন্য—উজীর, তুমি উপযুক্ত প্রহরী নিযুক্ত করিবে।”



সুলতানের কথা শুনিয়া উজীর বুলিলেন, তাঁহার এই আদেশ ফিরিবে না। সুলতানের কঠোর আদেশ অবিলম্বে রাজ্যের সর্বত্র প্রচারিত হইল। মহিবীর ভগিনীঘরের আত্মাদের সীমা রহিল না। শীঘ্র লৌহশিকর নির্মিত হইল, মহিবীকে তাহার মধ্যে পুরিয়া কন্দচারিগণ প্রধান মসজিদের সম্মুখে রাখিয়া আশিল; মহিবী বীরভাবে নন্তমস্তকে এই নিলাস্রুপ অপমান সহ্য করিতে লাগিলেন। সাধুলোকের হৃদয় মহিবীর দুখে ও অপমানে রহস্যভূত হইতে আরম্ভ হইয়া উঠিল; সুলতানের পৈশাচিক ব্যবহারের জন্য তাঁহারা বিজ্ঞার দিতে লাগিলেন।

সুলতানের পুত্রঘর ও কস্তাকে উজীর-পরিদর্শকের পত্নী নিজের পুত্র ও কস্তার জায় লাগানপালন করিতে লাগিলেন। আরবিনের মধ্যেই রাজপুত্রঘর ও রাজকস্তার গুণগ্রামের কথা সকলেরই কর্ণপোচ হইল। সাধারণ লোকের সন্তান অপেক্ষা সকল বিষয়েই তাহাদের বিশেষত্ব সকলে লক্ষ্য করিল।

উজীর-পরিদর্শক প্রধান পুত্রের নাম রাখিলেন, বামান; দ্বিতীয়ের নাম রাখিলেন পার্বিজ; রাজকুমারীর নাম হইল পরীকানী। এই কয়েকটি নামই পারস্তের প্রাচীন সুলতান ও সুলতান-মহিবীর নাম।

পুত্রকে পুত্র
জানক ভোগে

ক
১
ক

বিভাগ্যে সুলতাননন্দন ও সুলতাননন্দিনী অসামান্য দক্ষতা প্রকাশ করিলেন। অন্নদিনের মধ্যেই তাঁহারা স্নিগ্ধকর সমস্ত বিভা আয়ত্ত করিয়া গইলেন। সুলতানজিহা নৃত্যশিল্পেও অন্নদিনের মধ্যে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। জাই-ভঙ্গিনী সকলেই সমান বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

উত্তান-পরিদর্শক তাঁহার পালিত পুত্রকল্পাণের শিক্ষা, শারীরিক এবং মানসিক উন্নতি সকল বিশেষ পূর্ণকৃত হইলেন। তিনি তাহাদিগের বাসের জন্য একটি নূতন বাসস্থান নির্মাণ করাইলেন। তিনি তাহাদিগকে দৃষ্টি অস্ত্রাল করিতে পারিতেন না,—এতই অতিরিক্ত যত্ন করিতেন। তাহাদিগের স্বথের জন্য অর্বাব্যে তাঁহার রূপণতা ছিল না।

নূতন গৃহ নির্মিত হইলে উত্তান-পরিদর্শক সুলতানের নিকট উপস্থিত হইয়া, বার্তিকাবশুতঃ রাজকর্ম হইতে অবসর প্রার্থনা করিলেন। সুলতান তাঁহাকে অবসর দান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি আমার নিকট কি পুরস্কার লইতে ইচ্ছা কর?” উত্তান-পরিদর্শক বলিলেন, “জীহাণনা, আমি আপনার পিতার আমোল হইতে সয়কারের সেবা করিয়া আসিয়াছি, কখনও কোন বিষয়ে আমার অভাব হয় নাই, এখনও কোন অভাব নাই, আমি যে কয়দিন বাঁচিব, আপনার অহুগ্রহ হইতে যেন বঞ্চিত না হই, ইহা ভিন্ন আমার অন্য প্রার্থনা নাই।” সুলতান সন্তোষিত্তে তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন। উত্তান-পরিদর্শক তাঁহার নূতন বাড়ীতে আসিয়া পুত্রকল্পার সহিত বাস করিতে লাগিলেন। এই ঘটনার প্রায় ছয় মাস পরে সহসা উত্তান-পরিদর্শকের মৃত্যু হইল।

রাজকুমার বানান, পার্শ্বিক এবং রাজকুমারী পরীজাদী উত্তান-পরিদর্শককে তাঁহাদের পিতা বলিয়া আনিতেন। পিতার মৃত্যুতে তাঁহারা কাতরভাবে যিলাপ করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন শোকই বীৰ্য-কাল স্থায়ী হয় না, তাঁহাদের এ শোকও স্থায়ী হইল না। রাজপুত্রর উচ্চাকাঙ্ক্ষায় রাজকল্পার প্রবেশ করিবার সংকল্প করিলেন।

এক দিন রাজপুত্রর মরণ্য গিরাজেন, রাজকল্পা গৃহে একাকিনী আছেন, এমন সময় একটি বৃদ্ধ ব্রহ্মণ্যর ককিরাজী তাঁহাদের ঘরে আসিল। দাসীরা তাহাকে উত্তান প্রকৃতি দেখাইয়া অধমানে তাহাকে রাজকল্পার লব্ধ উপস্থিত করিল। রাজকল্পা তাহাকে অত্যন্ত আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া মধুরকনে বলিলেন, “মা, আমার পাশে আসিয়া বসুন, আপনার মত লোকের সঙ্গে চমকু কথা করিবার সুযোগ লাভ করিয়া আমি খুশি হইলাম, আপনার জায় ধর্মশীলা রমণীর পাদম্পর্শে এ গৃহ পবিত্র হইল।”

ককিরাজী নীচে বসিতে বাইতেছিল, কিন্তু রাজকল্পা তাহাকে নীচে বসিতে দিখেন না, তাহাকে ঘরির সোকার উপর নিজের কাছে উপবেশন করাইলেন। ককিরাজী বলিয়া বলিল, “মা, আমি আপনার সঙ্গে একত্র উপবেশনের যোগ্য নহি, তবে আপনি গৃহস্থামিনী, আপনার অহুগ্রহে দক্ষ না করিলে নয়, তা’ আপনার সঙ্গে একসঙ্গে বলিলাম।” উভয়ে গল্প আরম্ভ করিল, এক জন জনী মূল্যবান পায়ে লগ্ন্যবগেণে আয়োজন করিয়া দিল।

রাজকল্পা একখানি স্ট্রী সেই পাড় হইতে তুলিয়া লইয়া ককিরাজীকে বলিলেন, “মা, এই স্ট্রীখানি ধান, আর অনেক রকম ফল রহিয়াছে, গ্রহণ করুন।”—ককিরাজী বলিল, “মা, আমার এই সকল রাজভোগ আহারের অভাব নাই, কিন্তু আপনি অহুগ্রহ পুত্রক বহা দান করিতেছেন, তাহা অগ্রাহ করা আমার পক্ষে শোভা পায় না, তাই ইহা গ্রহণ করিলাম।” ককিরাজীকে আহার করিতে দিয়া রাজকল্পা ককিরাজীকে আহার করিলেন। তাহার পর তাহাকে ধর্ম মন্ত্রে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। অহুগ্রহে কল্পাএসে তিনি বলিলেন, “কেমন মা, আমাদের বাড়ী-ঘর আপনি শু’ দেখিলেন, কেমন, ইহা আপনার পছন্দ হয় ত’?”

অতিথি-
সম্বর্দনার
আগ্রহ

ক
১
ক

বলিলেন, “তোমাদের তায় ব্যক্তির বাসস্থান কোনক্রমেই আমার বিশ্বাসের অযোগ্য হইবে না, এ বিষাস আমার আছে, আমি মহানন্দে তোমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলাম, তোমাদের গুলবতী ভূমিনীর অতিথ্য-স্বীকারে আমি পরম আপ্যায়িত হইব। আগামী পরশ আমি তোমাদের গৃহে উপস্থিত হইব। প্রথম দিন তোমাদের সহিত আমার দেখানো সাক্ষাৎ হইল, পরন্তু প্রাতেও সেই স্থানে তোমরা আমার সাক্ষাৎ পাইবে। সন্ধ্যান হইতে আমাকে তোমরা তোমাদের গৃহে পথ দেখাইয়া লইয়া বাইবে।”

রাজপুত্র বামান ও পার্শ্বিজ সন্কার পর গৃহে কিরিয়া, স্থলতান তাঁহাবিগকে কিরূপ সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ভূমিনীকে বলিলেন; স্থলতান তাঁহাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও বলিলেন।

আর এক দিন পরেই স্থলতান গৃহে পদার্পণ করিবেন শুনিয়া রাজকুমারী বলিলেন, “স্থলতানকে উপযুক্ত অভ্যর্থনা করিতে হইবে, আমার বিবেচনার এ বিষয়ে আমাদের পার্থীর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত, সে স্থলতানের পছন্দ আমাদের অপেক্ষা ভাল জানে বলিয়াই বোধ হয়।”

পার্বীকে সম্বোধন করিয়া কুমারী বলিলেন, “পার্থী, স্থলতান আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আগামী পরশ এখানে আসিবেন, তাঁহাকে কিরূপ অভ্যর্থনা করি বল।” পার্থী বলিল, “তোমার ভাল বাঞ্ছার ত’ অভাব নাই, সন্ধ্যাপ্রে স্থলতানের জন্ত কাঁকড় দিয়া মুক্তার বাজ্ঞ প্রস্তুত করাইবে।”

রাজকন্তা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “কাঁকড় দিয়া মুক্তার বাজ্ঞ! সে আবার কি রকম তরকারী? পার্থী, তুমি তরকারীর কোন সম্বন্ধ জান না দেখিতেছি, মুক্তা দিয়া কাঁকড়ের তরকারী রাখা যায় না, বাগ্গা ত’ ঘরের কথা, আর আমাদের এত মুক্তাই বা কোথায়?”

পার্থী বলিল, “ঠাকুরানি, আমি বাহা বলি, তাহা কর, কোন ভয় নাই। মুক্তার অভাব হইবে না, কাল প্রত্যহে তোমাদের বাগানের সর্বপ্রথম বৃক্ষটির মূলদেশ খনন করিলেই আশাভিত্তিক মুক্তা দেখিতে পাইবে।”

পার্থী যে বৃক্ষমূল নির্দেশ করিয়া দিল, তাহার মূলদেশ খুঁড়িয়া, রাজকন্তা পরদিন একটি সুবর্ণনির্মিত বাসে বহনব্যাক মুক্তা পাইলেন। মাগী রাজকন্তার আদেশে বৃক্ষমূল খনন করিয়া মুক্তাপূর্ণ বাসটি উত্তোলন করে এবং রাজকন্তার হস্তে তাহা দিয়া পুনর্বার পূর্ণ মুক্তিকা দ্বারা পূর্ণ করিয়া ফেলেন।

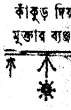
কুমারীর আদেশানুসারে বাবুর্জী সেই অসম্ভব তরকারীই রন্ধন করিল। প্রথমে সে বিস্তর আগুতি করিয়াছিল, রাজকন্তাকে পাগল মনে করিয়াছিল, কিন্তু রাজকন্তার আদেশে তাহাকে সম্মত হইতে হইল।

পরদিন স্থলতান সূর্য্য শয্যে করিয়া, মধ্যাহ্নকালে উত্তান-পরিদর্শকের গৃহে বাত্মা করিলেন। পার্শ্বিজ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন। বামান তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

স্থলতান রাজপুত্রদের সহিত তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিতেই রাজকন্তা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্ত আর্দ্র ত্যাগ করিলেন, স্থলতান রাজকন্তার রূপ দেখিয়া বিমোহিত হইলেন; প্রশংসামানুষ্টিতে তাঁহার দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, “কি চমৎকার! যেমন তাই, তেমনি ভগিনী!”

অনন্তর স্থলতান সেই গৃহের গৃহদ্বাৰা বহুদূর দেখিলেন, তাহারই প্রশংসা করার রাজকন্তা বলিলেন, “ভাগ্যিনী, আমাদের এই গৃহ সামান্য, আমরা বহির্জগৎ হইতে এক প্রকার ঘুরেই রহিয়াছি, নগরের সুপ্রশস্ত বসন্তিত হৃৎপ্রাণের সহিত ইহার কিছুমাত্র তুলনা হইতে পারে না, আপনার প্রাণদের ত’ কথাই নাই।”

স্থলতান বলিলেন, “আমি তোমাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। আমি তোমাদের এই প্রাণদের বহুদূর দেখিয়াছি, তাহা হইতেই ইহার অবশিষ্ট অংশ সম্বন্ধে উপযুক্ত ধারণা করিতে সমর্থ হইয়াছি। সকল অংশ দেখিয়া আমি আমার মৃত প্রকাশ করিব। এখন একবার উত্তান ও প্রাণাদটি ব্রিয়া দেখি চল।”



স্বলতান প্রাসাদের সকল অংশ প্রথমে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিলেন। তাহার পর বলিলেন, “ভদ্রে, তুমি এমন সুন্দর প্রাসাদকে সামান্য গৃহ মাত্র বলিয়া মনে কর? নগরের মধ্যে এমন প্রাসাদ দুই চারিট থাকিলে নগর ধ্বংস হইত, নগরের সৌন্দর্য্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইত। এমন সুন্দর বৃক্ষবাটিকা থাকিতে কে নগরে বাস করিতে বায়? চল, এখন তোমাদের উদ্ভান পরিদর্শন করি।”

আকাশে

স্বলতান

রাজকন্যা স্বলতানকে উদ্ভানের মধ্যে লইয়া চলিলেন। প্রথমেই স্বলতানের দৃষ্টি সেই সুবর্ণজালের নির্ঝর উপর নিপতিত হইল। নির্ঝরের জল সুবর্ণধারার দ্বায় বরবর শব্দে ঝরিয়া পড়িতেছে। স্বলতান অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিম্বরপূর্ণ-দৃষ্টিতে সেই নির্ঝর-শোভা নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর অত্যন্ত আগ্রহভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “এ সুবর্ণ-নির্ঝর কোথা হইতে আসিল? এমন অপূর্ণ সামগ্রী ত’ কোথাও দেখি নাই! অতি অল্পই পদার্থ। ক্রমে তিনি সঙ্গীতকারী বৃক্ষ ও বাক্শক্তিগণের বিহঙ্গের পিঞ্জরের নিকট উপস্থিত হইলেন।

সহসা তাঁহার কর্ণে বহুসংখ্যক বাস্তবস্ত্রের সম্মিশ্রিত, সুসঙ্গমিলিত সঙ্গীততরঙ্গ প্রবেশ করিয়া, অতৃপ্তপূর্ণ মাঝে তাঁহার চিত্ত আচ্ছন্ন করিল। কিন্তু কোথা হইতে সেই সঙ্গীতধ্বনি উদ্ভিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারিলেন, তিনি বিম্বাকুলদৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন। স্বলতান অবশেষে কোতুলহলভরে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে কোথায় গান করিতেছে? বড় মিষ্ট গান ত’। আকাশে কি সঙ্গীত-প্রবাহ সঞ্চারিত হইতেছে? ঐ, গায়কগণ কোথাও অদৃশ্য থাকিয়া শ্রোতার কানে এই সুধাধারা ঢালিয়া দিতেছে?” রাজকন্যা হাসিয়া গিলেন, “জাহাপনা, কোন গায়ক নহে। ঐ বৃক্ষই গান করিতেছে, উহার প্রত্যেক শাখা-পত্র হইতে সঙ্গীতধারা বহিতেছে। আপনি বৃক্ষের মূলদেশে উপস্থিত হইলেই আমার কথা বর্ণার্থ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন।”

স্বলতান বিষয়ে সন্তোষ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তাই ত’! এখন আমি বুঝিতেছি, অতি অল্পই বৃক্ষ! কাথায় এ বৃক্ষ পাইলে? ইহার কি নাম? পৃথিবীতে এমন গাছ আছে, তাহা আমি জানিতাম না।”

সম্মিত-মুখে রাজকন্যা বলিলেন, “এই বৃক্ষের নাম সঙ্গীতকারী বৃক্ষ। ইহা এ দেশে অল্পই আছে। এখানে বহুগুণে আসিল, জাহাপনা যখন বিশ্রাম করিবেন, সেই অবসরে সে বিচিত্র কাহিনী আপনার গোচর করিব। আপনি বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছেন, এখন অল্পগ্রহ করিয়া গৃহে আসিয়া বিশ্রাম করুন।”

স্বলতান বলিলেন, “না না, আমার ক্লান্তি নাই, এই সকল বিচিত্র দৃশ্য দেখিয়া আমি যথেষ্ট আমোদ হইতেছি। চল, আর একবার স্বর্ণসলিলের নির্ঝরটি দেখি। আমার বিশ্বাস, ইহাও এ দেশের সামগ্রী নহে, সঙ্গীতকারী বৃক্ষের দ্বায় ইহাও বিনোদের সামগ্রী।” রাজকন্যা বলিলেন, “ঐ জল এই আধারের ভিতর হইতে আপনিই উৎসারিত হইতেছে, কিন্তু ইহা বন্ধ হইবার নহে।”

পাখীর গানের
অমিয়-মাদুরী

ক

স্বলতান অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহা দেখিয়া বলিলেন, “এখন চল, বাক্শক্তিবিশিষ্ট পক্ষীটি দেখিয়া আসি।” স্বলতানকে সঙ্গে লইয়া রাজকন্যা প্রাসাদের দিকে চলিলেন, এক স্থানে আসিয়া স্বলতান দেখিলেন, বহুজাতীয় পক্ষী একটি বৃক্ষে বসিয়া মধুরস্বরে গান করিতেছে। স্বলতান সন্নিহনে জিজ্ঞাসা করিলেন, “উদ্ভানের আর কোথাও একটিও পক্ষী নাই, অথচ এখানে এত পক্ষী গান করিতেছে, ইহার অর্থ কি?”

রাজকন্যা বলিলেন, “বাক্শক্তিবিশিষ্ট পাখীর আচ্ছাদনে ইহার এখানে উপস্থিত হইয়াছে। স্বলতান, ঐ বারান্দায় যে একটি পিঞ্জর দেখিতেছেন, উহার মধ্যে সেই পাখীটি আছে। আপনি মনোযোগ দিয়া শুনিবে উহার সঙ্গীত শুনিতে পাইবেন, সকল পাখীর গান অপেক্ষা উহার গান সমধিক মিষ্ট।”



